অধরা মাধুরী

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগষ্ট ১৯৬৩

প্রকাশক

প্রদীপ বসু

বুকমার্ক

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

নবদ্বীপ বসাক

পাবলিসিটি কনসার্ন

৩ মধু গুপ্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ

গৌতম বসু

সৃষ্টির চালচিত্র

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আগামী পক্ষকাল বিশেষ জরুরী কাজে আমাকে বাইরে থাকতে হচ্ছে। যদিও আমি জানি আপনার সৃষ্টির চালচিত্রগুলি এখুনি প্রেসে দেওয়া দরকার। আপনার মুখ থেকে শোনা ছ'টি উপন্যাসের পটকথা আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে পাঠালাম। বাকি তিনটি আমার জানা না থাকায় ওগুলির পশ্চাৎপট রচনার ভার রইল আপনার ওপর।

আপনার স্নেহের
রোমি সাহা

*

রোমি আমার কন্যাপ্রতিম। বেশ কিছুদিন ধরে ও আমার উপন্যাসগুলি রচনার পটভূমি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে এসেছে এবং আমিও ওর কাছে আমার উপন্যাস-সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সেগুলি ও শ্রুতিধরের মতো স্মৃতিতে ধারণ করে লিখে পাঠিয়েছে। যে তিনটি উপন্যাস ওর অজানা ছিল সেগুলির চালচিত্র আমি এঁকে দিলাম। এখন রসগ্রাহী পাঠকই অনুমান করুন কোনটি কার রচনা।

লেখক

তানাকা

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' পড়েছিলাম। কয়েকটি আঁচড়ে কবি জাপানীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

নানা আলোচনার ভেতরে কবির দুটি বিশেষ আলোচনা আজও আমার মনকে অধিকার করে আছে। 'ইকেবানা' জাপানী ফুল সাজানোর একটি বিশেষ আর্ট। ফুল সাজানোর এই বিশেষ পদ্ধতিটিকে বিশ্বের শিল্পমনোভাবাপন্ন সমস্ত মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তা দেখা যাক। 'কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ওই দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পারছিলাম।'

কবিগুরুর অন্য দর্শনটি জাপানী কবিতা—'হাইকু' সম্বন্ধে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব বিশ্লেষণ বা মন্তব্য।

'পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।'

আর বেশী না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্ছে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এই টুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত

করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয় তার কারণ জাপানী পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল'।

আর একটি হাইকুর নমুনা তুলে ধরেছেন কবি, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো ঃ

'স্বর্গ এবং মর্ত্য হচ্ছে ফুল
দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্ছেন ফুল'—

'মানুষের হৃদয় হচ্ছে ফুলের অন্তরাত্মা। আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েছে। জাপান স্বর্গ মর্ত্যকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর করে দেখছে; ভারতবর্ষ বলছে, এই যে এক বৃন্তে দুই ফুল, স্বর্গ এবং মর্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত—এই সুন্দরের সৌন্দর্যটি হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।'

আমার কাছে কবিগুরুর লেখা এই ছত্রগুলি একসময় প্রেরণার মতো ছিল। জাপান দেশটাকে জানার জন্যে তাই আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

—* আমার এক ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয় একসময় জাপানী পুতুল গড়ার কারিগরী বিদ্যা শেখার জন্য জাপান যাত্রা করে। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় তাকে এ কাজে ব্রতী হবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।

সে ওই বিদ্যা শিখে ফিরে এসে কল্যাণীতে একটি কারখানাও করেছিল। সঙ্গে এনেছিল এক জাপানী বধূ। আমি শুনতাম, বধূটির আচার-ব্যবহার, রুচি ও পরিচ্ছন্নতা অনুকরণীয়। সকলের মুখে তাঁর প্রশংসা শুনতাম। কোনও কোনও বিবাহ অনুষ্ঠানে আমি তাঁকে দেখেছি। একটি সবুজ কিংবা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি তিনি পরতেন। দেহের সুবর্ণকান্তি তাতে অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠত। এত স্বল্প সাজে যে এমন সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে তাঁকে না দেখলে বোঝা যেত না।

একসময় আমার ওই ভাইটির ব্যবসার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। স্বভাবতই সংগ্রাম করতে হয় তাকে। সেই বিপর্যয়ের দিনেও স্বামীকে যেভাবে ওই জাপানী 'বধূটি' আগলে রাখতেন ও উৎসাহ দিতেন তা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগত।

সে সময় কোনও উৎসব-বাড়িতে গেলে তিনি নিজের হাতে তৈরি অমূল্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যেতেন। পরে এই বধূটির সহযোগিতায় আমার ভাইটি জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। তার সন্তান কৃতি হয়ে এখন আমেরিকাবাসী। ওখানে পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে দুজনে সুখে ও আনন্দে কাটাচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে, জাপানী বধূরা সংসার রচনায় সিদ্ধ।

—* প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের এক পুত্র জাপানের এক শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রবোধেন্দুনাথের 'কাদম্বরী' বইখানি রূপা থেকে নবকলেবরে প্রকাশিত হয়। রূপার কর্ণধার ডি. মেহ্‌রা সাহেবের ইচ্ছানুসারে আমি ঐ অমূল্য গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে দিই। প্রবোধেন্দু ঠাকুর ভারি খুশি হয়েছিলেন। সেই সুবাদে মেহ্‌রা সাহেব আমাকে তাঁর বাংলা পাবলিকেশানের সম্পাদনার ভার দেন। অধ্যাপনা ও আমার সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমি রূপার গ্রন্থ-সম্পাদনার কাজও করতাম।

সেই সময়ে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের জাপান-প্রবাসী শিল্পী-পুত্রের দুটি বাংলা পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। একটি জাপানী হাইকুর বাংলা রূপান্তর, অন্যটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জাপানী ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতার স্নো-কান্ট্রি উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ 'তুষার গ্রাম'। দুটি গ্রন্থই আমরা রূপা থেকে প্রকাশ করি। উপন্যাসটি আকারে ক্ষুদ্র। মহৎ উপন্যাসের উপাদান কিংবা বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি বা বার্তা এর মধ্যে নেই, কিন্তু যা আছে তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। জাপানের অন্তর্লোকের স্পন্দন এই উপন্যাসটিব ভেতর শোনা যায়।

এগুলি নিঃসন্দেহে আমার 'তানাকা' উপন্যাসটি রচনার পশ্চাদ্‌পট।

—* লক্ষ্মী নামের মেয়েটি আমাদের নিকট আত্মীয়া। রসিকতার মধুর সম্পর্ক তার সঙ্গে। জাপানে অবস্থিত ভারতীয় একটি ব্যাঙ্কের কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়ে তার স্বামী অশিস সেন সস্ত্রীক জাপান যাত্রা করে। বেশ কয়েক বছর জাপানে কাটিয়ে তারা দেশে ফিরেছে। জাপান থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া

বস্তুগুলি তারা একটি হল ঘরে সাজিয়ে রেখেছিল। সেগুলি দেখে আমার মনে হয়েছিল, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের স্বপ্নময় লীলাভূমি এই জাপান দেশটা। বিষয়-লক্ষ্মী তাঁর সম্পদের অনিঃশেষ ঝাঁপিটি মেলে বসে আছেন সেখানে, আর কলা-লক্ষ্মী তাঁর ঝাঁপি থেকে নিরন্তর বের করছেন, বিশ্বের দৃষ্টিনন্দন বিস্ময়কর আনন্দ কণিকাগুলি।

তিনসখী

একটি মফস্বল শহরে পাঁচ দিন ব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে পৌরহিত্য করতেন।

সেই সুন্দর এবং ছোট শহরটি'তে আমার কৈশোর এবং তারুণ্যের অনেকগুলি দিন কেটেছিল। যখন ওই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন আমি কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করি। হয়ত সেই অঞ্চলের মানুষ ছিলাম বলে উৎসবের পরিচালক সমিতি ওই পাঁচদিনের একদিন আমাকে সভা পরিচালনার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমি যখন সান্ধ্যসভায় যোগ দেওয়ার জন্য আসছিলাম তখন শেষ সূর্যের কিরণ ঝরে পড়ছিল মধুবিন্দুর মতো। আমার মনে হয়েছিল সেই বিন্দুগুলি যেন বিশ্বকবির সৃষ্টির অমৃতধারা!

সেদিন সেই সভায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও পথে সেই সুধারসধারার স্পর্শ পেয়েছিলেন।

আমি বক্তব্যের শুরুতেই ওই দৃশ্যটুকুর উল্লেখ করেছিলাম। আমার অনুভূতির সঙ্গে শ্রোতাদের অনুভূতি মিলে যাওয়ায় সেদিন সমস্ত সভা তাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল ।

প্রতিদিন সভার শেষে মঞ্চে একটি করে নাটকের অনুষ্ঠান হত। আমি যেদিন উপস্থিত ছিলাম সেদিন মঞ্চে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন হয়।

আমি প্রথম সারিতে বসে মঞ্চের অনুষ্ঠান দেখছিলাম।

'শ্যামা'-র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠলাম। প্রসাধনের আড়ালে যে মেয়েটি রয়েছে তাকে আমি তার নবকৈশোরে শহরের পথ দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখেছি। সে তার রূপ এবং লাবণ্যে পথচারীদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করত। সে অবশ্য একা চলত না, তার সঙ্গে চলত তারই যমজ বোন, অবিকল দর্পণে দেখা তারই প্রতিরূপ। রঙে, রূপে, লাবণ্যে দু-জনকে তফাৎ করার কোনও অবকাশ থাকত না।

সেদিন মঞ্চে একজন নেচেছিল 'শ্যামা'-র নাচ অন্যজন গেয়েছিল 'শ্যামা'র গান।

আমি মুগ্ধ হয়ে নৃত্যনাট্যটি দেখছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, ওই যমজ বোন দুটিকে নিয়ে ছোট্ট একটি উপন্যাস রচনা করলে কেমন হয়!

অনেক কথার মতো সেকথাও একদিন আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শান্তিনিকেতনে একটি অনুষ্ঠানে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য দেখে আমার আবার মনে পড়ে গিয়েছিল ওই যমজ বোন দুটির কথা।

সেদিন কৃষ্ণা সেন 'শ্যামা'-র ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশন করেছিল আর আমার যতদূর মনে পড়ছে 'শ্যামা'-র গান গেয়েছিলেন শ্রদ্ধেয়া মোহরদি।

সেটি ছিল বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান। আকাশে পূর্ণচন্দ্র স্বমহিমায় বিরাজ করছিল। গৌর-প্রাঙ্গনের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কেবল মঞ্চটুকু ছিল আলোকিত। চাঁদের আলোর প্লাবনে ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। তার সঙ্গে সে রাতে কবির আশীর্বাদ হয়ে ঝরছিল মতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিকণা, যাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বসন্তের উতল হাওয়া।

শ্যামার ভূমিকায় সেদিন অপূর্ব নেচেছিল কৃষ্ণা সেন। আমার নিকট-আত্মীয়া অজিতা, কৃষ্ণার সঙ্গে জুলজি নিয়ে পড়ত শান্তিনিকেতনে। তারা ছিল একেবারে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। কলকাতাতে এলেই ওরা দুটিতে আমার বাড়িতে চলে আসত। আমার ছোট্ট হলঘরটিতে ওরা নাচত, গাইত, আনন্দ করত। ওদের চেয়ে দু-এক বছরের বড় রীতা কলাভবনের ছাত্রী ছিল। সে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-র পুত্র শিল্পী বিশ্বরূপ

বসু-র নিকট আত্মীয়া। কৃষ্ণা আর অজিতা-র সঙ্গে রীতাও ত্রিবেণী সঙ্গমে যুক্ত ছিল। সুযোগ পেলে সে-ও চলে আসত আমার কলকাতার বাড়িতে। রীতা বহু যত্নে আমার মেয়েকে ছবি আঁকা শিখিয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে গেলে আমরা শালবীথিতে বসতাম, খোয়াই-তে ঘুরে বেড়াতাম আর কোপাই নদীর গেরুয়া জলে হাত ডোবাতাম।

শান্তিনিকেতনের পটভূমিতেই একদিন শুরু করি আমার 'তিনসখী' উপন্যাস, কিন্তু প্রধান চরিত্রে নিয়ে আসি প্রথম 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে দেখা ওই দুই যমজবোনকে। নবকল্লোল শারদীয় সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশের পর বেশ কিছু পাঠক তাঁদের চেনা মুখগুলিকে এর ভেতর দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন তাঁদের মনের উচ্ছ্বাস, আর সেটাই ছিল আমার পরম প্রাপ্তি। অবশ্য উপন্যাসের মূল কাহিনীটির সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই বললে হয়।

*

পিপাসার নদী

আমাদের ভেতর নিরন্তর বয়ে চলেছে এক পিপাসার নদী। কখনো সে তৃষ্ণা দূর করে, কখনো বা তৃষ্ণিতের কাছ থেকে দূর সরে যায়। অন্তঃসলিলা সে, তাই নির্ভর করতে হয় তার লীলার ওপরে। যখন সে স্বপ্রকাশ তখন প্রার্থিতের অঞ্জলি ভরে দেয় অমৃত ধারায়। আবার কখনো সে গুপ্ত হয় মরুবালুকায়। তখন শুধু মরুঝড়, রিক্ত কামনার হাহাকার।

কাহিনীর নীলাঞ্জন আর রুচিরা কোন স্বতন্ত্র তরুণ তরুণী নয়, প্রতিটি তরুণ তরুণীর কামনা বাসনা, পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত প্রতীক মাত্র।

*

গয়া থেকে তিলাইয়া ড্যামে পৌঁছনোর পথে পড়ে দীর্ঘ চৌপারণ অরণ্য। নিবিড় অরণ্যভূমির ভেতর দিয়ে পিচঢালা রাস্তাটা চলে গেছে আঁকাবাঁকা ময়াল সাপের মতো।

আমি যাচ্ছিলাম ডি. ভি. সি.-র একটা গাড়িতে গয়া থেকে তিলাইয়া। গাড়িটি আমার এক বিশেষ পরিচিত জনের। তিনি ডি. ভি. সি.-র অনেক ওপরের এক কর্মকর্তা। সে-সময় জরুরী কাজে দিল্লীতে ছিলেন তিনি। কয়েকদিনের ভেতরেই অন্যতম এক মেম্বারকে নিয়ে তাঁর তিলাইয়াতে আসার কথা। আমার সঙ্গে ছিল তাঁরই তরুণী বোন। ডিরেক্টর-স্ বাংলোতে মাননীয় মেম্বারের দেখভালের দায়িত্ব পড়েছিল তার ওপর।

সে সময় আমি গয়াতে গিয়ে, বোধগয়া ইত্যাদি ঘুরে দেখছিলাম। দিল্লী থেকে ওখানেই টেলিগ্রাম পেয়ে আমাদের ওই স্নেহের ভগ্নীটিকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলাম তিলাইয়ার পথে।

গাড়ি চালাচ্ছিল যে, সে ডি.ভি.সি-রই এক ইঞ্জিনিয়ার, সুদর্শন যুবা পুরুষ। তিলাইয়া ড্যামের চার্জ বুঝে নিতেই সে যাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে গাড়ি থামলে আমরা নেমে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিকে দেখছিলাম। ইচ্ছে করেই আমি সুযোগ করে দিচ্ছিলাম দুটি তরুণ-তরুণীকে একান্তে কথা বলার।

চৌপারণ অরণ্যের মাঝামাঝি এসে আমরা একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম। হঠাৎ গাড়িটা বিগড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও শেষ অবধি গাড়িটাকে চালান গেল না।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে উঠল তাল তাল মেঘ। ধেয়ে এল দুরন্ত ঝড়। অরণ্য উত্তাল। ছিন্নভিন্ন শাখা পল্লব। বিদ্যুতের ঝলসিত অসিতে বিদীর্ণ মেঘমালা। মেঘগর্জনে, বায়ুর স্বননে, মুহুর্মুহু বজ্রধ্বনিতে আদিম অরণ্য-পট কম্পমান।

শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি।

পেছনে রুচিরাকে নিয়ে বসেছিলাম আমি, সামনে স্টিয়ারিং ধরে নীলাঞ্জন। হঠাৎ গাড়ি থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল রুচিরা।

খুশিতে উদ্বেল সে। ডান হাত খানা শূন্যে তুলে ঝড়কে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে গেয়ে উঠল :

'ওরে ঝড় নেমে আয়
আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে ॥'

ব্যস, আর কোথা যায়। সামনের দরজা খুলে হুট্ করে বেরিয়ে পড়ল নীলাঞ্জন। সেও রুচিরার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, দুজনের কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। সমানে সুরে সুর মিলিয়ে গাইছে দুজনে।

রুচিরা রবীন্দ্রসংগীত শিখেছে স্বনামধন্য এক গায়িকার কাছে। তার কণ্ঠের মাধুর্য বিভিন্ন ছোটবড় আসরের শ্রোতাদের তৃপ্ত করেছে। কিন্তু নীলাঞ্জন নামের যুবকটির গান, এই আমি প্রথম শুনলাম। সুরেলা দরাজ গলা, শ্রবণ মন বাহবা দিয়ে উঠল।

একটা শেষ হতেই আর একটা ধরল রুচিরা :

'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে ॥'

অমনি চেঁচিয়ে উঠল নীলাঞ্জন, এবার আমার গাওয়ার পালা। রুচিরা থেমে গিয়ে বলল, দারুণ গলা আপনার, গান, গান।

নীলাঞ্জন গাইল পরের একটি স্তবক :

'তাহারে দেখিনা যে দেখিনা,
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনু রুনু রুনুরুনু নূপুর ধ্বনি ॥
গোপন স্বপনে ছাইল
অপরশ আঁচলের নব নীলিমা।'

এবার দ্বৈতগলায় অপরূপ হয়ে উঠল শেষাংশটুকু।

'উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে
তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে।
সে যে মন মোর দিল আকুলি
জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে ॥'

ওরা গাড়িতে এসে যখন ঢুকল তখন পোশাক-পরিচ্ছদ প্রায় ভিজে গেছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও।

আমার পায়ের তলায় একটা কিটব্যাগ ছিল। তার চেন টেনে নতুন তোয়ালেখানা বের করলাম। রুচিরার হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা দুজনে মাথাটাথা মুছে নাও।

রুচিরা কিন্তু তোয়ালেটা হাতে নিয়ে নীলাঞ্জনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নীলাঞ্জনদা, এই ধরুন, আগে আপনি মুছে নিন।

নীলাঞ্জন অমনি বলল, না না আপনি আগে।

রুচিরা হেসে বলল, আমার চুলে যে পরিমাণ জল জমেছে তাকে মুছুতে গেলে ওই তোয়ালেটাকে আর কিছুতেই শুকনো রাখা যাবে না। তার চেয়ে বরং আপনার ওই অল্প চুল আগে মুছে নিন।

তোয়ালের একটি কোনা দিয়ে তার চুল আর মুখটা মুছে নিল নীলাঞ্জন। তারপর ফিরিয়ে দিল রুচিরার হাতে।

রুচিরাও সেই তোয়ালে দিয়ে ধীরে ধীরে মুছে নিল তার ভেজা চুলগুলো।

গাড়ির ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল মৃদু মিষ্টি একটা গন্ধ। কালিফোরনিয়ান পপি জাতীয় কোন তেলের সুবাস।

আমি বললাম, মাথা বাঁচালে কিন্তু সর্বাঙ্গ বাঁচাতে পারলে না।

নীলাঞ্জন মুখ ঘুরিয়ে বলল, কিচ্ছু হবে না, ও গায়েতেই শুকিয়ে যাবে।

রুচিরাও বলল, সিন্থেটিক জামাকাপড়ে জল ধরে না।

মনে মনে ভাবলাম, যৌবনের উত্তাপ সব সিক্ততাকেই শুষে নেয়।

প্রায় দু-ঘন্টা অঝোর বর্ষণের পর শান্ত হল প্রকৃতি। ঝড় থামল, বৃষ্টি থামল, শুধু তাই নয় অরণ্যের বৃষ্টিধৌত শাখাপল্লবে চাঁদের আলো এসে পড়ল। আমাকে বলার অপেক্ষা না রেখে ওরা দুটিতে আবার বাইরে বেরোল। আমার ইচ্ছে থাকলেও আমি গাড়িতে বসে থেকে দুটি তরুণ-তরুণীর একান্ত আলাপের সুযোগ করে দিলাম।

একসময় কথা বলতে বলতে ওরা বনের আলোছায়ার দিকে এগিয়ে গেল। আমি বসে বসে, মনে মনে গল্পের প্লট বুনতে লাগলাম।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে রুচিরা গাড়ির পেছন থেকে এগিয়ে এসে চুপি চুপি বলল, শীগগির বেরিয়ে আসুন, চমৎকার একটা ছবি দেখতে পাবেন।

আমি বেরিয়ে ওর সঙ্গে বনের দিকে হেঁটে গেলাম।

নীলাঞ্জন গাছের আড়ালে থেকে দৃশ্যটা দেখছিল, আমরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দুটো হরিণ আর একটা বাচ্চা বনের বাইরে এক চিলতে ঘাসে ভরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। ওরা আমাদের দিকে পেছন ফিরে চাঁদের আলো গায়ে মাখছিল। মা-হরিণের গায়ে লেপটে ছিল বাচ্চাটা।

সত্যিই চাঁদের আলোর একটা মোহিনী মায়া আছে। সে যেন ঘর থেকে সবাইকে বের করে আনবেই।

প্রায় সারারাত জেগে থেকে শেষ রাতে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

একটা নয়, দু-দুটো গাড়ি!

নীলাঞ্জন হাত নেড়ে, চিৎকার করে গাড়ি দুটিকে থামাতে গেল। সামনের কাঠ বোঝাই লরিটা বেরিয়ে গেল প্রায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। পেছনের জিপটা যদিও সামান্য ব্রেক দিল কিন্তু পরক্ষণেই লরিটার পেছনে উধাও হয়ে গেল।

আমরা তিনজনেই নিরাশ হয়ে ভোরের আলোর অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় আধঘন্টার ভেতরেই ফিরে এল লরি আর জিপ।

জিপ থেকে নেমে এলেন চৌপারণ ফরেস্টের রেঞ্জার সাহেব। তাঁর মুখেই শুনলাম, চোরাই কাঠবোঝাই লরিটাকে ধরার জন্যে নীলাঞ্জনের ডাকে সে সময় তিনি সাড়া দিতে পারেননি।

ওঁর নির্দেশে ফরেস্ট-গার্ডটি লরির ড্রাইভারকে ডেকে নিয়ে এল। সে রেঞ্জার সাহেবের কাছে এসেই জড়িয়ে ধরল তাঁর পা।

রেঞ্জার হঠাৎ বললেন, যদি এই অচল গাড়িটাকে সারিয়ে তুলতে পার তা হলে দেখা যাবে।

ড্রাইভার লরি থেকে টর্চ আর কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে এল। প্রথমে বনেট খুলে দেখে নিল তারপর ঢুকে পড়ল গাড়ির তলায়।

মিনিট দশ পনেরোর ভেতরে সচল হল অচল গাড়ি।

কথা রেখেছিলেন রেঞ্জার। অবশ্য ড্রাইভারকে সবকটা কাঠই নামিয়ে রেখে আসতে হল যথাস্থানে। তারপর যৎসামান্য জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেল ড্রাইভার।

রেঞ্জার সাহেবের আমন্ত্রণে আমরা ফরেস্ট বাংলোতে গিয়ে প্রভাতী চায়ের আসরে যোগ দিয়েছিলাম।

সেদিনই জ্যোৎস্নাঝরা সন্ধ্যায় আমরা নৌকো করে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম স্বপ্ন-সরোবর তিলাইয়ার লেকে। ওরা দুটিতে ছোট্ট সাজান আইল্যাণ্ডের ভেতর ঘুরে বেড়িয়েছিল। আমি তখন নৌকোয় বসে লেকের শোভা দেখছিলাম। ওদের ভেতর সেদিন কী কথা হয়েছিল জানি না। পরের দিনই রুচিরার দাদার সঙ্গে কর্পোরেশনের মেম্বার এসে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ওরা দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিজের নিজের কাজে। নিভৃত আলাপনের আর কোনও সুযোগ ছিল না।

একসময় আমরা যে যার আস্তানায় ফিরে এলাম। রুচিরা আর নীলাঞ্জন আমার মন থেকে হারিয়ে গেল না।

রুচিরার সঙ্গে প্রায় দুবছর পরে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় গোলপার্কের সামনে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার মুখে মিশন-লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছিলাম। ও ফুলের দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়েছিল।

রুচিরা যে, কি ব্যাপার! কোত্থেকে?

ও ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রণাম করে একমুখ হাসি উপহার দিল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুর আর হলুদ রঙের একটা গোলাপের তোড়া কিনে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, দিল্লী থেকে তোমার বিয়ের কার্ড পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে পারিনি। দাদার এই সামান্য উপহারটুকু খুশি মনে নিলে আমি গভীর আনন্দ পাব।

ও গোলাপগুচ্ছ তুলে ধরে বলল, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর কি আছে দাদা।

কথা প্রসঙ্গে জানলাম, ও যোধপুর পার্কে এক আত্মীয়ার বিয়ে বাড়ি অ্যাটেণ্ড করতে এসেছে। কালই চলে যাচ্ছে দিল্লী।

ওর বিয়ের কার্ড থেকে জেনেছিলাম, ওর বর নেহেরু ইউনিভারসিটির অধ্যাপক।

বললাম, স্বামী রত্নটি কোথায়?

আর বলবেন না দাদা, বিয়ের দিনেই ওর ভাইবার ডেট পড়ে গেল। তাই রাজধানী এক্সপ্রেসে আমাকে তুলে দিয়ে ও নিজে থেকে গেল রাজধানীতে।

হেসে বললাম, ভাল বলেছ। এখন পাঁচ মিনিট বসতে সময় হবে কি আমার দীনভবনে? এখান থেকে ঠিক এক মিনিটের পদযাত্রা।

চলুন, বলে ও আমার সঙ্গে চলে এলো আমার গরীবখানায়।

বসার ঘরে ঢুকে ও দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললাম, কি হল, বস। এখন বল, কি দিয়ে অতিথি সেবা করি! মিষ্টি না নোনতা, চা না কফি?

ও বলল, বুঝতেই পারছেন দাদা, কদিন ধরে একটানা বিয়ে বাড়ির হুজ্জোৎ আর ভোজ। স্রেফ একগ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে খুশি হব।

লেমন স্কোয়াস মিশিয়ে দেব কি?

তাই দিন।

আমি ভেতর থেকে ফিরে এসে দেখি ও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টি আটকে আছে ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবির ওপর।

এখনও দাঁড়িয়ে।

আমি ঐ কাংড়া পেইন্টিংটা দেখছি, অপূর্ব!

বললাম, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বিদ্যুতের চমক, চলেছেন অভিসারিকা শ্রীরাধা। ঠিক যেমন দুবছর আগের সেই চৌপারণ অরণ্য আর রুচিরা।

আমি লঘু ভঙ্গীতে কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু বলারসময় ভাবিনি কোন কথা কোথায় গিয়ে বাজে।

হঠাৎ দেখলাম, রুচিরা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। সে কোন কথা না বলে উদাস চোখে চেয়ে রইল জানালার বাইরে। আমার ডাকে যখন ও ফিরে দাঁড়াল, তখন দেখি, ওর বড় বড় সজল চোখে বাদলের ছায়া।

কিছু মনে করনা বোন, অতীতের পর্দাটা হঠাৎ সরিয়ে দিলাম বলে।

ও রুমালটা চোখে বুলিয়ে নিয়ে বলল, ঐ পর্দাটা এলোমেলো হাওয়ায় আপনি উড়তে থাকে দাদা।

আমি ওর কথায় কোনরকম মন্তব্য না করে নীরব রইলাম।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও বলল, নীলাঞ্জনদার খবর রাখেন?

না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমার দাদা বলল, নীলাঞ্জনদা নাকি একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়ে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

আরও বলল, এখন ও ব্যাঙ্গালোরে কি যেন একটা দোকান খুলেছে।

দাদার কথা শুনে মুহূর্তে বুকখানা ঠেলে একটা কান্না উঠে এল। আমি প্রায় ঝরে পড়া চোখের জলকে বড় কষ্টে চেপে রেখে কাজের অছিলায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

একটা প্রশ্ন করতে পারি?

করুন।

তুমি তোমার নতুন জীবনে সুখীতো?

খুব ভাল ছেলে সুকান্ত, তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু দাদা আমার একটা অপরাধকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারবনা।

কি এমন অপরাধ রুচিরা?

তিলাইয়ার সেই জ্যোৎস্নাঝরা রাতে ড্রিম আইল্যাণ্ডে আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, মিলন আমাদের হবেই, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারিনি।

সেদিন ও বিদায় নিয়ে চলে গেলে, আমি রুচিরা আর নীলাঞ্জনের কথা ভাবতে লাগলাম।

কবিগুরুর চারটি ছত্র ফিরে ফিরে আমার মনে বাজতে লাগল ঃ

'ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান,
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।'

*

সোনিয়া অগ্নিহোত্রী

আমার এক বিশেষ পরিচিত জন আমাকে ফোন করে জানতে চাইলেন, পুজোয় আমি কোথায় যাচ্ছি?

বললাম, এখনও কিছু ঠিক করিনি।

উনি বললেন, চলুন না হৃষীকেশে।

উত্তর দিলাম, একাধিকবার গিয়েছি, আর না। বছর দুয়েক আগে হৃষীকেশ থেকেই তো গাড়োয়াল মণ্ডল নিগমের গাড়িতে চার ধাম ঘুরে এসেছি। এখন আর হৃষীকেশ দেখে কি করব?

উনি কিন্তু ফোন ছাড়লেন না। বললেন, আমার ছেলেবৌমা দারুন ভ্রমণবিলাসী কিন্তু স্থান নির্বাচনে ভীষণ খুঁতখুঁতে। তারাই বলল, একবার ঘুরে এসো হৃষীকেশের বানপ্রস্থ আশ্রমে। খুব ভাল লাগবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে যদি জায়গা না পাই?

ওপার থেকে উত্তর এল, আমার ছেলেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে বড়বাজার খেংরাপটিতে কালী কমলিবাবার আশ্রমের অফিস আছে। ওখানে টাকা দিয়ে ঘর বুক করা যায়।

আমি বললাম, বেশ, আর কিছু ইনফরমেশন?

উনি বললেন, কয়েক একর জায়গা নিয়ে ওঁরা সারি সারি বাড়ি তৈরি করেছেন। একেবারে নতুন সব বাড়ি। পার্ক, মন্দির, বাগান সবই রয়েছে তার ভেতর। সব ঘরগুলিই প্রায় দোতলা। আধুনিক ডিজাইনের প্রশস্ত সব ঘর, অ্যাটাচড্ বাথ। গীজার ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। গঙ্গামুখী ঘরগুলো থেকে

একদিকে সারাদিন গঙ্গার প্রবাহ দেখা যায়, কলধ্বনি শোনা যায়, আবার পুবদিকে তাকালে দেখা যায় সবুজ অরণ্যে ছাওয়া পাহাড়, সূর্যোদয় আর মেঘের খেলা।

বাঃ। হৃষীকেশের এ যে দেখছি নতুন আকর্ষণ। কিন্তু আহারের ব্যবস্থাদি?

একটা ক্যান্টিন আছে, সেখানে সস্তায় নিরামিষ খাবার পাওয়া যায়। বেশ প্রশস্ত কিচেন, গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা, বাসন-কোসন সবই সাপ্লাই করছে আশ্রম। ইচ্ছে হলে নিজে রেঁধে খান।

এবার আমি সোচ্ছ্বাসে বললাম, টিকিট কাটার ব্যবস্থা আপনি করুন, আমি এক পায়ে খাড়া।

*

বানপ্রস্থ আশ্রমে পৌঁছে সত্যিই আমার প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল।

বাইরে যাওয়ার রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ, ফুলে ভরা লতা ঝুলছে। তাদের তলায় মোজাইক করা সারি সারি বেঞ্চ।

বাইরে বেরিয়ে গঙ্গার পাড় ঘেঁষে রাস্তা, দু-দিকে দোকানপাট। পরমার্থনিকেতন আর গীতাভবনের মন্দির থেকে সকাল-সন্ধ্যা আরতির সঙ্গীত ভেসে আসে।

এক সন্ধ্যায় পরমার্থনিকেতনের বাঁধান গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যারতির আয়োজন হচ্ছিল। আমি পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। গঙ্গা সংলগ্ন মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়েছিলেন সৌম্যসুন্দর এক পুরোহিত। মনে হল বয়স আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতরে হবে। তাঁরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লালপাড় গরদের শাড়ি পরা এক পরমা সুন্দরী মহিলা।

মন্দিরের ছায়াটি পড়েছে চাতালে। আলোছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়ের কী কথা হচ্ছিল তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না।

কিছু পরে আমি সুদর্শন পুরোহিতকে ঘাটের শেষ ধাপে নেমে যেতে দেখলাম। তাঁর গায়ে উত্তরীয়। তিনি একহাতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ধরে সুরধুনী গঙ্গার আরতি করতে লাগলেন।

শঙ্খ ঘন্টা বেজে উঠল। সিঁড়ির দু-পাশে পাথরের বেদীতে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছে। দেখলাম, তারই ভেতর ওই মহিলা স্থান করে নিয়েছেন।

আরতির শেষে শুরু হল গঙ্গাস্তোত্র। পুরোহিতের কণ্ঠমাধুর্য গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে, বায়ুর প্রবাহের সঙ্গে মিশে অপূর্ব এক দিব্যভাবের সৃষ্টি করল। ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে গাইলেন সুর করে। সেই ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরও আমার কানে এসে বাজছিল।

দুদিন সন্ধ্যায় আমি একই দৃশ্য দেখলাম। সেই পুরোহিত আর ভদ্রমহিলার একান্তে কথোপকথন, গঙ্গার ঘাটে সমাবেশ, আরতির পর পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোত্র।

তৃতীয় দিনে ভদ্রমহিলা কিংবা পুরোহিত কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমার মনের কৌতূহল বেড়ে গেল।

প্রধান পুরোহিতের সহকারীকে তৃতীয় দিন সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে দেখলাম। স্তোত্রগানও হল, কিন্তু সেই ভক্তিপূর্ণ সুরধ্বনি হৃদয়ে এসে বাজল না।

অনুষ্ঠান শেষে ভক্তেরা চলে গেলে আমি সহকারী পুরোহিতকে প্রধান পুরোহিতের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

উনি বললেন, তপস্যার জন্য মাঝে মাঝে উনি হিমালয়ের নিভৃতে চলে যান।

জানতে চাইলাম, ফিরছেন কবে?

ঠিক এক পক্ষকাল কাটিয়ে এসে পৌঁছবেন।

দুদিন পরে আকস্মিকভাবে ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল বানপ্রস্থ আশ্রমের গেটের মুখে এস. টি. ডি বুথে।

রাত সাড়ে ন'টা। বুথের ভেতর একটা চেয়ারে বসেছিলেন উনি। বছর ষাট বয়সের লম্বা কালো একটি ভদ্রলোক খাটো ধুতি আর গুরু পাঞ্জাবি পরে গলা চড়িয়ে ফোন করে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন হাঁ করে।

আমি উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসলাম।

ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত, না, না, পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপার নয়, তুমি আগেও এ রকম জঘন্য আপরাধ করেছিলে, মার্জনা করেছিলাম প্রথম দোষ বলে। আর নয়। আমি আর ঐ পাপ গৃহে ফিরছি না। তুমি এখন থেকে আমার ভাতিজা বলে কোন জায়গায় পরিচয় দেবে না।

না, না, আমাকে আর কোনভাবেই অনুরোধ করে ফেরাতে পারবে না। খাবার জিনিসে যে ভেজাল দেয় তার নরকেও জায়গা হবে না। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি সেই কাজ করেছ।

হ্যাঁ, আমি দূরে থাকলেও সব খবর পেয়ে যাই।

তোমাকে আমি শেষ একটা কথা বলছি। খাবার দোকানের নামটা পাল্‌টে দাও। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা জমা আছে, সেগুলো তুলে নাও। আমার বিত্তে প্রয়োজন নেই, মাধুকরী করে, গাছের তলায় শুয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব। শুধু একটু কৃপা কর, আমার প্রতিষ্ঠিত দোকানের নামটা একেবারে বদলে দিও।

দুম্ করে ফোনটা রেখে দিয়ে অনেকগুলো টাকা গুণে দিলেন।

বেরিয়ে যাবার সময় দেখি ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটিকে নত হয়ে নমস্কার নিবেদন করলেন।

ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে তারিফের গলায় বললেন, সাবাস।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ভদ্রলোককে চেনেন?

এমনি ওঁকে আমি চিনিনা। কিন্তু এসব মানুষ একটি কথাতেই নিজেকে চিনিয়ে দেন।

এবার দুজনেই পর পর প্রিয়জনদের কাছে ফোনে সমাচার নিবেদন করলাম।

আমার আগেই উনি ফোনের কাজ শেষ করে মৃদু হেসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি আশ্রম-অফিসে গিয়ে স্নানঘরের জানালায় বোলতার বাসা তৈরীর দুঃসংবাদ দিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বলে এলাম।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে পার্কের দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ চোখাচুখি হয়ে গেল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনি বসেছিলেন গাছের তলায় মোজাইক বেঞ্চের ওপর। বিশাল গাছ, প্রসারিত ডালপালায় ঘন সবুজ পল্লব পুঞ্জ। তার ওপর পড়েছে চন্দ্রালোক। পাতার ফাঁকে চুইয়ে পড়ছে সে আলো। আঁকা হচ্ছে আল্‌পনা।

বিস্ময়ে বললাম, আপনি এখানে!

কেন, আমি তো এখানেই থাকি।

তাই! আমি কয়েক দিন রয়েছি এখানে, আপনাকে কিন্তু এ আশ্রমে দেখিনি।

আপনাদের আমি দেখেছি। পনেরো নম্বর বাড়ির দোতলায় থাকেন তো?

ঠিক, আপনি?

ক্যানটিনের ধারে গঙ্গার দিকে ঘরখানায়।

সপরিবারে?

ভদ্রমহিলার মুখে প্রত্যয়ের ধ্বনি, না, একাই।

এবার আমি জানতে চাইলাম, এসেছেন কতদিন?

একটু ভেবে নিয়ে বললেন, একমাস ছ'দিন।

কথার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, বড় চমৎকার জায়গা। গঙ্গার কলধ্বনি আর পর্বতের মৌনী, দুই মিলে এই হৃষীকেশের স্থানমাহাত্ম্য।

দারুণ বলেছেন।

আপনি কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, কলকাতা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি আসছি লক্ষ্ণৌ থেকে, ওখানেই আমার বাড়ি।

আপনি তাহলে প্রবাসী বাঙালী।

উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আমি বাঙালীই নই, ইউ. পি.-র মেয়ে।

আমার বিস্ময়ের শেষ নেই। বললাম, এমন বাংলা শিখলেন কি করে?

লক্ষ্ণৌতে আমার বাঙালী বান্ধবীদের কাছ থেকে। শুধু কি তাই, আমি বাঙালী মেয়েদের শাড়ি পরা ভীষণ পছন্দ করি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এই দেখুন না, শাড়িতে কি আমাকে খুব বেমানান মনে হচ্ছে?

আদপেই না। চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। বসনে আর বচনে কে বলবে আপনি বাঙালী নন।

*

পরের দিন ভদ্রমহিলা দেরাদুন চলে গেলেন। আমরাও ঐ পথে গিয়েছিলাম আরও দিন পাঁচেক পরে। দেরাদুনে নেমে রাজপুর রোড ধরে একেবারে কিষেণপুর। বাঁদিকে উঠে গেছে মুসৌরীর রাস্তা, তার প্রায় ডানদিকে রাজপুর রোডের গা ঘেঁষে কিষেণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ওখানে অতিথি নিবাসে আমাদের কদিন থাকার ব্যবস্থা ছিল।

জায়গাটি শুধু শান্ত, মনোরম নয়, নিভৃত ধ্যানের উপযুক্ত। বিশাল জায়গা জুড়ে আশ্রম। বনস্পতির প্রচ্ছায়ে লতাগুল্ম ও পুষ্পের সমারোহ। তারই মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তর নির্মিত দৃষ্টিনন্দন মন্দিরটি নীলাকাশের নীচে দিব্য মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্রম ছাড়িয়ে ঘনসবুজ প্রসারিত বনভূমি দূরে তরঙ্গিত শিবালিক পর্বতমালার একেবারে গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। সূর্যোদয়ের রক্তিম আর স্বর্ণাভ রঙের খেলা ভোলার নয়।

দূরে সবুজ অরণ্যের মাঝে একটি অতিক্ষুদ্র জনপদ, নাম—দ্রোণগ্রাম। সম্ভবত মহাভারতের কালে রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে দ্রোণাচার্য এই গ্রামখানি লাভ করেছিলেন। এই জনপদের পাশ দিয়ে অরণ্য চিরে যে নদীটি প্রবাহিত হয়েছে, তার নাম ঋষ্পর্ণা (ঋষি অপর্ণা)।

আমি একদিন অপরাহ্নে একাই গেলাম সেই নদীটি দেখতে।

গাছপালার ভেতর দিয়ে পাহাড়ী ভাঙাচোরা রাস্তায় নেমে গিয়ে নদীর হদিস পেলাম।

স্রোতের বেগ আছে কিন্তু জলের গভীরতা নেই।

হঠাৎ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, এক রহস্যময়ী রমণী নদীর মাঝ বরাবর একটি শিলাখণ্ডের ওপর বসে রয়েছেন। পরনে সালোয়ার কামিজ। আমার বিপরীত দিকে মুখ ফেরানো।

সহসা উঠে দাঁড়ালেন। দুহাত ওপরে তুলে দোপাট্টাখানা ভাজ করতে গিয়ে আমার দিকেই উড়ে এলো ওড়নাটা। একটুর জন্যে জলের স্পর্শ থেকে বাঁচাতে পারলাম না।

জল ভেঙে উনি এগিয়ে এলেন।

দুজনের চোখে তখন উদ্বেলিত বিস্ময়!

বেলা শেষের আলো এসে পড়েছিল ওঁর চোখে মুখে।

চোখের তারায় যেন বিদেশিনীর ছায়া।

বললাম, আপনি এখানে!

উনি হাত তুলে বললেন, ঐ যে দেখছেন দ্রোণগ্রাম, ওখানে গিয়েছিলাম।

ওখানে কি আপনি এখন আছেন?

না, দেখতে গিয়েছিলাম। শুনেছি, আমি জন্মেছিলাম ওখানে।

আমি সেই মধুবর্ষী সূর্যাস্তের মুহূর্তে আমার উপন্যাসের নায়িকাকে খুঁজে পেলাম।

*

অধরা মাধুরী

আমার প্রপিতামহের পিতৃদেব শুনেছি বেশ উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসনে সংলগ্ন জমিজায়গা, দেবার্চনা, পালপার্বণ ইত্যাদি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। গ্রাম থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে এক নদীতীরবর্তী জঙ্গল সরকারের কাছে থেকে সংগ্রহ করেন। বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ জনের সাহায্যে জঙ্গল কাটিয়ে জমি উদ্ধার করে পত্তন করেন নতুন এক মহাল।

পরবর্তীকালে তাঁর কয়েকজন উত্তরপুরুষের ভেতর ঐ মহালটি ভাগ হয়ে যায়। আমার ঐসব জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিত্তশালী ছিলেন। কিন্তু আমাদের তিন পিতামহের অমিতব্যয়িতার জন্য দারুণ অবস্থা-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

আমরা প্রায় দারিদ্র্যের ভেতর আমাদের শৈশব অতিবাহিত করি। পিতৃদেবের অকাল মৃত্যুতে আমরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন মায়ের বয়েস ছিল বিশ বছর মাত্র। একে একে পুরোনো কাজের মানুষদের সামর্থ্য মত অর্থ দিয়ে চোখের জলে বিদায় দিয়েছিল আমার মা। তারপর রান্না থেকে প্রায় সবকাজ নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল।

পড়াশোনার ওপর আমার মায়ের ছিল অফুরন্ত আগ্রহ। বাবা বহু ইংরাজী গল্প উপন্যাস অনুবাদ করে মাকে শোনাতেন। তাছাড়া বৈধব্যের পর পিতৃগৃহে যখন মা যেত তখন দাদামশায়ের লাইব্রেরী থেকে বিচিত্র সব বই সংগ্রহ করে পড়ত।

গল্প বলায় যাদুকরী ক্ষমতা ছিল আমার মায়ের। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কিংবা আরব্যরজনীর কাহিনীগুলি যখন মা বলত, তখন কেবল আমরা নই, প্রতিবেশিনীরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

বছরে অন্তত মাস তিনেক মা থাকত আমাদের জঙ্গলমহলের কাছারি বাড়িতে। ওখানে যতটুকু জমি জায়গা ছিল তারই ফসল সংগ্রহ এবং লিজ নেওয়া খালের মাছ ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে মাকে ব্যস্ত থাকতে হত। সেখানে ফলকর গাছগাছালি ছিল প্রচুর।

আমাদের পাশের চকেই ছিল অবস্থাপন্ন এক জ্ঞাতির বাগানবাড়ি। সেখানে সারা বছর বাগান আগলে থাকত এক পাঁড়েজী। তার অল্পবয়সী মা-মরা একটি মেয়ে ছিল।

গ্রামের বাড়িতে ছুটি পড়লেই আমি চকের কাছারি বাড়িতে মায়ের কাছে চলে যেতাম। সেখানে পাঁড়েজীর মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হত। সে মায়ের কাছে আসত আরব্যরজনীর গল্প শুনতে।

আমি ওকে নিয়ে খালে বিলে ঝিলে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের কাছারির গোমস্তাবাবুর ছেলেকে আমি দাদা বলে ডাকতাম। সেও ছিল আমাদের ছায়াসঙ্গী।

মায়ের কাছ থেকে আরব্যরজনীর গল্প শুনে পাঁড়েজীর ঐ মেয়েটিও গল্প বলায় ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। আমরা তিনজনে কোন কোনদিন নাশিখাল বেয়ে ছোট্ট একটা নৌকা নিয়ে বড় নদীতে গিয়ে পড়তাম। কিছু দূরে নদীর ভারী সুন্দর একটা চর ছিল। সেখানে একটা গাছে নৌকো বেঁধে আমরা বসতাম। পাঁড়েজীর মেয়েটি মায়ের কাছ থেকে শোনা আরব্যরজনীর গল্প বলত। সেই থেকে আমি তাকে ডাকতাম শাহরাজাদি বলে। আরব্যরজনীতে বাদশাকে গল্প শোনাতো শাহরাজাদি।

সহস্র এক রজনী ধরে উজির-কন্যা শাহরাজাদি বাদশা শাহরিয়ারকে গল্প শুনিয়েছিল।

কেন বাদশার নিদমহলে এতগুলি রাত ধরে গল্পের আসর বসেছিল তা নিয়ে বিচিত্র একটি কাহিনী আছে।

অনেক অনেককাল আগে ইরানের বাদশামহলে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা ঘটেছিল।

বাদশা শাহরিয়ার একসময় তাঁর পেয়ারের বেগমের বেইমানিতে এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি শুধু তার গর্দান নিয়েই তুষ্ট হননি, হারেমের সমস্ত বেগমকে হত্যা করেছিলেন।

শেষে বাদশা তাঁর উজিরকে ডেকে বললেন, প্রতিরাতে তুমি আমীর ওমরাহ আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ঘর থেকে একটি করে সুন্দরী কুমারী মেয়েকে নিয়ে আসবে। আমি তাকে সাদি করব মহাসমারোহে। সে শুধু একটি রাতের জন্য বেগমের মর্যাদা আর আমার পেয়ার পাবে। পরদিন ভোরেই কিন্তু জল্লাদের হাতে গর্দান যাবে তার।

বাদশার আদেশ শুনে থর থর করে কাঁপছিলেন উজির। কিন্তু বাদশার ফরমানকে উপেক্ষা করার মত শক্তি ছিল না তাঁর।

প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল উঠত যে কোন এক আমীর ওম্‌রাহের বাড়ী থেকে। বাদশা মেয়েটিকে সাদি করতেন জাঁকজমকের সঙ্গে। রাত পোহালেই গর্দান যেত তার।

শেষে বাদশার বিয়ের যুগ্যি মেয়ে পাওয়াই দায় হয়ে উঠল। উজির চিন্তায় শুকিয়ে গেলেন।

একদিন মহাচিন্তায় মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকলেন উজির।

বড় মেয়ে শাহ্‌রাজাদি আব্বাজানকে ঐ অবস্থায় দেখে উদ্বেগে বলে উঠল, কি হল তোমার আব্বা, এমন ভেঙে পড়লে কেন?

উজির বললেন, এবার জান রাখা যে দায় হল মা।

কেন আব্বা?

বিয়ের যুগ্যি মেয়ে যে আর পাওয়া যাচ্ছে নারে মা। শেষ কালে বাদশার কোপ পড়বে তোর এই হতভাগ্য আব্বাটার ওপর।

কেন আব্বাজান, তোমার ঘরে কি বিয়ের যুগ্যি মেয়ে নেই?

বলছিস কি রে মা, বাপ হয়ে জেনে শুনে মেয়েকে তুলে দেব জহ্লাদের হাতে!

শাহ্‌রাজাদি বলল, যাদের এতদিন তুলে দিয়েছ জহ্লাদের হাতে তাদেরও তো আব্বা আম্মা ছিল।

তুই কি বলতে চাস খুলে বলতো বেটী।

আজ তুমি আমাকে সাদির কনে সাজিয়ে বাদশার হাতে সঁপে দেবে।

সব জেনে বুঝে বলছিস?

হ্যাঁ আব্বাজান। তুমি কোনরকম চিন্তা করো না।

তাই হল। মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে চোখের জল মুছে উজির বাদশার প্রাসাদে যাবার জন্য তৈরী হলো। তাঞ্জামে ওঠার আগে শাহ্‌রাজাদি তার একমাত্র বোন দুনিয়াজাদিকে কাছে ডেকে বলল, মাঝ রাতের পর বাদশা মহল থেকে আমি দাসী পাঠাব তোকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্য। তুই আমার কাছে গিয়ে শেষবারের মত একটা গল্প শুনতে চাইবি।

দুনিয়াজাদি কান্নাভেজা গলায় বলল, তাই হবে।

বাদশা বসরাই গোলাপের মত উজিরের মেয়েটিকে দেখে যেমন মুগ্ধ হলেন তেমন অবাকও হলেন। তিনি শাহ্‌রাজাদিকে বললেন, তুমি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কেন এলে আমার প্রাসাদে?

শাহ্‌রাজাদি ভুবন ভোলানো হাসি হেসে বলল, আমি শুধু একটি রাতের জন্য বাদশা শাহরিয়ার বেগম হতে পেলে হাজারবার মরণবরণ করতে রাজি আছি।

বাদশা উজিরের মেয়ের কথা শুনে ভারি খুশি হলেন।

সাদির পর রাতে শাহ্‌রাজাদি বাদশার অনেক পেয়ার পেল।

একসময় শাহ্‌রাজাদি বাদশার কাছে জন্মের মত ছোট বোনটিকে দেখার আর্জি জানাল।

বাদশা সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজাদিকে প্রাসাদে আনার ব্যবস্থা করলেন।

দুনিয়াজাদি এসেই বাদশাজাদাকে তসলিম জানিয়ে দিদির গা ঘেঁষে বসল।

দুজন একসময় দুজনকে আবেগে জড়িয়ে ধরল। শাহ্‌রাজাদি বলল, আমি চলে গেলে তুই আব্বাজানকে দেখিস দুনিয়া।

দিদির কথা শুনে দুহাতের পাতায় চোখ ঢাকল দুনিয়াজাদি।

শেষে বিদায় লগ্ন যখন সমাগত তখন সহসা দুনিয়াজাদি বলল, দিদি, আর তো তোর মুখে সেই প্রাণমাতানো অবাক করা সব গল্প শুনতে পাব না, যদি শেষবারের মত একটা গল্প শোনাস আমাকে।

শাহ্‌রাজাদি সঙ্গে সঙ্গে বলল, শাহানশার অনুমতি ছাড়া আমি তো কিছু বলতে পারব না বোন।

এতক্ষণ দুবোনের কথা শুনছিলেন বাদশা। এবার বলে উঠলেন, বোনকে শোনাও না একটা গল্প, আমিও শুনি।

বাদশাকে তসলিম করে গল্পের যাদুকরী শাহ্‌রাজাদি শুরু করল তার গল্প।

কি বিচিত্র সে গল্পের কাহিনী। শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত ভেসে চলল সেই গল্পের স্রোতে।

বাদশাও মজে গেলেন সেই গল্পের রসে।

রাত শেষ হল, কিন্তু শাহ্‌রাজাদির গল্প শেষ হল না। তাই বাদশা সেদিনের মত রদ করলেন শাহ্‌রাজাদির মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু কি আশ্চর্য! এক একটি গল্পের টানে বাদশা এগিয়ে চললেন রাতের পর রাত। গল্পের যাদুকরী শাহ্‌রাজাদি যেন তার মন্ত্র বলে বেঁধে ফেলল বাদশা শাহরিয়ারকে।

এমনি করে হাজার এক রজনী পার হলে বাদশা একেবারে রদ করে দিলেন শাহরাজাদির মৃত্যুদণ্ড। শুধু তাই নয়, নারী জাতির ওপর বাদশার আর কোন বিদ্বেষই রইল না।

শাহরাজাদির গল্প বলার যাদুতে বেঁচে গেল সে দেশের সমস্ত কুমারীরা।

*

আমি এক বছর পড়ার চাপে চকবাড়িতে যেতে পারিনি।

ইতিমধ্যে খবর পেলাম, পাঁড়েজীর মৃত্যু হয়েছে। আমার শাহরাজাদিকে তার বড়বাবা (জেঠামশায়) এসে নিয়ে গেছে তাদের মুলুকে।

যাবে না বলে সে নাকি কেঁদেকেটে অস্থির হয়েছিল। জড়িয়ে ধরেছিল মাকে।

মা অনেক বুঝিয়ে তাকে পাঠিয়েছিল তার বড়বাবার সঙ্গে। কিছু টাকাও তার বড় বাবাকে দিয়েছিল বিয়ের যৌতুক হিসেবে।

তারপর থেকে আমার সোনালী কৈশোরের সাথীটির আর কোন খবর পাইনি।

জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমি একসময় এসে উঠেছিলাম সন্তোষপুরের একটা ভাড়া বাড়িতে। কাজ করতাম একটা কলেজে।

এক ছুটির দিনে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক বাসনউলি চলেছে। সে হাঁক পেড়ে ওপর দিকে তাকাল। চোখাচুখি হল আমার সঙ্গে।

কয়েক বছরের ব্যবধান, কিন্তু অবিকল সেই মুখ!

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাসনউলি হয়ত ভাবল, আমি বাসন নিতে চাই। তাই সে আমার গেটের সামনে এসে তার বাসনের বোঝা নামিয়ে রাখল।

একি সত্যিই শাহরাজাদি না অন্য কোন জন!

আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম।

*

বোবা বসন্ত

আমি তখন কলকাতার দুটি কলেজে সকাল সন্ধ্যে অধ্যাপনা করছি। থাকি সন্তোষপুরের একটি ভাড়া বাড়িতে।

আমার রাঁধুনি কাম গার্জেন নর্মদাদি এসে খবর দিল, ছোটদা, দুটি লোক এসেছেন, বাইরের ঘরে বসিয়েছি।

রোববার, দক্ষিণের বারান্দায় বসে খবর কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিলাম, আর সামনের পুকুরটার ওপর দিয়ে বয়ে আসা বসন্ত পবনের দাক্ষিণ্য উপভোগ করছিলাম। খবর পেয়েই উঠে গেলাম বসার ঘরে। নমস্কার বিনিময়ের পরে জানলাম, ওঁরা এসেছেন মেদিনীপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। ওঁদের আবেদন, এ বছর ক্লাবের বসন্ত উৎসবে আমাকে ওঁরা সভাপতি হিসেবে পেতে চান।

আমি গ্রামের ছেলে, তাই গ্রাম বাংলার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারিনা। রাজি হয়ে গেলাম।

আমার কাছ থেকে ওঁরা যাবেন এক নামকরা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর বাড়িতে। তিনি নাকি বছর পাঁচেক আগে ঐ গ্রামে একবার গান করতে গিয়েছিলেন অন্য এক নামী শিল্পীর সঙ্গে। কথা দিয়ে এসেছিলেন, ডাক পেলে আবার আসবেন।

অতীতের সেই আশ্বাসকে সম্বল করে ওঁরা যাচ্ছেন সেই শিল্পীর কাছে।

ওঁরা সামান্য জলযোগ সেরে বিদায় নিলেন আমার বাড়ি থেকে। গ্রামের মানুষ, চোখে মুখে কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সেই ভাবটি। আমি ওঁদের ভেতর মাটির অকৃত্রিম গন্ধটি পেয়ে খুশি হলাম।

যে শিল্পীটির বাড়িতে ওঁরা গেলেন, আমি তাকে চিনি। প্রথম যখন কলেজে ঢুকি তখন ও ছিল ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। অত্যন্ত সুভদ্র ছেলে। আমাকে একসময় ওর বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিল।

কলেজ ফাংশানে ওর গান শুনে ছাত্রেরা হৈ হৈ করে হাততালি দিত। অধ্যাপকরা সবাই তারিফ করতেন ওর সুরেলা দরদী কণ্ঠের।

এখন তো ও স্বনামধন্য শিল্পী। এইচ. এম. ভি. থেকে প্রকাশিত ওর বেশ কখানি রেকর্ড সুপার হিট।

শুনেছি ও এখন প্রতি আসরে প্রচুর টাকা দক্ষিণা নেয়।

শিল্পীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ের কথাটি কিন্তু আমি গ্রামের দুটি মানুষের কাছে বলিনি।

নির্দিষ্ট দিনে ওঁদের ভেতর একজন এসে আমাকে নিয়ে গেলেন।

উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরের পাথুরে মাটিভরা একটি গ্রাম। ট্রেন থেকে নেমে মাইল তিনেক পথ সাইকেল রিক্সো চেপে আসতে হল। পথের ধারে পলাশ শিমুলের সে কি রঙীন উচ্ছ্বাস!

গ্রামে ঢুকলাম সন্ধ্যার মুখে। গাছ গাছালিতে ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম। একটা বহু শাখা-প্রসারিত শিরীষের ডালে সন্ধ্যার-কুলায় ফেরা পাখিদের চলেছিল কূজনগুঞ্জন।

রিক্সো এসে থামল একেবারে ক্লাবের সামনে। পেছনে দেখা যচ্ছিল ঝিলের একটা অংশ। তীরে ঘন গাছগাছালি, শরবন, জলজ উদ্ভিদ।

ক্লাবের দক্ষিণ দিকের অঙ্গনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আসরপাতা। ওপরে সামিয়ানা। একদিকে উঁচু মঞ্চ। তার ওপর টেবল চেয়ার পাতা। মনে হল ফিনিশিং টাচ দেওয়া হচ্ছে।

হঠাৎ একটু দূর থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল সবকটা আলো।

উদ্যোক্তারা আমাকে নিয়ে ঢুকলেন আলোকিত ক্লাব ঘরে। সেখানেই আমাদের চা আর সামান্য খাবার পরিবেশন করল একটি মেয়ে।

শ্যামলা মেয়েটি ভারি মিষ্টি আর লাবণ্যময়ী। ভাসা ভাসা দুটি চোখে ফুটে উঠেছে সলজ্জ ভাবটি। রবীন্দ্রনাথের পিয়ালী কবিতার কথা মনে পড়ে যায়।

'চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে,
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কি-যে দেবে।..'

এখন কবিত্ব থাক, সভারম্ভের পালা। শুরুতেই সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দেবার ব্যবস্থা হল। কারণ মঞ্চ থেকে টেবিলটা নিচে না নামিয়ে নিলে নাচ গানের অনুষ্ঠানটি স্থানাভাবে অচল হয়ে যাবে।

অবশ্য সমবেত কণ্ঠে প্রারম্ভিক একটি গান গেয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল।

'ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ ॥ ..'

সংক্ষিপ্ত ভাষণের আগে ওরা একটি স্টেইনলেস স্টিলের নতুন থালায় গরদের পাঞ্জাবীর একটি পিস্ আর কিছু অশোক ফুল উপহার দিল।

প্রথম দেখা ঐ শ্যামলী মেয়েটি আমার হাতে সভাপতি বরণের উপহার ধরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

আমি উপহারগুলি মাথায় ঠেকিয়ে সামনের টেবিলে রেখে দিলাম।

ভাষণ শুরু ও শেষ হল আধ ঘণ্টার ভেতর।

এরপর আবৃত্তি, গীতসহযোগে নৃত্যাদি চলল প্রায় পৌনে দুঘন্টা। তারই ভেতর বসন্ত-বরণের সংক্ষিপ্ত একটি কথিকাও ছিল।

এই অনুষ্ঠানগুলি শেষ হবার পর স্টেজে উঠলেন উদ্যোক্তাদের একজন। তিনি মাইকে এই কটি

কথা ঘোষণা করলেন, যে স্বনামধন্য শিল্পীকে আমরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তিনি কিছুটা সম্মতি দিয়েও শেষপর্যন্ত কথা রক্ষা করতে পারেননি। পাঁচ বছর আগে তিনি এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর খ্যাতি এতখানি ছড়িয়ে পড়েনি। তবু সেসময় তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

সেদিনের সেই শিল্পী এক কিশোরীর গান শুনে বলেছিলেন, এ যদি কলকাতায় গান শেখার সুযোগ পেত তাহলে গানের জগতে অনেক ওপরে উঠে যেতে পারত।

দুঃখের বিষয়, প্রতিভা থাকলেও এক প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের কন্যা সে সুযোগ পায়নি।

আপনারা মহাভারতে একলব্যের কথা পড়েছেন। গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি অন্ত্যজ বলে অস্ত্রশিক্ষার সুযোগ পাননি। তবু নিজের অধ্যবসায়ে তিনি গুরুর মূর্তি গড়ে তাঁরই সামনে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। একলব্যের শরসন্ধান-শক্তির কথা আপনাদের কারোরই অজানা নয়।

পাঁচ বছর আগেকার সেই কিশোরী কন্যাটি আজ তরুণী। রেডিও-র সংগীত শিক্ষার আসর, কয়েকখানি সুনির্বাচিত রেকর্ড আর পাঁচ বছর পূর্বের সেই সঙ্গীত শিল্পীর প্রেরণা সম্বল করে সে সংগীত-সাধনা করেছে। আপনাদের সামনে পাঁচ বছর পরে সংগীত-সাধক বনশ্রী অনুষ্ঠানের শেষ কটি গান পরিবেশন করবে।

আমার বিস্ময় আর কৌতূহলকে পূর্ণ করে আসরে এসে বিনীত নমস্কার নিবেদন করল সেই শ্যামকান্তিময়ী কন্যাটি।

শ্রোতারা হাততালি দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল তাদেরই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একান্ত প্রচার বিমুখ এই অষ্টাদশী তরুণীটিকে।

বনশ্রী প্রথম গানেই ঢেউ তুলল শ্রোতাদের মনে।

'বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন, সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি ॥
...
উদাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন্ ডাকে
সাগর পারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে যে তায় গো—
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি ॥'

প্রথম গানেই বয়ে গেল করতালির ঝড়। আশ্চর্য সুমিষ্ট কণ্ঠ আর আবেগভরা উচ্চারণ।

আমি বনশ্রীর গান শুনছিলাম আর ছবি দেখছিলাম।

সারি সারি শিমূলের প্রসারিত ডালে ফাল্গুন তার ছোঁয়া দিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে রোমাঞ্চিত কুসুম কলি। একটা কালো কোকিল ডাক দিল বাতাসে সুরের তরঙ্গ তুলে। তারপর ডানা মেলে উড়ে গেল কোন সুদূরে। সে যেন বলে গেল, তুমি কলির বাঁধন টুটে ফুটে ওঠ, আমি আবার এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাব।

অনুরাগের রাঙা রঙ ছড়িয়ে ফুটে উঠল শিমূল। কিন্তু এই ভরা বসন্তে নেই কেন সেই পাখি, নেই কেন!'

'সে তো এলোনা, সে তো এলোনা,' এই হাহাকারে ভরে উঠল সমস্ত অন্তর বাহির।

চার পাঁচখানা গানে বনশ্রী মাৎ করে দিল আসর।

অনুষ্ঠান শেষ হল। আরও কিছু প্রাপ্তি ছিল আমার। বনশ্রীর পিতৃ গৃহেই সে রাতে সভাপতির নিশিযাপনের ব্যবস্থা।

ক্লাবের পেছনেই বাঁধান ঘাট। ফাল্গুনী পূর্ণিমার আলোয় উদ্ভাসিত দিক দেশ। সামনে স্বপ্নময় ঝিল। ঘাটে বাঁধা ছোট্ট একটা সাল্‌তি জাতীয় নৌকো।

উদ্যোক্তারা আমাকে চাঁদের জ্যোৎস্না ভাসা ঘাটে নিয়ে এলেন।

বললেন, মাস্টারমশায় তারিণীবাবুর বাড়ি এই ঝিলের ওপারে। ডাঙাপথে যেতে হলে অনেকখানি

ঘুরে যেতে হবে। আর একটা পথ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। রাতে জঙ্গল চিরে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ঝিলের ওপর দিয়ে এই সাল্‌তিতে করে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে। পূর্ণিমার রাত, খুব এনজয় করবেন।

সামান্য সময় হলেও জ্যোৎস্না ঝরা রাতে নৌ-যাত্রায় একটা রোমাঞ্চ আছে।

বললাম, এতো দারুণ খুশির খবর।

আগে সাল্‌তিতে গিয়ে উঠল বনশ্রী। সে লগি ধরে দাঁড়াল। তারিণীবাবু আমার হাত ধরে নৌকোয় তুলে দিয়ে দড়ি খুলে নিজেও উঠে পড়লেন।

আমি একটু অবাক হলাম। আমাকে গলুইতে বসিয়ে তিনিও আমার পাশে বসলেন।

ইতিমধ্যে কখন বনশ্রী তার আঁচলখানা কোমরে জড়িয়ে বেঁধেছে।

লগির ঠেলায় সাল্‌তি সরে গেল ঘাট থেকে। উদ্যোক্তারা সামান্য সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়তে লাগলেন।

বনশ্রী ঝিলের ধার ঘেঁষে সালতিখানা চালিয়ে নিয়ে চলল।

তার নৌকো চালানোর অনায়াস দক্ষতা দেখে মনে হল, সে রোজই একাজ করে থাকে।

তারিণীবাবুকে বললাম, আপনার কন্যাটি কেবল সংগীতেই দক্ষ নয়, সাল্‌তি চালাতেও সিদ্ধ।

তারিণীবাবু হেসে বললেন, সারাদিন যখন তখন সে প্রায় চষে বেড়ায় এই ঝিল। সমস্ত দোকানপাট, ইস্কুল, ক্লাব ঘরের দিকেই, তাই রোজ ওকে বার বার সাল্‌তি নিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। সাল্‌তিটা আমি ওকে তৈরী করে দিয়েছি।

জঙ্গলটার ভেতর ঝাঁক বেঁধে জোনাকিরা ঝিলমিল আলো জ্বেলে নাচতে নাচতে উড়ে গেল। এক জায়গায় সাদা সাদা বক একটা ঝাঁকড়া গাছের মাথায় ফুলের মত ফুটে আছে।

ঝিলের ধারে নলবন জ্যোৎস্নার আলোয় চেনা যাচ্ছিল। নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে চার পাঁচটি যাযাবর হাঁস ডানা মেলে জ্যোৎস্নার আকাশে উড়ল।

এখানে অনেক পাখি আছে দেখছি!

এবার জবাবটা এলো বনশ্রীর কাছ থেকে, হাজার পাখির মেলা। জলে জঙ্গলে কত যে পাখি আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। শুধু কি পাখি, নানা রঙের নানা আকারের ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। বুনো ফুল যে কত রকমের তার লেখাজোখা নেই।

ডাঙায় ওঠার আগে বনশ্রী বলল, ঝিলের পূব-উত্তর কোণে পদ্ম ফোটে। শাপলা ফোটে আমাদের ঘাটের কোলে।

এবারও ঘাটে সাল্‌তি ঠেকিয়ে লগি ধরে দাঁড়াল বনশ্রী। তারিণীবাবু লাফ দিয়ে নেমে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি ওঁর হাত ধরে নামলাম।

ছিমছাম বাড়ি। পাশাপাশি তিনটি ঘর। সামনে মেহেদির বেড়া। দুপাশে দুটো আম গাছ। কচি আম ধরেছে।

আমি যে ঘরে ঢুকলাম, সেখানে টেবিলের ওপর একটা হেরিকেন জ্বলে আছে। তক্তপোষের ওপর ধবধবে বিছানা পাতা। টিপয়ের মাঝখানে কাচের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া জল।

তারিণীবাবুর মুখে শুনলাম, এই জল জঙ্গলের ভেতর মাত্র তিনটি প্রাণী এই ঘরে বাস করেন। স্ত্রী বহুদিন হল প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। সংসারের পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে বনশ্রী। তাই মেয়েটা স্কুল ফাইনালের পর আর এগোতে পারেনি। জঙ্গল, ঝিল, গান আর মাকে নিয়ে পড়ে আছে।

গাড়ি দুটোয়। ভোরবেলা একটু বেড়াতে বেরোলাম। বনশ্রী আমাকে সাল্‌তিতে করে নিয়ে গেল জঙ্গল দেখাতে।

সকাল বেলার সোনালী আলো মেখে যাযাবর হাঁসেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে উড়ল কতকগুলো। তারপর পাখা টেনে ডাক দিতে দিতে চলে গেল উত্তর পশ্চিম দিকে।

বনশ্রী বলল, প্রতিদিন এমনি ঝাঁক বেঁধে সব চলে যাচ্ছে। নতুন হাঁস এখন আর আসবেনা।

আমার সেদিন অনেক অভিজ্ঞতা হল বনে ঢুকে। বনফুলের গন্ধ নিতে নিতে, ঝাঁক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির ব্যালে দেখতে দেখতে, কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে আমি আর একবার আমার কৈশোরকে ফিরে পেলাম।

বনশ্রী আমাকে নিবিড় একটি লতা বিতানের কাছে নিয়ে গেল। এটি তার নিভৃত নির্জন বিশ্রাম নিকেতন। প্রকৃতির আপন খেয়ালে তৈরী পুষ্পিত লতাকুঞ্জ।

আমরা সেখানে বসলাম।

বনশ্রী বলল, আমি এখানে একা বসে গুনগুন করে গান গাই।

বললাম, যাবার আগে তুমি কি আমাকে আর একখানা গান শোনাবে?

বেশী অনুরোধ করতে হল না বনশ্রীকে।

তার কণ্ঠে গান এলো ঃ

'দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে ॥
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন অচিন পুরে ॥ ..'

আমি ট্রেনে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম, বনশ্রী কি কোনদিন তার মনের মত আস্তানাটির খোঁজ পাবে।

*

কলকাতায় ফিরে এসে জুলজির ছাত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে জায়গাটির সন্ধান দিয়ে বললাম, ওটা তোর স্বপ্নের স্বর্গরাজ্য, রিসার্চের মহাপীঠ। কয়েক ডজন নানা সাইজ আর রঙের প্রজাপতি পাবি। ঝিলে শীতকালে জলচর বিদেশী পাখির মেলা। দিশি পাখিও অগুনতি।

সব দেখিয়ে আর চিনিয়ে দেবার জন্য আরণ্যকের ভানুমতীর মত এক অরণ্যকন্যার দেখাও পেয়ে যাবি।

*

মাসাম্মা

প্রবোধের সঙ্গে আকৈশোর আমি বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা। একই অঞ্চলের অধিবাসী, একই স্কুলের ছাত্র। ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক (প্রাক্তন ডিন, ফ্যাকালটি অব সায়েন্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বর্তমানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন নৃতত্ত্ববিদ।

আবাল্য প্রবোধ অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির। কৈশোরে সে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' কাহিনীটির নাট্যরূপ দেয়। তার নিমন্ত্রণে আমরা কয়েক বন্ধু তার গ্রামে ঐ নাটক দেখতে যাই। সেখানে প্রবোধের মমতাময়ী বউদি আমাদের খুব যত্ন করেন।

রাতে নাটকের অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের চাষাভূষো ছেলেমেয়েদের দিয়ে ও নাটকটি মঞ্চস্থ করে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে সে রাতে ওর নাটকটি উপভোগ করেছিলাম।

বিয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনের ঢেউ এসে যখন আছড়ে পড়ে আমাদের স্কুলে, প্রবোধ তখন মহাবিক্রমে আন্দোলনের সামিল হয় ও কারাবরণ করে।

ইউনিভারসিটির পড়াশোনা শেষ করে ও যখন গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিল তখন ইংরাজদের ছাপমারা 'বর্ণ ক্রিমিনাল' লোধাদের সংস্পর্শে আসে। তারা থাকত ঝাড়গ্রামের দুর্গম বনপাহাড়ী অঞ্চলে।

সে সময় বন্ধুবরকে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হতো। কিন্তু একসময় প্রবোধকে ওরা বন্ধু বলে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে লোধাদের নিয়ে ও কেবল গ্রন্থ রচনাই করেনি তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য তৈরী করেছে বিশাল কর্মশালা। মেদিনীপুরে বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে গড়ে তোলা ওর 'বিদিশা' যেন শান্তিনিকেতনের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে পড়াশোনা আর ক্ষেতখামারের কাজ করছে আদিবাসী ছেলেরা। আনন্দের বহু আয়োজন তাদের সামনে। বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ওরা উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠে। প্রান্তবর্তী দু একটি রাজ্য থেকে আদিবাসী তীরন্দাজ, বাদ্যিকার আর বিচিত্র সাজে সজ্জিত নর্তকেরা আসে। সারারাত আলোর মালায় সাজে বিদিশা। নাচেগানে খুশির লহরী বইতে থাকে।

নৃতত্ত্বের সেমিনারে দেশবিদেশের নৃতত্ত্ববিদদের সমাবেশ ঘটে। নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু সমাদৃত গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর পি. কে. ভৌমিক। দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক করে তথ্য সংগ্রহ করার ভেতরেই ওর আসল আনন্দ। ডক্টর ভৌমিকের সৃষ্ট গ্রন্থগুলি তাই মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

বন্ধুবর সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ, আমার একাধিক উপন্যাসের উপাদান আমি ওর উপহার দেওয়া গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি।

মাসাম্‌মা উপন্যাসের নায়িকা মাসাম্‌মা অন্ধ্রপ্রদেশের অরণ্যভূমির অধিবাসী 'চেঞ্চু' সম্প্রদায়ের এক আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত কন্যা।

চেঞ্চুদের আচার আচরণ, রীতি নীতি, ক্রিয়াকর্ম আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেক স্বতন্ত্র আর বিচিত্র।

বন্ধুবর সশিষ্য ঐ টিলা পাহাড় সংকুল অরণ্যভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে চেঞ্চু সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘদিন কাজ করে 'চেঞ্চু' নামে একটি মূল্যবান ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করেছে। ঐ গ্রন্থের এক কপি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রে আমি পাই।

ভ্রাম্যমাণ হিসেবে ঐ অঞ্চলটিতে আমি গেলেও ডক্টর ভৌমিকের মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি না পেলে আমার পক্ষে মাসাম্‌মা উপন্যাসটি রচনা করা কোনভাবেই সম্ভব হত না। অকুণ্ঠে বন্ধুবরের কাছে এই ঋণ স্বীকার করছি।

মাসাম্‌মা আমার বড় প্রিয় চরিত্র। লেখক একান্তে আপন মনে নিজের সৃষ্টির আস্বাদন করেন। আমি চেঞ্চু-কন্যা মাসাম্‌মাকে বড় সমাদরে অন্তরে লালন করি।

মেয়েটি ঠিক মেঘের মত। কখনো আকাশের গায়ে থমকে থেমে থাকে, কখনো বা ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তার ভেতরে ভালবাসার উত্তাপ আছে, অশ্রুও আছে, কিন্তু সে অশ্রুকে বর্ষণে সে রিক্ত হতে দেয় না।

প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্য সে অন্তরে সঞ্চিত রেখেছে বিদ্যুৎ। যথাসময়ে যথাস্থানে তা বার বার ঝলসে উঠেছে।

দু-তিন বছর সে তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারেনি, সেই অজুহাতে তার স্বামী গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাকে বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলাবৃত এক টিলারগুহায়। সেখানে একসময় ছোট্ট একটা প্লেন ভেঙে পড়ে। তার একমাত্র বিদেশী পাইলটটি দুটি পা ভেঙে কোন রকমে বেঁচে যায়। পুরো একটি বছর মাসাম্‌মা তাকে তার গুহায় রেখে সেবা করেছে। বনৌষধি প্রয়োগে প্রায় সুস্থ করে তুলেছে সেই বিদেশীকে। তার বঞ্চিত জীবনে এই পুরুষটি যেন দেবতারই অযাচিত দান।

ভাগ্যচক্রে স্বামীর অন্বেষণে একদিন এসে পড়ল তার স্ত্রী আর শিশুকন্যাটি। হারানো মানুষটি তার আত্মজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আবেগে অধীর।

অদূরে দাঁড়িয়ে সেই মিলনদৃশ্য দেখল মাসাম্‌মা। যাকে বৎসরাধিককাল সেবাযত্নে সুস্থ করে তুলেছে, যার সঙ্গে দেহমনের সংযোগ ঘটেছে তার, বিদায় মুহূর্তে কিন্তু নিজের মনের কোন ক্ষোভ বা ব্যথা সে প্রকাশ করল না।

নিঃসন্দেহে মাসাম্‌মার চোখের ওপর তখন ফুটে উঠছিল এক অপার্থিব ছবি। এক দেবশিশু জড়িয়ে ধরে আছে তার মা বাবাকে।

সেই মিলন-স্বর্গ থেকে কাউকেই বিচ্ছিন্ন করার কথা সে ভাবতেই পারল না।

ওরা চলে যাবার কয়েকদিন পরেই মাসাম্‌মা বুঝতে পারল, সেও মা হতে চলেছে। তাহলে সে বন্ধ্যা নয়!

এই মিথ্যা অপবাদের জবাব দিতে একদিন সে তার শিশুটিকে বুকে বেঁধে নিয়ে বনচিরে চলল তার গাঁয়ের দিকে।

মাসাম্‌মা উপন্যাসে এই প্রতিবাদী চরিত্রটিকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

যে মেঘ বর্ষার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ, তারই ভেতরেই তো রয়েছে বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ।

*

আকাশ হারিয়ে যায়

সংবাদপত্রের পাতায় সংক্ষিপ্ত একটি সমাচার পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম।

বরাবরই আমি ছিলাম পুরুষকারে বিশ্বাসী। ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে এ জগৎ চলছে, এ সত্যে যাঁরা বিশ্বাসী, আমি কোনও দিনও ছিলাম না তাঁদের দলে।

কিন্তু এই ঘটনাটি জানার পর এক রহস্যময়ী নিয়তির অস্তিত্ব আমি গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম।

আমার মনে হয়েছিল আমরা সকলেই মঞ্চের এক একজন কুশীলব, কিন্তু আমরা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। যিনি আমাদের খেলাচ্ছেন তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা খেলছি, তিনি নিয়তি—অন্তরালবর্তিনী।

পরিবারটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, একসময় এই পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। যেমন ধার্মিক, তেমনি সৎ ও শিক্ষিত পরিবার। তাঁরা একটি নামকরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

যে দুটি কন্যার কাহিনী নিয়ে আমার এই উপন্যাসে ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তারা এই সম্ভ্রান্ত পরিবারেরই সন্তান। এদের আমি বালিকা বয়স থেকেই দেখেছি। অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি এই দুটি কন্যার আচরণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মা সঙ্গে থাকলেও তারা হাসিমুখে নিয়ে আসত অতিথিদের খাবারের প্লেট। এ সবই ছিল তাদের সুশিক্ষিত, সদাচারী মায়েরই শিক্ষা।

দুই বোনের শিক্ষাজীবনেও ছিল মায়ের সুনিয়ন্ত্রিত প্রভাব।

এরপর কর্মচক্রে আমি এঁদের কাছ থেকে কয়েকবছর হারিয়ে যাই। ইতিমধ্যে ওই দুই বোনের বিয়ের সংবাদ আমার কানে এসে পৌঁছেছিল। হয়তো বারে বারে আমার ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে তাঁরা আর যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেননি।

একদিন ওঁদেরই এক পারিবারিক বন্ধুর মুখ থেকে বড় মেয়েটির সাংসারিক বিপর্যয়ের কথা শুনতে পেলাম। কারণ না জেনেও আমি সেদিন ভীষণভাবে আহত হয়েছিলাম। বারে বারে ভেসে উঠছিল সংসারবিচ্ছিন্ন মেয়েটির মুখখানা। আমি অবাক হচ্ছিলাম ওদের ভালবাসার বিয়ের পরিণতির কথা ভেবে। ওরা ছিল সহপাঠী এবং দুজনেই ছিল পড়াশোনায় অত্যন্ত কৃতী। বন্ধুরা রসিকতা করে বলত, এমন রাজযোটক নাকি হয় না।

শুনেছিলাম ছোট মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষিত সমাজের কাছে এ দুটি পরিবার ছিল বিশেষভাবে পরিচিত।

ছোট মেয়েটির আকস্মিকভাবে এক বিদেশী শিল্পীর প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে কেন্দ্র করে মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে আত্মহত্যার খবর যখন আমি সংবাদপত্রে পড়ি তখন তার মায়ের মুখটাই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল। বড় স্থির শান্ত, স্থিতধী স্বভাবের মহিলা ছিলেন তিনি। কীভাবে এই দুটি বিপর্যয়কে গ্রহণ করেছিলেন তিনি তা আমি কল্পনায় আনতে পারিনি।

ওদের নিয়েই আমি আমার এই উপন্যাসের জাল বুনেছি। এর বেশির ভাগ অংশই সত্যের আধারে

প্রতিষ্ঠিত। যা আমার কল্পনাসঞ্জাত সেটি কন্যাদুটির মায়ের চরিত্র। আমি আমার উপন্যাসটিকে বিশেষভাবে সাজাবার জন্য মায়ের চরিত্রেও একটি কামনাহীন মহৎ প্রেমের চিত্র এঁকেছি।

দুটি সংক্ষুব্ধ, তরঙ্গিত প্রেমের মাঝখানে শান্ত শাশ্বত প্রেমের স্বর্ণকমলটিকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

*

অজানা বন্ধনে

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসু মশায় একসময় সপরিবারে তাগদা বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমিও সস্ত্রীক তাঁদের সঙ্গী ছিলাম।

দার্জিলিং থেকে সিকিমের পথে যেতে 'সিক্স মাইল' নামে একটি জায়গা আসবে। ওখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটি পথ নেমে গেছে অনেকখানি নীচে তাগদা অর্কিড ব্রিডিং সেন্টারে। ওপর থেকে অর্কিড সেন্টারটা বড় একটা কঙ্কার মত দেখতে। শুনেছি ঐ সেন্টারটি এশিয়ার ভেতর সর্ববৃহৎ অর্কিড সৃষ্টি, সংগ্রহ ও পরিচর্যা কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বোধন করেছিলেন ঐ সেন্টারের।

বিশাল জায়গা জুড়ে কাচের ঘরের ভেতর হাজার রকম অর্কিডের সমাবেশ।

তাগদার একদিকে মংপু অন্যদিকে কালিম্পং। একটি ফরেস্ট বাংলো, গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউস, প্রাইভেট দু-চারখানা কোয়ার্টার আর দু'একটা ছোটখাটো অফিস নিয়ে তাগদা।

আমরা ছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে তৈরী একটি সরকারী রেস্ট হাউসে। বেশ বড় কাচে ঢাকা কাঠের বাড়ি। সামনে রাস্তা, পেছনে গাছপালায় ভরা ছোটখাটো জঙ্গল। ওর ভেতর দর্শনীয় বিশাল উঁচু দুটো ফার গাছ। পাহাড়ের গায়ে ছবির মত পাইনের বন।

সত্যি, জায়গাটি নিভৃত এবং মনোরম। ভোরবেলা উঠে নীচের দিকে তাকালেই একটি চমৎকার দৃশ্য চোখে ফুটে ওঠে।

সবুজ পাহাড়গুলোর শেষ প্রান্তে নদীর জলপ্রবাহ, তার ওপর সোনালী সূর্যের আলো পড়ে গলিত স্বর্ণের তরল স্রোত বলে মনে হয়।

তাগদাতে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের ভাল বাজার নেই। তাই রথ দেখা আর কলা কেনার (বেচা নয়) অভিপ্রায়ে প্রায় প্রতিদিন বিকেলের দিকে দার্জিলিং যেতাম। ম্যালে বেড়িয়ে বাজার সেরে ফিরতাম সন্ধ্যের মুখে।

আমাদের তাগদা-দার্জিলিং যাতায়াতের জন্য একটি প্রায় বিকল রথ আর একজন দক্ষ সাহসী সারথি ছিল।

সারথি বিক্রম থাপা স্বাস্থ্যবান গ্র্যাজুয়েট যুবা পুরুষ।

বিক্রমের রাত্রিবাস জনৈকা সব্জিউলির দোকানে। আর তার লঝ্ঝড় ল্যাণ্ডরোভারখানা সারারাত শীতে কেঁপে বৃষ্টিতে ভিজে দাঁড়িয়ে থাকে পথের ধারে খোলা আকাশের নীচে।

ভোরবেলা সে তার গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নানান কাজে। সারারাত শীতে হিম হয়ে থাকা গাড়িটাকে নানা কায়দায় সে তাতায়। তারপর হঠাৎ তাগদ ফিরে পেয়ে গর্জে ওঠে ল্যাণ্ডরোভার। এরপর পাহাড় কাঁপিয়ে বহুদূর পর্যন্ত শব্দ ছড়াতে ছড়াতে সিক্স মাইলের দিকে উঠে যায় বিক্রমের গাড়িখানা।

আমরা দুপুরের আহারপর্ব শেষ করে বাইরের ঘরে বসে গল্প শুরু করি। দুটো থেকে আড়াইটার ভেতর সিংহের গর্জনে পাহাড়পর্বত কাঁপিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে নেমে আসে বিক্রমের ল্যাণ্ডরোভার।

এবার আমাদের ওঠার পালা। প্রয়োজনমতো পোশাক-পরিচ্ছদ বদলে আমরা দার্জিলিং যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে থাকি।

বিক্রম সিপ্ন মাইলের কাছেই নির্দিষ্ট একটা হোটেলে তার লাঞ্চ শেষ করে আসে। ঠিক সোয়া তিনটেতে বিক্রমের গাড়ির হর্ন বাজতে থাকে। আমরা সবাই একসঙ্গে বিক্রমের গাড়ি করে যাত্রা করি শৈলনগরীর পথে।

কখনও মেঘের ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছি কখনও বা দূরে সরে যাচ্ছে মেঘ। উঁচু পর্বত থেকে যে শৈলশিরাগুলো উপত্যকার পথে নেমে গেছে তাদের গায়ে সৈনিকের শৃঙ্খলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি পাইনগাছ। হালকা নীলাভ কুয়াশা স্বচ্ছ মসলিনের মতো জড়িয়ে আছে পাইন বন আর শৈলশিরার গায়ে। এ দৃশ্য ভোলার নয়।

হিমালয়ের একাধিক শৈলশোভা দেখে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি দার্জিলিঙের সৌন্দর্য অনন্য এবং স্বতন্ত্র। তাই বুঝি দার্জিলিং আমাদের শৈলরানী।

বিক্রমের ল্যাণ্ডরোভার পথের মাঝে বারবার অচল হবেই। দিনের বেলা গাড়ির তলায় ঢুকে বিক্রম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে সারিয়ে তোলে। কিন্তু ফেরার পথে যখন ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়, তখন পথের দিশা আর পাওয়া যায় না। বিক্রমের হেডলাইট কেমন যেন ছানিপড়া চোখের মতো আবছা দেখায়। তখনই ঘোরতর সমস্যার ভেতর পড়তে হয়।

একদিকে গভীর গিরিখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকাবাঁকা রাস্তা। তারই মাঝে এগিয়ে চলে বিক্রমের গাড়ি আর আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে টানটান হয়ে বসে থাকি।

হঠাৎ গাড়ি থেমে গেলে বিক্রম কিছুক্ষণ ঠুকঠাক করে তাকে সচল করার চেষ্টা করে। তাতে কাজ না হলে আরোহীদের অন্ধকারে নামিয়ে দিয়ে বলে, গাড়ি ঠেলতে থাক।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, অনুভবে গাড়িখানা ধরে আমরা ঠেলতে থাকি। কিন্তু কোথায় সে গড়িয়ে চলেছে তা আমরা বুঝতে পারি না।

সহসা বাঘের মতো গাড়িটা গর্জন করে উঠে গড়াতে থাকে। আমরা কোনও রকমে গাড়ি ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ি। মেয়েরা সবাই কিন্তু বসে থাকে গাড়ির ভেতর।

এই অন্ধকারে যখন বেশি জোরে গাড়িটা বাঁক নিয়ে চলতে থাকে আর গাড়ির হলুদ আলোটুকু মিটমিট করে পথ দেখায় তখন আমরা ভয়ে চিৎকার করে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম ব্রেক কষে গাড়ি থামায়।

ভারী বিরক্ত হয়ে সে ধমকের সুরে বলে, কি হল, এত হল্লা কেন?

মনোজবাবু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। তোমার হেডলাইট অন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকারে তুমি গাড়িটাকে খাদে ফেলে দেবে নাকি!

বিক্রম সমানে চেঁচিয়ে বলে, আট বছর ধরে আমি এই রাস্তায় আমার গাড়িটা নিয়ে দিনরাত্রি যাওয়া আসা করছি। রাস্তার প্রতিটা আঁকবাঁক আমার মুখস্থ। আমি অন্ধকারেও সব দেখতে পাই। আপনাদের প্রাণের ভয় আছে, আমার নেই?

এরপর আর কথা চলে না। আশ্বস্ত না হলেও নির্ভর করতে হয়। এ ঘটনা প্রায় দিনই ঘটে। প্রাণের মায়া বড় মায়া, বারে বারে আমরাও চেঁচাই আর বিক্রমের ধমক খাই।

প্রতিদিন কিন্তু দুপুরে গাড়িতে ওঠার সময় বিক্রমের খুশি ভরা মুখটা দেখি। সে নানাভাবে আমাদের গাড়িতে উঠতে সাহায্য করে। এই চরিত্র
সব্জিউলির দোকানে ও রাতের আশ্রয় প
আমি দেখেছি। ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে বিক্র
বিদায় জানায়। মেয়েটির নাম জেনেছিলাম,

ওকে নায়িকা করলে কেমন হয়?

তানাকা

ভোরের রেডিও থেকে ঘোষিকার মিষ্টি গলার ঘোষণাটি ভেসে এল,

মহামান্য সম্রাটের উদ্যানে কুঁড়ি থেকে সাকুরাকে পাপড়ি মেলতে দেখা যাচ্ছে।

এ ঘোষণাটি শোনা গেল ভোরবেলা বেশ কয়েকবার।

চারদিকে রেডিও থেকে ছড়িয়ে পড়ছে খবরটা।

ঘরের ভেতরের মানুষ, পথ চলতি মানুষ, ট্রেন, বাসের যাত্রীরা উল্লসিত হয়ে উঠছে খবরটা শুনে। তাদের কথাবার্তায় সেই খুশির হাওয়া।

কেবল সম্রাটের উদ্যানই নয়, চেরি বা সাকুরা ফুটছে ইয়ামাতো সানদো, আরও কত নামী অনামী জায়গায়। কাজের ফাঁকে, পড়ার ফাঁকে ছেলেমেয়ে, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় বৃদ্ধ দল বেঁধে চলেছে জাপানের জাতীয় ফুল সাকুরার ফুটে ওঠা দেখতে।

বসন্তে সাকুরা মনোহারিনী। ডাল ভরে পিঙ্কের ছোঁয়ালাগা থোকা থোকা সাদা ফুল উৎসবের মেজাজ এনে দেয়। যেখানে চেরি সেখানে মেলা। ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা চেরিগাছগুলোকে ঘিরে বসেছে পিকনিকের আসর। হাসি গান কথা, ভালবাসার জনের একান্তে আলাপন।

বসন্তে পাখির ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন, প্রজাপতির রঙীন পাখায় ওড়াউড়ি, বাচ্চাদের নাচ, সবই ফুলন্ত সাকুরা গাছগুলোকে ঘিরে।

তিলকচন্দনের এই প্রথম দেখা চেরি গাছের ফুল ফোটা। সে তার ঝোলা থেকে রঙ, তুলি আর কাগজ বের করে একটু আড়ালে আঁকতে শুরু করে দিয়েছে।

সবে চারমাস হল সে জাপানের একটা আর্টকলেজে ঢুকেছে ছবি আঁকা শিখতে। কলকাতার সুমন্ত ঠাকুর এই কলেজে ইণ্ডিয়ান আর্টের অধ্যাপক। তিনিই তিলকচন্দনকে টেনে এনেছেন এতদূরে জাপানি আর্ট শেখার জন্য। নিজের কাছেই রেখেছেন প্রতিভাবান দরিদ্র ছেলেটিকে। বাবা নেই, মা নেই, আর কোন ভাইবোনও নেই, তাই সাংসারিক দায় দায়িত্বও নেই ছেলেটার।

আর্টকলেজের ফুটপাথে ছবি আঁকছিল রঙীন চক্ দিয়ে, চোখে পড়ে গেল সুমন্ত ঠাকুরের। তিনি ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন।

হাতের টান দেখেই বুঝেছিলেন জাতশিল্পী।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন সুমন্ত ঠাকুর। আঁকা শেষ হলে পাশ থেকে বললেন, কি নাম তোমার?

চমকে ফিরে তাকাল পথের শিল্পী। সম্ভ্রান্ত এক ভদ্রলোক তার নাম জানতে চাইছেন।

ও ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বলল, তিলকচন্দন।

বেশ নাম তো, থাক কোথাও?

আমার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। দুদিন ছিলাম একটা মেসে অনাথবাবুর কাছে। কাল রাতে শুয়েছিলাম গঙ্গার ধারে একটা খাটালের খাটিয়ায়।

সুমন্ত ঠাকুরের বেশ অদ্ভুত ঠেকল এই বোহেমিয়ান ছেলেটির কথা শুনে। পথে ঘুরে ঘুরেও ক্লান্তির ছায়া নেই চোখে মুখে। সুদর্শন, স্বাস্থ্যেভরা আনন্দময় চেহারা। পোশাকের দৈন্য তার স্বাভাবিক হাসিটুকুকে হরণ করতে পারেনি।

অনাথবাবু কে?

উনি আর্টিস্ট। কোন কোন মাসিক পত্রিকায় ছবি আঁকেন। ছেলেদের পড়ার বইতেও ছবি আঁকেন উনি।

তুমি কি ওঁর কাছে ছবি আঁকার কাজ শেখ?

আমি ওঁর ছবি আঁকার কাজে মাঝে মাঝে সাহায্য করি।

একজন বিশিষ্ট পথচারী ফুটপাথ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল তিলকচন্দন, ও মশাই, ফুটপাথে এতখানি জায়গা থাকতে আপনি ছবিটা মাড়িয়ে মুছে চলে গেলেন!

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়িয়ে মেজাজ দেখিয়ে বললেন, ফুটপাথটা পায়ে চলার জন্য, কারো ছবি আঁকার জন্যে নয়।

কথা কটি ছুঁড়ে দিয়ে মিলিটারি কায়দায় ঘুরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমন্ত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সকলে ছবি বোঝেনা।

তিলক বলল, ঠিক বলেছেন।

আবার মুখে হাসির রেখা। বলল, কেউ কি কারো ছবি মুছে ফেলতে পারে, ওটা তো মগজে আঁকা হয়ে থেকে যায়।

ছেলেটার কথা শুনে সুমন্ত অবাক হলেন।

তুমি গতকাল খাটালে কি করছিলে?

মোষেদের স্কেচ করছিলাম।

খুব ভাল। আজ তো দেখছি, তুমি একপাল মোষের ছবিই এঁকেছ ফুটপাতে। দুটো লোক একপাল মোষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোরবেলা উঠে দেখি, গঙ্গার রাস্তা ধরে ঐ দুটো লোক মোষগুলোকে কসাইখানার দিকে নিয়ে চলেছে। আমিও পা চালিয়ে চললাম ওদের পেছন পেছন। ট্রাফিকের কাছে থেমে দাঁড়ালে আমি ওদের অসহায় লাল চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। সেই বিহার থেকে এসেছে। ভাল করে দুটো খেতেও পায়নি। ক্লান্ত, পা নাড়তে পারছেনা। ওরা কি স্যার ওদের মৃত্যুর পরোয়ানাটা জানতে পেরেছে? দেখুন ওদের চোখমুখের ভাব। আমি ওদেরই আঁকার চেষ্টা করেছি।

এবার তিলকচন্দনের ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন শিল্পী সুমন্ত ঠকুর। প্রতিটি মোষের চোখে মুখে চলনে অসহায়ত্বের অসাধারণ অভিব্যক্তি।

তোমার বাবা মা কি দেশে থাকেন?

আমার কেউ নেই।

তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

তিলকচন্দন কোথায় যেতে হবে সে প্রশ্ন করলনা। শুধু মাথা নেড়ে বলল, যাব।

সুমন্ত ঠাকুর তাকে পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে নিয়ে এলেন।

পরিত্যক্ত পুরানো ভগ্ন প্রাসাদ। তারই সামনে ছোট্ট সুন্দর একটি বাড়ি তুলেছেন তিনি। সাদা ধবধব করছে বাড়ির রঙ। পেছনে এক চিলতে নীলাকাশ। বাড়িতে ঢোকার মুখে সবুজ ঘাসের এক টুকরো লন। লনের মাঝখানে একটা চাঁপাগাছ। ডালে ডালে ফুটে আছে কনক চাঁপা। রূপে শুধু চোখকে টানেনা, গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা।

সেদিন সুমন্ত ঠাকুরের স্ত্রী সুমিতা ঠাকুরই ওকে খেতে দিয়েছিলেন। অল্প ভারিভুরি চেহারা, একেবারে প্রসন্ন প্রতিমার মত।

বাড়িতে থাকে কেবল কেয়ারটেকার। বছরে দু'একবার দেশে এসে কিছুদিন করে কাটিয়ে যান

খাবার থালাটি বসিযে দেবার পর লক্ষ্মী প্রতিমাকে প্রণাম করেছিল তিলকচন্দন।

সুমিতা বলেছিলেন, বেশ নামটি তোমার। কে এই নাম রেখেছিলেন?

ঠিক জানিনা, সম্ভবত আমার জন্মদাতা মানুষটি।

সেই মুহূর্তে সুমিতার মনে হাজার প্রশ্ন ভিড় করে এলেও তিনি আর একটিও প্রশ্ন করলেন না। কৌতূহলকে প্রশ্রয় না দেবার সংযম তিনি নিজগুণেই অর্জন করেছেন।

ছেলেটিকে খেতে দিয়ে তিনি বসেছিলেন তার পাশে। বাড়তি কিছু পরিবেশনের জিনিস নিয়েই বসেছিলেন।

সুমিতা লক্ষ্য করলেন, অযত্নে, অনাহারে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা হাতের কাছে খাবার পেলে যেভাবে গোগ্রাসে খেতে থাকে, এ ছেলেটি কিন্তু তাদের দলে নয়। ক্ষিদের জ্বালা থাকলেও আহার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কুরুচির কোন পরিচয় নেই।

তিলকচন্দন একবার খাবার মাঝেই মুখ তুলে জানতে চাইল, স্যারের খাওয়া হয়ে গেছে?

আজ আমাদের এ বেলাতেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমন্তন। রাতে একসঙ্গে বসেই খাওয়া যাবে।

একটু থেমে আবার বললেন, তুমি ওঁকে স্যার বলছ কেন? উনি সমুন্ত ঠাকুর আর আমি সুমিতা। তুমি আমাদের দাদা বৌদি বলে ডেকো।

প্রথম দিনের এই কথাটুকু শুনে ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল তিলকচন্দন। এতখানি অন্তরের ছোঁয়া সে আশা করেনি।

সেদিনই সুমিতা ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, তোমার কোন পিছুটান আছে কি তিলক?

মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেছিলেন, তোমার নামটাকে একটু খানি ছোট করে নিলাম, আপত্তি নেই তো?

কিছুমাত্র না। অনাথবাবু তো ঐ নামেই ডাকেন।

অনাথবাবু কে?

একজন খুব ভালমানুষ, ছবিটবি এঁকে সংসার চালান। আমি মাঝে মাঝে তাঁর আঁকার কাজে সাহায্য করি। বছর তিনেক আগে আমি যখন খুব অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলাম তখন উনি আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। সবে মা মারা গেছে, তার কয়েক বছর আগেই আমার জন্মদাতা উধাও। আমাদের বস্তির ডেরাটাও বাকি ভাড়ার দায়ে হাতছাড়া। ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা সামনে, ফি দেবার টাকা নেই। অনাথবাবু আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, কিছু বই কেনার টাকা আর ফিয়ের টাকা দিয়ে দিলেন। মেসে নিজের কাছে দুমাস রেখে পরীক্ষাটা দেওয়ালেন।

সুমিতা বললেন, ভদ্রলোকের অন্তঃকরণ অত্যন্ত ভাল।

জানেন বৌদি, উনিও খুব সচ্ছল অবস্থার মানুষ নন। বর্ধমানের এক অজ পাড়াগাঁয়ে বাড়ি। স্ত্রী আর দুটি মেয়ে নিয়ে সংসার। কতটুকুই বা রোজগার বলুন। তবুও আমাদের মত চালচুলোহীনদের দুঃখ সইতে পারেননা।

সুমিতা বেশ গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, এসব মানুষ লাখে একটি মেলে কিনা সন্দেহ।

এবার তিলকচন্দন বলল, আপনি প্রথম জানতে চেয়েছিলেন, আমার কোন পিছুটান আছে কিনা। আমি আপন মনে গান গাই, ছবি আঁকি, ঘুরে বেড়াই। আমার আবার পিছুটান কি?

কি গান গাও?

রবি ঠাকুরের।

খুব ভাল। একদিন শুনব।

একটু থেমে বললেন, তুমি থাকবে আমাদের কাছে?

এত স্নেহ পেলে একটা পথের কুকুরও ছেড়ে যেতে চায় না।

ওকথা বল না ভাই। আমরা কিন্তু থাকি অনেক দূরে।

যেখানেই থাকুন না কেন, আমার বাধা কি?

তোমার দাদা জাপানের এক আর্ট কলেজে কাজ করেন। তাঁর ইচ্ছে, তুমি ওখানে আমাদের সঙ্গে থাক। তোমার আঁকা ছবি দেখে উনি দারুণ খুশি। ওখানে আমাদের কাছে থেকে তুমি ছবি আঁকা শিখবে।

কিছু সময়ের জন্য খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তিলকচন্দনের। এ যেন তার কাছে এক অভাবিত, অবিশ্বাস্য প্রস্তাব। একেই কি দৈববাণী বলে!

কি, এতদূরে যেতে মন কেমন করছে, তাই না?

একটুও না বৌদি, আমি ভাবতেই পারছি না!

তুমি আজ থেকে থাকবে আমাদের সঙ্গে। তোমার যাবার ব্যাপারে অনেকটাই ঘোরাঘুরি করতে হবে। সে সব তোমার দাদা করবেন।

আমাকে একবার অনাথবাবুর কাছে যেতে হবে বৌদি।

যাবে বইকি ভাই, তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদ নিয়ে আসতে হবে না! তিনি তোমাকে ভালবাসেন। বিপদ আপদে কত সাহায্য করেছেন।

একদিন কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরের দেশ জাপানে চলে এলো তিলকচন্দন। এলো এক হৃদয়বান দম্পতির সঙ্গে, যাঁরা গুণগ্রাহী এবং অত্যন্ত সহৃদয়।

দশ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও ঠাকুর দম্পতি সন্তানহীন। এতে অপূর্ণতার বেদনা থাকলেও কোন ক্ষোভ নেই উভয়ের অন্তরে। অন্তরঙ্গতার রঙীন সুতোয় বাঁধা সমস্ত সংসারটি। এই সন্তানহীন সংসারটিকে ভায়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে যে তরুণটি, সে ক্ষুদ্র এই ঠাকুর পরিবারের সাম্প্রতিক সংযোজন। সে গান গায়, ছবি আঁকে। তার প্রাণের এস্‌রাজটি বেজে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানে। তার হাতের তুলি শুধু ছবি আঁকেনা, সে ছবি আশ্চর্য এক প্রাণের স্পন্দন নিয়ে জেগে ওঠে।

এখন তিলকচন্দন জাপানি আর্টের ক্লাস করছে। সে কয়েকদিনের ভেতরেই গুরু ফুজিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে।

জাপানি তুলি ধরা, ব্রাশের টান, পরিমিত রঙের ব্যবহার কদিনেই তার করায়ত্ত।

সুমন্ত ঠাকুরকে অধ্যাপক ফুজিতা বলেছেন, ছেলেবেলা থেকে জাপানি ছবির সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন কোন বিদেশী শিল্পীর এ ধরনের প্রতিভা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

সুমন্ত ঠাকুর বলেছেন, আপনার ছাত্রটি শিল্প-প্রতিভা নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ওর চোখ সজীব, গভীর, বর্ণময়। ওর হাত মনের অবিকল ভাবনাগুলোকে তুলির টানে, পেনসিলের আঁচড়ে রূপ দিয়ে যায়।

ফুজিতা বলেছেন, আমাদের আর্ট কলেজে সকল মাধ্যমেই ওর কাজ সবার সেরা।

সুমন্ত অতঃপর হাসতে হাসতে বলেছেন, আমার ঘরের দেওয়ালে এখন ওর হাতের পেইন্টিং শোভা পাচ্ছে। আমার বাগানের একমাত্র চেরিগাছের তলাটা ও সাদা আর নীলাভ দুটো পাথর আর কতকগুলো ছোটবড় নুড়ি দিয়ে সাজিয়েছে। তাছাড়া ইদানীং ও মেতে আছে জাপানি ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইকাবানা নিয়ে।

ফুজিতা শেষ কথাটি বলেছেন, ও যে দেশে যাবে, সে দেশের সেরা শিল্পী-সমাজ ওকে লুফে নেবে।

দুই

তিলকচন্দন সম্রাটের বাগানে এই প্রথম চেরিফুলের ফুটে ওঠা দেখল। শুধু দেখা নয়, তিনদিন ধরে রঙ তুলির টানে তাকে রূপ দিয়ে চলল।

চতুর্থদিন ভোরবেলা গিয়ে দেখল, প্রাসাদমুখো লাইন দিয়ে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে।

সেও লাইন দিয়ে দাঁড়াল।

পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার মশাই?

আজ যে মাহামান্য সম্রাটের জন্মদিন। উনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের শুভকামনা জানাবেন।

তিলকচন্দন ভাবল, চেরিদর্শন আর রাজদর্শন, দুটোই আজ কপালে জুটবে!

লাইন এখনও অনড়। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাজবাড়িটি যেন মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায়। পাতার কাঁপনে কখনো সে ঘোমটা দেয়, আবার কখনো ঘোমটা খোলে।

একি! পেছন থেকে একটা হাত এগিয়ে এলো তার দিকে। ছোট্ট একটা কাঠিতে জড়ানো সূর্য-আঁকা একটা পতাকা।

তাই তো, এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি, এখন দেখল, সামনে দাঁড়ানো সকলের হাতেই এমনি সূর্য-আঁকা এক একটা পতাকা।

তিলকচন্দন পেছন ফিরেই দেখল, ভারি চমৎকার কিমোনো পরা একটি মোমের পুতুল তার দিকে চেরা চোখে তাকিয়ে মিষ্টি এক টুকরো হাসি হাসছে।

তরুণীটির হাতে দুটো পতাকা, তার একটা সে তিলকচন্দনকে দিতে চায়।

দারুণ খুশি হয়ে মেয়েটির হাত থেকে ফ্ল্যাগটা নিয়ে নিল সে।

মেয়েটি পেছন থেকে বলল, এটি 'নিহন্নো হাতা', রাজদর্শনের পর রাজবাড়ির বিশেষ একটি জায়গায় সূর্য আঁকা এই ফ্ল্যাগটি রেখে আসতে হয়।

সামনে থেকে তিলকচন্দন বলল, আমি তাই করব।

অতি চমৎকার প্রাসাদ সম্রাটের। চারদিকে গাছের সারি, পুষ্পিত উদ্যান।

সম্রাট এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। জনতা নত হয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানালো।

ও ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছে জাপানিরা কাউকে অভ্যর্থনা করার সময় কিংবা অভিবাদন জানানোর সময়, বার বার মাথা অনেকখানি নত করে। সম্রাটের বেলাতে তারা বার বার নত হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল। সেও দেখাদেখি তাই করল।

সবাই যেখানে সূর্য আঁকা ফ্ল্যাগটি রেখে চলে যাচ্ছে সেও তাদের দেখাদেখি সেখানেই রাখল। পরে পেছনের মানুষদের জায়গা করে দিয়ে সামনের দলটির সঙ্গে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

একটু দূরে গিয়ে সে রাজপ্রাসাদের ছবি আঁকতে বসে গেল। তার স্কেচ হয়ে যাওয়া এবং রং ছড়ানোর পর সে যখন চোখ তুলল তখন রাজবাড়ির ব্যালকনিতে সম্রাটকে দেখতে পেল না। সামনে থেকে সারিবদ্ধ মানুষগুলো তখন একেবারে সরে গেছে।

তিলক তার ব্যাগে সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়, সেই চেরিফুলের বাগানে।

সবাই তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পানভোজনে মত্ত, চারদিকে উৎসবের মেজাজ।

তিলকচন্দনের কাছে কিন্তু কোনও খাবার ছিল না। সে আজ শুধু দ্রষ্টা, ভোক্তা নয়। উপনিষদের দ্রষ্টা পাখিটির মতো সে নিজে ভোগ না করে ভোক্তাদের দেখছিল।

সুমন্ত ঠাকুর ঘরে ফিরে এসে রোজই উপনিষদ থেকে কিছু কিছু পাঠ করে শোনান। শ্রোতা সুমিতা ঠাকুর। ইদানীং উপনিষদ পাঠের সান্ধ্য আসরে তিলকচন্দনও তার স্থান করে নিয়েছে।

যেদিন সুমন্ত ঠাকুর জীবাত্মা, পরমাত্মা সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে উপনিষদ থেকে দুটি পাখির উপমা দিয়েছিলেন, সেদিন উপমাটি ছবি হয়ে ফুটে উঠেছিল তিলকচন্দনের মনে।

পরের দিনই ওই দুটি পাখির ছবি এঁকেছিল সে জাপানি ব্রাশের টানে। ভোক্তা পাখিটির সমস্ত দৃষ্টি একটি ফলের ওপর নিবদ্ধ। আর ঠিক তার ওপরের ডালে বসে থাকা দ্রষ্টা পাখিটি সেদিকে তাকিয়ে আছে নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে। দুটি পাখির চোখ আশ্চর্য অর্থবহ।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে ওই ছবিটি দেখে সুমন্ত ঠাকুর বলেছিলেন, উপনিষদের আলো অন্তরের গভীরে এসে না পড়লে এমন ছবি আঁকা যায় না। যে কোনও বিষয়ের ভেতরে ডুবে যাওয়ার বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে তিলকের।

এতক্ষণে খোঁজ পড়ল সেই মেয়েটির, যে তিলককে একটি সূর্য আঁকা ফ্ল্যাগ দিয়েছিল।

চারদিকে উৎসবের ভিড়ে সে খুঁজতে লাগল মেয়েটিকে।

ওই তো দূরে একটা চেরি গাছের তলায় চার-পাঁচজন বান্ধবীর সঙ্গে বসে আছে সে।

মেয়েটিকে সামান্য ধন্যবাদ জানাতেও সে ভুলে গিয়েছিল। তারপর অনেকটা সময়ই সে বসে বসে

রাজপ্রাসাদের ছবি এঁকেছিল।

মেয়েটির কথা তার মনেই ছিল না।

তিলকচন্দনের মনে হল উঠে গিয়ে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসবে। কিন্তু কেমন যেন তার সঙ্কোচ এল মনে। মেয়েটি যদি একা বসে থাকত তা হলে সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারত তার কাছে। কিন্তু সখী পরিবৃতা, সেখানেই তো সঙ্কোচ।

অবশেষে সব সঙ্কোচের অবসান হল। ওই তো মেয়েটি বান্ধবীদের কাছ থেকে উঠে তিলকচন্দনের দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে মেয়েটি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল তিলককে। তিলকও প্রত্যভিবাদন জানাতে ভুলল না।

আপনি একা বসে রয়েছেন দেখে চলে এলাম।

তিলক পাশের জমিনটা দেখিয়ে বলল, বসুন বসুন।

মেয়েটি তিলকের মুখোমুখি বসে বলল, আমি আৎসুকো তানাকা। আপনি আমাকে তানাকা বললেই খুশি হব।

আমি তিলকচন্দন। কলকাতা থেকে আপনার এই সুন্দর দেশটিতে ছবি আঁকা শিখতে এসেছি।

তানাকা বলল, আপনাকে আমি কয়েকদিন চেরি ফুলের ছবি আঁকতে দেখেছি।

তিলক বলল, আমি কিন্তু আজই আপনাকে দেখলাম।

তানাকা মৃদু হেসে বলল, দেখা যখন হল, তখন আসুন আমরা কিছু খাই।

আমি তো কিছু খাবার আনিনি।

একটা প্যাকেট বের করে তানাকা বলল, আপনি তেমপুরা (তেলেভাজা) খান নিশ্চয়ই।

নাম পর্যন্ত শুনিনি। অল্পদিন হল এসেছি এ দেশে।

তানাকা, তেমপুরার প্রস্তুত প্রণালী বলতে শুরু করল।

ছোট ছোট আস্ত মাছ, বড় মাছের টুকরো, চিংড়ি ইত্যাদি ডিমের সাদা অংশ আর ময়দার গোলায় ডুবিয়ে কড়া করে ভেজে নিতে হয়। সয়া সসে ডুবিয়ে খেলে আমাদের জাপানি জিভে দারুণ লাগে।

\তিলক বলল, ভিন্ন নাম হলেও আমাদের দেশে এর কদর কম নয়।

তানাকা বলল, আসুন, খাওয়া যাক্।

পরিবেশনও যে কত শিল্প সুষমামণ্ডিত হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেল তানাকার হাতের ছোঁয়ায়। সে তার ব্যাগ থেকে ঝকঝকে ফুল আঁকা দুটো কাগজের প্লেট বের করল। চমৎকার পাটকরা ফিন্‌ফিনে একটি রুমাল খুলে প্লেট দুটো মুছল। প্যাকেট থেকে কাঠির সাহায্যে দুটো করে তেমপুরা তুলে নিয়ে প্লেটে রাখল। সবার আগে ঘাসের জমিনে একটা ধোয়া হলুদ তোয়ালে পেতে নিয়েছিল তানাকা। তারই ওপর রাখল পিঙ্ক ফুল তোলা ধবধবে সাদা দুটো প্লেট। তাতেই শোভা পাচ্ছে তেমপুরা।

পানীয় জলের একটি সুদৃশ্য বোতলও রাখা হল খাবার জায়গায়। তার মাথায় একটি খাবার জলের গ্লাস প্যাঁচ দিয়ে আটকানো।

উড়ন্ত সারসের ছবি আঁকা লম্বা মুখওয়ালা ছোট্ট একটি ফ্লাওয়ারভাস সে তার সোনালী ও সিঁদুর রঙের অপরূপ কাজ করা কিমোনোর ভেতর থেকে বের করল।

বিনীত হাসি উপহার দিয়ে বলল, দু'এক মিনিট এখান থেকে উঠে যাবার জন্য আপনি কি আমাকে অনুমতি দেবেন?

স্বচ্ছন্দে। আনন্দ করতে এসেছি, সময়ের হিসেব করতে নয়।

তানাকা প্রথমে ওর বন্ধুদের কাছে গিয়ে কিছু বলল। তারপর বাগানের এক প্রান্তে পাইনগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও। যখন তিলকচন্দনের কাছে এসে পৌছল তখন

ঘড়িতে চার পাঁচ মিনিটের বেশী সময় পার হয়ে যায়নি। তবুও এটুকু সময় অনুপস্থিত থাকার জন্য সে ক্ষমা চেয়ে নিল।

এবার তিলকচন্দনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তানাকার স্বল্পসময় অনুপস্থিতির কারণ। সে নিশ্চয়ই বন্ধুদের কৌতূহলের কিছুটা নিরসন করে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাইন গাছের আড়াল থেকে তুলে আনল সরু সবুজ ডাঁটাওয়ালা গাঢ় পিঙ্ক রঙের একটি ফুল।

এবার ঘাসের জমিনে বসে তানাকা তার ছোট্ট সুদৃশ্য ফ্লাওয়ার ভাসে সামান্য একটুখানি জল ঢেলে সরু লম্বা ডাঁটাওয়ালা ফুলটা রেখে দিল।

তিলকচন্দন বলল, আপনাদের দেশটার দিকে তাকালেই চোখে ঘোর লাগে। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, বন, ক্ষেতখামার, একেবারে ক্যানভাসের ওপর শ্রেষ্ঠ কোন শিল্পীর তুলির টানে আঁকা বলে মনে হয়। কিন্তু তার চেয়েও যে বস্তুটি বিস্ময় জাগায় তা'হল জাপানিদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ। ছবি যাঁরা আঁকেননা তাঁরাও এখানে মনেপ্রাণে শিল্পী।

মৃদু মৃদু হাসল তানাকা, মুখে কোন কথা বললনা।

খেতে খেতে ওরা টুকরো কথার আদানপ্রদান করতে লাগল।

তিলকচন্দন খানিকটা তেমপুরার আস্বাদ নিয়ে বলল, সত্যিই দারুণ!

তানাকার সরু চোখে খুশির রামধনু ঝলকালো।

ভাল লেগেছে আপনার?

চমৎকার। একেবারে স্বাদে ভরে উঠেছে সমস্ত মুখখানা। এ জিনিস তারিয়ে তারিয়ে খেতে হয়।

আমি কিন্তু সয়া সস্ আনতে পারিনি, ওটা বন্ধুদের কাছে থেকে গেছে।

তিলকচন্দন বলল, ভাগ্যিস থেকে গেছে। এই অপূর্ব জিনিসটির সঙ্গে ও বস্তু মিশলে আনন্দে আমার কথাই বন্ধ হয়ে যেত।

এবার হাসিতে খুশির ছোট ছোট ঢেউ তুলল তানাকা।

ওরা ভাব বিনিময় করছিল বাংলা ভাষায়। মাঝে মাঝে তিলকচন্দন দুচারটে সদ্য শেখা জাপানি ভাষা মিশিয়ে দিচ্ছিল কথাবার্তায়।

এতক্ষণে তিলকের মনে হঠাৎ একটা ভাবনার উদয় হল। কি করে তানাকা এত চমৎকার বাংলায় কথা চালিয়ে যাচ্ছে!

তিলক এবার চোখেমুখে বিস্ময়-চিহ্ন এঁকে বলল, আপনি আমাকে কিন্তু অবাক করলেন।

এবার বিস্ময়ের ঘোর আর জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল তানাকার চোখে।

তিলক বলল, বাংলাভাষায় কথা বলতে শিখলেন কোথা থেকে?

কিয়োতোতে ঘোষ জিমনাসিয়ামের শাখা রয়েছে। ওখানে আমি দু-তিন বছর যোগাসন শিখেছিলাম। ওখানে যাঁরা বাংলায় কথা বলতেন তাঁদের কথার সুর আমার কানে গানের মতো বাজত। আমি তাঁদের কাছ থেকেই বাংলায় কথা বলতে শিখেছি। শুধু তাই নয়, আস্ত একটা চিঠিও আমি বাংলায় লিখতে পারি।

তিলক বাহবা দিয়ে বলল, দারুণ কৃতিত্ব আপনার, অশেষ গুণের মেয়ে আপনি।

আপনিও তো দেখছি কিছু কিছু জাপানি কথা ব্যবহার করছেন।

এটা সম্ভব হচ্ছে আমার দাদা-বৌদির কল্যাণে।

প্রশ্ন করল তানাকা, ওঁরা কি এদেশে কোন্য কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

এখানে একটি আর্ট-কলেজে ইণ্ডিয়ান আর্টের অধ্যাপক আমার দাদা।

স্থির শান্ত মেয়ে তানাকা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, ভারতীয় শিল্প আমার ভীষণ ভালো লাগে।

অবাক করলেন, যেমন?

অজন্তা গুহার একটা রঙিন অ্যালবাম আমার সংগ্রহে আছে। তা ছাড়া ভারতের মন্দির ভাস্কর্যের ওপরে দু-খানা বই, একজন ভারতীয় পর্যটক আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

তিলকচন্দন হেসে বলল, আপনার উপহার পাওয়ার ভাগ্য দেখছি খুবই ভাল।

সেই ভারতীয় পর্যটককে আমি জাপানের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো একসময় সঙ্গে থেকে দেখিয়েছিলাম।

আপনার একটা বড় গুণের পরিচয় পেলাম, আপনি ছবি ভালোবাসেন। আর কোনও-গুণের পরিচয় জানা সম্ভব হবে কি?

তানাকা আবার জলতরঙ্গের মতো হাসি ছড়াল।

একটা বিশেষ স্কুলের ট্রেনিং আছে আমার। সেখানে নাচ, গান, ছবি আঁকা সবই শিখতে হয়। এমনকি রান্নাও। তা ছাড়া সবার ওপরে যেটা শেখানো হয় তা হল নিঃসঙ্গ মানুষদের মনোরঞ্জন করা। তিনি যাতে ভাবতে না পারেন, সংসারে তিনি উপেক্ষিত।

তিলকচন্দন বলল, অশেষ গুণে গুণী আপনি। এখন অনুগ্রহ করে আমার একটি কথা শুনুন।

আমাদের দেশে একটি রীতি আছে, খাওয়ানোর শেষে অতিথিকে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। আজ আপনি অতিথি সেবা করেছেন, তাই আপনার কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা প্রত্যাশা করি।

কথাটা শুনে তানাকা সাগ্রহে বলল, বলুন, বলুন, আমি আপনাকে কি দিতে পারি?

কেবল একটি ছবি আঁকার সুযোগ।

বিস্ময়ের চোখ মেলে তানাকা বলল, ছবি আঁকার সুযোগ করে দেব আমি।

আমরা যে গাছের তলায় বসে আছি সেই পুষ্পিত চেরির একটি ডাল ছুঁয়ে আপনাকে কিছু সময় দাঁড়াতে হবে, আর আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই দৃশ্যটাকে তুলির টানে ধরে রাখব।

তানাকা এবার মধুর হেসে উঠে দাঁড়াল। সত্যি তার দেহটাকে মোমের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। বড় কোমল আর মসৃণ তার ত্বক। লম্বা লম্বা কাঁটা দিয়ে ফোলানো কবরীকে মনোরম করে বেঁধেছে। সোনালি, সিঁদুর রঙের কিমোনোখানা জড়িয়ে ধরেছে তার অষ্টাদশী তরুণী দেহটাকে। ব্রোকেটের ওপর ছড়িয়ে আছে কিছু কিছু সাদা ফুলের কাজ। কিমোনোর গলার সামনে সরু লাল রঙের একটা ফিতে। সমস্ত মুখেচোখে হাসি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তানাকা। বসন্তের সাকুরা যেন তার হাতের ছোঁয়ায় কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে উঠছে।

মনপ্রাণ ঢেলে ছবির কাজটা শেষ করল তিলকচন্দন। বড় দ্রুত আর নিখুঁতভাবে তার হাত চলে।

ছবিটা শেষ করে তিলক বলল, একখানা হাত তুলে আপনি আর কতক্ষণ কষ্ট করবেন। এবার আসুন, মুখোমুখি বসা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে তানাকা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সে ঝুঁকে দেখতে লাগল তিলকচন্দনের আঁকা ছবিখানা।

আশ্চর্য! সেই মুহূর্তে একটা পাখির ডাকে গাছের ডালের দিকে তাকাল তিলকচন্দন। আরে পাখিটাও যে ওরই মতো ঝুঁকে দেখছে তানাকাকে।

হঠাৎ তানাকা ছবিটাকে টেনে নিয়ে আদ্দেক মুখ তাতে ঢেকে ফেলে বলল, এ ছবি আমার, আমি কাউকে এটি দিতে পারব না।

তিলকচন্দন তৃপ্তির হাসি হাসল। বলল, ঠিক এরকমই একটা ছবি আমি আপনাকে তৈরি করে দেব।

তানাকা ছবিটা শিল্পীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, কথা দিচ্ছেন তো? আমি কিন্তু ঠিক তিনদিন পরে কিয়োতোতে ফিরে যাব।

তার ভেতরেই ছবি পেয়ে যাবেন।

তানাকা খুশি হয়ে বলল, কয়েকদিন পর পর এখানে এলাম। কাল থেকে টোকিও-তে আমার অন্য কাজ আছে। যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ঠিক এখানে হাজির থাকব আপনার ছবিখানা পাওয়ার আশায়।

নিশ্চয়ই শিল্পী সেদিন ছবিখানা তোমার হাতে তুলে দেবে।

'তুমি' বলার জন্যে মনে হল তানাকা খুশিই হয়েছে। তার মুখে চোখে সেই ছবিই ফুটে উঠল।

চলে যাওয়ার আগে তানাকা বলল, সেই শুভ সন্ধ্যায় আমি তোমাকে কোতো বাজিয়ে শোনাব।

তিলকচন্দন বলল, আমি এক জ্যোৎস্নারাতে শপিং সেরে যখন বৌদির সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম তখন কোতোর টুংটাং আওয়াজ শুনে পথের ওপরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। বাজনা শেষ হলে সেদিন ঘরে ফিরে এসেছিলাম বড় তৃপ্তি নিয়ে। কি মিষ্টি বাজনা!

এবার তানাকার দুটো চোখে চাঞ্চল্য দেখা গেল।

কি হল তোমার? শিল্পীর এই খোলা পিঞ্জরে দুদণ্ড ঢুকে পড়েছিলে, এখন বুঝি পাখা মেলে উড়ে যাবার জন্য মন কেমন করছে?

তাকিয়ে দেখ, ফুলন্ত চেরির বাগান এখন জনশূন্য। আমার বন্ধুরা একটি বিশেষ রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

তিলকচন্দন বলল, অবশ্যই তোমার এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুদের কাছে যাওয়া উচিত। আমি অনেকটা সময়ই তোমার কেড়ে নিয়েছি।

সে সময়গুলো আমার আনন্দের ভাণ্ডারে বহু মূল্যবান রত্নের মত জমা হয়ে রইল তিলক্।

বেদনার একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে সেই নন্দন কানন থেকে বসন্তের মনোহারিণী পাখিটি উড়ে চলে গেল।

তিলকচন্দন ঘরে ফিরে এল। তার আকাশে তখন পূর্ণচাঁদের ঝলকানি। গলায় গুনগুনিয়ে উঠছে গানের কলি,—'আমি চিনি গো চিনি তোমারে

ওগো বিদেশিনী,

তুমি থাক সিন্ধুপারে

ওগো বিদেশিনী...'

সুরের আড়ালে কথা নিজেকে গোপন করে ভোমরার মত গুনগুনিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের ভেতর।

রান্নার পাট চুকিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সুমিতার কানে এসে বাজল সেই বড় চেনা, হৃদয় ছোঁয়া সুর।

অমনি সুমিতা সকৌতুকে বললেন. কোন বিদেশিনীর সন্ধান পেলে নাকি দেবরজী?

সুমিতা তিলকচন্দনকে মাঝে মাঝে মজা করে দেবরজী বলে ডেকে থাকেন।

তিলক তার ঘরের ভেতর থেকে নিজের আঁকা ছবিখানা দেখতে দেখতে জবাব দিল, 'সে আসে, সে আসে।'

বয়সের কিছুটা ব্যবধান থাকলেও ঠাকুরপো আর বৌদির ভেতর ইতিমধ্যেই বড় মধুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তাই বুঝি, বলে তিলকের ঘরে ঢুকে পড়লেন সুমিতা। অমনি শিল্পী তার বৌদির চোখের সামনে তুলে ধরল আজকের আঁকা ছবিখানা।

সুমিতা ছবি দেখে সকৌতুকে বললেন,—

হাঁউ মাঁউ খাঁউ

প্রেমিকার গন্ধ পাঁউ।

তিলক বলল, তুমি যতটা ভেবেছ, ঘটনা ততটা গড়ায়নি কিন্তু। সে এখনও অধরা মাধুরী।

তবু?

রাজদর্শনে যাবার পথে হাতে 'নিহস্রোহাতা' গুঁজে দেওয়া থেকে বিদায়-মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেল তিলকচন্দন।

সুমিতা বললেন, ছবির মত ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে, তবে সাগর সঙ্গম এখনও বহুদূরে।

এবার সুমিতা চন্দনতিলকের আঁকা ছবিখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

চমৎকার! বলার পরেই হঠাৎ ছবির একটা জায়গায় সুমিতার চোখ দুটো আটকে গেল।

একসময় ছবি থেকে মুখ তুলে বললেন, মেয়েটির কিমোনোর গলার কাছে কি এমনি একটা লাল ফিতে ছিল?

যা দেখেছি তাই এঁকেছি ভাবীজী।

একটি সুন্দরী গেইশার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তিলকচন্দন। তুমি তারই ছবি এঁকেছ।

তুমি কি করে জানলে ও গেইশা?

গেইশারা সাধারণত যে কিমোনো পরে তার গলার কাছে একটা লাল ফিতের বেষ্টনি থাকে।

তিলকচন্দন বলল, গেইশা শব্দটা শুনেছি বটে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই।

ওরা চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী এক নারী সম্প্রদায়। নাচ-গান-বাজনা-অভিনয়, এমনকি রান্নাতেও তাদের অশেষ দক্ষতা।

তিলকচন্দন বলল, তানাকার মুখ থেকে শুনেছি, ও যে স্কুলে পড়ত সেখানে এই সব বিদ্যেই শেখানো হত।

ও ঠিকই বলেছে, ওগুলো গেইশা ট্রেনিং স্কুল। ওখানে নিপুণ আলাপচারিতা শেখে ওরা। বড় বড় বাড়ির মেয়েদেরও ওরা অনেক সময় সহবত শেখানোর জন্য নিযুক্ত হয়। পোশাক পরিচ্ছদ পরার আর্টও ওরা তাদের শেখায়।

তানাকা বলেছিল, নিঃসঙ্গ বিত্তবান মানুষদের সঙ্গ দিয়ে ওরা নাকি তাদের একাকিত্ব দূর করে।

সুমিতা বললেন, গেইশারা সেজন্যে কিছুটা রহস্যময়ী। অনেকে এ নিয়ে ওদের অপবাদও দেয়। শুনেছি পাহাড়ি এলাকায় যখন তুষারপাত হয় তখন সেখানকার কোন কোন হট ওয়াটার স্প্রিংয়ে স্নান করতে যায় সৌখিন মানুষেরা। সেখানে নির্জন স্নানঘরে গেইশারা তাদের গা হাত মেজে স্নান করিয়ে দেয়। এ জন্যে উপযুক্ত অর্থও পায়।

তিলক জানতে চাইল, এরা সংসার করে না?

হয়তো কেউ কেউ করে, কিন্তু বিশিষ্ট পরিবারের মানুষেরা সাধারণত গেইশাদের ঘরের বউ করে আনে না।

আমাদের দেশের মত ওরা কি পতিতা?

সুমিতা বললেন, আগেই বলেছি, ওরা নিজেদের খানিকটা রহস্যের কুয়াশায় ঢেকে রাখে, তাই ওদের ক্রিয়াকর্মের হদিস পাওয়া যায় না। তবে ওরা যে বিশেষ গুণের অধিকারিণী সে বিষয়ে কারু দ্বিমত নেই। এইসব গুণী মেয়েদের বারবণিতা বলতে আমার রুচিতে বাধে। তাছাড়া... বলেই একটু থামলেন সুমিতা।

তাছাড়া কি ভাবীজী?

শুনেছি, নামকরা হোটেলে বড় বড় বিজনেস ম্যানদের ভেতর যখন গোপনীয় ব্যবসায়িক ডিল হয় তখন সেখানে অনেকেই সার্ভ করার জন্য নিযুক্ত করেন গেইশাদের। তারা হাসি আর মধুর ব্যবহারে পরিবেশকে খুবই অনুকূল করে তোলে। শুধু তাই নয়, বিজনেস সিক্রেট তারা কানে শুনলেও বাইরে কখনও প্রকাশ করে না। সবাই বলেন, তারা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

তিলকচন্দন কৌতুক করে বলল, এত গুণবতী একজন তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার, কি বল, ভাবীজী?

সৌভাগ্য কি মন্দভাগ্য, সেটা সময়ই বিচার করবে। তবে পরিচয় পর্বটা যেন দ্রুত না গড়ায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখ।

এরপর কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, সবই উপভোগ করতে হয় তারিয়ে তারিয়ে, তবেই আসল স্বাদটি পাওয়া যায়।

কথামত রাতদিন ভারী নিবিষ্ট হয়ে দ্বিতীয় ছবিটা আঁকল তিলকচন্দন। প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবিখানা একটু বড় হল।

মাঝে মাঝে সুমিতা এসে ছবিটা দেখতেন এবং তারিফ করে যেতেন।

তিলকচন্দন বলল, দোহাই ভাবীজী, কথাটা আবার যেন দাদার কানে তুল না।

ভালোবাসার খেলায় যেমন গোপনীয়তা থাকবে তেমনি নির্ভীকতা আর বিশ্বস্ততা থাকা চাই। কূলে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করো, মাঝদরিয়ায় হাবুডুবু খেয়ো না। তবে সন্ধ্যায় এক ঘন্টা দাদার উপনিষদের ক্লাসে নিয়ম করে হাজির থেকো। মাথায় ঢুকুক আর না ঢুকুক।

ছবিখানা উপহারের মতো করে বাঁধাল তিলকচন্দন।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার কিছু আগে সেই চেরিকাননের কাছে এসে হাজির হল সে। দূর পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত হয়ে গেল। সারা আকাশ জুড়ে রঙের খেলা চলল কিছুক্ষণ। সেই রঙ ছড়িয়ে গেল শিল্পী তিলকচন্দনের সারা হৃদয় জুড়ে।

পূর্ণ চাঁদকে যেন সঙ্গে নিয়ে এলো রূপবতী কন্যা তানাকা। আজ তার পরনে নতুন একখানা কিমোনো। সিঁদুরে লালের ওপরে চমৎকার সোনালি কাজ করা। কাজের ভেতরে মাঝে মাঝে উড়ন্ত দুধসাদা হাকুচুর, যা জাপানের জাতীয় পাখি। উড়ে চলা সারসের মত ছন্দময় ও সুন্দর।

বড় স্নিগ্ধ আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ।

চাঁদের মত শুভ্র মিষ্টি হেসে তানাকা বলল, আজ তোমাকে ছোট্ট একটি উপহার দিতে চাই।

তিলকচন্দন কোনও দ্বিধা না রেখে, কোনও কথা না বলে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল তানাকার দিকে।

তানাকা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগ থেকে অতি সুন্দর একটি সেন্টের শিশি বের করল। সবুজ সুদর্শন আধারে সোনালি দৃষ্টিনন্দন ঢাকনা।

সেন্টের শিশির প্যাঁচ খুলে প্রথমেই সে কয়েক ফোঁটা ছড়িয়ে দিল তিলকচন্দনের বুকের ওপর। তারপর ঢাকনা বন্ধ করে উপহারটা দিল ওর হাতে।

অপূর্ব!

তানাকা বলল, অপূর্ব কি ?

সবকিছুই। ওই সেন্টের শিশি, তার গন্ধ আর তার উপহারদাতা।

তানাকা যোগ করল আর এই চেরিগাছের আড়ালে ঝকঝকে চাঁদটা।

তিলকচন্দন বলল, আজ আকাশে একমাত্র চাঁদের উদয় হয়েছে, নক্ষত্রেরা কোথায় গেল! তোমার সেই সঙ্গিনীর দল?

তারা আজ সারা আকাশ জুড়ে চাঁদকে জ্যোৎস্নার জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেরা ডুব দিয়েছে।

শিল্পী বলল, এসো, বসা যাক।

ওরা সেদিনের সেই চেরিগাছটার তলায় বসল।

ডালে, ফুলে, চাঁদের আলোয় দুজনের দেহ জুড়ে অপূর্ব আলপনা।

আমার ছবি কই?

ওটা ছবি নয়, আমার উপহার।

ব্যাগ থেকে প্যাক করা ছবিখানা বের করে সে ধীরে ধীরে খুলে কৌতূহলী তানাকার হাতে তুলে দিল।

তানাকা সেই মুহূর্তে ছবি হয়ে গেল। সে চিত্রার্পিতের মত দেখতে লাগল তিলক চন্দনের আঁকা ছবিখানা।

তানাকা যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর্শিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে।

চোখেমুখে খুশি আর মুগ্ধতা নিয়ে এবার তানাকা তাকাল তিলকচন্দনের দিকে।

আমি কিন্তু এতসুন্দর নই তিলক। তোমার চোখ দিয়ে আমি নিজেকে আজ নতুন রূপে, নতুন ভাবে দেখছি।

তিলকচন্দন বলল, যে যথার্থ সুন্দর সে নিজেকে সবসময় সঠিকভাবে চিনতে পারে না। অন্যের চোখের আয়নায় যখন সে নিজেকে দেখে তখন সে তার সঠিক রূপটিকে দেখতে পায়।

এবার ব্যাগ খুলে আগের মত তোয়ালে, প্লেট ইত্যাদি বের করল তানাকা। সেগুলো যথাস্থানে পেতে দিয়ে কয়েক পিস স্যাণ্ডউইচ আর দুপিস চকোলেট রাখল তার ওপর।

মুখে বলল, আজ সান্ধ্য আসরে সামান্য একটু জলযোগ।

তিলক এক পিস স্যাণ্ডউইচ মুখে তুলতে তুলতে বলল, আপ্যায়নের আন্তরিকতায়, পরিবেশনের গুণে সামান্যও অসামান্য হয়ে ওঠে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। টুকরো টুকরো কথা। জলের ওপর চাঁদের আলোর ঝিকিমিকির মত।

আর্ট কলেজের পাঠ শেষ হলে কি দেশেই ফিরে যাবে?

সবে তো শুরু, শেষ কবে তা তো জানিনা।

আমি বলছি, একদিন তো শেষ হবে, তখন কি দাদার মত এ দেশেই কাজ নিয়ে থেকে যাবে?

এতদূর ভেবে দেখিনি।

চকোলেটের একটা দিক ঠোঁটে ছুঁইয়ে তানাকা বলল, মনে হয় তোমার কোন পেছুটান নেই।

কি করে বুঝলে?

অনুমান।

এ অনুমানের কারণ?

তানাকা বলল, শীত পড়লে পরিযায়ী পাখিরা একটু উষ্ণতার খোঁজে ভিনদেশে যায়। সেখানে কোন জলাশয়ে দু'তিন মাসের জন্য সংসার রচনা করে। কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে স্বদেশে। শীতের প্রকোপ কমলেই তারা স্বস্থানে ফিরে যায়।

তিলক বলল, আমার কথায় তুমি দেশে ফেরার আকুলতা খুঁজে পাওনি, তাই তো?

তানাকা মিষ্টি হেসে তাকাল তিলকের দিকে। তার চোখে কোন এক প্রত্যাশার ছবি কাঁপছিল।

এবার কুয়াশার অস্পষ্টতা সরিয়ে তিলকচন্দন বলল, ভারতবর্ষ আমার দেশ, কিন্তু আমি ভবঘুরে। আমার নিজস্ব কোন বাড়িঘর বা বন্ধন নেই।

তানাকা বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার দাদা বৌদি?

ওঁরা এই ভবঘুরে ছেলেটাকে প্রায় পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। দাদাই আমার হাতের ছবি দেখে টেনে এনেছেন এখানে।

তানাকা বলল, এতক্ষণে বুঝলাম, তুমি স্রোতে ভাসা একটি ফুল। তোমাকে ভালবেসে এক শিল্পী দম্পতি জল থেকে তুলে নিয়েছেন।

আমি কিন্তু অচ্ছুৎ, কোন পুজোতেই আমার স্থান হবেনা।

এই কটি শব্দ বলতে গিয়ে ভারি হয়ে উঠল তিলকচন্দনের গলা।

বুদ্ধিমতী তানাকা পরিস্থিতি বুঝে কথান্তরে চলে গেল।

তিলক, তুমি টোকিয়োর বাইরে কোথাও গেছ কি?

সে সুযোগ এখনও আসেনি।

কোন টেম্পল (বৌদ্ধ মন্দির) অথবা শ্রাইন-এ (শিন্‌তো মন্দির)?

এখনও নয়।

তানাকা তাব হাত ব্যাগ খুলে চমৎকার একটি চন্দ্রমল্লিকার ছবি আঁকা ছোট্ট কার্ড বের করল, তাতে তানাকার অ্যাড্রেস লেখা। কিয়োতো নগরীতে তার বাড়ির ঠিকানা। কার্ডখানা তিলকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যেদিন সময় করতে পারবে, ফোনে জানালেই আমি এসে তোমাকে কিয়োতো নিয়ে যাব।

কিয়োতো!

হাঁ, জাপানের এককালের রাজধানী। প্রায় হাজার বছর ধরে রাজধানীর গৌরব নিয়ে বিরাজ করেছিল। টোকিয়োর মত একেবারে আধুনিক নয়, প্রাচীন আর নবীনের মিশ্রণ দেখতে পাবে ওখানে।

তোমার উষ্ণ আমন্ত্রণ পেলাম। অবশ্যই প্রথম সুযোগে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করব।

আমি ওখানে তোমাকে অনেক পাহাড়, কৃষিক্ষেত্র আর প্রাচীন মন্দির দেখাব। পাহাড়ে খাঁজ কেটে কেটে চায়ের চাষ দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

এত প্রলোভন দেখিওনা, তাহলে টোকিয়োতে আর একদণ্ড থাকতেও মন চাইবেনা।

তানাকা বলল, দুয়ের তুলনা কর না। টোকিয়ো-টোকিয়ো আর কিয়োতো-কিয়োতো। দুটি মেয়ে কিংবা দুটি পুরুষ কি স্বভাবে সৌন্দর্যে কখনো সমান হয়। আলোয় অন্ধকারে, ভালোয় মন্দে মিলে দুটিই স্বতন্ত্র এবং অনন্য।

তিলক বলল, সুন্দরকে দেখার শুধু চোখ নয়, একটি নিয়ত সজাগ মনও আছে তোমার।

তানাকা ছোট্ট হাত ঘড়িটার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, বন্ধুদের ডেরায় ফেরার সময় হয়ে গেছে। এখন তাই আর এক নতুন পাওয়া প্রিয়জনের কাছে বিদায় চাইছি।

তোমরা কাল সকলেই কি কিয়োতোতে ফিরছ?

তানাকা ম্লান হেসে মাথা নেড়ে জানাল, না।

মুখে বলল, আমি একাই কিয়োতো যাচ্ছি। অন্য দুজন ওসাকায়। তাদের ভেতর একজন, বন্ধুর বাড়িতে দুদিন থেকে নিজের বাড়ি হিরোশিমাতে চলে যাবে।

ওসাকা থেকেই ট্রেন ছুটবে হিরোশিমা?

হাঁ, দূরত্ব বেশ খানিকটা। প্রায় সন্ধ্যের মুখোমুখি ট্রেন পৌছবে হিরোশিমাতে।

কিছু যদি মনে না কর একটি অবান্তর প্রশ্ন করব।

অসংকোচে বল।

তোমাদের তিনজন কি একই ধরনের কোন কাজে যুক্ত আছ?

তানাকার মুখে আবার সেই মিষ্টি হাসির ছোঁওয়া। বলল, একেবারেই না। ওসাকার বন্ধু মিউকি সরকারি ফিসারি ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আর হিরোশিমার বন্ধু কিমিকো ওখানকার একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। আমার কাজের খবর পাবে কিয়োতো গিয়ে।

কৌতুকের গলায় তিলক বলল, ত্রিভুজের তিন কোণে তিনজনের বাস, মিলন হোল কি করে?

জাপানের নানা স্কুলের ছেলেমেয়েরা অক্টোবর নভেম্বরে স্কুলবাসে চেপে জাপান চষে বেড়ায়। সে সময় কিয়োতোতে আমার বাবার চায়ের বাগান দেখতে এসেছিল দু'তিনটে বাস বোঝাই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। ওখানেই মিউকি আর কিমিকোর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে নিবিড় বন্ধুত্ব, যা আজও অটুট।

তোমার বিদায় মুহূর্তে একটি কথা কিন্তু ভুলিনি তানাকা।

চোখে বিস্ময় চিহ্ন এঁকে তানাকা তাকাল তিলকের দিকে।

তুমি কথা দিয়েছিলে, আজ আমাকে কোতো বাজিয়ে শোনাবে।

আমার এক বন্ধু ঐ বাদ্যযন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আজ এখানে আসার আগে দেখি, ওটি বিগড়ে বসে আছে। সারিয়ে যে আনব, সে সময়টুকু হাতে ছিল না। কিছু মনে কর না তিলক, কিয়োতো গেলে আমি আমার কথা রাখব। এক জ্যোৎস্না রাতে তোমার যতক্ষণ খুশি আমি কোতো বাজিয়ে শোনাব।

তিলকচন্দন বলল, বেশ তাই হবে। তবে আজকের বিদায় মুহূর্তে দু ছত্র গানে আমার হৃদয়ের কথাটি জানিয়ে যেতে চাই।

তানাকা গভীর আবেগে বলল, আজকের এই জ্যোৎস্নাভরা রাতটুকু তোমার গানেই স্মরণীয় হয়ে থাক্ বন্ধু।

তিলকচন্দনের গলায় বেজে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান ঃ

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।।
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।।

জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।।

গাওয়া শেষ হলে তিলকচন্দন সহজ করে বুঝিয়ে দিল গানের অর্থটি। অমনি মুগ্ধ মগ্ন শ্রোতার কাছ থেকে এলো দ্বিতীয়বার গাইবার অনুরোধ।

গানটি আবার গাওয়া হল দরদ ভরা গলায়। তানাকার টলটলে চোখের জলে তখন জ্যোৎস্নার ইন্দ্রধনু ছায়া।

মিষ্টি গন্ধে ভরা একটুকরো রুমাল বের করে তানাকা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তিলকচনন্দনও। একটি মুখ আঁটা গোলাপী আভার খাম তানাকার হাতে ধরিয়ে দিল তিলক।

খামটা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না তানাকা। সে চোখের সামনে সেটি তুলে ধরল। খামের এককোণে প্রসারিত একটি ফুলন্ত চেরির ডাল। সে ডালে বসে আকুল হয়ে ডাকছে একটি পাখি।

খামখানা ব্যাগে ভরে নিয়ে চোখে মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বিদায় নিল তানাকা।

ট্রেন তখন কিয়োতোর দিকে আদ্দেক পথ এগিয়েছে। জানালার ধারে বসে সবুজে ছাওয়া চাষের ক্ষেত, গ্রাম্য কুটির আর টিলা পাহাড় দেখতে দেখতে স্বপ্নের অঞ্জন লেগেছে তানাকার চোখে। ঠিক এই সময়টিতে তার হাত চলে গেল ব্যাগের মধ্যে। সে আলতো আঙুলে তুলে আনল তিলকের দেওয়া খামখানা।

নতুন পাওয়া বন্ধুর দেওয়া খাম সে খুলল প্রাপ্তির এতগুলো ঘন্টার পরে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে কোন কিছু পাওয়ার যে আনন্দ তার স্বাদই আলাদা। তাই সে যখের ধনের মত এতক্ষণ আগলে রেখেছিল বন্ধুর দেওয়া খামখানাকে। চঞ্চল মন বার বার উঁকি ঝুকি মারছিল চিঠিখানা খাম থেকে বের করে আনার জন্য, কিন্তু সংযমের শাসনে তাকে বেঁধে রেখেছিল তানাকা।

চিঠির ভাঁজ খুলল কাঁপা কাঁপা হাতে। উৎসুক চোখের সামনে মেলে ধরল চিঠির পাতা। মাত্র তিনটি ছত্র, তাও অতি অল্প কয়েকটি শব্দ। একটি নিটোল জাপানী হাইকু যেন।

জীবন একটি ফুল,
ভালবাসা তার সুবাস,
মিলন তার মধু।
—বন্ধু তিলকচন্দন।

বার বার তিনটি ছত্র পড়তে লাগল তানাকা। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, কুঁড়ি থেকে জেগে উঠছে একটি ফুল। অপূর্ব মিষ্টি একটা গন্ধ বেরিয়ে আসছে তার ভেতর থেকে। অদৃশ্য মধুবিন্দু টলমল করছে তার গর্ভে।

এই তিনটি ছত্র জল স্থল আকাশ হয়ে তানাকার ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করে ফেলল।

তিন

রঙীন কাপড়ে তৈরী উড়িষ্যার ছোট বড় নানা সাইজের বটুয়ামণিগুলি (ভ্যানিটি ব্যাগ) একসময় বাংলার গ্রামে গঞ্জে শহরে বহুল প্রচলিত ছিল। তেমনি একটা ব্যাগ ফ্যামিলি সাইজ বড় একখানা সুটকেশের ভেতর থেকে বের করে দোলাতে দোলাতে ড্রইংরুমে নিয়ে এল তিলকচন্দন। একুশ বছরের তরতাজা সুদর্শন যুবা পুরুষ।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর ড্রইংরুমের সোফায় বসে আরাম করেন সুমিতা দেবী। দ্বিপ্রহরের আহারান্তে

নিদ্রার অভ্যেস নেই তাঁর। হাতে থাকে এমব্রয়ডারির কাপড় আর ছুঁচ সুতো। কাঁচিটা পড়ে থাকে সামনের টেবিলে। সামান্য তন্দ্রা এলেই হাতটা থেমে যায়। কিন্তু ছুঁচ গলে পড়ে না হাত থেকে। মুহূর্তেই আবার সজাগ।

তিলকচন্দন এ সময় কলেজ থেকে আউটডোরে স্কেচ করার জন্য বেরিয়ে আসে। সে বৌদির সঙ্গে গল্প করতে করতে লাঞ্চ সারে। তারপর এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ে স্কেচের খাতা নিয়ে। বাঁশঝাড়, বাড়িঘর, জনস্রোত কোনও কিছুই তার হাতের স্কেচ থেকে বাদ যায় না।

তিলকচন্দনের পায়ের সাড়া পেয়ে ড্রইংরুমের ভেতরের দরজার দিকে তাকালেন সুমিতা দেবী।

কি হল, আজ এখনও স্কেচ করতে বেরোওনি?

আজ বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলা, যাত্রা নাস্তি।

এটা জাপান, ভারতবর্ষ নয় দেবরজী।

আজ একটা বিশেষ জিনিস তোমার কাছে এনেছি, তোমার হাত দিয়েই তার উদ্বোধন হবে।

কি ভাই? আমার মতো অখ্যাতের ওপর উদ্বোধনের ভার!

জিনিসটা অকিঞ্চিৎকর বৌদি, কিন্তু আমার কাছে এ বস্তু প্রাণের চেয়েও প্রিয়। অসীম এর মূল্য।

আমাকে কেন হেঁয়ালির ভেতর ফেলে দিচ্ছ, তাড়াতাড়ি খুলে বল।

তিলকচন্দন মুখ বাঁধা বটুয়াটি সুমিতার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এর ভেতর রয়েছে আমার মায়ের স্মৃতি। মারা যাওয়ার আগে মা আমার হাতে এটি তুলে দিয়ে বলেছিল, যত্ন করে এটি তোমার কাছে রেখে দাও। একুশ বছর পূর্ণ হলে তুমি এর মুখ খুলবে।

সুমিতা বললেন, মায়ের আদেশ তোমাকেই পালন করতে হবে ভাই, তুমিই খুলবে এর মুখ।

তিলকচন্দন বলল, খুলতে গেলে আমার হাত কাঁপবে। তুমি একাধারে আমার বৌদি আর মা। তোমার স্নেহের হাতের ছোঁয়া এর ওপর একবার রাখো, তারপর আমি নির্ভয়ে এটা খুলব।

মায়ের দান, ভয়ের তো কিছু নেই ভাই,—বলতে বলতে মমতার হাত বুলিয়ে দিল মায়ের স্মৃতিমাখা বস্তুটির ওপরে।

এবার বহু যত্নে মুখের বাঁধন খুলে ফেলল তিলকচন্দন। হাত ঢুকিয়ে সে টেনে আনল বাঁধানো, পুরানো একটি খাতা, একেবারে নীচ থেকে উঠে এল সূক্ষ্ম কাজ করা একটি সুদৃশ্য সোনার আংটি, ডালিম দানার মতো একটুকরো চুনি তার ওপর জ্বলজ্বল করছে।

আংটির সঙ্গে ছিল একচিলতে কাগজ। তাতে লেখা ছিল, তোমার জন্মদাতা একদিন এটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন। জীবনে আমি নানাদিক থেকে নিঃস্ব হয়েও এ আংটিটি খোয়াইনি। এটি আমার পুত্রবধূকে দেব এই ইচ্ছাই ছিল। সেটা নিজে পূর্ণ করে যেতে পারলাম না, তুমি আমার হয়ে মায়ের স্মৃতিটুকু তার হাতে তুলে দিও।

এবার ওই খাতার ভেতর কি আছে তা তুমিই প্রথম খুলে দেখ বৌদি।

সুমিতা তিলকের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে তার মলাট খুললেন। প্রথম পাতার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আমার কথা।

সুমিতা বললেন, এটি তোমার মায়ের স্মৃতিকথা বলে মনে হচ্ছে।

মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে তিলকচন্দন ঝুঁকে দেখতে লাগল লেখাটা।

হাঁ, এটা আমার মায়ের হাতেরই লেখা। তুমি লেখার শেষ পাতাটা একবার উল্টে দেখো তো বৌদি।

তিলকের কথামতো সুমিতা লেখার শেষ অংশটি ওল্টালেন।

শেষ ছত্রের নীচে লেখা আছে,—বাগীশ্বরী।

হাঁ, এ আমার মায়েরই নাম।

সুমিতা বললেন, তোমাদের পদবীটা কী তা আজও আমাদের জানা হয়নি ভাই। তোমার দাদা আর আমি এতকাল সঙ্কোচে তোমাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

ইস্কুলে ঢোকার সময় মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। তখন আমার মনে আছে, ইস্কুলের কেউ যেন আমার পদবীটা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

মা বলেছিল, আমার ছেলের নাম তিলক আর তার পদবী চন্দন।

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করেননি।

সুমিতা জানতে চাইলেন, তোমার বাবা যখন মারা যান তখন তুমি কত বড় ?

চার বছর বয়স পর্যন্ত আমি আমার জন্মদাতাকে দেখেছি, তারপর আর দেখিনি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কি মারা গেছেন তা আমি জানি না।

বড় হয়ে তুমি মা-কে বাবার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করনি?

কোনও দিনই না। অকারণ কৌতূহল আমার কখনও ছিল না, আজও নেই।

আশ্চর্য! নিজের বাবার কথা জানতে তোমার ইচ্ছে হয়নি?

কতটুকুই বা তাঁকে দেখতে পেতাম। বস্তির একটা কুঁড়েঘরে বড় কষ্টে আমার আর মায়ের দিন কাটত। বড় হয়েও দেখেছি, আমার মা বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করে বেড়াত।

তুমি লেখাপড়া শিখলে কি ভাবে? গানই বা শিখলে কার কাছে?

স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত কিন্তু মা-ই আমাকে পড়িয়েছে। গানও শিখেছি তার কাছ থেকে।

সুমিতা আবারও বললেন, আশ্চর্য! তোমার মা কেবল শিক্ষিতাই নন, অশেষ গুণে গুণী। কিন্তু এরকম একজন গুণবতী মহিলা লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করছেন, এটা আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না।

আমার মা-কে অর্থ দেবার মতো কেউ ছিল না, আর মা নিশ্চয় কোনও কাজকে ছোট বলে ভাবত না।

তুমি বড় হয়ে তোমার মাকে তার অতীত সম্বন্ধে কোনও কিছু প্রশ্ন করনি?

আগেই বলেছি, আমার কৌতূহল কম, অযাচিত হয়ে আমি কাউকে কোনও প্রশ্ন করতাম না। আমার মায়ের উপস্থিতিটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা। তোমার অনেক প্রশ্নের, অনেক কৌতূহলের জবাব হয়তো তুমি মায়ের এই লেখা থেকেই পেয়ে যাবে। আমিও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পেতে পারব।

তুমি পড়বে, না আমি পড়ব?

তুমি পড়ো, আমি শুনি।

সুমিতা তিলকচন্দনের মায়ের স্মৃতিকথাটি পড়তে শুরু করলেন।

আমার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। অত্যন্ত মার্জিত ও সংস্কারমুক্ত মন ছিল তাঁর। আমি তাঁর মাতৃহারা একমাত্র কন্যা। তাই বুকে করে আগলে রাখতেন আমাকে। সে সময় মফস্বল শহর অথবা পল্লীগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষ চল ছিল না। আমাদের গ্রাম থেকে দু-মাইলের ভেতরে ছিল মহকুমা শহর। সেখানে এক জমিদার নতুন একটি কলেজ পত্তন করেছিলেন। বাবা সেখানে সংস্কৃত পড়ানোর কাজ পেয়েছিলেন।

বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতেন। গ্রামের এক পিসি আমার দেখাশোনা করত।

শহরে একটি ব্রাহ্মসমাজ এবং উপাসনার মন্দির ছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হত। বাবা ওই সভায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। আগেই বলেছি, বাবা ব্রাহ্মণ হলেও কোনরকম গোঁড়ামি ছিল না তাঁর। তিনি মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ উৎসবে যোগ দিতেন। ওইখানে গান শুনে শুনে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত হয়ে যান।

আমি একটু বড় হলে বাবা আমাকে টাউনে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। বাবার সঙ্গে যেতাম, বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে আসতাম।

ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই, অঙ্ক আর সংস্কৃতে আমার লেটার মার্কস ছিল।

বাবা আমার জন্যে আর একটি ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন তাঁর ক্লাসে আমাকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

আমি সব কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করতাম। আমার গানের গুরু খুবই প্রশংসা করতেন আমার গলার। অনুষ্ঠানে আমি গানের দলে যোগ দিতাম। আমাকে দিয়ে একক সংগীতও গাওয়ানো হত।

মফস্বল কলেজে তখন কো-এডুকেশন ছিল না, আর কলকাতা কলেজে আমাকে হোস্টেলে রেখে পড়ানোর সঙ্গতিও ছিল না বাবার।

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মনের মধ্যে। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হয়নি।

এরকম একটা অবস্থায় ম্যাট্রিক পাসের পর আমি ঘরে থাকতেই বাধ্য হলাম। সপ্তাহে মাত্র একদিন করে বাবার সঙ্গে যেতাম গানের ক্লাসে যোগ দিতে।

বাবা, সংসারী মানুষ ছিলেন না। ছোটবেলা থেকেই আমি গুছিয়ে সংসারের কাজ করতে পারতাম। গ্রাম সুবাদে পিসি আমাকে সাহায্য করত।

এখন পুরো সংসারের ভার আমার ওপর এসে পড়ল।

আমার যে বিয়ের বয়স হয়েছে এ সম্বন্ধে বাবার চেতনাই ছিল না। অবসর সময়ে বইপত্রের ভেতর ডুবে আছেন আর আমার মুখ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছেন, এতেই ওঁর তৃপ্তি আর জীবনের পূর্ণতা বলে মনে করতেন।

আমাদের গ্রামের জমিদার ছিলেন শশাঙ্ক বিশ্বাস। বেশ ডাকসাইটে জমিদার। পালা-পার্বণের ঘটা ছিল। জমি জিরাত নিয়ে মার দাঙ্গায় দল দল লেঠেলও পাঠাতেন।

পাশেই বরোজ নদী। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে যে রসুলপুর নদীর উল্লেখ আছে, তারই এক অংশের নাম বরোজ। ঐ নদীর ঘাটে বাঁধা থাকত জমিদার বিশ্বাসদের বজরা। শহরের ইয়ার দোস্ত নিয়ে মাঝে মাঝে ঐ বজরা-বিহার হত।

তিন চারখানা গাধাবোট বাঁধা থাকত নদীর ঘাটে।

এই পর্যন্ত পড়ে থামলেন সুমিতা দেবী। তিলকের দিকে তাকিয়ে বললেন, গাধাবোট কাকে বলে তিলক?

সঠিক আমি জানিনা, তবে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যখন নৌকোর স্কেচ করে ঘুরতাম তখন গাধাবোটের নামটা একবার আমার কানে এসেছিল। অনেককিছু বোঝাই নিয়ে মেদিনীপুর থেকে এসেছিল বোটগুলো।

সুমিতা বললেন, আমার মনে হয়, গাধার পিঠে যেমন অনেক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি অনেক ভারি বোঝা নিয়ে যে বোট চলে তাকে হয়তো গাধাবোট বলে।

তোমার এ ধারণাটা মনে হয় সঠিক।

সুমিতা বললেন, অনুমানমাত্র। ওগুলোর আসল নাম, গাধাবোট না হয়ে গাদাবোটও হতে পারে। যেমন বারুদ ঠাসা বন্দুককে বলে গাদাবন্দুক। কিংবা খড়ের গাদা।

তিলক বলল, একটু চেষ্টা করলে তুমি গবেষক হতে পারতে বৌদি।

তোমার কমপ্লিমেন্টের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু এখন আসল কাহিনীতে ফিরে যাব।

তিলক বলল, শুরু কর।

সুমিতা বললেন, আমার জানতে ভারি ইচ্ছে করে, তোমার মা কি কোন প্রসঙ্গে তোমার অধ্যাপক দাদামশায়ের কথা তোমাকে একবারও বলেননি?

অতীত জীবন সম্বন্ধে মা একেবারে নীরব ছিল বৌদি। তাছাড়া আগেই তো বলেছি, কৌতূহল ব্যাপারটা আমাকে কখনও খোঁচা দেয় না।

একটা জিনিস কিন্তু আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কি বৌদি?

তুমি স্বভাবে ভবঘুরে হতে পার কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল নও। তোমার দাদামশায় সমাজের এক সম্মানীয় ব্যক্তি। তোমার মা এমন গুণবতী মহিলা। আচ্ছা, এবার তোমার মায়ের স্মৃতিকথাটা পড়া যাক্। হয়ত এর ভেতের থেকে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

শুরু হল পড়া ঃ

ঐ গাধাবোটগুলোতে জমিদার বাড়ির ক্ষেত খামারের মালপত্র বোঝাই হয়ে বিক্রির জন্য কলকাতায় যেত।

জমিদারদের তত্ত্বাবধানে বাশুলির জাত হত প্রতিবছর। নৌকোর ভিড় নদীতে, মেলা জুড়ে দোকানপাট, কেনাকাটা, হৈ চৈ, বাদ্যি বাজনা।

মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল দুটো জিনিস। একটি, শেষবেলায় মেলাসংলগ্ন মাঠে ঘোড় দৌড়। ঘোড়সওয়াররা দৌড় শুরু করত নদীতীর থেকে। একেবারে শেষ হত মেলা-সংলগ্ন মাঠে এসে।

এই দৌড় দেখার জন্য মেলা যেন ভেঙে পড়ত।

অন্য আকর্ষণটি ছিল রাতের বাজি। কলকাতা থেকে জমিদারবাবুরা নানা ধরনের বাজি আনাতেন। মেলার শেষে বাজির আলোয় ঝলমল করে উঠত সারা আকাশ। অবাক হয়ে সে সব দেখত গ্রামগ্রামান্তের মানুষরা।

অনেক রাতে তারা বাশুলি মায়ের জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ি ফিরত।

জমিদারবাড়িতে পূর্বে কোন বিশেষ পারিবারিক অঘটনের জন্য শারদীয় দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে যায়। তাই মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হোতো বাসন্তী পূজা।

এই পূজা-উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল যাত্রাপালা।

যাত্রার আসর সাজানো হত দেখবার মত। বিশাল সামিয়ানা মাথার ওপরে। গাঢ় লাল শালুর ওপর চক্রাকার পিপ্‌লির কাজ। সবুজ, হলুদ, কালো আর ফিকে লাল দিয়ে ঘোড়া, হাতি, পাখি আর ফুল লতাপাতার চক্রাকার সারি। সামিয়ানার কেন্দ্রে ছোট ছোট লাল পাপড়িওয়ালা সহস্রদল পদ্ম।

চারকোণে ঝুলছে চারটে ঝাড়ের আলো। মাঝখানে থরে থরে সাজানো শত দীপের চোখ জুড়ানো ঝাড়। পলতোলা বেলোয়ারী কাচের ঝালরে আলো পড়ে রামধনু ঝলকাচ্ছে।

সামিয়ানার নীচে একদিকে অনুচ্চ রেলিং ঘেরা চৌকোণা যাত্রার মঞ্চ। সেখানে একদিকে সারি দিয়ে বসে আছে বাজনদাররা। তাদের সামনে একটা রেকাবিতে টুকরো টুকরো মিছরি আর কাবাবচিনি।

মঞ্চের অপর দিকে অমনি ঘেরা জায়গার ভেতর আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে বাবুদের বসার জন্য ফরাস পাতা। বাবুরা কোলে ধবধবে সাদা তাকিয়া গুঁজে আয়াস করে বসে থাকেন।

যাত্রা-মঞ্চের তিনদিক ঘিরে আসর। পলখড়ের আস্তরণের ওপর সতরঞ্চি পাতা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একেবারে সামনে বসে। তাদের কলরব আর উৎসাহের অন্ত নেই। যাত্রাপালার ভেতরে যখন কেউ বিলাপের সুরে গান গায় আর বেহালাবাদক করুণ সুরে বেহালা বাজায় তখন বাচ্চা ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়ে। আবার যখন যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তলোয়ারের ঝনঝনা শুরু হয় তখন সবকটা বাচ্চা জেগে উঠে বড় বড় চোখ মেলে যুদ্ধ দেখতে লেগে যায়। এ দৃশ্য তাদের উত্তেজনার খোরাক যোগায়।

চাওড়া ঠাকুরদালানে চিকের আড়ালে বসে যাত্রাপালা উপভোগ করে গ্রামের বিশিষ্ট বাড়ির নিমন্ত্রিত মেয়েরা। জমিদার বাবুর বাড়ি থেকে পাল্‌কি পাঠানো হয় তাদের যাত্রার আসরে নিয়ে আসার জন্য। গোলাব পাশ, আতরদান থেকে তাদের ওপর ছড়ানো হয় সুগন্ধী জল। ঝকঝকে মাজা পেতলের ডাবর থেকে মেয়েরা সাজা পান তুলে তুলে খায়। কত সব মশলা, কি তার স্বাদ!

জমিদার শশাঙ্ক বিশ্বাসের এক ছেলে তিন মেয়ে। ছেলেটি কলকাতায় তার মামার বাড়িতে থেকে নাকি পড়াশোনা করে। তাই তাকে আমি কোনদিন চোখে দেখিনি। কিন্তু একদিন তার সঙ্গে বাশুলির জাতে আমার আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল। আমি তখন সতের বছরের মেয়ে আর জমিদার শশাঙ্ক বিশ্বাসের ছেলে জয়তিলক পঁচিশ বছরের পূর্ণ যুবক।

পরে জেনেছিলাম, বাশুলি মেলায় আর বাসন্তী পূজায় সে বেশ কয়েকদিনের জন্য ঘরে আসে। মৃত্যুর সময় জমিদার শশাঙ্ক বিশ্বাসের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে একটি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সে অনুরোধটি হল, জমিদারি ঐশ্বর্যের ভেতর তাঁর ছেলেটি যেন শিশুকাল থেকে বেড়ে না ওঠে।

স্ত্রীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী জমিদার বিশ্বাস তাঁর বালক পুত্রটিকে কলকাতায় মধ্যবিত্ত শ্বশুর মশায়ের হেপাজতে রেখে আসেন। ছেলে শিক্ষিত হয়ে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হলে তাকে সংসারী করে জমিদারী সমর্পণ করবেন, এই ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে।

জয়তিলক ম্যাট্রিক পাশ করার পর ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলে ঢোকে। সেখান থেকে যথাসময়ে প্রথম স্থান অধিকার করে বেরোয়।

ছেলের ইচ্ছাপূরণের জন্য জমিদার বিশ্বাস চৌরঙ্গী পাড়ায় একটি ঘর ভাড়া করেন। সেখানেই তৈরি হয় জয়তিলকের স্টুডিও।

আর ঠিক সেই সময়ই বীর্যবান এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবকের সঙ্গে এক সপ্তদশী গ্রাম-কন্যার দেখা হয়ে যায় বাশুলি মেলায়, সোনা ঝরানো এক দিনান্তে।

এই পর্যন্ত পড়ে সুমিতা থামলেন। পরক্ষণেই মুখ তুলে বললেন, তোমার মা অনন্যা, তিলক। ছোট বড় সবকিছুকে নিবিড়, গভীরভাবে দেখার চোখ, তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছে।

মা আমাকে স্কুল পর্যন্ত পড়িয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, স্কুলের একজন বাংলা স্যার ছাড়া আর কারু পড়ানো আমার মায়ের পড়ানোর মত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়নি।

সুমিতা বললেন, তাঁর ডায়েরিতেই সে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, এবার আমরা একটা রোমান্টিক নভেলের পাতা ওল্টাতে চলেছি। যার প্রতিটি ছত্রে বাস্তব সত্যের ছোঁয়া পাওয়া যাবে।

এবার আবেগভরা গলায় বললেন, তুমি তোমার মায়ের জন্য গর্ববোধ করতে পার তিলক।

আত্মমগ্ন দৃষ্টিতে তিলকচন্দন তাকিয়ে রইল সুমিতা বৌদির মুখের দিকে। কোন কথা বলতে পারল না।

পড়া শুরু হল ঃ

বাশুলি মেলায় শেষবেলা শুরু হল ঘৌড়দৌড়। মেলা ভেঙে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে দৌড় দেখতে। আমি আগেভাগে পিসির হাত ধরে সীমানা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি।

আশপাশে গাছে উঠে বসেছিল যে সব লোক তারা চেঁচাতে লাগল, ঐ দেখা যায়, ঐ দেখা যায়!

আগেই উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছিল, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পনের জন ঘোড়সওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এখন সেই ঘোড়াগুলো ছুটতে শুরু করেছে বরোজ নদীর চওড়া তীর বরাবর। কিছুদূর গিয়েই ওরা লোকাল বোর্ডের অপেক্ষাকৃত নিচু বাঁধে নামবে। ঐ নামার সময় ডিঙিয়ে আসতে হবে বড় বড় মাটির ডেলা। তারপর কিছুপথ মসৃণ রাস্তায় দৌড়। শেষে পেরোতে হবে একটা মাঠ। মাঠের শুরুতেই হাত ছয়েক চওড়া একটি জলনিকাশী নালা। ওটাকে ঘোড়ার পিঠে চড়েই লাফিয়ে পেরোতে হবে।

গাছের উঁচু ডালে যারা আগে ভাগে এসে উঠে বসে আছে, তারা পুরো দৌড়টাই দেখবার সুযোগ পাচ্ছে। নীচে দাঁড়ানো লোকেরা শুধু শেষ দৌড়টুকু দেখতে পায়। ঐ মাঠটুকু পেরিয়ে আসার সময়।

গাছের ওপর থেকে আবার বলছে, রাস্তার মাঝামাঝি এসে গেছে।

ঐ যে লাল ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে। ঘাড়ের কেশরগুলো আগুনের মত ঝলকাচ্ছে। সামনের সাদাটাকে টপকে চলে এলো। এখন অনেকটা পেছনেই ফেলে দিয়েছে সব কটাকে। সওয়ার এখন ঘোড়ার ওপর আধখানা উঠে দাঁড়িয়েছে।

পেরিয়ে এলো, পেরিয়ে এলো, লাফ দিয়ে পেরিয়ে এলো নালা।

এবার সবার চোখের সামনে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো।

একি? লাল ঘোড়াটা সবার আগে এসে দড়ি না ছুঁয়ে যে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘোড়সওয়ার অতি সুদর্শন, শক্তিমান এক যুবক।

আমি তখন উত্তেজনায় কাঁপছি। সীমানার দড়ি ছোঁয়ার জন্য প্রবলভাবে হাত নেড়ে যুবকটিকে ডাকতে লাগলাম।

হঠাৎ তার দৃষ্টি আমার দিকে পড়ল। সে হেসে তার ডানহাতখানা তুলে নাড়ল।

আমি এই যুবকটির হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার কারণ বুঝতে পারলাম না।

পাশ থেকে পিসি বলল, একে চিনতে পারলি না?

না তো।

জমিদারবাবুর ছেলে রে।

কি নাম?

জয়তিলক বিশ্বাস।

মনে মনে তারিফ করলাম, দেখতে যেমন সুন্দর, নামটিও তেমনি।

ম্যাট্রিক পাসের পর সুযোগ ছিল না কলেজে পড়ার। টাউনের কলেজে তখন কেবল ছেলেরাই পড়ত।

আমার বাবা অনেক বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের আট বছর পরে আমার জন্ম। আমার ম্যাট্রিক পাশের পর বাবা রিটায়ার্ড করেন। তখন কলেজের মাইনে ছিল অত্যন্ত কম। বিঘে তিনেক চাষের জমি আর গোটা চারেক ফলন্ত নারকেল গাছ। এতেই তিনটি প্রাণীর প্রাণধারণ।

আজকাল টাউনে গান শিখতে যাই একাই। বাবাকে সঙ্গী করে আর কষ্ট দিতে চাই না।

আমার টাউনে একা যাওয়া আসার ব্যাপারে বাবা প্রথম দিকে খুব উদ্বিগ্ন হতেন। তারপর ধীরে ধীরে সব সয়ে যায়।

ঘোড়দৌড়ের পরের দিন ছিল রোববার। ঐ দিন ব্রাহ্মসমাজের প্রেয়ারের পর আমার গান ছিল।

আমি মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরার জন্য হাঁটছিলাম। হঠাৎ পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে জয়তিলক বললেন, কোথায় চলেছ বাগীশ্বরী?

আমি হেসে বললাম, আপনি আমার নামটাও জেনে ফেলেছেন দেখছি।

ও ঘোড়া থেকে নামতে নামতেই বলল, বাঃ, এক গাঁয়ের মানুষ আর নাম জানব না! আজ ভোরবেলাতেই তোমার পিসির সঙ্গে দেখা...।

তার কাছ থেকেই তা হলে আমার নামটা জানা হয়েছে।

উপায় কি বল? তুমি হাত নেড়ে আমাকে সীমানা ছুঁতে ডাকলে, তার পর মিলিয়ে গেলে ভিড়ের ভেতর। মেলা শেষে তোমাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, আপনি সবার আগে এসে হাতচারেক দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন, এ রহস্যের সমাধান আমি এখনও করে উঠতে পারিনি।

ঘোড়ার রশি ধরে টানতে টানতে জয়তিলক আমার সঙ্গে চলছিল। চলতে চলতে বলল, এটা তো আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে জমিদারবাবুর একমাত্র পুত্র ঘোড়দৌড়ের পুরস্কারটা জিতে নিল, এটা কি ঠিক, লোকেই বা কি বলবে।

আমি হেসে বললাম, এর ভেতর এত রহস্য আমি বুঝতে পারিনি। আপনি দাঁড়িয়ে গেলেন দেখে আমার খুব খারাপ লেগেছিল।

জয়তিলক বলল, সবাই দেখল আমি অনেকটা ব্যবধানে জিতে গেছি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি দানটা ছেড়ে দিতে পারি। সেই সাদাঘোড়ার সওয়ারকেই আমি জেতার সুযোগ করে দিলাম। কারণটা কি জানো? একটা কারণ আগেই বলেছি। দ্বিতীয় কারণটা হল, নদীর ওপারে নবীনকান্ত রায়েদের জমিদারী। ওদের সঙ্গে আমাদের তিনপুরুষের বিবাদ। লাঠালাঠি হয়েছে অনেক। প্রতিবারই বিশ্বাসরা

জয়ী হয়েছে। এবার ও এসেছে ওদের প্রতিনিধি হয়ে। যুদ্ধে তো পারে না তাই ঘোড় দৌড়ের দান ছেড়ে দিয়ে ওকে একটা জয়ের স্বাদ দিলাম।

আপনি পারেনও বটে, শত্রুকেও মিত্র করে নিতে জানেন।

আমি কিন্তু একটা জিনিস পারি না।

কি ?

অচেনাকে অন্তরঙ্গ বানাতে পারি না।

তাই—বলে দুজনেই হেসে উঠলাম।

সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। তারপর দুজনের ভেতরে ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি সময় লাগেনি। হয়তো আমি তার রূপে মুগ্ধ ছিলাম অথবা কথার যাদুতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার দিনরাত্রির ভাবনা ছিল জয়তিলককে ঘিরে। ও চলে গেল কলকাতা আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

দু-তিনবার আসা-যাওয়া করল ও। এর পর ওকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারব না, এটা গভীরভাবে অনুভব করলাম। কিন্তু তখন সমাজে জাতিভেদ প্রবল। বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমি জানতাম, আমাদের মিলনে কোনওভাবেই তাঁর আশীর্বাদ পাওয়া যাবে না।

সবদিক ভেবে আমি স্থির করলাম, গৃহত্যাগই করব।

জয়তিলক বলল, আমি গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার ঠিক পাঁচদিন পরে অমাবস্যার রাতে তুমি বরোজের ঘাটে এসে দাঁড়াবে। রাত দশটা নাগাদ আমি কলকাতা থেকে নৌকো নিয়ে ওই ঘাটে হাজির থাকব। কেউ জানবে না যে তুমি আমার সঙ্গেই গৃহত্যাগ করেছ।

কথামতো আমি নির্দিষ্ট দিনে তৈরি হলাম।

অমাবস্যার অন্ধকারে সমস্ত গ্রাম নিঃঝুম। শীতের রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। আমি ঘুমে অচেতন বাবার পায়ের কাছে প্রণাম করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। হু হু করে বুক থেকে উঠে এল কান্না। আমি দুটো হাত জোড় করে মনে মনে বললাম, তোমাকে ছেড়ে আজ বহুদূরে চলে যাচ্ছি। শুধু জেনো, আমি এমন কাজ কখনও করব না যা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার অযোগ্য।

ওর সঙ্গে চলে এলাম কলকাতায়। তারপর শুরু হল আমার নতুন জীবন।

জয়তিলক আগের মতোই থাকত তার মামার বাড়িতে, আমাকে রাখল বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করে।

আমি মাসখানেকের ভেতরেই বস্তির মানুষদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলাম, কারণ, বস্তির ছেলেমেয়েদের আমি বিনি পয়সায় পড়াতে শুরু করেছিলাম।

আমার মাথায় সিঁদুর ছিল কৌতূহলী মেয়েরা তাই আমার বরের কথা জিজ্ঞেস করত।

আমি বলতাম, ভালোবেসে বিয়ে করেছি, এখন বর থাকে তার মামার বাড়িতে আমাকে তাই এখানে এসে উঠতে হয়েছে। আমার বরকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

ওরা ছেলেমেয়ের ব্যাপারে আমার কাছে এতই উপকার পাচ্ছিল যে আমার বিরুদ্ধে কোনওরকম বিরূপ মন্তব্য করতে পারেনি।

মাঝে মাঝে জয়তিলক যখন আমার কাছে আসত তখন বস্তির মেয়েদের ভেতর সাড়া পড়ে যেত।

আমি বস্তিতে থাকলেও জয়তিলকের সঙ্গে প্রায়ই ওর স্টুডিওতে চলে যেতাম। সেখানে আমাকে মডেলের কাজ করতে হত। আমাকে নিয়ে ও বহু ছবি এঁকেছিল। সেসব ছবির এগজিবিশান হয়েছিল দু-তিনবার। সেই উপলক্ষে একবার আমরা বাঙ্গালোরেও যাই।

ওর অনেকগুলো ছবি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল মোটা টাকায়। পুরো টাকাটাই আমার জন্যে খরচ করেছিল ও।

বলেছিলাম, টাকাটা তোমার কাছেই রাখো।

ও বলেছিল, ছবিটা এঁকেছি আমি কিন্তু আমার সমস্ত ভাবনা ও কাজ তোমাকে জড়িয়ে।

এর পর জন্ম নিল তিলকচন্দন। ওর বাবাই নামটা রেখেছিল। নিজের নামের তিলকটা ছেলের

কপালে পরিয়ে দিয়েছিল আর চন্দনের পবিত্রতা ও সুগন্ধ ভরে দিয়েছিল তার মধ্যে।

আমাদের কলকাতাবাসের মাস দুয়েক পরে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে ও একবার দেশে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসেছিল একটি মর্মান্তিক সংবাদ সঙ্গে নিয়ে।

প্রথমে সংবাদটি শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। শেষে যখন সত্য বলে জানলাম তখন তিনদিন আমি কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারিনি। একবিন্দু জলও মুখে তুলতে পারিনি।

সংবাদটা বাবার মৃত্যু নিয়ে।

আমার গৃহত্যাগের মর্মান্তিক আঘাতে তিনি নাকি অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন। ওইভাবে দশদিন থেকে মেয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করেন।

বাবার মৃত্যুর কারণ হলাম আমি,—এই অপরাধের সান্ত্বনা আমি কোনও দিনই পাইনি।

এই পর্যন্ত এসে বৌদি থামলেন।

দেখ তিলক, তোমার মা কঠিন সত্যগুলোকে কোনওরকম আড়াল না দিয়ে কত অকপটে প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজেই বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে যেন একুশ বছর বয়স হলে তাঁর ডায়েরীটা পড়ে দেখে। কতখানি সত্য থাকলে মা অসঙ্কোচে সন্তানের কাছে একথা প্রকাশ করতে পারেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

এই ডায়েরী পড়তে গিয়ে আরেকটি কথা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ভাই।

তিলকচন্দন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল সুমিতা বৌদির মুখের দিকে।

তোমার ভিতরে যে শিল্প প্রতিভা, তা তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ তোমার বাবার কাছ থেকে।

তিলকচন্দন বলল, এই মুহূর্তে আমি সেকথাই ভাবছিলাম।

তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আজ আমি তোমাকে অকুণ্ঠভাবে একটি কথা জানাব।

কি বৌদি? মায়ের ডায়েরী শুনে আজ আমি অভিভূত হয়ে গেছি। বর্ষার জলে ধুয়ে প্রকৃতি যেমন নির্মল হয়ে যায় আমার ধুলিমলিন মনটাও তেমনি আজ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সুমিতা বললেন, যতক্ষণ আমি তোমার পিতৃপরিচয় পাইনি ততক্ষণ মানবতার আবরণে পথের একটি ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এবার একটি উপমা দিয়ে আমার মনের কথাটা বলি।

নির্মল ঊষা যেমন আলোয় ভরা সূর্যের জন্ম দেয়, তোমার মা-ও আজ তোমাকে সকলের চোখে তেমনি উজ্জ্বল করে তুলে ধরলেন।

তিলকচন্দনের সারা মুখ তখন অপার্থিব এক আলোকের স্পর্শে উদ্ভাসিত। তার চোখ দুটি শুধু চিক চিক করছিল জলের ছোঁয়ায়। মনের এতখানি আনন্দ উপচে পড়ছিল অশ্রুলেখায়।

সুমিতা বললেন, এসো, শেষ কটি পাতা আমরা পড়ে নি।

সাগ্রহে বৌদির মুখের দিকে তাকাল তিলকচন্দন।

সুমিতা পড়া শুরু করলেন ঃ

তিলকের জন্মের পর চার বছর পর্যন্ত আমি মাঝে মাঝে স্বামী-সান্নিধ্য পেয়েছি। জয়তিলক কখনো আমার সঙ্গে বস্তিতে কাটায়নি। সে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতো। আমি তার সঙ্গে স্টুডিওতে বেরিয়ে যেতাম। হয়তো দুদিন ওখানেই থেকে যেতাম। কিন্তু বেশীদিন স্টুডিওতে থাকার উপায় ছিল না। ওর বন্ধুরা মাঝে মাঝে চলে আসত। তাছাড়া ওর এক মামাতো ভাইও পথ চলতি কখনো সখনো ঢুকে পড়তো স্টুডিওতে।

একবার তো ওর বাবা এসে পড়লেন। আমি তখন স্টুডিওর পাশে এক চিলতে চা তৈরীর ঘরে বন্দী। প্রায় ঘন্টা খানিক ঐ ঘরে আটকে থাকতে হয়েছিল আমাকে। বাবা চলে যাবার পর ও তালা খুলেছিল। সেই দমবন্ধ ঘর থেকে আমি বেরিয়েছিলাম গলদঘর্ম হয়ে।

সে সময় পিতাপুত্রের কয়েকটি কথা আমার কানে এসেছিল।

বাবা বলছিলেন, তোমার মা নেই। তিনিই তো এতবড় সংসারটাকে ধরে রেখেছিলেন। এখন একে একে তোমার তিনটি বোন চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি। এবার আমি এতবড় সংসারে একলা। আমার

বয়েস হয়ে গেছে। আমি একা তো আর পেরে উঠছিনা বাবা। তুমি সংসারী হও, হাল ধর জমিদারীর। শূন্য সংসারে গৃহলক্ষ্মী আসুক, আমি শেষ বয়সে নিশ্চিন্ত হই।

ও বাবাকে পথে এগিয়ে দিয়ে এসে আমার ঘরের তালা খুলল। আমি দেখলাম, ওর মুখখানা থমথম করছে।

আমি যে ওর বাবার কথাগুলো সব শুনেছি, তা ওকে বলে আর বিব্রত করতে চাইলাম না।

দু-চারদিন পরে যখন ওর সঙ্গে আমার দেখা হল, তখন কথায় কথায় বলল, বাবা দেশে চলে গেছেন কিন্তু আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন একটা দুশ্চিন্তার বোঝা।

কি রকম?

ও কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ না তুলে সম্পূর্ণ অন্য কথা পাড়ল।

ও বলল, বাবা ইদানিং চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিলেন না। আমি চোখের ডাক্তারকে দেখালাম। তিনি দেখেশুনে একটা ওষুধ দিলেন। তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, চোখের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়, ওষুধটা দিতে থাকুন, যদি কিছু ইমপ্রুভ করে।

বাবা যেমন আবেগ প্রবণ মানুষ তেমনি জেদিও। তিনি দেশে ফেরার সময় ডাক্তারের দেওয়া ওষুধটার সঙ্গে এক শিশি পদ্মমধুও নিয়ে গেলেন। কাশ্মীরী পদ্মমধু চোখে দিলে নাকি চোখ ভাল থাকে। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা যায় কি করে বল।

আমি বললাম, তুমি এখানে বড় ডাক্তার দেখিয়েছ, তিনি ওষুধও দিয়েছেন, দেখই না কি হয়।

তিনমাস পরে এলো বাগুলির মেলা।

একদিন জয়তিলক এলো আমার বাসায়। তার দিকে তাকিয়ে আমি চিনতেই পারছিলাম না। কে যেন মুখে চোখে কালি লেপে দিয়েছে। আমি ভেবেই পেলাম না, জয়তিলকের এ অবস্থা কি করে হল!

দরজার সামনের উঠোনে খেলা করছিল তিলক, তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

আমাকে বলল, তুমি দেরী না করে চলে এসো আমার সঙ্গে। আজ স্টুডিওতেই আমরা থাকব।

আমি ওর মুখ চোখের অবস্থা দেখে কোন কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। ও বুক থেকে তিলককে আর নামাল না।

পাশের ঘরে আমার সম বয়সী একটি বউ থাকত। তার কোন ছেলেপুলে ছিল না। সে প্রায় সারাক্ষণ বুকে জড়িয়ে রাখত তিলককে। আমি দু-একদিনের জন্য স্টুডিওতে থেকে গেলে বউটি তিলককে নিজের কাছে রেখে দিত। তিলকও পছন্দ করত ওর কাছে থাকতে।

সেদিন কিন্তু বাবা তার ছেলেকে বুক থেকে নামাল না।

একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে আমরা চৌরঙ্গী এলাকার স্টুডিওতে এসে পৌঁছলাম।

ও আমাদের ঘর খুলে দিয়ে বলল, তোমরা বস, আমি সামান্য একটু কাজ সেরে নিয়েই আসছি। সঙ্গে সঙ্গে জলখাবারও আনব।

ও চলে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, স্টুডিওতে অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি।

খাটের তলা থেকে ঝাঁটাখানা বের করে নিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করলাম।

ঘরের একদিকে একটা খাট পড়ে থাকত। তার ওপর বিছানা পাতা।

দেখলাম, বিছানার চাদরটা কুঁচকে এঁকেবেঁকে রয়েছে।

বিছানাটা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখতে গেলাম।

মাথার বালিশটা সরিয়ে রাখতে গিয়ে দেখি তার তলায় একটি চিঠি। খাম খুলে চিঠিটা বের করে পড়ে দুটোকেই বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছে জয়তিলক।

খোলা চিঠিখানা পড়তে লাগলাম।

পরম কল্যাণীয়েষু—

বাবা জয়, আমার হাতের লেখা ও আঁকা বাঁকা লাইনগুলি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে আমি কত অসহায়। দিনে দিনে চোখ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। হয়ত কিছুদিনের ভিতরেই এমন অবস্থা হইবে যে, তোমার মুখখানি কাছে আসিলেও চিনিতে পারিব না।

কয়েকটি জরুরী কথা আমি তোমাকে লিখিয়া জানাইতেছি। অধিক কথা লিখিবার অবস্থা এখন আমার নাই। তুমি চিঠি পড়িয়া বিবেক অনুযায়ী কাজ করিবে।

তোমার পূর্বপুরুষেরা যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখনই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমার পক্ষে এ ভার বহন করা আর সম্ভব নয়। শরীর ও মনের দিক হইতে আমি একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

জয়, আমারও ত ইচ্ছা করে মৃত্যুর আগে পুত্রকে সংসারী দেখি। গৃহলক্ষ্মী পুত্রবধূর কোলে পৌত্রকে দেখিয়া যাই। অথবা ইহার মধ্যে যদি দৃষ্টিশক্তি হারাই, তাহা হইলেও যেন তাহার মুখচুম্বন করিয়া যাইতে পারি।

তুমি জান, প্রায় প্রতিবছর নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করিয়া লাঠালাঠি হয়। দুই এক টুকরা চরের অধিকার লইয়া মারদাঙ্গা বাধিয়া যায়।

এইরূপ উত্তেজনা আমার আর সহ্য হইতেছে না। কোর্ট কাচারি, উকিল মোক্তারের কুম্ভীপাকে ক্রমশঃ জড়াইয়া পড়িতেছি।

এই সকল অবস্থার হাত হইতে পরিত্রাণের একটি পথ ঈশ্বর আমাকে দেখাইয়াছেন। বড় সম্মান ও মর্যাদার পথ সেটি। সেই পথ অবলম্বনের ব্যাপারে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

কথাটা খুলিয়া বলি। কন্যাটি অতীব সুন্দরী, শিক্ষিতা ও সুলক্ষণা। যাহারা দেখিয়াছে তাহারা একবাক্যে প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। পিতার একমাত্র কন্যা, বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী।

আমি সম্পত্তিলাভের আশায় এই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছি বলিয়া মনে করিও না। আমাদের দীর্ঘকালের বিবাদজনিত যন্ত্রণার উপশম একমাত্র ঐ কন্যাই ঘটাইতে পারে।

তুমি আমার বিবেচক ও বুদ্ধিমান ছেলে। আমি কাহাদের প্রসঙ্গে এইসব কথা বলিতেছি তাহা তোমার এতক্ষণে অবিদিত থাকিবার কথা নহে।

রায়েরা আমাদের স্বজাতি। নবীনকান্ত নিজেই উপযাচক হইয়া এই বিবাহ-প্রস্তাবটি পাঠাইয়াছেন। ইহাতে আমাদের সম্মানরক্ষা ও মর্যাদাবৃদ্ধি পাইয়াছে। কুমারী কল্যাণী, নবীনকান্ত রায়ের একমাত্র কন্যা। এই বিবাহে চির শত্রুতার অবসান হইবে।

উপযুক্ত পুত্রের কাছে পিতার অনেক কিছু দাবী থাকে। আমি কোনদিনই তোমার কাছে কোন দাবী জানাই নাই।

তোমার মায়ের মৃত্যুর পর আমি পিতামাতার কর্তব্য একই সঙ্গে পালন করিয়াছি। এখন প্রায়-অন্ধ পিতার শেষ ইচ্ছাটুকু পূরণ করিয়া জীবন সায়াহ্নে আমাকে একটু শান্তি দাও, এই কামনা।

আশীর্বাদক বাবা।
শশাঙ্ক শেখর বিশ্বাস।

চিঠিপড়া শেষ হলে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়া হল আমার ভেতর।

আমি দুশ্চিন্তা কিংবা কষ্টে ভেঙে পড়লাম না।

মৃত্যু পথযাত্রী অনশন-ক্লিষ্ট আমার বাবাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তিনি তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে পলাতকা কন্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে যাচ্ছেন।

মুমূর্ষু পিতার এই ছবিখানা আমাকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করল। মুহূর্তে আমি আত্মসুখকে বিসর্জন দিয়ে পিতৃ-তর্পণের জন্য প্রস্তুত হলাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, নিজের সুখের জন্য অন্যের কষ্টের কারণ হব না। আমার বাবার মত জয়তিলকের বাবা যদি ছেলের কারণে মৃত্যু-পথযাত্রী হন তাহলে সে পাপের ভাগী আমাকেই হতে হবে।

ও মুখ ফুটে কোন কথা আমাকে বলতে পারল না। আমিই শ্বশুরমশায়ের চিঠির কথা তুলে সারারাত ওকে বোঝালাম।

ও কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিলককে বুকে জড়িয়ে ধরে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে দিল।

রাত্রি শেষের মুহূর্তে আমি ওকে বললাম, শুধু আমার একটি প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর, জীবনে অন্য কোন প্রার্থনা আমি তোমার কাছে জানাব না।

ও ম্লান মুখে দুটো চোখ মেলে শুধু তাকাল। আমি ওর হাত দুটো মুঠোর মধ্যে ধরে বললাম, বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছি আমি, সেই পাপের হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার কর।

ও বড় যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আমার কথা মেনে নিল।

আমি বললাম, শুধু অনুরোধ, বিয়ের পর তুমি কোনভাবেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখোনা। এতে তোমার সংসারে নতুন যে বধূটি আসছে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

বললাম, তুমি নিশ্চিন্তে তোমার সন্তানকে আমার কাছে রেখে যাও, আমি তাকে বড়লোক করতে পারব না কিন্তু সত্যিকারের মানুষ করার চেষ্টা করব।

বাগীশ্বরী দেবীর অতি সংক্ষিপ্ত আত্মকথা এইখানেই শেষ হয়েছে। পাঠ শেষ করে সুমিতা কতক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তিলকের মুখেও কোন কথা ছিল না।

একসময় সুমিতা বললেন, তোমার মায়ের তো মৃত্যুর বয়েস হয়নি, উনি কিভাবে এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন?

মা বস্তির ছেলেদের দুবেলা বিনি পয়সায় পড়াতো। আমাকেও স্কুলফাইনাল পর্যন্ত পড়িয়েছে আমার মা। দুজনের খাওয়া পরার জন্যে দুটো বাড়িতে রাঁধুনির কাজও করেতে হয়েছে।

শেষদিকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মায়ের শরীর ভেঙে যায়। আমি বস্তির বাইরে টিউশনি করে সে সময়ে কিছু অর্থ রোজগার করতাম।

শেষ পর্যন্ত মায়ের ভাঙা শরীরে টি. বি. র লক্ষ্মণ দেখা দেয়। আমি বহু চেষ্টায় মাকে যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে ভর্তি করে দিই। কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে মা আমার হাতখানা ধরে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যায়।

সুমিতা বললেন, আজ বহু সত্য উদঘাটিত হল। নিজের গভীর দুঃখকে গোপন করে রেখে যে মা আপন সন্তানের জন্য জীবন পাত করেন, তাঁর ত্যাগ আর মহত্ত্বের কোন তুলনাই হয় না।

চার

কিয়োতো থেকে তানাকার চিঠি এলো এক দুপুরে। সাদা খামের এক কোণায় সোনালী রঙে আঁকা দুটো হাকুচুরু পাখি উড়ে চলেছে। খামের তলায় বাঁদিকে প্রেরকের নামটি লেখা—তানাকা।

জাপানি অক্ষরের ছাঁদটি ঠিক ছবির মত।

চিঠিখানা পেয়েই খাম না খুলে বৌদির হাতে তুলে দিল তিলক চন্দন।

এ তো তোমার চিঠি।

যার হোক্, তুমিই খুলবে।

সুমিতা বললেন, অসম্ভব। প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার প্রথম চিঠি, তাকে খুলে পাপের ভাগী হই আর কি! এ সব তোমার ব্যাপার, তুমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ কর ভাই। পড়ার শেষে একটুখানি ছিটে ফোঁটা ছড়িয়ে দিও, তাতেই খুশি।

লক্ষ্মী বৌদি, অন্তত খামের মুখটা খোল, পড়ার কষ্টটুকু আমি না হয় সইব।

কি মজা, ফল ছাড়াবে একজন আর শাঁসটুকু খাবে অন্যজন। ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল। আর তোমাকে কাতর প্রতীক্ষায় রাখব না।

খামের মুখখানা ছিঁড়ে ফেলে খামসমেত চিঠিটা সুমিতা ধরিয়ে দিলেন তিলকের হাতে। বললেন, পাশের ঘরে সরে পড়। প্রেমের চিঠি কারু সামনে পড়তে নেই।

অভিজ্ঞতা আছে নাকি ভাবীজী?

জলতরঙ্গের শব্দে সারাঘর হাসিতে ভরিয়ে সুমিতা বললেন, ওরে ছেলে, আমাদের সে সুযোগ

ছিল নাকি ? আমার বাবা ছিলেন শ্বশুরমশায়ের মজলিসের এক মেম্বার। কি কারণে যেন একদিন দেখা করতে এলেন বাবার সঙ্গে। বাবা বাড়ি ছিলেন না, আমিই তাঁকে আপ্যায়ন করে ঘরে এনে বসালাম।

পরের দিনই বাবা শুভসংবাদটি ঘরে বয়ে আনলেন। ওঁর নাকি ভারি পছন্দ হয়েছে আমাকে। ছেলের বউ করবেন।

তারপর মাসখানিকের ভেতরেই যুগল-মিলন। এবার চিঠিসহ সুমিতা ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন তিলককে পাশের ঘরে।

চিঠি খোলার আগেই বুকের ভেতর আশ্চর্য এক অনুভূতি। কাঁপছিল তার সমস্ত মন। এ কি প্রেমের ছোঁয়ায় না অনাগত দিনে না পাওয়ার বেদনায়। কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলল তিলকচন্দন।

প্রথম সম্বোধন ঃ

বিদেশী বন্ধু, ট্রেন যাত্রার আগে তোমার চিঠি পড়তে পারিনি। একান্তে পড়ব এই ছিল বাসনা। ট্রেনে অনেকখানি পথ পাড়ি দেবার পর মনটা যখন সবুজ গাছপালা, আকাশের নীলে বন্দী হল তখনই বুঝলাম দূরের বন্ধুর চিঠি পড়ার সময় এসেছে।

মাত্র তিন ছত্রের একটি কবিতা, এর চেয়ে বেশী লিখলে সুরের তারটাই কেটে যেত। সেই টুকরো তিনটি ছত্র একটি ভোমরার গুঞ্জনের মতো আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল। মনে হল আমি মগ্ন হয়ে সুন্দর কয়েক কলি গান শুনছি।

জীবনটা সত্যি একটি ফুল। সে ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে জাগে, অমনি বড় ভালবাসার মতো ছড়িয়ে পড়ে তার গন্ধ। যে ফুলে গন্ধ নেই সে ফুল শুধু দৃষ্টিনন্দন, তাতে চোখের পিপাসা মিটলেও মন ভরে না। তাই ভালবাসায় সুবাস চাই। সেই তো টেনে আনে আপনজনকে বড় কাছে। গন্ধের টানে যে আসে সেইই সত্যিকারের ভালবাসার স্বপ্ন রচনা করতে পারে।

তোমার তৃতীয় কলিটি আমার কাছে একেবারেই অধরা। তাকে স্বপ্নে দেখতেও ভয় পাই। সে যেন আকাশে দূরের নক্ষত্রের মতো, যার রহস্যময়তা আমাকে আকর্ষণ করে কিন্তু আমার ভেতর এমন শক্তি নেই যার বলে আমি ওর কাছে পৌঁছতে পারি।

আমার বাগানে দুটি রঙিন পাখি সারাদিন ধরে হুটোপুটি করে দিনান্তে চারটি রঙিন পালক ফেলে দিয়ে গেছে। কি বিচিত্র সে রং! পরের দিন ভোরে বাগনে বেড়াতে গিয়ে আমি ওদের কুড়িয়ে এনেছিলাম।

ভাবতে ভাবতে সেই চারটি পালক চারটি টুকরো কবিতার রূপ নিয়েছে।

বড় দ্বিধায়, বড় সঙ্কোচে সেই চারটি অক্ষম হাতের রচনা একান্ত আপনজন ভেবে তোমার কাছে পাঠালাম।

এক ঃ

কঞ্চির ডগায়
কাঁপছে একটি বাঁশের পাতা,
কাঁপছে, কাঁপছে আর কাঁপছে।
ভীরু প্রেম সারাক্ষণই কাঁপে।

দুই ঃ

নিটোল জলে
টুব করে একটি ঢিল পড়ল,
অমনি স্থির জল অস্থির।
কোতোয় একটা টঙ্কার উঠল,
অমনি সুরের সাগর উত্তাল।

তিন ঃ

পাখিটা
ডাকছে, ডাকছে, ডাকছে,
নিঃঝুম দুপুর।
কার প্রতীক্ষায়?

চার ঃ

হাকুচুরু পাখিটা
ডানা টেনে টেনে উড়ছে।
শেষবেলার রাঙা রোদ।
যে পাখিটার পা ভেঙেছে,
সে বাসায় বসে,
চোখদুটো তার আকাশের দিকে।

বড় সুন্দর একটি দিনে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিন ফুলের উৎসব। ডাল ভরে ফুটে উঠছিল সাকুরা। রাজার উদ্যানে সাকুরার ডালে ডালে হাজারো পাখি কলরব করে ফিরছিল।

নীচেও ছিল পুষ্প প্রেমী মানুষদের কোলাহল। শিল্পী বন্ধু, সবার মাঝে তোমাকে আমার সেদিন খুঁজে নিতে কষ্ট হয়নি। কোনও কোনও বস্তু চোখে দেখলেও মুহূর্তে হারিয়ে যায়। কিন্তু এমন বস্তু আছে যার ওপর চোখ পড়লেই সে চুম্বকের মতো কাছে টেনে নেয়। তোমার উপস্থিতি সেদিন এমনি করে আমাকে তোমার কাছে টেনেছিল।

সেদিন আমি আমার সংযমকে সংযত করতে পারিনি, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। তোমার সামান্য প্রশ্রয়ও আমার অধিকারের সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কবে আসছ শুধু এরই প্রতীক্ষায় রইলাম।

কিয়োতোর বন, পাহাড়, নদী আর প্রাচীন মন্দিরগুলি তোমাকে তাদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তোমার একান্ত আপনজন,—জানি না আমার এ অধিকারের দাবি তুমি কীভাবে গ্রহণ করবে।

তোমার দু-ছত্র উত্তরের অপেক্ষায় আমার প্রতিটি মুহূর্ত উন্মুখ হয়ে রইল।

তানাকা।

চিঠিটা বার বার করে পড়ল তিলকচন্দন। তারপর একসময় মনে হল, চিঠিখানা পড়তে বড় বেশী সময় নিয়ে ফেলেছে সে। ও ঘরে বৌদির কাছে এতক্ষণে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল তার।

সে ঘরে ঢুকতেই এমব্রয়ডারির ফ্রেমের থেকে চোখ না তুলে সুমিতা বললেন, খবর খুব জবর, তাইনা?

তিলক দ্রুতপায়ে এসে চিঠিখানা এগিয়ে ধরে বলল, পড়ে দেখ।

সুমিতা কাঁচি দিয়ে সুতোটা কেটে এমব্রয়ডারির ফ্রেমখানা নামিয়ে রাখলেন।

দাও, তোমার নিরুপমার শুভ সমাচার। 'বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।' —তাই তো?

তোমার অনুমান সত্য হোক্।

চিঠিখানা পড়ার আগে নিবিষ্ট হয়ে দেখল খামখানা। চিঠির কোণায় সোনালী দুটো সারস উড়ে চলেছে।

চোখের অনেক কাছে ছবিটাকে তুলে নিয়ে সুমিতা বললেন, ছবিটা তোমার চোখে পড়েনি আর্টিস্ট?

দেখেছি।

কি দেখেছ?

দুটো উড়ন্ত সারসের ছবি।

কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছ?

বৈশিষ্ট্য হল, ও দুটি আকাশচারী বিহঙ্গ প্রেমিক প্রেমিকার প্রতীক।

তোমার মুণ্ডু।

মাথা চুলকে তিলক বলল, ও রকম দুই পাখিওলা ছাপা কার্ড বাজারে নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যায়।

এ কার্ড কেনা যায়না মশাই। এটি শিল্পীর নিপুণ হাতের কাজ। সোনালী সিল্কের সুতো আর সামান্য আঠার সাহায্যে তৈরী হয়েছে এই চোখজুড়ানো শিল্পকর্মটি।

খামটা তিলকচন্দনের দিকে এগিয়ে দিলেন সুমিতা।

তিলক দেখল, পালকের শেডগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব ব্যাপারটাই ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল।

চিঠিখানা এবার হাতে নিয়ে সুমিতা বললেন, গেইশারা সর্বকর্মেই নিপুণ হয়, কিন্তু এতখানি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম আমি আশা করিনি।

চিঠি পড়তে শুরু করলেন সুমিতা। দু ছত্র পড়েই থামলেন।

কই, প্রেমিকাকে দেওয়া তোমার প্রথম চিঠিতো আমাকে দেখাওনি?

কিয়োতোতে যাবার আগে তিনছত্র কবিতা আমি ওকে একটি খামে ভরে উপহার দিয়েছিলাম।

সেটা কিন্তু আমাকে দেখাওনি তুমি।

রাগ কোরোনা ভাবীজী, সেজন্যে অনুতপ্ত আর ক্ষমাপ্রার্থী আমি। তিনছত্র কবিতা আমার মুখেই আছে, শোন ঃ

জীবন একটি ফুল,
ভালবাসা তার সুবাস,
মিলন তার মধু।

চমৎকার! জাত শিল্পী হিসেবে তুমি একদিন আমাদের দৃষ্টি-হরণ করেছিলে, কিন্তু ভাবুক কবি হিসেবে আজ তুমি একেবারে হৃদয়-হরণ করে নিলে।

তিলক সহসা সুমিতা বৌদির পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে নিল।

সুমিতা অমনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে বললেন, শুভায় ভবতু। লক্ষ্যে স্থির থেকে অগ্রসর হও বৎস, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

এবার তানাকার চিঠিতে মনঃসংযোগ করলেন সুমিতা।

পড়া শেষ হলে বললেন, তোমার মত কাব্য, আর শিল্প-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে ও। সত্যি আশ্চর্য তোমাদের যোগাযোগ।

তিলক বলল, 'একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে'।

সুমিতা বললেন, খাঁচার পাখিটি কে?

কেন, এই অধম।

তুমি নিজেকে 'খাঁচায় বন্দী' মনে কর নাকি?

নয়তো কি? সারা দিন রজনী তো বন্দী হয়ে আছি তোমার স্নেহের খাঁচায়।

চাইলেই খাঁচার দরজা খুলে দেব।

আমি কখন যে ওড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, তা নিজেই জানতে পারিনি বৌদি।

সুমিতা আবেগ-বিহ্বল হয়ে বললেন, উড়ন্ত পাখিটিকে খাঁচায় বন্দী করে বোধহয় ভুল করেছি ভাই। আসলে একাধারে সহোদর আর সন্তানের ছায়া দেখেছিলাম তোমার ভেতর, তাই তোমাকে এমন কঠিন বাঁধনে না বেঁধে পারিনি। সেই রবি ঠাকুরের কবিতা আবার এসে পড়ল।

'হারাই হারাই ভয়ে গো তাই,
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।'

আবেগমথিত সুমিতার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল তিলক। বলল, তুমি আমাকে বিচিত্র এক বাঁধনে বেঁধেছ বৌদি। আমাকে দিয়েছ অনন্ত মুক্তির স্বাদ, আবার ক্ষণিক বন্ধনের সুখ। সারাদিন পাখির মত আকাশের নীলে-সোনায় ভেসে চলি, সবুজের আমন্ত্রণে কখনো বা ধরা দি, আবার ঠিক দিনান্তে ফিরে আসি আপন নীড়ে। তুমি আমার সেই শ্রান্তিহরা নীড় বৌদি।

সুমিতা কথান্তরে গেলেন।

তাহলে যাচ্ছ কবে কিয়োতো?

সামনের সপ্তাহে একটা পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষ হলে দিন পনেরোর জন্যে টানা একটা ছুটি নেব। প্রিন্সিপাল আমাকে ভালবাসেন। ওকে বলব, ছবির বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য জাপানের কয়েকটা জায়গা ঘুরে দেখতে চাই। আশা করছি উনি রাজি হয়ে যাবেন।

আর দাদা?

দাদাকে রাজি করানোর ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম বৌদি। শুধু একটু কৃপা কোরো...

অমনি সুমিতা কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, দাদা যেন তোমার অভিসারের কথাটা জানতে না পারেন।

হেসে উঠল তিলক।

সত্যি বৌদি, মনের ছবিটা তুমি যেন এক্সরে প্লেটের ওপর দেখতে পাও।

সুমিতা বললেন, পারমিশান পাওয়া মাত্র দিনক্ষণ জানিয়ে চিঠি লিখে দাও। বর যাচ্ছে টোকিয়ো থেকে হিকারি এক্সপ্রেসে। কিয়োতো স্টেশানে স্বয়ং কনে যেন বরকে বরণ করে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত থাকে।

তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবেনা বৌদি? অন্ততঃ কিয়োতো পর্যন্ত।

একা সাহসে কুলোচ্ছেনা বুঝি ?

ঠিক তা নয়। তুমি আমার পাশে গার্জেনের মত থাকলে আসর একদম জমে উঠত।

সুমিতা বললেন, প্রেমে দূতির ভূমিকা আছে। তারা একজনের হৃদয়বেদনার কথা অন্যজনকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রেমের আসরে গার্জেনের আবির্ভাব, নৈব নৈব চ। উপদেশের ঠ্যালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার চেয়ে নির্ভীক প্রেমিকের মত একাই অগ্রসর হও। মনে মনে উচ্চারণ কর রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা ঃ

'মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে,
ধনুর্বাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী—
কহিনু, আমি এসেছি পরদেশী।'

ট্রেনযাত্রা সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আর ছবি নিয়ে আসে। তিলকচন্দন বসেছিল কামরার ডানদিকের জানলা ঘেষে। গাছপালা, সবুজ মাঠ, ছোট ছোট টিলা, লালটালির ছাউনি দেওয়া ঘর পিছলে চলে যাচ্ছে পেছনে।

তিলক ছবি দেখছে, তার ভেতর সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন ভেসে আসছে মনে। ওই তো মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি পুরুষের পেছনে পেছনে চলেছে একটি মেয়ে। তারা আকাশের দিকে তাকাচ্ছে আর থমকে থেমে থাকা বৃষ্টির মেঘটাকে দেখছে। মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলেছে সেই ভাবনার থেকে।

মেয়েটির মাথা চমৎকার একটি কাজ করা স্কার্ফে ঢাকা। তার পিঠে বাধা লম্বা, গোল চমৎকার একটি ঝুড়ি। পুরুষটির মাথা ঘিরে রৌদ্র-ত্রাণের জন্যে একটি টোকা। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না সরু সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে ওটি তৈরি কিনা।

ওরা কি কোনও চা-বাগানে কাজ করতে চলেছে? না অন্য কোনও কাজে চলেছে ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে। স্বামী-স্ত্রী, না প্রেমিক-প্রেমিকা।

একটা পাখি মিষ্টি শিস তুলে উড়ে গেল। পল্লীর জীবন কত সুন্দর।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তিলক লক্ষ্য করল, তার সামনে ডানদিকের জানালা ঘেঁষে বসে থাকা যাত্রীরা বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ও ঠিক যাত্রীদের হঠাৎ চাঞ্চল্যের কারণটা ধরতে পারল না।

একসময় কে যেন বলে উঠল, ফুজি, ফুজি।

তিলক চঞ্চল হয়ে উঠল। এইপথেই ট্রেনের ডানদিকে পড়বে ফুজিয়ামা। টোকিও থেকে সত্তর মাইল দূরে।

জাপানে ইয়ামার অর্থ পাহাড়। সৌন্দর্যপিপাসুরা বলেন, পৃথিবীর সুন্দরতম পর্বত এই ফুজি। জাপানী শিল্পীরা ফুজিয়ামার ছবি আঁকবার জন্যে পাগল।

ফুজিয়ামা একটি আগ্নেয়গিরি। বহুযুগ পূর্বে অগ্ন্যুদ্গার করেছিল এই পর্বত। বিপুল লাভার স্রোত নেমে এসেছিল তার গা বেয়ে। খানিক দূর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ওপর সেই লাভার বাঁধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে নদীটা রূপান্তরিত হয়ে বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য লেকে পরিণত হয়েছে। প্রায় সাড়ে বারো হাজার ফিট উঁচু এই পর্বতটির ওপরের অংশ সাদা বরফে মোড়া।

দূর থেকে দেখে তিলকেব মনে হল পর্বতটি সত্যিই অপূর্ব। জাপানীরা এই পর্বতকে দেবতাজ্ঞানে মান্য করেন। ফুজিয়ামা যেন জাপানের রক্ষাকর্তা।

প্রতি বছর তীর্থযাত্রার মতো দলে দলে জাপানী এই পর্বতশীর্ষে আরোহনের চেষ্টা করেন। তাঁদের কাছে বড় প্রিয়, বড় পূজ্য এই পর্বত।

ট্রেনের কামরার ভেতর মেয়েরা খাবার ফেরি করে বেড়াচ্ছে। ভারী মিষ্টি তাদের কণ্ঠস্বর।

তিলক দু-একটা খাবার প্যাকেট কিনল। আপন মনে তাই খেতে খেতে চলল সে। ফুজিয়ামা কখন দূরে সরে গেছে।

কিয়োতো পৌঁছবার আগে এল নাগোয়া। কিছুক্ষণের ভেতরেই ট্রেন ঢুকল কিয়োতো স্টেশনে।

বিপুল যাত্রীর ভার লাঘব হল প্ল্যাটফর্মে। জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ল। তিলক ভাবল, এই জনারণ্যে কি সে তানাকার দেখা পাবে! তার চিঠি ঠিকমতো পেয়েছে তো তানাকা ?

ও প্রথমে ভিড়টাকে হালকা হতে দিল। একা দাঁড়িয়ে রইল প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন ওর ব্যাগটা ধরে টান দিল।

ও চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে, তানাকা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

তানাকা বলল, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। ভিড়ের সঙ্গে হাঁটলে আমি সহজে তোমাকে ধরতে পারতাম না।

তিলক বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছিল তুমি ঠিকসময়ে চিঠিখানা পেয়েছ কিনা? যদি না পাও তাহলে আমার পক্ষে ঠিকানা খুঁজে তোমাকে আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হত না।

তানাকা বলল, কিয়োতো অনেক বড় শহর, আমি থাকি শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। তোমার পক্ষে সত্যিই অসুবিধে হত।

হাসিতে প্ল্যাটফর্ম ভরিয়ে দিয়ে তিলক বলল,এস, আমরা দুজনে জাপানের ডাকবিভাগকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

তানাকা বলল, যত দূরের থেকেই আসুক, চিঠি আমরা পাবই। এ পর্যন্ত ডাকবিভাগের ওপর আমার কোনও অভিযোগ নেই। এখন দয়া করে ব্যাগটা আমার হাতে দাও।

তিলকচন্দন বলল, অসম্ভব। বহু মূল্যবান মণি রত্নে ভরা আমার ব্যাগ অন্য কারও হাতে তুলে দিতে পারি না।

তনাকা ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, কথা বাড়িও না, বেলা অনেক বেড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এস। বাইরে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে।

ওরা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে এসে একটা ঝকঝকে কালো অস্টিন গাড়িতে উঠে বসল।

পরে তানাকার মুখেই তিলক শুনেছিল, এ গাড়িটা, ভীষণ লাকি। ওর বাবা নাকি এই গাড়িটাই ব্যবহার করতেন।

শহরের ভেতর দিয়ে গাড়িটা দারুণ দক্ষতায় চালিয়ে নিয়ে চলল ড্রাইভার। সামনে নানা ধরনের মানুষ আর যানবাহন। তার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে কি কৌশলে যে গাড়িটাকে একটু ফাঁকায় বের করে আনল ড্রাইভার, তা চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না।

একটা গাড়ির পেছনে আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলে যেমন হর্ণের শব্দে কানপাতা দায় হয়, এখানে কিন্তু, তেমনটি নেই। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সব চালকই গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভেতর অতি দক্ষ কোনও ড্রাইভার যাদুর বলে যেন ভিড়ের থেকে গাড়িটাকে বের করে নিয়ে যায়।

এখন অস্টিন ছুটেছে শহরতলির পথ ধরে। প্রাচীন রাজধানীর এলাকা ছাড়িয়ে সেই মাঠ, সেই সবুজের বন্যা। বিরল লোকযাত্রা।

পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। বেশী কথা নয়, শুধু অনুভব। প্রতীক্ষার অবসান, মিলনের আশ্বাস। 'আমি তোমাকে ভালবাসি,' এ কথা উচ্চারণ করলেই ভালবাসার ধার কমে যায়। ভালবাসার ছবি ফোটে আভাসে, ইঙ্গিতে। আকাশে থরে থরে মেঘ জমে উঠলে, বায়ুভরে বকের পাতি মালা গেঁথে উড়ে গেলে, কদমের বন কুসুমে কুসুমে রোমাঞ্চিত হলে সোচ্চারে বলে দিতে হয়না, বর্ষা ঋতু এসেছে।

চোখের ভাষায়, হঠাৎ একটুখানি ছোঁয়ায়, যে সচকিত রোমাঞ্চিত ভাবটি ফুটে ওঠে, তাই-ই ভালবাসা।

পরস্পরের সান্নিধ্যে দুটি হৃদয়ের একান্ত অনুভবের পর শুরু হল টুকরো কথা। মেঘে মেঘে মিতালির পর রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টিধারা।

তিলক বলল, শহরের ভেতর থাকতে হল না, এতে আমি দারুণ খুশি।

আমি তো শঙ্কায় ছিলাম।

কারণ?

তুমি রাজধানী টোকিয়োর প্রায় বুকের মধ্যে বাস কর, তাই ভাবছিলাম, এতো নির্জনতার ভার কি তুমি সইতে পারবে?

প্রয়োজনের জগতে আমি বাস করি ঠিক কিন্তু আমার মন ঘুরে বেড়ায় নির্জনে।

তানাকা বলল, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। একজন স্বভাব কবি কিংবা জাতশিল্পীকে মনে মনে, নির্জনে বাস করতে হয়।

একটা প্রশ্ন করব?

একটুখানি নড়ে উঠল তানাকা। মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিল, অবশ্যই।

তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

অনেককে নিয়েই আমার সংসার।

বাবা মা?

পাঁচ বছর আগে মা, তিন বছর আগে বাবা এ সংসার ছেড়ে চলে গেছেন। অমিতাভ বুদ্ধের করুণার আশ্রয় লাভ করেছেন তাঁরা।

বর্তমান সংসারে আর কোন আত্মীয় রয়েছেন?

তুমি যে আত্মীয়ের কথা জানতে চাইছ এমন কোন আত্মীয় আমার সংসারে নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা যে কোনভাবেই হোক, আমার বাবার টি-গার্ডেনের সঙ্গে যুক্ত। বলতে পার তাঁরাই আমার আত্মীয় স্বজন।

তার মানে, একটি সুখী পরিবারের পরিচালিকা তুমি।

সুখ দুঃখ মিলেই সংসার। আমরা সবাই সুখ দুঃখকে বুদ্ধের করুণার দান বলে মনে করি। তাই আনন্দে থাকি।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের একটা রেঞ্জ দেখা যাচ্ছিল। হাল্‌কা বেগুনি আর নীল রঙের মিশেল। তার

ওপর যেন হাওয়ায় উড়ছে কুয়াশার একটা মিহি মসলিন।

হঠাৎ গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিল। তিলকের ডান দিকেই বসেছিল তানাকা। কোনরকমে টাল সামলে নিল তিলক। দোষটা চালকের নয়, তারই। দূরের পাহাড় দেখায় মগ্ন ছিল, তাই। সচেতন থাকলে এমন কাৎ হয়ে পড়ত না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তারা বসেছিল, তবে স্পর্শের সীমা ছুঁয়ে নয়।

আমরা এসে গেছি তিলক।

ডানদিকে একটা ঘন সবুজে ঢাকা পাহাড়। এতক্ষণ একবারের জন্যেও ওদিকে চোখ পড়েনি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ছোট্ট পাহাড়টার তলায় একটা বাগানের ভেতর। ছবির মত দ্বিতল একটি কাঠের বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে।

বাগানে ছায়া সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে পাইন আর প্লামগাছগুলো। একটা বাঁশের ঝাড় বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে স্নান করছে।

সারা জমিটা জুড়ে সবুজ ঘাস আর ফুলের কেয়ারি। রাস্তার প্রান্ত থেকে বাগান পেরিয়ে ঘরের বারান্দা অব্দি যে পথটা এসেছে, সেটাতে নানা সাইজ আর আকারের পাথর বসানো।

তিলক ঘরে ঢুকেই জাপানের রীতি অনুযায়ী বাইরের জুতোটা খুলে রাখল। ডানদিকে সাজানো ঘরে পরার জুতো পায়ে গলিয়ে নিয়ে ঘরের এক ধাপ উঁচু মেঝেতে উঠে দাঁড়াল।

এবার সবিনয় নমস্কারের রীতি অনুযায়ী তিলকচন্দনকে ঘরের ভেতর আহ্বান জানাল তরুণী তানাকা।

খড়ের গদীর ওপর মাদুর মোড়া মেঝে। তাতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় না।

তানাকা এবার তার নরম হাতখানা বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে। সে হাত বড় অনুরাগে ধরল তিলকচন্দন। তানাকার সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে সে প্রথম ঢুকল ড্রইংরুমে।

সারা ঘরখানা প্রায় খালি। বাঁ দিকে একটি লম্বা টানা সোফা। তারই সমকোণে সামান্য তফাতে একটি মেহগিনি পালিশ করা কাঠের চেয়ার। অপূর্ব কাঠের কাজ। দারুশিল্পে কিয়োতোর তক্ষণদের অক্ষয় সুনাম। সোফার আবরণে দর্শনীয় এমব্রয়ডারির কাজ। সোফার ঠিক উল্টোদিকের দেয়াল জুড়ে আড়াই হাত চওড়া বিশাল একখণ্ড পালিশ করা কাঠ। তার মাঝখানে দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোট্ট কাঠের মঞ্চ। তার ওপর ধবধবে বড় একটি বাটির আকারে পোর্সিলেনের ফুলদানিতে ফুল সাজানো। নিখুঁত ইকাবানার দৃষ্টিনন্দন কাজ।

এতবড় একখানা ঘরে আর কোন আসবাবপত্র কিংবা সামগ্রী নেই।

জাপানিরা সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিলাসী। তারা একই জায়গায় অনেক কিছু জিনিসের সমাবেশ সইতে পারে না।

একটিমাত্র সুন্দর বস্তুকে দেখবার জন্য তার চারদিক ঘিরে বিরলতার অবকাশ চাই। তবেই তাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করা যায়।

সোফায় পাশাপাশি দুজনে বসলাম। ও কোন কথা বলল না। আমাকে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার সুযোগ দিল। এতখানি ট্রেন ও মোটর জার্নির পর শ্রান্ত মনটা যাতে শান্ত হয়ে আসে, সম্ভবত সেই শুভ ইচ্ছায়। তাছাড়া ফুলের কাজটুকু অতিথি সম্পূর্ণ একাগ্র চিত্তে উপভোগ করুক, এই প্রচ্ছন্ন সুন্দর বাসনাটুকুও হয়ত কাজ করছিল তানাকার মনে।

এতক্ষণে কথা বলল সে, ট্রেনজার্নি কেমন উপভোগ করলে?

তিলক বলল, সারা যাত্রাপথ জুড়ে অদৃশ্য কোন মহাশিল্পী যেন ছবি এঁকে রেখেছেন।

তুমি যাত্রাপথের দৃশ্য দেখে খুশি হয়েছ জেনে আমিও খুব আনন্দিত।

শুধু খুশি নয় তানাকা, আমি মুগ্ধ।

একটি কিশোরী মেয়ের আবির্ভাব হল ভেতরের দরজার সামনে। সে সমানে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রথমে অতিথিকে, পরে গৃহকর্ত্রীকে অভিবাদন জানাল।

শেষে নম্র মিষ্টি গলায় বলল, স্নানঘরে হাত-পা ধোয়ার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আছে।

তানাকার ইঙ্গিতে কথাটুকু বলেই সরে গেল সে।

তানাকা বলল, মিনো, স্বর্গের এক দূতী। সে ঐ দেবলোক থেকেই নেমে এসেছে। আমার সঙ্গিনী বলতে পার, এ গৃহের চালিকা শক্তি। ও কাজ করে আমদের টি-গার্ডেনে, থাকে আমার কাছে।

তিলক বলল, এমন লাবণ্যেভরা পবিত্র চোখমুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।

তানাকা বলল, লাঞ্চের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। এই অবেলায় ভুরিভোজের কোনও ব্যবস্থা রাখিনি। হেভি জলযোগ করে নিলে চলবে তো?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। এখন পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো অন্নগ্রহণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া...।

হাসিমুখে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকতেই পাশ থেকে তানাকার প্রশ্ন এল, তা ছাড়া কি ?

হিকারী এক্সপ্রেসে যে সব সুবেশা তরুণী সুরেলা গলায় খাবার ফিরি করেন তাঁদের হাত থেকে কিছু খাবার না নিয়ে কি পারা যায়। তাই টুকটাক খেতে খেতে লাঞ্চ নেবার কথা একবারও মনে পড়েনি।

ওর সঙ্গে ড্রয়িং রুম পেরিয়ে যে ঘরে পা রাখলাম তার ডান দিকেই প্রশস্ত স্নানঘর।

তানাকা বলল, তোমার ব্যাগ থেকে শার্ট প্যান্ট মিনো নিশ্চিত বের করে স্নানঘরের হ্যাঙারে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া ওখানে নতুন তোয়ালে, সাবান, শ্যাম্পু সবই পাবে। হট ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার, তোমার যেমন খুশি বাথটাবে মিশিয়ে নিও।

তিলক স্নানঘরে ঢুকে পড়ল।

ঝকঝক করছে পাথর বিছানো মেঝে। ট্যাপের মুখগুলো যেন সদ্য কেনা, রূপোলি ঝিলিক দিচ্ছে।

সত্যি মেয়েটা যেন জাদু জানে। প্রয়োজনের জিনিসগুলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় এমন গুছিয়ে রেখে দিয়েছে যে হাঁকডাক করে বাড়ি মাথায় করার কোনও সুযোগই আর নেই। তাছাড়া ও যেন ঠিক তানাকারই ছায়া। তেমনি প্রশান্ত মুখটি, তেমনি লাবণ্যে ভরা রঙ। ইঙ্গিতে যেন সব কিছু বুঝে নিতে পারে। এখন তিলকের মনে পড়ছে গাড়ি থেকে নেমে ও তার একটা ব্যাগ আর সুটকেস মিনোর হাতেই ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন তিলক ওকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেনি, কারণ সে সময় বাগানের কোণে সে অপরাহ্নের অপরূপ আলোয় বাঁশঝাড়ের স্নানলীলা দেখছিল।

ও ঠিক ব্যাগ থেকেই তিলকের প্যান্ট আর শার্ট বের করে নিয়েছিল।

সুটকেসটা খোলার চেষ্টা করেনি, কারণ, চাবি ছিল তার কাছে।

মেঝেতে একটি কাঠেব পিঁড়ি পাতা। খটখটে শুকনো, একফোঁটা জলের দাগ নেই।

তিলক বাথটাবটা ঠাণ্ডা গরম জলে ভরে নিলো।

আশ্চর্য! স্নানের জলটা সুরভিত, নিশ্চয়ই ওপরের ট্যাঙ্কের জলে কোনও গন্ধদ্রব্য মেশানো হয়েছে।

বড় আরামে চান করল সে। শ্যাম্পু ঘষে দূর করল মাথার ময়লা। অতি মৃদু সৌরভে ভরা সাবানটাকে হালকা সবুজ সোপকেস থেকে তুলে নিয়ে গায়ে বুলিয়ে নিল।

স্নানপর্ব শেষ করে তোয়ালেতে গা হাত মুছে পোশাক পরে সে ফিটফাট হয়ে দাঁড়াল।

কোনও কিছুরই কি ত্রুটি ধরা যাবে না? ঝকঝকে আয়নাটি ঝুলছে একদিকে, তার কোলের খোপে জেন্টস চিরুনি। তুলে দেখল, আনকোরা নতুন।

মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারল না সে। প্যান্টের পকেটে একটা পাট করা রুমাল ঢুকিয়ে দিয়েছে। তিলকের রুমাল সুটকেসে, তাই নতুন রুমালই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথায় চিরুনি দিয়ে মুখে, গলায় হালকা পাউডারের পাফ বুলিয়ে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো তখন নিজেকে তার অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

স্নানঘরের সামনে কিন্তু কেউ ছিল না, আর না থাকারই কথা। খড়ের গদির ওপর মাদুর, তাই পায়ের সাড়া না পাওয়ারই কথা।

তিলক দেখল, যে পাদুকা জোড়া দরজামুখো খুলে রেখে সে স্নানঘরে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে,

সে পাদুকাযুগল উল্টোমুখো ঘুরে আছে। অর্থাৎ স্নানার্থী বেরোলেই অতি সহজে যাতে কোনওদিকে না ঘুরে পাদুকাটি পায়ে গলিয়ে নিতে পারে।

একে সামান্য কাজ বলব না অসামান্য? কী নিখুঁত দৃষ্টি আর সচেতনতা থাকলে অতিথির সামান্যতম সুবিধেটুকুকেও সুচারুভাবে সম্পন্ন করে ফেলা যায় তার একটা নিদর্শন হয়ে রইল এই ছোট্ট কাজটুকু।

ওরা সাড়া পায়। ওদের কান এত সজাগ যে খড়ের ওপর হালকা পায়ের আওয়াজ দেওয়াল পেরিয়ে ওদের কানে ঢোকে।

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল তানাকা।

অবেলায় সামান্য কিছু আয়োজন করেছি তোমার শরীরের কথা ভেবে, এসো আমার সঙ্গে।

তিলক ওর পেছনে পেছনে খাবার ঘরে ঢুকল।

মেঝেতে আসন পাতা রয়েছে, সামনে একখানা পিঁড়ি পাতা। তার ওপর খাবার থালা বসবে। উল্টো দিকে আর একখানা আসন। সেখানে গৃহকর্ত্রী বসে তদারকি করবেন।

বন্ধু হলেও অতি বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে, হাত দুটি এগিয়ে তিলককে আসনে বসার জন্য আহ্বান করল সে।

তিলক আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনে একটি বড় দুধ সাদা জাপানী প্লেটে খাবার নিয়ে এল মিনো। সে প্লেটটা বসিয়ে দিয়েই চলে গেল ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্লেটও এসে গেল। প্রথমটিতে কয়েকখানা স্যাণ্ডুইচ, দ্বিতীয় প্লেটে কলা, কিসমিস আর বাদাম।

উল্টোদিকের আসনে কিমোনো পরা তানাকা হাঁটু ভেঙে জাপানী রীতি অনুযায়ী বসে আছে। অনুরোধ জানাচ্ছে অতিথিকে কিছু খাবার জন্যে।

তিলক খাবারগুলো খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হয়ে এলে আর কিছু নেবে কিনা জিজ্ঞেস করল তানাকা।

অন্য একটা প্লেটে ততক্ষণে কিছু খাবার নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে মিনো। গৃহকর্ত্রীর আদেশ পেলেই সে দ্বিতীয়বার সার্ভ করবে।

তিলক বলল, যথেষ্ট খাওয়া হয়েছে, এর বেশি খেলে রাতে আর খাওয়া যাবে না। খাওয়ার ব্যাপারে বাঙালি গৃহিণীদের মতো পীড়াপীড়ি করল না তানাকা।

ঘরের কোণায় বেসিন। ঝকঝক তকতক করছে। চারদিকে সৌন্দর্য আর পরিচ্ছন্নতার যেন শোভাযাত্রা! রিং থেকে ঝুলছে হাত মোছার জন্য ধোয়া শুকনো তোয়ালে। সোপকেসে সাবান রাখা। সবই যেন এইমাত্র দোকান থেকে কিনে এনে ফিট করে রাখা হয়েছে।

তানাকা বলল, বেলা শেষ হয়ে আসছে, এখন কি একটু বিশ্রাম নেবে, না পায়চারি করবে বাগানে?

তিলক বলল, পড়ন্ত বেলায় বিছানায় যাওয়ার অভ্যেস নেই। তা ছাড়া স্নান, খাওয়ার পর এতটুকুও ক্লান্ত মনে হচ্ছে না নিজেকে।

তানাকা বলল, তা হলে এসো, আমরা বাগানে ঘুরে বেড়াই।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে অপূর্ব একটি কথা সে শুনতে পেল তানাকার মুখ থেকে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তানাকা একজায়গায় থমকে থেমে গিয়ে বলল, দেখো, বাগানে বড় গাছ বলতে তিন রকমের রয়েছে, পাইন, প্লাম, আর বাঁশের ঝাড়। একসঙ্গে এই তিনের সম্মেলনকে জাপানে বলে 'শোচেকু বাই'। অর্থাৎ শুভ, সুন্দর আর সত্যের মিলন।

সঙ্গে সঙ্গে তিলক বলল, আমাদের দেশে ঠিক এমনি একটি কথা আছে, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্। যদিও সেখানে গাছের ভেতর দিয়ে এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু কথা ও ভাবের প্রকাশটা এক।

সেই শেষবেলার নরম রোদে দুজনে আর কোনও কথা না বলে হাতে হাত রেখে হাঁটতে লাগল। কখন যে পেছনের পাহাড়ে সূর্য অস্ত গেল তা টেরও পেল না।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে তানাকা বলল, দেখো, দেখো বাঁশগাছের আড়াল থেকে রূপোর থালার মতো ঝকঝকে চাঁদটা কেমন বেরিয়ে আসছে। একদিকে সূর্যাস্ত অন্যদিকে চন্দ্রোদয় এই দুয়ের সন্ধিলগ্নটি বড় শুভমুহূর্ত।

তিলক বলল, আমাদের দেশে সূর্যাস্তের পরের লগ্নটিকে বলে গোধূলি লগ্ন। সে মুহূর্তে দূর দিগন্তে চন্দ্রোদয়ও দেখা যেতে পারে। সেই গোধূলি লগ্নটি আমাদের দেশে বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন।

হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল তানাকা, তা-ই—বলেই তিলকের হাতটা চেপে ধরল সে।

মুখে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়েছে ততক্ষণে। স্বপ্নময় পরিবেশ, স্বপ্নময় তানাকা।

সন্ধ্যায় ফিরে অতিথিনিবাসের পেছনের একটি ঘরে তানাকা তিলককে নিয়ে গেল।

এই ঘরে রোজই আমাদের চা-পর্বের অনুষ্ঠান হয়।

ঘরের ভেতর ঢুকে তিলক দেখল, মিষ্টিমধুর নীলাভ আলোয় ঘরটা ভাসছে।

ইতিমধ্যোই মিনো সেখানে হাজির, যেন তাদেরই অপেক্ষায়। তিলক অবাক হল! এ কী সারাক্ষণ চোখ আর কান পেতে থাকে? এর কী পান থেকে কখনো চুন খসে পড়ে না।

ওদের দেখেই সে নত হয়ে অভিবাদন জানাল। বিনয়, শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধের এই আন্তরিক ছবি জাপানে না এলে বোঝা যাবে না।

সামান্য দুটি প্রাণীর চা পান, তার আয়োজন কত। ঘরের মাঝে জ্বলছে উনুন, কেটলিতে জল ফুটছে। তার পাশে চায়ের গোল বাটি, পালিশ করা চায়ের কৌটো, বাঁশের একটি চামচ, ওই বাঁশেরই তৈরি একটি ব্রাশ। এসব ধোয়ার জন্যে একটি সুন্দর পাত্রে জল রাখা ছিল।

একটি পাট করা রুমাল খুলে পালিশ করা কৌটোটি মোছা হল। তারপর জলের পাত্র থেকে গোল বাটিতে জল ঢালল মিনো। বাঁশের ব্রাশ দিয়ে ওই জল নেড়ে দিল। বাটি থেকে অন্য একটি পাত্রে জলটা ঢেলে ফেলে পরিষ্কার রুমালে সেটা মুছে নিল।

এবার পালিশ করা কৌটোর মুখ খুলে বাঁশের চামচে করে চা নিয়ে ওই গোল বাটিতে রাখা হল,—গুঁড়ো চা। হাতায় করে কেটলি থেকে ফুটন্ত জল নিয়ে ঢালা হল তাতে। ব্রাশ দিয়ে ঘন ঘন নাড়ার পর চা তৈরি হয়ে গেল।

আগেই তিলক আর তানাকার সামনে দুটি বাটি রাখা হয়েছিল। তাতেই ঢেলে দেওয়া হল গরম চা।

কয়েক চুমুকে সমুদ্র শুষে নেওয়া নয়, তারিয়ে তারিয়ে বাটির চারদিকে ঠোঁট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেতে হবে। এতে মনের দিক থেকে একটা আলাদা আস্বাদ পাওয়া যায়।

তিলকচন্দন তৈরি চায়ের বিশেষ প্রশংসা করল। হাঁটু মুড়ে বসে চা প্রস্তুত ও পরিবেশন করছিল মিনো। সে তিলকের প্রশংসা শুনে ওই অবস্থাতেই বার বার মাথা ঝুঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল।

মনোরম চাঁদের আলো-ঝরা সন্ধ্যা, ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া তিলকের সমস্ত মেজাজটাকে খুশিতে ভরে দিল। এখানে কোনও শব্দ প্রায়ই শোনা যায় না। লোকালয় থেকে দূরে বেশ নির্জন জায়গা এটি। কান পাতলে শুধু শোনা যায় নিস্তব্ধতার একটি অশ্রুতপূর্ব রাগিণী।

তানাকা বলল, তুমি আজ ক্লান্ত, নইলে এই চন্দ্রালোকে তোমাকে একটি নির্জন জায়গা দেখাতে নিয়ে যেতাম।

তিলক সোৎসাহে বলল, তুমি আমাকে এখুনি নিয়ে চল তানাকা, আমি একেবারেই ক্লান্ত নই। আমি রূপ দেখার চোখ আর মন নিয়েই তোমার কাছে এসেছি, শ্রান্তি ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারবে না।

সেই জ্যোৎস্নালোকে অস্টিন গাড়িটি বেরোল। ড্রাইভারটি যেন কর্তব্যরত সৈনিক। নীরবে আদেশ পালনের জন্য তৈরি।

তানাকা নম্র মিষ্টি গলায় বলল, ওগানা, আমাদের কাৎসুরা বাগানবাড়িটা একটু ঘুরিয়ে আনতে পারবে?

সে স্টিয়ারিং ধরে মাথাটা নত করল। অর্থাৎ এমন একজন প্রভুর আদেশ পালনে সে সবসময় তৈরি। গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণমুখো। কিয়োতো শহর থেকে কাৎসুর দূরত্ব যতখানি তানাকার টি-গার্ডেন থেকে সে দূরত্ব অনেকটাই কম। জাপানের ন্যাশনাল ওয়ে রুট ওয়ান ধরে গাড়ি অনেকখানি এগিয়ে গেল। খানিক পরেই মূল রাস্তাটা ছেড়ে একটা গ্রামের পথ ধরে ঢুকে পড়ল গাড়িটা।

সারা গ্রাম নিঃঝুম। গাছের পাতা থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে চাঁদের আলো। সেই গ্রাম ছাড়িয়ে একটা মাঠ। মাঠের পথেই পাড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল ওগানা। সামনে একটি ছোট্ট বন। সেই বনের ভেতর বুনো বাঁশের ঘন বেড়ার ধার দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা দুজনে। খানিক পরেই বাঁশ দিয়ে তৈরি চমৎকার একটি দরজার সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

কাকে যেন ডাক দিল তানাকা। বন থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ। তিলকের মনে হল, সম্ভবত এই প্রৌঢ় লোকটি উদ্যান-রক্ষক।

সে নত হয়ে দু'বার অভিবাদন জানাল আগন্তুকদের। এরা দুজনও প্রথা মতো প্রত্যভিবাদন জানালো।

তানাকা বলল, আজ এক বন্ধুকে জ্যোৎস্নারাতে সম্রাট-কবির বাগান দেখাতে এনেছি।

ও আবার অভিবাদন জানিয়ে বাঁশের দরজাটা খুলে টেনে ধরল।

এসব পথঘাট, গাছপালা যেন তানাকার বহু পরিচিত। ছোট ছোট জলাশয়ের পাশ দিয়ে, ঘাসের জমির ওপর দিয়ে গাছের আলপনা আঁকা পথে পা ফেলে ফেলে ওরা এগিয়ে চলল।

সপ্তদশ শতাব্দীর সম্রাট তোশিহিতোর বড় প্রিয় উদ্যান-বাটিকা এটি।

কাঠের কয়েকটি ছড়ানো ছিটোনো বাড়ি আছে এখানে। মন্দিরের মতো সুদর্শন চালাওয়ালা বাড়ি। সামনে টানা বারান্দা।

একটি বাড়ির বারান্দায় তিলকের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল তানাকা।

এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সম্রাট পূর্ণ চাঁদটিকে দেখতেন। নিজে কবি, তাই চাঁদ নিয়ে পাগল। নীল আকাশে উজ্জ্বল ঝলমলে চাঁদ, গাছের ডালে আটকে থাকা চাঁদ, জলের আরশিতে প্রতিবিম্ব দেখা চাঁদ—চাঁদের সব রূপকেই তিনি উপভোগ করতেন। তাঁর প্রাণের খুশি কোনও সুরযন্ত্রে ঝরে পড়ত। এমনকি বিষণ্ণ পাণ্ডুর চাঁদটি যখন অস্তাচলে যেত তখন সম্রাট হা-হুতাশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

রাত ন-টায় গাড়ি ফিরল অতিথিনিবাসে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল মিনো। সে তানাকার এই ছোট্ট পরিকল্পনাটির কথা জানত না। কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা উদ্বেগের ভাব তখনও লেগেছিল তার মুখে-চোখে। সে এখন আশ্বস্ত হয়ে পাখির মতো কোথায় যেন উড়ে চলে গেল।

রাতের খাওয়া তানাকা আর তিলক একসঙ্গেই খেলো। খাবার শেষে দোতলার ঘরে তিলককে শোবার জন্যে নিয়ে গেল তানাকা।

পাশাপাশি দু-খানা ঘর। দুটি ঘরের মাঝের ব্যবধান হাত চারেকের মতো।

বারান্দায় একটি বালব্ হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। ওই আলোতে দেখা গেল সামনের দিকের দুটি ফাঁককে যুক্ত করেছে একটি অপূর্ব কাজ করা পাল্কি।

আমাদের দেশের পাল্কির মতো গোল হাতলযুক্ত নয়। পুরু চ্যাপটা হাতল। পাল্কির ছাদ ঢালু। পাল্কির দরজা খোলা।

পাল্কিটির গঠন পারিপাট্য সত্যিই সুন্দর, তার অলংকৃতি আরও চমৎকার। হাতল সমেত সমস্ত দেহটি ডার্ক মেহগিনি রঙের লাক্ষা পালিশ করা। মসৃণ হাতলে সোনালি রঙের বড় বড় ফুল-লতার কাজ। দরজার দু-পাশের দেওয়ালে পর পর রুপোলি রঙের মাঝখানে সোনালি চাকতি।

পাল্কিটি যে কোনও দর্শকের দৃষ্টিকে হরণ করবে। কিন্তু হৃদয়কে হরণ করবে আর একটি বস্তু। পাল্কির ভেতর বসে আছে কিমোনো পরা অপূর্ব-দর্শন একটি পুতুল-বধূ। সাধারণ পুতুলের চেয়ে আকারে অনেক বড় কিন্তু তার সিল্কের রঙিন কিমোনো ওই হলুদ আলোতে যেন মাখনের মতো নরম তুলতুল করছে।

তিলকের পাশে দাঁড়িয়েছিল তানাকা। সে বলল, কয়েক যুগ আগে আমাদের দেশের বিবাহিত বধূরা পাল্‌কিতে চড়ে পতিগৃহে যেত। তারপর ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল। সবশেষে মোটরকার। পাল্‌কিতে যাওয়ার সেই আমেজটাই হারিয়ে গেল।

তিলক মজা করে বলল, পাল্‌কির জন্য দুঃখ হচ্ছে, আমাদের দেশে এখনও এমন পল্লী আছে যেখানকার মেয়েরা পাল্‌কিতে চড়ে শ্বশুরবাড়ি কিংবা মন্দিরে দেবদর্শনে যায়। তোমার যদি নিতান্তই সাধ থাকে তাহলে একবার অন্তত চলো আমার দেশে, তোমাকে পাল্‌কি চড়াব।

একঝলক মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে তানাকা বলল, সত্যি, কথা দিচ্ছ?

তিলক বলল, আমি কথা দিলেই কি তুমি কোনও দিন আমার দেশে যাবে?

দিয়েই দেখো না।

তিলক হঠাৎ তনাকার হাতটা ধরে ফেলল। কিন্তু দুজনের কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

তিলকের মনে হল, বাইরের চন্দ্রালোকিত রহস্যময় রাত্রির পথ ধরে একখানি চিত্রিত পাল্‌কি এগিয়ে চলেছে। অতি দ্রুত সে পাল্‌কি বয়ে নিয়ে চলেছে মহাকালের বাহকেরা। তার ভেতরের বধূটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। আধো আলো, আধো অন্ধকারে ঢাকা সেই দিব্য বধূটির মুখ।

পরের দিন সকালে জলযোগের পর তানাকা বলল, আজকে একটু দূরের প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি।

তিলক বলল, কেন, তোমার টি-গার্ডেনে নিয়ে যাবে না? আমি তোমার চায়ের প্যাকেট মূল্য দিয়েই নিয়ে যাব।

তানাকা বলল, তুমি দাম দিয়ে কিনবে কোন দুঃখে। আমার বাগানের শ্রেষ্ঠ চা আমি উৎকৃষ্ট প্যাকেটে তোমাকে উপহার দেব।

খুব খুশির খবর। এখন যেখানে ইচ্ছে নিয়ে চল।

তোমার যাবার ইচ্ছে নেই?

এখন তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে তানাকা।

গাড়ি ছুটল হিয়েই পর্বতকে ডানদিকে রেখে উত্তরে ওহারার দিকে।

ওহারা পৌঁছে দেখা গেল, অল্প দূরত্বের ভেতর অনেকগুলো মন্দির রয়েছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অজস্র গাছপালার ছায়ায় মন্দিরগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ভেতর একটু বড় ধরনের মন্দির সানজেন ইন। ভিড় এখানেই বেশী। অমিতাভ তথাগতের একটি বিরাট মূর্তি আছে এখানে। তাঁর দুপাশে রয়েছেন দুই বোধিসত্ত্ব। পেছনে সারি দিয়ে বসে আছেন অসংখ্য ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি।

ওরা দুজনেই প্রণাম নিবেদন করল বুদ্ধের চরণে।

দূরে একটি গাছের তলায় দু'চারটি তরুণীকে দেখা গেল। তারা যেন গাছের ডালে কিছু বাঁধছিল।

তিলকচন্দন কৌতূহলী হয়ে উঠল। সে তানাকার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতেই তানাকার মুখে ফুটে উঠল একটুকরো বেদনার হাসি।

কি হল তানাকা?

ও দিকে তাকালে মন কেমন করে।

কেন? ওখানে কি আছে?

গাছের ডালে মন্ত্রলেখা মানতের কাগজ ওখানে বেঁধে দেয় কুমারী মেয়েরা।

তিলক জানতে চাইল, কিসের মানত?

প্রেমিকেরা প্রবঞ্চনা করলে বা মনে কোনরকম আঘাত দিলে প্রেমিকারা এইভাবে মনের বেদনা জানায় করুণাময় তথাগতের অঙ্গনে গাছের ডালে মন্ত্রলেখা কাগজ বেঁধে।

তিলক বলল, একটা প্রশ্ন করব?

তানাকা হেসে বলল, একটা কেন, যতগুলো খুশি করতে পার, আমি সানন্দে জবাব দেব।

আমার প্রশ্নটা কিন্তু আনন্দের সঙ্গে জড়িত নয়, বরং দুঃখের সঙ্গে।

অসংকোচে বল। বহু দুঃখের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়েছি, তাই দুঃখ-জয়ের কিছুটা শক্তিও অর্জন করেছি।

এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল তিলক, তুমি কি কোনদিন ঐ গাছের কাছে গিয়ে তোমার বেদনার কথা জানিয়ে এসেছ?

আবার সেই জলতরঙ্গ বাজল তানাকার হাসিতে।

হাসি থামলে বলল, সে দুর্ভাগ্য এখনও আসেনি।

তিলক সকৌতুকে বলল, তাহলে তো তোমার মনের মানুষটির প্রশংসা করতে হয় তানাকা।

এখনও সে নিন্দা প্রশংসার বাইরে। সময় মন্দ হলে ভাগ্যের দেবতাই একদিন আমাকে এই গাছের তলায় এনে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

তানাকা অর্থপূর্ণ মিষ্টি চাহনি হেনে তিলকের হাত ধরে মন্দির-চত্বরের বাইরে নিয়ে গেল।

খ্যাত অখ্যাত বেশ কয়েকটি মন্দির ওরা ঘুরে বেড়াল। যেগুলিতে দর্শনার্থীর ভিড় সেগুলিতেও কোন কলরব নেই। তিলক এরই ভেতর জেনে ফেলেছে, জাপানের মানুষ কত সুশৃঙ্খল। তাদের বিপুল উন্নতির চাবিকাঠি এই শৃঙ্খলাবোধ, আর শ্রমনিষ্ঠা।

অখ্যাত মন্দিরগুলোতেই ওরা বেশী করে ঘুরে বেড়াল। নির্জনতার যে একটা ধ্বনি আছে তা এসব জায়গায় এলে বোঝা যায়। আলোয় ছায়ায়, সবুজে সুনীলে সুনিবিড় মাখামাখি। এসব জায়গা ধ্যানের, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার।

পরের দিন তানাকাদের চা বাগান দেখতে গেল তিলক।

পাহাড় জুড়ে চায়ের বাগান। সবুজে মলমল করছে চা গাছগুলো। গ্রীন টি খাওয়ার রেওয়াজ আছে জাপানে। তবে অতি ছোটপাতার কোয়ালিটি চা কিয়োতোতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। সে সব উৎকৃষ্ট চা সাধারণত জাপানের মানুষই ব্যবহার করে, বাইরে কদাচিৎ চালান যায়। জাপানের জাতীয় পানীয়ের মর্যাদা পেয়েছে চা।

মেয়েরা মাথায় টুপির মত ফুলতোলা মোটা স্কার্ফ বেঁধেছে। টপাটপ গাছ থেকে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলছে চা পাতা।

নতুন মানুষটিকে তানাকার সঙ্গে ঘুরতে দেখে ওরা ওদের বিশেষ জাপানি ভঙ্গিতে অভিবাদন জানাল। শেষে মিষ্টি হেসে হাত নাড়ল।

তানাকা বলল, প্রায় চল্লিশ রকমের চায়ের চাষ হয় সারা জাপানে।

তিলক বলল, তোমার ছোট্ট পাহাড়টি ঘিরে দেখছি শুধু চায়েরই চাষ।

তানাকা বলল, আমরা সারা পাহাড়টা জুড়ে চায়ের চাষ করি, আবার পাহাড়ের ওপারে গেলে অন্য ছবি দেখবে।

সত্যি, পাহাড়ের পেছনে এসে আর এক দৃশ্য। বেশ খানিকটা সমতল জুড়ে অজস্র চৌকো কাটা ধানের ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা অপ্রশস্ত একটা নদী।

তানাকা বলল, কিয়োতো শহরটাকে ছেড়ে আসার আগে আমরা যে নদীটাকে পেরিয়ে এসেছিলাম, এটি সেই নদী। এই নদীকে আমরা বলি, কামৌগাওয়া, আর বিদেশীরা একে বলে ডাক রিভার। বছরের বেশীর ভাগ সময় এর শরীরটা শীর্ণ হয়ে থাকে, আবার যখন ফুঁসে ওঠে তখন ক্ষেতখামার ভাসিয়ে দিয়ে যায়। পলি পড়ে জমিতে, ধান হয় প্রচুর।

কথা বলতে বলতে ওরা পাহাড়টাকে বেষ্টন করতে লাগল। হঠাৎ ডানদিকে ফিরে অনেকগুলো গাছগাছালির ভেতর দেখা গেল একটি বড় আকারের কাঠের বাড়ি। তার মাথার ছাদ চীনে টালির ছাদের মত, কানা উঁচু, দৃষ্টি-নন্দন।

ঐ বাড়ির দুদিকে ঠিক ঐরকম নীলরঙের ছাদওয়ালা ছোট ছোট কটেজ।

তানাকা তিলককে নিয়ে ঐ বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকল।

তিলক চারদিকের পরিবেশ দেখে ভারি খুশি।

এইসব সুন্দর বাড়িগুলো কাদের তানাকা?

যারা ওখানে কাজ করছে বলতে পার তাদের। অবশ্য আমিও তাদের ভেতর একজন।

তিলক জানতে চাইল, ওখানে কি কাজ হচ্ছে?

তানাকা বলল, গেলেই দেখতে পাবে।

মাঝের ঐ সুদৃশ্য দোচালা উঁচু বাড়িটা, যার দুদিকে দুটো পাইন গাছ, ওটাতেও কি কাজ চলছে?

তানাকা বলল, এই সবকটা বাড়িই বাবার কর্মশালা। তবে মাঝের বাড়ির নিচতলাতে ড্রইংরুম। তার পাশেই অফিস ঘর। দোতলাতে আমাদের পৈতৃক নিবাস। এই বাড়িতেই আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি। এখন আমার ঠিকানা অতিথি-নিবাস। বাবা মারা যাবার পর তাঁর পঁচাশি বছরের এক ব্যাচিলার আঙ্কেল এখানে থাকেন। এই ব্যবসাবাণিজ্য এখনও তিনিই দেখেন। তাঁর কথাই শেষ কথা। বড় ভালবাসেন আমাকে। আমার সবকিছু বুক দিয়ে আগলাচ্ছেন।

তিলক বলল, আমার কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?

অবশ্যই। আমি তাঁর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

তিলক বলল, চল যাই।

এখনই নয়। আগে আমরা বাবার কর্মশালা ঘুরে দেখব। সেই সময়ের ভেতর উনিও দোতলা থেকে নেমে আসবেন নিচের ড্রইংরুমে। তখনই তোমাকে নিয়ে যাব ওঁর কাছে।

তিলকের মনে হল, বিশ্বকর্মার কর্মশালায় ঢুকে পড়েছে সে। তিনখানা ঘর নির্দিষ্ট আছে চায়ের জন্য। সেঁকে শুকিয়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে বিভিন্ন কোয়ালিটির চা প্যাক করে রাখা হচ্ছে নানা ধরনের আধারে। অতি সুদৃশ্য সব কোম্পানির লেবেল আঁটা আধার। এগুলো চালান যাবে দেশের বিভিন্ন শহর অঞ্চলে। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়বে দেশের সর্বত্র।

আর দুখানা ঘর জুড়ে তাঁত চলেছে। মাকুর আওয়াজ উঠেছে ঠক্ ঠক্। সিল্কের সুতোয় বোনা হচ্ছে কিমোনোর কাপড়। একদিকে সেলাই মেশিনের শব্দ, কিমোনো তৈরি হচ্ছে। তের পিস কাপড় জুড়ে নানা রঙের বাহারি সব কিমোনো। সিল্ক ব্রোকেডের অতি দামী কিমোনো থেকে, মাঝারি দামের ফুল তোলা কিমোনো। কালো কিমোনোগুলো আনুষ্ঠানিক পোশাক। বাচ্চাদের কিমোনোগুলো ভারি সুন্দর ফুলের কাজ করা।

দেয়ালের একদিকে হ্যাঙারে ঝুলে আছে সেইসব কিমোনো। সব যাবে কিয়োতো শহরের মার্কেট প্লেসে।

এবার তানাকার পিতৃ-সদনের দক্ষিণ দিকের ঘরগুলোতে ঢুকল দুজনে।

দুটো ঘর জুড়ে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের জাপানি পুতুল। কিমোনো পরা পুতুলই বেশী। একটা দেয়াল জুড়ে পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডে চেরি গাছ। তার তলা দিয়ে কিমোনো পরা পুতুলগুলো যেন লীলাভরে হেঁটে চলেছে। কেউ ছাতা মেলে দিয়েছে মাথার ওপর। কারু হাতে আধখানা চাঁদের মত হাত পাখা।

আর একটি ঘরে চলেছে এম্‌ব্রয়ডারির কাজ। অতি চমৎকার সব ডিজাইন। টেবিল, টিপয় ক্লথ থেকে, নানারকম পাত্রের ঢাকা। সোফা কৌচের পিঠের অলংকরণ, বেডকভার, পোশাক, সব কিছুকেই উজ্জ্বল, সুন্দর, রুচিশীল করে তুলেছে এই এম্‌ব্রয়ডারির কাজগুলো।

শেষ ঘরটি আকারে কিছুটা লম্বা। তার একদিকে চলেছে কাঠের বাক্স, আলমারি আর টিপয়ের ওপর নক্‌শার অপূর্ব সব কাজ। অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে বুৎসুদান। ছোটবড় নানা আকারের বুৎসুদান বা বুদ্ধের স্থান। চায়ের পরে এর চাহিদাই বেশী।

ছোট বড় কাঠের ঘর এগুলো। বেশ নক্‌শা তোলা। কাঠের নক্‌শার পর সেগুলোর ওপর লাক্ষা পালিশ চলেছে।

জাপানের প্রায় ঘরে ঘরে একটি করে বুৎসুদান বসানো থাকে। ওটির ভেতর বিরাজ করে পূর্বপুরুষদের আত্মা। সেখানে প্রতিদিন ফুল, জল আর খাবার দিয়ে ঘণ্টা বাজানো হয়।

এ ব্যাপারটা তিলকের অজানা ছিল না। কিন্তু এখানে সে দেখল, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে।

এরপর তানাকা তাকে নিয়ে গেল, তার সেই বৃদ্ধ পিতামহের কাছে।

ড্রইংরুমে বসেছিলেন পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ মানুষটি।

প্রথম দর্শনেই তিলক অবাক হল। এমন দশাসই পুরুষ জাপানিদের ভেতর বড় একটা দেখা যায় না। পঁচাশি বছরেও গায়ের রঙ ঠিক কাঁচা সোনার মত। এক মাথা চুল। গায়ের চামড়া যতটুকু দেখা যাচ্ছে, মসৃণ।

তিলক আশ্চর্য হল, তানাকার দাদুর বসার আসনের ঠিক পেছনে একটি মূর্তি দেখে।

কাঠের প্রমাণসাইজ একটি মূর্তি। লাক্ষা পালিশে ঝক্ ঝক্ করছে। ডানহাতে উঁচু করে ধরা আছে একটি চওড়া তরবারি। ঠিক সামুরাইদের ভঙ্গি। বুক আর উদর ঢেকে বর্ম। মাথার কেশগুচ্ছ ঝুটি করে বাঁধা। মুখে হুঙ্কার, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

তানাকা তার দাদুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তিলকের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলেছে, অমনি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জাপানের আন্তরিক শিষ্টাচারের রীতি অনুযায়ী তিলকচন্দনকে অভিবাদন জানালেন।

তিলক মূর্তি দেখায় মগ্ন ছিল, তাই ভুলে গিয়েছিল বৃদ্ধকে প্রথমে অভিবাদন জানাতে।

এখন সে বার বার নত হয়ে বৃদ্ধের কাছে তার শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ করল।

বৃদ্ধ হাত তুলে তাঁর উল্টোদিকে তিলককে আসন গ্রহণ করবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। তিনি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট কিমোনো জাতীয় একটি পোশাক পরেছিলেন।

তানাকা তিলকের থেকে খানিকটা তফাতে হাঁটুমুড়ে বসল তার দাদুর মুখোমুখি।

তানাকা দাদুর কাছে সরাসরি তিলককে তার ভারতীয় বন্ধু বলে পরিচয় দিল।

বৃদ্ধের চোখে মুখে ফুটে উঠল প্রসন্ন হাসিটি। তিনি বললেন, ভারত থেকে একজন ঋষিকবি একসময় আমাদের দেশে এসেছিলেন। আমি সে সময় তাঁকে দেখবার জন্য টোকিয়োতে যাই। এক ঘরোয়া সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাঁর মুখ থেকে কিছু আলোচনা শুনেছিলাম। অপূর্ব! অপূর্ব! মানুষটি যেমন সমাহিত, তাঁর ভাষণও তেমনি স্তব্ধ হয়ে শোনার মতো।

তিলক বলল, উনি কেবল নোবল লরিয়েট কবিই নন, বিশ্ববন্দিত এক চিন্তাশীল দার্শনিক।

বৃদ্ধ বললেন, আমি তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলাম।

সেদিন তিলকের অনেক কথা হল বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে।

একসময় তিলক ওই সামুরাই মূর্তিটির প্রসঙ্গ তুলে তার কৌতূহল প্রকাশ করতেই বৃদ্ধ বললেন, আজ এ বেলা এই বাড়িতেই তোমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দেবে। বিশ্রামের পর ও বেলা যখন আমি আবার এখানে এসে বসব তখন তোমার কৌতূহলের জবাব পেয়ে যাবে।

খাওয়ার পরে বৃদ্ধ বিশ্রাম করছিলেন। ওরা দুজনে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারা কম্পাউণ্ডের গাছপালার ভেতর দিয়ে। তিলক কিন্তু একবারও তানাকার কাছে সামুরাই-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি। তানাকাও নিজের থেকে আলোকপাত করেনি সে প্রসঙ্গে।

তিলক হাঁটতে হাঁটতে বলল, কী গভীর নিষ্ঠায় তোমার কর্মীরা কাজ করে চলেছে, দেখলে অবাক হতে হয়।

তানাকা বলল, এখানকার কর্মীরা কেউ কিন্তু মালিকের কাজ করছে না, তারা সবাই নিজেদের কাজেই ব্যস্ত।

কি রকম?

যদিও কাগজে কলমে তানাকা ইণ্ডাস্ট্রির মালিক আমি কিন্তু বাবার নির্দেশ আছে এর সমস্ত লাভ আমার সঙ্গে সমান ভাগ করে নেবে প্রতিটি কর্মী।

তিলক বলল, তোমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত মহৎ এবং উদার হৃদয়ের মানুষ।

বাবার প্রশংসা শুনে তানাকা একটু থমকে দাঁড়াল। বলল, সন্ধ্যায় অতিথি নিবাসে আমি আমার পরলোকগত মা বাবা সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাকে শোনাব।

তিলক বলল, আমি শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।

ওরা বেশ কিছুক্ষণ হাতে হাত মিলিয়ে ঘুরে বেড়াল বড় বড় গাছের ছায়ার তলায়। ওরা কিন্তু তখন কোনও কথা বলছিল না। হাত কথা বলে। দুটি আকাঙ্ক্ষিত জন হাতে হাত রাখলে প্রাণের কথাগুলি আপনিই বোঝা যায়।

তিলক বুঝতে পারেনি অপরাহ্নে তার জন্যে কতখানি চমক অপেক্ষা করে আছে।

তেমনি সামুরাইয়ের পাদপীঠে নিজের আসনে বসেছিলেন তানাকার পিতামহ আর বিপরীত দিকে তারা দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তানাকার দাদু বলতে লাগলেন, আমার পেছনে যে মূর্তিটি দেখছ তা এক সম্ভ্রান্ত সামুরাইয়ের মূর্তি। কল্পনার ওপরে এই মূর্তিটি তৈরি হলেও আমরা মনে করি ইনি ছিলেন আমাদের বংশের আদি পুরুষ।

তিলক বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি আপনার কথার মাঝে কথা বলছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার দেহের গঠনের মধ্যেও আমি ওই বলিষ্ঠ ভাবটি লক্ষ্য করেছি। অবশ্য আপনার মধ্যে সেই যোদ্ধার বীরত্ব ও ক্রুদ্ধ ভাবটি নেই। তার পরিবর্তে এক ধরনের প্রসন্ন প্রশান্তি আছে।

বৃদ্ধর মুখে একটুকরো আনন্দময় হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, অনেকেই আমার দেহসম্বন্ধে এই ইঙ্গিতই করে থাকেন। তবে এত যুগ পরে আমার হাত থেকে অস্ত্র আর বুক থেকে বর্ম খসে পড়ে গেছে।

এবার অনাবিল হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললেন তিনি।

আবার শুরু হল কথা ঃ

আগেকার দিনে সামুরাইরা ছিল দুর্দান্ত যোদ্ধা। তারা এক একটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে জাপানের বিভিন্ন অংশে রাজার মতো বিচরণ করত। সামুরাই যোদ্ধাদের প্রধান বা সর্দারকে বলা হত শোগুন।

আমাদের পূর্বপুরুষ যে শোগুনের অধীনে কাজ করতেন তাঁর নাম ছিল টাইকান। আর আমাদের সামুরাই পূর্বপুরুষটির নাম ছিল সানো।

কয়েকজন সামুরাই সর্দার থাকতেন শোগুনের সভাসদ। তাদের অধীনে শক্তিশালী যোদ্ধাদের দল থাকত। তেমনি একটি দলকে পরিচালনা করতেন সামুরাই সানো।

অজস্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে জাপান সাম্রাজ্য। তারই ভেতর একটি দ্বীপে জনৈক শোগুন সর্দার গড়ে তুলেছিলেন ছোট্ট একটি রাজ্য। ওই দ্বীপটি সমুদ্রের তুফান বলয়ের ভেতরে সুরক্ষিত ছিল। প্রবল ঝটিকা এবং সমুদ্রতরঙ্গ ওই দ্বীপে আছড়ে পড়ত।

অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন ওই দ্বীপের অধীশ্বর। জলস্তম্ভ তুফানের ভেতর দিয়েও যাতায়াত করতে পারত ওই দ্বীপের সামুরাই যোদ্ধারা। তারা জলযানে করে মূল দ্বীপরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ত। সেখানে লুণ্ঠন ইত্যাদি করে, প্রয়োজনীয় জিনিসে জলযানগুলিকে পূর্ণ করে, আবার ফিরে যেত।

কোনও কোনও দুঃসাহসী বণিক সেই দ্বীপে পণ্য নিয়ে গেলে তাকে অত্যন্ত সমাদর করত সেখানকার সামুরাই-প্রধান। যদিও ওই আবর্ত সঙ্কুল জলপথ পেরিয়ে বণিকরা সাধারণত যেতে চাইত না।

কথাটা কয়েকজন বণিকের মুখেই প্রথম প্রচারিত হয়।

তিলক বলল, কি কথা?

সেখানকার অধীশ্বর শোগুনের কন্যা নাকি পরম রূপবতী। সেরকম সুদর্শনা কন্যা স্বয়ং জাপ-সম্রাটের প্রাসাদেও দুর্লভ।

শোগুন টাইক্কানের কানেও সেই খবর পৌছলো। তিনি কন্যাটিকে লাভ করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন।

একদিন টাইক্কান তাঁর সভাসদ সামুরাইদের কাছে প্রকাশ করলেন তাঁর মনের ইচ্ছা ঃ

কে পারবে সেই কন্যাকে হরণ করে আনতে।

সমুদ্রতরঙ্গের ওপর মাথা উঁচু করে থাকা ডুবো পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘূর্নিবলয় পেরিয়ে কে পৌছতে পারবে ওই দ্বীপে। শুধু পৌছনোই নয়, কন্যার পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিতে হবে। সম্মতি না দিলে হরণ করে আনতে হবে কন্যাকে।

শোগুন টাইক্কানের কাছে দুর্গম ও অসম্ভব পরিস্থিতির কথা ভেবে সবাই মাথা নিচু করে রইল। যত বড় যোদ্ধাই হোক, এ কাজে তার পক্ষে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব।

সামুরাই সানো মাথা উঁচু করে বললেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি সর্দার।

টাইক্কান চিৎকার করে বললেন আমার সহযোগী সামুরাইদের মধ্যে অন্তত একজনও রয়েছে যার কথা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠল।

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন আমার পূর্বপুরুষ সানো।

সারারাত ধরে তিনি মনে মনে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে যুদ্ধ করে, বিক্রম দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না। কৌশলের পথ অবলম্বন করতে হবে।

সানো কোনও যোদ্ধাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন না। সমুদ্র তুফানের সঙ্গে নিত্য যে সব ধীবর যুদ্ধ করে, যারা তুফান ও চোরাস্রোতের সন্ধান জানে, তাদের ভেতর বুদ্ধিমান ও বলশালী চারজনকে সঙ্গে নিলেন।

একটি সদাগরী জলযান ভাড়া করে তারা উঠল কিছু মূল্যবান পণ্য নিয়ে। তার ভেতর ছিল কতকগুলি অতি সুদৃশ্য কিমোনো, আর বহুমূল্য কিছু রত্ন। এই রত্নের মধ্যে মুক্তোর মালা ছিল অনেকগুলি। সেই মালাগুলি কারুকার্য করা মুখ ঢাকা একটি সোনার পাত্রে রাখা ছিল।

শুরু হল যাত্রা। রাজহাঁসের মতো সেই দক্ষ ধীবরেরা উড়িয়ে নিয়ে চলল পণ্যবাহী জলযানটি।

ঘূর্ণির গ্রাস থেকে বেঁচে, তুফানের প্রহারকে আড়াল করে একদিন সেই জলযান পৌছে গেল ওই বহু আকাঙ্খিত দ্বীপের তটে।

সামুরাই সানো একজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে চললেন শোগুনের রাজপ্রাসাদ লক্ষ্য করে। সঙ্গে বাহকের মাথায় পণ্যসামগ্রী।

দ্বীপের অধীশ্বর তাঁর সামুরাইদের নিয়ে বসেছিলেন সভা সাজিয়ে। ঠিক সেই সময় বিদেশী বণিক পরিচয় দিয়ে সানো রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

তিনি শোগুনকে তাঁর পণ্যসম্ভার দেখাতে চাইলেন।

শোগুন বললেন, কি পণ্য আছে তোমার পসরায়?

সানো একে একে তাঁর পণ্যের ফিরিস্তি দিলেন।

শোগুন হেসে বললেন, এ পণ্য রাজগৃহের মেয়েরাই দেখবে। তাদের পছন্দের ওপরেই তোমার পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে। তুমি বিশ্রাম কর, এখুনি সভা ভঙ্গ হচ্ছে। মধ্যাহ্নকাল গত হলে আমার কন্যাই তোমার পণ্যসামগ্রী দেখবে।

সানো কেবল স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, পরম রূপবান পুরুষ হিসেবে সুখ্যাতি ছিল তাঁর।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে এবার একাই গেলেন সানো। নির্বাচিত কয়েকটি অতি সুদৃশ্য কিমোনো ও সোনার পাত্রে রাখা মুক্তোর মালা নিয়ে গেলেন তিনি।

মূল প্রাসাদের অল্প দূরে রাজকন্যা থাকেন মনোরম একখানি গৃহে। সবুজ বনভূমি পরিবেষ্টিত সুনীল সাগরের তীরে সেই গৃহখানি কোন সাগর-কন্যার লীলা নিকেতন বলে মনে হয়।

সামুরাই সানোকে গবাক্ষ পথে আসতে দেখেছিল রাজকন্যা উজিয়ামা। প্রথম দর্শনেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্তরে। সে তার কক্ষ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, সঙ্গিনী আর পরিচারিকাদের।

পথ-প্রদর্শক, সানোকে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েই অদৃশ্য হল। উজিয়ামা এগিয়ে এসে বিদেশী বণিক সানোকে অভ্যর্থনা করে কক্ষের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

সেদিন দুজনে মুখোমুখি বসে দুজনকে দেখল। দৃষ্টির ভেতর দিয়ে জন্ম নিল ভালবাসা। দু'চারটি কথার বিনিময়ে হল হৃদয় বিনিময়।

শ্রেষ্ঠ কিমোনোখানি পরে, গলায় দুর্লভ মুক্তোর মালা দুলিয়ে পিতাকে মনের খুশি ও অভিবাদন জানিয়ে এল রাজকন্যা উজিয়ামা।

মহা খুশি শোগুন সর্দার। তিনি বললেন, আজ সন্ধ্যা সমাগত। বিদেশী বণিকদের অতিথি-ভবনে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। কাল সভায় ওকে পুরস্কৃত করা হবে।

শোগুন সর্দার সকল বিষয়ে পরামর্শ নিতেন তাঁর কন্যার। উজিয়ামা কেবল সুন্দরীই ছিল না, তার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ওপর গভীর আস্থা ছিল সর্দারের।

কিন্তু ভালবাসার আকর্ষণ সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়।

সেই রাতেই অস্ফুট জ্যোৎস্নার আলোকে সামুরাই সানোর সঙ্গে গৃহত্যাগ করল উজিয়ামা।

ঝটিকা সংক্ষুব্ধ সমুদ্র, ডুবো পাহাড়ের ঘন ঘন মাথা তোলা, এরই ভেতর দিয়ে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ধীবরদের সিদ্ধ হস্তের চালনায় সানোর জলযানটি ছুটে চলেছিল। হঠাৎ তালভঙ্গ হল। একজন চিৎকার করে উঠল, পেছনে তাড়া করে আসছে চার চারটে নৌকো। ক্রমে ব্যবধান কমে আসতে লাগল।

সানো দেখলেন, সব কটাতেই সামুরাই যোদ্ধারা অস্ত্র উঁচিয়ে বসে আছে।

তিনি আদেশ করলেন, প্রাণপণ দাঁড় টেনে উড়ে চলে যাও। ওরা জলদস্যু নয়, সামুরাই যোদ্ধা।

উজিয়ামা সানোকে জড়িয়ে ধরে দেখছিল পুরো দৃশ্যটা। সে বলে উঠল, ঐ তো সামুরাই হায়াসী। ও আমার বাবার ডানহাত। আমাকে পাবার জন্যে ও বহু ফন্দি ফিকির করেছে।

ও কি করে জানল, আমরা দ্বীপ ছেড়ে পালাচ্ছি?

উজিয়ামা বলল, একমাত্র জানে আম্মার প্রধান পরিচারিকা। ওকে অনেক অর্থ দিয়ে এসেছি, তবু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

হাতখানা ক্রমশ কঠিন হল সানোর। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ডান হাতে ধরে থাকা অস্ত্রটা জলযানের আড়ালে গোপন করে রাখলেন।

ঐ তো বাঘের মত লাফিয়ে আসছে হায়াসীর নৌকোটা। তাকে অনুসরণ করে বাজের মত উড়ে আসছে বাকি তিনটে।

মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল ধীবরগুলো, সামাল, সামাল, ঘূর্ণি!

ততক্ষণে হায়াসীর নৌকো প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সানোর জলযানের ওপর।

স্বল্প জ্যোৎস্নালোকে সহসা ঝিকিয়ে উঠল সানোর তরবারি। ছিট্‌কে জলে পড়ে গেল হায়াসীর মুণ্ডুটা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র উঁচিয়ে রে-রে শব্দে অকুস্থলে এসে পড়ল বাকি তিনটে নৌকো।

মহা ঘূর্ণির আবর্তে ততক্ষণে পড়ে গেছে সবকটা জলযান। ওরা উত্তেজনায় বুঝতে পারেনি সামনে মহামৃত্যুর ফাঁদ।

ক্ষণিকের জন্যে শোনা গেল আর্ত চিৎকার, পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর জলকল্লোল ধ্বনির মধ্যে তা ডুবে গেল।

তিনজন ধীবর দাঁড় তুলে নিয়েছে জলযানের ভেতর। শুধু একজন অভিজ্ঞ ধীবর হাল ধরে বসে আছে স্থির হয়ে। প্রবল আবর্তের ভেতর অকল্পনীয় গতিতে ঘুরতে ঘুরতে যেন পাতাল-প্রবেশ করছে জলযানটি।

কয়েকমুহূর্ত পরে একটা বিপরীত ঘূর্ণির পাকে আবার ঠিক তেমনি করে ওপরে উঠে এল সেই যান। উঠল যেন একটা জলস্তম্ভের ওপর। সেই স্তম্ভ ভেঙে পড়তেই তীর বেগে একটা প্রবাহ জলযানটিকে পিঠে তুলে নিয়ে বিদ্যুৎ-গতি অশ্বের মত কূল অভিমুখে ছুটে গেল।

একসময় তীরের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে গেল জলযান; ছিট্‌কে গেল আরোহীরা। কিন্তু খানিক দূরে

নরম বালিতে এসে পড়ায় গুরুতর হল না আঘাত।

উজিয়ামাকে সারাক্ষণ বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখেছিলেন সানো। আর একটি মহামূল্য রত্ন পেটিকাকে সাবধানে আগলে রেখেছিল উজিয়ামা।

ধীবরদের বিদায় দিয়ে জনপদে গিয়ে দুটি অশ্ব সংগ্রহ করলেন সানো। সেই অশ্বে আরোহণ করে সন্ধ্যার মুখে তাঁরা দুজনে এসে পৌঁছলেন শোগুন টাইক্কানের প্রাসাদের সামনে।

সারাদিনের যাত্রায় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, অবসন্ন তাঁরা। অশ্ব থেকে দুজনেই নেমে দাঁড়ালেন। এখন কেবল বাকি প্রাসাদে প্রবেশ।

উজিয়ামা প্রশ্ন করল, এ কার প্রাসাদ?

উত্তর দিলেন সানো, আমাদের সর্দার টাইক্কানের। ওঁরই নির্দেশে তোমাদের রাজ্যে আমার যাওয়া। সারা নিপ্‌পনে তোমার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। শোগুন টাইক্কান চান, তাঁর প্রাসাদে তুমি সাম্রাজ্ঞীর মহিমায় অবস্থান কর।

উজিয়ামা অনুত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমিও কি তাই চাও?

মাথা নত হল সামুরাই সানোর। তিনি কোন কথা বলতে পারলেন না। একদিকে সর্দারের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে ভালবাসা। উভয় দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে তিনি ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলেন।

উজিয়ামা বলে উঠল, বিপদ মাথায় নিয়ে আমার রাজ্য ছেড়ে তোমার এখানে চলে আসার একমাত্র কারণ বা আকর্ষণ, তুমি। আমার এই মানসিক অবস্থায় স্বয়ং জাপ-সম্রাট আমাকে তাঁর সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী করতে চাইলেও আমি তা হেলায় প্রত্যাখ্যান করব।

একটু থেমে আবার বলল, তুমি যদি তোমার সর্দারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য আমার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে, তবে জীবিত নয়, মৃত।

কথা শেষ করেই উজিয়ামা তাঁর কোমরবন্ধ থেকে তীক্ষ্নধার একটি ছুরিকা বিদ্যুৎ বেগে বের করে আনল।

সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন সামুরাই সানো। আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এই মুহূর্তে আমি আর সামান্য সামুরাই নই, আমি এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। ভালবাসা আমাকে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য দান করেছে।

শোগুন টাইক্কানের প্রাসাদে প্রবেশ না করে, সারা রাত ধরে দুজনে অশ্বারোহণে এই নির্জন পার্বত্য এলাকায় এসে পড়েছিলেন।

বৃদ্ধ সামান্য সময় থেমে বললেন, এঁরাই কিয়োতোতে আমাদের বংশের আদি জনকজননী।

সূর্যের দেবী আমাতেরাসুকে যেমন জাপান সম্রাটদের আদি জননী রূপে অভিহিত করা হয়, ঠিক তেমনি আমি আমাদের কিয়োতো বংশধারার আদি জননী বলে ভাবি উজিয়ামাকে।

তিলক জানতে চাইল, আপনার কিয়োতো বংশের আদি পুরুষ সানোর যেমন দারুমূর্তি নির্মাণ করে রেখেছেন, আদি জননী উজিয়ামার তেমন কোন মূর্তি আছে কি?

বৃদ্ধ বললেন, আমাদের এখান থেকে কিমোনো পরা যেসব মেয়ে-পুতুল তৈরী হয়ে দেশ-বিদেশের বাজারে যায়, তাদের আকৃতি ও মুখশ্রীর সঙ্গে জননী উজিয়ামার মিল আছে বলে আমরা মনে করি। সতেরোশ পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিখ্যাত শিল্পী হোসোদা, সৌন্দর্যের রাণী উজিয়ামাকে নিয়ে যে চিত্র প্রস্তুত করেন আমাদের পুতুল তারই অনুকরণে তৈরী।

সে রাত অতিথি-নিবাসে বড় আনন্দে কাটল দুজনের। তানাকা কথা দিয়েছিল টোকিয়োতে, তিলক কিয়োতো এলে কোতো বাজিয়ে শোনাবে। অনেক রাত অব্দি তাই তানাকার হাতের যাদুতে কোতোর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল অতিথি নিবাস থেকে জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনস্থলিতে।

কখনো কথা, কখনো বাজনা, কখনো মধুর হাসির তরঙ্গ, কখনো বা হাতে হাত রেখে নীরবে অনুভব।

সংযমের বাঁধ আগে কে ভাঙবে এই দ্বিধা ডিঙোতেই রাতভোর হয়ে গেল।

আসর ভাঙার আগে তানাকা বলল, তোমাকে আমার মা বাবা সম্বন্ধে কিছু শোনাব বলে আগাম বলে রেখেছিলাম, কিন্তু রাতে ইচ্ছে করেই তাঁদের কথা তুলিনি। আজ আমি তোমাকে দূরের একটা জায়গায় নিয়ে যাব, সেখানেই বলব তাঁদের কথা, কারণ সেখানেই শুরু হয়েছিল তাঁদের প্রথম পরিচয়-পর্ব।

মিনো যেন দশভূজা। দশখানা হাতে অতি দ্রুত তৈরী করে ফেলল ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের প্যাকেট। বোতলে জল আর ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়ে ওরা দুজনে পাড়ি দিল।

প্রায় দুঘন্টার পথ পেরিয়ে গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দাঁড়াল পথের ধারে একটা চটির সামনে। এখানেই আপাতত যাত্রার ইতি। চা পাওয়া যায় চটিতে। ড্রাইভারের খাবার তার সঙ্গেই আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অখণ্ড বিশ্রাম তার।

চটি থেকেই শুরু হয়েছে পাথর ছড়ানো রাস্তাটা। ওরা দুজনে নামল সে রাস্তায়। পাথুরে জমি ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। দিগন্তে দেখা যাচ্ছে ধূসর শৈলমালা। তাদের মাঝ বরাবর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি আগ্নেয় গিরি। বহুবছর নাকি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

পথ চলতে চলতে এসব বিবরণ দিচ্ছিল তানাকা।

আর একখণ্ড সবুজ চারদিকে প্রাণহীন প্রস্তরস্তূপের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। তানাকা তিলককে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে। প্রায় আধ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যাবার পর স্পষ্ট দেখা গেল কয়েকটি পাইন গাছ নিচ থেকে অল্প উঁচু পর্যন্ত থরে থরে চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপ তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও এগিয়ে চোখে পড়ল, পাইন গাছগুলোর ফাঁকে লাল টালি ছাওয়া একটি কাঠের বাড়ি।

কাছে পৌঁছে তানাকা বলল, বিয়ের আগে এটি ছিল আমার মায়ের বড় প্রিয় আস্তানা। আজ সারাটা দিন আমরা কাটাব এখানে।

তিলক বলল, দূরে ধূমল শৈল শ্রেণী। রোদে ভরা চরাচর, নীলাকাশে দুখণ্ড মেঘ, বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ—আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল এখানে এসে।

তানাকা বলল, দেখবে, এখানে স্নান করলে কত আরাম লাগে।

তিলক বাধা দিয়ে বলল, আবহাওয়া এখনও বেশ শীতল, স্নানের দরকারই হবে না। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় একেবারে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করব।

তানাকা হেসে বলল, এ বাড়িটি আসলে স্নানঘর। এখানে স্নান করতে পেলে সকলে খুশি হয়।

এবার তিলককে পথ দেখিয়ে তানাকা স্নান ঘরের পেছনে নিয়ে এলো।

বাইরে থেকে দেখা যায় না ছোট্ট এক কামরার কুঠি ঘরটি। সঙ্গে এক চিলতে কিচেন।

ঘর আর জানালা খুলে দেখা গেল পরিপাটি রয়েছে ঘর। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, এতটুকু ধুলো নেই কোথাও। কাঠের মেঝেতে কুচো খড়ের গদি। তার ওপর মাদুর পাতা। দিব্যি গা এলিয়ে বসে পড়ল দুজনে। একটু পরেই তানাকা ব্যাগ থেকে খাবার দাবার বের করল। প্লেটে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে তিলকের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আজ মিনোর হাতের তৈরী খাবার খাও, অন্য আর একদিন এসে এখানে পিকনিক করে যাব।

তিলক বলল, যে রাস্তায় আমাদের গাড়ি রয়েছে, সেটাতে কি শুধু প্রাইভেট কারই চলাচল করে?

তা কেন, দূর পাল্লার দুটো বাস যাতায়াত করে সারাদিনে। বহুদূর পর্যন্ত পাথুরে জমি, তাই লোকালয় গড়ে ওঠেনি। বড় ফাঁকা আর নির্জন জায়গা।

তাহলে তোমার মা কি করে থাকতেন এখানে?

সপ্তাহে মাত্র দুদিন এসে থাকতেন। সেই দুদিন এই স্নান ঘরে চলত সমারোহ।

তিলক কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি রকম সমারোহ?

কিয়োতো, ওসাকা, এমন কি টোকিয়ো থেকে কবি, শিল্পীরা চলে আসতেন এখানে। স্নান করতে করতে তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করতেন। শিল্পীরা ঐ কুয়াশার চাদর জড়ানো নীলাভ পাহাড়ের ছবি

আঁকতেন। সামনে থাকত থরে থরে সাজানো নীলাকাশের দিকে মাথা তুলে থাকা পাইনের সবুজ সতেজ গাছগুলো।

বরফের ঋতুতে আরও জমত আসর। তখন দূরের পাহাড়গুলো সাদা হয়ে যেত। ঐ উঁচু আগ্নেয়গিরির মাথায় সূর্য আপন হাতে পরিয়ে দিতেন সোনার মুকুট।

তিলক বলল, অপূর্ব! অপূর্ব! কিন্তু . .

তানাকা তাকাল তিলকের দিকে। চোখে প্রশ্ন, কিন্তু কি ?

ঐ প্রবল শীতে সে সময় স্নানঘরে স্নান করত কি করে?

হাসল তানাকা।

এতক্ষণ তোমাকে বলা হয়নি। উষ্ণ প্রস্রবনের জল ওঠে এই স্নান ঘরে। তাই বাইরে যত ঠাণ্ডা, ভেতরে স্নান করে তত আরাম।

তোমার মা বুঝি এই স্নান ঘরটি চালাতেন।

হাঁ, আমার মা ছিলেন অত্যন্ত নামী একজন গেইশা। তাঁর আলাপচারিতা, রুচি আর বোধ ছিল খুবই উন্নত মানের। শিল্প এবং সাহিত্যের তিনি মস্তবড় সমঝদার ছিলেন। কবি শিল্পীরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে কেবল আনন্দ পেতেন না, প্রেরণাও পেতেন।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল তানাকা, স্নান ঘরগুলোতে নারী আর পুরুষের নগ্ন হয়ে স্নান করার রীতি।

তিলক বলল, আমার অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি শুনেছি। আচ্ছা, নারী পুরুষ যদি একই স্নানঘরে নগ্ন হয়ে স্নান করে তাহলে সংযম বিঘ্নিত হয় না কি ?

একেবারে হয় না তা নয়, তবে খুব কমক্ষেত্রে। মা চমৎকার একটি কথা আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়ে গেছেন। কথাটি প্রভু বুদ্ধের।

তানাকা থামতেই কৌতূহলী প্রশ্ন তিলকের, কি সে কথা তানাকা?

'সংযম আর মৈত্রী'। এই দুটি শব্দের অনুশীলনে ভুবন-জয়ী হওয়া যায়। নিজেকে সংযত রাখা আর ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, প্রমত্ত মানুষের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেওয়া। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, মা, নিজের হাতে স্নান করিয়ে দিতেন নগ্ন পুরুষদের। মনে মনে কিন্তু জপ করতেন, প্রভু বুদ্ধের ঐ মন্ত্র।

তিলক বলল, কোন পুরুষ কি এ অবস্থায় কোনদিন বিচলিত হয়নি? কামনা পূর্ণ না হলে কি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেনি?

ঠিক সে সময়টিতে নিজেকে সংযত রেখে, ক্রোধ প্রকাশ না করে মৈত্রীর হাতটি বাড়িয়ে দিতে হয়। সে যে তোমার একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু তা অন্তর থেকে ঘোষণা করতে হয়। তারপরও যিনি স্নানঘরে আসেন তিনি শুদ্ধ পবিত্র জলেই স্নান করতে আসেন।

তিলক অবাক হল। অভিভূত হল তানাকার এ ধবনের বিশ্লেষণে ও মানসিকতায়।

এবার অন্যকথা পাড়ল তানাকা।

আমার বাবাও একদিন এসেছিলেন এই স্নানঘরে। তিনি কবি কিংবা শিল্পী ছিলেন না, ব্যবসার কাজ নিয়ে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। তখন ছিল শুধু চায়ের ব্যবসা। আমার জন্মের পর আমার বাবা এই 'তানাকা ইণ্ডাস্ট্রি' শুরু করেন।

বাবা এক সময় ক্লান্ত হয়ে এই স্নানঘরে স্নানের জন্য আসেন। এখানেই মায়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। বাবা কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, অত্যন্ত সংযমী মানুষ ছিলেন। সেদিন অন্য কোনও স্নানার্থী ছিলেন না। মা সুরভিত জলে ওঁকে স্নান করালেন। নিয়মমতো অঙ্গ সংবাহনও করে দিলেন। অন্যদের ক্ষেত্রে এই সময় যে ভাবটি ফুটে ওঠে, চোখে-মুখে যে চাঞ্চল্য দেখা যায় তার লেশমাত্র বাবাব আচরণে প্রকাশ পায়নি।

মা সেদিন না কি বাবাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন কিন্তু বাবা নির্বিকার। কেবল স্নানের আনন্দই উপভোগ করে গেছেন, আর কিছু না।

আমার মা কিন্তু কম আকর্ষণীয় ছিলেন না। মায়ের সাবলীল ও সুন্দর ব্যবহারে বাবাও সেদিন তৃপ্ত হয়েছিলেন।

চলে যাওয়ার সময় অতি সুন্দর একটি পার্সের ভেতরে মায়ের পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচটি সোনার মুদ্রা দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, খুব তৃপ্তি পেলাম, শান্ত হল মন।

মা শুধু বললেন, আবার আসবেন।

এই যাওয়া আসার ভেতরেই দুজন দুজনকে জানলেন। বাবা ঘন ঘন আসতে পারতেন না। কিন্তু মা আমার বাবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকতেন।

ধীরে ধীরে তাঁরা একসময় অনুভব করলেন, দুজনে পরস্পর দুজনের একান্ত আপনজন। কিন্তু সংযমের সীমা কেউ অতিক্রম করলেন না।

বাবা মানসিক দিক থেকে মাঝে মাঝে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়তেন। মা, সহানুভূতির সুরে বাবার কাছ থেকে জানতে চাইতেন তাঁর কষ্টের কারণ।

সেই সময়ই আমার মা জানতে পারেন, আমার বাবা দশ বছর বিবাহিত। কোনও সন্তান-সন্ততিই নেই তাঁদের। শুধু তাই নয়, ওঁর স্ত্রী দু-তিন বছর হল কঠিন পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু।

ব্যবসা করেন ঠিক, অর্থও আসে প্রচুর কিন্তু শান্তি আর আনন্দ তো অর্থ দিয়ে কেনা যায় না।

একদিন স্নান করতে করতে মাকে বললেন, ব্যবসার কাজে আমাকে অনেকসময় দূরে চলে যেতে হয়, তখন কেমন যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আমার স্ত্রী। পরিচারিকারা সেবা যত্ন করে, কিন্তু মনের খোরাক দেবার ক্ষমতা তো তাদের নেই। তাই আমি দূরে থেকেও ওঁর জন্য কষ্ট পাই।

কয়েকদিন পরে বাবা যখন আবার স্নান করতে এলেন তখন মা তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব রাখলেন।

আমি কি আপনার স্ত্রীকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি?

বাবা বললেন, কি রকম?

আমি কেবল গেইশাদের স্কুলে পড়াই না, নার্সের ট্রেনিংও আছে আমার।

তুমি কি ভাবে সাহায্য করতে চাও?

আমি ওঁকে সঙ্গ দিয়ে, সেবা করে সাহায্য করব।

এ প্রস্তাবে বাবা যেমন আনন্দিত হলেন তেমনি বিচলিতও হলেন। বিচলিত হলেন তাঁর স্ত্রীর কথা ভেবে।

ওঁর স্ত্রী কিন্তু প্রস্তাবটা শুনে দারুণ খুশি হলেন। তিনি যেন মনোমত একজন দরদী সঙ্গিনী পেয়ে গেলেন।

দিনে দিনে আমার মায়ের সেবায় ও সান্নিধ্যে মুগ্ধ হলেন তিনি। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে তাঁর প্রবল ইচ্ছায় বাবার সঙ্গে মায়ের মিলন হয়।

এখন আমার যে দাদুকে তুমি দেখছ, তিনিও মায়ের আচরণে ভারী তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরও পূর্ণ সম্মতি ছিল মাকে এই পরিবারের বধূরূপে গ্রহণ করে নেবার পক্ষে।

থামল তানাকা।

এর দু-বছর পরে আমার জন্ম। দূর সম্পর্কের এই জ্ঞাতি দাদুটি ছাড়া এখন সামুরাই সানো-র বংশে পুরুষ বলতে আর কেউ নেই।

সেদিন তিলক আর তানাকা স্নান করেছিল আদি মানব মানবীর অবয়ব নিয়ে। বিপরীতমুখী দুটি চৌবাচ্চায় উষ্ণ জলের প্রবাহে তারা নিজেদের আনন্দের স্বাদ খুঁজে পেয়েছিল।

তিলক রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতাটির ভাব আগে তানাকাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়ে পরে কিছু কিছু অংশ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল।

নগ্ন সৌন্দর্য যে কত সুন্দর ও শক্তির আধার হতে পারে তার পরিচয় পেয়েছিল সেদিন তানাকা।

যে নারী সৌন্দর্যের প্রতিমা তাকে কামনার দৃষ্টিতে দেখেছিল প্রেমের দেবতা মদন। তাই মহান শক্তিরূপিনী সেই নারীর কাছে পরাভব ঘটেছিল তাঁর।

তিলকের কণ্ঠে বেজে উঠল রবীন্দ্রনাথের নারী-মহিমার সেই অপূর্ব কবিতাটি।

'অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি।

তীরে, শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিত গৌরব
অনাদৃত — শ্রীঅঙ্গের উতপ্ত সৌরভ
এখনও জড়িত আছে—আয়ু পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্ণ কঠিন পাষাণে।

বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেতশিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে—

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুন্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণ চিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দি হয়ে আছে, তারই শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়
বাহুযুগে সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।

ত্যজিয়া বকুল মূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গ দেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে

ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানুপাতি বসি, নির্বাক বিস্ময় ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।'

কবিতাটি শুনে, তার ভাব উপলব্ধি করে সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তানাকা। ফিরে আসার সময় সে বলেছিল, আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কেউ কোনও দিন ছিন্ন করতে পারবে না।

আমার বাবা মায়ের মতো একদিন আমিও তোমাকে নিয়ে মিলনের নীড় রচনা করব।

নভেম্বরে ছুটি পড়ল। সস্ত্রীক সুমন্ত ঠাকুর তিলকচন্দনকে সঙ্গে নিয়ে দেশে পাড়ি দিলেন।

জাহাজঘাটে বিদায় জানাতে এসেছিল তানাকা।

সুমিতা বৌদি তানাকার চিবুকে হাত রেখে বলেছিলেন, দু-মাস বন্ধুকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে না?

তানাকা মুখ নিচু করেছিল, কোনও কথা বলতে পারেনি।

আবার বলেছিলেন সুমিতা বৌদি, আমার দেশে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?

তানাকা বৌদির হাত ধরে বলেছিল; ইণ্ডিয়া তো আমারও দেশ।

পাঁচ

প্রিয় চন্দ্রমল্লিকা,

অপরাহ্নের সোনালী আলোয় স্নান করতে করতে একটা নিঃসঙ্গ পরিযায়ী পাখি বাতাসে তরঙ্গ তুলে উড়ে গেল। হঠাৎ তার একটি পালক ঝরে পড়ল আমাদের সবুজ ঘাসে ছাওয়া বাগানে। আর ঠিক সেইমুহূর্তে ডাকপিওন এসে ঢুকল আমাদের ঘরে। আমার আকুল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এল তোমার চিঠি। কী আশ্চর্য! তোমার খামের এক কোণায় আঁকা হয়ে আছে একটু আগে দেখা আকাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া সেই পরিযায়ী পাখিটি!

প্রিয় বস্তুকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে আমি ভালোবাসি। তাই খামের মুখ না খুলে তোমার পাঠানো চিঠিটাকে খানিকক্ষণ আমি বুকের মধ্যে রেখে দিলাম। কিন্তু আমার অধীর আগ্রহকে বেশি সময় ধরে রাখতে পারলাম না।

খাম খুলতেই ছড়িয়ে পড়ল একটা মিষ্টি গন্ধ। মনে হল যেন তোমারই গায়ের সুবাস। তোমার চিঠি পড়ছি আর তোমাকে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। মুখোমুখি বসে তুমি যেমন করে কথা বলতে সেই কথাগুলোই যেন ছড়িয়ে দিয়েছ তোমার চিঠিতে।

তনাকার চিঠি পাওয়ার আনন্দে তিলকের প্রত্যুত্তরের প্রথম উচ্ছ্বাস।

তানাকার চিঠি ঃ

প্রিয় তিলকচন্দন,

আমি চিরদিনই চন্দনের গন্ধ ভালোবাসি। মনে আছে, একদিন তুমি আমাকে ওই চন্দনের টিপ পরিয়েছিলে। পাছে সেই টিপ মুছে যায় তাই সেদিন আমি স্নান করিনি। তোমার নাম, তোমার স্বভাবের সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল ওই চন্দন তিললকের। তাই তুমি বহুদূরে থেকেও আমার দিনরাত্রির চিন্তা ও স্বপ্নের ভেতরেই রয়েছ।

জানো, আমি কয়েকদিন আগে আমাদের সেই স্নানঘরে গিয়েছিলাম। মনে হল, তুমি আমার পাশে পাশেই চলেছ। আমি সেই চটিতে বসে এক কাপ চা খেয়েছিলাম। চটির সেই ছেলেটি বড় যত্ন করে আমাকে চা তৈরি করে দিয়েছিল, কিন্তু সে চায়ের স্বাদ আমি পাইনি, কারণ, তুমি পাশে ছিলে না।

আমি সেই চটিতে সেদিনই একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছি। বলতো, সেই বোর্ডে কি লেখা আছে?

অনেক ভেবেও তুমি সঠিক উত্তরটা খুঁজে পেলে না তো।

এবার শোনো, আমি লিখে দিয়ে এসেছি, 'স্নানঘর বন্ধ'।

অনেক কবি, অনেক শিল্পী আসতেন। আমার মা তাঁদের কাছ থেকে অনেক আনন্দের খোরাক পেতেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে অনেক রত্নের সঞ্চয় ছিল।

তুমি আমার কোহিনুর, সব রত্নের সেরা। তাই স্নানঘর বন্ধ করে দিয়েও আমার কোনও ক্ষোভ নেই। তোমার সঙ্গে একদিন স্নানঘরে কাটিয়েছি, তাই স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে থাক।

গভীর রাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, তখন, দূর থেকে ভেসে আসা কারো পায়ের ধ্বনি শুনতে পাই। মনে হয় তুমি আসছ। ধবধবে সাদা সারসের মতো প্লেনটা নীল সাগরের ওপর দিয়ে, সবুজ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে তোমাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে সিধে গাড়ি করে তুমি এসে নেমেছ আমার বাগানের সীমানায়। তারপর সেই পরিচিত পথ, চেনা পায়ের ধ্বনি।

এই ভাবনায় রাতের নিদ্রা আমার উধাও।

বড় জানতে ইচ্ছে করে, তোমার ভাবনার ছবিগুলো।

কবে পাব তোমার চিঠি এই আশায় দিন গুনছি।

দু'মাস ছুটি যে এত দীর্ঘ হয় তা আগে আমি জানতাম না।

তোমার
তনাকা

পুনশ্চ ঃ দাদা-বৌদির খবর জানতে বড় ইচ্ছে করে। জাহাজঘাটে বিদায়ের দিনে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছলেন। সে ছোঁয়া আজও আমার সারা দেহে লেগে আছে।—তনাকা।

পেছনে পায়ের সাড়া পেতেই ফিরে তাকাল তিলক। বৌদির আবির্ভাব।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি।

তোমার ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল বৌদি।

লেখার টেবিলের পাশে ওটা কী? চিঠি বলে মনে হচ্ছে?

তিলক হেসে বলল, দুঁদে ডিটেকটিভও দেখছি তোমার কাছে হেরে যাবে।—বলতে বলতে চিঠিখানা বৌদির দিকে এগিয়ে দিল। বৌদিও অগ্যস্ত মুনির মতো চিঠিখানা শুষে নিল এক গণ্ডুষে। শেষে কপালে হাত চাপড়ে বলল, অমৃতভাণ্ডটা উপুড় করে খেলো একজন আর তলানিটুকু পেল অন্যজন।

তিলকের চোখে বিস্ময়! সে বলল, তোমার হেঁয়ালিটা একটু খোলসা করে বলবে বৌদি?

পুনশ্চতে আমার জায়গা হয়েছে, তাই বলছিলাম।

তিলক বলল, ও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

ভাবী বউয়ের হয়ে আর সাফাই গাইতে হবে না ভাই। একটু থেমে বললেন, ছোট্ট চিঠিতে মেয়েটা তার সারা মনটাকে মেলে ধরেছে। জীবনে এমন একটা চিঠি তোমার দাদাকে আমি লিখতে পারিনি। হ্যাঁ, তুমি ওর চিঠির উত্তরে কি লিখলে তা যেন আমি দেখতে পাই।

শুরু করে দিয়েছি, শেষের দাড়িটা পড়লেই তুমি দেখতে পাবে।

সুমিতা বৌদি হেসে চলে গেলেন।

তিল আবার চিঠির পাতায় লেখা শুরু করল।

তোমার মায়ের স্মৃতির সুবাসে ভরা স্নানঘরটি বন্ধ করে দিলে কেন? তুমি লিখেছ, তোমার আর মণি কড়োবার দরকার নেই, কারণ তুমি নাকি মণির সেরা কোহিনুর পেয়ে গেছ।

ইঙ্গিতটা বড় স্পষ্ট, তাই সংকোচের শেষ নেই আমার। এক ডেলা কাচের পিণ্ডকে তুমি কোহিনুর

ভেবে বসে আছ, এ লজ্জা লুকোবার ঠাঁই নেই কোথাও। তবু ঘাসের ফুলেও শিশিরের ছোঁয়া লাগে, চাঁদের জ্যোৎস্না ঝরে। ভরসা এই টুকুই।

মাঝে মাঝে রাতে ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকি। মনে হয় তোমার ভালবাসা ঐ নক্ষত্রের রূপ ধরে জেগে আছে, যা নিত্য, যা অচঞ্চল।

সামুরাই সানো-র বংশের শেষ প্রতিনিধির আকার নিয়ে তোমার যে দাদু বসে রয়েছেন, তাঁর কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। যে শিলাস্তূপকে ঘিরে তোমাদের চায়ের বাগান, তারই যেন সংক্ষিপ্ত প্রতীক তিনি। ঐ টিলাটির মত কঠিন দৃঢ় দেহ। কিন্তু তার চিন্তা সজীব সবুজ। তোমার মায়ের সেবিকা-মূর্তিটি তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাই তোমার বাবা মায়ের বিয়েতে ছিল ওঁর পূর্ণসম্মতি।

ছবির মত আশ্চর্য সুন্দর দেশ তোমাদের। রূপ শুধু প্রকৃতিতেই নয়, মানুষের মনেও। তারা দক্ষ স্রষ্টার মত খণ্ড খণ্ড রূপের জগৎ তৈরি করতে পারে। ছোট ছোট হাইকুতে মনের সুখ দুঃখের কি চমৎকার ছবি আঁকা যায়। দু'একটি তুলির টানে জেগে ওঠে ফুজিয়ামা, পাখাটেনে উড়ে চলেসারস, বাঁশ গাছের ডালপাতার ফাঁকে চাঁদ ওঠে আর সাপের ফণার মত সাগরের ঢেউ আছড়ায়।

কত অল্পে কত গভীরকে ধরা যায় তার সফল পরীক্ষাগার হল জাপান।

তোমার দেশের বন্দনা গাইছি আমার দেশের মাটিতে বসে। একবার এ দেশে এসে যখন তুমি আবার জাপানে ফিরে যাবে, তখন তোমার লেখায়, বলায় এ দেশের হৃদ্ পদ্মটিও ফুটে উঠবে।

বড় ইচ্ছে করে তোমাকে দেখতে। তোমার অদর্শনে এই শীতের দিনেও বুকের ভেতর বিরহের মেঘ ঘনায়।

তুমি তো বিপুল কাজের ভেতর ডুবে থাক সারাদিন, আর এখানে আমার অখণ্ড অবসর। আমার ভাবনার পাখিগুলো তাই তোমার খবরের টুকরো টুকরো দানাগুলো সংগ্রহের আশায় ওড়াউড়ি করে।

কবে আমাদের বিরহ মধুর হবার রাত আসবে, তাই ভাবছি।

তোমার তিলকচন্দন

চিঠির তলায় শক্ত শক্ত বাংলা শব্দগুলোর জাপানী তর্জমা করে দিল তিলক। অসাধারণ ক্ষমতা তার যে কোন ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করে নেবার। জাপানী ভাষাটিকে এই অল্প সময়ের ভেতর সে যেভাবে লেখায় বলায় আয়ত্ত করে নিয়েছে তা শুধু প্রশংসার যোগ্য নয়, বিস্ময়েরও ব্যাপার।

ডাকে দেবার আগে চিঠিটি কথামতো সুমিতা বৌদির হাতে তুলে দিতে হল। উনি চিঠি নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বেশ কিছু সময় পরে ফিরে এসে বললেন, মূল্যবান চিঠিখানা আনাড়ির হাতে পড়ে পাছে খোয়া যায় তাই ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলে তো?

তুমি যে কি বল বৌদি।

সুমিতা বললেন, শোন, আজ ডাকে চিঠি ফেলা বেকার। সারারাত ডাকবাক্সে এমন জীবন্ত চিঠিখানাকে তালাবন্দী হয়ে থাকতে হবে। তার চেয়ে সকালে বাক্সে ফেলো, সাড়ে সাতটায় প্রথম ক্লিয়ারেন্সে চলে যাবে। এখন আমার কাছে থাক। তোমার দাদা সান্ধ্য টহল সেরে ফিরে এলে তাকে একবার পড়িয়ে জিজ্ঞেস করব, তুমি এমন একখানা চিটি লিখতে পারবে কি?

সুমিতা বৌদির পায়ের কাছে বসে পড়ল তিলক।

করুণ গলায় বলল, দোহাই তোমার বউদি, অমন নিষ্ঠুর হয়োনা। পথের থেকে একদিন দাদা আমাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, ও চিঠি পড়ার পরে দাদা আমাকে আবার ঐ পথের ওপরেই ফেলে দিয়ে আসবেন।

সুমিতা অভয় দেওয়ার ভঙ্গীতে হাতটি তুলে বললেন, মৎ ডরো। আমি থাকতে কার সাধ্য তোমার নখাগ্র স্পর্শ করে। তবুও যদি নির্ভয় হতে চাও, ধর তোমার চিঠি।

তিলক হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে চিঠিখানা বৌদির হাত থেকে নিয়ে বলল, আমার নখাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা দু'চারদিন অন্তত কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

সুমিতা বললেন, দু-চারদিন কেন?

তারপর নখাগ্র চাঁদের কলার মত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তিলকের কথার তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পেরে তার দিকে চেয়ে রইলেন সুমিতা বৌদি।

এবার তিলকচন্দন চিঠিখানা পকেটে পুরে দু'খানা হাতের দশখানা আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আজই নেলকাটারে নির্মূল করে ছেঁটে ফেলেছি নখগুলো। এখন কয়েকটা দিন ওগুলোকে স্পর্শ করার আর কোন সুযোগই নেই।

সুমিতা বৌদি এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।

অভাবনীয় ঘটনা। ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো কিন্তু সূর্যোদয়ের দেশ থেকে তিলকচন্দনের কাছে এলোনা কোন চিঠি।

অস্থির হয়ে উঠল তিলকচন্দনের দিনরাত্রি। তার লেখা চিঠি কি তাহলে পৌঁছয়নি তানাকার হাতে!

সে যখন অশান্ত মনে আরও একখানা চিঠি পাঠাবার জন্য সংকল্প করছিল, ঠিক তখনি জাপান থেকে এলো একখানা চিঠি। না, সে চিঠি তিলকচন্দনের নামে ছিল না, সেটি ছিল, জাপানের আর্টকলেজ থেকে পাঠানো সুমন্ত ঠাকুরের নামে একটি অফিসিয়াল চিঠি।

সবাই চিঠির বিষয়বস্তুটি জানার জন্য উৎকণ্ঠিত।

চিঠি পড়ার পরে গম্ভীর হল সুমন্ত ঠাকুরের মুখ। তিনি বললেন, জাপানের একটা বিশেষ অংশের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প। যার তাণ্ডবে প্রাণ হারিয়েছে বহু মানুষ, ভেঙে পড়েছে বহু ঘরবাড়ি। কলেজের বাড়িটিও ভগ্নদশায়। তাকে না সারিয়ে নতুন বিল্ডিং তোলার তোড়জোড় চলেছে। সুতরাং আরও চারমাস কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্ণিং বডি।

খবর জেনে স্তব্ধ সবাই। কখন কোন ফাঁকে টি. ভি.তে বিবিসি অথবা স্টার নিউজ খবর দিয়েছে, তার কোন হদিসই পায়নি এরা। বাংলা খবর কাগজের কোন্ কলমে, কোন্ কোণায় খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল তাও এই ঠাকুর পরিবারের অলক্ষে থেকে গেছে।

কিয়োতো পর্যন্ত কি প্রসারিত হয়েছিল এই বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ক্রিয়া?

চিঠিতে এ বিষয়ে কোন খবর ছিল না।

অতএব আরও কটি মাস কলকাতায় বসে থাকা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

তিলকচন্দনের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। অসহায়, নিরুপায় অবস্থায় অস্থির চিত্তে দিন কাটাতে হচ্ছিল তাকে। যে যন্ত্রণার হাত থেকে কোনভাবেই মুক্তি নেই, তার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় ছিল না তার। মনে হচ্ছিল, এখুনি সে ডানা মেলে উড়ে চলে যায় একটি ঘরে ফেরা পরিযায়ী পাখির মত।

ইদানিং মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল একটা ছবি, আর সে ছবি দেখতে দেখতে একটা বিষাক্ত কীট ছবির আড়াল থেকে উড়ে এসে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল তার বুকটাকে।

সে ছবি একটা বিবাহ-যাত্রার।

মহাসমারোহে সুসজ্জিতা কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোন বিবাহ সভায়। শোভাযাত্রার সামনে চলেছেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাকে ঠিক চিনতে পারছিল তিল। সেই সামুরাই সানো-বংশের শেষ প্রতিনিধিটি! মাঝে সখী-পরিবৃতা কন্যা। বসনভূষণের আড়ালে আধখানা দেখা যাচ্ছে কন্যার মুখ। আশ্চর্য সাদৃশ্য তার চেনা একটা মুখের সঙ্গে।

এই ছবিটুকু দেখার পরেই তিলকের হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে উড়ে আসে সেই কীট। তারপর বিষাক্ত দংশনে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় তাকে।

সুমন্ত ঠাকুরের কাছে জাপান থেকে চিঠি আসার পর একদিকে তানাকার জন্য তিলকের যেমন বেড়েছে দুর্ভাবনা, অন্যদিকে মন থেকে বিবাহ-যাত্রার ছবিটি মুছে গিয়ে তার ভেতরে এনে দিয়েছে একটা স্বস্তির ভাব।

১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত অশান্ত মন নিয়ে কলকাতায় আটকে থাকতে হল তিলককে। উদ্বেগ ভারি পাথরের মত ক্রমাগত চেপে বসছিল তিলকের মনে। পর পর চারখানা চিঠি পাঠিয়েও কিয়োতো থেকে জবাব আসেনি একছত্র। কি হল, কি হল ভাব সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছিল তাকে।

সে একসময় একাই জাপানে চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সুমিতা বৌদি কিছুতেই তাকে একা ছেড়ে দেননি। সেখানে তাদের আস্তানার কি অবস্থা তাও জানা নেই। একটি কর্মহীন যুবকের পক্ষে জাপানের মত ব্যয়বহুল জায়গায় একদিনও খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এসব ভেবে সুমিতা বৌদি তাকে আটকে রেখেছিলেন।

অবশেষে বসন্ত ঋতুতে জাপানের অতিকায় শুভ্র সারস পাখিটি তাদের বয়ে নিয়ে গেল সূর্যোদয়ের দেশে।

ওরা সভয়ে ডেরাতে পৌঁছে দেখল, আশ্চর্যভাবে অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের আস্তানাটি। আশপাশের বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কোনটার সারাই সম্পূর্ণ, কোনটা বা শেষ পর্বে। শোনা গেল, এ ধরনের বড় মাপের ভূমিকম্প নাকি অনেকেই তাদের সত্তর বছর জীবনকালের মধ্যে দেখেনি।

একটি ঘুমহীন রাত কাটিয়ে তিলক সুমিতা বৌদির হাতখানা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বলল, আমি আর কিছুই চাইনা বৌদি, ওরা এতবড় বিপদের হাত থেকে জীবনটা বাঁচাতে পেরেছে, এইটুকু শুধু জানতে চাই। তুমি আশীর্বাদ কর, আমার প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়।

ঠাকুরের কাছে আমি প্রার্থনা জানাব ভাই, যা করার তিনিই করবেন। তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, কোন অবস্থাতেই তুমি ভেঙে পড় না।

কিয়োতোর দিকে ট্রেনযাত্রার পথেই পড়ল সেই ফুজিয়ামা। পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর এবং জাপানের পবিত্রতম পর্বত, এই ফুজি।

কি অপরূপ মহিমায় শিরে শুভ্র তুষারমুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন জাপানের রক্ষাকর্তা দেবতা। জাপানীরা প্রতি বছর দলে দলে যায় ঐ পর্বতকে পুজো দিতে।

ফুজির দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা জানাল তিলক, হে রক্ষাকর্তা দেবতা, সবাইকে তুমি ভাল রেখ। তনাকাকে ... উচ্চারণ করতে গিয়েই বুকখানা তার হঠাৎ কেঁপে উঠল। সে মনে মনে ভাবল, দেবতার কাছে স্বার্থপরের মত কেবল একজনের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা জানাতে নেই।

কিয়োতো স্টেশনে পৌঁছল গাড়ি। পথেই ভূমিকম্পের অনেক ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়েছিল তার। মূলসুদ্দো ওপড়ানো বিশাল গাছ, ভাঙা বাড়ি, মাঠের এপার ওপার জুড়ে বিরাট ফাটল, আরও কতকিছু। বোঝা যায়, প্রচুর মেরামতির পরেও কিছু ক্ষত এখনও নিরাময়ের অপেক্ষায় আছে।

এ যাত্রায় একটা গাড়ি নিয়ে তানাকাদের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে একাই রওনা দিল তিলক।

প্রাচন পুরানো শহরের ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর। রাস্তাঘাটের মেরামতি আর কিছু রদবদল চোকে পড়ল।

এবার শহর ছাড়িয়ে আবার প্রান্তর। গাড়ি ছুটছে নির্দিষ্ট আস্তানার দিকে। তার আগে আগে ছুটে চলেছে তিলকের মন।

কাছাকাছি এসে টিলাটায় চোখ পড়ল। এ কি! কে যেন পরশুরামের কুঠার চালিয়ে চিরে দুফাঁক করে দিয়েছে টিলাটাকে। কারা যেন খামচে খামচে তুলে নিয়েছে কিছু কিছু চায়ের গাছ।

আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেল আগের ঘরবাড়ি বলতে কিছু নেই। মূল সুদৃশ্য বাড়িটির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটা ব্যারাক বাড়ির মত।

গাড়ি থেকে নেমেই সে দ্রুত পা চালিয়ে ঐ বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। ডান হাতে বাগানের ভেতর যে বাড়িটা ছিল সেটার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

তিলকের মনে হল, তার বুকের ভেতর কে যেন প্রবল বেগে ড্রাম পিটে চলেছে।

গাড়িটাকে ছেড়ে দিল না সে। তাকে দাঁড়াতে বলে ব্যারাক বাড়িটার মাঝখানের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হ্যাঁ, ঠিক ঠিক অফিস ঘরেই সে ঢুকেছে।

অবাক হয়ে দেখল, তানাকার দাদুর বিশাল চেয়ারখানা যেখানে থাকত, সেখানে সেটি নেই। সামান্য একটা কাজ চলার মত কুর্শি আর টেবল রয়েছে সেখানে। একটি মহিলা কুর্শিতে বসে আপন মনে কিছু কাজ করে যাচ্ছিলেন।

তিলকের পায়ের সাড়া পেয়ে তাকালেন তিনি। চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকা।

তানাকার কথা জানতে গিয়েও গলা দিয়ে শঙ্কায় স্বর বেরুল না। তার প্রশ্নটা এবার অন্যদিকে ঘুরে গেল।

আপনি যেখানে বসে আছেন সেখানে সানো বংশের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কয়েকমাস আগেও বসতে দেখেছি, তিনি এখন কোথায়?

ভদ্রমহিলা তিলককে বসতে বললেন।

তিলক বসলে তিনি বললেন, ভূমিকম্পের সময় আপনি কি জাপানেই ছিলেন? আপনাকে দেখে বিদেশী বলেই মনে হচ্ছে।

না, আমি আমার দেশ হিন্দুস্থানেই ছিলাম। আমি টোকিয়োতে আর্ট কলেজের ছাত্র।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি যাঁর কথা জানতে চাইছেন, তিনি এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বলি হয়েছেন। আপনি যে বাড়িতে তাঁকে বসতে দেখেছেন, এটি নিশ্চয় সে বাড়ি নয়।

তিলক বলল, না।

তার গলা কাঁপছিল।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, ভূমিকম্পের সময় তিনি এখানেই বসেছিলেন, বাইরে বেরুতে পারেননি। পুরানো দিনের কাঠের ভারি স্ট্রাকচার হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। তারই তলায় চাপা পড়ে শেষ হয়ে যায় তাঁর জীবন। এখানকার বহুকর্মী সেই ভূমিকম্পে মারা না গেলেও নানাভাবে প্রচণ্ডরকম আহত হয়।

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তিলক। প্রায় দম বন্ধ করেই জিজ্ঞেস করল, তানাকাকে দেখছিনা, সে কোথায়?

এখন এখানে থাকেন না তিনি। আমাদের ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে তিনি চবেল গেছেন তাঁর আর একটা আস্তানায়।

তিলক বলল, তাদের একটা 'চানঘর' ছিল, সেখানে কি?

হাঁ।

তিলক আর কোন কথা জানতে চাইল না। অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত পায়ে চলে এল গাড়ির কাছে। ড্রাইভারকে তানাকার ঠিকানা বলে দিয়ে উঠে বসল গাড়িতে। তার শরীরটা এখন পাখির মত হালকা হয়ে গেছে।

তানাকা বেঁচে আছে, এর চেয়ে মধুরতম সংবাদ পৃথিবীতে আর আছে বলে তার মনে হল না।

অপরাহ্ণের দিকে গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই নির্দিষ্ট টি-স্টলের ধারে। অদূরে দেখা যাচ্ছিল নীল পাহাড়, সবুজের ছোঁয়ালাগা একখণ্ড জমি। তারই ভেতর অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে আছে তানাকার চানঘর।

এখান থেকে পাথরে প্রান্তর পেরিয়ে তাকে যেতে হবে নীল আকাশের কোলে ঐ সবুজ পাইনের একটুকরো ল্যাণ্ডস্কেপের ভেতর।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে পাথুরে পথটা ধরে হাঁটতে লাগল তিলক। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল টিলার গায়ে থরে থরে সাজানো পাইন বন। তার ফাঁক দিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে চানঘরের চূড়া।

আরও, আরও কাছে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল মিনোকে। ঝকঝকে কিশোরী কন্যাটি হাতে একটা বাল্‌তি দুলিয়ে যাচ্ছিল ঝর্ণা থেকে জল আনতে।

হঠাৎ পথের দিকে চোখ পড়ল তার। সে থমকে দাঁড়াল। অভাবনীয় কিছু একটা সামনে দেখে সে একেবারে আত্মহারা। ঝর্ণাতলায় পড়ে রইল তার কচি কলাপাতা সবুজ বালতিটা। সে একটা চঞ্চল কিশোরী হরিণীর মত লাফাতে লাফাতে ছুটে এলো তিলকচন্দনের কাছে। খুশিতে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার। অপরাহ্নের আলোয় চিক্‌চিক্ করে উঠল তার সুন্দর চেরা দুটি চোখ।

কথা না বলে সে তিলকের হাত থেকে টেনে নিল ব্যাগটা। পেছন ফিরে এবার হাঁটতে শুরু করল।

তিলক ডাকল, মিনো।

থমকে ফিরে দাঁড়াল সে।

এবার তিলকের প্রশ্ন, দিদি কোথায়?

ইয়াজাকুরা গাছের তলায় বসে খেলনার পাল্‌কি তৈরী করছে।

পাল্‌কি!

কেন, তুমি কি আগে আমাদের শো-রুমে বিয়ের পাল্‌কি দেখনি? দিদি এখন এখানেই থাকে, পাল্‌কি আর পুতুলের কনে তৈরী করে শো-রুমে পাঠায়।

আমি তোমার দিদির কাছে তোমাদের খবর পাবার জন্য অনেক চিঠি লিখেছি, কিন্তু একটিরও উত্তর পাইনি।

মিনো বলল, তোমার চিঠি এলে আমি জানতে পারতাম। দিদি চিঠি পড়ত আর কাঁদত।

কাঁদত কেন মিনো?

দিদি তোমাকে খুউব ভালোবাসত। আমার কাছে বলেছিল তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

সে তো আমিও জানতাম মিনো, কিন্তু তাতে কান্নার কি আছে?

দিদির তো আর বিয়ে হবে না, তাই কাঁদত।

বিয়ে হবেনা দিদির! কিন্তু কেন?

জান না, ভূমিকম্পের সময় দিদি ছিল চা বাগানে। পাহাড় থেকে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিদির পায়ে এসে পড়ে। হাঁটুর হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এখন দিদি ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটাচলা করে। ডাক্তাররা বলেছে পরে নকল পা লাগিয়ে দেবে। ভাঙা পা বলে নাকি বোঝাই যাবে না।

তিলকের গলা আবেগে ভেঙে গেল। আমাকে তোমার দিদির কাছে নিয়ে চল মিনো।

জানো, দিদির মা ইয়াজাকুরা গাছটা লাগিয়েছিল। এ বছর প্রথম ফুল এসেছে তার ডাল ভরে। দিদি ঐ গাছতলা ছেড়ে আর উঠতেই চায় না।

পেছন থেকে নিঃশব্দে গিয়ে দুটি হাতের পাতায় তানাকার চোখ সমেত মুখখানা ঢেকে ফেলল তিলক।

দুটি হাত পেছন দিকে বাড়িয়ে অপরিচিতকে চেনার চেষ্টা করতে লাগল তানাকা।

একসময় তারই দেওয়া তিলকের হাত ঘড়িটি তার হাতে ঠেকল। অমনি পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু। চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নামল তানাকার।

পাগলের মত বলে চলল, তুমি কেন এলে আমার কাছে তিলক, আমি পঙ্গু, নিস্ব হয়ে গেছি।

তানাকাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তিলক বলল, তোমার কিছুই হারায়নি তানাকা। তুমি বিশ্বের সেরা মণি হয়ে আমার বুকের মধ্যে রয়েছ, থাকবেও চিরদিন।

রাতে পাশাপাশি শুয়ে আছে দুজনে। বড় নিবিড়, বড় অন্তরঙ্গ। তুলির মত নরম আঙুলের ছোঁয়া লাগল তিলকচন্দনের বুকে। তানাকা বলল, মনে আছে তোমার, ওহারায় গিয়েছিলাম আমরা দুজনে।

মনে আছে তানাকা। বিশাল বিশাল গাছ ডালে ডালে পাতায় পাতায় দাঁড়িয়েছিল জড়াজড়ি করে।

তার ভেতর দিয়ে চুইয়ে পড়ছিল স্বপ্নের মত জ্যোৎস্না, তাই না?

তিলক বলল, বন কাঁপিয়ে, প্রাণ কাঁপিয়ে সুরেলা গলায় ডেকে উঠেছিল একটা নিশিপাখি। দূরের গাছ থেকে তার বিচ্ছিন্ন সঙ্গীনীও কি মিষ্টি প্রতিধ্বনি তলেছিল।

তানাকা আকুল গলায় বলল, সেটা ছিল তার বেদনার ধ্বনি। সে বলছিল, আমি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, তুমি এসো, তুমি এসো।

তানাকার কণ্ঠস্বরে ব্যথার সুর কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

তিলক তানাকার হাতখানা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, সে পাখি আর দূরে নেই তানাকা, সে একান্ত কাছে এসে সঙ্গিনীর বুকের ধ্বনি শুনছে।

ওহারার সেই মন্দিরের নাম মনে আছে তোমার?

তিলক বলল, ভুলিনি, জাক্‌কোইন।

তানাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনেই যেন উচ্চারণ করল মন্দিরের নামের অর্থটা, 'বিষাদিনী জ্যোৎস্নার মন্দির'। আমি আজ সেই মন্দিরেই বাস করছি।

তিলক তানাকাকে একেবারে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, এ মন্দিরের কোথাও নেই বিষাদের ছায়া, মায়াময় জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে এ মন্দির। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তোমার মায়ের হাতে পোঁতা ইয়াজাকুরা, গাছটি। গাঢ় পিঙ্ক রঙের ঘন ঠাসা পাপড়িতে ভরে আছে তার ডাল। সেই অপরূপা ফুলের স্তবক, তুমিই তানাকা।

আর তুমি ঐ মায়াময় জ্যোৎস্না তিলক। আমি চিরদিন স্নান করব তোমার ঐ জ্যোৎস্নার জলে।

●

তিন সখী

প্রথম দিনটি সিঁথির ছিল বৃষ্টির নেশা ভরা। কিন্তু সে ছিল গগনে বাদল নয়নে বাদলের দিন। বাবা তাকে শ্রীসদনের ভারপ্রাপ্তা সুরমাদির কাছে রেখে পরের ট্রেনেই ফিরে গেলেন। জরুরী কাজের তাগিদ তাঁর। তাকিয়েছিল সিঁথি। গাছের সারির ভেতর দিয়ে বাবাকে কিছু পথ হেঁটে যেতে দেখা গেল। তারপর হারিয়ে গেলেন তিনি। এতক্ষণে নিঃসঙ্গতা নেমে এলো সিঁথির চারদিকে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এতদিনের জমানো স্বপ্ন তার এই মুহূর্তে দুর্ভার বলে মনে হল।

এ অভিজ্ঞতা সুরমাদির নতুন নয়। তিনি সস্নেহে বললেন, এসো ওপরে, বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে নাও।

সুরমাদির পেছনে সিঁথি পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। দুফোঁটা চোখের জল সামলে নেবার আগেই তা ঝরে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

না, কেউই দেখতে পায় নি তার দুর্বলতা।

সুরমাদি যেন সর্বজ্ঞ। উঠতে উঠতেই একটু থামলেন। তারপর বললেন, আজ এখানে এসে যেমন তোমার মনটা ভারী হয়ে উঠেছে, এখান থেকে একদিন চলে যাবার সময়েও তোমার মন তেমনি ভারী হয়ে উঠবে।

সুরমাদি তাকে মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নেমে গেলেন।

সিঁথিকে নিয়ে ঘরে তখন তারা তিনজন।

শান্তা এগিয়ে এসে সিঁথির হাতটা নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, ঐ যিনি তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, উনি সংহিতা। স্মৃতি, শ্রুতি সংহিতা নন, উনি সংগীতভবনবিহারিণী সংহিতা। আর আমি ভাই শান্তা। কলাভবনে রঙ তুলির শ্রাদ্ধ করি।

এবার সংহিতার কথা বলার পালা।

সত্যি শান্তা, আমি অবাক্ হচ্ছি একটা কথা ভেবে। লক্ষ্য করেছ, আমাদের তিনজনের নামের আদি অক্ষরে কি অদ্ভুত মিল।

শান্তা বলল, ঠিক ধরেছিস। এ একটা যথার্থ আবিষ্কার।

তারপর সিঁথির দিকে ফিরে বলল, তুমি এখন কি খাবে ভাই? যদিও একটু পরেই খাবার ডাক পড়বে।

সিঁথি মাথা নেড়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলল, এখন কিছু খাবার দরকার হবে না।

শান্তা বলল, তা কি হয় ভাই, শুধু মুখে বন্ধুত্ব কি জমে?

এবার এগিয়ে গেল সে সংহিতার ডেস্কের দিকে। একটা বড় শিশির মুখ খুলে সে বের করল খানিকটা খাদ্যজাতীয় বস্তু। তারপর সিঁথির কাছে ফিরে এসে বলল, হাঁ কর, হাঁ কর তো দেখি।

সিঁথি লজ্জা পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শান্তা ওর মুখখানা বাঁ হাত দিয়ে তুলে ধরে ডান হাতের বস্তুগুলো মুখের মধ্যে ভরে দিয়ে বলল, প্রথম দর্শনে মিষ্টিমুখ করাতে হয়। হাতের কাছে তৈরি মিষ্টি যখন নেই তখন দুলালের তাল মিছরিই খাও ভাই।

সিঁথি এবার ডান হাতখানা মুখে চেপে খিলখিল করে হেসে উঠল।

শান্তা বলল, ঐ যে রাগিণী রয়েছেন, ওঁর সুরের পথটিকে সাফ করে রাখার জন্যেই এই মিছরির ব্যবস্থা।

বিকেলে ওরা তিনজনে বেরুল। সংহিতা বলল, কোথায় যাওয়া যায়? খোয়াই-এর দিকে?

শান্তা বলল, নৈব নৈব চ। প্রথম দিনেই দূরের সিক্রেটগুলো দেখানো ঠিক নয়। এখনো সামনে অনেকটা দিনই রয়েছে।

সংহিতা বলল, তবে?

শান্তা সুর তুলে বলল, তুমি রবে নীরবে। আজ পথ দেখানোর পালাটা আমার হোক।

ওরা গৌরপ্রাঙ্গণের ধারে বটের তলায় বাঁধানো বেদীর ওপর বসল। বিরাট ঘন্টাটি নীরব হয়ে আছে।

আকাশের মেঘ অনেক নীচে নেমে এসেছে। আসন্ন বৃষ্টির খবর বাতাসে। দু'তিনজনের এক একটি দল হালকা হওয়ায় ভেসে এসে আবার কোথায় মিলিয়ে গেল।

শান্তা বলল, সংহিতা, এখন তোর পালা। গান দিয়ে সখীবরণ হোক।

কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইল। তারপর সুর এলো সংহিতার গলায়। প্রথমে মৌমাছির গুনগুন। তারপর ফুটল কথার ফুল।

'তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন ॥
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ গন্ধে মাতাও সমীরণ ॥'

গান শেষ হলে কেমন এক ধরনের মিষ্টি ছোঁয়া লাগল সিঁথির মনে। সে চিরদিনই আলাপে আড়ষ্ট। তবু আজ সারা মনটা তার কথা বলে উঠতে চাইল। অনেক কথা সে বলতে চায় তার নতুন পাওয়া বন্ধবীদের। তার দুঃখ, তার সুখ, তার ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী সে উজাড় করে বলতে চাইল। কিন্তু কিছুই বলা হল না। শুধু এইটুকু বলতে পারল, কি সুন্দর গলা তোমার, আর একটা গাও ভাই।

শান্তা অমনি বলে উঠল, উঁহু, অলমতিবিস্তরেণ। বেশী নম্বর ও পেয়ে যাচ্ছে। নিক্তির কাঁটা সব সময় সিধে রাখতে হয়। তুমি আমাকে ছেড়ে সংহিতার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে, সেটি হচ্ছে না।

হাসল সংহিতা। ওর বলার ধরনে সিঁথিও না হেসে থাকতে পারল না।

শান্তার এবার অন্য মুড।

বলল, সত্যি সংহিতা, তোর গানের জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় আমিও গানটান কিছু গেয়ে ফেলি।

সংহিতা বলল, কতদিনই তো তোমাকে সেধেছি গাইতে।

আমার কি তোর মত সাধা গলা যে সাধলেই অমনি সুর ঝরে পড়বে।

ওই তোমার এক কথা। সবকিছুকে হালকা করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া।

এবার সত্যিই শান্তা গেয়ে উঠল—

'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী,
একা একা করি খেলা।
আনমনা যেন দিক্‌বালিকার
ভাসানো মেঘের ভেলা।।'

সত্যি তুমি যতই বল, গলা তোমার একটুও খারাপ নয়,—এবার জোরের সঙ্গে বলল সংহিতা।

শান্তা মুচকি হেসে সিঁথির দিকে তাকিয়ে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, বেশী বকিস নি, এখনও নতুন শ্রোতার সারটিফিকেট পাই নি।

একটু চঞ্চল হয়ে নড়ে-চড়ে বসল সিঁথি। খুশি তার চোখে-মুখে। বলল, গান যে তোমার ভাল, সেটা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

শান্তা বলল, আফসোস তো আমার ঐখানে। 'বাহবা বাহবা নন্দলাল' বললেই কেমন যেন মনে হয় খুব এক হাত নিচ্ছে। আচ্ছা সে যা হোক, এখন পায়ে পায়ে একটু হেঁটে বেড়ানো যাক।

ওরা উঠে পড়ল। শালবীথির তলা দিয়ে এগিয়ে চলল। কিছু পথ যেতে না যেতেই বৃষ্টি নামল।

এবার পা চালিয়ে ফেরার পালা। শালবীথির ভেতর দিয়ে আসতে গিয়ে ওরা পেল বড় বড় কয়েক ফোঁট বৃষ্টি।

সিঁথির বেশ লাগছিল। ভিজতে তার বরাবরই ভাল লাগে। তা ছাড়া এমন ভেজার জায়গা পেলে তো কথাই নেই।

ওরা যখন শিক্ষাভবনে এসে ঢুকল, তখন তিনজনেই ভিজে গেছে।

সব ঘরেরই জানালা খোলা। খোলা জানালা দিয়ে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ছে,

'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো কারো স্নান নবধারা জলে।।'

শান্তা সংহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, গান গেয়ে স্নান করা চলে, কিন্তু নবধারায় স্নান করে গানের গলাটা ঠিক রাখা সহজ না।

সেদিনটা তিন সখীর মোটামুটি শুভারম্ভ হল।

সিঁথি ভর্তি হল বাংলায়।

প্রতিদিন তিন সখী যা কিছু পাঠ নেয়, সন্ধ্যার মজলিসে চলে তার সরস আলোচনা।

শান্তা বলে, অদ্য তোমার কি শিক্ষা লাভ হল সখী সউন্দলে?

সিঁথি মুখ টিপে মিষ্টি করে হাসল, কোন উত্তর দিল না।

সংহিতা অমনি গেয়ে উঠল,

'তোমার গোপন কথাটি
সখি রেখো না মনে—'

এবার সিঁথি মুখ খুলল, পড়াশোনার ব্যাপারে গোপনতার কি থাকতে পারে বল? প্রথম পাঠ হল আজ পদাবলী সাহিত্যে প্রেম।

শান্তা বলল, হাঁউ মাঁউ খাঁউ
প্রথমেই প্রেমের গন্ধ পাঁউ।

সিঁথি বলল, দূর, প্রেমের তত্ত্ব, প্রেমের স্বরূপ, দেহাতীত প্রেমের সাধনবেগ ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিকুজি কোষ্ঠী বিচার বিশ্লেষণ হলে কি আর প্রেমের কিছু থাকে?

সংহিতা অমনি বলল, ঠিক বলেছিস ভাই, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সেই 'Violet by a mossy stone half-hidden from the eye'. এ নইলে প্রেম হয়।

অমনি গান এলো সংহিতার গলায়,

'একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি,
তাই দিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।'

শান্তা জানালা দিয়ে আকাশ দেখল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো চুইয়ে পড়ছিল।

ও বলল, চল একটু বেড়িয়েই আসি।

বের হল তিনজনে।

বর্ষার ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা পাশাপাশি চলছিল। খেলার মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছল পীচের রাস্তার ওপর। হাঁটতে লাগল শ্রীপল্লীর ভেতর দিয়ে। বড় বড় গাছগুলো গম্ভীর অভিভাবকের মত থমথমে ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁথির ভাল লাগছিল এই মেঘলা সন্ধ্যা, চাঁদের ভাঙা আলো, তরল অন্ধকারে ডুব দেওয়া গাছপালা।

ওরা চুপচাপ হেঁটে চলছিল। বোধ হয় রাতের প্রকৃতির এই নিঃশব্দ ছায়াচিত্র ওদের তিনজনকেই নির্বাক করে রেখেছিল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর সংহিতাই মুখ খুলল, এ সময়ে ভ্রমণ সুরমাদির চোখে খুব একটা স্বাস্থ্যকর ঠেকবে বলে মনে হয় না।

শান্তা অমনি ফোঁস করে উঠল, তুই চুপ কর। এসব সন্ধ্যেয় বাইরে বেরোতে হয়। মনের স্বাস্থ্য এতে ভাল থাকে।

এমন করে কথাগুলো নির্বিষ সাপের ফোঁস করার মত ভঙ্গী নিয়ে শান্তা বলে ফেলল যে, সিঁথি না হেসে থাকতে পারল না।

দ্বিধাগ্রস্ত সংহিতা তখনও চুপ করে আছে দেখে শান্তা হোস্টেলের দিকে ফিরে বলল, চল ফেরা যাক। তাহলে আর একটুও দেরি না।

অমনি সংহিতা গান ধরল,

'এখন আর দেরি নয়, নয় গো
তোরা হাতে হাতে ধর গো
আজ আপন পথে ফিরতে হবে,
সামনে মিলন স্বর্গ।'

কিছুকাল পরের ঘটনা। কয়েকটা ঋতু ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের শাল, শিমূল, পলাশের পাতায় বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে, পাতা ঝরিয়ে বয়ে গেছে।

এখন শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে, স্থলে-জলে বসন্ত-বাসর। শালের বীথিতে মাখন রঙের ফুলমঞ্জরী দেখা দেবার কাল আসি আসি করছে। আম্রকুঞ্জ ফেনিয়ে উঠেছে মুকুলে। মাতাল হয়ে উঠেছে মৌমাছি পাড়া।

একদল মেয়ে আম্রকুঞ্জের ভেতর নিরুদ্দেশ ভাবনায় ঘুরতে ঘুরতে গান ধরেছিল,

'ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি।'

গানটা সমস্ত প্রকৃতি আর প্রাণের ভেতর কেমন সুন্দর আর সূক্ষ্ম একটা যোগাযোগের সেতু তৈরি করছিল।

একাই আজ বসেছিল সিঁথি। প্রথম দিন যে বটগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে ওরা এসে বসেছিল, ঠিক সেখানটিতে। তেমনি ওর মাথার ওপর ঝুলছিল সেই বিরাট আকারের ঘন্টা।

শান্তা আর সংহিতা গেছে খোয়াই-এর দিকে। কি একটা ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে কয়েকদিন ধরে মেতেছে শান্তা। প্রায় রোজই সঙ্গী হতে হয় সংহিতা আর সিঁথিকে। আজ একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে ওদের। সকাল থেকে কেন জানি না, ভারী হয়ে উঠেছিল সিঁথির মন।

শান্তা বলেছিল এক সময়, কিরে সিঁথি, আজ যেন কেমন আনমনা আনমনা!

সিঁথি মনের ভাব গোপন রেখে বলেছিল, শরীরটা আজ যেন কি রকম বিগড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারী। কিন্তু সে ডাক্তারীর ওষুধ সিঁথির ব্যথার গভীরে পৌঁছল না।

বিকেলে ওরা বেরুল যথারীতি। শুধু রয়ে গেল সিঁথি। ওরা চলে গেলে সিঁথি পায়ে পায়ে এসে বসল ঐ বাঁধানো বেদীর ওপর।

আজ তোতনের জন্মদিন। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এমন দিনে। ঠিক ঐ আমের মুকুলের মত। তারপর গুনগুন গুঞ্জনে মাতিয়ে তুলেছিল সারা বাড়ি। আজ তার জন্মদিন। সিঁথি তার পাশে নেই আজ। দু'টি বছর বুকের একান্ত নিবিড়ে ধরে রেখেছিল তাকে। হয়তো এমনি করেই রাখত সে, কিন্তু কোথা দিয়ে কি যেন হয়ে গেল। এক মুহূর্তে ভেঙে গেল সব খেলা।

হঠাৎ হাওয়ায় উড়ে গেল একরাশ শুকনো পাতা। এলোমেলো উড়ছিল সিঁথির চূর্ণ চুলের রাশ। ও দু'হাতে সেগুলোকে ঠিক করে নিল। তারপর চোখ দুটোতে জমে ওঠা জলের ধারা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর চোখে পড়ল, আম্রকুঞ্জের ভেতর বেড়িয়ে বেড়ানো সেই দলটি ওর ঠিক পেছনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁথি কেমন যেন লজ্জা পেল। এমন দিনে একা একা থাকা একটু বেমানান বইকি!

ওর দিকে এগিয়ে এলো ওদেরই ক্লাসের একটি মেয়ে। অঞ্জু ওর কাছে এসে বলল, একা কেন ভাই, শান্তারা গেল কোথায়?

এদের তিনজনকে শ্রীসদনের সবাই নাম দিয়েছিল ত্রিতন্ত্রী। বৈদিক যুগে কবিরা ত্রিতন্ত্রী বাজিয়ে গান করত।

শান্তা বলে, যে কবি এই ত্রিতন্ত্রী বাজাবে, তারই আগমনের কাল গুনছি আমরা তিনজনে। তোমরা কেউ যদি তার খবর পাও জানিও আমাদের, তিনজনে একসঙ্গেই তার গলায় মালা দেব।

অঞ্জুর কথার একটা কিছু জবাব দিতে হয়। সিঁথি বলল, শান্তা আর সংহিতা আজ খোয়াই-এর দিকে গেছে।

তুমি একা!

অঞ্জুর প্রশ্নে একটু বিস্ময়ের চমক।

মুখে হাসি টেনে বলল সিঁথি, একটু বেমানান লাগছে, তাই না? দলছাড়া হয়ে পড়েছি।

অঞ্জু ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দলে।

তারপর ওরা সবাই বসন্তের একটা গান গাইতে গাইতে চলল সোনাঝুরি বনের পথে।

মাঠ পেরিয়ে ওরা উঁচু-নীচু ঢিবির ওপর দিয়ে পৌঁছল একটা জায়গায়। ওখানে বসে বসে অনেক কটা গানই গাওয়া হল। সিঁথির মনটা হালকা হয়ে এসেছিল। একা একা বসে থেকে দুঃখ ভোগ করা দুর্ভার বলেই মনে হয়। সকলের সঙ্গে থাকা মানেই অনেক কিছু ভুলে থাকা।

ফেরার পথে হঠাৎ দেখা শান্তা আর সংহিতার সঙ্গে।

দলের ভেতর সিঁথিকে দেখে ওরা প্রথমে একটু চমকেই উঠেছিল। প্রথম কারণ, সিঁথির শরীর ভাল নেই বলে সে বের হয় নি তাদের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় দফায় ভাবনা হল, সিঁথি এমনিতেই একটু চাপা মেয়ে। মেলামেশার ব্যাপারে এতদিনও সে বিশেষ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ সেই সিঁথি আজ ভিন্ন দলবিহারিণী।

ওদের চাপা বিস্ময়টা অঞ্জুর নজর এড়ায় নি। সে তাই এগিয়ে এসে সিঁথির হাতটা ধরে শান্তার দিকে তাকিয়ে বলল, কমললোচন, আমি তোমার সাধ্বী সঙ্গিনীকে স্বর্ণলঙ্কার বদলে সোনাঝুরি বনে হরণ করে এনেছিলাম। শোকের কারণ নেই, এই নাও, তোমাকে প্রত্যর্পণ করলাম।

কথাগুলো বলতে বলতেই অঞ্জু আচমকা সিঁথিকে ঠেলে দিলে ওদের দিকে।

একটা হাসির তরঙ্গ উঠল।

শান্তা বলল, শুধু ফিরে পেলে তো ল্যাঠা চুকবে না। ঘরে গিয়ে অগ্নিপরীক্ষা করে দেখতে হবে এখনও গিনি সোনা আছে কি না।

আবার হাসির ঢেউ উঠল। ওরা সবাই মিলে এগিয়ে চলল হোস্টেলের পথে।

হোস্টেলে শান্তা আর সংহিতা থাকে একই ঘরে, কিন্তু সিঁথি একখানা ছোট রুমে একাই থাকে। এ ঘর ও ঘরে তিন বন্ধুর নিত্য আসা যাওয়া।

সন্ধ্যা যখন রাত্রির সীমা ছুঁই ছুঁই করছে, অর্থাৎ আকাশবাণী থেকে 'স্থানীয় সংবাদ' পড়ছি গোছের একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, তখন দু'টি বন্ধু নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তৃতীয়ার দরজায়। ভেতর থেকে দরজাটা ভেজানোই ছিল, কিন্তু ঘরে আলো জ্বালাবার কোন তাগিদই ছিল না অন্তঃপুরচারিণীর।

ওরা কান পাতল দরজায়। ভেতর থেকে অতি মৃদু কিছু একটা উচ্চারিত হচ্ছিল। নিবিষ্ট হতেই ওরা শুনতে পেল ক'টি কথা : তোতনসোনা, আমি কাছে নেই, খুব কষ্ট হচ্ছে না তোমার? আর কোন দিন তোমাকে যে আমি দেখতে পাব না বাপী।

হয়তো আগে কিছু কথা হয়ে থাকবে, কিন্তু এই ক'টি কথাতেই আপাততঃ শেষ হল সিঁথির বক্তব্য। তারপর ওরা দু'জনে শুনতে পেল প্রায় অস্ফুট একটা ফোঁপানি।

কতক্ষণ পরে সে ফোঁপানিও বন্ধ হল। কিছুক্ষণ সবকিছু চুপচাপ। তারপর এক সময় আলো জ্বলল ঘরে। দরজার ফাঁক দিয়ে ওরা দেখতে পেল, সিঁথি একটা ফটো নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখছে।

ওরা দু'জনে দু'জনকার গা টিপল, তারপর যে যার নিজের নিজের পা টিপে নিঃশব্দে চলে এলো নিজেদের ঘরে।

সংহিতা তাকিয়ে দেখল, শান্তা তার দিকেই চেয়ে আছে। দু'জনের চোখেই প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্ন যে সমাধানের বাইরে।

সিঁথির ওপর ওদের অভিমান হল। প্রথম দিন থেকেই ওরা বুঝেছিল, সিঁথি একটু চাপা স্বভাবের মেয়ে। মেলামেশায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না তার, তবু কোথায় যেন একটা গোপন আশ্রয় ছিল তার মনের মধ্যে। সেখানকার খবর কোন দিনই বাইরে এসে পৌঁছত না। শুধু সিঁথি মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে ঢুকত, বাইরে থেকে তখন বন্ধ হয়ে যেত দরজা। সংহিতা আর শান্তা সিঁথির এমনি এক নিশি পাওয়া ভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য যে না করেছে তা নয়। কোন দিন পথ চলতে তিন সখীতে যখন কথার ফুলঝুরি ঝরাতে ঝরাতে চলত, তখন হঠাৎ কোন কথার মাঝে সিঁথি একেবারে নীরব হয়ে যেত। এক মুহূর্তে একেবারে আত্মস্থ। তখন ও ওদের সঙ্গে চলত ঠিক, কখনও বা ওদের হাসিতে যোগও দিত, কিন্তু কেমন এক রকমের অর্ধচেতন অবস্থায়।

শান্তা যদি বলত, কি হোল রে তোর? হঠাৎ ডেড্ সী সাইলেন্স!

অমনি সিঁথি নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করত। কিন্তু ফল হত এই, মুখখানা তার আরও লাল হয়ে উঠত, কখনও বা জল এসে যেত চোখে।

শান্তা আর সংহিতা তখন অবাক হয়ে শুধু তাকাত ওর দিকে। তখন তিনজনেই চুপচাপ হাঁটত কিছুক্ষণ। সিঁথি মুঠো করে ধরত ওদের হাত। তার হাতের চাপে ওরা বুঝত, সিঁথি ঐ হাতের ভেতর দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে ওরা যেন তার এই অসহায়ত্বকে ক্ষমা করে।

সংহিতা ঐ পরিস্থিতিকে আর গভীর হতে না দিয়ে গানের ভেতর তাকে মুক্তি দিতে চাইত। ও ধীরে ধীরে গান ধরত—

'আমার মন মানে না—দিন রজনী।
আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দু'টি নয়নে
উথলে নয়ন বারি—
ওগো সজনি।'

তবু সিঁথিকে ওরা ভালবাসে। সে ভালবাসার কারণ সিঁথির মুখে এক নিষ্পাপ কিশোরীর প্রশান্তি। সিঁথি সুন্দর। পথ দিয়ে চলে গেলে অনেকগুলি চোখই তাকে অনুসরণ করে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সিঁথির মনের গভীর থেকে উঠে আসা এক সুর অশ্রুত ধ্বনিতে সারাক্ষণ তার চারদিকে বাজতে থাকে। তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

শান্তা আর সংহিতা সিঁথির গভীর গোপন মনের দরজাটা খুলতে না পেরে খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। বেড়ে গেল তাদের কৌতূহল। ওরা ভাবল, যে কোন রকমেই হোক একদিন সিঁথির ঐ বন্ধ দরজাটা ওরা খুলবেই।

ইতিমধ্যে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফাল্গুনের রঙ ধরতে শুরু করেছে। শিমুল পাগল হয়ে মেতেছে রঙের খেলায়। পলাশ জ্বেলেছে তার ডালে ডালে আকাশ-প্রদীপ। বসন্ত উৎসবের মহড়া চলেছে পূর্ণোদ্যমে। চিঠি আসছে দূরদূরান্ত থেকে। বসন্ত উৎসবে পরিজনেরা আসছেন আশ্রমবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনন্দের অংশ নিতে। তাছাড়া বাইরের দর্শক সংখ্যাও অগণিত।

সিঁথি জানত, কোন পরিচিতের মুখই সে দেখতে পাবে না। বাবা বিশেষ কাজে এ সময় বাইরে আছেন। তাঁর পক্ষে এ উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। মাকে সে হারিয়েছে অনেক ছোটবেলায়। সুতরাং আর কারই বা আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে সে। তবে যাদের একান্তভাবে পেতে পারত, তাদের আসার পথ সে নিজেই তো বন্ধ করে দিয়ে এসেছে।

একটা অঘটন ঘটিয়েছে এই তিন সখীতে। সিঁথি যদিও শিক্ষাভবনের ছাত্রী, তবুও সে নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় নৃত্যের আসরে যোগ দিত। নাচের অভ্যেস তার শান্তিনিকেতনের বাইরে থেকেই। তার সুগঠিত দেহ নাচের মুদ্রার যেন লীলাভূমি। সংগীতভবনের ছাত্রীরা যদি এজন্যে সিঁথির ওপর কিছুটা ঈর্ষা করে থাকে, তাহলে সেটা তাদের দিক থেকে খুব একটা অসংগত বলে মনে হয় না। সংগীতভবনে যেসব ছাত্রী শুধু নাচের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, তাদের যদি শিক্ষাভবনের কোন ছাত্রী আংশিক সময়ের ক্লাস করেও পেছনে ফেলে চলে যায়, তাহলে ক্ষোভটা ফেনিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তার ওপর কাটা ঘায়ে পড়েছে নুনের ছিটে। এবার বসন্ত উৎসবে হয়েছে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আয়োজন। আর নাম-ভূমিকায় যে নির্বাচিত হয়েছে তাকে শান্তিনিকেতনে প্রায় নবাগতা বললেই চলে। সিঁথি তাই দু'দিনেই শান্তিনিকেতনের প্রতিটি আশ্রমিকের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

শান্তা আর সংহিতা সখীগর্বে স্ফীতা। তারা তো কলাভবন, সংগীতভবন আর শিক্ষাভবন চষে বেড়াতে লাগল মুখরোচক সব খবর রটনা করে। সিঁথি নাকি রিহার্সেল দিতে গিয়ে নিজেকে একেবারে ভুলে যায়। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তার অভিনয়কে অভিনয় বলে একেবারে মনেই হয় না। রিহার্সেল থেকে ফেরার পথে শান্তা আর সংহিতার সঙ্গে সে নাকি সহজভাবে কথা বলতেও পারে না। এমনি তন্ময় হয়ে থাকে সে তখন।

এদিকে সংহিতা গানের দলে। শ্যামার গান গাইবার ভার পড়েছে তারই ওপর। যোগটা একেবারে মণিকাঞ্চন।

ঘরের ভেতর যখন তিনজন থাকে, তখন গান শুরু করে দেয় সংহিতা আর নাচতে থাকে সিঁথি। শান্তা প্রক্সি দেয় বজ্রসেনের।

আর পারি নে বাপু, কখনো বা শান্তা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, তোর জন্যে আমার প্রাণান্ত।

তারপর একটু থেমে সিঁথির ভাবে বিভোর সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে, একটা কথা বলব সিঁথি?

সিঁথি থমকে থেমে গিয়ে ওর দিকে তাকায়।

শান্তা বলে, বজ্রসেন লোকটার ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে। শ্যামার মত মেয়ের কদর সে বুঝল না। আমি হলে এই এমনি করে হাতটা ধরে (সিঁথির একখানা হাত ধরে) যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যেতাম।

সংহিতা কপট ক্রোধে বলে, যে মেয়ে উত্তীয়ের মত এমন প্রেমিককে মরণের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করলে না, তাকে তুমি কোন্ প্রাণে গ্রহণ করতে চাও?

শান্তা বলল, ঐ হাঁদাগুলো আমার দু'চোখের জ্বালা। আরে বাপু, ভালই যদি বাসবি তুই শ্যামাকে, তাহলে এমন হাঁদারামের মত নীরব হয়ে থাকা কেন? গটমট করে এগিয়ে এসে ধরবি প্রেমিকার হাতখানা। তারপর টান মেরে বলবি, সঙ্গে আসবে তো এসো, নইলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। তাহলেই অমনি দেখতিস, সুড়সুড় করে শ্যামা উত্তীয়ের পেছন পেছন চলত। তা নয়, আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকা। অতশত মহত্ত্বের কথা আমি বুঝি-সুঝি না বাপু।

শান্তা হাত নেড়ে কথাগুলো এমন ভঙ্গীতে উচ্চারণ করল যে সংহিতা আর সিঁথি না হেসে থাকতে পারল না।

আগের দিন বিকেল থেকেই আম্রকুঞ্জ চিত্রিত হয়েছে আলপনায়। শান্তার বিশ্রাম ছিল না। কলাভবনের শিক্ষকদের সযত্ন নির্দেশে তারা কাজ করে গেছে। সাদা, গৈরিক, বাসন্তী, রঙের পর রঙ ওদের হাতের টানে টানে ঝরে ঝরে পড়েছে। রূপশ্রীমণ্ডিত হয়েছে উৎসব-মণ্ডপ।

একবার সংহিতা এসেছিল। কি যেন বলেছিল চুপিচুপি। শান্তা মুখ না তুলেই বলেছিল, আজ নয়, কাল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সব কি তুই ভণ্ডুল করে দিতে চাস?

সংহিতা যেমন এসেছিল, তেমনি ফিরে গিয়েছিল নিঃশব্দে।

উৎসবের দিন সকাল থেকেই জনসমাগম। গাছে গাছে ফুলে ফুলে বাতাসে আকাশে ঋতুপতির চরণধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তাঁর রঙীন উত্তরীয়।

দূর থেকে গানের কলি ভেসে এলো,

'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল
লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল
দ্বার খোল দ্বার খোল।'

সবাই উৎকর্ণ, উচ্চকিত। দেখা গেল, আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বাসন্তী সাজে সেজে, ফুলের মালা কেশে জড়িয়ে, গলায় দুলিয়ে, হাতে নিয়ে পূজার উপচার নাচতে নাচতে প্রবেশ করছে আম্রকুঞ্জে। প্রথমে ছোট, তারপর বড়রা নাচের নানা মুদ্রায় আম্রতরুগুলিকে বেষ্টন করে একটি সুন্দর মণ্ডল তৈরি করতে করতে এগিয়ে আসছে। সংগীতের কথা ও সুর ভেসে আসছে আম্রকুঞ্জের নির্দিষ্ট আসন থেকে। সেখানে উপবিষ্ট গায়ক-গায়িকার দল। কতক্ষণ এমনি চলল বসন্ত-বরণ।

এর পর শুরু হল কথা, গান, নৃত্য। ঋতুরাজকে যেন ষোড়শ উপচারে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে আহ্বান।

সবশেষে শুরু হল ফাগ খেলা। আকাশে উড়ল আবীরের ধুলো। একে অন্যকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। পরিচয় অপরিচয়ের ভেদ ঘুচে গেছে। টুকরো টুকরো গানেব সুর ভেসে আসছে।

বসন্তের কাছে শেষ মিনতি—

'যাও গো এবার যাবার আগে
রাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

এবার দেখা গেল, ছেলেমেয়েরা এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো দলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মনের মত গান করছে, আর তার সঙ্গে চলেছে নাচ। এক একটি দলকে ঘিরে অনেকগুলি দর্শকের জটলা।

এমনি করে শেষ হল আনন্দের প্রথম পর্ব।

অভিনয় অনুষ্ঠান সেই সন্ধ্যে সাতটায়।

শান্তা একটা গানের মণ্ডল থেকে সংহিতা আর সিঁথিকে টেনে এনেছিল বাইরে।

তোরা কি ভেবেছিস বলতে পারিস?

শান্তার গলায় কঠিন অনুযোগের সুর।

সিঁথিকে যেন নাচে পেয়ে বসেছিল।

সিঁথি যত নাচে, সংহিতা আর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা হাতে তালি দিয়ে তত গাইতে থাকে।

সেই জমজমাট আসরটা শান্তার ডাকে ভেঙে গিয়েছিল।

শান্তা যে কালবোশেখীর ঝড় তুললে।

কে যেন বলে উঠেছিল, বসন্ত বাসরে।

শান্তা আজকের এই উৎসবের দিনে মেয়েটিকে তার অভ্যাসসিদ্ধ ভাষায় আপ্যায়িত করল না। শুধু হেসে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে একমুঠো আবীর তার মুখে মাথায় ঘষে দিয়ে বলল, খা, কিছুটা কালবোশেখীর রাঙা ধুলো খা।

তারপর বেরিয়ে গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে।

পথে যেতে যেতে শান্তা বলেছিল, এত বড়টি হয়েছিস, তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না সিঁথি। আজ সন্ধ্যেয় কত বড় অনুষ্ঠান। তোর তা নিয়ে যেন একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি যে ধরা পড়েছি চুরির দায়ে। জেলখানায় বন্দী। উৎসবে যোগ দেওয়া তো দূরের কথা, কোথায় মনের মত ফুল পাব, কোন্ শাড়িতে তোকে মানাবে, তাই খুঁজে খুঁজে আমার বেলা গেল। এদিকে আলতু-ফালতু নেচে গেয়ে তোরা দুটোতে এনার্জি নষ্ট করছিস।

সংহিতা বলল, তুমি কিচ্ছু ভেব না। সবার সামনে নেচে ও একটু ফ্রি হয়ে নিচ্ছে।

তুই থাম্, এবার সত্যিই ঝাঁঝিয়ে উঠল শান্তা, তুই হচ্ছিস যত নষ্টের গোড়া। নিজের গলাটা কাল থেকে ভেঙে বসে আছিস, আজ আবার ওর হাত-পাগুলো ভাঙার যোগাড় করছিস।

একটু থেমে বলল, আমাকে ছুটি দে তোরা। আমি আর তোদের জন্যে মণ মণ তাল মিছরি, তাল তাল উৎকণ্ঠা বয়ে বেড়াতে পারব না।

গম্ভীর হয়ে গেল শান্তা।

মনে মনে হাসল সংহিতা আর সিঁথি। ওরা জানে, শান্তা ছাড়া এক পা চলাও তাদের অসম্ভব। আর ওদের শাসন করতে না পারলে শান্তারও যে শান্তিনিকেতনে একদিনও থাকা চলবে না, তা ওরা ভাল করেই জানে।

বিকেলটা যখন সন্ধ্যের দিকে গড়িয়ে চলল, তখন শান্তা আর সংহিতার চোখে চোখে কি যেন কথা হয়ে গেল। ওরা বসেছিল সিঁথির ঘরে। তাড়াতাড়িতে তখন শান্তা আর সংহিতা সিঁথির দরকারী জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলছিল। ইতিমধ্যে দু'দুবার ডাক এসে গেছে, মেকআপের জন্যে এখুনি যেতে হবে।

সংহিতা বলল, সিঁথি, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়, তুই এখুনি চলে যা মেকআপের জায়গায়, আমরা জিনিসপত্র নিয়ে পেছনে যাচ্ছি।

সিঁথি বলল, আমি না থাকলে তোমাদের অসুবিধেয় পড়তে হবে না?

ঝংকার দিয়ে উঠল শান্তা, কি আমার সুবিধে করে দেবার মেয়ে! যাও, যাও, নিজের পথ দেখ গে। বাকী ভাবনাগুলো এখন আর ভেবে কাজ নেই।

সিঁথি এবার নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত। আজ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের জন্য মনটা তার সত্যিই চঞ্চল হয়ে আছে।

সিঁথি চলে গেলে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সংহিতা উঠে এসে চোখ রাখল জানালায়। কোন কারণে সিঁথি যদি আবার ফিরে আসে, তাই এই সাবধানতা।

চাবির গোছাটা টুংটাং শব্দ করল। তারপর খড়খড় আওয়াজ করে ট্রাঙ্কটা খুলে গেল। ত্রস্তহাতে যেমন করে শান্তা কোন কিছু এলোমেলো না করেও খোঁজাখুঁজির কাজ চালাতে লাগল, তাতে মনে হল, শান্তা হাত-সাফাইয়ের কাজে সার্টিফিকেট পাওয়া।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর শান্তার গলায় চাপা উত্তেজনার আওয়াজ। অ্যা—য়!

আর কিছু বলতে হল না। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সংহিতা এই ডাকটুকুর জন্যেই উৎকর্ণ হয়েছিল। একটা ঘূর্ণির পাক দিয়ে সে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘটনাস্থলে।

শান্তার হাতে দুখানা ফটো। চারটে চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তা যেন চিরে চিরে বিশ্লেষণ করতে লাগল। রঙীন ফটো। একটি আধুনিক ডিজাইনের গেট। তার ওপর সুন্দর ফুলে ভরা বোগেনভিলিয়া লতিয়ে আছে। ঐ গেটের নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি সহাস্য সুদর্শন যুবক। তার পাশে শান্তাদের ঔৎসুক্যের বাতিটাকে চরমে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শাড়ি পরা একটি মেয়ে। কপালে মাথায় তার এথয়াতির চিহ্ন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। অন্য ছবিখানা মা আর ছেলের। বড় বড় চোখ মেলে শিশুটি তাকিয়ে আছে তার মায়ের মুখের দিকে। সন্তানগর্বে মেয়েটির সারামুখে ছড়িয়ে পড়েছে কেমন এক তৃপ্তির আভা।

শান্তা তাকাল সংহিতার দিকে। সংহিতাও চোখ তুলে তাকাল শান্তার দিকে।

শান্তা এতক্ষণে কথা বলল, সত্যি করে বল তো সংহিতা, সিঁথি যে বিয়ে করেছে, সিঁথি যে মা, একথা তোর কোন দিন মনে হয়েছে?

সংহিতার চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। সে শুধু বলল, এখনও যেন আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না শান্তা।

শান্তা প্রায় স্বগতোক্তি করার মত করেই বলতে লাগল, মানুষকে আমরা কতটুকু বুঝি বল। বাইরের থেকে যখন আমরা বিচার করি, খুব বিজ্ঞের মত রায় দিই, তখন আড়ালে থেকে মানুষের মন গড়ার কারিগর হাসতে থাকেন।

সংহিতা বলল, ফটোটা লুকিয়ে ফেলি চল।

শান্তা বলল, কি হবে লুকিয়ে বল। যে নিজেকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে, তার ফটোখানা লুকিয়ে রাখলেই কি আর তাকে খুঁজে পাবি?

সংহিতা বলল, আমার কাছে সবচেয়ে বড় রহস্য হয়ে রইল, এমন সুন্দর স্বামী আর ছেলেকে ফেলে সিঁথির চলে আসা। আমি ভাবি, মা হয়ে ও ছেলেকে ভুলল কি করে?

শান্তা বলল, তার চেয়েও বড় কথা, সিঁথির স্বভাবে এমন কিছু আছে বলে তো মনে হয় না, যা তার স্বামীর কাছে খুব বিরক্তিকর ঠেকতে পারে। যার ফলে ঘটতে পারে এমন একটা বিচ্ছেদ।

এর পর শান্তা আর সংহিতা কতক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন দিকে কোন কূলের দিশা পেল না।

শান্তা একসময় বলল, চল, ওঠা যাক।

তারপর একটু অভিমানের সুরেই হেসে উঠে বলল, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরের দরকার কি বল আমাদের।

ফটোখানা যথাস্থানে রেখে ট্রাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করতে গিয়েই ঘটল আর এক ঘটনা। ট্রাঙ্কের ভেতরের পকেট থেকে এককানা প্যাকেট ছিটকে পড়ল। পিঙ্ক রঙের কাগজে কি যেন প্যাক করা রয়েছে। ওপরের প্যাকিং পেপারের দিকে তাকিয়ে ওরা দেখতে পেল কিছু লেখা।

'যা সত্য নয়, তার ভার বইবার দুঃখ থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। যা এতদিন জানতাম একান্তই আমার, তার মিথ্যে আবরণটুকু খসে পড়েছে ; এখন যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মাঝে ডুবে থাকতে চাই শান্তনু।'

রহস্যের অজস্র উপাদান হাতের কাছে এসে পড়ল। অতএব খোল।

প্যাক খুলে বেরুল একগোছা চিঠি। সব ক'টি সিঁথির হাতের লেখা। কেবল নাম সহির জায়গাটিতে লেখা রয়েছে, 'দূরবাসিনী'। খামগুলি এয়ার মেলের। ওপরের ঠিকানায় লেখা আছে শান্তনু রায়চৌধুরীর নাম। আর পত্র-প্রাপকের তৎকালীন স্থিতি জার্মানী।

একটি একটি চিঠি পড়তে লাগল ওরা। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বসবাসকারী স্বামীর কাছে লেখা স্ত্রীর চিঠি। প্রতিটি চিঠিই প্রাণের উত্তাপে ভরা। স্বামীকে ছেড়ে নিঃসঙ্গ জীবন কেমন দুঃসহ হয়ে উঠেছে তার দীর্ঘশ্বাস। কোন চিঠি শুধু ছেলের দুষ্টুমির কৃতিত্বে পূর্ণ। তবে প্রতি চিঠিতেই কর্তব্য পালনের জন্য স্বামীকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

সব ক'টি চিঠিই প্রায় ওরা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল। তারপর ঠিকমত প্যাক করে রেখে দিল যথাস্থানে।

'গৌড় প্রাঙ্গণে' তিলধারণের জায়গা নেই। মুক্ত অঙ্গনে মঞ্চসজ্জার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু অভিনয়ের প্রতীক্ষা। প্রাঙ্গণের আলোকিত ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটার ঘন্টা বেজে গেল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার মঞ্চে ভেসে এলো আলোর তরঙ্গ।

শুরু হল অভিনয়। গৌড় প্রাঙ্গণ ছাপিয়ে, আম্রকুঞ্জ আর শালবীথি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল গানের সুর।

সংহিতার গলার সুর শ্যামার প্রতিটি মুদ্রায়, প্রতিটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় হিল্লোলিত হয়ে চলেছে। আজ দুই সখী যেন পরস্পরকে সহযোগিতা করছে।

বিদেশী পথিক বজ্রসেনকে শ্যামা দেখছে। বারাঙ্গনার চোখে আজ বরাঙ্গনার দৃষ্টি। ভালবাসার প্রথম মন্ত্র যেন উচ্চারিত হচ্ছে সংগীতে। পূর্বরাগের প্রতিটি অনুভূতি আজ শ্যামার দেহকে ঘিরে তার লীলা করে চলেছে।

অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষকে দেখে শ্যামার সকল ইন্দ্রিয় উন্মুখ। কামনার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত শ্যামার চোখে আজ ফুটে উঠেছে ভালবাসার দু'টি ফুল।

উদগ্র কামনায় শ্যামা মথিত। সে যেন সমুদ্রগামী এক সুসজ্জিত তরণী। অবলীলায় পেরিয়ে চলেছে

ঢেউ-এর পর ঢেউ। নগরপাল, উত্তীয় সবাই একে একে সরে গেল তার চলার পথের দু'ধারে। সে চলেছে অভিসারে। যাকে প্রথম দেখাতেই চিনেছে তার মন, সমস্ত জীবন, সমস্ত সাধন দিয়েই যে তাকে পেতে হবে।

শ্যামার দুস্তর পারাবার-যাত্রা বুঝি শেষ হয়ে আসে। অদূরে দেখা যায় কূলের দিশা। এইবার বুঝি তার সব দুঃখের সমাপ্তি। কিন্তু একি হল! কূল ছুঁয়েও যে আর কূল পাওয়া গেল না। তট-তরঙ্গের ঘায়ে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল তার তরণী। সীমাহারা অকূল সমুদ্রে শ্যামা আজ পরিত্যক্তা। শুধু তার চারদিক ঘিরে নিষ্ঠুর স্মৃতির তরঙ্গ-নাগিনীদের জ্বালাময় দংশন।

শেষ হল অনুষ্ঠান। মঞ্চের আলো জ্বলে উঠেছে। নাটকের পাত্র-পাত্রী গায়ক-গায়িকার দল এসে দাঁড়াল মঞ্চ জুড়ে। গান শুরু হল, 'আমাদের শান্তিনিকেতন'।

শ্রোতা আর দর্শকের দল দাঁড়িয়ে আছেন নিজের নিজের আসনে। তাঁদের নীরবতাই প্রকাশ করছে তাঁদের তৃপ্তি।

অনুষ্ঠান শেষে কিছুক্ষণের ভেতরেই জনশূন্য হয়ে গেল গৌর প্রাঙ্গণ। কেবল দু'চারটি কর্মী পরিত্যক্ত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি গুছিয়ে তুলছিল।

গৌর প্রাঙ্গণে ঘড়িঘরের পাশে বাঁধানো আলো-আঁধারি জায়গাটিতে তখনও বসেছিল শান্তা। আকাশ জুড়ে তখন ছিন্ন মেঘেদের শিবির গড়ার কাজ চলেছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে। একরাশ পাতাপত্তর উড়ে গেল। হঠাৎ টপটপ্ করে ক'ফোটা জল ঝরে পড়ে শুকনো ধুলো ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

শান্তার চোখে কেন জল এলো? জীবনটাকে যে কতকগুলো কৌতুক আর কথামালা ছাড়া জানত না, তার মন আজ এমন ভারী হয়ে উঠল কেন?

মঞ্চের ওপর যখন সিঁথিকে আর কোন রকমেই সিঁথি বলে চেনা যাচ্ছিল না, সিঁথির সারা দেহমন যখন শ্যামাতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, তখন অবাক হয়ে শুধু তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল শান্তা।

সেদিন ওদের সামনে যে উত্তীয়কে নিতান্ত নির্বোধ বলে ভর্ৎসনা করেছিল, আজ অভিনয়ের ভেতর তার ত্যাগকে অনেক বড় করে দেখতে পেল শান্তা। তার মনে হল, জীবনটা শুধু পাওয়া নয়, দেওয়াও বটে। সে দেওয়া উত্তীয়ের মত এমনি নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া।

আর শ্যামা! শুধু ভালবাসাকে দু'হাতে আগলে রাখতে গিয়ে হারিয়ে বসল তার সব।

আচ্ছা, সিঁথি কি প্রত্যাখ্যাতা শ্যামারই অন্য রূপ? স্বামীকে দু'হাত ভরে পেতে চেয়েছিল বলেই কি সে আজ শ্যামার মত নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেল? আবার জল এলো শান্তার চোখে। তার হঠাৎ মনে হল, রূপ, দক্ষতা, কোন কিছুই কিছু না। এদের যদি মূল্য থাকত, তাহলে সিঁথির মত এমন একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় কেন?

গুরুদেবের গানের দু'টি কলি তার মনে এলো,

'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।'

এ প্রার্থনা কি উত্তীয়ের প্রার্থনা? এমন ভালবাসা নইলে কি নীরবে সবকিছু সঁপে দিয়ে সরে দাঁড়ানো যায়?

কতক্ষণ একা একা বসেছিল শান্তা। আকাশের ঐ ভেসে চলা মেঘের মত কত এলোমেলো ভাবনাই না ভেসে আসছিল তার মনে।

এদিকে শ্রীসদনের পথের ধারে তখন বিশিষ্ট অতিথিদের ভিড়। অনুষ্ঠানে সিঁথির কৃতিত্বই তখন একমাত্র আলোচ্য বিষয়। সিঁথি আজ যেন তার সব হারিয়েও বিজয়িনী।

কেউ কেউ অবশ্য তারিফ করল সংহিতাকে। এমন দরদী গলার গান বড় একটা নাকি শোনা যায় না। আবার কেউ এমন মন্তব্যও করল যে, ওরা দুটিতে আজ সুর আর সঙ্গতের মত মিলে গিয়েছিল। দুটির একটি সরে দাঁড়ালে এমন অনুষ্ঠান কিছুতেই আশা করা যেত না।

প্রশংসার বর্ষণ যখন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো, আশীর্বাদ কুড়োনোর পালা যখন প্রায় সাঙ্গ, তখন খোঁজ পড়ল শান্তার।

ভিড় ঠেলে সিঁথি আর সংহিতা আজ যেন বেরুতেই পারছিল না। এখন মুক্তি পেয়ে ওরা ছুটল শান্তার খোঁজে।

ওদের অবাক লাগল এই ভেবে যে, সবার আগে যার আসার কথা, সেই আজ নিরুদ্দেশে। ওরা হোস্টেলের অন্ধিসন্ধি খুঁজে দেখল। জনে জনে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, কিন্তু শান্তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

কেউ বা হেসে মন্তব্য করল, শান্তা আজ ত্র্যহস্পর্শ যোগ এড়াতে চাইছে বোধহয়।

যারা ওদের ভালবাসত তাদের মধ্যে কেউ মন্তব্য করল, তা কেন হবে, ওরা তো ত্রিবেণী। ওদের স্পর্শ করেও পুণ্যি।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা এসে পড়ল গৌর প্রাঙ্গণের ঐ ঘুরোনো চাতালের পাশে। আবছা অন্ধকারে তখনও বসেছিল শান্তা। ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল না, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল!

সিঁথি দৌড়ে এসে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরল। কান্নাভেজা অনুযোগের সুরে বলল, কি করেছি আমি তোমার যে আজকের দিনে তুমি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলে? বল, উত্তর দাও?

সংহিতাও ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে শান্তার পাশে। তার দৃষ্টিতেও প্রশ্ন।

শান্তা সিঁথির হাতখানা চেপে ধরে বলল, তোদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলে আমি আর কি নিয়ে থাকব বল?

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দু'ঘন্টা ধরে নেচে নেচে শরীরটা তোর একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে, তাই না রে?

আমার কিচ্ছু হয়নি,—হেসে বলল সিঁথি।

এবার সংহিতার দিকে ফিরে শান্তা বলল, কি ভাবনাই ছিল তোর গলা নিয়ে, কিন্তু আজ তুই সত্যি আমার মুখ রেখেছিস। আমার তালমিছরি খাওয়ানোর ফল ফলল এতদিনে।

শান্তার শেষের কথাটায় তিন সখীতেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

রাতের শান্তিনিকেতন তখন গভীর ঘুমে অচেতন। শ্রীসদনের কোন ঘর থেকেই এক কণা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না। আশ্রমিকরা আজ ক্লান্ত।

কেবল একটি ঘরের সামনে কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে ছিল দুটি ছায়ামূর্তি। তারা বাইরে থেকে শুনছিল ঘরের ভেতর একটা চাপা কান্নার সুর আর মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি। টুকরো টুকরো কথা অস্পষ্ট কিছু অর্থ নিয়ে উৎকর্ণ দুটি ছায়ামূর্তির কানে ভেসে আসছিল।

এক সময় শান্তা দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলে। বন্ধ হয়ে গেল ভেতরের ফোঁপানির আওয়াজ।

কিছু পরে জানালার কাছে এগিয়ে এলো সিঁথি।

কে!—সিঁথির গলায় বিস্ময়ের চমক।

দরজা খোল, আমরা।

দরজাটা খুলে গেল।

সিঁথির স্বরে তখনও বিস্ময়, এত রাতে, তোমরা!

ওরা ঘরের ভেতর ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

শান্তা বলল, ভেবেছিলি বুঝি বজ্রসেন আসবে, আমাদের দেখে তাই নিরাশ হলি।

বস, বস, বলে সিঁথি ওদের বিছানাটা দেখিয়ে দিচ্ছিল। শান্তা চাপা গলায় ঝংকার দিয়ে বলল, থাম্, থাম্, তোকে আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না। বসার জায়গা আমরাই দেখে নিতে পারব।

শান্তা এবার সিঁথির হাতটা টেনে নিয়ে তাকে জোর করে বিছানায় বসিয়ে বলল, এখন বলবি কি, এত রাত অবধি কেন জেগে বসে আছিস?

সিঁথি নীরবে বসে আছে দেখে শান্তা বলল, এমন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন বলতে পারিস?

পেছনের একটা জানালা দিয়ে পূর্ণিমা চাঁদের আলো এসে পড়েছিল। সিঁথির টেবিলের ওপর রাখা

ছিল সেই দুটি ফটো। ধূপ দেওয়া হয়েছিল, গন্ধটা তখনও মিলিয়ে যায়নি। সংহিতা আজ সন্ধ্যায় দেখা ফটো দুটি আবার দেখতে লাগল নিবিষ্ট হয়ে।

সংহিতা এতক্ষণে কথা বলল, এ যে তোর ফটো রে।

নির্বিকার চোখ তুলে সংহিতার দিকে তাকিয়ে রইল সিঁথি।

শান্তা বলল, আচ্ছা সিঁথি, একটা কথার উত্তর দিবি?

সিঁথি শান্তার দিকে চোখ মেলে তাকাল।

শান্তা বলল, আগে বল, কোনকিছু লুকোবি না?

সিঁথি মাথা নেড়ে জানাল যে বন্ধুদের কাছে কোন কিছুই সে গোপন করে রাখবে না।

শান্তা বলল, তুই যে বিয়ে করেছিস, তোর যে এমন সুন্দর একটা সংসার আছে, তা তুই ভুলে আছিস কি করে? সবার কাছ থেকে এমন করে পালিয়ে তুই কি শান্তি পাচ্ছিস তোর মনে?

শান্তা সংহিতার হাত থেকে একখানা ফটো টেনে নিয়ে সিঁথির দিকে ফিরে বলল, কি জন্যে তুই সংসার ছেড়ে এখানে এলি, তা আমরা জানতে চাই না; শুধু এইটুকু কথা মনে হয়, এই নিষ্পাপ শিশু তোর কাছে কি দোষ করল। কেন তুই তাকে তোর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলি?

সিঁথি যে আর বসে থাকতে পারছে না। দুটি হাতে মুখ ঢেকে সে শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

শান্তা তার মাথায় হাত রাখতেই সে পাগলের মত শান্তাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপাতে লাগল।

সংহিতা ততক্ষণে তার পাশে এসে বসেছে। সে সিঁথির গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, এতকাল নিজের মনে এতবড় একটা দুঃখকে তুই চেপে রেখেছিস। আমাদের কাছে বললেও তো তোর মনটা হালকা হত।

কতক্ষণ পরে সিঁথি মুখ তুলল। মনে হল দুটি বন্ধুর মনের উত্তাপ পেয়ে সে কিছুটা শান্ত হয়েছে।

শাড়ির একটা প্রান্ত তুলে সে তার চোখ মুখ ভাল করে মুছে নিল। দোলের চাঁদ সিঁথির ঘরে ততক্ষণে আলোর ঢেউ তুলেছে। সেই আলোয় সিঁথির মুখখানাকে বড় করুণ, বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সিঁথি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ওদের দিকে। বলল, তোমরা হয়তো আমার সম্বন্ধে কত কিছুই না ভেবেছ।

তারপর সে টেবিলের ওপর থেকে ঐ দুটি ফটো তুলে এনে বলল, এই ফটোর সঙ্গে আমার একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে, তাই না?

একটু থেমে সে বলতে লাগল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার অবস্থায় কোন দিন কাউকে পড়তে না হয়।

সিঁথি এবার বলল, আমার জীবনের গল্প এমন কিছু বড় নয়, তোমরা যদি সে গল্প শুনতে চাও তাহলে আমার সম্বন্ধে অনেক ধারণাই হয়তো তোমরা মুছে ফেলতে পারবে।

কোন একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কতগুলো গাছ চাঁদের আলোয় স্নান করছে। পিঙ্করঙের বোগেনভিলিয়া আশ্চর্য এক বসন্ত-বাহার। দিনের আলোয় আর রাতের জ্যোৎস্নায় সে যেন সমান সুন্দরী।

রাতের জগতের দিকে একবার তাকাল সিঁথি। এত ঐশ্বর্য, তবু এত নিঃসঙ্গ।

শান্তা কথা বলল, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বলতে তোর যদি কষ্ট হয় সিঁথি তাহলে থাক সেসব কথা। তুই আমাদের বন্ধু, আমরা মনে করি তাই আমাদেব সবচেয়ে বড় পাওয়া।

না, না, সে কথা নয়,—বলল সিঁথি,—আমি এতকাল নিজেকে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছি, আজ মনে হচ্ছে, আমি নিজেকে নিজের কাছ থেকেই এড়িয়ে চলেছি। আমি যে কি চাই আর কি চাই না আমার নিজের কাছেই তা স্পষ্ট নয়।

সংহিতা বলল, এমন করে তুই যদি নিজেই কষ্ট পাস তাহলে আমরা কেমন করে সহজ আনন্দে তোকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই বল? দুঃখ হয়তো তোর আমরা মুছে দিতে পারব না, তবু তোর দুঃখের সামান্য কিছুটা ভাগ আমরা পেলে, মনের দিক থেকে তুই কিছুটা হালকা হতে পারতিস।

সিঁথি বলল, অনেকদিন তোমাদের কাছে আমার মনের যন্ত্রণার ছবিটাকে তুলে ধরতে চেয়েছি, কিন্তু কেমন এক ধরনের সংকোচ বার বার আমাকে বাধা দিয়েছে। আজ মনে হচ্ছে, আমার অতীতের সব কটা পাতা তোমাদের সামনে মেলে দিতে পারলে, স্মৃতির যন্ত্রণার হাত থেকে কিছুটা অন্তত রেহাই পেতে পারব।

শান্তা বলল, বোন বল, বন্ধু বল, তোকে আমরা সব-রকমভাবেই মেনে নিয়েছি। আমাদের কাছে তোর গোপন কিছুই থাকবার কথা নয়।

এরপর কিছুক্ষণের নীরবতা। সিঁথি বাইরে তাকিয়ে দেখল, শান্তিনিকেতন প্রসন্ন শান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। দিনের সেই উৎসবের উত্তেজনার কোন চিহ্নই আর নেই তার চেতনায়।

সিঁথি এবার বন্ধুদের দিকে ফিরে বলতে শুরু করল, সাত বছরে আমরা দু'বোন মাকে হারিয়েছিলাম। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। মিলিটারীতে কাজ করতেন। আমরা মায়ের কাছেই থাকতাম। মা খুব ভাল নাচতে পারতেন। ছোটবেলা থেকেই মা আমাদের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচ শেখাতেন। সেই বয়সেও আমরা দু'বোন নানান জায়গায় নাচের প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার পেয়েছিলাম। মিলিটারীর কাজে বাবাকে ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। মা একটা নামকরা স্কুলে আংশিক সময়ের জন্যে নাচ শেখানোর কাজ নিয়েছিলেন। কোন কোন সময়ে বাবা আমাদের কাছে এসে কয়েকদিনের জন্যে থেকে যেতেন। তাঁর আসার আগে থেকে মা আমাদের বাবার মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে নানারকম শিক্ষা দিতেন। কত রকমের ডিসিপ্লিন আমাদের শিখে নিতে হত।

বাবা এলে সঙ্গে আনতেন অনেক রকমের উপহার। আমরা সে সব পেয়ে যে পরিমাণ খুশি হতাম, সে পরিমাণে মনের আনন্দকে প্রকাশ করতে পারতাম না। কারণ, চেঁচিয়ে উল্লাস প্রকাশ করা বাবা আদপেই পছন্দ করতেন না।

একটা জিনিস বিশেষ করে আমাদের নজরে পড়েছিল। বাবা এলেই, আমাদের বাড়িতে এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসতেন। শুনেছিলাম তিনি নাকি কোন এক কনভেন্টের টিচার। মা আমাদের ওঁকে আন্‌টি বলতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা লক্ষ্য করতাম, আন্‌টি এলেই সারা বাড়ির পরিবেশটা বদলে যেত। মা তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন, কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকতেন। বাবা তখন একেবারে উলটো স্বভাবের। কোথায় থাকত তাঁর গাম্ভীর্য। তিনি আন্‌টির সঙ্গে উচ্ছল কথাবার্তায় মেতে যেতেন।

তারপর মা যখন খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন আমরা দেখতাম বাবা আর ঐ আন্‌টি লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে গল্পসল্প করছেন।

আমরা দু'বোন ছিলাম যমজ। অনেকেই যমজ থাকে, আর তাদের দেহের গঠনে পার্থক্যও থাকে কম, কিন্তু আমাদের বেলায় ছিল অবাক রকমের সাদৃশ্য। বাবা আমাদের দুজনকে পৃথক করতে পারতেন না। শুধু মাই জানতেন, আমাদেব ভেতর কে সিঁথি আর কে বীথি।

একবার আন্‌টি বাবার জন্যে একটি কুকুর উপহার এনেছিলেন। সেই ভীষণ চেহারার কুকুরটাকে দেখে আমরা দু'বোন বড় ভয় পেতাম। তাছাড়া আমরা কুকুর একেবারেই পছন্দ করতাম না। আমরা যা পছন্দ করতাম তা হল বেড়াল। লেজ ফুলিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে আমাদের পোষা বেড়ালগুলো যখন আসত তখন আমরা তাদের মালিক হিসেবে বিশেষ গর্ববোধ করতাম।

বাবার ঘরে আসার সময় হলেই মা আমাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বেড়ালগুলোকে ধমকধামক দিয়ে বাড়ির বার করে দিতেন। আমরা তাদের ছেড়ে মনমরা হয়ে থাকতাম। কিন্তু খেতে বসে দেখতাম, ওরা আমাদের ভোলেনি। ডাইনিং টেবিলের তলায় আমাদের পায়ের কাছে এসে হাজির হত। মা নানাভাবে বাবার চোখের আড়ালে হাত পা নেড়ে তাদের সরাতে চাইতেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। এতক্ষণের নির্বাসন-দুঃখ ভোলার জন্যে ওরা লাফ দিয়ে উঠত খাওয়ার টেবিলের ওপর। বাবা অমনি তেড়ে উঠতেন। হাতের কাছে যা থাকত তাই ছুঁড়ে মারতেন। মা শুধু অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকতেন।

বীথির মনটা ছিল ভীষণ কোমল। সে আহত বেড়ালের দুঃখ সইতে না পেরে কখনোসখনো ছুটত তার পেছন পেছন।

বাবা অমনি রূঢ় গলায় বলতেন, এরা হয়েছে তোমার মতই শিক্ষাদীক্ষায় খাটো। কুকুর পছন্দ করে না অথচ বেড়াল নিয়ে মেতে থাকে।

বাবার কথায় মাকে কোনদিন আমরা পালটা জবাব দিতে দেখিনি।

আমরা দু'বোনে নিরিবিলিতে বাবার সমালোচনা করতাম। মা কিন্তু টের পেলেই আমাদের বাবার বিরুদ্ধে ওরকম সমালোচনা করতে বারণ করতেন। আমাদের সেই ছোটবেলার স্মৃতিতেও মায়ের স্বভাবের ছবিটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমরা কোনদিন মাকে বাবার কোনরকম উত্তেজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখিনি।

কি কারণে মায়ের মৃত্যু হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, তবে মা যখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন বাবা বাড়ি এসে কিছুকাল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মায়ের কাছে অবশ্য চব্বিশ ঘন্টাই নার্সের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আমরা দেখতাম, ঐ আন্টি এলেই বাবা আগের মতই তাঁর সঙ্গে হাসিগল্পে মেতে থাকতেন। মার ঘরে কোনদিন যদি আন্টি আসতেন তাহলে আমার অসুস্থ মা তাঁর শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে পাশের চেয়ারে বসতে বলতেন। আমরা দেখতাম, আন্টি প্রায়ই বসতেন না। দু'একটা কথা বলতেন, তাতেই লক্ষ্য করতাম, মায়ের দুটি চোখ কৃতজ্ঞতায় ছলছল করত।

মা মারা যাবার অনেক পরে প্রতিবেশীদের মুখ থেকে শুনেছিলাম, কোন এক নাচের মঞ্চে নাকি মায়ের নাচ দেখে বাবার খুব ভাল লাগে, আর সেই ভাল লাগার ফলেই মা আমাদের ঘরে আসেন।

মা মারা গেলে আমরা দু'বোনে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হলাম। মাসে মাসে বাবা টাকা পাঠিয়ে যেতেন, কিন্তু বছরে একটিবারও দেখা করতে আসতেন কিনা সন্দেহ। বাবাকে আমরা প্রায় ভুলে যেতে লাগলাম। আর মা বাবার স্নেহ থেকে অল্পবয়সে বঞ্চিত হয়ে আমরা দুই যমজ বোন পরস্পরকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলাম।

আমাদের চেহারাই শুধু এক ছিল না, স্বভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি হাতের লেখাটিও ছিল এক। অবশ্য হাতের লেখার প্রথম পাঠ আমরা পেয়েছিলাম মায়ের কাছ থেকেই।

স্কুলের দিদিমণিরা আমাদের দু'বোনকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। পড়াশোনায় আমরা ভালই ছিলাম। তার ওপর স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানে আমরা দু'বোন প্রধান ভূমিকা নিতাম।

বোর্ডিংএ নিয়মমত দুজনের আলাদা বেডের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রাতে শোবার সময় আমরা এক বিছানাতেই থাকতাম। আমরা দুজনে কত গল্প করতাম, ভবিষ্যৎ জীবনের কত স্বপ্নই না দেখতাম।

তখন বোধকরি ক্লাস নাইন কি টেন-এ পড়ছি। একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে বীথি বলল, দেখ সিঁথি, ক'দিন থেকে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।

অবাক হয়ে বললাম, সে কি রে, ক'দিন ধরে মনে হচ্ছে অথচ আমাকে বলিসনি। কি করে কথাটা পেটে চেপে রেখেছিস বল!

বীথি বলল, আগে শোন কথাটা। এসব লেখাপড়া, খেলাধূলো, গালগল্পের কথা নয়। এ কথা অনেক ভেবে চিন্তে বলতে হয়।

আমি ওর কথা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম।

বীথি খুব বিজ্ঞের মত গলার আওয়াজ করে বলল, কোনদিন তুই কি বিয়ের কথা ভেবেছিস?

বললাম, ও ভাবনা এলে তোকে বলেই ফেলতাম।

বীথি আরও গম্ভীর গলায় বলল, না এটা অত সহজে বলা যায় না। এর জন্যে অনেক ভাবনাচিন্তা চাই।

ওর কথায় প্রতিবাদ না করে চুপ করে রইলাম। সত্যি, বিয়ের কোন ভাবনাই আমার মনকে তখন একটুখানিও নাড়া দেয়নি। মনে মনে ভাবলাম, বুঝি ও ভাবনাটা খুবই শক্ত। আর তাই বীথি বেচারা ক'দিন ধরে এমন বড় একটা ভাবনার বিষয় নিয়ে একাই হিমশিম খাচ্ছে।

বীথি বলল, বিয়ে করাটা মেয়েদের ধর্ম, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের বিয়ে করা চলবে না।

বললাম, কেন?

বীথি অবাক হয়ে বলল, কেন কি রে, তাহলে যে আমাদের একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।

আমি ঠিক এতটা ভাবিনি। তাই কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় বললাম, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না, অথচ বিয়েটাও হল।

বীথি আমার কথার ওপর ঠিক ভরসা করতে পারল বলে মনে হল না। কারণ এ বিষয়টা নিয়ে সে আমার চেয়ে বেশী ভেবেছে। তবু বলল, সে কি করে হয় রে!

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, ধর যদি এমন হয় খুঁজেপেতে আমাদের মত দুটো যমজ ভাইকে আমরা বিয়ে করি।

বীথি বলল, এ কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি। দেখছি, তোর মাথাটা আমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার।

তারপর আমরা যখন এ বিষয়টা নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করলাম, তখন এই পরিকল্পনায় বেশ কিছুটা অসুবিধা দেখা দিল। প্রথমতঃ এমন একজোড়া ছেলে পাই কোথা, যারা শুধু দেখতে নয় স্বভাবেও এক হবে। দ্বিতীয়তঃ ছেলে যদি পাওয়াও যায় তাহলে তারা যে আমাদের দু'বোনকে বলামাত্র বিয়ে করবে তার কি নিশ্চয়তা আছে।

অতএব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার সেই পরিকল্পনাটিকে বাতিল করতে হল।

কিছু সময় চুপচাপ শুয়েছিলাম। বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল। বীথির খোঁচায় ধড়ফড় করে বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

কি রে, কি হল!

বীথিকে রীতিমত উত্তেজিত বলে মনে হল। ও বলল, মোটামুটি একটা পথ পেয়েছি, এখন তোর মতের অপেক্ষা।

কি বল?

বীথি বলল, তোর অমত না থাকলে আমরা একজনকেই বিয়ে করতে পারি।

বললাম, কিন্তু সেই লোকটি যে একসঙ্গে আমাদের দুজনকে বিয়ে করতে রাজী হবে তার বা কি নিশ্চয়তা আছে।

বীথি জোরের সঙ্গেই বলল, ছেলেদের তুই জানিস না, ওরা দুটো কেন সুযোগ পেলে দশটা বিয়ে করতে পারে।

প্রায় আমাদের ভাবনার সমাধান হয়ে আসছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন বাংলা ক্লাসের দিদিমণি সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কুলীনের অনেকগুলো বিয়ের উল্লেখ করেছিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বেচারা কুলীনদের সে দিন গেছে। এখন আইনের আওতায় নৈকষ্য কুলীনেরও একটির বেশী দুটি বিয়ের উপায় নেই।

কথাটা বীথিকে মনে করিয়ে দিলাম। বীথি ভীষণভাবে নিরাশ হয়ে পড়ল। সে রাতে এবং তার পরে বেশ কিছুকাল আমরা আর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বাবা এখন দু'এক মাস অন্তর আমাদের হোস্টেলে এসে দেখে যেতেন। তাঁকে আর আগের মত মনে হত না। বেশ হাসিমুখে তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করতেন, আমাদের সুবিধে অসুবিধের কথা তাঁকে জানাতে বলতেন। অবশ্য এই ক'বছরে তিনি বয়সের তুলনায় মনে হত অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন। পরে লোকমুখে শুনেছিলাম, আমাদের সেই আন্টির সঙ্গে বাবার একটা বিয়ের মত কিছু হয়েছিল, তারপর বিচ্ছেদ হতেও বেশী দেরি লাগেনি।

আমরা বাবাকে ভয় করতে শিখেছিলাম, ভালবাসতে শিখিনি। এখন বাবাকে দেখে কেমন যেন মায়া হত। আমাদের একান্ত আপনার কেউ আছেন, একথা ভাবতে ভাল লাগত।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার পর আমরা আমাদের বাড়ি ফিরে গেলাম। এতদিনের বোর্ডিং-এর মায়া কাটিয়ে আসতে আমাদের সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাড়িতে এসে আমরা অবাক হয়ে দেখলাম,

আমাদের জন্য সেখানে আর কেউ নেই। সেই সাবেককালের বড় বাড়িতে দু'একটি ঝি, চাকর, আর আমরা দু'বোন। প্রথমে গোছগাছ করে নিতে খুব কষ্টই হয়েছিল, কিন্তু ক'দিনেই আমরা বাড়ির শ্রী ফিরিয়ে ফেললাম। বাবা যখন চাকরির জায়গায় চলে যেতেন তখন তিনি তাঁর লাইব্রেরী ঘর বন্ধ করে চাবিখানা নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যেতেন। তাই লাইব্রেরী ঘর ছাড়া অন্য সব কটি ঘরই আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলাম।

বাবা তাঁর কাজের জায়গা থেকে এলেন আমাদের আসার কয়েকদিন পরেই। তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলাম যে তিনি সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে আবার কোন প্রাইভেট ফার্মে কাজ নেবেন।

সকালবেলা বাবা এলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়া চুকলে তিনি ঢুকলেন তাঁর লাইব্রেরী রুমে। দুপুরে ঘুমোনো তাঁর অভ্যেসের মধ্যে ছিল না। তিনি একখানা ইজিচেয়ারে বসে বই নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। যখন সন্ধ্যের আলো জ্বলে উঠল, তখন বাবা আমাদের দু'বোনকে ডেকে পাঠালেন। আমরা প্রায় এক যুগ পরে লাইব্রেরী ঘরে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাবা আমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের হাত ধরে পূবের দেওয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে একটি আলোর সুইচ টিপলেন।

দেখ তো তোমরা এঁকে চিনতে পার কি না।

একখানা বড় অয়েল-পেন্টিং। একটি তরুণী দক্ষিণী আভরণ আর আবরণে নিজেকে সাজিয়ে ভরত-নাট্যমের বিশেষ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার উজ্জ্বল হাসির আভাস।

আমরা দাঁড়িয়ে সেই সুন্দর ছবিখানি দেখছিলাম, কিন্তু সেটি কার ছবি তা ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না।

বাবা বললেন, এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমাদের মা।

তিনি একটু থেমেই আবার বললেন, অবশ্য তোমাদের মায়ের এ ছবি তোমাদের চেনার কথা নয়। আমিই এ ছবিখানা এক নাচের অনুষ্ঠানে তুলেছিলাম। সম্প্রতি সেই ছবিখানাই বোম্বের এক আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে পেন্টিং করিয়ে নিয়ে এসেছি।

বীথিকে দেখলাম সে তার ডান হাতখানাতে চোখের পাতা ততক্ষণে ঢেকে ফেলেছে। আমার চোখও শুকনো ছিল না। মনে হতে লাগল, বাবার এই পরিবর্তন যদি আমার দুঃখী মা একবার চোখে দেখে যেতে পারতেন তাহলে মৃত্যুও তাঁর কাছে কত শান্তির হত।

আমরা মায়ের ছবিকে প্রণাম করলাম। তারপর বাবার পায়ের ধূলো নিলাম। বাবা আমাদের মাথায় হাত রাখলেন। বাবাকে বিচলিত বলে মনে হল। কোন কথা তিনি সে সময় বলতে পারলেন না।

আমাদের মনে হল আমরা যেন আমাদের বাবাকে নতুন করে ফিরে পেলাম।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাবা বাগানে বসেছিলেন। আমরা দু'বোন ছাদের ওপর পায়চারি করে আকাশের রঙফেরা দেখছিলাম। সূর্যের শেষ আলোটুকু কোমল সোনার আভা নিয়ে এসে পড়েছিল বীথির মুখে। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে! আমি বলে উঠলাম, জানিস, একে বলে কনে-দেখা আলো। আর এই আলোয় তোকে ঠিক বিয়ের কনের মত দেখাচ্ছে।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোকেও।

আর ঠিক তার একটু পরেই যেন একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল।

বাবা নীচে বাগানে আমাদের ডেকে পাঠালেন। এখনও ভেবে পাই না আমার কথার সঙ্গে বাবার কথার সেদিন এমন মিল ঘটল কি করে।

আমরা নীচে গেলে বাবা আমাদের তাঁর সামনে বসতে বললেন। তারপর বাবা কোন ভণিতা না করেই ধীরে ধীরে বলে গেলেন, তোমরা দুটি বোন এতকাল একসঙ্গে রয়েছ, কিন্তু খুব বেশীদিন একসঙ্গে এমনি করে থাকা তো আর সম্ভব নয়। এবার তোমাদের একে একে বিয়ে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য শেষ করতে চাই। তোমাদের মা থাকলেও তিনি তাই চাইতেন। একটু থামলেন বাবা। তারপর বললেন, একটি ইঞ্জিনীয়ার ছেলে আমার সন্ধানে আছে। ছেলেটি খুব ভালভাবেই পাশ করেছে। খুব

মেধাবী ছেলে। অবস্থা মোটেই ভাল না। তার ওপর সংসারে তার দূরসম্পর্কের এক মামা ছাড়া কেউ নেই বলেই শুনেছি। আমার ইচ্ছে ছেলেটিকে আমি জার্মানীতে পাঠাই। কিন্তু তার আগে বীথির সঙ্গে ওর বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। এ বিষয়ে আমি কিছুটা এগিয়েও গিয়েছি।

বাবার ওপর কথা বলার সাহস আমাদের কোনদিনই ছিল না। মুখ বুজে চুপচাপ শুনে গেলাম।

কিছুক্ষণ থেমে বাবা বললেন, অবশ্য এতে সিঁথিই প্রথম প্রথম কিছুটা অসুবিধেয় পড়বে। তারপর দিন গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া ওকেও তো একদিন বীথির মতই সংসারী হতে হবে।

আমার চোখে জল আসছিল। আমি কোনরকম করে তা চেপে রইলাম। আমি জানতাম, একদিন আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে, কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি তা ভাবতে পারিনি।

বাবা বললেন, সন্ধ্যে হল, এখন তোমরা এসো।

তারপর হেসে বললেন, দুঃখ করো না পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে, এ হল সংসারের নিয়ম। সবই ধীরে ধীরে সয়ে যায়।

আমরা বাবার কাছ থেকে উঠে এলাম।

সেদিন দুজনের একজনও ভাল করে খেতে পারিনি। একসঙ্গে রোজকারমত এক বিছানায় শুয়েও মনে হল আমাদের দুজনকার মাঝে ব্যবধান রচনা করে আর কেউ শুয়ে আছে।

বীথির বিয়ে হয়ে গেল। শান্তনু ছেলে হিসেবে নিখুঁতই বলতে হবে। ধীর স্থির স্বভাব। দেখতে আশাতীত সুন্দর। বিয়ের আগে বাবার সঙ্গে গিয়ে আমি একদিন ওকে দেখে এসেছিলাম। ফিরে এসেই বিছানায় শুয়ে বীথিকে তার বরের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে লাগলাম। বীথি দেখি নির্বাক।

কি হল তোর?

কোন কথা নেই। ফিরে দেখি বীথি কানে আঙুল দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে।

পরে অবশ্য ও আমাকে বলেছিল, শুভদৃষ্টির সময়ে একঝলক ওকে দেখে বীথির নাকি খুব ভাল লেগেছিল।

আমি অমনি বলেছিলাম, আমার চেয়েও ভাল?

ও হেসে বলেছিল, (উত্তরটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে) দেখ তোর আর আমার ভেতর কোন ভেদ নেই। আবার ওকে আমি এখন আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। এখন তুই ওর সঙ্গে ঝগড়া করে তোর পাওনাগণ্ডা বুঝে নে।

আমি হেসেই ওকে জবাব দিয়েছিলাম, এরই মধ্যে এত দূরত্ব!

ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, তোকে ভুললে নিজেকেই যে আমার ভুলতে হবে রে।

বিয়ের ঠিক তিন মাস পরেই শান্তনুকে জার্মানীতে চলে যেতে হল। বাবা বলেছিলেন, বিয়ের পর বেশীদিন এখানে থাকলে ও আর বাইরে পড়াশোনার জন্যে যেতে চাইবে না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি পড়াশোনার কাজটা চুকিয়েই চলে আসুক।

আমি বুঝতে পারছিলাম বীথি খুব ভেঙে পড়েছে মনে মনে। কিন্তু শান্তনুর যাবার দিনে সে একটুও বিচলিত হল না। তাকে শুধু সামান্য গম্ভীর দেখাচ্ছিল। আমি আর বীথি ক'দিন শান্তনুর জিনিসপত্র গোছগাছ করছিলাম।

একসময় শান্তনু এসে বলল, ফটো দিয়েছ?

বীথি বলল, কার?

এই তোমার আর তোমার প্রাণাধিক ভগ্নীর।

আমি পাশেই ছিলাম, হেসে বললাম, আমাকে মিথ্যে জড়াচ্ছেন কেন মশায়। যার ফটো আসলে না নিলে সব শূন্য হয়ে যাবে, তার ফটোখানাই সযত্নে বুকের কাছে পকেটে ভরে রাখুন। আর 'প্রাণাধিক ভগ্নী' বলে বললেন না? জেনে রাখুন বীথির হৃদয়ে এককালে হয়তো তার ভগ্নীই প্রাণাধিক ছিল, কিন্তু তাকে প্রবলভাবে স্থানচ্যুত করে আপনি স্বয়ং দখল নিয়ে বসেছেন।

শান্তনু হেসে বলল, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার ফিরে এলে। এখন ঝগড়াটা মুলতুবী রইল।

শান্তনু চলে গেলে ক'দিন বীথি খুব কান্নাকাটি করেছিল। আমি তাকে অনেক প্রবোধ দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখছিলাম। ইতিমধ্যে জানতে পারলাম বীথি মা হতে চলেছে। খবরটা জানতে পেরে মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, এতদিন বীথিকে যে মূর্তিতে দেখেছি, সম্পূর্ণ নতুন এক মূর্তি নিয়ে কিছুদিন পরে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে।

প্রায় প্রতিদিন ওকে লক্ষ্য করতাম। ওর ভেতর কত নতুন সব পরিবর্তন দেখা যেত। আমরা দুজনে এই নতুন জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলাম না, তাই অনেকসময় অসুবিধায় পড়তে হত।

যত দিন যেতে লাগল ও যেন একটি কিশোরী মেয়ের মত চঞ্চল হয়ে উঠল। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ওর আবদার অনুযোগের শেষ ছিল না।

জার্মানী থেকে চিঠি এলো শান্তনুর। খুশিতে ভরপুর। বীথিকে চিঠিখানা খুলতে না দিয়ে আমিই খুললাম। ও কিছুক্ষণ মুখ ভার করে রইল। আমি যখন চিঠিখানা চেঁচিয়ে খুব মজা করে পড়তে লাগলাম তখন ও কানে আঙুল দিয়ে বসে রইল।

ওর কাছে গিয়ে হেসে জোর করে বললাম, তুই না একদিন বলেছিলি এক বরকে দুজন মিলে বিয়ে করার কথা, আর আজ একখানা চিঠিতে একটু ভাগ বসাতে যেতেই মুখখানা আষাঢ়ের মেঘ হয়ে উঠল।

ও অমনি আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। আমি ওর হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিয়ে বললাম, এই নাও তোমার প্রেমপত্র।

আমার কপট রাগ দেখে ও তো কেঁদেই সারা। কিছুতেই চিঠিখানা পড়বে না। শেষে ওকে অনেক বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলাম।

একসময় একটু নিভৃতে গিয়ে অনেক কথাই মনে এলো। বীথি বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠেছে আজকাল। শান্তনুর চিঠি আসতে দু'একটা দিন দেরি হলেই অমনি আহার নিদ্রা বন্ধ। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমারও ঐ একই অবস্থা।

অথচ কি মজাই না করেছিল বীথি বিয়ের বাসরে আমাকে নিয়ে।

প্ল্যানটা ছিল ওরই, আর সহযোগিতায় ছিল বন্ধুরা।

ওরা বিয়ের পর বীথির শাড়িখানা আমাকে পরিয়ে, কপালে চন্দনের চিত্র এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিল বাসরে।

শান্তনুর সঙ্গে প্রেমের প্রথম আলাপ হয়েছিল আমারই। আর ওরা আশপাশে থেকে খুব মজা লুটছিল। বীথি মাঝে মাঝে কাজের অছিলায় ঢুকে দু'একটা কথা ছুঁড়ছিল শান্তনুর দিকে।

কি, পছন্দ হয় আমার বোনকে?

শান্তনু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, দাঁড়ান, ভাল করে পরখ করে দেখি তারপর তো বলব পছন্দ অপছন্দের কথা।

বন্ধুদের কেউ বলেছিল, নিজের স্ত্রীকে ভাল করে চিনে নিন মশাই, নইলে আবার কখন শালীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন।

শান্তনু অমনি বলল, ভয় নেই, চিহ্ন দিয়ে রাখব।

আর একটি বন্ধু বলল, ভরসাও তো খুব আছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রথম রাতেই বউকে সরিয়ে দিয়ে পরনারীর সঙ্গে প্রেমালাপ।

হো হো করে সকলে হেসে উঠল। শান্তনু যেন কেমন হকচকিয়ে গিয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

আমি উঠে পড়ে বললাম, এতক্ষণ উলুবনে মুক্তো ছড়ালেন শুধু শুধু। প্রেমের যে কটি শেখা বুলি ছিল সবই তো শালীর ওপর উজাড় করে দিলেন, এখন আসল মালিককে এনে দিচ্ছি, বানানো কথা রেখে তার সঙ্গে প্রাণের কথা বলুন।

বীথিকে টেনে নিয়ে ওর গায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমরা সরে গেলাম।

সে রাতে শান্তনু এমন বোকা বনে গিয়েছিল যে বীথির দিকে মাঝে মাঝে কেবল তাকিয়ে দেখছিল, কোন কথা নাকি বলতে পারেনি সাহস করে।

সেদিন এ ধরনের রসিকতায় বীথি খুব মজা পেত। কিন্তু আজকাল শান্তনু ওর ধ্যানজ্ঞান। সহজ রসিকতা অনেকসময় ও সহজভাবে নিতে পারত না।

আমি তাতে দুঃখ পেতাম না, খুশিই হতাম। স্বামীর ওপর ওর প্রাণভরা ভালবাসার ছবি দেখে আমি মনে মনে খুব তৃপ্তি পেতাম।

এরপর জন্ম নিল তোতন, বীথির ছেলে। ওকে জন্ম দিয়েছিল বীথি, কিন্তু ও মা বলে চিনল আমাকেই। আমার বুকের মানিক হয়েই রয়ে গেল ও।

নিজের ছেলেকে কোলে তুলে নেবার সাধ থাকলেও তখন সাধ্য ছিল না বীথির। ও দুরারোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল। নার্স ছিল ওকে সেবা করার জন্যে, কিন্তু ও সারাক্ষণ আমাকে কাছে ধরে রাখতে চাইত। তোতনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ত।

আমি ওর পাশে বসে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতাম। আশ্বাস দিয়ে বলতাম, তুমি সেরে উঠলেই তোতনকে সারাক্ষণ তোমার কোলে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পাব। এখন চোখের জল ফেললে যে ওরই অকল্যাণ হবে।

শেষের দিকে ও আর চোখের জল ফেলত না। কেবল বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে।

আমি যখন বলতাম, দেখ, দেখ, তোতনের মুখখানা অবিকল তার বাপের মত হয়েছে, তখন দেখতাম বীথির মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মেঘলা দিনে রোদের ঝিলিকের মত ওর রোগপাণ্ডুর মুখখানায় খুশি উপচে পড়ত।

কোন কোনদিন ক্ষীণ গলায় ও শান্তনুর কাছে চিঠি লেখার বয়ান বলে যেত, আমি লিখে যেতাম। নিজের হাতে চিঠি লেখার শক্তি ও তখন হারিয়েছিল। আগেই বলেছি, আমার আর ওর হাতের লেখা ছিল একই ছাঁদের। শান্তনু তফাতটা ধরতে পারত না।

শান্তনুর কাছে আমরা তোতনের জন্মের খবরটা দিলেও বীথির অসুখের খবরটা লুকিয়েছিলাম। এ ছিল বীথির নির্দেশ। কি হবে বিদেশে মানুষটাকে বিব্রত করে। আর কিছুদিন পরেই যখন সে বড় ডিগ্রি নিয়ে ফিরবে তখন বীথিই হবে তার গৌরবের অংশীদার।

আড়ালে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতাম। ডাক্তার প্রথম প্রথম আশ্বাস দিলেও পরে আমার দিকে তাকিয়ে সাধারণভাবে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে মাথা নীচু করে চলে যেতেন।

এতকাল আমি আমার সুখ দুঃখ যার কাছে বলে এসেছি, মনের গুরুভার যার কাছে বলে হালকা হয়েছি, এবার তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে লাগলাম। সে যে কি দুঃসহ লুকোচুরির খেলা তা তোমাদের আমি বোঝাতে পারব না।

আমি যেন ক'দিনে নিপুণ এক অভিনেত্রী হয়ে গেলাম। বুকে পাষাণের ভার নিয়ে চোখের জলের উৎসটাকে বন্ধ করতাম। আড়ালে তোতনকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতাম, কিন্তু পরক্ষণেই মুখে হাসি ছড়িয়ে ওর ঘরে ঢুকতাম।

কোন কোনদিন ও আমাকে ওর শীর্ণ হাত তুলে কাছে ডাকত। আমি পাশে বসলেই ও আমার হাতখানা ধরে রাখত। এলোমেলো কত কি ও ভাবত মনে মনে।

একদিন ও বলল, দেখ সিঁথি, ও ফিরে এলে আমার এরকম বিচ্ছিরি চেহারা দেখে আগের মত ভালবাসতে পারবে তো?

আমি একমুখ হেসে প্রায় ধমকের সুরেই বললাম, তোর যত উদ্‌ভুট্টি কল্পনা। আসুক ও একবার ফিরে, তোর এ কথা আমি ওকে নিশ্চয়ই বলব।

ও ওর দুর্বল হাতখানা আমার মুখের কাছে তুলে চাপা দেবার চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য, আমি যেন সত্যি সত্যি এ কথা শান্তনুকে না বলি।

অন্য একদিন ও বলল, দেখ সিঁথি, মেয়েরা বুঝি সব দিতে পারে কিন্তু নিজের স্বামীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে না।

ও মনে হয় বহুদূরের কোন অলক্ষ্য মন্দিরের অস্পষ্ট ঘন্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল।

আমি ওর চুল বেঁধে ওকে প্রতিদিন সাজিয়ে দিতাম। ও যে ফুল ভালবাসত সেই ফুল একটি প্লেটে করে ওর বিছানার ওপর এনে রাখতাম। এবার কখন শিউলি ঝরে গেল গাছের তলায়। যমে মানুষে টানাটানি করে আরও দুটি মাস কাটল।

আমাদের বাগানের বড় বড় গাছগুলো পাতা ঝরাতে শুরু করল। একদিন কখন একটি ঝরাপাতা উড়ে এসে পড়েছিল ওর বিছানায়। ও সেটিকে অতিকষ্টে মাথার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিল। আমি যখন দিনের শেষে ওর কাছে গিয়ে বসলাম, ও তখন সেই পাতাটা বের করে আমার হাতে দিল। তারপর কিছু না বলে জানালার বাইরে পাতাশূন্য গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি উঠে আসছিলাম ঘর থেকে। সেদিন আমার সহ্যের সমস্ত সীমা ভেঙে গিয়েছিল। ও সাড়া পেয়ে আমার দিকে ফিরল। আমি যেতে গিয়েও যেতে পারলাম না। ও ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকল। আমার মুখখানা ওর মুখের আরও কাছে নিয়ে যেতে বলল। আমি তাই করলাম।

ওর গলা দিয়ে অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর ভেসে এল।

তোতনকে দেখিস সিঁথি, ও আমার শান্তনুর ছেলে। আর দেখিস যেন আর কেউ এসে ওকে কষ্ট না দেয়।

সেই রাতে বীথি চলে গেল। বোধহয় এমনি এক রাতে মাও চলে গিয়েছিলেন।

সিঁথি এইখানে কিছুক্ষণ থামল। তারপর শাড়ির আঁচলে চোখের জলটুকু মুছে নিয়ে বলল, বীথির মৃত্যু আমার কাছে যে রূপ নিয়েই আসুক না কেন একেবারে ভেঙে পড়ার আগে আমি তোতনকে ধরে বেঁচেছিলাম, কিন্তু এক নিষ্ঠুর যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যেতে হল এর পরের অধ্যায়ে।

বীথি মারা যাবার পর কিছুদিন কাটল। শোকের উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে কমে এল। আমি তোতনকে বুকের মাঝে আগলে রাখলাম। একদিন বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, (সাধারণতঃ বাবা বিশেষ কোন ভণিতা না করেই কথা বলতেন) এখন শান্তনু সম্বন্ধে কি কার যায়, সেই পরামর্শের জন্যে তোমাকে ডেকে আনলাম।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা বললেন, তুমি জান, অনেকগুলি করে টাকা শান্তনুর কাছে মাসে মাসে আমাকে পাঠাতে হয়। এখন বীথি চলে যাওয়ায় এ বিষয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

আমি তখনও নীরব।

বাবা আবার বললেন, শান্তনু যুবক ছেলে, আমার বিশ্বাস তাকে নতুন করে সংসার করতে হবে। তখন আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্কই আর তার থাকবে না। এ অবস্থায় মিথ্যা এতগুলো করে টাকা খরচ করার কোন দরকার আছে কি?

এবার আমি বললাম, বাবা, বীথি নেই ঠিক, কিন্তু তোতন তো আছে। আমরা কি বীথির স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক মুছে ফেলতে পারি?

বাবা বললেন, এটা রূঢ় হলেও বাস্তবের কথা। ভাবালুতা দিয়ে একে বিচার করলে চলবে না।

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

বাবা চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর একসময় বললেন, আর একটা কথা আমার মনে এল, তুমি ভেবে দেখতে পার।

আমি বাবার দিকে তাকালাম। বাবা বললেন, তোতন তোমার কাছে ছাড়া যখন থাকতে চায় না তখন ইচ্ছা হলে তুমি শান্তনুর সংসার করতে পার। আমি তার সমস্ত আয়োজন করে দেব। আর এ ধরনের ঘটনা তো হয়েই থাকে। তখন আর আমার টাকা পাঠাতে আপত্তি থাকবার কথা নয়।

এই প্রথম আমি বাবার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, আমি তা পারব না বাবা। তার চেয়ে আপনি টাকা পাঠান বন্ধ করে দিন।

চলে আসছিলাম। আবার একটা কথা মনে এল। ফিরে গিয়ে বললাম, শান্তনুকে বীথির মৃত্যুর খবরটা এখনও দেওয়া হয়নি, ওটা আমিই দেব। আর অন্যান্য সব কথা আমিই খুলে লিখব।

বাবা বললেন, বেশ তাই হবে।

সারারাত বিছানায় শুয়ে চোখের জলে ভাসলাম। একবার মনে হল, এই শিশুকে আমায় ছেড়ে দিতে হবে চিরদিনের মত। সমস্ত বুকটা যেন শূন্য হয়ে গেল। না, কিছুতেই পারব না একে অন্যের হাতে তুলে দিতে। পরক্ষণেই মনে হল, বাবার কথামত শান্তনুকে যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে সবই আমার থাকে। কিন্তু তা আমি কিছুতেই পারব না। বীথির অতৃপ্ত আত্মা আমার চারদিকে হাহাকার করে ফিরবে।

পারব না, আমি পারব না, শান্তনুকে গ্রহণ করতে আমি কিছুতেই পারব না।

পরের দিন সমস্যা দাঁড়াল, শান্তনুকে আমি টাকা পাঠাই কি করে। বীথি জীবনের শেষ দিনগুলোতেও যার সঙ্গে দেখা করতে চায়নি তার মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, তার পড়াশোনা আমি মাঝপথে থামিয়ে দিই কি করে।

আমি এক মহাসমস্যা পড়ে গেলাম। একদিকে তোতন, অন্যদিকে বাবার প্রস্তাব, তার ওপর বীথির সেই কথা, 'মেয়েরা বুঝি সব দিতে পারে, কিন্তু নিজের স্বামীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারে না।'

ভগবান আমাকে সেই দুর্যোগে পথ দেখালেন। আমার মায়ের বহু অলংকার উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা দু'বোন পেয়েছিলাম। আমি সেগুলি বিক্রি করে যথেষ্ট টাকা পেলাম, আর তাই পাঠাতে লাগলাম শান্তনুর কাছে। বীথির মৃত্যুর খবর না দিয়ে শান্তনুর উচ্ছ্বাসে ভরা চিঠির জবাব আমি নিজে দিয়ে যেতে লাগলাম।

তোমাদের আমি আজ আর বোঝাতে পারব না, কত দুঃখ বুকে চেপে আমি এ কাজ করেছি। মিথ্যা প্রেমের কথা বানাতে গিয়ে নিজের মনেই কতদিন আমি পাগলের মত হেসে উঠেছি; পরক্ষণেই ভেঙে পড়েছি কান্নায়।

যেদিন শান্তনুর চিঠি এল, তার এতদিনের সাধনা সফল হয়েছে, সে কৃতিত্বের সঙ্গে তার ডিগ্রি পেয়েছে, সেদিন বীথির ছবিখানার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে হাসি আর চোখে জল ঝরিয়ে কত কথাই না বলেছি। বলেছি, তোর আশা পূরণের জন্য আমি কোন ত্রুটি করিনি বীথি। আজ তোর শান্তনু ফিরে আসছে সগৌরবে। এতে যে তোর কত আনন্দ তা আমি প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারছি। তোর তোতনকে তার হাতে তুলে দিয়ে আমি এবার নিশ্চিন্ত হতে চাই।

আমি তোতনকে নিয়ে গিয়েছিলাম এয়ারপোর্টে শান্তনুর আসার দিনে। তার আগেই ওকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, ও যেন তার মামার বাড়িতে গিয়েই ওঠে।

প্লেন থেকে স্বাস্থ্যবান এক যুবককে নেমে আসতে দেখলাম। তোতনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, ঐ তোর বাপী।

শান্তনুর চোখ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কাছাকাছি হতেই তোতন তার শিশুহাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাপী, বাপী।

শান্তনু এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর গভীর আবেগে তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম গাড়িতে। ওর মামার বাড়িতে গিয়েই আপাততঃ ওঠার কথা।

শান্তনু আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, কতদিন তোমাকে দেখিনি।

আমি হাত সরিয়ে নিতে পারলাম না। চোখে আমার জল চিকচিক করছে তখন। ও কত কথা বলে গেল, আমি তার কোন উত্তরই দিতে পারলাম না। শুধু আধো আধো দুর্বোধ্য ভাষায় তোতন অনর্গল কথা বলে চলল।

গাড়ি যখন ওর মামার বাড়ির কাছে এসে পড়েছে তখন ও হঠাৎ বলল, সিঁথি আসেনি কেন তোমার সঙ্গে?

গাড়ি সেই মুহূর্তে এসে থামল ওর মামার বাড়ির সামনে। আমি উত্তর দেবার হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

ও নেমেই হেসে উঠল। আমার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। ও বলল, বাসরঘরের পরও আমার শিক্ষা হয়নি, তোমার কাছে এই আমার দ্বিতীয়বার হার হল।

আমি ওর হাতে একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে, তোতনকে ওর বুকে তুলে দিয়েই পালিয়ে এলাম।

বাড়ি এসে বীথির ফটোর কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, সব পেরেছি, শুধু পারলাম না তোর একটা কথা রাখতে। তোতনকে আমার বুকে চিরদিনের করে আগলে রাখতে পারলাম না। তুই আমাকে ক্ষমা করিস।

বীথি যে বিছানায় তার শেষশয্যা পেতেছিল আমি তারই ওপর মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। সাঁঝের বাতি জ্বলল না, শুধু আকাশের অস্পষ্ট চাঁদ আর অগুনতি তারা আমার ব্যথার মূক দর্শক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ এমনি করে আমার কেটেছিল মনে নেই। হয়তো অনেককিছু ভাবনা ভাবতে না পেরে আচ্ছন্নের মত পড়েছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমার গায়ে হাত রাখল। একটু চমকে উঠেছিলাম। বিছানার ওপর উঠে বসলাম।

আমি শান্তনু।

আশ্চর্য স্থির গলায় ও দুটি শব্দ উচ্চারণ করল।

আমার মনে পড়ল একটি দিনের কথা। সে ছিল শান্তনুর বাইরে যাবার আগের রাতটি। আমি, বীথি আর শান্তনু এই খাটখানার ওপরেই সে রাতে বসেছিলাম। সেদিন আমি একটু দূরেই বসেছিলাম ওদের থেকে। নানা গল্প চলছিল। একসময় বীথি বলল, শুনেছি সেখানে সুন্দরী মেয়েরা নাকি বিদেশী ছেলেদের ধরবার জন্যে পথের মোড়ে বসে থাকে। ঐ ভয়েই তো আমার দিন কাটবে।

শান্তনু হেসে বলল, নাঃ তুমি দেখছি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেলে। এ বয়সেও তোমার ছেলে-ধরার ভয় গেল না।

বীথি বলল, ভয় কি সাধে পাই। এ যে জাত বদল। মেয়ে-ছেলেধরার হাত থেকে বেরিয়ে আসা কি এত সহজ মশাই।

শান্তনু অমনি বলল, দেখ, চোরের যত দোষই থাক অন্ততঃ একটা মহৎ গুণ তার আছে, সে কখনো তার জাতভাইদের ঘরে চুরি করে না। ওরা যখন জানবে যে একজন ছেলেধরায় আমায় আগেই ধরেছে তখন চোরের ওপর বাটপাড়ি আর ওরা করবে না।

বীথি বলল, বিশ্বাস নেই। এদেশ আর ওদেশের রীতিনীতি, কাজেকর্মে অনেক তফাত। আমাদের দেশের চোরে তোমার নিয়মটা হয়তো মানতে পারে, কিন্তু মেমসাহেব চোরেও যে মানবে এর ভরসা কোথায়।

এবার শান্তনু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, কিগো অভিন্নহৃদয়া, তোমারও কি ঐ একই শঙ্কা? যদি তাই হয় তবে তো এখুনি বাঁধন খুলে ফেলতে হয়।

বললাম, কিসের বাঁধন খুলবেন?

এই বাক্স প্যাঁটরার।

তাই বলুন, আমি ভাবলাম, বুঝি আমার বোনের সঙ্গেই বাঁধন ছেঁড়ার তাল করছেন।

শান্তনু অমনি বীথির দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠল, 'তোমার বাঁধন খুলতে লাগে বেদন কি যে'। তাছাড়া যদি একটা বাঁধন হত তাহলে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত, কিন্তু এ যে একেবারে এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠ বাঁধন। দু'বোনে মিলে একেবারে কষে টান করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছ।

বললাম, আমাকে এর ভেতর টানাটানি কেন। বীথি ভাববে, আমিও গোপনে হয়তো আপনাকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছি।

বীথি অমনি আচমকা শান্তনুকে ধাক্কা দিলে। শান্তনু টাল সামলাতে না পেরে এসে পড়ল আমার ওপর।

বীথি হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, বাঁধ না, যত পারিস বাঁধ। তুই বাঁধলেই আমার বাঁধা হল।

আমি ততক্ষণে সসংকোচে নিজেকে শান্তনুর স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে একটু দূরে বসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, তুই যেন কি বীথি, মাথাটা একবারে তোর খারাপ হয়ে গেছে।

বীথি অমনি বলল, খুব লেগেছে বুঝি?

শান্তনু আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটু লজ্জা পেয়েছিল। সে দাঁড়িয়ে অন্য কাজের অছিলায় হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, এই এখুনি ফিরে আসছি।

সে রাতে যখন শান্তনু আবার ফিরে এসেছিল ঘরে তখন আর আমি ছিলাম না।

সেদিনের ছবির সঙ্গে নিথর মূর্তির মত আমার একটু দূরে বসে থাকা শান্তনুর কত তফাত।

আমি সেদিন শান্তনুর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

ঘরের নিঃশব্দতাকে ঐ ভাঙল।

তোমার চিঠি পড়ে আমি সব জেনেছি, কিন্তু একটা কথা জানতে পারিনি তাই এলাম।

ওর দিকে এবার মুখ তুলে তাকালাম।

শান্তনু বলল, মামার কাছে শুনলাম, তুমি নাকি বীথির মৃত্যুর খবরটা আমাকে না জানাতে ওঁদের অনুরোধ করেছ। তারপর এও শুনলাম, শেষের ক'টি মাস তুমি নাকি ওঁদের হাতে আমার খরচের টাকা তুলে দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলে এসেছ। তোমার চিঠির ভেতর এসব কথার উল্লেখ নেই। তাই তোমার বারণ সত্ত্বেও আমি না এসে থাকতে পারিনি।

বললাম, দয়া করে সে প্রশ্ন আমাকে আর করবেন না। সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে আজ আর কি লাভ আছে বলুন।

ও মাথা নীচু করে কতক্ষণ বসে রইল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। এই কয়েক ঘন্টায় একটা মানুষ ভেতরের ঝড়ে কি নিদারুণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে তার ছবি আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম।

কতক্ষণ ও এমনি বসেছিল। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার বারণ না শুনেই এসেছি, পার তো ক্ষমা কর।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বসুন, যাবেন না। আমার চোখের জলের বাঁধটুকু ভেঙে দিয়ে যদি শান্তি পান, তাহলে তাই হোক।

ওর মুখে আর কোন কথা ছিল না। ও বিহ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললাম বীথি বারণ করেছিল। তার অসুখের খবরে আপনি চঞ্চল হবেন, এ সে চায়নি। আর দোহাই আপনার, টাকা পাঠানোর কথা তুলে আমাকে বিব্রত করবেন না।

শান্তনু বসল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সিঁথি, যে বণিকের ভরাডুবি হয়েছে, তার এক একটি জিনিসের জন্যে আলাদা শোক করে লাভ নেই জানি, তবু অবুঝ মন মানতে চায় না।

একটু থেমে বলল, আমার বাইরে যাবার আগের রাতটার কথা মনে আছে সিঁথি?

মাথা নেড়ে জানালাম, মনে আছে।

শান্তনু বলল, বীথির বড় ভয় ছিল ওদেশের মেয়েদের ওপর। ও নানাভাবে নানাছলে, চোখের জল ফেলে ওর ঐ আশঙ্কার কথা আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু আজ ফিরে এসে ওর চোখের সামনে গর্ব করে দাঁড়াবার কোন সুযোগই ও আমাকে আর দিল না।

আমার চোখ পড়ল বীথির বাঁধানো বড় ফটোখানার ওপর।

বললাম, ঐ ছবিখানার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। দেখুন আপনার তোতনকে বুকে জড়িয়ে ধরে ও কেমন করে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। ও যে আপনাকেই চাইছে সারা মন জুড়ে।

শান্তনু উদাস চোখ মেলে একবার তাকাল বীথির ছবিখানার দিকে। বলল, কি হবে আর ছবির মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে। এ যে শুধু স্মৃতির যন্ত্রণাই বয়ে আনবে।

আমার কি মনে হল, বললাম, ছবির দিক থেকে না হয় মুখ ফিরিয়ে রইলেন, কিন্তু কি করে মুখ ফেরাবেন তোতনের দিক থেকে। ও যে বীথির সবসেরা স্মৃতিচিহ্ন।

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল শান্তনুর মুখে। বলল, বড় বুদ্ধিমতী ছিল তোমার বোন, তাই আসল জায়গায় আমাকে বেঁধে রেখে গেছে। চেষ্টা করলেও আর এ বাঁধন খুলে যাওয়া যাবে না কোথাও।

তোতনের জন্য মনটা আমার কেঁদে উঠল। কি নিষ্ঠুরের মতই না আমি তাকে এতক্ষণ দূরে সরিয়ে রেখে এসেছি। ও যে তার মার চেয়ে আমাকেই চিনেছিল বেশী করে। কতদিন আমাকে ও মা মা বলে জড়িয়ে ধরেছে। বীথি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে, তুই ওর সত্যিকারের মা সিঁথি।

আমি রাগ করে তখন তোতনকে কত কপট শাসনই না করেছি, খবরদার দুষ্টু ছেলে, মা বলেছ কি ফেলে দেব। বল, মাসি, মাসি, মাসি।

বীথির দিকে তাকিয়ে বলেছি, তোর ছেলের স্বভাব কিন্তু ভারী বিচ্ছিরি হয়ে যাচ্ছে। কখন সবার সামনে এমনি মা ডেকে বসবে আমাকে।

কিন্তু আমি তো জানি, নাওয়া খাওয়া শোয়া সবই ওর আমার কাছে। একদণ্ড ও আমার কাছ-ছাড়া হয়ে থাকতে পারেনি। ওকে ওর বাবার হাতে তুলে দিয়ে যখন ঘরে ফিরে এসেছি তখন মনে হয়েছে, বীথি চলে যাবার পর এতবড় দুঃখ আর আমি কখনো পাইনি।

বললাম, তোতন কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

কথাটা বলতে গিয়ে চেষ্টা করেও আমি আমার চোখের জলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

শান্তনু বলল, তুমি চলে আসার পর ও যেন কেমন অসহায়ের মত চারদিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকাতে লাগল। তারপর কান্না। প্রথমে চেঁচিয়ে, তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

কতক্ষণ ওকে ছেড়ে আমি তোমার চিঠিখানা নিয়ে পড়ছিলাম। তারপর সমস্ত জগৎ আমার চোখের সামনে থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুছে গেল। আমি তখন কি অবস্থায় ছিলাম, তা তোমাকে এখন আর বলতে পারব না। কতক্ষণ এমনি অবস্থায় ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, আমারই সামনে অসহায় একটি শিশু আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে।

ওকে কেউ আমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকবে। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর বড় বড় দুটো চোখে দেখলাম ওর মায়েরই দৃষ্টি। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এয়ারপোর্টে ওর প্রথম ডাক, বাপী বাপী, আর একবার আমার কানে ভেসে এল।

ও আমার বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নাভাঙা গলায় যাকে ও ডেকে চলল, সে যে তখন নিষ্ঠুরের মত ওকে ফেলে রেখে চলে এসেছে।

আমার চোখদুটো আবার জলে ভরে উঠল। বুকটা গভীর এক শূন্যতায় ধূ-ধূ মাঠের মত খালি হয়ে গেল।

শান্তনু একটু থেমে বলল, বেচারা এখন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই আমি তোমার কাছে কিছু সময়ের জন্যে চলে আসতে পারলাম।

আমি কান্নাভেজা গলাতেই বললাম, কেন এলেন ওকে ফেলে রেখে। ঘুম ভেঙে যদি পরিচিত মুখ ও না দেখতে পায় তাহলে ঠোঁট দু'খানা ফুলে ফুলে উঠবে ওর। তারপর ডুকরে ডুকরে তোতন আমার কাঁদতে থাকবে। ওকে নিয়ে আসুন। এক্ষুণি এনে দিন আমার কাছে।

কত প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে মনে ওকে আর দেখব না বলে। প্রতিদিন প্রতীক্ষা করেছি ওর বাবার বিদেশ থেকে ফেরার পথ চেয়ে। নিজেকে প্রস্তুত করেছি, তোতনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের দিনটির কথা ভেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল, আমি পারব না, কিছুতেই তোতনকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না। মনে মনে ভাবলাম, আমি এড়াতে চেয়েছিলাম শান্তনুকে, কিন্তু তোতনকে এমন করে হারাতে আমি চাইনি।

শান্তনুকে প্রায় জোর করেই আমি পাঠালাম ওর মামার ওখানে। কিছু পরে তোতনকে সঙ্গে করে ও ফিরে এল আমার কাছে। আমাকে দেখে সে কি অভিমান ছেলের। বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল সুর করে করে।

শান্তনু সে রাতে ফিরে গেল তার মামার বাড়ি। তোতনকে আমি আর ছাড়তে পারলাম না।

এমনি করে কাটতে লাগল আমার দিনগুলো।

ইতিমধ্যে বাবা অনেক চেষ্টা করলেন শান্তনুকে সংসারী করতে কিন্তু শান্তনুর সারা মন জুড়ে তখন বীথির স্মৃতি। সে বার বার এড়িয়ে গেল। বাবা আগেই আমার মনের খবর জানতেন, তাই আমাকে শান্তনুর সঙ্গে তিনি জড়াতে চাননি।

শান্তনুর চাকরির ডাক এল। দু'তিনটে জায়গা থেকেই তার দরখাস্তের সাড়া এসেছিল। এখন স্থান নির্বাচনের পালা তার।

একদিন আমি বসেছিলাম বীথির ঘরে, ও এসে দাঁড়াল আমার কাছে। নিয়োগপত্রগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, বল কোথায় যাওয়া যায়?

বাংলা আর বিহার থেকে এসেছে দুটি সরকারী নিয়োগপত্র আর একখানা জম্মু কাশ্মীর থেকে।

ওর হাতে কাগজগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার। আমি এ বিষয়ে একেবারে আনাড়ী।

শান্তনু বলল, চাকরির ব্যাপারটা আমার ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে তোমারও একটু যোগ থেকে গেছে। তাই তোমাকে ছেড়ে আমি একা কোন ডিসিশান নিতে পারছি না।

আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। ও বলল, আমার ইচ্ছে আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে চলে যাই। কিছুদিন বাইরে কাজ নিয়ে থাকলে হয়তো এই দুঃখের বোঝাটাকে কিছুটা ভুলে থাকতে পারা যাবে। কিন্তু তোমার আর তোতনের কথা ভেবে আমি কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ভেবে নিয়ে বললাম, আমারও মনে হয়, আপনার ক্লান্তশরীর আর মন যেখানে গিয়ে শান্তি পায় সেখানেই আপনার যাওয়া ভাল।

কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটার সমাধান হবে কী করে?

হেসে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই তোতনকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি স্বার্থপরের মত ওকে আগলে রাখব না। তা ছাড়া ও এখন বাপীকে অনেকখানি চিনে ফেলেছে।

শান্তনু চুপচাপ বসে রইল। একসময় বলল, প্রথম প্রথম ওর খুবই কষ্ট হবে। তা ছাড়া নতুন চাকরি। এদিক ওদিক আমাকে ঘুরতে ফিরতে হবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরায় অনেক অসুবিধে।

একটু থেমে ম্লান হেসে বলল, যা হোক করে একটা ব্যবস্থা এরই ভেতর আমাকে করে নিতে হবে। তোতনের মাসিকে তো আর সব জায়গায় পাওয়ার আশা করতে পারি না।

কি মনে এল, বলে ফেললাম, আপনার আপত্তি না থাকলে কিছুদিনের জন্যে আমিও সঙ্গে যেতে পারি। আপনার নতুন সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসা যাবে।

শান্তনু যেন অকূলে কূল পেল। বলল, তাহলে এখুনি আমি কাশ্মীরেই টেলিগ্রামে খবরটা পাঠাচ্ছি।

আমার যাওয়াতে বাবা বিশেষ আপত্তি করলেন না। আমার মনের আগের সংকল্পের পরিবর্তন ঘটুক বাবা হয়তো তাই চেয়েছিলেন। আমাকে তাই বাধা দিলেন না।

আমরা কয়েকদিনের ভেতরেই শ্রীনগরে রওনা হয়ে গেলাম।

নতুন সংসার পাতলাম ঝিলমের জলের ওপর একখানা হাউসবোটে। ডাঙায় সহসা মনের মত বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না। হয়তো ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শান্তনু চেয়েছিল কিছুদিন হাউসবোটেই থাকতে। তাই বাড়ি খোঁজার ব্যাপারে যতটা মনোযোগী হওয়া দরকার ছিল ভেতর থেকে সে হয়তো ততটা তাগিদ পায়নি। আমরা থেকে গেলাম হাইসবোটের সংসারে।

প্রতিদিনই আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা। সকাল থেকেই শিকারায় করে তরিতরকারি ফলফুল নিয়ে বেচতে আসত মেয়ে পুরুষ। নদীর জলে চিত্রিত নৌকোগুলো ভেসে বেড়াতে। তোতন তো মহাখুশি। সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেত ফলওয়ালীদের সঙ্গে। ভাবটা তাদের সঙ্গেই ছিল তার বেশী। ফলে প্রায় দিনই আমার বারণ সত্ত্বেও সে একটা দুটো আপেল উপঢৌকন পেত। ওর বাবা যখন ফিরে আসত অফিস থেকে তখন ও ওর হাতে ধরে থাকা লালরঙের আপেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত, আর ওর নিজের ভাষায় কৃতিত্ব জাহির করত।

শান্তনু বলত, ছেলে ঠিক তার মায়ের মতই হয়েছে।

বলতাম, মিথ্যে কেন ওকথা বলছেন। অবিকল আপনার মুখ, শুধু চোখ দুটো ছাড়া।

তাহলেই হোল। চোখই তো সবকিছু দেখায়। সব চেনার মূলেই যে ঐ।

বলতাম, শুধু চেহারা নয়, স্বভাবটাও বাবার মতই হয়েছে।

কি করে বুঝলে?

হেসে বলতাম, যেমন চঞ্চল তেমনি স্থির।

হেসে উঠত শান্তনু।

হাউসবোটের ভেতরটা ভারী সুন্দর। ড্রইং-রুম। রেডিও, বই-এর আলমারি সেখানে। ডাইনিং-রুম। তারপর দু'খানা সুন্দর সজ্জিত ঘর। একটাতে শান্তনুর থাকবার ব্যবস্থা, অন্যটিতে আমি আর তোতন।

আমরা সাঁঝের একটু আগে শান্তনু ফিরে এলে হাউসবোটের ছাদের ওপর চায়ের আসর পাততাম। ওখান থেকে ভারী সুন্দর দেখাত ঝিলমের ওপারে নীলে বাদামীতে মেশা পাহাড়। চিনার আর পপলারের গাছগুলো ডালপাতার ছবি মেলে এক একটা সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ তৈরি করত।

কত পণ্যবাহী নৌকোর আনাগোনা চলত। এপার ওপারে হাউসবোটে চলত নানাধরনের কথা। কখনো সন্ধ্যার আবছায়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যেত পাখি। হাততালি দিয়ে খুশিতে ফেটে পড়ত তোতন।

এখানে এসে নতুন কাজের ভেতর সারাদিন ডুবে থাকত শান্তনু। কলকাতায় অলসভাবে বসে থাকায় মনের ভেতর যে দারুণ ভার চেপে বসেছিল ওর, এখানে ধীরে ধীরে মনে হল তা হালকা হয়ে আসছে।

আমি ওকে যতটুকু পারতাম সঙ্গ দেবার চেষ্টা করতাম। কথায় কথায় ওর মনের গোপন ক্ষতটুকু ধুয়ে মুছে দেবার চেষ্টা করতাম।

মাঝে মাঝে যখন একা থাকতাম তখন মনে হত, এ কি করছি আমি। দিনের পর দিন একটা সংসারের ভেতর আমি জড়িয়ে পড়ছি। যে সংসার আমার নিজের নয়, যার সঙ্গে আমার আগামী দিনগুলোর কোন যোগই আর থাকবে না।

হইচই করে একদিন শান্তনু একটা পরিকল্পনা পেশ করল। সামনে তার কি উপলক্ষে যেন কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেছে। ঐ ছুটিতে সে কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে চায়।

আমরা এতদিন কাশ্মীরে এসেও শ্রীনগরের বাইরে কোনদিন বেরোবার সুযোগ বা সময় পাইনি। তাই শান্তনুর এই খবরে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

একদিন আমরা শিকারা ভাড়া করে চললাম মোগল গার্ডেনস্ দেখতে। সারাদিন কাটালাম পাহাড়ের কোলে চিনারের ছায়ায় ছায়ায়। তোতন এমন দস্যি ছেলে যে তাকে সামলাতে সামলাতেই আমরা নাজেহাল।

ফিরে চললাম শিকারায়। তখন সূর্যাস্তের আবীর ছড়িয়ে পড়েছে ডাল লেকের জলে। শেষবারের মত পীরপাঞ্জালের পর্বতশ্রেণী মাথায় বরফের মুকুট পরে জলের আয়নায় দেখে নিচ্ছে তার সারাটা দেহের ছবি। সে দৃশ্য ভোলার নয়। আমাদের শিকারা জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পানকৌড়ি জলের ওপর পাখার ঝাপটা টেনে উড়ে চলেছে। তাদের পেছনে ঝিলমিল করে ছড়িয়ে পড়ছে জলের কণা।

খলখল খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠছে তোতন। একবার সেই দস্যুটা বাবার কোলে চলে যাচ্ছে, আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে আমার বুকের ওপর। যেন একটা অদৃশ্য সেতু বাঁধার চেষ্টা করছে ও।

হঠাৎ লেকের জলের যেখানটাতে একফালি সরু জমি দীর্ঘ পপলার গাছগুলো নিয়ে এগিয়ে এসেছে তার বুকে চতুর্দশীর চাঁদের ছবিটা ফুটে উঠল। আমরা সেখান থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। চারদিকে থইথই জল। পপলারের মাথার ওপর থেকে প্রায় পূর্ণ চাঁদ আলো ঝরিয়ে দিচ্ছিল। শতখণ্ড ভাঙা মুকুরের মত ঝকমক করে উঠছিল নীচের ঢেউতোলা জলের প্রবাহ। সেদিনের সে দৃশ্য ভোলার নয়। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সবকিছু ভাবনা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। শান্তনু চেয়ে আছে, আমিও সেই একই দৃশ্যে আমার মন আর দুটো চোখ মেলে দিয়েছি।

সে রাতে একটি ঘটনা ঘটল। তোতনকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে আছি, ঘুম এসেও আসছে না আমার চোখে। স্রোতের শেওলার মত মনের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে টুকরো টুকরো অসংলগ্ন কত ভাবনা। কার পায়ের সাড়া পেলাম আমার ঘরের দরজায়। কান পেতে বুঝলাম, শান্তনু এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপারে। দরজা বন্ধ করে রাখার কোন প্রয়োজনই আমি বোধ করি না, শুধু ভেজিয়েই রেখে দি। আমি

অন্ধকারে চেয়ে রইলাম। দরজা যেমন ভেজানো ছিল তেমনি রইল। কেউ হাত দিয়ে ঠেলল না। এমনিভাবে কতক্ষণ কেটে গেল। মনে হল কোন বিশেষ দরকারে হয়তো এসেছে শান্তনু, কিন্তু সঙ্কোচে ভেতরে না আসতে পেরে ভাবনায় পড়েছে।

আমিই উঠলাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজাটা মেলে ধরলাম। শান্তনুই দাঁড়িয়েছিল। ও যেন কিছু একটা ভেবেই এসেছিল, কিন্তু আমাকে দেখে কোন কথাই আর ওর মুখ দিয়ে বেরোল না।

বললাম, আপনি! ঘুমোন নি এখনও?

শান্তনু এতক্ষণে কথা খুঁজে পেল। বলল, আসবে সিঁথি আমার সঙ্গে নৌকোর ছাদে? বাপীর চোখে ঘুম, কিন্তু আমি যে এই ভেসে যাওয়ায় চাঁদের আলোয় বিছানায় থাকতে পারছি না।

ঘরের ভেতর থেকে র‍্যাপারখানা টেনে নিলাম। গায়ে জড়াতে জড়াতে বললাম, চলুন।

শান্তনু আগে, আমি পেছনে।

সে কি, আপনি এমনি একখানা পাতলা জামা গায়ে দিয়ে ছাদে যাবেন নাকি?

শান্তনু একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল।

বললাম, দাঁড়ান, আমি শালখানা নিয়ে আসছি।

ওর ঘর থেকে গরম জামা আর একখানা শাল এনে ওর হাতে দিলাম।

এবার আমরা ছাদে উঠে এলাম। দুটো চেয়ার পাতা ছিল পাশাপাশি, বসলাম তারই ওপর।

আমরা প্রথমে কোন কথাই বলতে পারলাম না। চাঁদের আলোয় যেন বান ডেকেছে। ঝিলমের মলিন জলের ধারাকে আকাশের ঐ চাঁদ যেন রূপোর পাতের প্রবাহ করে তুলেছে। ওপারের পাহাড় বন অস্পষ্ট রহস্যে ঢাকা।

'মনে হল সৃষ্টি যেন
স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ
অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।'

মনে মনে গুনগুনিয়ে উঠল বলাকার কবিতা। কি সত্য ছবিই না দেখেছিলেন কবি এই ঝিলমের ওপর থেকে!

আর একটা কথা মনে এল। আমার সামনে যে মানুষটি চিত্রার্পিত হয়ে বসে আছে, তার মনেও কি এমনি অব্যক্ত ধ্বনি প্রকাশের অপেক্ষায় গুমরে উঠছে!

একবার শান্তনু আমার দিকে তাকাল। সেই অস্পষ্ট আলোছায়ার মায়ায় আমি তার সঠিক মনের ভাষা পড়তে পারলাম না।

কতক্ষণ ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমিও চোখ ফেরাতে পারলাম না।

ও কি তখন আমার ভেতর বীথিকে খুঁজছিল। এমন নিস্তব্ধ চন্দ্রাচন্দ্রে, এমন প্রকৃতির আয়োজনের ভেতর একটি পুরুষের হৃদয় যাকে একান্ত কাছে পেতে চায়, তাকেই কি খুঁজছিল শান্তনু।

কিন্তু সে কোথায়? এমন আয়োজনের ভেতর সে কেন নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। একটি পুরুষ-হৃদয় এই মুহূর্তে যাকে প্রার্থনা করছে, সে কেন তার কোন উত্তরই দিচ্ছে না।

আমি বুঝতে পারছিলাম, শান্তনুর সমস্ত মন আজ এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমি কি যেন ভাবলাম। নিজেকে সেই প্রবল ঘূর্ণির আকর্ষণ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য অসহায়ভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম।

হঠাৎ যেন এক দেবদূত আমাকে সেই ঘূর্ণির টান থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেল।

সিঁড়ির ওপরে উঠতে পারছে না তোতন। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে আমাকে কাছে না পেয়ে সে চলে এসেছে সিঁড়ির তলায়। আমরা উঠে পড়লাম। সেই মুহূর্তে যা কিছু ঘটতে যাচ্ছিল তার তার কেটে গেল। আমি ছুটে নেমে গেলাম সিঁড়ির তলায়। কোলে তুলে নিলাম

তোতনকে। বুকে জড়িয়ে বিছানার গভীরে ঢুকে পড়লাম। সে রাতে কেন জানি না কিসের যেন ভয়ে আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নিজের কাছ থেকেই বুঝি বেশী ভয় পেয়েছিলাম সেদিন, তাই এ সাবধানতা।

ভোর হল। রোজকার মত চা তৈরি করে দিয়ে গেলাম শান্তনুর ঘরে। ও তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন ড্রইং করছিল।

বললাম, এখন ওসব রেখে চা-টা খেয়ে নিন। ড্রইং-এ মন দিলে চা আর গরম থাকবে না।

ও হেসে পাশে সরিয়ে রাখল ওর অফিসের কাগজপত্র। আমার হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে গিয়ে বলল, মনে হচ্ছে কাল রাতে একজনের খুব ভাল ঘুম হয়েছে।

যেন বিচারকের কাছে আমার ধরা পড়ে যাবার অবস্থা। সত্যিই গত রাতে বিছানায় ফিরে এসে আমি একটুও ঘুমোতে পারি নি। মনে বার বার ফিরে ফিরে জেগে উঠেছে একটি কথা। শান্তনু কেন এই বয়েসে এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে। যে বয়েসে ছেলেরা নতুন সংসার পাতে, শান্তনু যে সেই গোত্রের। কিন্তু তাহলেও শান্তনু যেন সবার চেয়ে কোথায় স্বতন্ত্র। তার শক্তি অফুরন্ত, কিন্তু সে শক্তি যথেচ্ছ ব্যবহারে সে ক্ষয় করে না। এইখানেই শান্তনুর ওপর তার যা কিছু আকর্ষণ।

সকালের খাওয়া শেষ করে শান্তনু বেরিয়ে যেত অফিসের কাজে। ফিরত যখন তখন প্রায় সাঁঝের ছায়া ঘনাত ঝিলমের জলে, চিনারের বনে। আমার মনে হত, শান্তনু আমাদের সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়। আমাদের কাছে এলে বীথির স্মৃতি তার মনে জেগে উঠবে, তাই হয়তো তার এই পালিয়ে বেড়ানোর খেলা।

আমি কিন্তু বেলা পড়ে এলেই তাকিয়ে থাকতাম ওর আসার পথের দিকে। মনে মনে আমার কেন জানি না কান্না ঘনিয়ে আসত। মনে হত এমনি এক তরুণ প্রাণ দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। সে নিজে শান্তি পাচ্ছে না, অন্যকেও পারছে না শান্তি দিতে।

কেন এই আত্মনির্যাতন! বিয়ে করুক শান্তনু, সুখী হোক সে। এমনি তো কতজনেই করে থাকে। এক একবার মনে হত, নিজেই শান্তনুকে বলব এই কথাটা। কতদিন একটি মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারে? এ ঠিক নয়। তোতন সবকিছু বুঝতে যখন শিখবে তখন শান্তনুর বিয়ে করা শোভা পাবে না। তার আগে আসুক শান্তনুর ঘরে নতুন মানুষ। সে এই শিশুকে যতটুকু পারে নিক আপনার করে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারতাম না। ভয় হত মনে, যদি শান্তনু বলে, রাজী আছি তোমার প্রস্তাবে, যদি তুমি রাজী থাক। বীথির মুখ আর মনের ছায়া যেখানে পড়েছে, নতুন করে ঘর বাঁধতে হলে সেখানেই বাঁধব। আর কোথাও সংসার সাজানো সম্ভব নয় আমার।

এর কি উত্তর দেব আমি। তার চেয়ে যেমন চলছে তেমনি চলুক। যদি কোনদিন তার মনের তাগিদ আসে, সে নিজেই খুঁজে নেবে তার পথ।

আমাদের মনের ধারা যখন এমনি এলোমেলো অসমান রেখায় চলেছে, তখনই একদিন এল এক ঝড়। সে ঝড় বাইরের প্রকৃতিকে নাড়া দিয়ে তোলপাড় করে তুলল আমাদের মন।

শান্তনুর ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। আমাদের বাইরে বেড়ানোর শেষ নিশানা ছিল গুলমার্গ হয়ে খিলেনমার্গ।

যখন বের হলাম শ্রীনগর থেকে, আকাশে তখন মেঘ ছিল না। নীল আকাশের পটে ঝকঝকে সারি সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চিনার তার পাতায় জ্বেলেছে লকলকে আগুনের শিখা। উইলো গাছগুলো পরে আছে সবুজ আর হলুদে ছোপান শাড়ি।

আমরা একটি কার ভাড়া করে চলেছিলাম টাঙমার্গের পথ ধরে। পথে দু'দিক জুড়ে পপলারের সারি। আমাদের সামনে প্রায় তিন দিক ঘিরে দেখা যাচ্ছিল কাশ্মীরের তুষার ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী। সে দৃশ্য তন্ময় হয়ে উপভোগ করবার। আমার দিকে সুন্দর কোনকিছু দৃশ্য দেখা গেলে আমি শান্তনুকে ডাক দিতাম। ও মুখ বাড়িয়ে তাই দেখার চেষ্টা করত। ঠিক তেমনি আমারও ডাক পড়ত ওর দিকের কোন সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যে। আমরা যখন এ ওর ডাকে পরস্পরের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম,

তখন তোতনের খুব মজা লাগত। সে অমনি কখনো বাবার বুকে চেপে, কখনো আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিপুণ দর্শকের অভিনয় করত।

আমরা এমনি করে চলার পথে কত পাহাড়ী আঁকবাঁক, কত ছবি আঁকা ক্ষেত, কত বিচিত্র পোশাক পরা মেয়ে পুরুষ দেখতে লাগলাম। টাঙমার্গের কাছাকাছি এসে শান্তনু একটি সুন্দর দৃশ্য দেখালে। দোয়েল পাখির ঝাঁক উড়ে চলছিল আকাশপথে। একটুও শীত সইতে পারে না ওরা। তাই আকাশে দীর্ঘ অসিরেখা এঁকে ওরা চলে যায় দূরদূরান্তের কোন উত্তপ্ত প্রকৃতির কোলে।

আকাশে দোয়েলের সেই দীর্ঘরেখা দেখতে গিয়ে আমি এমনই মগ্ন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে বুঝতেই পারি নি কখন শান্তনুর কোলে আমার মাথাটি রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি।

দোয়েলের চিহ্ন যখন আকাশ থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল তখন আমি ফিরে এলাম আমার চেতনার মধ্যে।

এ কি! শান্তনু তার দুটি চোখের দৃষ্টি যে আমার মুগ্ধ বিস্মিত মুখের ওপর মেলে রেখেছে!

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তোতনকে জড়িয়ে অকারণে খুব বেশী আদর করতে লাগলাম। পরিস্থিতি রক্ষার জন্যে তোতন তখন আমার একমাত্র রক্ষাকবচ।

টাঙমার্গ এসে গেল। গাড়ি এখানেই থাকবে। কোন গাড়ি আর ওপরে যাবে না। এখান থেকে ওপরে গুলমার্গ আর খিলেনমার্গে উঠতে হবে ঘোড়ায় চড়ে।

আমরা প্রত্যেকে এক একটি ঘোড়া নির্বাচন করে চড়লাম। তোতন অবশ্য রইল আমারই কোলে। শান্তনু আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, তোতনকে দাও আমার কোলে, পাহাড়ী পথে নিজেকে সামলানোই তোমার দায় হবে।

হেসে উত্তর দিয়েছিলাম, দেখা যাবে। ভয় নেই আপনার, ছেলেকে ফেলে রেখে পালাব না।

ঘোড়ায় চড়া, বাবার উৎসাহে ছেলেবেলাতেই আমাদের রপ্ত হয়েছিল।

আমরা যত ওপরে উঠতে লাগলাম, গাছের পাতা সবুজ মখমলের রঙ ধরল। হিমেল হাওয়া বয়ে আসতে লাগল। একটা বাঁক ঘুরতেই পাইনবনের ওপারে ঝকঝকে সাদা আর পিঙ্কে মেশা একটা তুষারের পাহাড় ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি ঘোড়া থামিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

পেছনে আসছিল শান্তনু। সেও ঘোড়া নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কতক্ষণ ধরে আমরা দুজনে সে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আবার যখন চলতে শুরু করলাম তখন মনে হল এই অরণ্য পর্বতে কেবল আমরা দুজনেই পথচারী। সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমার শিরা উপশিরা বেয়ে এক গভীর অন্তরঙ্গতার প্রবাহ বয়ে গেল। শান্তনুকে নিজের ভেতর এমন করে আর কোনদিন অনুভব করিনি আমি।

আমরা গুলমার্গে ঘুরে বেড়ালাম। সেখানে হোটেলগুলো পরিচ্ছন্ন, পরিবেশটি সুন্দর। পাইনের গাছগুলো ঈষৎ উঁচু-নীচু ঢেউখেলানো প্রান্তরে দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। শীত পড়লে বরফে ছেয়ে যাবে ঐ সামনের প্রান্তর। তখন গুলমার্গে বিদেশীদের ভিড় জমে উঠবে। স্কী খেলার আসর জমবে তখনই।

গুলমার্গ থেকে কাশ্মীরের বড় বড় হ্রদগুলোকে এক এক খণ্ড রূপোর পাতার মত দেখাচ্ছিল। কি যে ভাল লাগায় সেদিন পেয়ে বসেছিল আমাদের!

এর পর আমরা ঘোড়া নিয়ে উঠলাম খিলেনমার্গে। গুলমার্গের পথ যতটা নির্ভরযোগ্য, খিলেনমার্গের পথ ঠিক ততটাই শঙ্কাসংকুল। পায়ে পায়ে হোঁচট খাচ্ছিল আমাদের ঘোড়া। পাশেই চলছিল সহিস। বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়ানো সে পথ। আমরা অনেক কষ্টে সে পথ পেরিয়ে উঠে এলাম ওপরে। খিলেনমার্গের ওপরে কোন গাছপালা নেই। শুধু ধুধু প্রান্তর আর তুষারের পর্বত। বরফের টুকরোগুলো ইতস্ততঃ পড়েছিল, আমরা হাতে তুলে লুফোলুফি খেলা করলাম। এ খেলায় তোতনের যত উৎসাহ তত ভয়। সে খেলার লোভে মুঠি ভরে তুলছিল বরফ। তারপর বরফের কামড়ে 'উঁহু' করে ফেলে দিচ্ছিল হাত থেকে। আমরা ওর মজা দেখে হাসিতে ফেটে পড়ছিলাম।

কতক্ষণ এমনি খেলা চলছিল আমাদের মনে নেই, তবে বেলা দ্রুত চলে যাচ্ছিল পাহাড়ের আড়ালে।

একসময় সহিসদের সমবেত ডাকে আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। ওরা যে কথা বলল তাতে আমাদের মুখে বন্ধ হয়ে গেল কথা। চোখে মুখে আমাদের তখন উদ্বেগ। আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত ঝড়ের চিহ্ন।

আমাদের ফেরার চিত্র সেদিন সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে উঠল। আমার কোল থেকে কেড়ে নেওয়া হল তোতনকে। সে প্রবল চিৎকারে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও সহিসের কাঁধে তাকে তুলে দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ই আমাদের ছিল না।

পাহাড়ে ওঠার সাবধানতার চেয়ে নামার জন্যে অনেক হুঁশিয়ারির দরকার হয়। ঝড় আমাদের তখন তাড়া করে আসছে পেছনে। পথের গাছপালার মাথায় ঘোলাটে মেঘ জমে উঠেছে। আথাল-পাথাল নাড়া খাচ্ছে গাছের ডালপালা। তার ভেতর সহিসের হুঁশিয়ারি শোনা যাচ্ছে পায়ে পায়ে। একটু বেচাল হলেই একেবারে ঘোড়া নিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে নীচে। কারো মুখে কথা নেই। শান্তনু আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে থাকবার চেষ্টা করছে। আমি নিজেকে দেখার ফাঁকে ফাঁকে শান্তনুকে দেখতে লাগলাম। বিপদের মুখে যেন বেশী করে ওকে আগলে রাখতে চাই। এতক্ষণে তোতনের কান্না ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে। বুঝতে পারছি তার বাহক আমাদের অনেক পেছনে পড়ে আছে। সহিসকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তোতনের কথা। সে তার নিশ্চিত পৌঁছনর সম্বন্ধে এমন আশ্বাস দিল যে তার কথায় বিশ্বাস না করে পারলাম না। আর তাদের ওপর নির্ভর না করে তখন উপায়ই বা কি ছিল আমাদের।

গুলমার্গে পৌঁছনর পথেই আমরা ঝড়ের মুখে পড়লাম। বরফের টুকরো প্রবলবেগে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমাদের ওপরেও কয়েকখণ্ড শিলাপাত হয়ে গেল। সহিস ঘোড়ার লাগাম ধরে যখন গুলমার্গের একটা আশ্রয়ে আমাদের এনে তুলল তখন সাঁঝের আঁধারের সঙ্গে ঝড়ের বিপুল দাপট শুরু হয়ে গেছে। আশ্রয়ে পৌঁছে আমরা থরথর করে শীতের বাতাসে কাঁপছিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্বেগে আকুল। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে। অসহায় তোতনের ছবিটা তখন আমার সমস্ত বুক জুড়ে কান্নার ঢেউ তুলেছে।

আমি ভয়ে ভাবনায় এমন অবসন্ন হয়ে পড়লাম যে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অবস্থাই তখন আমার ছিল না। পড়ে যাচ্ছিলাম, শান্তনু আমাকে জড়িয়ে ধরল। সহিসেরা ঘরের বাইরে থেকে আমাদের সাহস দিচ্ছিল, কিন্তু সেই অন্ধকার আর ভয়াবহ ঝড়ের মুখে সব আশ্বাসই শুকনো পাতাপত্রের মত উড়ে যাচ্ছিল। আমি শান্তনুর বুকে মূর্ছিতের মত নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। তখন আমার দেহের কোন লজ্জা ছিল না, কারণ মন আমার ছিল সম্পূর্ণ মৃত, অবসন্ন।

একসময় ঝড় থামল। কিছু আগে যে এমন ভয়াবহ ঝড়ের তাণ্ডব চলেছিল তার কোন চিহ্নই আর রইল না আকাশে। আমার মনে কিন্তু তখনও ঝড়ের উত্তাল ঢেউ। আমি কেবল তোতনের নাম করতে লাগলাম।

ঝড় থেমে যাওয়ায় আমাদের সহিস বেরিয়ে পড়ল তোতনের খোঁজে। আমি সেই প্রবল শীতের বাতাসে বাইরে এসে অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাহাড়ী রাত তখন গভীর হয়েছে বলা যায়। আমরা অস্থির প্রতীক্ষায় রয়েছি জেনে হোটেলের মালিক আমাদের আর কিছু বললেন না। অনেক আগেই হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গিয়েছিল। আমাদের তখন খাবার চিন্তা ছিল না। বাইরের হাওয়া আর চোখের জল নিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। একসময় তোতনকে নিয়ে এল ওরা। তখন আমরা দুর্ভাবনার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলাম। ওকে কি করে যে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভেসেছিলাম তা আর আজ বলতে পারব না। তোতন যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ পরিচিতদের কাছছাড়া হয়ে, ঝড়ের মুখে একটা পাথরের গুহায় কাটিয়ে সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আমরা তাকে নিয়ে ঢুকলাম হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে। সে রাতে প্রবল শীতে একই শয্যার আশ্রয় নিতে হল আমাদের। একটা ভয়ানক বিপদের মুখ থেকে বেঁচে উঠতে পেরে আমরা পরস্পর অনেকখানি নিবিড় হয়ে উঠেছিলাম। সে রাতে কি যে হয়েছিল সে কথা আমার স্মৃতির পাতা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছি। শুধু মনে আছে আমরা সে

রাতে বড় নিকটে এসেছিলাম দুজনের। অনেক ভয় আর উদ্বেগের শেষে কি এক গভীর আনন্দের আবেগে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। সে রাতে আমরা বিসর্জন দিয়েছিলাম আমাদের চিন্তা, আমাদের সাধারণ সংকোচ। আমাদের দেহ মন তখন দাঁড়িয়েছিল একই উত্তাপের মুখোমুখি।

সে রাত অবিস্মরণীয় হলেও আমাকে তা ভুলতে হল।

আমরা ফিরে এলাম শ্রীনগরে। যে মন নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ফিরে এলাম অন্য মন নিয়ে। শান্তনু যেন অফুরন্ত যৌবন আর আনন্দের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল আমার সামনে। মনে হল সে মুছে ফেলতে পেরেছে তার মনের পুঞ্জীভূত দুঃখ।

আমার আর কিছু ভাবনার ছিল না। বোধহয় নতুন করে পুরোনো ভাবনাগুলো আমি আর ফিরে পেতে চাই নি। আমি শান্তনুর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুত হলাম।

পরের দিন কাজে বেরিয়েছিল শান্তনু। আমি জানতাম, সে সেদিন আর ফিরতে দেরি করবে না।

আমি সারা সকাল ওর চলে যাবার পর শিকারার মেয়েদের কাছ থেকে অনেক ফুল কিনলাম। ঘর সাজালাম। মনে মনে হাসলাম। শান্তনু ভাববে না তো, এ আবার নতুন করে ফুলশয্যার আয়োজন। ভাবুক। ওর ভাবনা এখন আমার ভাবনায় এসে মিলেছে।

বিকেলে নিজেই তৈরি করলাম ফুলের গহনা। একে একে ফুলের সাজে সাজালাম নিজেকে। এরপর সুসজ্জিত দেহখানা নিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে বিরাট আয়নার সামনে।

দেখা যাচ্ছিল। আমার সম্পূর্ণ দেহের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিল সেই আয়নায়। এ কি হল আমার! আমি এ কাকে দেখছি আমার সামনে! বিস্ময়ে বিস্ফারিত দুটি বড় বড় চোখ মেলে কে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

বীথি! বীথি!

বীথি কাঁদছে, বীথি হাসছে, বীথি সেজে দাঁড়িয়ে আছে কার প্রতীক্ষায়? শান্তনু আসবে। সব কাজের শেষে সে ফিরে আসবে বীথির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। সে যে মনপ্রাণ দিয়ে তারই প্রতীক্ষা করে চলেছে।

না, না, না, এ হতে পারে না। আমি পাগলের মত ঐ বিরাট আয়নার ওপর কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ছিঁড়ে ফেললাম ফুলের সাজ। বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

মনে মনে বললাম, আমায় ক্ষমা কর বীথি। বড় ছোট হয়ে গিয়েছিলাম তোর কাছে। তোর কামনার, তোর কাতর চোখে পথ চাওয়া সর্বস্বধনকে আমি কেড়ে নেব না। শান্তনু তোর, একান্তই তোর।

এরপর শ্রীনগরে আমি থাকতে পারি নি। চলে এসেছি শান্তনুকে অবাক করে দিয়ে, আর আমার তোতনকে কাঁদিয়ে।

সিঁথি ছেদ ফেলল তার কথায়। শান্তা আর সংহিতা যেন এতক্ষণ অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। কতক্ষণ ওরা নীরবে বসে রইল। তারপর শান্তা একসময় বলল, ক্ষমা করিস ভাই, আমরাও তোর সম্বন্ধে মিথ্যে কত কথাই না ভেবে বসেছিলাম।

রাত কেটে গিয়ে নীলাভ ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ঘণ্টা বাজল। বৈতালিকে যোগ দেবার ঘন্টা। ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। পূজার গান শুরু হয়েছে।

'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু,
তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু,
তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।।'

●

পিপাসার নদী

এখানে গাড়িটা একটু রাখবেন?

নীলাঞ্জন ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করে গাড়িটাকে নিয়ে এসে রাখল রাস্তার ধার ঘেঁষে। দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। রুচিরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তার ওপর। নীলাঞ্জন স্টিয়ারিং থেকে হাত সরিয়ে একটু রিল্যাক্স করে বসল। মাঝে মাঝে সে আড়চোখে তাকাচ্ছিল রুচিরার দিকে। মেয়েটিকে বেশ একটু মুডি বলেই তার মনে হয়েছে।

সামনে পেছনে চৌপারনের গভীর বন। গয়া থেকে বেরিয়েই মেয়েটি বলল, বোধগয়াটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেন?

নীলাঞ্জন কোন কথা বলে নি। বোধগয়ার রাস্তায় যখন গাড়ি এল তখন বাঁ দিকের পথ ধরে সে এগিয়ে গেল।

বুদ্ধমন্দিরের কাছে গাড়ি থামলে মেয়েটি নেমে মন্দিরের দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইল। হঠাৎ এক সময় সলজ্জ হাসিতে মুখখানাকে সুন্দর করে নীলাঞ্জনের কাছে এসে বলল, একটু মন্দিরটা ঘুরে আসব? আপনার খুব দেরি হয়ে যাবে না?

নীলাঞ্জন বলল, আসুন না ঘুরে। আধ ঘন্টার ভেতর এলেই চলবে।

আপনি যাবেন না?

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল নীলাঞ্জন। বলল, চলুন, অনেকবার দেখা।

রুচিরার গলায় বিস্ময়, অনেকবার! ফরেন ট্যুরিস্টরা সাত সাগর পেরিয়ে একটি বার বোধগয়া দেখতে আসে, আর আপনি বারবার দেখেছেন। সত্যি, দারুণ লাকি আপনি।

নীলাঞ্জন রুচিরার পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, এটা কোন লাকের ব্যাপার নয়, নেহাতই ঘটনাচক্রে আসা। গয়াতে থাকার সময় অনেক আত্মীয় বেড়াতে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে আসতে হয়েছে মন্দির দেখাতে।

রুচিরা বলল, জানেন, মামাকে বোধগয়াটা ঘুরিয়ে দেখানোর কথা বলেছিলাম, প্ল্যানও একটা হয়েছিল আমাদের, কিন্তু বাবার ফোন এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।

নীলাঞ্জন কোন কথা বলল না। অনেক ওপরের বস সোমসাহেব। তাঁর মেয়ে রুচিরা এসেছিল গয়ায় মামার কাছে বেড়াতে। মামা গয়াতেই বসবাস করছেন অনেককাল। নামকরা ডাক্তার। হঠাৎ ফোন এসেছে ডি.ভি.সি.-র বড়কর্তা সোমসাহেবের কাছ থেকে, রুচিরাকে পাঠিয়ে দাও তিলাইয়া। ওখানকার অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার নীলাঞ্জন বোস তিলাইয়ার চার্জ নিয়ে আসছে। ওর সঙ্গে ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিও। আমি দু'একদিনের ভেতরেই তিলাইয়া পৌঁছব, সঙ্গে থাকবেন ডি.ভি.সি-র ভি.আই.পি.। রুচিরা যেন ডি.ভি.সি. ফার্মে তার কাকুর কাছে ওঠে।

রুচিরার মামা তাই ডি, ভি, সি অফিস থেকে নীলাঞ্জন বোসকে বের করে ভগ্নীপতির কথামত মেয়েকে পাঠানোর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্ল্যান থাকলেও তাই তিনি রুচিরাকে আর বোধগয়াটা দেখিয়ে আনতে পারেন নি।

ওরা দুজনে শ্যাওলা পড়া ধূসর কয়েকটা স্তূপ দেখতে দেখতে মূল মন্দিরে এসে গেল। কয়েকজন দর্শনার্থী প্রায়ান্ধকার গর্ভগৃহের পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল।

রুচিরা বলল, আপনার আর কষ্ট করে ওপরে উঠে কাজ নেই, আমি ঐ ওদের সঙ্গে মন্দির ঘুরে আসছি।

নীলাঞ্জন মাথা কাত করে একটু হাসল। রুচিরা এগিয়ে গেল সামনের সিঁড়ির দিকে।

মনে মনে কোথাও হারিয়ে যাবার যেমন মানা নেই, তেমনি মানা নেই নিষিদ্ধ কথা ভাববার। নীলাঞ্জন সেই মুহূর্তে ভাবল, রুচিরা সুন্দর, মডার্ন আর স্বভাবটা বেশ মার্জিত। তার চলায় বলায় একটা সংযত ছন্দ আছে। মডার্ন মেয়েদের ভেতর শো-কেসে সাজানো ধরনের যে একটা সদা টিপটপ ভাব থাকে, তা মেয়েটির ভেতর নেই। নীলাঞ্জন এ যুগের ছেলে হলেও ঠিক ও ধরনের আধুনিকতায় আদপেই উদ্দীপ্ত হয় না।

নীলাঞ্জন দেখল, রুচিরার সঙ্গের যাত্রীরা ওপর ঘুরে নেমে এল। আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নীলাঞ্জন। রুচিরার দেখা নেই। ও এবার প্রায় লাফাতে লাফাতেই উঠে এল সিঁড়ি ভেঙে ওপরে। চক্কর দিয়ে ছাদের ও প্রান্তে গিয়ে দেখল, বোধিদ্রুমের দিকে ঠায় চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুচিরা।

নীলাঞ্জন কাছে গেল, রুচিরার মগ্নতাটুকু কিন্তু ভাঙল না।

একসময় কথা বলে উঠল নীলাঞ্জন, এটা কিন্তু আসল বোধিবৃক্ষ নয়।

রুচিরা চমকে নীলাঞ্জনের মুখোমুখি ফিরে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে তখন অনেক দূরের ছবি আঁকা।

নীলাঞ্জন বলল, যে গাছের তলায় বুদ্ধদেব বসে ধ্যান করেছিলেন, সে গাছ আড়াই হাজার বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় বলুন?

নীলাঞ্জন কথা বলা শেষ করে দেখল, রুচিরার চোখ দুটো কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল। সে এতক্ষণ যে গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঐ গাছটির অজস্র শাখাপল্লবের সমারোহের ভেতর দিয়ে দূর অতীতের আলো আঁধারি পথের সন্ধান করে ফিরছিল, তা যেন নীলাঞ্জন হঠাৎ রুদ্ধ করে দিল।

রুচিরার মুখখানার দিকে তাকিয়ে নীলাঞ্জন বুঝতে পারল, যেভাবেই হোক সে রুচিরার মনের একটা কোমল জায়গায় ঘা দিয়েছে।

নীলাঞ্জন তার কথার সূত্র ধরেই বলল, এ গাছ হয়ত সেদিনের নয়, কিন্তু মূল গাছ থেকেই যে জন্মসূত্রে এর যোগ তাতে সন্দেহ নেই।

রুচিরার মুখখানার একপাশে পাতার ঝিলিমিলি দিয়ে আলো এসে পড়েছিল। এখন সারা মুখে তার আলো এসে পড়ল।

রুচিরা বলল, সে-রকম একটা কিছু হলেই হল। আমাদের আজকের সব ভাবনাগুলোই কিন্তু পুরোনো ভাবনার থেকে জন্ম নিয়েছে।

নীলাঞ্জন বলল, আমাদের হাতে কিন্তু সময় বড় একটা নেই। পথে যেতে যেতে এ নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি।

রুচিরা বেশ লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল। সে বলল, এই দেখুন দেখি কি রকম সময় নষ্ট করছি আপনার।

বলতে বলতে সে এগোতে লাগল।

নীলাঞ্জন ভদ্রতা করে বলল, ঠিক আছে, এখুনি তো কোন জরুরী কাজ নেই। পথ যদিও অনেকখানি বাকী, একটু স্পীডে গেলেই চলবে।

এর পর স্পীডেই বেরিয়ে এসে ওরা জি, টি, রোডে পড়েছে। ফল্গু ব্রীজ পেরোবার সময় মেঘের ছায়া ঘনাতে দেখেছে জলে। পথের ধারে নিজের জন্যে একবারটি নেমেছিল নীলাঞ্জন। লাইটারের পাথর কাজ করছিল না, তাই দেশলাই-এর দরকার হয়ে পড়েছিল। ফল্গু পেরিয়ে ছোট্ট একটা গ্রাম। সেখানে নেমে দেশলাই কিনে ফিরে এসেছিল নীলাঞ্জন।

সিগারেট ধরাবার আগে জিজ্ঞেস করেছিল রুচিরাকে, সিগারেটের ধোঁয়াতে আপনার অস্বস্তি আছে কি?

রুচিরা বলেছিল, আমার বাবা চেইন স্মোকার।

একটু হেসে সে চুপ করে গিয়েছিল। আর নীলাঞ্জন সিগারেট টানতে টানতে মেজাজে গাড়ি চালিয়েছিল।

রুচিরা হঠাৎ বলে উঠল, কি নাম ঐ গ্রামটার, আপনি যেখানে দেশলাই কিনেছিলেন?

নীলাঞ্জন একটা বাঁক পেরোতে পেরোতে বলল, নামটা খুব সুন্দর নয়। বরাচাট্টি।

রুচিরা বলল, এদিকে এমনিই সব নাম মনে হয়।

নীলাঞ্জন একটা বিপরীতমুখী ট্রাককে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, মোটেই তা নয়, অন্ততঃ ডজনখানেক ভাল নাম আছে।

কি রকম, কি রকম,—রুচিরা জানতে চাইল।

নীলাঞ্জন বলল, এই যেমন, বাসারিয়া, তিতির, ধুমরাই, তিথি।

ভারী সুন্দর নাম তো!—খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল রুচিরা।

নীলাঞ্জন আবার বলল, আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সে জায়গার নামটাও কিন্তু ফ্যালনা নয়।

রুচিরা বলল, তাই তো, এতক্ষণ তিলাইয়ার কথা একবারও মনে হয় নি।

নীলাঞ্জন বলল, আমরা বলি তিলাইয়া, কিন্তু ওর আসল নাম ঝুমরী তিলাইয়া।

দারুণ সুন্দর নাম। বরাকর নদী যেন ঝুমুর বাজিয়ে চলল তিলাইয়ার ভেতর দিয়ে।

নীলাঞ্জন বলল, আপনি তো শুনেছি তিলাইয়া এই প্রথম যাচ্ছেন, তাহলে জানলেন কি করে তিলাইয়া আর বরাকর নদীর কথা?

রুচিরা হেসে বলল, বাবার ঘরে ম্যাপ দেখে তিলাইয়া মাইথন সব মুখস্থ করে ফেলেছি। লেকের ছবি চোখের ওপর ভাসছে।

নীলাঞ্জন হেসে বলল, দুধের সাধ কিন্তু আপনি ঘোলে মেটাচ্ছেন তাহলে।

কি রকম?—বড় বড় চোখ মেলে তাকাল রুচিরা।

নীলাঞ্জন বলল, তাহলে তো ভূগোলের মাস্টারমশাইরা সবচেয়ে বড় ভ্রাম্যমান।

রুচিরা এ-কথার পিঠে আর কোন কথা বলতে পারল না। হঠাৎ আকাশ জুড়ে এক ঝাঁক পাখি ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল।

দেখুন, দেখুন, কত পাখি উড়ে যাচ্ছে!

নীলাঞ্জন গাড়ি চালাতে চালাতে একবার দেখে নিয়ে বলল, আসতেন চৈত্র শেষে, দেখতেন পাখি কাকে বলে। সবুজ টিয়ার ঝাঁক দেখলে মনে হবে, কেউ যেন আকাশ জুড়ে পাতা বিছিয়ে দিয়েছে।

রুচিরা গলায় বিস্ময়ের ঢেউ তুলে বলল, আপনি দেখেছেন?

নীলাঞ্জন হেসে বলল, আমি কিন্তু ম্যাপ মুখস্থ করে কথা বলি না।

রুচিরা নীলাঞ্জনের হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, আপনি কিন্তু সাংঘাতিক লোক, কোন কথাই সহজে ভোলেন না।

নীলাঞ্জন হাসতে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়াল। বলল, ঐ হল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েসনের বাড়ি। লরি ড্রাইভাররা এখানে গাড়ি রাখে। রাত হলে থাকার আস্তানাও আছে ওদের।

আবার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, এবার আমরা ঘাট সেকশনে ঢুকলাম। এখন পনের-বিশ মাইল জুড়ে চৌপারনের গভীর বন। এখানকার বাসিন্দারা বলে, দলমার জঙ্গল।

ওরা এগোতে লাগল। দুদিকে বনের অসংখ্য গাছগাছালির জটলা। মাঝে কালো ময়ালের মত পথটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। এ জঙ্গলে জনপদবাসীর চিহ্নমাত্র নেই।

কয়েক মাইল আসার পরেই রুচিরা হঠাৎ গাড়িটা থামাতে বলল, আর বাধ্য ছেলের মত নীলাঞ্জন গাড়িতে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

রুচিরা পথের ওপর নেমে হাওয়ায় এলোমেলো চুলগুলো দুটো হাতের পাতায় চেপে গালের ওপর থেকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। আকাশ ঘিরে মেঘ ঘনিয়েছে। শেষ বেলার আলো মেঘের আড়ালে মুছে গেছে অনেক আগে। তাল তাল মেঘের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল রুচিরা।

নীলাঞ্জন মেয়েটির মুডের পরিচয় আগেই পেয়েছিল। বোধগয়ায় বোধিবৃক্ষের দিকে এমনি করে রুচিরা চেয়েছিল। নীলাঞ্জন হাত-পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরাল।

হাওয়া দিচ্ছিল। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল গাড়ির সামনের গ্লাসে।

নীলাঞ্জন বেরিয়ে এসে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। অনেকখানি গুমোটের পর ঠাণ্ডা জোলো হাওয়াটা সত্যি ভাল লাগছিল।

রুচিরা বলল, গাড়ির ভেতর বসে মেঘগুলো ঠিক দেখা যাচ্ছিল না, তাই আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম।

হঠাৎ আকাশের একদিকে চোখ পড়তেই গলার সুর বদলে গেল রুচিরার।

দেখুন, দেখুন, মেঘের কিনারা জুড়ে আলোর কি অপূর্ব পাড়!

সূর্যের শেষ আলোটুকু চলে যাবার আগে তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন এঁকে এঁকে দিয়েছে। নীলাঞ্জনের খুব ভাল লাগল সেই মুহূর্তটি। একটা সাদা শাড়িতে দু'চারটে পিঙ্ক ফুল ছড়ানো, রুচিরার শ্যাম্পু করা অবাধ্য চুলগুলো নিয়ে হাওয়ার খেলা, সুন্দর চোখে মেঘ আর আলোর আলপনার দিকে তাকিয়ে থাকা, এ অন্য জগৎ অন্য স্বাদ। নীলাঞ্জনের ছাব্বিশ বছরের একটানা পড়া আর কাজের ফাঁকে কোথায় যেন যৌবনটা চাপা পড়েছিল। আজ এই নির্জন জঙ্গলে মেঘের আবছায়ায় সে হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করে বসল। তার মনে হল রুচিরার কথা। মেয়েটির চরিত্র একটু অদ্ভুত বই কি। এই মুহূর্তে অজস্র কথা কয়ে চলেছে, একটু পরে বিষয়ান্তরে একেবারে স্থির! যেন সেই মুহূর্তের রুচিরার সঙ্গে আগের রুচিরার কোন মিল নেই।

দুটো ময়ূর বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে একটা গাছের নীচে। আস্তে আস্তে সারা দেহটা কাঁপিয়ে পেখম মেলছে একটা ময়ূর। অন্যটি অবাক্ হয়ে দেখছে।

নীলাঞ্জনের চাপা গলার ডাকে চমকে তাকাল রুচিরা। বড় বড় চোখের তারায় বিস্ময়।

নীলাঞ্জন মুখে আর কোন শব্দ করল না। ইশারায় ছবিটা দেখিয়ে দিল।

রুচিরা যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটার সন্ধান পেয়ে গেছে। সে তাকিয়ে রইল সেদিকে। বিস্ময় আনন্দ তার চোখে-মুখে মাখামাখি হয়ে এক নতুন মুখ গড়ে তুলেছে। নীলাঞ্জন ময়ূর দেখার অভিনয় করছিল, কিন্তু আসলে আড়চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল রুচিরাকে।

কতক্ষণ পরে চড়বড়িয়ে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ওদের ওপর এসে পড়তেই নীলাঞ্জন বলল, আর নয়, গাড়িতে উঠে বসুন।

ওরা গাড়িতে উঠে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই ময়ূরগুলো অচেনা আওয়াজে চমকে গিয়ে বনের ভেতর পিছু হটতে লাগল। গাড়ি ওদের ছেড়ে এগিয়ে গেল। পেছনের কাচে দুটো হাত আর মুখ চেপে রুচিরা তাদের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। সামনের ভিউ-ফাইণ্ডারে রুচিরার পাক খাওয়া দেহ আর একরাশ চুলের ছবি দেখতে দেখতে নীলাঞ্জন কেমন যেন এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল ঐ ময়ূরগুলোর সঙ্গে তার আর রুচিরার কোথায় যেন একটা মিল আছে।

মেঘ আর গভীর বনের যোগসাজসে আঁধার নিবিড় হল চৌপারনে। গাড়ির হেডলাইট জ্বালতে হল পথের নিশানা পেতে। অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে তখন। হাজার বাঘের ডাক বেজে উঠল মেঘে মেঘে।

নীলাঞ্জন বলল, বৃষ্টিটার যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। এমন অঝোরে নেমেছে যেন চোখে-কানে দেখতে পাচ্ছে না।

রুচিরা নিশ্চয় অন্য কিছু ভাবছিল। তার কানে পৌঁছল না নীলাঞ্জনের কথা।

এখন গাড়ির আর বৃষ্টির আওয়াজ মিলে গেছে। গাড়ি চলছিল স্বাভাবিক স্পীডের অনেক নীচে। আলো জ্বেলেও ভেদ করা যাচ্ছিল না বৃষ্টির ঘন ঝালর।

তীব্র একটা বিদ্যুৎ মেঘের বুকখানা ফেঁড়ে দিতেই প্রবল মৃত্যু-চিৎকারে দিগন্ত কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। মনে হল, যেন গাড়ির ওপর বাজটা এসে পড়ল। ব্রেক কষেছে সজোরে নীলাঞ্জন। গাড়ীর আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে সে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল পাশের গাছটা। রুচিরা পেছন থেকে আছড়ে পড়েছে নীলাঞ্জনের ওপর। দারুণ ভয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে তার। নীলাঞ্জন অত্যন্ত শক্ত নার্ভের ছেলে, সে-ও কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। একটা হাত ঘুরিয়ে সে চেপে ধরে রইল রুচিরাকে।

এমনি কতক্ষণ ওরা গাড়ির ভেতর স্তব্ধ হয়ে রইল। জলের ঝাপটায় ধীরে ধীরে নিভে এল গাছটার

আগুন। দু'একবার নিষ্ফল ডাক দিতে দিতে থেমে গেল মেঘের গর্জন। বৃষ্টির ধারা শন্ শন্ হাওয়ায় এলোমেলো ছড়াতে ছড়াতে এক সময় ফুরিয়ে গেল। অবশিষ্ট মেঘ হাওয়ার তাড়ায় উড়ে যেতেই শেষ সন্ধ্যার আলোটুকু ফুটে উঠল চারদিকে।

লজ্জা পেয়ে গেছে ততক্ষণে রুচিরা। নিজের সীটে সে সরে এসে বসেছে।

নীলাঞ্জন একটা অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতির ভেতর কাটাচ্ছিল এতক্ষণ। সে এবার নড়ে-চড়ে বসল। রুচিরার আকুল চুলের ছোঁয়া তখনও তার মুখে-হাতে গলায় লেগে আছে। শ্যাম্পুর কোমল মিষ্টি গন্ধটা লেগে আছে তার নাকে। মাথার ভেতর সেই গন্ধটা রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ একটা অনুভূতির ঢেউ তুলছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে গিয়ে নীলাঞ্জন দেখল স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়ি। এ এক ফ্যাসাদ। সে অনেকবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারই একটু আশ্বাসের আওয়াজ তুলেই গভীর নৈরাশ্যের ভেতর ফেলে দিতে লাগল গাড়িটা।

নীলাঞ্জন নেমে সাধারণ পরীক্ষাগুলো করে নিয়ে বুঝল, গলদ আরও গভীরে। সে একেই গাড়ি বিশারদ নয়, তারপর গাড়িখানা তার নিজেরও নয়। তিলাইয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার ঘোষদার। গয়ায় থাকতে ওটাকে কারখানায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তদ্বির শুরু হয়েছিল নীলাঞ্জনকে তিলাইয়াতে টেনে নেবার। নীলাঞ্জনের বদলির খবর পেয়েই লিখেছিল ঘোষদা, হতভাগা চলে আয় গাড়ি নিয়ে। বউ নিয়ে এলে আরও খুশি হবে তোর বউদি। দুদণ্ড কথা বলে বাঁচবে। আমাদের মত দুটো পাষণ্ডের হাত থেকে ওরা রক্ষে পাবে।

নীলাঞ্জনের এই মুহূর্তে মনে পড়ল ঘোষদার কথাটা। মনে মনে বলল, প্রায় মিলে যাচ্ছিল, কিন্তু একেই বলে পাথর চাপা কপাল।

রুচিরা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। সে এসে দাঁড়িয়েছে নীলাঞ্জনের পাশ ঘেঁষে। কিছু একটা বিপদের গন্ধ সে পেয়েছে, কিন্তু তার গুরুত্ব কতখানি, সঠিক তা বুঝতে পারছে না।

এক সময় নীলাঞ্জন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, নো হোপ। গাড়ি আর এক পাও নড়বে না।

রুচিরা খুব ভয় পেয়ে গেল। কান্নাভেজা গলায় বলল, কি হবে নীলাঞ্জনদা?

নীলাঞ্জন এবার সত্যি সত্যি বিদ্যুতের শক্ খেল। এই বিপদ রুচিরাকে তার অনেক কাছে এনে দিয়েছে। তার মনে হল, ভয় বস্তুটার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, সে জাদুর খেলা দেখিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে দিতে পারে। রুচিরার ভয়ের গলায় ডাকা 'নীলাঞ্জনদা', সন্ধ্যার আবছায়ার আড়াল দিয়ে বনের মাথা ছুঁয়ে অনেক দূরের আকাশে ভেসে গেল। কখন সে ডাক আবার দূরের গন্ধ মেখে ফিরে এল নীলাঞ্জনের কাছে। ছুঁয়ে দিয়ে গেল তার গোপন মনের দরজাটা।

নীলাঞ্জন রুচিরার কথার উত্তরে কোন আশ্বাসের কথা শোনাতে পারল না। শুধু বলল, ভয় পেওনা, দরকার হলে চৌপারনের বনে রাত কাটানোর জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

নীলাঞ্জনের আরও কাছে সরে এল রুচিরা। প্রায় গা ছুঁয়ে দাঁড়াল। ভয়ে তার মুখখানা যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তা না দেখলেও বুঝতে পারল নীলাঞ্জন।

গাড়িতে উঠে বসে দুচার বার ব্যর্থ চেষ্টার পর নেমে এসে বলল, ভোরের জন্যে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। রাতে এ পথে বড় একটা গাড়ি চলাচল করে না। ভোরে লরীওয়ালাদের দেখা পেয়ে গেলে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রুচিরার কাছে এটা নিশ্চয়ই খুব একটা ভরসার ব্যাপার ছিল না। সে চুপচাপ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে ভাবনায় সে তখন আড়ষ্ঠ হয়ে গেছে।

নীলাঞ্জন গাড়িটাকে ঠেলতে লাগল। ঢালু রাস্তায় গড়িয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হল না তার। পথের ধারে একটা গাছের তলায় গাড়িটা রেখে নীলাঞ্জন বলল, এখন আরাম করে গাড়িতে উঠে বসতে পার। ইচ্ছে হলে গ্লাস তুলে লক্ করে দাও ভেতর থেকে।

রুচিরা এগিয়ে এল নীলাঞ্জনের কাছে। বলল, এ বনে কোন জন্তু-জানোয়ার নেই?

নীলাঞ্জন বলল, হাতি, সিংহ, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা নেই, আর সব আছে।

রুচিরা ভয়ে ভয়ে বলল, বাঘ?

নীলাঞ্জন বলল, লক্ করে বসে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। তা ছাড়া মানুষের গায়ের গন্ধ পেলেই বাঘ আসে। কাচ তুলে বসে থাকলে টেরও পাবে না ওরা।

বাঘের না আসার এই সহজ সমাধানে রুচিরা কিন্তু একটুও আশ্বস্ত হতে পারল না।

সে বলল, নীলাঞ্জনদা, আমি যদি সামনের সীটে আপনার পাশে বসি, তাহলে আপনার কি খুব অসুবিধে হবে?

নীলাঞ্জন বুঝল, ভয় পেয়েছে রুচিরা। বলল, তোমার অসুবিধে না হলেই হল। রাত জাগতে হবে তো, তাই অনেক সিগারেট পোড়াতে হবে। তুমি হয়ত অসুবিধেয় পড়বে।

রুচিরা বলল, কিচ্ছু হবে না। আমিও জেগে বসে কাটিয়ে দিতে পারব।

তুমি জাগতে যাবে কেন, আমি তো জেগেই থাকব সারারাত, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পার।

রুচিরা মনে মনে বলল, নিশ্চিন্তে ঘুমানোর পরিবেশ বটে।

মুখে বলল, সে দেখা যাবে এখন।

ওরা দুজনে বাইরে থেকে উঠে এল গাড়ির ভেতর। চারদিক লক্ করে কেবল একটা কাচ একটুখানি নামিয়ে বসে রইল দুজনে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীলাঞ্জন বলল, খরচ করতে হবে বুঝে-সুঝে। মাত্র এক প্যাকেট আর দু'টি অবশিষ্ট।

আপনি অনেক সিগারেট খান।

নীলাঞ্জন বলল, সোমসাহেব নিশ্চয়ই আরও বেশী খান।

দুঃখের ভেতরেও হাসি পেল রুচিরার। বলল, আপনার চেয়ে বাবার বয়েস অনেক অনেক বেশী।

তাহলে তুমি পারমিসান দিচ্ছ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সিগারেট খাওয়ার মাত্রা বাড়াতে পারি?

রুচিরা হেসে ফেলে বলল, আপনি কিন্তু দারুণ লোক। যে কোন কথাকে ঘুরিয়ে নিজের পক্ষে টেনে নিতে পারেন।

নীলাঞ্জন একমুখ ধোঁয়া কাঁচের ফাঁকে বের করে দিতেই রুচিরা বলল, এত কষ্টের আর দরকার নেই আপনি আরাম করে বসে খান।

নীলাঞ্জন বলল, বাঘ তাড়াচ্ছি। কড়া সিগারেটের গন্ধ পেলে ওরা আর ভুল করেও কাছে পিঠে ভিড়বে না। আর তা ছাড়া এ গন্ধ নাকে গেলে মানুষের গন্ধ পাবার সম্ভাবনা কম।

রুচিরা বলল, ভারি কাজের একটা রক্ষাকবচ বের করেছেন যা হোক।

নীলাঞ্জন বাঁ হাতখানা রুচিরার পাশে ঝট্ করে পেতে দিয়ে বলল, দাম দিতে হয়, এমনিতে কবচ মেলে না।

রুচিরা অমনি হাসতে হাসতে নীলাঞ্জনের হাতখানা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, আপনি দারুণ ইন্টারেস্টিং নীলাঞ্জনদা। ভয় ভাবনা সব আপনি ঘুচিয়ে দিতে পারেন।

একটুও সংকোচ না রেখে রুচিরা হাত ধরল দেখে নীলাঞ্জনের বড় ভাল লাগল রুচিরাকে। এই মুহূর্তে তার মনে হল না, একটি যুবকের হাত এই প্রথম ধরল একটি তরুণী, তাও বোধ করি সবচেয়ে নিভৃত একটা জায়গায়, তার চেয়েও কাম্য একটা সময়ে।

কিছু পরেই কিন্তু এ ভাবটা কেটে গেল দুজনের। কোন কথা না বলে নীলাঞ্জন টেনে চলল সিগারেট, আর রুচিরা আস্তে আস্তে নীলাঞ্জনের হাতখানা নামিয়ে রাখল সেইখানে, যেখান থেকে সে একটু আগে অসংকোচে তুলে নিয়েছিল।

একটু দেরিতে হলেও এখন দুজনে বুঝতে পেরেছে, পরস্পরের কাছে এত সহজে তারা সহজ হতে পারে না।

দীর্ঘ সময় কোন কথাই তারা আর বলতে পারল না। মনের গোপন গভীরে হয়ত তারা অন্য এক

অরণ্যের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল তখন। অচেনা লতা পাতা, ফুল, পাখির নিবিড় রহস্যে ভরা গন্ধ তাদেব ক্ষণে ক্ষণে চমকে দিয়ে যাচ্ছিল।

চাঁদ উঠল বনের মাথায়। একটা থমকে থাকা মেঘের খবর পাওয়া গেল চাঁদের আলোয়। চাঁদটা কিন্তু ওর পাশে দিয়েই বেরিয়ে এল, ছোঁয়া লাগল না। রুচিরা বলল, ঐ যে চাঁদ উঠেছে, আমি কিন্তু আপনাকে প্রথম দেখালাম।

নীলাঞ্জন চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বল তো আজ তিথিটা কি?

রুচিরা বিপদে পড়ল। লরেটোতে পড়া মেয়ে, মেলামেশা হাই সোসাইটিতে, ঘরে চাঁদের তিথির গবেষণা বড় একটা হয়ে ওঠে না।

রুচিরা বলল, জানি না।

নীলাঞ্জন বলল, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমরা, তাই আমাদের জানতে হয়।

এমন করে বলছেন কেন? আমি যে জানি না, এটা সত্যি আমার দোষ, এসব নিশ্চয়ই জানা দরকার।

নীলাঞ্জন বলল, কবির ভাষায় বলা যায় ঃ

আজ শুক্লা একাদশী
হের নিদ্রাহারা শশী
স্বপ্ন পারাবারের খেয়া
একলা চালায় বসি।

অবশ্য স্বপ্ন পারাবারের খেয়া চালাচ্ছে কিনা, তা একাদশীর চাঁদ যারা ভালবাসে তারাই জানে।

রুচিরা গুনগুন করে ঐ চারটি পদ গাইল। নীলাঞ্জন বলল, দারুণ গলা তো তোমার!

থামুন, থামুন, আর প্রশংসা করতে হবে না। ভয়ে বিপদে যে মাথাটা এখনও ঠিক আছে, সেটা না আবার প্রশংসায় ঘুরে যায়।

আচ্ছা, প্রশংসা করব না, এবার থেকে নিন্দেই করব।

রুচিরা বলল, খামোকা নিন্দে করবেন কেন, আমি কি নিন্দের কোন কাজ করেছি?

নীলাঞ্জন বলল, একটি পরিচিত মানুষের হয় প্রশংসা, নয় নিন্দে করতে হয়। যেটা খুশি তোমার বেছে নাও।

রুচিরা বলল, কথায় পেরে উঠব না আপনার সঙ্গে। আচ্ছা, এখন বলুন তো দেখি, আজ যে একাদশী, তা এত কাজের ভেতর আপনি মনে রাখলেন কি করে?

নীলাঞ্জন বলল, আমার ঘরে একটি লিভিং পঞ্জিকা আছেন, তাঁর কল্যাণে তিথি নক্ষত্রগুলো আমার নখদর্পণে।

ঠিক বুঝলাম না।

নীলাঞ্জন বলল, আমার ঠাকুমা সেই জীবন্ত পঞ্জিকা। বারব্রত বিধি নিষেধের ব্যারিস্টার।

রুচিরা বলল, এমন করে বলছেন কেন?

নীলাঞ্জন বলল, নিত্য কর্মপদ্ধতির এমন আইনজ্ঞ আমি খুব কম দেখেছি, তাই ওঁকে আমি ওঁর সামনেই মহামান্যা ব্যারিস্টার বলে সম্বোধন করে থাকি।

রুচিরা একটু সংকোচের সঙ্গেই বলল, দু-একটা পারিবারিক প্রশ্ন করব আপনাকে?

অখণ্ড অবসর এখন, যা খুশি জিজ্ঞেস করতে পার।

আপনার সংসারে কে কে আছেন?—রুচিরা বেশ একটু কৌতূহল নিয়েই জানতে চাইল।

নীলাঞ্জন বলল, গয়াতে রয়েছেন আমার বুড়োমা। আমি ঠাকুরমাকে বুড়োমা বলি অনেক ছোটবেলা থেকে। মা মারা যান কবে, একটুও মনে করতে পারি না। সেই থেকে বুড়োমার সোহাগে শাসনে মানুষ। এখন এই বুড়ো বয়েসেও আমি তাঁর নয়নের মণি।

রুচিরা কথার মাঝে বলল, আনলেন না কেন আপনার বুড়োমাকে?

নীলাঞ্জন বলল, আজ যাত্রা নাস্তি বলে নোটিস দিয়েছিলেন, কিন্তু নাস্তিক নাতিটি তা মানতে রাজী হয় নি। তাই বিপরীত ব্যবস্থা হয়েছিল। জনৈক বন্ধু গৃহে আগের দিন থেকে আশ্রয় নিয়ে যাত্রাদোষ

খণ্ডন করতে হয়েছিল। এ অবস্থায় বুড়োমাকে আনা অসম্ভব ব্যাপার নয় কি? আর তা ছাড়া গয়ার বাসাটা এখনও রয়েছে আমারই অধিকারে।

রুচিরা বলল, দেখলেন তো, এ যুগের ছেলে বলে সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে এলেন, এখন কি রকম ফলটা ভোগ করছেন!

নীলাঞ্জন সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, এমনি যাত্রা নাস্তির অভাবনীয় দিনগুলো যদি আসে, তাহলে সে আর কোন শুভদিনে কোথাও যাত্রা করবে না।

একটু থেমে রুচিরা আবার বলল, আর একটা কথা জানতে চাইছি, আপনার বাবা ভাইবোন এঁরা সব কোথায়?

নীলাঞ্জন বলল, মায়ের একটি মাত্র সন্তান আমি। মা মারা যাবার পর বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন। তিনি কলকাতায় এ, জি, বেঙ্গলে কাজ করেন। আমার সৎমা প্রথম থেকেই কেন জানি না আমাকে সুনজরে দেখতে পারেন নি, তাই বুড়োমাকে নিয়েই আমাকে ছেলেবেলা থেকে আলাদা জায়গায় থাকতে হয়েছিল। সেই থেকে কালে ভদ্রে এক আধখানা চিঠির দেয়া-নেয়া ছাড়া বাবার সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ নেই।

রুচিরা বলল, যাদের মা নেই তাদের সত্যি বড় কষ্ট। আমি তো ভাবতেও পারি না যে, কোন দিন আমার মা থাকবে না।

নীলাঞ্জনের গলা গম্ভীর হল, জান রুচিরা, মায়ের একটি মাত্র বাঁধানো ফটো ছিল আমাদের ঘরে। ছোটবেলা বুড়োমার কথায় রোজ ছবিটিকে প্রণাম করতাম। একদিন দেখি, ছবি নেই। বুড়োমা খবর পেয়ে কিছুক্ষণ হৈ-চৈ করলেন। তারপর সব চুপচাপ। পরে আমার সৎবোনের মুখ থেকে বুড়োমা জেনেছিলেন, নতুন মা ছবিখানাকে ভেঙে বাইরে ফেলে দিয়েছেন।

রুচিরার মুখে দুঃখের একটা আওয়াজ বেজে উঠল।

নীলাঞ্জন বলল, জানো রুচিরা, তখন বুঝি নি, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের কথা। ছবির স্মৃতিও আমার কাছে অস্পষ্ট। এখন যদি মায়ের ছবিটা কাছে থাকত তাহলে মা কেমন দেখতে ছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম। রুচিরা হঠাৎ বলে উঠল , মা নিশ্চয়ই আপনার মত দেখতে ছিলেন!

নীলাঞ্জনের গলায় বিস্ময়, তুমি কি করে জানলে?

রুচিরা বলল, আমার কেমন যেন মনে হল, তাই বললাম।

অনেকে সে-কথা বলেন। আমার বুড়োমার মুখে তো রোজ উঠতে বসতে শুনতে পাই।

রুচিরা বলল, আপনার মা দেখতে কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন।

নীলাঞ্জন অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই তো শুনেছি।

রুচিরা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, চাঁদের আলোয় নীলাঞ্জনকে মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যমূর্তি ডেভিডের মত মনে হচ্ছে।

আর কোন কথা ওদের ভেতর হল না। নীলাঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। হয়ত সে তখন তার হারানো মায়ের কথা ভাবছিল।

রুচিরা শুনতে পেল, সারা চৌপারন বন জুড়ে কোটি কোটি কীটপতঙ্গ অতি করুণ সুরে ঐকতান সেধে চলেছে।

কতক্ষণ এমনি গান শুনল সে। তারপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখল টুকরো টুকরো মেঘ চাঁদের পাশ দিয়ে, কখনো বা চাঁদ ঢেকে ভেসে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, তাদের গাড়িখানা কখন নৌকো হয়ে গেছে, আর সেই নৌকোয় করে তারা ভেসে চলেছে দিক দিশাহীন মহাশূন্যে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল রুচিরা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, রাত কত সে জানে না। হঠাৎ কিসের ছোঁয়ায় চমকে জেগে উঠল। নীলাঞ্জন তার ঘুম ভাঙিয়েছে। রুচিরা দেখল, নীলাঞ্জন মুখে হাত রেখে তাকে কথা বলতে বারণ করছে। এবার নীলাঞ্জন রুচিরার দিকে ডালপালা পাতাপত্তর ছড়িয়ে যে বিরাট গাছটা দাঁড়িয়েছিল সেদিকে ইঙ্গিত করল।

রুচিরা ভয় ভয় চোখে একটুখানি তাকিয়ে দেখল, কি যেন দাঁড়িয়ে আছে। সে অমনি দারুণ ভয় পেয়ে নীলাঞ্জনের কাছে ঘেঁষে এল। বাঁ হাতে চেপে ধরল নীলাঞ্জনের একখানা হাত।

নীলাঞ্জন আবার ইঙ্গিত করতে ভয়ে ভয়ে পাশ ফিরে তাকাল রুচিরা। দেখতে দেখতে গাছটার দিকে ঘুরে বসল। গাছের তলায় তিনটি হরিণ। শিশু হরিণটি মা-হরিণের কোল ঘেঁষে শুয়ে আছে। পুরুষ হরিণটি ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বনের দিকে। চাঁদের আলো গড়িয়ে পিছলে যাচ্ছে তার চকচকে লোমে ভরা শরীরটার ওপর দিয়ে।

রুচিরা দেখতে দেখতে ফিরে তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। নীলাঞ্জনও দেখছিল সেই ছবি।

রুচিরা যেন তার অবাক আনন্দ কোন রকমেই চেপে রাখতে পারছিল না। সে নীলাঞ্জনের কানের ওপর তার দুটো হাতের পাতা গোল করে চেপে ফিসফিসিয়ে বলল, দারুণ, দারুণ ছবি নীলাঞ্জনদা। উৎসাহে আনন্দে সে যেন ফোটান দুধের মত ফেনিয়ে উঠছিল।

কতক্ষণ তারা নিবিড় আনন্দে সে ছবি দেখল। দুজন যে তারা দুজনকে ছুঁয়ে আছে একান্ত সান্নিধ্যে, সে-কথা একেবারেই তাদের মনে এল না।

হঠাৎ বনে হাহাকার করে ডেকে উঠল কটা শেয়াল। চমকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শিশু আর মা-হরিণ। চোখের পলকে তিনটে হরিণ লাফাতে লাফাতে পথ পেরিয়ে অদৃস্য হয়ে গেল উলটো দিকের বনে।

শেয়ালের ডাক থেমে গেছে, হরিণ তিনটে চলে যাবার পর বনে আর কোন আলোড়ন নেই। চারদিকে স্তব্ধতা। হঠাৎ দূরে যেন কিসের একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। বড় চাপা সে আওয়াজ, কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল সে গর্জন। কখনো স্পষ্ট, কখনো বা অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। চাঁদের চেহারা আমাজা পেতলের থালার মত হয়ে আসছিল। বনের অন্ধকার বাড়তে শুরু করেছিল শেষ রাতের দিকে।

নীলাঞ্জনকে ধরে বসেছিল রুচিরা। রহস্যময় চৌপারন বনে ঐ দূরাগত শব্দটা যত এগিয়ে আসছিল, একটা অজানিত আশঙ্কায় দমটা বুকের ভেতর তত জমে যাচ্ছিল রুচিরার।

কান পেতেছিল নীলাঞ্জনও। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে রুচিরাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল সে।

ততক্ষণে শব্দের বস্তুটি কাছে এসে গেছে। বনের বাঁক ঘুরতেই উজ্জ্বল হেড লাইটের আলোটা যেন হোসপাইপের মত সব কিছুকে স্নান করিয়ে দিল। একটা লরী বিপুল স্পীড নিয়ে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেল। নীলাঞ্জনের হাত নাড়া কিংবা চিৎকারকে আমলই দিল না।

পেছনে গভীর অন্ধকার রেখে গাড়িটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আর একখানা গাড়ির আলো বনের একদিকে এসে পড়ল। চোখের ওপর গাড়িটা এসে পড়তেই বোঝা গেল, এটা একটা জীপ।

নীলাঞ্জন হাত নাড়তেই জীপটা হঠাৎ ব্রেক কষল একটু দূরে গিয়ে। তারপর কি ভেবে দারুণ গর্জন তুলে লরিটা যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে ছুটে চলে গেল।

দুদুটো চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে নীলাঞ্জন গাড়ির পাশে এসে বলল, আরও বেশ কিছু সময় ভোগান্তি আছে বলে মনে হচ্ছে।

রুচিরা বলল, কি হল বলুন তো, গাড়ি দুটোর একটাও দাঁড়াল না!

নীলাঞ্জন বলল, আমিও তো তাই ভাবছি। অন্ততঃ দ্বিতীয় গাড়িটা যে আমার অস্তিত্ব জানতে পেরেছে, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

কি আর করা যায়। নিরাশ নীলাঞ্জন আবার উঠে এল গাড়ির ভেতর। একেবারে ম্লান হয়ে গেছে তখন চাঁদের আলো।

রুচিরা এবার নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সে একেবারে ধার ঘেঁষে সরে বসে নীলাঞ্জনকে একটু ছড়িয়ে বসার জায়গা করে দিয়েছে।

নীলাঞ্জন আবার সিগারেট ধরাল। দুচারটে টান দিয়ে বলল, মনে হয় তোমার অনেকটা ভয় কেটে গেছে, এখন পিছনের সীটে দিব্যি আরাম করে শুতে পার।

রুচিরা বলল, আপনার অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়ই। সেই একভাবে বসে আছেন। আপনি এখানে একটু ছড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলে আমি পিছনের সীটে গিয়ে বসতে পারি।

নীলাঞ্জন বলল, আমার অসুবিধের কোন কথাই ওঠে না। টপ বসের মেয়েকে কোথায় আরামে গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে পৌঁছে দেব ডেস্টিনেশানে তা নয় বনবাসে এনে ফেললাম।

রুচিরা হেসে বলল, জীবনে দারুণ এক অভিজ্ঞতা। কলেজের বন্ধুদের কাছে এই থ্রিলিং এ্যাডভেঞ্চারের গল্প করতে হবে।

একটু থেমে কি ভেবে বলল, আচ্ছা নীলাঞ্জনদা, রামায়ণের সীতা খুব লাকি ছিল তাই না?

এই প্রথম একজনের মুখে শুনলাম সীতা ভাগ্যবতী। কথাটা কিন্তু একেবারে অরিজিনাল।

রুচিরা বলল, কেন নয় বলুন। বিয়ে করেই বরের সঙ্গে এ বনে ও বনে ঘোরা, সে কি কম কথা। অযোধ্যায় রোজ সেই একই দাসদাসীর মুখ দেখতে দেখতে, আর চারপাশের বদ্ধ দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠত না।

নীলাঞ্জন বলল, রামায়ণের চরিত্রের নতুন ইন্টারপ্রিটেশন শুনছি কিন্তু।

রুচিরা অভিমানের সুর গলায় ঢেলে বলল, যাঃ, কোনদিন আর সীতা, বন, এসব নিয়ে কথা তুলব না। আপনি মনে মনে হাসছেন আমার কথা শুনে।

নীলাঞ্জন রুচিরার গায়ে হাত ঠেকিয়ে বলল, বিশ্বাস কর, তোমার আইডিয়াগুলোকে আমি একটুও লঘু করে দেখছি না।

রুচিরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেছন থেকে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে চুপ করে গেল।

ওরা এখন গাড়ির বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা গেল ঐ আগের দুটো গাড়িই ফিরে এল। জীপটা আগে আগে, তার পেছনে কাঠবোঝাই একটা লরি।

এখন নীলাঞ্জনদের দেখতে পেয়েছে ওরা। জীপটা এগিয়ে এল ওদের গাড়ির কাছে। নীলাঞ্জন দেখল জীপের ড্রাইভার ছাড়া আরও দুজন আরোহী। একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজন অফিসার। লরিটা আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার ওপর।

অফিসারটি গাড়ি থেকে নেমে বলল, হোয়াটস দ্য ট্রাবল?

নীলাঞ্জন গাড়ির বিগড়ে যাবার খবরটা সবিস্তারে বলল।

অফিসার ভদ্রলোক জীপ থেকে টর্চ একটা আনলেন। গাড়িটা পরীক্ষা করে দেখলেন। পেট্রোল ঠিক মত আসছে কিনা পাইপ খুলে পরিয়ে স্টার্ট দিয়ে দেখে নিলেন। নাঃ গোলমালের উৎস এখানে নয়। ড্রাইভারকে ডাকলেন। সে এসে আরও কিছু নাড়াচাড়া ধাক্কাধাক্কি করল, কিন্তু গাড়ি যেমন ছিল তেমনি রইল। কিছুদূর সবাই মিলে ঠেলে দৌড় করান হল। সামান্য আশ্বাসের আওয়াজ বের করেই থেমে গেল গাড়িটা।

হঠাৎ একটা লোক পাশে এসে দাঁড়াল। সে কাঠ বোঝাই লরির ড্রাইভার। সে একবার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে চায়, অবশ্য হজৌর যদি অনুগ্রহ করে আদেশ দেন।

অফিসার ভদ্রলোক তার হাতে টর্চটা দিয়ে দিলেন। সে লরি থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে এল। নীলাঞ্জনকে স্টার্ট দিতে বলে ওপরটা খুলে একবার দেখে নিল। তারপর টর্চটা নিয়ে একেবারে সিঁধিয়ে গেল নীচে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। নীলাঞ্জন স্টার্ট নিয়ে দেখল, গাড়ি রাতের বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল।

নীলাঞ্জন বক্‌শিস দিতে চাইল লরী ড্রাইভারকে, সে সেলাম করে পিছিয়ে গেল।

মুহূর্তে এক কাণ্ড করে বসল ড্রাইভারটি। সে দুটো পা জড়িয়ে ধরল অফিসার সাহেবের। কিছুতেই ছাড়বে না। তার গুস্তাকি মাফি করে দিতে হবে।

বন্দুকধারী লোকটা ওকে টেনে তুলে অফিসারের ইঙ্গিতে আড়ালে নিয়ে গেল। কথাবার্তা লেনদেন চুকলে কাঠের বোঝাই সমেত লরিটা ঘুরে চলে গেল।

অফিসারটিকে নীলাঞ্জন আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতেই ভদ্রলোক বললেন, নো, নো, অত সহজে

ছেড়ে দেওয়া যাবে না আপনাদের। আপনারা যখন আমাদের এলাকায় এসে এত কষ্ট পেয়েছেন তখন কিছু না হোক অন্ততঃ এক কাপ করে গরম কফি দিয়ে অতিথি সৎকার করতে দিন। বিশেষ করে মিসেস যখন রয়েছেন। উনি পরে হয়ত ভাববেন, দলমা জঙ্গলটা একেবারে যাচ্ছেতাই।

নীলাঞ্জনের দুটো কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। পাগল লোকটা তাদের ঠাউরেছে কি! নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী ভেবে বসে আছে। রুচিরাই বা ভাবছে কি!

রুচিরা হঠাৎ কথা বলে উঠল, না, না তা ভাবতে যাব কেন। গাড়ি খারাপ হল বলেই তো সারা রাত আমরা বনটাকে ভাল করে দেখলাম।

নীলাঞ্জনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তাহলে রুচিরা কিছু একটা মনে করে বসেনি।

এখন ঐ পলাতক লরির পরিবর্তে নীলাঞ্জনের গাড়ি অনুসরণ করে চলল জীপখানাকে। কিছু পথ এসেই বাঁ দিকে বনের ভেতর বেঁকে গেল জীপটা। নীলাঞ্জনও সেই পথ ধরল।

সামান্য পথ এসেই জীপ দাঁড়াল ফরেস্ট বাংলোর সামনে। গাড়ি থেকে রেঞ্জার সাহেব নামলেন। নীলাঞ্জন আর রুচিরাও নেমে দাঁড়াল।

গাড়ির আওয়াজে ফরেস্ট গার্ড এসে সাহেবকে সেলাম জানিয়ে গিয়েছিল। এখন রেঞ্জার সাহেব ওদের সামনে এগিয়ে এসে বললেন, আসুন গরীবখানায়। বনবাসে একা একা থাকি। অনেকদূরে শহরে ফ্যামিলির আর সব মেম্বাররা থাকে। এই নির্জন জগতে আমার সঙ্গে কে থাকবে বলুন। নিঃসঙ্গ পড়ে আছি। ভাগ্যে আজ আপনাদের দেখা পেয়ে গেলাম।

লোকটিকে বেশ ভাল লাগল নীলাঞ্জনের। টর্চের আলো দেখিয়ে ভদ্রলোক ওদের একটা বাগান পার করে এনে তুললেন বাংলোর দাওয়ায়।

একটি আদিবাসী মেয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। রেঞ্জার তার পাশ কাটিয়ে নীলাঞ্জনদের ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, কফি বানাও, আউর অমলেট ভি বানাও।

মেয়েটি চলে গেল ; সবাই মিলে ওরা বসার ঘরে গিয়ে বসল।

নানা রকম ক্যাকটাস আর লতাপাতায় সাজান ঘর। একটা দর্শনীয় অ্যাকোয়ারিয়াম ঘরের দীর্ঘ দেওয়াল জুড়ে রয়েছে। অনেক রকম রঙীন মাছ নুড়িপাথর আর সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে!

রেঞ্জার বললেন, রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন আপনারা, বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে কফি খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিন। আমি ততক্ষণে অভদ্র পোশাকটা বদলে আসি। রেঞ্জার ঘরের সঙ্গে লাগাও বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

রুচিরা হাত-মুখ ধুতে চলে গেলে নীলাঞ্জন দেখলে, সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে আদিবাসী মেয়েদের বিচিত্র ভাব ও ভঙ্গীর ছবি টাঙানো। নীলাঞ্জন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পাহাড়ী নদী যেমন কালো পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফেনার ফুল ছড়িয়ে হেসে ওঠে, ঠিক তেমনি কালো কালো নিটোল স্বাস্থ্যের মেয়েগুলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসি ছড়াচ্ছে। প্রায় সব ক'টি ছবিই রঙীন। নীলাঞ্জন ছবির থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। যে মেয়েটিকে একটু আগে কফি বানাবার আদেশ দিলেন ফরেস্ট অফিসার, সে মেয়েটির অনেক ক'টি ছবিই নানা অ্যাঙ্গেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বড় এক্সপ্রেসিভ মুখ মেয়েটির।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন রেঞ্জার, ওসব পাগলামি মশায়, স্রেফ পাগলামি। কাঁহাতক সারাক্ষণ বন নিয়ে বসে থাকি বলুন তো। তাই বুনোদের নিয়ে মাঝে মাঝে জলসা বসাই আর কি। বাবা ছিলেন কনজারভেটর আর আমার দৌড় রেঞ্জার তক। বাবার খেয়াল ছিল ছবি তোলার, আমি পেয়েছি পিতৃদত্ত ক্যামেরাখানাই শুধু, প্রতিভা এক ফোঁটাও পাই নি।

নীলাঞ্জন বলল, দারুণ সব ছবি তুলেছেন আপনি। যে কোন ফটোগ্রাফারের ঈর্ষা কুড়োবেন।

বিনয়ের হাসি হেসে বললেন রেঞ্জার, মিসেস আসুন, বাবার তোলা কয়েকটি ছবি দেখাব।

বলতে বলতেই ঘরে এসে ঢুকল রুচিরা। নীলাঞ্জনকে ইঙ্গিত করল চোখে মুখে জল দিয়ে আসতে।

নীলাঞ্জন উঠে যেতেই রেঞ্জার বললেন, আপনাদের এখানে ডেকে এনে কষ্টে ফেললাম কিন্তু।

রুচিরা হেসে বলল, পড়েছিলাম পথের ধারে, নিয়ে এলেন বন-ভবনে, সুতরাং সুখের জগৎ থেকে কষ্টে যে এসে পড়লাম তাতে আর সন্দেহ কি।

রেঞ্জার বললেন, হোক অল্প সময়ের জন্যে, আপনাদের পেয়ে কিন্তু আমার খুব আনন্দ হয়েছে।

রুচিরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, ভারি সুন্দর পরিবেশটি আপনার।

রেঞ্জার বললেন, দু'চার দিনের বেশী জনমনুষ্যহীন বন আপনাদের ভাল লাগবে না। প্রথম প্রথম আমি এই নির্জন জায়গায় কাজ করতে এসে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু অবাক্ কাণ্ড জানেন, এখন ধীরে ধীরে বনের প্রেমে পড়ে প্রায় পাগল হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে পাটনা যাই বৌ ছেলেমেয়েকে দেখতে, কিন্তু দু'চার দিন থাকলেই মন বলে, পালাই পালাই। জানেন, একটুও ভাল লাগে না শহর বাজারের হৈ-হট্টগোলের ভেতর কাটাতে।

রুচিরা ভদ্রলোকের কথা নিবিষ্ট হয়ে শুনছিল।

হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, থাক্ নিজের কথা, আপনাদের খবরই নেওয়া হল না এতক্ষণ। মিস্টারের নামটা?

রুচিরা বলল, নীলাঞ্জন বোস।

রেঞ্জার বললেন, বাপের বাড়ি কোথায় আপনার?

বাবা থাকেন কলকাতায়।

রেঞ্জার জানতে চাইলেন, কোথাও প্লেজার ট্রিপে যাচ্ছিলেন বুঝি? মিঃ বোস তিলাইয়ায় বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

রেঞ্জার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ভারি চমৎকার জায়গা, আপনার কিন্তু খুব ভাল লাগবে।

রুচিরা মিষ্টি করে হাসল। তারপর হঠাৎ কি ভেবে বলল, বাবা তিলাইয়া এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

রেঞ্জার হেসে বললেন, নতুন নতুন বেশ কিছুদিন এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে হবে। এই দেখুন না, বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছি, আপনারই বয়েসী হবে, এই আসছে, এই যাচ্ছে।

রুচিরা দেখল, ভদ্রলোকের ধারণা তাদের সম্বন্ধে অনেকদূর এগিয়েছে। এখন ভুল ভাঙাতে যাওয়াই মুশকিল।

সে কথার মোড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমি যদি আপনার মেয়ের বয়েসী, তাহলে আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

হিতে বিপরীত হল। রেঞ্জার অমনি বলে উঠলেন, তাহলে আমার জামাইকেও 'তুমি' বলেই ডাকা যাবে, কি বল?

এখন আর লরেটোর বিদ্যে যথেষ্ট বলে মনে হল না রুচিরার। সে শুধু ভাবতে লাগল, নীলাঞ্জনদা ফিরে এলে এই ভদ্রলোক না একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন।

নীলাঞ্জন ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক বললেন, এসো এসো। তুমি বলার পারমিসানটা আদায় করে নিয়েছি।

নীলাঞ্জন ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে এক রকম করে বলল, আপনি বয়সে বড়, হাজার বার 'তুমি' বলার অধিকার আছে।

রেঞ্জার সাহেব সোচ্ছ্বাসে কিছু বলতে গিয়েই থেমে গেলেন। কফি আর খাবার ট্রে হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আদিবাসী মেয়েটি।

নাও, নাও, বনে যা পাওয়া যায় তাই একটু চেখে দেখ। রেঞ্জার ট্রে থেকে প্লেট তুলে ওদের হাতে দিতে যেতেই রুচিরা উঠে দাঁড়িয়ে ট্রে-টা হাতে ধরে নিয়ে বলল, আপনি বসুন তো, আমাকে এটুকু কাজ করতে দিন।

রেঞ্জার আর নীলাঞ্জন হাসতে লাগল। রুচিরা কফি আর খাবার তুলে দিল ওদের হাতে।

কফির চাপে চুমুক দিতে দিতে ওরা এলোমেলো অনেক আলোচনাই চালাল। রুচিরা আর নীলাঞ্জন খুব সাবধানেই কথা বলছিল। পাছে তাদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথার মোড় ঘুরে যায়, তাই দেশের নানা ধরনের সমস্যা নিয়েই আলোচনা চালাচ্ছিল নীলাঞ্জন।

হঠাৎ নীলাঞ্জন বলল, আপনার বাবার তোলা ছবি দেখাবেন বলেছিলেন না?

রেঞ্জার ছবিগুলো আনতে ভেতরে চলে গেলেন।

নীলাঞ্জন গলা নামিয়ে বলল, অনেক অভিজ্ঞতা হল, এখন এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচি।

রুচিরা নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগল। একগাদা ছবি নিয়ে হাজির হলেন রেঞ্জার সাহেব।

ওরা দু'জনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবিগুলো। ওদের মনে হল, আশ্চর্য এক শিল্পী বাস করছেন এই ছবিগুলোর ভেতর।

ছবির বিষয়বস্তু কিন্তু খুবই তুচ্ছ। সেই তুচ্ছ বিষয়গুলো শিল্পীর হাতে পড়ে কি অসামান্য হয়ে উঠেছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

একটা ছবি, ছোট ছোট একগুচ্ছ সাদা ফুলের। মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে উঠেছে কাণ্ডটি। তার থেকে প্রথমে বেরিয়েছে দু'টি বড় বড় সবুজ পাতা। তার একটু ওপরে হালকা সবুজ দুটি পাতা। তাদের ঠিক ওপরে জেগে আছে ঐ গুচ্ছ ফুলটি। সাদা ফুলের কোন কোনটির ভেতর হলুদ পরাগ দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য, কোথা থেকে একটা উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ঐ পাতা আর ফুলের একদিকে। আলোতে রামধনুর রঙ।

নীলাঞ্জন আর রুচিরা মগ্ন হয়ে ছবি দেখছিল। রেঞ্জার বললেন, বাবা যখন ঐ ছবি তুলছিলেন, আমি তখন তাঁর নির্দেশে দূর থেকে আয়নায় সূর্যের আলো ধরে ছায়ায় ঢাকা ফুলের ওপর ফেলছিলাম। আয়নার ধারের কাচটা প্রিজিমের কাজ করছিল, তাই রামধনুর রঙ এসে গেছে।

অন্য ছবিখানাও ফুলের। গোলাপী আভার কাঞ্চন ফুল ফুটে আছে। ঐ ফুলের ওপর উড়ছে ক'টা দুর্লভ গোলাপী আভার প্রজাপতি। একেবারে ফুলের রঙ, ফুলের আকার।

অন্য একখানা ছবিতে সরু কালো ক'টি ডাল নাচের ভঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি ডালের মাথায় একটি করে লাল ফুল ফুটে আছে।

এমনি ফুলের ছবি অজস্র। পশুপাখি গাছপালা তাদের শিল্পরূপগুলো যেন জমা রেখে গেছে দক্ষ এক ফটোগ্রাফারের কাছে।

ছবি দেখা শেষ হলে রুচিরা বলল, আমার এত ভাল লেগেছে যে কি বলব। আপনার এখানে না এলে অনেক কিছুই মিস করতাম।

নীলাঞ্জন রুচিরাকে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলল, উপযুক্ত শিল্পীর উপযুক্ত উত্তরপুরুষের তোলা ছবিগুলো দেখে নাও।

রেঞ্জার হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, কার সঙ্গে কার তুলনা।

রুচিরা ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখতে লাগল আর প্রশংসাসূচক নানা রকম ধ্বনি দিয়ে চলল।

রেঞ্জার তারি ফাঁকে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েকে কিন্তু আজ কোন রকমেই ছেড়ে দিতে পারব না।

নীলাঞ্জন প্রমাদ গুনল। ভদ্রলোক যে রকম উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন, তাতে কোথাকার জল কোথায় কতদূর গড়ায় বলা মুশকিল। ইতিমধ্যে সে যখন বাথরুমে গিয়েছিল, তখন রেঞ্জার সাহেব নিশ্চয় রুচিরাকে মেয়ের আসনে বসিয়ে থাকবেন।

নীলাঞ্জন বলল, গত সন্ধ্যায় যেখানে পৌঁছানর কথা, সেখানে সারা রাত কেটে গেল। গয়ার আত্মীয়েরা ফোনে পৌঁছানর খবর নিতে গিয়ে যখন জানবেন আমরা সারারাত অনুপস্থিত, তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখুন।

রেঞ্জার হেসে বললেন, যদি গাড়ির কোন মেজর ডিফেক্ট ধরা পড়ত, তখন তো আটকে থাকতে হত।

নীলাঞ্জন সে কথার কোন জবাব দিতে পারল না, শুধু হাসতে লাগল।

উৎসাহ পেয়ে গেলেন রেঞ্জার। বললেন, আত্মীয়েরা ভাববেন, আবার তোমরা হানিমুনে গেছ।

একটু থেমে রসিকতা করে বললেন, মেয়ে, আমাদের কথায় কান দিও না যেন।

কথাগুলো নিশ্চয়ই রুচিরার কানে যাচ্ছিল, তবু সে না শোনার ভান করে মগ্ন হয়ে একখানা ছবি দেখতে লাগল।

নীলাঞ্জন সত্যিকারের বিব্রত হয়ে বলল, আমি ঠিক আমাদের অসুবিধের কথাটা আপনাকে বোধহয় বোঝাতে পারছি না। এখুনি চলে যাওয়াটা আমাদের খুবই দরকার।

রেঞ্জার সাহেব রুচিরাকে কাছে ডেকে বসালেন। নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর যদি দিতে পার, তাহলে অনিচ্ছায় হলেও তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।

নীলাঞ্জন মনে মনে প্রমাদ গুনল, সেরেছে, কি না জানি প্রশ্ন আবার করে বসে রুচিরার সামনে।

রুচিরা কিন্তু থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে উৎসুক শ্রোতার মত বসে রইল। ভাবখানা এই, নীলাঞ্জনদা, এখন কেমন জব্দ। দিন উত্তর।

নীলাঞ্জনের রাগ হচ্ছিল রুচিরার ওপর, ওর এ ধরনের নিশ্চিন্তে বসার ভঙ্গীটা দেখে।

রেঞ্জার বললেন, মনে কর, তোমার গাড়িখানা এমন এক জায়গায় খারাপ হয়ে গেল যেখানে সারানোর কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না। পথ দিয়ে যে দু'একখানা গাড়ি যায় তাদেরও সাধ্যের বাইরে। আর সারাই-এর কারখানা প্রায় এক বেলার পথের দূরত্বে।

এখন তুমি নির্জন জায়গায় গাড়ি ফেলে রেখে পথের কোন গাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে মেকানিক আনতে যাবে, না গাড়ির পাহারায় স্ত্রীকে বসিয়ে রেখে নিজে যাবে, অথবা নিজে গাড়িতে বসে থেকে স্ত্রীকে পাঠাবে ঐসব লরীওয়ালার সঙ্গে মেকানিক আনতে?

নীলাঞ্জন সমস্যায় পড়ল। রুচিরাও যে ভাবতে শুরু করেছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার চোখমুখের ভাব দেখে।

নীলাঞ্জন বলল, এক কথায় এর জবাব দেওয়া মুশকিল। যদি মানুষটি আদর্শ স্বামী হয় তাহলে গাড়ির মায়া ছেড়ে বউকে সঙ্গে নিয়েই যাবে, আর যদি পাকা ব্যবসাদার হয় তাহলে বউকে একা ছেড়ে দেবে, কিন্তু গাড়ি ছাড়বে না। সে জানে, বউ গেলে বউ আবার আসবে। চাই কি টাকাপয়সা নিয়েও আসবে। কিন্তু গাড়ি গেলে গাড়ি আসবে না। ঘর থেকে টাকা বের করে তবে গাড়ি পেতে হবে।

রুচিরা খিল খিল করে হেসে উঠল দেখে রেঞ্জার বললেন, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। এখন যাওয়া না যাওয়া তোমার হাতে।

নীলাঞ্জন বলল, কোনদিন এ পথ দিয়ে যদি যাই তাহলে আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাব না। শুধু আজকের মত খুশি মনে যাবার অনুমতিটুকু দিন।

রেঞ্জার বললেন, খুশি হয়ে যাবার কথা বলতে না পারলেও তোমাদের কাজের গুরুত্ব বুঝে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তবে কথা যখন দিয়েছ আসবে, তখন মনে মনে আশা করে থাকব আবার কোন দিন তোমাদের দু'জনকে কাছে পাব।

নীলাঞ্জন আর রুচিরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই রেঞ্জার বললেন, তোমাদের ছোট্ট একটু স্মৃতিচিহ্ন দিতে চাই।

এই বলে তাঁর বাবার তোলা ফটোগ্রাফ থেকে একটি ছবি বেছে নিয়ে রুচিরার হাতে তুলে দিলেন।

বললেন, এ ছবিটা আমার বড় প্রিয়। আমার মেয়ে জামাইকে উপহার দেব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু ওরা ঠিক ছবির সমঝদার নয়, তাই দিই নি। তোমরা ছবির মর্যদা বোঝ, তাই তোমাদের হাতে দিয়ে তৃপ্তি পেলাম। এটি তোমাকেই যত্ন করে রাখতে হবে।

রুচিরা অত্যন্ত যত্নে ছবিখানা হাতে ধরে দেখতে লাগল। নীলাঞ্জনও তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল রেঞ্জার সাহেবের দেওয়া উপহারখানা।

'ভি' সেপের একটা ডাল। তার মাঝখানে বাসা তৈরিতে ব্যস্ত দুটো পাখি। স্ত্রী পাখিটা বসে আছে আধখানা তৈরি বাসার ওপর। পুরুষ পাখি কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে বাসা তৈরির জন্য সরু এক টুকরো খড়। খড়ের দুটো প্রান্ত ঠোঁট দিয়ে ধরে আছে দু'টি পাখি। দূর আকাশে অস্পষ্ট এক টুকরো মেঘের আভাস।

রুচিরার এত ভাল লেগে গিয়েছিল ছবিখানা যে সে কথা বলতে পারছিল না। হঠাৎ কি হল রুচিরার, সব ভুলে সে ছবিখানা নীলাঞ্জনের হাতে তুলে দিয়ে রুমালে চোখ ঢেকে ফেলল। কতক্ষণ পরে চোখ মুছে তাকাতে দেখা গেল, চোখ দুটো তার কান্নার আবেগে রঙীন হয়ে গেছে।

এতক্ষণ যে রুচিরা অভিনয় অভিনয় খেলা খেলছিল, ছবিখানা পেয়ে সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। শেষ অভিনয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনেত্রী সত্য আর অভিনয়কে পৃথক করতে পারল না, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

গাড়িতে যেতে যেতে রুচিরা বলল, ছবিখানা কোথায় রাখলেন? ওটা কিন্তু আমার।

নীলাঞ্জন কোন কথা না বলে পাশে পড়ে থাকা ছবিখানা পেছনে রুচিরার হাতে দিয়ে দিলে।

স্পীডে গাড়ি চালাতে লাগল নীলাঞ্জন, আর পেছনে আধফোটা ভোরের আলোয় কোলের ওপর ফেলে পলকহারা চোখে ছবিখানা দেখতে লাগল রুচিরা। নীলাঞ্জনের আড়ালে বসে সে যেন নীলাঞ্জনকেই চুরি করে দেখতে লাগল।

এক সময় চৌপারনের সীমানা ছাড়িয়ে এল ওদের গাড়ি। দূর দিগন্তে লাল সূর্যটা জ্বলে উঠল। নীলাঞ্জন বলল, চৌপারনকে কোন দিন ভুলতে পারব না।

ভিউ ফাইণ্ডারে পেছনের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখল নীলাঞ্জন, রুচিরার দু'টি গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

ভোরের হাওয়ায় নীলাঞ্জনের ছাব্বিশ বছরের যৌবনটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

বারহিতে গাড়ি এলে নীলাঞ্জন গাড়ি থামিয়ে বলল, ভোরের চা-টা এখানে খেয়ে নিতে পার।

রুচিরা শুধু মাথা নেড়ে তার অসম্মতি জানাল।

হঠাৎ কি ভেবে বলল, আপনি ইচ্ছে হলে খেয়ে নিতে পারেন।

নীলাঞ্জন বলল, তুমি একটু গাড়িতে বস রুচিরা, আমি সিগারেট নিয়ে আসি।

নীলাঞ্জন গাড়ি থেকে নেমে গেল। তার চলে যাওয়াটুকু অন্যমনস্কভাবে দেখতে লাগল রুচিরা।

একটা স্কুলবাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল নীলাঞ্জন। ফিরল প্রায় মিনিট কুড়ি কাটিয়ে।

রুচিরা দূর থেকে দেখল, একটি সুঠাম সুন্দর যুবক দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে। সিগারেটটায় মাঝে মাঝে টান দিচ্ছে অন্যমনস্কভাবে।

কাছে এলে দেখা গেল, নীলাঞ্জন গম্ভীর আর কিছুটা যেন চিন্তিত। কোন কথা না বলে গাড়িতে উঠে এসে সে স্টার্ট দিল। কিছু পরে হঠাৎ যেন তার রুচিরার কথা মনে পড়ে গেল। সে স্টার্ট বন্ধ করে পেছন দিকে ফিরে বলল, সরি, দেরি করে ফেললাম বড় বেশী।

রুচিরা বলল, কিছু অসুবিধে হয় নি, বেশ বসেছিলাম একা একা।

রাতের অরণ্য ওদের যতটা নিকট করে দিয়েছিল, দিনের আলোতে আর ঠিক ততটা রইল না। রুচিরাকে কিছুটা বিব্রত মনে হল। সে পেছনে বসে নীলাঞ্জনের ভাবান্তরগুলো লক্ষ্য করে চলল। এই কয়েক মুহূর্তে নীলাঞ্জন কেমন যেন খানিকটা রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এসেছে।

বারহি থেকে এখন ডান দিকে কোডারমার রাস্তা ধরে চলেছে গাড়ি। কিছু পথ একটানা ছুটে যেতেই দু'দিকে দেখা গেল লেকের অগাধ জল। জলের দিকে চেয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল রুচিরার। গাড়ি স্পীডে নদীর ওপর কংক্রিটের ব্রীজ পেরিয়ে এল। পথ চলে গেছে রিজার্ভারের গা ছুঁয়ে কিছু দূর। গাড়ি ধীরে ধীরে লেকের জল পেছনে ফেলে এগিয়ে এল আরও কিছুটা। হঠাৎ কেমন যেন অভিমানে পেয়ে বসল রুচিরাকে। নীলাঞ্জন কি একেবারে মূক হয়ে গেল? কি দোষ সে করেছে তার কাছে।

উরাও গ্রামে এসে গাড়ি কোডারমার রাস্তা ছেড়ে ঢুকল এবার ডান দিকে। এ পথে চার মাইল গেলে তিলাইয়া ড্যামে পৌঁছান যায়।

এতক্ষণে গাড়ি থামাল নীলাঞ্জন। বলল, তোমাকে একটা কথা বলার আছে রুচিরা।

রুচিরা চেয়ে আছে নীলাঞ্জনের দিকে।

নীলাঞ্জন বলল, খুব কম সময়ের ভেতরেই আমরা পৌঁছে যাব ডি.ভি.সি.-র ফার্মে। তোমার কাকুর

কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমাকে আরও দু' মাইল এগিয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছতে হবে।

রুচিরা বলল, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না?

নীলাঞ্জনের মুখে ম্লান হাসি, কোন দিন হঠাৎ করে হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেখা হবেই, জোর করে কি একথা বলা যায়?

রুচিরা এ কথার সঠিক কোন একটা উত্তর খুঁজে পেল না।

নীলাঞ্জন বলল, চৌপারনে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার ঘটনা আর ওখানে রাত কাটানোর কথাটুকু থাক না সবার কাছ থেকে লুকোনো। মানুষের কল্পনাশক্তির শেষ নেই, উদ্ভট কোন কিছু একটা ভেবে বসলেই হল।

রুচিরা বলল, কোন দিন কথা উঠলে সে তখন একটা কিছু বানিয়ে বলা যাবে! আপাততঃ তার দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।

নীলাঞ্জন বলল, আমি বড় অপয়া, তাই না?

রুচিরার গলায় কষ্টের সুর, এ কথা কেন বলছেন নীলাঞ্জনদা?

সারারাত একটা বনে ফেলে রাখলাম।

চৌপারনের বন আমার স্মৃতির সব সেরা রত্ন নীলাঞ্জনদা। আমি কোনদিন চৌপারন বনের রাতকে ভুলতে পারব না।

নীলাঞ্জন কিছু সময় চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল।

রুচিরা বলল, হাসলেন যে?

এই এমনি।

বলুন না নীলাঞ্জনদা?

নীলাঞ্জন বলল, আমরা যে পথে এখন এগোচ্ছি, এটি ডি.ভি.সি.-র তৈরি পথ। এখন থেকে আমি অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নীলাঞ্জন বোস, আর আপনি রুচিরা সোম, আমার অনেক ওপরের বসের মেয়ে। এই মুহূর্ত থেকে আমার সঙ্গে আপনার একটা সম্ভ্রমের সম্পর্ক।

রুচিরা বলল, তা বলে আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন? অসম্ভব নীলাঞ্জনদা।

নীলাঞ্জন বলল, আবার সেই ভুল! আমি আপনার নীলাঞ্জনদা কখনও ছিলাম না, এখনও নই। আমি মিঃ বোস। আর আপনি মিস সোম।

রুচিরার গলা কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ল, আমি পারব না, কখনও এমন করে বানিয়ে বলতে পারব না নীলাঞ্জনদা।

নীলাঞ্জন বলল, পারতে হবে মিস সোম। লোকের চোখের আড়ালে আমরা চিরদিন রইব চৌপারনের নীলাঞ্জনদা আর রুচিরা। যা আমাদের দু'জনের একান্ত, তাকে নাই বা ডেকে আনলাম সবার মাঝে।

রুচিরা চুপ করে রইল।

নীলাঞ্জন বলল, তোমাকে যে কথাটা জানাবার জন্যে গাড়ি থামালাম, সেটা এখনও বলা হয়নি।

রুচিরা তাকাল নীলাঞ্জনের দিকে। তখনও মনটা তার দারুণ একটা অস্থিরতায় কাঁপছে. মনের ভেতর কোথা থেকে কান্নার ক'টা মেঘ থমকে দাড়িয়ে আছে।

নীলাঞ্জন বলল, বারহি পাওয়ার স্টেশানে একটা খবর পেলাম, সেই থেকে মনটা ডিস্টার্বড্ হয়ে আছে।

রুচিরার গলায় ভয় মেশান বিস্ময়, কি খবর নীলাঞ্জনদা!

নীলাঞ্জন বলল, ডি.ভি.সির কর্মীদের ভেতর নানারকম দাবিদাওয়া নিয়ে অনেকদিন থেকেই অসন্তোষ ধুঁইয়ে উঠছিল, কিন্তু শুনছি, তিলাইয়াতে তার আউটবার্স্ট-এর সম্ভাবনা।

রুচিরা বলল, সত্যি! তাহলে তুমি তো দারুণ অসুবিধের ভেতর পড়বে। তার চেয়ে গয়াতে থাকলে কোন ঝামেলাই তোমাকে পোহাতে হত না।

রুচিরার আন্তরিক উদ্বেগ লক্ষ্য করল নীলাঞ্জন। তার শুভাশুভের কথা ভাবছে মেয়েটি। তা ছাড়া

একান্ত অন্তরঙ্গ 'তুমি'র পর্যায়ে যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক অধিকারে নামিয়ে এনেছে তাদের সম্পর্ক।

নীলাঞ্জন হেসে বলল, মেয়েরা চিরদিনই বড় স্বার্থপর। নিজের জনকে আগলে রাখতে চায়, বিপদের আঁচটা যেন গায়ে না লাগে।

রুচিরা লজ্জা পেল।

নীলাঞ্জন বলে চলল, আমি না এলে আমার মত যে কেউ একজনকে আসতে হত তিলাইয়ার চার্জ নিয়ে। সে বেচারার ঐ একই হাল হত। তার কথাটাও একটু ভেবে দেখ।

আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

নীলাঞ্জন বলল, সেন্ট্রাল থেকে ভি.আই.পি. মেম্বার আসছেন তোমার বাবার সঙ্গে, নিশ্চয়ই কিছু আঁচ পেয়েছেন ওঁরা। আমি তো তিমিরেই ছিলাম।

রুচিরা বলল, এখন তাহলে কি করবে তুমি?

নীলাঞ্জন হেসে বলল, আপাততঃ ফার্মের সুপারভাইজারের হেপাজতে তাঁর ভাইঝিটিকে পৌঁছে দিয়ে নিঃসঙ্গ তিলাইয়া প্রস্থান।

রুচিরা বলল, তুমি ব্যাপারটার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ বলে মনে হচ্ছে না। দাবি আদায়ের জন্যে একবার ওরা বাপীকে চব্বিশ ঘন্টা আটকে রেখেছিল। ফোন অবধি করতে দেয় নি।

আচ্ছা রুচিরা, এমনও তো হতে পারে আমি ওদের সংগ্রামকেই সমর্থন করে গেলাম।

রুচিরা বলল, যদি ওদের বক্তব্যে জোর আর যুক্তি থাকে, তাহলে তুমি ওদের সমর্থন করলে আমি খুশিই হব। তবে শুনেছি, আজকাল নাকি কাজের চেয়ে পলিটিক্সের খেলা বেশী।

নীলাঞ্জন অমনি বলল, জান রুচিরা, আমি রাজনীতির প্রথমভাগখানাও পড়ি নি। তাই যখন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বক্তাদের বক্তৃতা শুনি, তখন সব দলকেই আমার দারুণ যুক্তিপূর্ণ আর কাজের বলে মনে হয়।

সত্যি তোমার দুঃখ আছে কপালে। খুব জবরদস্ত আর ট্যাক্টফুল না হলে অফিসার হওয়া যায় না।

নীলাঞ্জন বলল, যা বলেছ। ওসব অফিসার-টফিসার হওয়া অনেক ঝকমারির ব্যাপার। দু'হাত ভরে কাজ পেলে আমি বর্তে যাই। আলো উৎপাদনের কাজে আমরা লেগে গেছি আর দিকে দিকে ঘরে ঘরে কলে কারখানায় সে আলো জ্বলে উঠছে, একথা ভাবলেও কেমন যেন আমার রোমাঞ্চ হয় রুচিরা।

আমি খুব ভালবাসি তাকে যে কাজ ভালবাসে।

গাড়ি এসে পৌঁছল ডি.ভি.সি, ফার্মের পাশে। গাড়ি থেকে নামবার আগে রুচিরা বলল, দোহাই তোমার নীলাঞ্জনদা, পড়ন্ত বেলায় রোজ একবারটি করে অন্ততঃ তিলাইয়া ড্যামের কাছে এস। আমি বেড়াতে গেলে যেন তোমাকে দেখতে পাই।

তরুণী মনের সেই চিরদিনের চাওয়া, সেই চোখে চোখে একান্ত প্রার্থিত মানুষটিকে ধরে রাখার চেষ্টা।

নীলাঞ্জন বলল, খবরদার! দাদা, দাদা, ডেকে চাকরিটা আমার খতম করে দিও না।

রুচিরা চাপা গলায় বলল, একশবার ডাকব, নীলাঞ্জনদা, নীলাঞ্জনদা, নীলাঞ্জনদা।

ফার্মের দিকে এগিয়ে গেল রুচিরা আর তার পেছন পেছন চলল নীলাঞ্জন।

রুচিরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। নীলাঞ্জন দেখল, সুপারভাইজারের কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রুচিরা ফার্মের একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। নীলাঞ্জন কোয়ার্টারের সামনে যেতে না যেতেই ও ফিরে এল।

কাকু কোয়ার্টারে কুলুপ এঁটে পাটনা গেছেন কাজে। দিন সাতেক পরে ফেরার কথা। কাল দুপুরে বেরিয়েছেন। এখন উপায়?

নীলাঞ্জন বলল, এমনিতেই মাথায় একরাশ ভাবনার বোঝা চেপেছে, তার ওপর তুমি এলে বাড়তি প্রবলেম হয়ে। কোথায় এখন তোমায় নিয়ে তুলি বল তো?

রুচিরা অমনি বলল, কেন, তোমার কোয়ার্টার নেই?

নীলাঞ্জন বলল, আমার সেই ব্যাচিলার্স ডেনে তোমাকে নিয়ে তুললে আর দেখতে হবে না। ডাইরেক্টার্স বাংলোতে পর্যন্ত পোস্টার পড়ে যাবে। মেয়ের খবর পেতে তোমার বাবাকে বেশী মেহনত করতে হবে না।

তাহলে!

নীলাঞ্জন গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, চল, একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে। আফটার অল সিংহশিশু সিংহই, বসের কন্যা শিশু হলেও বস।

রুচিরা দারুণভাবে মাথা নেড়ে বলল, প্রোটেস্ট, মোটেও আমি শিশু নই।

নীলাঞ্জন বলল, শিশু যে নও, তার পরীক্ষা দিতে হবে একা নির্জন ডাইরেক্টর্স্ বাংলোতে থেকে।

রুচিরা বলল, তার মানে, আমি একা থাকব বাংলোতে? অসম্ভব। অবশ্য একই বাংলোতে যদি মিঃ বোস থাকেন তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

নীলাঞ্জন ধমকের সুরে বলল, এখানে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বোসই সর্বময় কর্তা। তার কথার ওপর কোন কথাই চলবে না। তার ডিসিসানই ফাইনাল।

রুচিরা গাড়িতে উঠে বসে বলল, পড়েছি যবনের হাতে, এখন যেমন চালাও তেমনি চলতে হবে।

নীলাঞ্জন গাড়িখানা চালিয়ে এনে থামাল অ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার ঘোষদার কোয়ার্টারের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কোয়ার্টারের ভেতর। ঘোষজায়া কলবল করে উঠলেন, এই যে সাহেব, এসো, এসো। ঘোষদা এখুনি এসে পড়ল বলে। ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে দুধটা সঙ্গে নিয়ে ফেরেন।

নীলাঞ্জন বলল, বিপদ গুরুতর। সঙ্গে রয়েছেন এক সুন্দরী তরুণী। তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার ভার তোমার।

ঘোষ বউদি ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, তাকে পথে বসিয়ে রেখে এসেছ, একেই বলে পুরুষ মানুষ।

বিশ্বাস করুন বৌঠান, পথে বসাই নি, ঘোষদার গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছি, হাত ধরে বাড়িতে তুলে নেবার অপেক্ষায়।

হন্তদন্ত হয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন ঘোষ বৌদি, হঠাৎ পেছন ফিরে ফিসফিস করে বললেন, গোপনে কিছু কাণ্ড-টাণ্ড করে ফেল নি তো?

নীলাঞ্জন হেসে বলল, এখনও কবির ভাষায় অনাঘ্রাতা কুসুম।

বেরিয়ে যেতে যেতে ঘোষ বৌদি মন্তব্য করলেন, কি জানি ভাই, তোমাদের বিশ্বাস নেই।

ঘোষ বৌদি রুচিরাকে আনতে গেলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের দরজা দিয়ে দুধের পাত্র হাতে নিয়ে ঢুকল ঘোষদা।

মুখোমুখি হতেই নীলাঞ্জন বলল, ঘরে নতুন অতিথি এসেছে, বৌঠান রিসিভ করে আনতে গেছে।

ঘোষদা তো অবাক্। বলল, খবর না দিয়ে একটা সারপ্রাইজ দেবার ইচ্ছে, তাই না? একেবারে বোকা বানিয়ে দিলি যে রে।

কয়েক মুহূর্তের ভেতরে এই ঘরের মধ্যে সোমসাহেবের সুন্দরী তরুণী কন্যা প্রবেশ করবে।

প্রায় আঁতকে উঠল ঘোষদা, সোমসাহেবের মেয়ে, বলিস কিরে!

নীলাঞ্জন বলল, সোমসাহেবের মেয়ে।

আবও উত্তেজিত হয়ে বলল ঘোষদা, সোমসাহেবের মেয়ে!

নীলাঞ্জন আবাবও বলল, সোমসাহেবের মেয়ে।

কথা বলতে বলতে রুচিরাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ঘোষ বৌদি।

ঘোষদা আগে ভাগেই দু'হাত তুলে নমস্কার করল। রুচিরা হেসে প্রতি নমস্কার জানাল।

ঘোষদা বলল, আপনি আমাদের এখানে এসে উঠবেন, তা ভাবাই যায় না।

একথা কেন বলছেন, আমি আপনাদেরই একজন।

তারপর নীলাঞ্জনের দিকে আড়চোখে হেসে তাকিয়ে বলল, নীলাঞ্জনদা বলেছেন, তিনি এখানকার সম্রাট। তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তাই তিনি যেখানে এনে তুলেছেন, সেখানেই আমার আস্তানা।

ঘোষদা চেঁচিয়ে উঠলেন, হাঁরে হতভাগা, তুই এই ফরমান জারি করেছিস? এখনও তুই এখানকার চার্জ পাস নি। দাশগুপ্তের কাছ থেকে হাতে-নাতে যতক্ষণ চার্জ বুঝে না নিচ্ছিস, ততক্ষণ তোর কোন স্টেটাসই নেই।

রুচিরার দিকে তাকিয়ে এবার বলল, আপনাকে ভাঁওতা দিয়েছে ও।

নীলাঞ্জন আর রুচিরা হাসতে লাগল ঘোষদার ব্যাপার স্যাপার দেখে। ঘোষজায়া ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রাতরাশের ব্যবস্থায়।

তিলাইয়ার চার্জ মিঃ দাশগুপ্তের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছে নীলাঞ্জন। দাশগুপ্তও তাঁর নতুন অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। এদিকে খাওয়াদাওয়ার পর নীলাঞ্জন আর ঘোষদার ভেতর বাইরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল।

পরিস্থিতি বড় জটিল হয়ে উঠেছে নীলাঞ্জন।

নীলাঞ্জন বলল, বারহি থেকেই খবরটা পেলাম। একেবারে চার্জ পেয়ে এসেই লড়াই-এর মুখোমুখি দাঁড়াতে হল।

ঘোষদা বলল, এখনও কাজ চলছে, ১৫ই সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি। এদিকে হাই টাইম, লেক টুলটুল করছে জলে। মাইথন থেকে প্রায়ই রিজার্ভার ম্যানেজার খবর পাঠাচ্ছেন, ক্রেস্ট গেট খুলে রাখার জন্যে। একদিন বরাকরে এমন ঢল নামল, রাত একটায় খবর এল, তিরিশ মাইল দূরে ঢল চলেছে, আশুর স্লুইস গেটগুলোও খুলে দাও। এ অবস্থায় স্ট্রাইক চললে কি উপায় হবে বল দেখি!

নীলাঞ্জন চিন্তিত মুখে বসে রইল।

রুচিরাকে এনে তোলা হল ডাইরেক্টরস্ বাংলোতে। তিনচার দিনের ভেতরেই সোমসাহেব আর সেন্ট্রাল থেকে কর্পোরেশান মেম্বার-এর এসে পড়ার কথা। রুচিরা ওখানে থাকলে ভি.আই.পি-র দেখাশোনার ভার নিতে পারবে। তাছাড়া সোমসাহেব এসে যদি দেখেন, রুচিরা এ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলারের বাড়িতে রয়েছে, তাহলে ব্যাজার হতে পারেন। ওপরওয়ালাদের মেজাজ মর্জি বুঝে ওঠা ভার।

রুচিরা ডাইরেক্টরস্ বাংলোতে এসে দারুণ খুশি। অনেক উঁচুতে টিলার ওপর বাংলো। লেকের দৃশ্য ভোলাব নয়। দু'চারটে পাহাড়ের মাথা জেগে আছে এখানে ওখানে। থৈ থৈ জলের সমুদ্র। পিকনিক আইল্যাণ্ডটা দেখা যাচ্ছে। এখন সেখানে যাওয়া বারণ। জল বেশী হলে আইল্যাণ্ডের অনেকখানি ডুবে যায়। রুচিরা ঘুরে ঘুরে বাংলোর লাগাও ডিয়ারপার্কে হরিণ দেখতে লাগল। মেঘের মত ঘন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রেনট্রীগুলো দাঁড়িয়ে আছে। গরমের সময় হরিণরা ছায়ার খোঁজে এসে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে কংক্রিটের ছাউনি দেখা যাচ্ছে। হরিণগুলো ইচ্ছে হলে ওখানে বিশ্রাম করতে পারে। লোহার জাল দিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে। পাহাড়ের গা ধাপে ধাপে ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। গরমের দিনে জলের সীমা অনেক দূর অব্দি নেমে যায়। হরিণরা জল খাবার জন্যে ঐ পর্যন্ত নামে। তারের বেড়া গরমের দিনের জল-সীমা অব্দি টেনে দেওয়া আছে। এখন জল অনেক ওপরে। ডিয়ার পার্কের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছে রুচিরা। কাছেই পাওয়ার হাউস। বারশো ফুট লম্বা ড্যামটা বিরাট লেকের জল আটকে রেখেছে। নীলাঞ্জনের কাছ থেকে ইতিমধ্যে রুচিরার জানা হয়ে গেছে, ড্যামটা একশো ফুট উঁচু। জলের চাপ বাড়লে তাকে বের করে দেবার সব রকম ব্যবস্থাই আছে। আবার ঐ জল নিয়েই হাইডেল পাওয়ার স্টেশানের কাজ চলে। রুচিরা কলকাতায় হোস্টেলে থেকে চিরদিন পড়াশোনা করেছে। পাটনা, গয়া, এসব জায়গায় বাবা মা'র সঙ্গে কাটিয়েছে ছুটিগুলো। সে কোনদিন দেখেনি হাডডেল পাওয়ার স্টেশনের কাজ। নীলাঞ্জন তাকে কথা দিয়েছে রাতে ঘুরিয়ে দেখাবে পাওয়ার হাউস। ঘোষদা বলেছে, হাঙ্গামার আগেই তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব সিস্টার।

রুচিরার মনে হয়েছে, ঘোষদা, বৌঠান, এরা কত ভাল, কত আন্তরিক। একটা ছোট সংসার, একেবারে নিজের, তাকে কত ভালবেসে সাজান যায়। মনে মনে রুচিরা সংসার গড়তে থাকে। উঠোনের পেপে গাছটাকেও কত সুন্দর বলে মনে হয়। কি সুন্দর ছাতার মত পাতাগুলো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সে কোমরে ভেজা কাপড় জড়িয়ে শাড়িগুলো শুকোতে দিচ্ছে প্লাসটিকের দড়িতে ঘোষ বৌঠানের মত। তারপর কখন শুকনো শাড়ি পরে হাতে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বসার ঘরে। একটি মানুষ ইজিচেয়ারটায় আধশোয়া। মুখ আর বুক ঢেকে খবরের কাগজ পড়ছে। রুচিরা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মানুষটা কিছুতেই তাকাচ্ছে না। হঠাৎ কেমন যেন কান্না পেয়ে গেল রুচিরার। মুখটা দেখার জন্যে সে যেন পাগল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখের মালিক সেই যে কাগজে মুখ ডুবিয়ে আছে, সে আর মুখখানা তুলছে না।

এই যে রুচিরা।

রুচিরার ভাবনার ঘোর কেটে গেল। নীচ থেকে ডাক দিচ্ছে নীলাঞ্জন। আজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা। ওপর থেকে নীলাঞ্জনদাকে কি লাভলি দেখাচ্ছে। খয়েরী লাল স্যুটে কি সুন্দর মানিয়েছে ওকে। কিন্তু ঘোষদা নেই, গাড়িটাও সঙ্গে নেই, কোথায় যাবে ও বেড়াতে?

সেজে তৈরি হয়েই ছিল রুচিরা। সে উঁচু টিলা থেকে পাক খেয়ে খেয়ে নামতে লাগল।

নীলাঞ্জনের মনে হল, নীল আকাশ, টুকরো টুকরো মেঘ, টিলার ওপর সুন্দর বাড়িটা যেন অন্য কোন জগৎ। তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেই জগৎ থেকে নেমে আসছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ে। পরনে সাদা পোশাক। পাড়ের কাছে বড় বড় ক'টি ডিপ পিঙ্ক রঙের ফুল। ফ্রিল বসান ব্লাউজের কলার সুন্দর গলাটিকে ঘিরে রেখেছে. রুচিরার হাতে একটা আধফোটা লাল গোলাপ।

নীচে নেমে এসে বড় বড় চোখে নীলাঞ্জনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মিঃ বোসকে। অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

রুচিরা হাসতে হাসতে অনাবৃত হাতখানা বাড়িয়ে নীলাঞ্জনকে গোলাপটা প্রেজেন্ট করল।

নীলাঞ্জন গোলাপ হাতে নিয়ে বলল, শরতে তোমার প্রথম দান এই গোলাপ কুঁড়িটি আমার মনে রঙ ধরিয়ে দিলে।

রুচিরা হেসে বলল, তিলাইয়ার সম্রাটের প্রমোদ সরোবরে অগাধ জল। সামান্য রঙের দাগ মুছে ফেলতে কতক্ষণ।

নীলাঞ্জন কি ভেবে বলে উঠল, দি আইডিয়া, চল আজ নৌকোয় তোমাকে পিকনিক গার্ডেনটা ঘুরিয়ে আনি।

রুচিরা অবাক্ হয়ে বলল, তুমি না বলেছিলে পিকনিক গার্ডেন এখন বন্ধ।

নীলাঞ্জন বলল, সোমসাহেবের মেয়ের জন্যে সব সময় খোলা।

নৌকো কোথায়? কে নিয়ে যাবে নীলাঞ্জনদা?—উৎসুক প্রশ্ন রুচিরার গলায়।

ভরসা যদি রাখতে পার কলকাতার লেকের রোয়িং ক্লাবের এই মেম্বারটির ওপর, তাহলে চলে এসো চটপট। নৌকো নীচেই বাঁধা রয়েছে।

ওরা দু'জনে অথৈ জলে নৌকো ভাসাল। ওপরের আকাশ আজ লেকের আয়নায় মুখ দেখছে। টুকরো টুকরো মেঘগুলো ভেঙে যাচ্ছে নীলাঞ্জনের বৈঠার গায়ে। রুচিরার চোখ খুশিতে ছোট হয়ে এসেছে। সে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আছে। নীলাঞ্জন তার গায়ের কোটখানা আগেই ফেলে দিয়েছে রুচিরার কোলে। শার্টের হাতা তুলে নিয়েছে কনুই-এর ওপর অব্দি। চুলগুলো ওর ঈষৎ লালচে। কয়েকটা অবাধ্য চুল নেমে এসেছে কপালে। চোখ দুটো উজ্জ্বল। থুত্‌নিটা কেমন টেপা। তার ঠিক ওপরে কালো একটা তিল। রুচিরা দেখছে, নীলাঞ্জনের হাতের অনাবৃত অংশের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। ফর্সা রঙ, তাই শিরার অস্পষ্ট নীল রঙ দেখা যাচ্ছে। ঐ শিরায় বইছে টুকটুকে লাল রক্ত। রুচিরার মনে হল, তার দেওয়া গোলপটা কখন যেন রঙ মিশিয়েছে নীলাঞ্জনদার রক্তের রঙে।

ওরা জলের ওপর জেগে থাকা একটা পাহাড়ের চূড়োর পাশ কাটিয়ে হাঁসের মত ভাসিয়ে নিয়ে এল নৌকোখানাকে পিকনিক আইল্যাণ্ডে।

সাবধানে নেমে নৌকোটাকে আগে বেঁধে ফেলল নীলাঞ্জন। ততক্ষণে নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে রুচিরা। নীলাঞ্জন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধর আমার হাত, সাবধানে নেমে এসো।

রুচিরা নীলাঞ্জনের হাতে কোটখানা ধরিয়ে দিয়ে নিজেই লাফিয়ে নামল আইল্যাণ্ডে।

নীলাঞ্জন বলল, এ হাতখানা ধরতে ভরসা হল না বুঝি?

রুচিরা অমনি বলল, নিজের শক্তি কারো কাছে বাঁধা দিতে নেই।

নীলাঞ্জন গম্ভীর হয়ে গেল। সে সামনের দিকে চলতে লাগল। পেছন পেছন চলল রুচিরা।

দেখ, দেখ নীলাঞ্জনদা, কি সুন্দর বোগনভেলিয়া। লাল আর সাদা ফুলে যেন বাসর সাজিয়ে রেখেছে।

নীলাঞ্জন মনে মনে হাসল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

আবার সপ্তমে রুচিরার গলা বেজে উঠল, কি সুন্দর সাজান আইল্যাণ্ড, পাতার সবুজে চোখ ডুবে যাচ্ছে নীলাঞ্জনদা।

নীলাঞ্জন এবারও কোন উত্তর দিল না দেখে রুচিরা পেছন থেকে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, কি হল তোমার নীলাঞ্জনদা, এমন বোবা বনে গেলে কেন?

নীলাঞ্জন অমনি বলল, নিজের ভেতরের কথা কারো কাছে খুলে বলতে নেই।

রুচিরা বাতাসে হাসি ছড়াতে ছড়াতে বলল, ও বুঝেছি, রাগ হয়েছে সাহেবের। আমি হাত ধরে আইল্যাণ্ডে নামি নি, তাই কথা বন্ধ।

এবার খপ করে নীলাঞ্জনের একটা হাত ধরল রুচিরা। টানতে টানতে নিয়ে এল সবুজ পাতায় ছাওয়া একটা জাম গাছের তলায়। বলল, বস এখানে, মহারাজকে একটা গান শুনিয়ে মান ভাঙাই। গানটার প্রথমেই যে শব্দটা আছে, তা শুনলে মহারাজের কিন্তু আর রাগ থাকবে না।

নীলাঞ্জন বলল, আজ দারুণ মুডে আছ দেখছি।

রুচিরা কোন কথা আর বলল না। ওপরের একটা জলভরা মেঘ লেকের জলে ছায়া ছেলে ফেলে চলে যাচ্ছিল। বাতাসে জামের পাতাগুলো একবার শব্দ করে থেমে গেল।

রুচিরার গলায় এল গান—
'নীলাঞ্জন ছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন।
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীল নীরদ, পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহ কান্তারে।।'

গানের সুর কখনো আকাশের দিকে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছিল, কখনো মেঘের সঞ্চিত জলকে কান্নার মত ঝরিয়ে দিচ্ছিল আঘাত করে, কখনো বা সমস্ত লেকের ওপর হেমন্তের করুণ কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ছিল।

গান থামল, কিন্তু সুরের ব্যথাটুকু ওদের দু'জনের মুখের কথা কেড়ে নিল। মূক হয়ে বসে রইল দু'জনে।

প্রথম কথা বলল নীলাঞ্জন, হাসি দিয়ে গান গাওয়া শুরু করেছিলে, শেষ করলে কান্না দিয়ে।

রুচিরার চোখ তখনও গানের সুরের ব্যথায় ভরা। ও বলল, আমাকে যিনি গান শেখান তিনি বলেন, সকল শ্রেষ্ঠ গানের সুরে কান্না ভরা রয়েছে। প্রার্থনার গান, প্রেমের গান, প্রকৃতির গান যখনই গভীর হয়ে বাজে, তখনই বুঝতে হবে তাতে আত্মনিবেদনের কান্না ঝরছে।

নীলাঞ্জন বলল, তোমাকে যিনি গান শিখিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই সাধক, কেবল সুরের নন, ভাবেরও। তাই তোমার গানে এমন প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

ওরা সেদিন নির্জন পিকনিক আইল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল, যত বাধাই আসুক, পরস্পর মিলনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। দীর্ঘকালের প্রয়োজন হলেও তারা তাদের চেষ্টায় নিরলস থাকবে।

সন্ধ্যায় নীলাঞ্জন আর নিজের কোয়ার্টার ছেড়ে বের হয় নি। সে যখন ফোনে পাওয়ার হাউসের কন্ট্রোল রুম থেকে খবর নিচ্ছিল, তখন রুচিরা বসেছিল ঘোষদার পাশে। ঘোষদা তাকে পাওয়ার হাউসের কাজের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছে।

নীলাঞ্জন ফোন করছিল, বিহার কত পাওয়ার নিচ্ছে?

উত্তর এল কন্ট্রোল রুম থেকে, বার মেগাওয়াট।

নীলাঞ্জন বলল, ওদের বল, নয় মেগাওয়াটের ভেতর রাখতে।

উত্তর এল, কথা শুনছে কই?

নীলাঞ্জন অমনি বলল, ফ্রিকোয়েন্সী কম থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার সাপ্লাই কেটে দিও।

নীলাঞ্জন ফোন ছেড়ে দিয়েছে। এখন ঘোষদা রুচিরাকে নিয়ে নীচে নামল।

ঘোষদা বলল, ঐ যে চাকার মত বস্তুটি দেখছ ওটা হল টারবাইন। ওর সঙ্গে ড্যামের যোগ আছে। ড্যামের দিকে যে গেট আছে, তাকে বলে ইন্‌টেক গেট। ঐ ইন্‌টেক গেট তুললেই রিজার্ভার থেকে টারবাইনের চেম্বারে জল ঢুকতে থাকবে, ঐ জলই ঘোরাবে টারবাইন। টারবাইন ঘুরিয়ে দিয়েই জল টেলরেস দিয়ে বেরিয়ে যাবে উল্টো দিকের নদীতে।

ইন্‌টেক গেট খোলার পর জল টারবাইনে পৌঁছবার আগে অনেকগুলো ইউকেট গেট আছে। ওপরের কন্ট্রোল ফ্লোর থেকে ওগুলোর মাধ্যমে জলের স্রোত কম বেশী করা হয়। ঐ যে দু'ফুট ডায়মিটারের শাফট্ দেখছ, ঐ রড দিয়ে নীচের টারবাইনের সঙ্গে ওপরের জেনারেটারের যোগ আছে। নামার সময় মন্দিরের মত যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে দেখলে, ওগুলোই জেনারেটার। এখন টারবাইন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ওপরের জেনারেটারের রোটার ঘুরতে লাগল। ফ্লোর থেকে একটা নির্ধারিত স্পীডে তাকে ঘোরানোর ব্যবস্থা করা হল।

রুচিরা বলল, নির্ধারিত স্পিড মানে?

ঘোষদা বলল, ধর মিনিটে দুশো বার ঘোরান হবে। তাকে বলে টু হাণ্ড্রেড, আর.পি.এম।

এখন টারবাইন আর জেনারেটার ঘুরছে। অন করে দেওয়া হল এক্সাইটেশন। ভোলটেজ তৈরি আরম্ভ হয়েছে। নির্দিষ্ট সীমায় না আসা পর্যন্ত এক্সাইটেশন বাড়িয়ে যেতে হবে।

এবার কন্ট্রোল রুমের মিটারে সব দেখা যাচ্ছে। ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সী, এক্সাইটেশনের প্রকৃতি। এখন ঐ জেনারেটারটিকে যোগ করে দিতে হবে বিরাট বৈদ্যুতিক সিস্টেমের সঙ্গে। যে সিস্টেমে বাঁধা আছে বিহার, বাংলা, ইউ-পি ইত্যাদি প্রদেশগুলো।

রুচিরাকে বলল ঘোষদা, চল এবার তোমাকে বৈজয়ন্তধামে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রুচিরা পাওয়ার স্টেশান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, বৈজয়ন্তধামটা আবার কোথায় ঘোষদা?

ইন্দ্রপুরী, মানে তিলাইয়ার ডাইরেক্টরস্ বাংলো, মানে সোমসাহেবের কন্যা আপাততঃ অবস্থান করবেন যেখানে।

রুচিরা বলল, ঘোষদা, আপনার এসব কথা যদি ডাইরেক্টরস্ বাহাদুরদের কানে যায়, তাহলে আপনার প্রোমোসান ঠেকায় কে? এমন নামকরণের ক্ষমতা!

ঘোষদা বলল, ডাইরেক্টরদের কান পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, তোমার বাবার কানে গেলেই গরিব অ্যাসিস্টেন্ট কন্টোলারের মাথাটা ধড় থেকে নেবে যাবে।

ঘোষদা রুচিরাকে আলো ঝলমল ডাইরেক্টরস্ বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে এল।

রাত দশটায় খাওয়া শেষ হলে রুচিরা নিজের ঘরে এসে বসল। বাইরে চাঁদের আলো টগরফুলের মত ফুটে আছে। লেকের জল, দূরের পাহাড় আবছা আবছা, কেমন যেন অচেনা অজানা একটা জগৎ বলে মনে হচ্ছে।

রুচিরা কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। একটা হাওয়া বয়ে এল জল ছুঁয়ে। রুচিরার ভাবনার তারগুলো সেই হাওয়ায় বিচিত্র সব সুর তুলতে লাগল। তার মনে হল, একটা নতুন জীবনকে সে ছুঁয়েছে, যে জীবন এতদিন ছিল তার কাছে অধরা। এর আস্বাদ পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুর আস্বাদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। সংসারে মা ভাই বোন বাবা তার মনটাকে তো কোন দিন এমন করে ভরে দিতে পারে নি। রুচিরার মনে হল, সে বড় অকৃতজ্ঞ। এতকাল সংসার থেকে অজস্র স্নেহ সম্পদ সে না চাইতেই পেয়েছে। কিন্তু আজ কোথা থেকে একটা ক্ষ্যাপা হাওয়া এসে তার এতদিনের স্নেহের সঞ্চয়গুলোকে উড়িয়ে কোন সাগরের তলে ফেলে দিয়ে এল। এই হাওয়ার ছোঁয়াই দিলে তাকে ভরিয়ে, আর দিলে তাকে ক্ষেপিয়ে আকুল করে।

কে এই নীলাঞ্জনদা, ঠিক দুটো দিন আগে পৃথিবীর হালকা চোখে চেয়ে দেখা মানুষগুলোর সঙ্গে তো এর কোন তফাৎ ছিল না! হঠাৎ তার কোন অসতর্ক মুহূর্তে সেই পথের মানুষটিই সোজা চলে এসে বলল, দরজা খোল, আমি এসেছি। ওর ডাকের এমন জোর ছিল, দরজা আপনিই খুলে গেল। ওকে বলতে হল না, তুমি বস। ও নিজে বসার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে হাত ধরে টেনে বসাল। বোধ হয় একটুও জোর লাগে নি ওর, কারণ, ওর হাতের ছোঁয়াতে এত জোর ছিল যাতে নিজের শক্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় নি।

আজ নীলাঞ্জনকে সে ফিরে আসার পথে বলেছিল, তোমার সঙ্গে আজ আর আমার দেখা না হওয়াই ভাল। আমার জীবনে যে অভাবনীয় এলো, তাকে নিয়ে আমার গোপন মনের গভীরে একটু খেলা করতে চাই। তুমি আমার চিরজীবনের সঙ্গী হবার আগে আমার মনের একান্ত নির্জনে তোমাকে অন্ততঃ আজকের রাতটার মত পেতে দাও। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব, যে কথা অনেক চেষ্টা করেও তোমার উপস্থিতিতে বলতে পারব না।

নীলাঞ্জন তাকে কথা দিয়ে গেছে, সে তার কথার মর্যাদা রাখবে। সে অনেক দুর্নিবার ইচ্ছাকে দমন করবে, তবু আসবে না।

ওরা নীড় বাঁধার প্রতিশ্রুতি যেদিন পিকনিক আইল্যাণ্ডে নিল, ঠিক তার পরের দিন ডাইরেক্টরস্ বাংলোতে এলেন কর্পোরেশান মেম্বারসহ সোমসাহেব। প্রায় সারপ্রাইজ ভিজিটের মত এলেন তাঁরা। রুচিরাকে সেখানে দেখে, আর তার আপ্যায়নের বিশিষ্টতা দেখে খুব খুশি হলেন মেম্বার।

খবর পেয়ে কোয়ার্টার থেকে দৌড়ে এল নীলাঞ্জন।

মেম্বার বললেন, মিঃ বোস, অনেক কাজ রয়েছে আমাদের, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। আজ থেকেই শুরু করা যাক্ কাজ। এখন বলুন ধর্মঘটিদের গ্রিভান্সগুলো কি? খুব সংক্ষেপে বলুন, অবশ্য মূল বক্তব্য যেন বাদ না পড়ে।

নীলাঞ্জনের অফিসে কর্মচারীরা আজ সকালেই তাদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একখানা কাগজ দিয়ে গিয়েছিল, নীলাঞ্জন তারই ভিত্তিতে ওদের একটা ডিমাণ্ডের লিস্ট খাড়া করে বলল।

মেম্বার সব শুনে বললেন, আপনি কিভাবে এই সব প্রবলেম ট্যাক্‌ল্ করবেন ভেবেছেন?

নীলাঞ্জন বলল, দ্রব্যমূল্য যে হারে বেড়েছে তাতে আমি মনে করি, ওদের অনেকগুলো দাবি অযৌক্তিক নয়।

মেম্বার সোমসাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, মিঃ বোস তো আগে-ভাগেই সব দিয়ে বসলেন।

নীলাঞ্জন চুপ করে রইল দেখে প্রশ্নের ভঙ্গীতে মেম্বার বললেন, গো অন, গো অন।

নীলাঞ্জনের স্বভাবের ভেতর বসকে তোয়াজের বিদ্যেগুলো জানা ছিল না। সে কাজ শিখেছে যত্ন করে, তাই কাজের ভেতরেই সে আনন্দ খুঁজে পায়।

মেম্বারের কথার একটা কিছু উত্তর দিতে হয়, তাই সে বলল, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করি, যতটা সম্ভব ওদেরকে সাহায্য করার মনোভাব যদি আমাদের থাকে, তাহলে সমাধানও সহজে হতে পারে।

মেম্বার বললেন, অত সহজে সবকিছু হয় না মিঃ বোস। আপনি আদর্শবাদী বলে মনে হলেও অভিজ্ঞ নন। অনেক দেখাশোনা জানার পর মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। অভিজ্ঞতায় বলে, পৃথিবীতে কোন মানুষকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করা যায় না। তার মানে মানুষের মনে কিছু না কিছু অসন্তোষ সব সময় থাকবেই। আর আপনি যদি ওদের দাবিগুলো যথার্থ বলে মেনে নিয়ে তার সমাধান করে দেন, তাহলে পুরো দুটো দিন যেতে না যেতেই আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে ওরা নতুন দাবির লিস্ট নিয়ে আসবে।

এবার কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, আচ্ছা মি বোস, বলুন তো মানুষের অভাব আর চাওয়ার কি শেষ আছে?

নীলাঞ্জন বলল, আপনার এ কথা আমি মানি, অভাব কখনো পূর্ণ করা যায় না।

মেম্বার এখন নতুন প্রসঙ্গে এলেন, খবর পেলাম, ওরা নাকি কর্পোরেশানের কর্মকর্তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে?

নীলাঞ্জন বলল, আমি ওদের ছড়ান পোস্টারগুলো থেকেই এ খবর পেয়েছি।

মেম্বার বললেন, ওপরওয়ালাদের প্রতি ভয় মেশান শ্রদ্ধা যদি না থাকে তাহলে কাজ চলবে কি করে? দেশের সবাই রাজা হলে রাজ্যশাসন করবে কে? হুকুম যদি সবাই করে, তাহলে হুকুম তামিলের লোক পাওয়া যাবে কোথায়? দেখুন, সমালোচনা করা আজকাল একটা কাজ বলে গণ্য হয়েছে, তাই অন্য কোন কাজ না করে লোকে খালি সমালোচনাই করে চলেছে।

নীলাঞ্জন বলল, চোখের সামনে মানুষ যখন দেখে, এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য আর এক শ্রেণীর জীবনযাত্রার তফাৎ অনেকখানি, তখন তাদের ক্ষোভ আসা স্বাভাবিক। তাই সমালোচনায় তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মেম্বার বললেন, তফাৎ চিরদিন থাকবে। মানুষের বুদ্ধি, স্বভাব, ভাবনা এক নয়। মিল ফ্যাক্টরীর কর্মী দিনে আট ঘন্টা কাজ করে, তার ওপর ওভারটাইম আছে, তা বলে একজন বিজ্ঞানী কিংবা পরিকল্পনাকুশলীকে দিয়ে কি ঘন্টা বেঁধে কাজ করান যায়? তাঁদের সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা প্রয়োজন।

একটু থেমে বললেন, আমরা আসল ব্যাপার থেকে অনেকখানি দূরে এসে এসেছি, আপনি ওদের বোঝাবেন, ডি.ভি.সি, একটা কল্যাণ সংস্থা। সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা চাকরি করব আর মাইনে নিয়ে চলে যাব, একথা যেন না ভাবেন। মানুষের ঘরে ঘরে তাঁরা সম্পদ শ্রী আলো এনে দিচ্ছেন, এ ভাবনাটা ভুললে চলবে না।

নীলাঞ্জন বলল, আমি আপনার এ কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অন্ততঃ আমি নিজে সেইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। আমার দেশের মানুষেরা যখন কাজ করেন তখন তাঁদের একমাত্র ভাবনা, নিজের উন্নতি কিসে হয়। খুব কম লোকই ভাবেন, দেশের জন্যে কাজ করছি।

মেম্বার নীলাঞ্জন সম্বন্ধে ভাবলেন, ছেলেটি বড় বেশী আদর্শবাদী, তবে পাক্কা পলিটিক্যাল ধুরন্ধর নয়। বাঁ দিকে ঝুঁকে নেই।

সোমসাহেব এতক্ষণে কথা বললেন, মিঃ বোস, দাবি পূরণ না হলে পর পর ওরা কি অ্যাকশান নেবে বলে গেছে?

পরপর মানে ধাপে ধাপে কিছু করবে বলে মনে হল না, একেবারেই কর্মবিরতি পালন করবে।

সোমসাহেব মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বললেন, কঠিন সমস্যা। এ সময়ে প্রবল জলের ঢল নামছে দামোদর-বরাকরে। মুহূর্তে বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাবে।

মেম্বার বললেন, আপনারা এখানে অফিসার গ্রুপে ক'জন আছেন?

নীলাঞ্জন বলল, ডি.ভি.সি, ফার্ম, ফরেস্ট, রিজার্ভার, পাওয়ার স্টেশান মিলে আমরা আট-দশজন রয়েছি ধর্মঘটের আওতার বাইরে।

সোমসাহেব বললেন, ফরেস্ট আর ফার্ম নিয়ে আপাততঃ মাথা ব্যথার কিছু নেই, রিজার্ভার আর পাওয়ার স্টেশান রক্ষাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

নীলাঞ্জন বলল, এখানে আমরা তিন-চারজন রয়েছি।

মেম্বার বললেন, এখানে আরও কিছু টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড দিলে আপনি কাজটা সাময়িকভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন কি?

সোমসাহেব মেম্বারের দিকে ফিরে বললেন, স্যার, স্ট্রাইক চলেছে সব জায়গায়, টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড বলতে এখন শুধু ইঞ্জিনীয়াররা রয়েছেন। এতগুলো স্টেশানে তাঁদের কাজ চালাতে হবে. বাড়তি লোক পাওয়া মুশকিল।

মেম্বার চিন্তিত হলেন। পরে বললেন, আর্মড্ গার্ড মোতায়েন করতে হবে বেশী রকমের।

নীলাঞ্জন বলল, সমস্যা তাতে জটিল হবে। ওদের ভাবতে দিন জিনিসটা ওদের। দাবি পূরণের জন্য স্ট্রাইক করলেও রিজার্ভার কিংবা পাওয়ার স্টেশানের ওপর ওদের কোন বিরাগ নেই।

মেম্বার ধর্মঘটীদের ওপর একটি কারণে বিশেষ চটেছেন। যে ওপরওয়ালা অফিসারটির বিরুদ্ধে কর্মীরা দারুণ অভিযোগ এনেছে, তিনি মেম্বারের আত্মীয়। কন্ট্রাক্টর নিয়োগের ব্যাপারে টেণ্ডারের কারচুপির তিনি এক মোটা ভাগীদার। অফিস টাইমের বাইরে গাড়ি, ড্রাইভার ব্যবহার করেন তিনি। যথেচ্ছ পেট্রোল খরচের রোগ আছে তাঁর। অডিটে নানা ত্রুটি ধরা পড়েছে। বিদেশ থেকে পার্টস্ ইত্যাদি আনার ব্যাপারে মেম্বার সাহেবেরও নাকি একটা সিংহভাগ আছে। তাই ধর্মঘটীরা একটু বেশী রকমের শায়েস্তা হোক্ এটাই তিনি চান।

মেম্বার এবার একটু ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন, মিঃ সোম, এসব ছেলেমানুষী ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে এখন চলবে না। উপযুক্ত ফোর্সের জন্য হেড কোয়ার্টারে ইমিডিয়েট ফোন করুন।

নীলাঞ্জনের কথাকে যেভাবে মেম্বার নস্যাৎ করে দিলেন, তাতে নীলাঞ্জন বেশ খানিকটা আহত হল। তার মনে হল, নীচে যারা কাজ করছে, তাদের সঙ্গে মর্যাদার সম্পর্ক রক্ষা করতে না পারলে নীচের তলার কর্মীরা ওপরের কর্তাদের সঙ্গে মর্যাদা রেখে কথা বলবে কি করে?

নীলাঞ্জনকে অফিসের কাজে যাবার অনুমতি দিলেন ওঁরা। নীলাঞ্জন চলে গেলে মেম্বার একটু ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, এ সময় এই অনভিজ্ঞ, আনাড়ীকে এখানে নিয়ে আসা খুব বিচক্ষণতার কাজ হয় নি মিঃ সোম। এবার থেকে তিলাইয়ার জন্য আর একটু ওপরতলার ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

সোমসাহেব আমতা আমতা করে বললেন, ছেলেটি সৎ, কাজপাগল বলে ওকে এখানে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করেছিলাম।

যে যুগ পড়েছে, তাতে কাজের মানুষের চেয়ে কৌশলী মানুষের দরকার বেশী মিঃ সোম।

রুচিরা বয়কে দিয়ে প্রাতঃরাশ পাঠিয়ে দিল। পেছন পেছন নিজে এসে ঠিকমত জায়গায় সাজিয়ে রাখল।

মেম্বার রুচিরাকে দেখে খুশি হলেন। বললেন, মিঃ সোম, আপনার মেয়ে কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। ওর ভেতর একটা ইনটেলিজেন্সের ছাপ আছে। কিন্তু আপনার ঐ অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ছেলেটির ভেতর এর কানাকড়িও নেই।

সোমসাহেব এবার মেয়ের প্রশংসায় খুশি হলেন। মনে মনে ভাবলেন, ভাগ্যিস রুচিরাকে আনা হয়েছিল এখানে।

রুচিরা কিন্তু একটুও খুশি হল না এ মন্তব্যে। সে আড়ালে থেকে এদের কথাবার্তার ওপর কান রেখেছিল। নীলাঞ্জনের চরিত্রের ভেতর যে অনাবিল সততা আছে, তার পরিচয় পেয়ে সে মনে মনে গভীর তৃপ্তি বোধ করছিল।

বিকেলের দিকে মেম্বার রুচিরাকে ডেকে বললেন, মিস সোম, আজ আমাকে ড্যামে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

সোমসাহেব খুশি হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই স্যার। আপনারা বেড়াতে গেলে আমিও একটু ফার্মের দিক থেকে ঘুরে ফিরে অবস্থাটা বুঝে আসতে পারব।

রুচিরাকে মেম্বারের সঙ্গে যেতে হল বেড়াতে। নীলাঞ্জনকে আজ সে আড়লে থেকে দেখেছে, কিন্তু একটুখানি কথা বলার সুযোগই সে পেল না। মনটা তার ভারী হয়ে উঠল। বেড়াতে বেড়াতে মেম্বার কয়েক কাহন করে তাঁর কৃতিত্বের কথা বললেন। দু' একটা হালকা রসিকতা করলেন, কানে ঢুকল না রুচিরার। সে শুধু মিষ্টি হাসি হাসল মাঝে মাঝে। তাতেই খুশি হলেন মেম্বার সাহেব।

ফেরার পথে বাংলোর দিকে যখন উঠছিল ওরা তখন হঠাৎ রুচিরা বলল, আপনি ওপরে যান, আমি এখুনি আসছি।

মেম্বার ভাবলেন, বাবার খোঁজ নিতে বোধ করি মেয়ে বেরুল।

রুচিরা জোরে পা ফেলতে ফেলতে প্রায় দৌড়তে লাগল। যখন নীলাঞ্জনের অফিসের সামনে এসে পড়ল তখন হাঁপাচ্ছে।

নীলাঞ্জন অফিসে বসে তখনও জরুরী কাজ সারছিল। আগামী পরশু ধর্মঘট, মাঝে মাত্র একটি দিন

বাকী। বারহির স্টাফরাও তিলাইয়ায় আসছে ধর্মঘটের সামিল হতে। দুপুরে ওরা জানিয়েছে, আগামীকাল দশটায় ওদের লীডাররা মেম্বারের সঙ্গে মিট করবে। এ খবরটা আজ সন্ধ্যায় মেম্বারকে দিতে হবে। তার আগে মেম্বারের সঙ্গে ধর্মঘটীরা কি ধরনের কথা বলতে চায়, তার একটা আভাসও নিয়ে রেখেছে নীলাঞ্জন।

ঘরে ঢুকল রুচিরা ঝড়ের বেগে। নীলাঞ্জন রুচিরাকে দেখে হতবাক্।

তুমি! সোমসাহেব দেখে ফেললে দারুণ একটা অঘটন ঘটে যাবে।

দরজাটা ভেজিয়ে তার ওপর ঠেসান দিয়ে রুচিরা বলল, ভয় নেই, বাবা ফার্মের দিকে গেছে! আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম মেম্বারের সঙ্গে, সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি। হাঁ, শোন, সময় নেই, দু' একটা কথা বলে যাই।

নীলাঞ্জন বলল, তোমার সঙ্গে এখন আর দেখা হবে কিনা জানি না, কারণ কাল থেকে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আমাকে থাকতে হবে পাওয়ার স্টেশানে। আমাদের ধর্মঘটীদের ভেতর থেকে একজন বলেছেন, একটি ছেলে তাঁরা আমাকে দেবেন, যে পাওয়ার স্টেশান থেকে বাইরে আমাদের খাবারদাবার নিয়ে যাতায়াত করবে। বাংলোতে কেউ কাজ করবে না। ঐ ছেলেটিকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করাতে হবে।

রুচিরা বলল, আজ মেম্বারের কথা শুনে মনে হল. কালই ভদ্রলোক এখান থেকে সরে পড়ছেন।

নীলাঞ্জন চিন্তিত হয়ে পড়ল। মুখে বলল, চলে না গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করলে ফল অনেক ভাল ছাড়া খারাপ হত না। আমি সন্ধ্যায় গিয়ে চেষ্টা করে দেখব একবার।

রুচিরা অধীর হয়ে বলল, সে তোমরা যা ইচ্ছে তাই কর, আমি এসেছি অন্য কথা বলতে। সময় নেই হাতে, এখুনি পালাতে হবে।

নীলাঞ্জন রুচিরার দিকে কথা শোনার জন্য তাকিয়ে রইল। রুচিরা কোন কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, কই, কি বলবে বল?

রুচিরা তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বলল, কিছু না, তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করল তাই ছুটে এলাম।

নীলাঞ্জন হেসে বলল, পাগল, একেবারে পাগল!

রুচিরা বলল, নীলাঞ্জনদা, একেবারে যদি পাগল হয়ে যেতাম তাহলে বেঁচে যেতাম, কোন বোধ বুদ্ধিই আর থাকত না আমার। কিন্তু এ অবস্থা সহ্যের বাইরে।

একটু থেমে বলল, আমার ভারী কষ্ট হয়েছে সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখে। ভাবতে পারি নি বাবা হঠাৎ এসে পড়বে। এখন আর কথা বলার সুযোগই পাব না।

নীলাঞ্জন বলল, আমার সব কাজের ভেতর তোমার কথাই বাজবে। তুমি বলেছিলে, যে সত্যিকারের কাজের ভেতর ডুবে থাকে তাকে তুমি ভালবাস।

রুচিরা বলল, আমাকে হয়ত বাবার সঙ্গে চলে যেতে হবে, কিন্তু তোমাকে দীর্ঘদিন না দেখে তো আমি থাকতে পারব না আর। বল, তুমি আমাকে কবে তোমার কাছে নিয়ে আসবে?

নীলাঞ্জন বলল, একদিন আমাদের দেখা হবেই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ভগবানে বিশ্বাস হারাই নি। ঐ একটি মাত্র শক্তির কাছে আমাদের নতজানু হতে হয়।

দেখা হয়েছিল ওদের তিলাইয়াতে আর একটি বার। ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়! সেদিন আকাশে ছিল পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না। লেকের জলে তেমনি রহস্যময় স্বপ্ন, কিন্তু আলো ছিল না তিলাইয়ার কোন প্রান্তে। নিস্তব্ধতা ভেদ করে কিছু আগে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গিয়েছিল সব আলো। তখন শুধু একটা কালো ছায়াকে টিলার গা ঘেঁষে, ডিয়ার পার্কের পাশ দিয়ে সরে সরে নেমে যেতে দেখা গিয়েছিল। অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের খাস বেয়ারা বলে কেউ তাকে তখন আর সন্দেহ করে নি। মেম্বার ধর্মঘটের আগের দিনই চলে গিয়েছিলেন। রুচিরার কথায় তার বাবাকে থেকে যেতে হয়েছিল। রুচিরা বলেছিল, মেম্বার কাজের অছিলায় চলে যেতে পারেন, কিন্তু তুমি এ সময় চলে গেলে এখানকার অফিসাররা নিরুৎসাহ হয়ে পড়বেন। ওঁরা তিন-চারজনেই পাওয়ার

হাউস আর রিজার্ভারের কাজ চালিয়ে যেতে চান। এ সময় তুমি এঁদের কাছে থাকলে উৎসাহ পাবেন এঁরা।

সোমসাহেব মেম্বারের মত পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি, মেয়ের যুক্তি তাঁর বিবেককে আঘাত করেছিল । তিনি অধস্তনদের উৎসাহ যোগানর জন্য থেকে গিয়েছিলেন।

রিজার্ভারের জল বারে বারে বিপদসীমার ওপরে উঠে আসছিল, তাকে আনাড়ী হাতে ক্রেন চালিয়ে ক্রেস্ট গেট খুলে নিয়ন্ত্রণ করছিল ঘোষদা। প্রোটেকটিভ এরিয়ার ভেতর খাবার নিয়ে একটি বেয়ারাই শুধু ঢুকতে পারত। তার চলাফেরা ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। রাতদিন পাওয়ার হাউসে বসে কাজ করে যাচ্ছিল নীলাঞ্জন। কাজ শিখেছে সে, তাই কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠছে, এই সে দেখতে চায়।

কিন্তু নির্বোধ নীলাঞ্জনকে অনেক মূল্য দিতে হল শুধু কাজকে ভালবাসার জন্য।

সে গিয়েছিল ঘোষদাকে সাহায্য করতে। ক্রেস্ট গেট খুলেও জলের স্রোত যখন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না, তখন ঘোষদা এসেছিল তার সাহায্য চাইতে। সে ছুটে গিয়েছিল পাওয়ার হাউস ছেড়ে ড্যামের ওপর। দুজনে মিলে খুলে দিয়েছিল আগুার স্লুইস গেটগুলো। গর্জন করতে করতে বিপুল জলধারা বেরিয়ে গিয়েছিল টেল রেস দিয়ে পেছনের নদীতে।

নীলাঞ্জন ফিরে এসেছিল। সান্ত্রীরা দাঁড়িয়েছিল ড্যামের ওপর বিশেষ বিশেষ জায়গায়। পাওয়ার স্টেশানের সামনে আর ডাইরেক্টরস্ বাংলোর ব্যালকনিতে তারা দাঁড়িয়েছিল বন্দুক হাতে। কিন্তু নিঃশব্দে তার ভেতর কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গিয়েছিল নীলাঞ্জনের পার্সনাল বেয়ারা।

নীলাঞ্জন কন্ট্রোল রুম থেকে ফোনে খবর জানাচ্ছিল ডাইরেক্টরস্ বাংলোর সোমসাহেবকে। তারপর ফোন ছেড়ে চলে গিয়েছিল ঘোষদাকে সাহায্য করতে। ফিরে এসে আবার যখন খবর দেবার জন্য ফোন তুলল, তখন সোমসাহেবের বদলে ফোন ধরল রুচিরা। চাপা গলায় বলল, বাবা স্নানের ঘরে। সন্ধ্যায় স্নান করার অভ্যেস। জান, তোমার কথা বাবা এত বড় করে বলছিল আমার কাছে। মেম্বার যাই বলুন, বাবা তোমাকে এখানে এনে যে ভুল করে নি, সে-কথা চলতে ফিরতে শোনাচ্ছে আমাকে। আমার ভেতরটা যদি দেখতে পেত গর্বে কতখানি ফুলে উঠেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার এমন পর্বতপ্রমাণ প্রশংসা করত না।

নীলাঞ্জন বলল, দেখ কাজের আনন্দে কাজ করে যাচ্ছি। প্রমোশানের লোভে কিংবা অন্য কিছুর লোভে নয়।

রুচিরা ওপার থেকে বলল, আমার জন্যেও নয়?

আগে কাজ শেষ হোক্, তুমি আসবে আমার কাজের পুরস্কার হয়ে, আমার সব সেরা রিওয়ার্ড।

রুচিরা বলল, ধরুন, বাবা আসছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় কাঁপিয়ে বার্স্ট করল বোমাটা। ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারাল নীলাঞ্জন।

আলো নিভে গেছে চারদিকে। আর্মড গার্ডরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ছুটে আসছে ড্যামের ওপর দিয়ে ঘোষদা পাওয়ার হাউসের দিকে।

ওদিকে ডাইরেক্টরস্ বাংলো থেকে চিৎকার করতে করতে নেমে আসছে রুচিরা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও।

রুচিরা ঢুকে পড়ল অন্ধকার পাওয়ার হাউসের ভেতর, সামনে জ্বলছে টর্চ। ঘোষদা চিৎকার করে বললেন, রুচিরা, এই ধর আমার হাতের টর্চ।

রুচিরা টর্চ ধরে দেখল জেনারেটারের পাশে পড়ে নীলাঞ্জন। রক্তে ভেসে গেছে তার পোশাক। সে কেঁদে উঠল না, শক্ত করে টর্চটাকে ধরে রইল। চারদিক তখন ধোঁয়ায় ভরে আসছে। ঘোষদা বলিষ্ঠ হাতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে বের করে আনল নীলাঞ্জনকে।

সোমসাহেবের গাড়িতে এক সময় শোয়ানো হল অজ্ঞান নীলাঞ্জনকে। কোডারমার পথে পাটনা রওনা হয়ে গেল গাড়ি। ঘোষদা আর দু'টি সান্ত্রী সঙ্গে গেল নীলাঞ্জনের। রুচিরা কেঁদে ভাসিয়েছিল

তার নীলাঞ্জনদার সঙ্গে যাবে বলে, কিন্তু বাধা দিলেন সোমসাহেব। ধমকের সুরে বললেন, এইজন্যে তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলাম, তুমি যে আমার সাবর্ডিনেট অফিসারদের কাছে এমন কাণ্ড করে বসবে তা ভাবতে পারি নি।

দু'টি বছর পরে কলকাতার এক রাস্তার ধারে একটি ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়াল। তরুণী স্ত্রীটি স্বামীকে বলল, এখানেই গাড়ি পার্ক করা যাক।

স্বামী ভদ্রলোক বললেন, আমি আর নামছি না রুচিরা, তুমি বালবটা নিয়ে এসো।

পরপর অনেক ক'টি দোকান পেরিয়ে আসার পর একটা ইলেকট্রিকের দোকান চোখে পড়তেই সেটিতে ঢুকে পড়ল রুচিরা। দুপুরের দিকে খদ্দের ছিল না, মালিক ভদ্রলোক পেছনের চেয়ারে বসে মনে হয় কোন ম্যাগাজিন একমনে পড়ছিলেন। হঠাৎ দোকানে খদ্দেরের পায়ের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেলেন। হাতের কাছে রাখা ক্রাচটা মাটিতে পড়ে গেল। রুচিরার পায়ের কাছে ছিটকে পড়েছিল। সে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিতে যেতেই চোখাচুখি হল।

মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিডের সেই ভাস্কর্য মূর্তি তার দিকে চেয়ে আছে, মূর্তির একটি পা নেই।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে রুচিরার চোখ দুটো জলে ভরে এল। এক সময় চোখের জল যখন গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল তখন রুচিরা চোখ মুছতে মুছতে বলল, এভাবে তোমাকে দেখতে হবে কোন দিন ভাবি নি নীলাঞ্জনদা, কোন দিন ভাবি নি।

নীলাঞ্জন শুধু বলল, বিয়ের পর তুমি আরও সুন্দর হয়েছ রুচিরা।

ক্ষুব্ধ অভিমান ঝরে পড়ল রুচিরার গলায়, তুমি কেন আমার চিঠির জবাব দাও নি? আমি ঘোষদার ঠিকানায় কত চিঠি তোমাকে লিখেছি। তুমি কি বলতে চাও আমার একখানাও চিঠি তোমার হাতে এসে পড়ে নি? কতবার ঘোষদাকে তোমার ঠিকানা চেয়েছি, কিন্তু নিশ্চয়ই তোমার বারণ ছিল, তাই ঠিকানা পাই নি তাঁর কাছ থেকে। শেষ চিঠিতে তোমাকে কাঙালের মত অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার কলেজের সামনে দেখা করার জন্য। সেদিন বৃষ্টি ঝরছিল অঝোরে। পাছে তুমি এসে ফিরে যাও, তাই আমি সমানে দাঁড়িয়ে ভিজেছিলাম। চৌপারন ফরেস্টের ছবিটা সেদিন কতবার মনে পড়েছিল আমার। তুমি কেন এলে না, কেন সেদিন আমাকে এমন করে কাঁদালে নীলাঞ্জনদা?

নীলাঞ্জন বলল, তুমি এমন করে বললে আমার জীবনে যে কোন সান্ত্বনা থাকে না রুচিরা। তুমি ধীরে ধীরে একটা মানুষকে ভুলে যাবে, এই আমি চেয়েছিলাম। সেখানে ছিল আমার দুঃখের শান্তি। আজ এমন করে এসে অতীতকে তুলে ধরলে আমি সান্ত্বনা কোথায় পাই বল।

রুচিরা বলল, আমি যে মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে চেয়েছিলাম, তার কোন মূল্য কি নেই?

নীলাঞ্জন বলল, পাটনার হাসপাতালে পাখানা অ্যাম্পুট করার পরে নীলাঞ্জন বোস আর ইঞ্জিনীয়ার রইল না। সে তখন তার অতীতকে ভুলে নতুন জগতে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাইল।

রুচিরা বলল, আমি যে ভাবতে পারছি না নীলাঞ্জনদা, তুমি এ ধরনের জীবন কাটাবে।

হাসল নীলাঞ্জন। বলল, কেন মন্দ কি, সারা দেশে আলো জ্বালাতে চেয়েছিলাম, এখন তাই করছি। পথটা একটু আলাদা হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বালার সরঞ্জাম সরবরাহ করছি এখন।

রুচিরা কোন কথা আর বলতে পারল না, তার বুক ঠেলে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় বলল, এখনও চৌপারনের রেঞ্জার সাহেবের দেওয়া ছবিখানা আমার কাছে আছে। ঐ পাখি দুটো কতকাল ধরে ঘর বাঁধার আয়োজন করছে, কিন্তু ঘর বাঁধা তাদের আর শেষ হল না কোন দিন। ঘর বাঁধার স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থেকে যায় নীলাঞ্জনদা।

যেমন এসেছিল আবার তেমনি নীরবে ফিরে চলে গেল রুচিরা।

সোনিয়া অগ্নিহোত্রী

আজও সেই একই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সেই একই মঞ্চ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একই পাত্র-পাত্রী। নির্বাক, নিথর। যেন কোনও শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর্য আমার দৃষ্টিকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে চঞ্চল পা দুটোকে তিষ্ঠ বলে থামিয়ে দিয়েছে।

প্রথম সন্ধ্যায় এ দৃশ্য চকিতে চোখে এসে পড়েছিল। কিন্তু বিশেষ কাজে অতি দ্রুত পা চালিয়ে চলেছিলাম বলে বড় একটা কৌতূহল বোধ করিনি। দৃশ্যটা চোখে পড়লেও ভেসে গিয়েছিল, কারণ কাল আমার অন্য এক তাড়া ছিল।

আজ কিন্তু দৃশ্যটা আমাকে আটকে দিল। তখন পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের আয়োজন চলেছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরের অরণ্যভূমির মাথায় অস্তগামী সূর্য তার লাল আভাটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে। গঙ্গার তরঙ্গেও দেখা যাচ্ছে তার প্রতিফলন।

সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমার দ্বিতলের আস্তানা ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়েছি পথে। এগিয়ে চলেছি উত্তর দিকে বাজারের রাস্তা ধরে। দু'দিকে সারি সারি দোকান, সন্ধ্যায় জ্বালানো বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে।

পরমার্থ নিকেতনের উল্টোদিকের ঘাটের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়াবার কারণও ছিল। বেশ কয়েকটি গঙ্গার ঘাট নেমে গেছে এই পথ থেকে। সবকটি বাঁধানো। এতগুলি গঙ্গা-ঘাটের মধ্যে এই ঘাটটি বিশেষভাবে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশাল ঘাট সাদা মার্বেল পাথরে মোড়া। সামনের চত্বরটিও মার্বেল বাঁধানো। ডানদিকে ছোট্ট একটি মন্দির। গঙ্গার জল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে গেছে। দু'দিকে চক্রাকার বসার চাতাল। কিছু দর্শনার্থী ভক্ত নরনারী জড়ো হয়েছে। দু'পাশে বসে আছে। মন্দির এবং অঙ্গন-সংলগ্ন একটি সুদৃশ্য তোরণ। অর্জুনের অশ্ববাহিত গতিশীল রথটিকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পরিচালনা করছেন স্বয়ং পার্থসারথি। শুভ্রবর্ণের ভাস্কর্যটি নিখুঁতভাবে উৎকীর্ণ।

পূজা শেষ করে অঙ্গনে নেমে এসেছেন পুরোহিত। পরনে শুভ্র পরিচ্ছদ, গায়ে গৈরিক উত্তরীয়। শ্মশ্রু এবং কেশগুচ্ছ অবয়বধারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে।

অত্যন্ত সৌম্য চেহারা, মুখে মৃদু হাসি। আমি স্পষ্ট দেখলাম, একটি স্তম্ভের আড়াল থেকে কালকের সেই রমণী পুরোহিতের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পরনে লালপাড় একটি গরদের শাড়ি। পুরোহিত তাঁর দিকে তাকালেন, মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। রমণীর দুটো হাত বুকের কাছে। তিনি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন পুরোহিতের মুখের দিকে।

আমার মনে হলো, তাঁরা কোনও কথা বলছেন না। দু'জনেই নীরব। নীরবতার একটা ভাষা আছে। সে ভাষার প্রকাশ ছিল দু'জনের চোখে-মুখে।

ঘাটের শেষ সোপানটিতে তখন ব্রহ্মচারী পেতলের দীপাধারে শতদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। পুরোহিত পায়ে পায়ে নেমে গিয়ে বসলেন তাঁর আসনে। দীপাধারটিকে হাতে তুলে শুরু করলেন প্রবাহিনী গঙ্গার আরতি। হাতের ঘণ্টা শব্দিত হতে লাগল।

একসময় শেষ হলো পূজা। পুরোহিত শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন ভক্ত নর-নারীর শিরে। দেখলাম সেই রমণী বাম দিকের চাতালে এসে করজোড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছেন।

এবার পুরোহিত উঠে এসে মাঝখানের সোপানে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। কণ্ঠে বেজে উঠল শঙ্করাচার্যের গঙ্গা-স্তোত্রম।

"দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণী তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে
মমমতিরাস্তাং তব পদকমলে।।

গায়কের কণ্ঠমাধুর্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। কণ্ঠের মহিমা, লাবণ্য, স্বরগাম্ভীর্য, সব কিছু মিলে যে অসাধারণ ধ্বনির সৃষ্টি হলো তা ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল সন্ধ্যার আকাশে। গঙ্গার সুরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেল সেই অপূর্ব স্বরধ্বনি।

দু'ছত্র উচ্চারণ করে তিনি থেমে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী আর ভক্তেরা সেই ছত্র পুনরাবৃত্তি করছিল।

.....
ভাগীরথী সুখদায়িনি মাত-
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
.....
হরি-পাদপদ্ম বিহারিণি গঙ্গে
হিম-বিধু-মুক্তা ধবল তরঙ্গে।
.....
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবরমণ্ডিত ভঙ্গে।
......
রোগং শোকং তাপং পাপং
হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম।
.....
অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু কৃপাময়ি কাতর-বন্দ্যে।
তবতট নিকটে যস্য নিবাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।

এই ছত্রগুলির ভেতরে যেখানে যেখানে ভাগীরথী, জাহ্নবী, অলকানন্দা ও গঙ্গার নাম উচ্চারিত হচ্ছিল সেখানেই উৎসমুখ থেকে গঙ্গার প্রবাহের একটি ছবি ফুটে উঠছিল আমার চোখের সামনে:

হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ থেকে বয়ে আসছে শুভ্র হিমবাহ। গোমুখের ভেতর দিয়ে বয়ে আসার সময়ে সে পরিণত হলো স্রোতধারায়। হিমালয়ের সেই বরফ-গলা জল উচ্ছল নৃত্যে এসে পৌঁছল গঙ্গোত্রীতে। ভগীরথ যেন শঙ্খনিনাদ করে সেই প্রবাহকে নিয়ে চললেন মর্ত্যভূমির দিকে। ভৈরবঘাটির কাছে এসে সেই গৈরিক ভাগীরথীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলবসনা জাহ্নবী। ওদিকে বদরীনাথ হয়ে অলকানন্দা নেমে আসছে নিম্নভূমিতে সহস্র জলধারাকে বুকে বহন করে। আবার কেদারনাথকে স্পর্শ করে মন্দাকিনীও ছুটে আসছে সখী অলকানন্দার সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে।

রুদ্রপ্রয়াগে মিলন ঘটল দুই সখীর। আবেগে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে গেল মন্দাকিনী। এখন থেকে দুই ধারায় পুষ্ট হয়ে অলকানন্দা নামেই ছুটে চলল বেগবতী তরঙ্গিণী।

দেবপ্রয়াগে এসে ভাগীরথীর দেখা পেল অলকানন্দা। এবার দুজনেই দুজনের নাম হারিয়ে শুধু গঙ্গা নাম নিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। সেই ধারা প্রবল বেগে দেবভূমি থেকে নেমে এল মর্ত্যভূমিতে। দক্ষিণবাহিনী গঙ্গা হৃষীকেশ স্পর্শ করে ছুটে চলল হরিদ্বারের দিকে। বুকে তার সাগর সঙ্গমের স্বপ্ন। জলকল্লোলে কি সেই ইচ্ছারই উচ্চারণ?

কখন শেষ হয়ে গেছে গঙ্গাস্তোত্র। আমি স্তব্ধ আচ্ছন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। একে একে ভক্তরা আমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমার স্বপ্নর ঘোর কেটে গেল, সম্বিৎ ফিরে এল। আমি ঘাটের সোপানের পুরোহিত কিংবা সেই রমণীকে দেখতে পেলাম না। বাজাবের ভেতর দিয়ে পায়ে পায়ে ফিরে এলাম আমার আস্তানায়।

গীতাভবন, পরমার্থনিকেতন, স্বর্গাশ্রম ছাড়িয়ে এসে দাঁড়ালাম বানপ্রস্থ আশ্রমের গেটের সামনে। দক্ষিণে সামান্য পথ এগিয়েই গঙ্গা বাঁক নিয়েছে। আমি বানপ্রস্থ আশ্রমের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

বিশাল জায়গা জুড়ে শুরু হয়েছে বানপ্রস্থ আশ্রম। ভেতরে সুপ্রশস্ত পার্ক। চারদিক ঘিরে পাথর বসানো রাস্তা। পার্কে ফুলের বাগান, গেটে লতাবিতান, মখমল সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে নানা রঙের ফুলের কেয়ারি। ধারে ধারে সাদা মোজাইক করা বেঞ্চের সারি। চারদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বড় বড় বনস্পতি দাঁড়িয়ে আছে। তার ছায়ায় সারি সারি দ্বিতল অট্টালিকা। ভেতরে থাকা-খাওয়ার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। এক কামরা দু'কামরা ডাইনিং স্পেসবিশিষ্ট সামনের ফ্ল্যাটগুলি থেকে একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে অরণ্য আচ্ছাদিত পর্বত দেখা যায়।

ভোরবেলা উঠেই জানলা দিয়ে দেখা যায় সূর্যোদয়ের সমরোহ। পাহাড়ে মেঘ জমলে সে মেঘ ধীরে ধীরে অরণ্যের সবুজ ঢেকে নামতে থাকে। আড়ালে সূর্যকে দেখা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে তার অপূর্ব ছটার বিচ্ছুরণ ঘটে। মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যের বালার্ক অবস্থা থেকে জ্যোতির্ময় রূপটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। সে এক দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

গঙ্গার দৃশ্য আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু মনোরম। একজন স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন, অন্যজন চিরচঞ্চলা।

হরজটা থেকে নির্গত গঙ্গার পরিকল্পনা কে করেছিলেন জানি না তবে তিনি যে ধ্যানী এবং কবি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমার দ্বিতলের ঘরটিতে বসে সারাদিন আমি গঙ্গার কলধ্বনি শুনি। একই ধ্বনি কিন্তু কখনও পুরনো বলে মনে হয় না। নর্তকীর নূপুরধ্বনি এবং নৃত্যছন্দ যেমন কখনো পুরনো হয় না, যা চিরদিন মনকে আকর্ষণ আর আবিষ্ট করে।

এই মনোরম নির্জন নিবাসে কয়েকদিন আমি অবসরযাপন করছি। মনে মনে ভাবছি আমার আগামী শারদীয়ার প্লট। মাঝে মাঝে কিছু নোট করছি, পছন্দ না হলে সেগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে। নিচেই কমপ্লেক্সের ভেতরে একটা ক্যান্টিন, নিরামিষ খাবার, বেশ উপভোগ্য। দেরাদুন রাইস, চাপাটি, ডাল, সব্জি, কখনও বা পনিরের তরকারি। শেষে একবাটি করে ঘন টকদই। কাঁচালঙ্কা এবং পেঁয়াজ চাইলেই পাওয়া যায়। প্লেট প্রতি কুড়ি টাকা।

রান্নার সব ব্যবস্থা থাকলেও হাত পুড়িয়ে রান্না কে করে। রোজ বাজারহাট বয়ে এনে কে সংসার সাজায়।

তিন-চারদিন বাইরে যাওয়া হয়নি। ঘরে বসে এপারের পাহাড়ের সূর্যোদয় দেখছি। ওপারে দেখছি গঙ্গার জলে অস্ত-সূর্যের মহিমা।

একদিন একটা প্লট নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা এগিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ প্লটটাকে বাতিল করতে হলো। আমি সহসা সেই রহস্যময়ী রমণীর মুখোমুখি হলাম। এক সন্ধ্যায় আমি নিচে নেমেছিলাম। পার্কের একদিকে রামমন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল। আমি দূর থেকে দেখলাম, রামমন্দির থেকে পাথর বাঁধানো যে পথটা আশ্রমের গেট পর্যন্ত চলে গেছে তার দু'দিকে বড় বড় গাছের তলায় দুসারি সাদা মোজাইক করা বেঞ্চ, তার একটাতে আলোছায়ার আবছা রহস্যের ভেতর বসে রয়েছেন আরব্য রজনীর সেই রহস্যময়ী রমণী। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচুখি হলো। তিনি আমার দিকে তাকালেন, মুখে একটুকরো মধুর হাসি। সেই ঘি-রং-এর সিল্কের শাড়ি, সরু পাড়, হালকা সবুজ রং। সেদিন পাড়ের রঙ ছিল লাল।

আজ আকাশে মেঘ নেই। উজ্জ্বল চাঁদের আলো গাছের পাতাপত্রের ফাঁক দিয়ে এসে রমণীর মুখে এবং অঙ্গবস্ত্রে আলপনা আঁকছে।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেই আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম। উনিও প্রতি নমস্কারের জন্য হাত তুললেন।

প্রথম কথা বললেন অপরিচিতা, এখানেই উঠেছেন?

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।

আসছেন কোত্থেকে?

কলকাতা থেকে।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি?

আমাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—দিল্লি, দেরাদুন, মুম্বই, বাঙ্গালোর যখন যেখানে মন চায়, সেখানেই থাকি।

আমার কৌতূহল বাড়তে লাগল। চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। গায়ের রং, মুখের ডৌল শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরি কোনও প্রতিমার মতো। আমি প্রথম যখন দেখেছিলাম তখন মনে হয়েছিল ওঁরা দুজনেই গ্রীক ভাস্কর্যের তৈরি শ্রেষ্ঠ দুটি মূর্তি।

এবার আমার প্রশ্ন, এখানে উঠেছেন কোথায়?

কেন, এই আশ্রমেই। ক্যান্টিনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ওই একেবারে গঙ্গামুখী শেষ প্রান্তের ঘরটি আমি ভাড়া নিয়ে আছি। মাসখানেক হলো উঠেছি এখানে। দু একবার আপনাকে দেখেছি ও প্রান্তের ঘর থেকে নেমে আসতে।

আমি জানতে চাইলাম, আপনি কি প্রবাসী বাঙালি?

উনি হেসে মাথা নেড়ে জানালেন, আমার অনুমান ঠিক নয়। মুখে বললেন, আমি কোন দেশের তা আমি জানি না, তবে আমি একেবারেই বাঙালি নই।

অবাঙালি হয়ে এত চমৎকার বাংলা বলছেন কি করে? যেসব অবাঙালি কর্মসূত্রে বাংলাদেশে রয়েছেন এবং হয়তো দু-তিন পুরুষ কাটিয়েও দিয়েছেন, তাঁদের কথাতেও এক ধরনের টান থাকে। কিন্তু আপনার কথায় সে টানটুকুও নেই।

উনি মিষ্টি হাসলেন এবং শব্দ করেই হাসলেন। মনে হলো, কেউ জলতরঙ্গ বাজালো।

উনি এবার বললেন, আমি অনেকগুলি ভাষায় লিখতে, পড়তে পারি। আমি বিদেশী ভাষার ভেতর ইংলিশ, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ জানি আর এদেশের পাঁচ-সাতটি ভাষা আমার আয়ত্তে। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, কাশ্মীরি আর উর্দু।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, অবাক করলেন!

উনি হেসে বললেন, আমি জন্মেছি ইউ. পি.-র দেরাদুন অঞ্চলে। সুতরাং বলতে পারেন, মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ আমার হিন্দি।

আপনি ভাষাবিদ এবং গুণী। আমি মাতৃভাষা ছাড়া আর মাত্র দুটি ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি।

মহিলা বললেন, আমি অনেক কাছ থেকে কিন্তু আপনাকে দেখেছি। আপনি যে বিশেষ ভাবনার জগতে ঘোরেন সেটুকু বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি।

আমি চমকে উঠে বললাম, এ ধারণা আপনার হলো কি করে?

দুদিন আগে আপনি পরমার্থ নিকেতনের ঘাটের একপাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলেন, সন্ধ্যারতির পর আমরা যখন আপনার পাশ দিয়ে চলে যাই, তখন আপনি টেরও পাননি। নিশ্চয়ই আপনি কোনো ভাবের ভেতর ডুবেছিলেন।

বললাম, এখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের একটা মহিমা আছে, যা মনকে আবিষ্ট করে। তার ওপর গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যারতি, সাধুর কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ মানুষকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। আমি পূজারী মহারাজের কণ্ঠমাধুর্যে গঙ্গার যাত্রাপথের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম।

উনি বললেন, তাহলে একটু আগে আপনার সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলাম, তা একেবারেই মিথ্যে নয়।

এবার উনি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, দেখুন তো, সেইথেকে আপনি দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছেন আর আমি দিব্যি বসে রয়েছি। খুব জরুরি কাজ না থাকলে বসুন না। অনেক জায়গা রয়েছে।

ওঁর পাশে অনেকখানি জায়গা ছিল কিন্তু আমি উল্টোদিকের বেঞ্চে ওঁর মুখোমুখি বসলাম।

এবার উনি বললেন, আমাদের আলাপ হলো, কিন্তু এখনও কেউ কারো নাম জানি না।

আমি নাম বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, আমি সোনিয়া অগ্নিহোত্রী।

বলার পরক্ষণেই দেখলাম, ওঁর মুখে একটুকরো চাপা হাসির রেখা ফুটে উঠল।

উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বললেন, নামটা শুনে অবাক হলেন তো? এক বিদেশিনী ভারতীয় বধূর নামের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাই না?

ওঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হেসে তাকালাম ওঁর দিকে।

উনি এবার বললেন, ভদ্রমহিলার এদেশে আসার অনেক আগেই কিন্তু আমার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার বছরখানেক আগে আমার জন্ম হয়।

আমি কৌতূহল চাপতে না পেরে বললাম, নামটা আদপেই আমাদের ভারতীয় নয়, তাই এ নাম চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশে অপরিচিতই ছিল। ইদানীং নতুন প্রজন্মের কোনো কোনো মেয়ে এ নাম ধারণ করেছে।

সোনিয়া বললেন, নাম শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন তো? আমার বাবার এক ইটালিয়ান ডাক্তার বন্ধু সে সময় আমার এই নামকরণ করেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ওঁর দেশে এই নামটা নাকি বিশেষ পপুলার ছিল।

আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন। হাত দুটি জোড় করে বললেন, নিজের খাবার নিজেই তৈরি করি। গ্যাসের ব্যবস্থাও আছে। একেবারে একক পিকনিকের আয়োজন আর কি, তাই যেতে হচ্ছে।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাকে কথায় কথায় অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম।

সোনিয়া আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কয়েকদিন আছেন নিশ্চয়?

আরও কয়েকটা দিন থাকার ইচ্ছে আছে।

আবার দেখা হবে, বলেই সোনিয়া একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে নিজের আস্তানার দিকে চলে গেলেন।

শিকারী যেমন বনের ভেতর চলার সময় তার প্রার্থিত শিকারের গন্ধ পায়, আমি তেমনি সোনিয়ার ভেতর একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছিলাম। পরিবেশটি রহস্যময়, নারীও রহস্যময়ী। এসব নারী নিজেদের প্রকাশ করেন ধীরে ধীরে। এঁরা কথা কিংবা কাহিনীর ছন্দপতন ঘটান হঠাৎ হঠাৎ। এতে শ্রোতার সাময়িক আশাভঙ্গ হলেও আগ্রহ বাড়ে।

আমার আস্তানা থেকে বাজার, গঙ্গার ঘাট, রামঝুলা পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যে দু-তিনবার টহল দিয়েছি, কিন্তু সেই রহস্যময়ীর সন্ধান আর পাইনি। চার-পাঁচদিন এমনি কেটে গেছে। আশ্চর্য! সন্ধ্যায় গঙ্গাঘাটের সে মন্দিরে পুরোহিতেরও দেখা পাইনি। সম্পূর্ণ অন্য এক পুরোহিতকে পূজার কাজ করতে দেখলাম। আরতির সময় গঙ্গার ঘাটে ক্যাসেটে গঙ্গাস্তোত্র বাজানো হতো। যেন আগের পুরোহিতের সেই বিস্ময়কর কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি।

পুরোহিত এবং সোনিয়া দুজনে অদৃশ্য হলেন, এটা আমার মনের ওপর বিরাট এক জিজ্ঞাসাচিহ্ন এঁকে দিল। সন্ধ্যালগ্নে প্রতিদিন তাঁদের একান্ত সাক্ষাৎকারটি আমার কাছে নতুন এক তাৎপর্য বয়ে আনল।

শুরু হতে না হতেই ছেদ পড়ে গেল আমার গল্পের প্লটে। কিন্তু যেদিন যাওয়ার কথা ছিল, সেদিন আমার যাওয়া হলো না। কৌতূহল আমাকে আরও কয়েকদিন ওই আস্তানা থেকে নড়তে দিল না।

হৃষীকেশ থেকে ওঁদের চলে যাওয়ার সাতদিন পরে আমি গঙ্গার ঘাটে সেই পুরোহিতকে আবার

দেখতে পেলাম। তেমনি প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি, পূজা থেকে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ পর্যন্ত সবই করে গেলেন নিয়মমতো। কিন্তু আমার গল্পের নায়িকাকে দেখতে পেলাম না।

একবার মনে হলো, পুরোহিতমশাইকে জিজ্ঞেস করি, আমার গল্পের নায়িকাকে কোথায় রেখে এলেন।

পরক্ষণেই এ ধরনের ভাবনার জন্য নিজেকে মনে মনে শাসন করলাম। সে সন্ধ্যাটি, আমি গঙ্গার চাতালে সমবেত ভক্তদের সঙ্গে বসে কাটালাম। পুরোহিতের সেই মধুর কণ্ঠে গাওয়া গঙ্গাস্তোত্র শুনে আমি নতুন করে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

মানুষটির ভেতর বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য ছিল না। তাঁর চলাফেরা, আচার-আচরণ বড় শান্ত, বড় স্বাভাবিক। মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে কি একই দিনে দুজনের অন্তর্ধান কাকতালীয়?

গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে আমি বানপ্রস্থ আশ্রমের রামমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন শঙ্খ-ঘণ্টা-ঝাঁঝরে আরতি চলছিল। হয়তো গঙ্গার ঘাটে না গিয়ে সোনিয়া এই রামমন্দিরের আরতিতে যোগ দিতে পারেন। গঙ্গার ঘাট থেকে দুজনের অন্তর্ধান এবং পুনরাবির্ভাবকে লোকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারে ভেবে হয়তো সোনিয়া নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

আবার নিজেকে শাসন করলাম, ছিঃ ছিঃ! এমন সন্দেহপ্রবণ কি করে হলো আমার মন!

মন্দিরের ভক্তসমাবেশেও সোনিয়াকে দেখতে পেলাম না।

নায়িকার প্রতীক্ষায় বসে থেকে কিছু লাভ হবে না ভেবে আমি দিল্লি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

দু-দিন পরে একটা ট্যাক্সিতে দিল্লি যাব স্থির করে রামঝুলা পেরিয়ে ওপারের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গেলাম। কথাবার্তা পাকা করে সামান্য কিছু অ্যাডভান্সও দিয়ে এলাম।

ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড থেকে হেঁটে যাচ্ছিলাম রামঝুলার দিকে। হঠাৎ একটা অটো থেকে নারীকণ্ঠে আমার নাম শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। ততক্ষণে অটো থেমে গেছে, তার থেকে নেমে পড়েছেন সোনিয়া।

দুই

কোথায় চলেছেন? খুব ব্যস্ত নাকি?

আমি সোনিয়াকে দেখে মনে মনে দারুণ খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। বললাম, এখানে বেড়াতে এসেছি, তাই অবসর অখণ্ড, ব্যস্ততার কোনও প্রশ্নই নেই।

সোনিয়া এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলেন, যাবেন আমার সঙ্গে?

কোথায়?

সোনিয়া হেসে বললেন, আপনার স্থানের বাছবিচার আছে নাকি?

হেসে বললাম, চলুন।

অটোর কাছে গিয়ে ড্রাইভারের হাতে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে দিয়ে উনি আমার কাছে ফিরে এলেন। অটো ফিরে গেল তার ডেরায়।

বললাম, অটো ফিরিয়ে দিলেন যে?

হরিদ্বার থেকে ওটাতেই তো আমি এলাম। এখন ও ফিরে যাচ্ছে। অটো স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে ও। ওদিককার যাত্রী পেলেই চলে যাবে।

ওকথায় ইতি টেনে দিয়ে সোনিয়া বললেন, চার-পাঁচ দিন বানপ্রস্থের ডেরাটি ছেড়ে বাইরে থাকতে পারবেন? স্থানটি কিন্তু মনোরম।

চার-পাঁচ দিন বাইরে যেতে হলে আমার পোশাক-আশাক চাই। ওগুলো আনতে হবে।

সোনিয়া বললেন, ওটা আমার মাথায় ছিল না। বেশ, আমি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণে ফেরি পার হয়ে চলে যান। আমি এই স্ট্যান্ডে আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়ার হাতে ট্যাক্সি অফিসের দেওয়া অ্যাডভান্সের স্লিপটা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, পরশু দিল্লি যাবার জন্য একটা ট্যাক্সি বুক করে এসেছি এখুনি। দেখুন, এই অ্যাডভান্সটা অ্যাডজাস্ট করা যায় কিনা।

সোনিয়া স্লিপটা নিয়ে চলে গেলেন। আমি ফেরি নৌকোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ফিরে আসতে আমার কিছুটা দেরি হলো। ব্যাগভরে আমার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, অফিসের পাওনা মিটিয়ে এপারে আসতে কিছুটা দেরি হবারই কথা। সোনিয়া একটা চেয়ারে বসেছিলেন রাস্তার দিকে চোখ পেতে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

চলুন, ট্যাক্সি রেডি।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে সোনিয়ার সঙ্গে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম।

ট্যাক্সি কোথায় যাবে তার নির্দেশ সোনিয়া আগেই দিয়ে রেখেছিলেন নিশ্চয়, তাই ট্যাক্সিতে উঠতেই চালক কোনো প্রশ্ন না করে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

জনপদ ছাড়িয়ে গাড়ি ঢুকল শাল-জঙ্গলের ভেতর। বনের বুক চিরে পিচ রোডটা এগিয়ে গেছে একটা ময়াল সাপের মতো। পিচ্ছল, আঁকাবাঁকা।

শেষ শরতে মেঘ যাই যাই করেও যাচ্ছে না। শালগাছের মাথা ছুঁয়ে একটা বাতাস বয়ে গেল। পাতায় পাতায় তবলার বোলের মতো একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ সোনিয়া আমাকে অবাক করে দিয়ে কবিগুরুর একটি গানের কয়েক ছত্র আবৃত্তি করে গেলেন।

'শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।'

বললাম, কোথা থেকে শিখলেন এসব? আর ঠিক উপযুক্ত সময়ে আবৃত্তি করে শোনালেন সঠিক সংগীতটি ! গান নিশ্চয় আসে গলায়?

সোনিয়া তাঁর সোনালি কণ্ঠে হাসি ছড়ালেন। পরক্ষণেই গভীর গলায় বললেন, গান কে না গায়। কেউ গান শোনায় অন্যকে, কেউবা শুধু নিজেকে। আমি কিন্তু দ্বিতীয় দলে।

বললাম, আমি আমার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর এখনও পাইনি। রবীন্দ্রনাথের ওপর আপনার এতখানি আকর্ষণ এলো কি করে?

তখন আমি দিল্লিতে রয়েছি, অরুণবাবুর কাছে বাংলাভাষাটা রপ্ত করেছি। উনি মাঝে মাঝে গীতবিতান খুলে এক একটি গানের ব্যাখ্যা করছেন আর গেয়ে শোনাচ্ছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি। সেই থেকে আমার স্বপ্নের সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। একসময় কলকাতা থেকে নাচগানের একটি গ্রুপ দিল্লিতে আসে। তারা বর্ষার অনেকগুলি গান নাচের সঙ্গে পবিবেশন করে। সেই অনুষ্ঠানে এ গানটিও ছিল।

বললাম, আপনি শিল্পী।

কি করে বুঝলেন?

এই যেমন করে আপনি আমাকে ভাবুক বলে ধরে নিয়েছিলেন।

এবার দিলখোলা হাসি হেসে উঠলেন সোনিয়া।

আমি বললাম, আপনার চলার ছন্দ আর হাত নাড়ার বিশেষ মুদ্রা থেকেই আমি অনুমান করেছি, আপনি শিল্পী। সত্যি করে বলুন তো আমার ধারণাটা সঠিক কিনা?

সোনিয়া বললেন, অনেকগুলো দিন আমার লক্ষ্ণৌতে কেটেছিল, সেখানে অমি গান আর নাচে তালিম নিয়েছিলাম।

কত্থক আর ঠুংরি?

হাসির রেখা ফুটল সোনিয়ার মুখে। বললেন, আপনি নিশ্চয় নাচগানের সমঝদার।

দেখুন, বিধাতাপুরুষ যখন দুটো চোখ, দুটো কান আর একটি মন দিয়েছেন, তখন তার সদ্‌ব্যবহার করেই তো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে।

সোনিয়া বললেন, দক্ষিণ থেকে একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ এসেছিল কত্থক শিখতে। আমার গুরু তার তালিমের প্রাথমিক কাজগুলো আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি ওকে কত্থক শেখাতাম আর ওর কাছে শিখতাম কুচিপুদি।

আমি সোচ্ছ্বাসে বললাম, দারুণ গুণের মেয়ে আপনি।

সোনিয়া কথার মুখ অন্যদিকে ঘোরালেন, দেখুন, দেখুন, মেঘ উড়ে গিয়ে ঝকঝক করছে আকাশ।

আমি বললাম, একেই বলে 'নীলে সোনায় বসতি'।

গাড়ি দেরাদুন শহর ছাড়িয়ে রাজপুর রোড ধরল। বেশ কয়েক বছর পরে এলাম এদিকে। এই পথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিলেই মুসৌরি যাবার রাস্তা।

বললাম, আমাদের গন্তব্য কি শৈল শহর মুসৌরি?

সোনিয়া বললেন, ওখানে ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাকে ওয়াটার রিজার্ভারের গায়ে আমার ছোট্ট একটা ডেরা আছে, অতিথির ইচ্ছে হলে ওখানে নিয়ে যেতে পারি।

বললাম, সমস্ত প্রোগ্রামটাই আপনি ছকে রেখেছেন, সুতরাং যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাব।

সোনিয়া বললেন, দু'একদিন রাজপুরের একটা ডেরায় থাকুন, সেখান থেকে এক সময় মুসৌরি ঘুরে আসা যাবে।

সহাস্যে বললাম, উত্তম প্রস্তাব।

সোনিয়া ড্রাইভারকে বললেন, বাঁয়ে পপ্‌লার গাছটার গায়ে যে লোহার গেটটা দেখা যাচ্ছে সেখানে গাড়ি বাঁধুন।

বলতে বলতে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি এসে দাঁড়াল।

আগেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে টাকা চুকিয়ে দেওয়া ছিল। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে কিছু বকশিস দিলেন।

হাসিমুখে বললেন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এক কাপ চা খেয়ে যান।

ড্রাইভার হাত জোড় করে বলল, এখন বসতে পারব না বহিনজী। পুজোর সময় একদম ফুরসুৎ নেই। বহুৎ আদমি আসা যাওয়া করছে। কেদার, বদ্‌রি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী যাবার ধুম পড়ে গেছে। গাড়ি মাঙগা।

ড্রাইভার চলে গেল। আমরা গেটের দিকে ফিরে দাঁড়াতেই দেখি মধ্যবয়সী একটি লোক বাগানের ভেতর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে।

সোনিয়া বললেন, এ বাড়ির কেয়ারটেকার কাম ড্রাইভার লছমন সিং যাদব।

লছমন সিং গেট খুলে অভিবাদন জানিয়ে আমাদের গেটের পাশে রাখা দুটো ব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে হন হন করে বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে বাগানের গাছপালার ভেতর দিয়ে চলতে লাগলাম।

প্রশস্ত বাগান। অনেকদিনের পুরনো সব গাছ বিশাল ডালপালা, পাতাপত্র মেলে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিছু ফুলের গাছ, কিছু লতাপাতায় স্থানটি মনোরম। গাছের পাতাপত্র থেকে পিছলে সূর্যের আলো মাটিতে এসে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় আলপনার ছবি।

হঠাৎ একটা গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন সোনিয়া। ঘন সবুজ পাতায় ছাওয়া দীর্ঘ গাছ। তার তলায় একটি লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বেদি।

আমার দিকে তাকিয়ে সোনিয়া বললেন, এই বেদিতে বসে আমার ঠাকুরদাদা রুদ্রনারায়ণ দূরের শিবালিক পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। তাঁর সময়েই এই বাগানটি এক ইংরেজ

কর্নেল সাহেবের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। অবশ্য উনি বাংলো এবং বাগানের অনেক সংস্কার করেছিলেন। আমার বাবা পরবর্তী সময়ে বাংলো সংলগ্ন একটি গেস্টহাউস তৈরি করিয়েছিলেন।

আমি বললাম, এই শান্ত নির্জন স্থানটি সত্যিই সাধনার অনুকূল।

সোনিয়া হেসে বললেন, আচ্ছা এখন বলুন তো, যে গাছটির তলায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার নাম কি ?

গাছটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও নামের খোঁজ পেলাম না। হেসে বললাম, হার মানছি।

সোনিয়া বললেন, আমি অন্তত দশ-বারো জন অতিথিকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁরা কেউই এর পরিচয় দিতে পারেন নি। তাহলে আপনিও হার মানছেন?

মাথা নিচু করে হার স্বীকার করলাম।

সোনিয়া এবার মজা করলেন, আর একটু মাথা ঘামান না, ক্লু দিয়ে দিচ্ছি। এই যেমন 'সুরভি'তে দেয়।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মুখে মাখানো কৌতুকের হাসি। বললেন, জপের ক্ষেত্রে এ গাছের ফলের ভূমিকা আছে।

উনি চুপ করে গেলেন দেখে আমি গাছের ওপর দিকে একবার তাকালাম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ রঙের কয়েকটা করে ফল দেখা গেল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গাছটির পরিচয় আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেল।

সোনিয়া বললেন, আর আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার গতি ওই অতিথিদের দলে। এ গাছটি রুদ্রাক্ষের।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, রুদ্রাক্ষের আকৃতি এবং রঙ তো এরকম নয়।

সোনিয়া বললেন, এটা ফলের প্রথমাবস্থা। পরিপক্ক হলে ওর থেকে রুদ্রাক্ষ আসল রঙ আর রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে।

আমি বললাম, বানপ্রস্থ আশ্রমের ক্যান্টিনে একটি বয়স্ক লোক বসে থাকেন। একটু ভারীভুরি চেহারা. মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং ময়লা। ওঁর গলায় আমি বড় সবেদার মতো একটি রুদ্রাক্ষ ঝুলতে দেখেছি। তার দু-দিকে দুটো রুপোর চাকতি সাঁটা।

সোনিয়া বললেন, আমিও দেখেছি। রুদ্রাক্ষ ছোট, মাঝারি, বড় তিন রকম আকারেরই হয়। শুনেছি, বড় আকারের রুদ্রাক্ষগুলো ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। আমাদের গাছে ফলে মাঝারি সাইজের রুদ্রাক্ষ। এটাই সাধারণত জপের মালা রূপে ব্যবহার করা হয়। দাদু এই গাছের রুদ্রাক্ষ থেকে মালা তৈরি করে জপে বসতেন।

আমার থাকার জায়গা হলো অতিথি-নিবাসের দোতলায়। চমৎকার সাজানো-গোছানো ঘর, জানালা-দরজায় দামি পরদা ঝুলছে। মেঝেতে সুন্দর নক্শা কাটা কার্পেট বিছানো। সংলগ্ন বাথরুম, ইলেকট্রিকের আলো।

একটি কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন সোনিয়া। নতুন তোয়ালে, সাবান, তেল সবই এনে স্নানঘরে রাখল কিশোরীটি।

সোনিয়া বললেন, গিজার রয়েছে,গরম জল পাবেন। স্নানটা আগে সেরে ফেলুন। আমি আসব বলে কেয়ারটেকারকে আগে-ভাগেই ফোন করে দিয়েছিলাম। তখন জানতাম না আর একজন মেহমানও আমার সঙ্গে আসবেন। আমি ভেজিটেরিয়ান, আপনার জন্যে ননভেজের ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমি বললাম, নিরামিষে আমার বিন্দুমাত্র অরুচি নেই। এক যাত্রায় পৃথক ফল আর কেন, খাবার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই।

আজ দুপুরে আপনার জন্য চিকেনের ব্যবস্থা হয়েছে। ও বেলা থেকে নিরামিষ ভোজনই চলবে।

যথাসময়ে সেই কিশোরী মেয়েটি আমাকে খাবার জন্যে নিচে নিয়ে গেল।

নিচের ঘরে গিয়ে দেখলাম বেশ প্রশস্ত সাজানো ডাইনিং হল। মেহগিনি কাঠের পালিশ করা পায়ার

ওপরে শ্বেতপাথরের বিরাট ওভাল শেপের টেবিল। দামি প্লেটে ধবধবে সাদা দেরাদুন রাইস, পাশের একটি প্লেটে চাপাটি রাখা আছে। পাঁচ-ছটি বাটিতে রান্নার নানারকম আইটেম। আমার ঠিক উল্টোদিকে সোনিয়ার খাবার দেওয়া হয়েছে।

সোনিয়া সিফনের একটি সাদা শাড়ি আর নীল রঙের গরমের ব্লাউজ পরে দরজা ঠেলে ঢুকে এলেন।

শশব্যস্তে বলে উঠলেন, বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

দুজনে মুখোমুখি বসলাম। নানারকম গল্পের ভেতর দিয়ে ভোজনপর্ব শেষ হলো। দুপুরে সামান্য বিশ্রাম। অপরাহ্নে চা এল ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে এলেন সোনিয়া। এ বেলা তিনি নিজের হাতে চা পরিবেশন করলেন।

আমি বললাম, টি-সেটটি আপনার চমৎকার।

সোনিয়া হেসে বললেন, ওগুলো আমার সংগ্রহ। এক বন্ধু জাপান থেকে এনে আমাকে উপহার দিয়েছে।

অপরাহ্নের সূর্য পশ্চিমে নেমে এসেছে। গাছের আড়ালে শেষ সূর্যের ঝিলিক। আমরা দুজনে বাগানের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

গেট দিয়ে পথে বেরিয়ে আসার আগেই সোনিয়া আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

আজ থেকে আমরা বন্ধু, সুতরাং ....

সোনিয়া সামান্য থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, সুতরাং এখন থেকে আমরা পরস্পর নাম ধরে ডাকব এবং আপনি, আজ্ঞেগুলোকে নির্বাসন দেব।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। অসঙ্কোচে সোনিয়া আমার দিকে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

ও বলল, একটু হেঁটে গেলেই ডানদিকে কিষাণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম। এই কিছুদিন আগে চমৎকার একটি মন্দির তৈরি হয়েছে। বহুদিনের আশ্রম। কিন্তু এই বিশাল মন্দিরটি আশ্রমের নতুন সংযোজন। চল, ওখানে সন্ধ্যারতি দেখে আসি।

আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম। অল্প সময়ের ভেতরেই পৌঁছে গেলাম আশ্রমে।

মন্দির দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। আশ্রম জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকারের সব বনস্পতি। তার ঠিক পরেই গম্বুজাকৃতির মন্দিরটি নীল আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পেছনে তরঙ্গিত শিবালিক পর্বতমালা। মাঝে মাঝে কুয়াশার নীলাভ ওড়না উড়ছে। দিনান্তে শিবালিকের আকাশে রঙের খেলা নেই। কিন্তু ভোরের সূর্য রঙের চিত্রপট তুলে ধরে। কয়েকদিন আমরা সে দৃশ্য দেখেছি।

প্রথম সন্ধ্যায় ঘণ্টা ধ্বনি শুনে আমরা আশ্রমের বাঁধানো রাস্তা ধরে মন্দিরে পৌঁছলাম। ধীরে ধীরে প্রশস্ত সোপান বেয়ে উঠলাম মন্দিরদ্বারে। বিরাট হলঘরের দুদিকে লম্বা কার্পেট পাতা। হলের শেষ প্রান্তে ভক্তদের দিকে মুখ করে বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্বেতপাথরের মনোহারী উপবিষ্ট মূর্তি। ঠাকুরঘরের দরজার ওপরে কাঠের প্যানেল। তার খোপে খোপে বিভিন্ন ধর্মের সিম্বল খোদাই করা আছে। সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের উদ্গাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবনার প্রতীকচিহ্ন এই চিত্রগুলি।

শুরু হলো প্রার্থনা-সঙ্গীত ও আরতি। সাধুদের কণ্ঠে প্রার্থনাগীত বৈদিক মন্ত্রধ্বনির মতো উচ্চারিত হচ্ছিল। ব্রহ্মচারী মহারাজের আরাত্রিকের ছন্দমাধুর্যে মন ভরে ওঠে।

একদিকে মহিলাদের আসন, অন্যদিকে পুরুষদের। আরতিশেষে কথামৃত থেকে পাঠ করলেন এক মহারাজ। তার পর একে একে কয়েকজন মহারাজ ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন। সমস্ত পরিবেশটি পূর্ণ হয়ে উঠল প্রার্থনার ভাবে।

মন্দিব বন্ধ হওয়ার আগে ভক্তরা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এখানে কয়েকদিন রইলাম আশ্রমের দুর্গোৎসব দেখার জন্য। সোনিয়াই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল কয়েকটা দিন বেশি থেকে যেতে।

একদিন খাবার টেবিলে বসে বলল, ফেরার কি খুব তাড়া?

হেসে বললাম, গৃহস্বামিনী যদি অতিথিকে কিছু অনুগ্রহ করেন তাহলে সাগ্রহে সে থেকে যেতে পারে।

চাপা হাসি হেসে সোনিয়া বলল, কি রকম অনুগ্রহ?

আমি বললাম, তুমিই বলো লেখকের প্রার্থনা কি হতে পারে?

দেখলাম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী সোনিয়া।

সে বলল, ডাক্তারের প্রার্থনা রোগীর আরোগ্য আর লেখকের প্রার্থনা পাঠকের চিত্তহারী একটি প্লট।

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

হাসলে যে?

জানতাম তুমি বুদ্ধিমতী কিন্তু এত বড় মনোবিজ্ঞানী তা জানতাম না।

আগে বলো, আমার কাছে যে তুমি গল্পের কাহিনী পাবে এ কথা ভাবলে কি করে?

বললাম, তুমি আমার বন্ধু, অকুণ্ঠে একটা কথা বলতে পারি কি ?

স্বচ্ছন্দে।

তোমাকে প্রথম যেদিন সন্ধ্যায় পরমার্থনিকেতনের ঘাটে সৌম্য পুরোহিতটির মুখোমুখি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেদিনই মনে হয়েছিল তোমার ভেতর গল্পের প্লট আছে।

সোনিয়া সবিস্ময়ে বলল, আশ্চর্য তোমার অন্তর্দৃষ্টি !

বললাম, এবার তাহলে অতিথি অনুগ্রহ পেতে পারে?

তিনদিন পুজোর শেষে বিজয়ার ভাসান হবে ঋষ্পর্ণা (ঋষি অপর্ণা) নদীতে। বিসর্জন শেষ হলে সেই রাতেই আমি তোমাকে আমার জীবনের কথা শোনাব।

আমি আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। সন্ধানী চোখ মেলে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

সোনিয়া বলল, চুপচাপ বসে রইলে কেন? খাবার যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তিনদিন আশ্রমের পুজোয় যোগ দিয়ে বড় আনন্দে কাটল। দুদিন ধরে দু-তিন হাজার মানুষ প্রসাদ পেলেন। অধ্যক্ষ মহারাজ নিজে ঘুরে ঘুরে তদারকি করলেন। আমরা দুদিন মহানন্দে পঙ্‌ক্তিতে বসে দেবীর প্রসাদ পেলাম।

বিসর্জনের দিন আমরা প্রসেশানের সামিল হলাম। পটচিত্রে পুজো হয়, তাই পটটি রেখে ঘটই বিসর্জন হয়। ঘট নিয়ে অনেকখানি উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে আমরা একসময় ঋষ্পর্ণা নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম।

বর্ষার জলে পুষ্ট নদী কূলপ্লাবিনী। এখন নদী বইছে কয়েকটি ধারায়। এপারে বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ বাগান ও বসতি। রাজপথ ধরে গাড়ির আনাগোনা। ওপারে ছোটবড় পর্বতশ্রেণী, শ্যামল অরণ্যে আচ্ছাদিত। দূরে পর্বতের কোলে বনভূমির মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি কোঠা বাড়ি ও একটি সুউচ্চ অট্টালিকা। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বনের ভেতর দিয়ে কোথাও পথ আছে নিশ্চয়। মাঝে মাঝে গোলাকার মরাই-এর মতো দু'একটি বাড়ি দেখা গেল। চালা থেকে গোলাকৃতিদেওয়ালের যতটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে, সবটাই ধবধবে সাদা রঙে ঢাকা।

বিসর্জনের পরে সমবেত জনতার গায়ে জলসিঞ্চন করল উৎসাহীরা। এরপর দলে দলে সবাই চড়াই ভেঙে চলে গেল যে যার আস্তানায়।

সোনিয়ার ইঙ্গিতে আমি জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সবাই চোখের আড়ালে চলে গেলে আমরা নুড়ি বিছানো নদীখাতের ওপর দিয়ে, কোথাও বা জলস্রোত কাটিয়ে প্রায় নদীর মাঝবরাবর এসে পৌঁছলাম।

একটি মসৃণ শিলাস্তূপকে বেষ্টন করে স্রোতধারা শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিল।

সোনিয়া বলল, চল, ওর ওপরে উঠে বসি। ওর গায়ের ভাঙা খাঁজে খাঁজে পা রেখে দিব্যি ওঠা যাবে।

আমরা একসময় স্তূপের উপর উঠে বসলাম। এখন চারদিকের দৃশ্য বড় মনোরম হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমিই কথা শুরু করলাম, তোমার জন্মস্থানটা কোথায় সোনিয়া? ঐ বাংলো বাড়িতে তোমার মা-বাবার ফটো দেখেছি। তোমার দাদুও ধ্যান করতেন রুদ্রাক্ষ গাছের তলায় বাঁধানো বেদিতে বসে। তাই মনে হয় কাছেপিঠে কোথাও তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ। অবশ্য সবটাই আমার অনুমান।

সোনিয়া বলল, সঠিক তোমার অনুমান। ঐ বাংলোতে আমার জন্ম না হলেও এই অঞ্চলেই আমি জন্মেছি।

কথাটা শেষ করেই নদীর স্রোতের দিকে কিছুসময় চেয়ে রইল ও। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করে ওর নীরবতাকে ভাঙতে চাইলাম না।

একসময় চোখ তুলল সোনিয়া। বলল, ঐ দূরে শিবালিক পর্বতমালা দেখতে পাচ্ছ?

তোমার বাংলোর দোতলা থেকে রোজই ভোরে শিবালিকের ওপর সূর্যোদয় দেখি।

সোনিয়া বলল, এখন ঐ পাহাড়ের কোলে বনের সবুজ শোভা দেখতে পাচ্ছ কি?

আমি বললাম, সে বন তো এই নদীর কূল বরাবর চলে এসেছে।

এখন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে বন, সেদিকে একবার তাকাও।

আমি ওর কথামতো সেদিকে তাকালাম।

ও আবার প্রশ্ন করল, বন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে?

দু'একটা বাড়ি বনের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঐ বাড়িগুলো একসময় এক ব্রাহ্মণ জমিদারের ছিল। পাহাড়ী প্রজারা তাদের জমিদারকে রাজার সম্মান দিত। জমিদার-গৃহিণীকে বলত রানীমা।

আমি জানতে চাইলাম, ঐ অঞ্চলের কোনো একটা নাম আছে নিশ্চয়?

ঐ অঞ্চলটিকে লোকে বলে দ্রোণগ্রাম।

আমি বললাম, দ্রোণাচার্যের গ্রাম নাকি?

সোনিয়া উৎসাহিত হয়ে বলল, লোকের অনুমান তাই। একসময় রাজা দ্রুপদের রাজসভা থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু দ্রোণ। পরে পঞ্চপাণ্ডব যখন তাঁদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন, তখন দ্রোণাচার্য রাজা দ্রুপদকে বেঁধে আনতে বললেন। দ্রুপদ বন্দী হয়ে এলেন এবং মুক্তিপণ হিসেবে দ্রোণকে দিলেন তাঁর রাজ্যের কিছু অংশ। এই অঞ্চলটি নাকি আচার্য দ্রোণ রাজা দ্রুপদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সেই থেকে এ অঞ্চলটির নাম হয় দ্রোণগ্রাম।

বললাম, এ তো মহাভারতের যুগের কাহিনী। তারপর বহু যুগ চলে গেছে। নতুন নতুন বহু মানুষের আবির্ভাব আর তিরোধান হয়েছে। তারা লুপ্ত হয়ে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। কিন্তু দ্রোণগ্রামটি জেগে আছে সেই মহাভারতের যুগ থেকে। আর তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিবালিক পর্বত, এই অরণ্যভূমি আর দ্রোণগ্রাম ছুঁয়ে বয়ে চলা ঋষ্পর্ণা নদী।

ঐ গ্রামই আমার জন্মস্থান রঞ্জন।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, তাই!

ঐ যে উঁচু টিলাটা দেখছ, ওরতলার একটা বাড়িতে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম।

তুমি কি ওখানকার জমিদার পরিবারের কন্যা?

আমার ঠাকুর্দার বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ, ঠাকুর্দা রুদ্রনারায়ণ আর আমার বাবা অনন্তনারায়ণ অগ্নিহোত্রী ঐ দ্রোণগ্রামের জমিদার ছিলেন।

তাঁদের কোনো উত্তরাধিকারী ওখানে এখন আছেন কি?

সোনিয়া নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তাঁদের বংশধর এই একমাত্র কন্যাটি এখন বর্তমান। তাঁদের স্থাবর, অস্থাবর সব কিছুরই উত্তরাধিকারিণী।

আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম, তুমি এখনও নিশ্চয়ই ঐ দ্রোণগ্রামের বাড়িতে যাতায়াত কর?

সোনিয়া বলল, একেবারেই নয়।

কেন তা জানতে পারি কি ? অবশ্য বলতে যদি কোনো বাধা না থাকে।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, বলতে বাধা থাকবে কেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হলো। আমরা কমপেনসেশানের মোটা টাকা পেয়ে দ্রোণগ্রামের সম্পত্তি সরকারকে ছেড়ে দিলাম। এখন ঐ বাড়িতে সরকারি অফিস হয়েছে। একটা নাকি সংগ্রহশালা করার পরিকল্পনা আছে সরকারের।

তুমি কেবল এই রাজপুর রোডের বাংলোটাই রেখে দিয়েছ, তাইতো?

সোনিয়ার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, লক্ষ্ণৌতে একটা বাড়ি আর নিউ দিল্লিতে একটা ফ্ল্যাট আছে। বাড়িটা আমার বাবা কিনেছিলেন এক মুসলিম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। অত্যন্ত শৌখিন মানুষ ছিলেন সেই মুসলিম ভদ্রলোক। ছোটখাটো একটা শখের প্যালেস তৈরি করেছিলেন তিনি।

একটু থামল সোনিয়া। মাথাটা কাৎ করে উদাস চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ।

আমার মনে হলো, সোনিয়া ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে। আগেও দেখেছি, কথা বলতে বলতে ও মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। আবার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন মৃদু লজ্জার আবিরে রাঙা হয়ে ওঠে মুখ।

কথা বলে আমি ওর সাময়িক মগ্নতাকে ভাঙলাম না।

একসময় ও স্বাভাবিক হলো। সলজ্জ মৃদু হাসি হেসে তাকাল আমার দিকে।

এবার আমিই প্রশ্ন করলাম, উনি বিত্তবান ব্যবসায়ী মানুষ হয়েও শখের প্রাসাদ বিক্রি করলেন কেন?

হঠাৎ চাচা আশরাফ্ আলির ব্যবসায়ে মন্দা পড়ল। পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে পারছিলেন না তিনি। অত্যন্ত সৎ ও সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে শহরে সুনাম ছিল তাঁর। ঋণশোধের জন্য প্রাসাদোপম বাড়িখানা বিক্রি করে দিলেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর আশরাফ্ আলি সাহেবের কোনো খোঁজ রেখেছিলে?

যখন বাড়ি কেনা হয় তখন আমি ছিলাম খুবই ছোট। একটু বড় হয়ে শুনেছিলাম, চাচাজিকে বাবা নাকি ঐ বাড়িতেই থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজী হননি। যে বাড়ির মালিক ছিলেন একদিন, সেখানে মালিকানা হারিয়ে অন্যের বদান্যতায় থাকবেন কি করে তিনি?

ওঁরা কি লক্ষ্ণৌতে ছিলেন?

আমি বড় হয়ে যখন লক্ষ্ণৌতে পড়াশোনা আর নাচ শেখার জন্যে গেলাম তখন আশরাফ্ আলি গত হয়েছেন। আমি তাঁর শহরতলির বাড়িতে গিয়েছিলাম অনেক খোঁজ করে। একেবারে পড়ো জীর্ণ ছোট্ট একখানা বাড়িতে তাঁর একমাত্র ছেলে সংসার সাজিয়ে কোনো রকমে কষ্টে-দুঃখে কাল কাটাচ্ছিলেন। তাঁকেও আমি বাড়িটি নামমাত্র দামে বেচে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঐটুকু অর্থ দেওয়ার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। আমি বেশ বুঝেছিলাম, দরিদ্র হলেও বাবার মতো আত্মসম্মানবোধ ছিল আশরাফ্ আলির ছেলের। তাঁকে বিনি পয়সায় বাড়িখানা ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দিলে তিনি অসম্মানিত বোধ করতেন এবং ভীষণ আহত হতেন। তাই আর অনুরোধ-উপরোধ না করে বেরিয়ে এলাম পথে।

দু'চার পা এগিয়েছি, একটি বছর বারোর মেয়ে দৌড়ে এসে আমার পথ আটকাল।

আপনাকে আম্‌মা ডাকছে।

এত নির্মল সুন্দর মুখশ্রী আমি খুব কম দেখেছি রঞ্জন।

কি নাম তোমার?

বড় বড় দুটো চোখ তুলে ও বলল, নিশাত্।

আমি নিশাতের মানেটা জানতাম। নিশাত্ মানে আনন্দ। নির্মলতার যে আনন্দ সেটা ওর চোখে-মুখে মাখানো। সার্থক নাম।

বললাম, চল তোমার আম্মার কাছে যাই।

এবার অন্দরমহলে ঢুকলাম।

ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমাকে দেখে সেলাম করলেন। আমি নত হয়ে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম। উনি বললেন, মুখে কিছু না দিয়ে চলে যাবেন! আমরা দরিদ্র, কিন্তু শুধুমুখে এ বাড়ি থেকে কেউ ফিরে যান না। আপনি দয়া করে এখানে একটু বসুন।

আমি একটা ছেঁড়া পুরনো জাজিমের ওপর বসলাম। নিশাত্ কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি কিন্তু ওর মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

একটু পরেই নিশাত্ ঢুকল ঘরের ভেতর, হাতে তার ধবধবে সাদা একটা প্লেট। তাতে দেখলাম, সিমুইয়ের পায়েস, ওপরে দু-চারটে কিসমিশ ছড়ানো। ওর মা পেছনে এলেন জলের গ্লাস হাতে।

ততক্ষণে আমি নিশাত্কে জড়িয়ে ধরে আমার পাশে বসিয়েছি। সে কিন্তু পালিয়ে যাবার জন্য কোনওরকম ছটফট করছে না, আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম, আমাকে পছন্দ হয়েছে ওর।

নিশাতের মা বললেন, আপনি এটুকু পায়েস খেলে আমরা বড় তৃপ্তি পাব।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই খাব, কিন্তু তার আগে একটা জিনিস চেয়ে নেব আপনার কাছ থেকে। দেবেন কি ?

ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে বিস্ময়, বলুন কি দেব?

হেসে বললাম, একটা কথা দিতে হবে।

কি কথা?

আগে বলুন, আমার কথাটা রাখবেন?

বেশ।

নিশাতকে আমার খুব ভাল লেগেছে; আমি যদি ওকে কিছু দিই তাহলে আপনারা আপত্তি করবেন না তো!

আপনি যে ওকে ভালবেসেছেন, এটাই যথেষ্ট, তবু যদি কিছু দিতে চান আমরা কেন বাধা দেব? এ তো ভালবাসার উপহার।

আমি বললাম, উপহারটা পরে একদিন এসে দিয়ে যাব। এখন শুধু আপনার সম্মতিটুকু নিয়ে গেলাম।

এখন তাহলে পায়েসটুকু খান।

আমি নিশাতকে জড়িয়ে ধরে এক চামচ পায়েস ওর মুখে দিয়ে দিলাম।

নিশাতের মা বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান আর একটা চামচ আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি।

বললাম, কিচ্ছু দরকার নেই, এই তো চামচ রয়েছে, বলেই আমি ওই চামচে পায়েস তুলে খেতে লাগলাম।

দেখলাম, নিশাতের মা তাঁর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারছেন না, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

কয়েকদিন পরে আমি আবার গেলাম ওঁদের বাড়ি। নিশাতের বাবা আবিদ আলি আমাকে স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। উনি নিশাতের নাম ধরে কয়েকবার ডাক দিলেন।

দেখে যা কে এসেছেন!

নিশাত্ ছুটে এসে আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। আমিও নিশাত্কে কাছে পেয়ে অনেক আদর করলাম। ঘরের ভেতর থেকে নিশাতের মা আমাকে অন্দরে ডেকে নিলেন।

পাশে বসিয়ে অনেক গল্প করে তিনি একসময় বললেন, সেদিন আপনি খাওয়ার সময় যে কাণ্ড করলেন, আজ আর আপনাকে আমি পায়েস দেব না, মেওয়া খাওয়াব।

যা দেবেন, তাই খাব, কিন্তু আমার কথাটা মনে আছে তো?

নিশাতের মা হেসে বললেন, উপহার না দিয়ে খাবেন না বুঝি ?

সেরকমই তো কথা ছিল।

বেশ, যা দেবার নিশাতকে দিন। আমি ভেতর থেকে আপনার জন্যে মেওয়া নিয়ে আসছি।

উনি ভেতরে চলে গেলে আমার মায়ের অতি মূল্যবান গয়নার একটি সুন্দর কাজ করা বাক্স আমি নিশাতের হাতে তুলে দিলাম। বাক্সটি বন্ধ ছিল।

নিশাত্ বলল, এতে কি আছে?

এটা একটা যাদু-বাক্স। আমি চলে যাবার পর চাবি দিয়ে এর ডালাটি খুলবে, তা হলেই দেখতে পাবে যাদুকরের খেলা।

খুব মজা হবে, তাই না?

খু-উ-ব।

মেওয়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন নিশাতের মা। প্লেটটি আমার সামনে রেখে দিতেই আমি তাঁর হাতে বাক্সের চাবিটি তুলে দিয়ে বললাম, উপহারের বাক্সটা নিশাতকে দিয়েছি, চাবিটা রইল আপনার কাছে।

আমি চুনির দানার মতো ডালিমের কয়েকটা দানা হাতে তুলে নিলাম।

উনি বললেন, কি আছে ওই বাক্সের ভেতর?

ওর জন্যে কিছু উপহার। দয়া করে আমার যাওয়ার পরে ওকে খুলে দেখাবেন। ওর কৌতূহলটা আর একটু বাড়ুক।

উনি আর কিছু প্রশ্ন করলেন না। আমি চলে আসার সময় আবিদ আলি ও তাঁর বিবিসাহেবা আমাকে আবার আসতে বললেন। নিশাত্ তো আমাকে ছাড়তেই চায় না। অনেক কষ্টে তার হাতের বাঁধন কাটিয়ে আমাকে সেদিন বাড়ি ফিরতে হয়েছিল।

সোনিয়াকে বললাম, সত্যি তুমি দারুণ একটা কাজ করলে।

রঞ্জন, সেদিন আমি ওই উপহারটুকু দিয়ে মনে মনে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম। ওই উপহারের বাক্সের ভেতর ছোট একটা চিরকুটও দিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, নিশাতের সাদির উপহার।

একদিন পরেই ওই বাক্স হাতে আবিদ আলির আবির্ভাব।

আমি তাঁকে আপ্যায়ন করে ভেতরে নিয়ে গেলাম। বললাম, আজ আমার মনে হচ্ছে, বহুদিন পরে আমার প্রবাসী দাদা নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন।

আবিদ আলির চোখ ছলছলিয়ে উঠল। তিনি বললেন, তুমি আমার মায়ের পেটের বহিন আছো, তাই এমন কথা বললে।

আমি সেই সুযোগে বললাম, আপনি কিন্তু আমাকে পর বলেই ভাবছেন।

এ কথা কেন বহিন?

তা হলে সঙ্গে ওই বাক্সটা আর আনতেন না। আমি আমার দাদার মেয়েকে ওটা উপহার দিয়েছি। সে অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।

আশ্চর্য! আবিদ আলির চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি দু-হাতের অঞ্জলিতে বাক্সটাকে তুলে ধরে বললেন, এ আমার বহিনের হাত দিয়ে আল্লার দান।

আমি জানতে চাইলাম, আবিদ আলি কি এখনও বেঁচে আছেন?

খবর পেয়েছি গতবছর তিনি মারা গেছেন।

তাঁর মেয়ের সাদিতে কি তুমি গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, আমার মায়ের মূল্যবান গয়নাতে ওকে বেহেস্তের হুরীর মত সাজিয়ে দিয়েছিলাম।

বেশ খানিক সময় চুপ করে রইল সোনিয়া। একসময় মুখ তুলে বলল, আমি চলে গেলে আমার বাড়ি আর ফ্ল্যাটের কি অবস্থা হবে তা ভেবেই পাচ্ছি না।

একবার ভেবেছিলাম, আর মায়া কেন, দুটোই বিক্রি করে দেব। তারপর ভাবলাম, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই দুটো আস্তানার ভেতর। বিশেষ করে লক্ষ্ণৌর ওই বাড়িতে। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ

নাটকের অভিনয় হয়েছিল ওখানে। আমার দুই বন্ধু আর আমি সেই নাটকে ছিলাম কুশীলব।

আমি অমনি বললাম, তোমার নাটক শোনার জন্য আমি কিন্তু উদগ্রীব হয়ে উঠেছি।

সোনিয়া বলল, তাকিয়ে দেখ, পশ্চিমে সূর্য ডুবছে, এখন আমাদের ঘরে ফেরার পালা।

চল যাই, তবে তোমার কাহিনী শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রইল আমার মন।

সোনিয়া বলল, আমাদের তিন বন্ধুর কাহিনী শোনার আগে তোমাকে আর একটা ছোট্ট ঘটনা শুনতে হবে। যাকে আমি এতদিন আমার বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি, ঝড়ের ঝাপটায় আমার রক্তকে যে ঘটনা তোলপাড় করে দিয়ে যায়।

আমরা দুজনে এরপর নদীর স্রোতে পা ফেলতে ফেলতে ওপারে গিয়ে উঠলাম। তারপর চড়াই ভেঙে যখন বাংলোতে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার বাতি জ্বলে গেছে।

সোনিয়া আজ আর আমাকে গেস্ট হাউসের দিকে নিয়ে গেল না। সে বলল, আজ আমার ঘরেই তোমার চায়ের ব্যবস্থা হবে। আমি আজ নিজের হাতেই গেস্টকে চা করে খাওয়াব।

বললাম, আগে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

কিসের ফয়সালা?

আমি তোমার অতিথি না বন্ধু ?

বুদ্ধিতে ঝকঝক করছে সোনিয়া। হেসে উঠল সন্ধ্যার বাতাস কাঁপিয়ে। দুটো হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার ক্ষণিকের অতিথি নও, তুমি আমার সেই বন্ধু যার কাছে অসংকোচে অন্তর উজাড় করে দেওয়া যায়।

তাহলে আজ সন্ধ্যার সোনালী চায়ে আমাদের বন্ধুত্ব স্মরণীয় হোক।

ও আমার একটা হাত ধরে রইল। ঐ অবস্থায় আমরা সিঁড়ি ভেঙে ওর উপরের ঘরে উঠে গেলাম।

প্রশস্ত সাজানো ঘর। অর্ধেক মেঝে জুড়ে টুকটুকে লাল কার্পেটের ওপর পার্সিয়ান ডিজাইন। বাকি অর্ধেক ঝকঝকে সাদা অনাবৃত শ্বেতপাথর। কোণে একটি গাঢ় সবুজ পাথরের অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবল। সাদা পোর্সিলিনের একটি ফুলের টব বসানো তার ওপর। কিছু হলুদ ফুলের সঙ্গে সবুজ পাতার মাঝে একগুচ্ছ লাল রক্তকরবী মাথা তুলে আছে।

দরজায় ঝুলছে ভারী পর্দা। গোলাপী আভার কাপড়ে সোনালী লতার কাজ। জানালাতেও সেই কাপড়ের পর্দা, দুই প্রান্তে সাদা ফ্রিল।

একটি জানালার ধারে সোফা কাম বেড। প্লাস্টিক বাফ কালারের দেওয়ালে সাঁটা লম্বা একটা অয়েল পেইন্টিং। গ্রিন ফরেস্টের ফাঁকে ফাঁকে ছুটছে একপাল কৃষ্ণসার মৃগ। ছবিটায় চোখ আটকে যায়।

আমি ঘুরে ঘুরে সোনিয়ার শয়নগৃহ দেখছিলাম আর তারিফ করছিলাম মনে মনে, সেই ফাঁকে কখন সোনিয়া বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

ও ফিরে এলো একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম আর কিছু স্ন্যাক্‌স নিয়ে।

সোফার পাশে ছিল শ্বেতপাথরের একটা টেবল। সোনিয়া তার ওপর ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল, এমনিতেই বৈকালিক চায়ের সময় পেরিয়ে গেছে, এসো গলাটা একটু গরম জলে ভিজিয়ে নিই।

সোফায় পাশাপাশি বসে ওর শয়নকক্ষটির তারিফ করলাম। এমন একখানা বড় ঘরে যে অজস্র কিউরিও আর খাট-পালঙ্ক জড়ো করেনি, সেজন্যে ওকে অনেক সাধুবাদ দিলাম।

ও বলল, সৌন্দর্যের প্রথম শিক্ষা হলো, পরিমাণ-বোধ। অনেক সুন্দর জিনিস একসঙ্গে দেখতে গিয়ে চোখ পীড়িত হলো, সে দেখায় তৃপ্তি নেই। খাওয়ার ব্যাপারেও তাই। অনেক পদ জড়ো হলে কোনো পদটাকেই তারিয়ে খাওয়া যায় না।

আরও দু'একটা কথার পর দেওয়ালের চমৎকার অয়েল পেইন্টিংটার কথা তুললাম।

ও বলল, ওটা আমার এক বন্ধুর আঁকা।

আমি কৌতুক করে বললাম, কি রকম বন্ধু ?

'সে কথা এখন নয়, কহিলা সুন্দরী'।

বললাম, ইনি নিশ্চয় তোমাদের থ্রি কমরেডস-এর একজন?

সোনিয়া বলল, আমার অনুমানের চেয়েও প্রখর বুদ্ধি তোমার।

বললাম, এ বুদ্ধির ব্যাপার নয় সোনিয়া, অনুভবের প্রকাশ।

আমার কথা শুনে ও তারিফের চোখে আমার দিকে তাকাল। তিরতির করে কাঁপছিল ওর খুশিতে ভরা চোখ।

কিছুক্ষণ আমরা নীরবে বসে থেকে দুজনে দুজনকে অনুভব করলাম।

এবার সোনিয়াই প্রথম কথা বলল, দীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর একটা আয়োজন করতে হয়। আমাদের তিনবন্ধুর কথা বলার আগে আর একটা প্রাথমিক ঘটনা বলে নিতে চাই, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে আমার জন্মদাত্রী। এ ঘটনাটি জানে আর একজন মাত্র, সে আজও জীবিত।

আমি বললাম, তুমি তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে ঘটনাটি বলনি?

না, একমাত্র তোমার কাছেই আজ ঘটনাটি বলার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছি।

হেসে বললাম, আমার ওপর অশেষ অনুগ্রহ তোমার।

সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া বলল, তুমি আমার লেখক-বন্ধু, তাই তোমার সৃষ্টির ভেতরে আমার দুঃখটুকু সঞ্চিত থাকবে, এই আশায় তোমার কাছেই আমার গোপন বেদনার খবর দিয়ে যেতে চাই।

তার আগে আমার একটা কৌতূহল চরিতার্থ করবে কি?

কি সে কৌতূহল রঞ্জন?

বললাম, যা বেশ কয়েকটা দিন ধরে আমার সন্ধানী মনকে আলোড়িত করেছে।

আমাকে অসংকোচে সবকিছু খুলে বল রঞ্জন।

বললাম, গঙ্গার ঘাটে যে সৌম্য পুরোহিতটির কাছে গিয়ে তুমি সন্ধ্যারতির আগে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, তাঁর সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই।

সোনিয়া বলল, খুবই স্বাভাবিক। সে কৌতূহল একসময় তোমার মিটবে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে জড়িত আমার আর একটি প্রশ্ন আছে।

একই সঙ্গে কয়েকদিন আমাদের দুজনকেই তুমি কেন গঙ্গার ঘাটে দেখতে পাওনি, সেই প্রশ্নটাই তুলতে চাও তো?

মাথা নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। বিস্ময়ে তখন আমার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এত সূক্ষ্ম বোধশক্তি ওর।

সোনিয়া বলল, সবই জানতে পারবে, কোনোকিছু গোপন থাকবে না।

বললাম, তাহলে তোমার প্রথম কাহিনীটাই শুরু হোক। অবশ্য যাকে তুমি সংক্ষিপ্ত ঘটনা বলেই বলতে চাও।

ও এবার শুরু করল ওর ব্যক্তিগত জীবনের কথা।

মায়ের মুখ আমার মনে পড়ে না। যতবার সেই জন্মদাত্রীর মুখ আমি কল্পনায় আনতে চাই, ততবারই আর একখানা মুখ ভেসে ওঠে আমার চোখের ওপর। সে মুখ আমার ধাত্রীমাতার। আমি শুয়ে আছি। আমার চোখ দুটি স্থির হয়ে আছে তার দুটি চোখের তারায়। আমি সেই চোখের যাদুতে এমন আটকে পড়েছি যে কোনোদিকে একটুও নড়তে পারছি না। কি মধু যে সেই চোখে মাখানো ছিল তা আজ আর বলে বোঝাতে পারব না।

আমার যখন এক বছর মাত্র বয়েস তখনই আমার মা এক জ্যোৎস্না রাতে নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যান। তারপর থেকে আমি ধাইমাকেই মা বলে জানি।

আমি জানতে চাইলাম, তোমার ধাইমার সংসার ছিল না? সেখানে তাঁকে যেতে হতো না?

তোমার দুটো প্রশ্নের জবাবই হবে একটি, না। তবে....

সোনিয়া 'তবে' বলে বসে রইল দেখে আমি বললাম, এবার বাক্যটা শেষ হোক।

কেমন করে তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাব তাই ভাবছিলাম।

হেসে বললাম, ভেবে কিছু কিনারা পেলে না বুঝি ?

আচ্ছা, তবে সবটাই শোন। আমার ধাইমা অহল্যাবাঈ ছিলেন রাজপুতনার যোধপুরের মেয়ে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী মারা গেল দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই। অমনি শুরু হয়েঁ গেল শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন। যে ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়। শাশুড়ির বুক চাপড়ে আক্ষেপ, রাক্ষুসী আমার সোনার চাঁদ ছেলেটাকে গিলে খেয়েছে।

কিশোরী মেয়েটার দুঃখ কেউ বোঝে না, তার বুকভরা বোবা কান্না কেউ শুনতে পায় না। প্রতি কাজ, প্রতি কথায় কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সংসারের সব শুভ কাজেই সে অচ্ছুৎ।

এই রূঢ় অবস্থার হাত থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

সুযোগ এসে গেল। তখন সে পূর্ণ যুবতী। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে সে এল হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখতে।

সে বছর ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে বহু তীর্থযাত্রী মারা যান।

আমার মা সে বছর দ্রোণগ্রাম থেকে কুম্ভমেলায় গিয়েছিল। অত্যন্ত সাহসী ছিল আমার মা। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন পরিচারিকার সঙ্গে গিয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুদৃশ্য দেখার জন্য। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে দেখছিল শবের স্তূপ। আরও কত মানুষ খুঁজছিলেন তাঁদের হারানো আত্মীয়-স্বজনকে।

সেখান থেকেই মা তুলে নিয়ে আসে অর্ধমৃত অহল্যাবাঈকে। অনেক সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে আমার ধাইমা। তারপর মাকে ছেড়ে আর ফিরে যেতে চায়নি তার নরকের চেয়েও ভয়ঙ্কর আস্তানায়।

আমার ধাইমা অহল্যাবাঈ মায়ের সমবয়সী ছিল। তাই পরিচারিকা না ভেবে তাকে নিজের সখির মর্যাদা দিয়েছিল মা।

এই ঘটনার দু'বছর পরে আমার জন্ম হয়।

আমার জন্মের কয়েক বছর আগে মা একবার কঠিন অসুখে পড়ে। উদ্ভ্রান্ত বাবা মার চিকিৎসার নানারকম ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু কোনোরকম সুরাহা হল না। এই সময় দেরাদুনে গিয়ে এক বন্ধুর কাছ থেকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত এক বিদেশী ডাক্তারের খোঁজ পেলেন। ডাক্তার ইটালির অধিবাসী, নাম পাওলো।

ডাক্তার আমাদের বাড়ি এলেন। এবার তাঁর হাতেই শুরু হলো মায়ের চিকিৎসা। আশ্চর্য! ডাক্তারের চিকিৎসায় মাস তিনেকের ভেতরেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল আমার মা। সেই থেকে ডাক্তার হয়ে গেলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

দুজনে শিকারে যান, কখনও বা মাকে নিয়ে আমাদের মুসৌরির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

ডাক্তারের ওপর আমার মায়ের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। বাবা জমিদারির কাজে বেরিয়ে গেলে যখন-সখনও ডাক্তার আমাদের বাড়িতে এসে পড়তেন। তখন অসঙ্কোচে মায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ চলত। বাবার মত মায়ের সঙ্গেও ডাক্তারের ছিল বন্ধুর মতো ব্যবহার। আমি আমার ধাত্রীমায়ের কাছ থেকে বড় হয়ে এসব কথা শুনেছিলাম।

আমার জন্মের সময় ডাঃ পাওলো উপস্থিত ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমি ভূমিষ্ঠ হই। এসব ব্যাপারে বাবার কোন সংস্কার ছিল না। আমার জন্মের পর ডাক্তার নাকি খুবই আনন্দ করেছিলেন। শহর থেকে অনেক নতুন নতুন খেলনা নিয়ে মায়ের ঘরে জড়ো করেছিলেন।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, তোমার মায়ের জলে ডুবে মারা যাওয়াটাকি দুর্ঘটনা?

সোনিয়া খানিকটা বিস্ময়ের চোখ মেলে বলল, এ প্রশ্ন হঠাৎ তোমার মনে জাগল কেন রঞ্জন?

আমি কোন কিছু ভেবে বলিনি সোনিয়া, এমনি মনের ওপর ভেসে উঠল, তাই বললাম।

সোনিয়া বলল, এ প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল, কিন্তু আমি তার কোন সদুত্তর পাইনি।

অমি বললাম, কোন কিছু না ভেবেই আমি দুর্ঘটনা কিনা জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার মনে তো কোন সংশয় থাকার কথা নয়।

সংশয়ের কারণ আছে রঞ্জন। মায়ের মৃত্যুর পর নাকি তার দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

তোমার ধাত্রীমা এ সম্বন্ধে কি বলেন?

বড় হয়ে তাকে অনেক প্রশ্ন করে এটুকু জানতে পেরেছিলাম, বাবার ওপর অভিমানে মা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

আমার ধৃষ্টতা মাপ কর সোনিয়া, মায়ের অভিমানের কারণটা কি তুমি জানতে পেরেছ?

আমার ধাত্রীমাটি বড় চাপা স্বভাবের রঞ্জন। বেশি কিছু বলতে চায় না। তবে অনেকবার অনেক বলা কওয়ার পরে তার মুখ থেকেই শুনেছিলাম, বাবা দ্রোণগ্রাম ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য শিকারে বেরিয়েছিলেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা যেতে চায়নি, এই নিয়ে বচসা। হয়ত সেই অভিমাণে মায়ের আত্মহত্যা। তারপর বাবা নাকি ফিরে এসে বহুদূর পর্যন্ত নদীতীরে খোঁজ করেও সামান্যতম চিহ্ন খুঁজে পাননি।

বিষয়টাকে আমার রহস্যাবৃত বলেই মনে হল। কেন জানিনা আরও মনে হল, এ রহস্যের সমাধান কেবল সোনিয়ার ধাত্রীমাই করতে পারে। প্রাণরক্ষা যিনি করেছিলেন একসময়, তাঁর সম্বন্ধে গোপন কথা কিছু জানা থাকলেও কৃতজ্ঞ বুদ্ধিমতী অহল্যামাঈ তা কোনভাবেই প্রকাশ করতে চায়নি। অবশ্য এসবই আমার অনুমানমাত্র।

হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে আমার কাছে একটা সুযোগ এসে গেল। পারিবারিক কোন জরুরী পরামর্শের জন্য পরের দিন ভোরবেলা দেরাদুনে উকিলের বাড়ি বেরিয়ে গেল সোনিয়া। আমার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে বলে গেল, ফিরতে খানিকটা রাতও হয়ে যেতে পারে তার।

ওকে ভোরবেলা গেটের কাছে বিদায় দিয়ে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে গেল। সোনিয়ার বৃদ্ধা ধাইমা রয়েছে বাগানের কোণে একখানি ঘরে। মহিলা আজ অন্ধ হলেও অনেকখানি আত্মনির্ভরশীল। আমি তার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

কে ?

আমি আমার পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে অহল্যামাঈয়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। ধাইমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে হল অভিভূত হয়েছে। মুখে বলল, আমি সোনিয়ার মুখ থেকে তোমার সব খবর শুনেছি বেটা। এও জেনেছি, তুমি অনেক কিতাব লিখেছ। আমি শুনে বহুৎ খুশি হয়েছি বাপ।

বললাম, মাঈজী আমি কিতাব লিখিয়ে বলেই আজ তোমার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি।

মনে হল এ কথায় অহল্যামাঈ বিহ্বল হয়ে পড়েছে। হাতের পাতায় ধাইমাকে চোখ মুছতে দেখলাম।

আমি মুখ্খু বাবা, কিতাব লিখিয়েকে আশীর্বাদ করব আমি!

অহল্যামাঈর হাতখানা ধরে বললাম, একটা লেখা শুরু করতে যাচ্ছি আমি, তোমার এই পাহাড়ী অঞ্চলটাকে নিয়ে। তুমি যদি এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য কর, তাহলে সেটাই হবে আমার ওপর তোমার আশীর্বাদ।

কি রকম সাহায্য চাও বাবা, আমি কি পারব?

একমাত্র তুমিই পারবে মা, আর কেউ নয়।

বল, কি সাহায্য চাই?

আগে কথা দাও, তোমার কাছে যে কথা জানতে চাইব, তা ছেলেকে জানাবে। আমিও কথা দিচ্ছি, যা তোমার কাছ থেকে জানব তা অন্য কাউকে জানাব না।

কথা দিচ্ছি। বল, এখন কি জানতে চাও?

বললাম, সোনিয়ার মাকে ঘিরে যে রহস্য আছে, তার খোঁজ তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি সেই সত্যটুকু তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।

মুখ নিচু করে কতক্ষণ বসে রইল অহল্যামাঈ। একসময় বলল, বড় ধর্মসংকটে ফেলে দিলে বেটা। তবে কথা যখন দিয়েছি, সে কথার নড়চড় আর হবে না। তুমি শুধু আর একটি কথা দাও আমাকে।

আমি তোমার কথা না শুনেই আগাম কথা দিচ্ছি মা।

তোমার যত বড় বন্ধুই হোক, ওই ঘরছাড়া মেয়েটা অথবা তার মা অম্বা সম্বন্ধে যে কথা জানবে তা সোনিয়ার কাছে কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ তার জন্মের আসল রহস্যটাই সে জানে না। জানলে সে যে কি কাণ্ড করবে তা আমার ভাবতেও ভয় করে।

আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, এ বিষয়ে তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার মা।

অহল্যামাঈ শুরু করল তার মনে ভেতর জমিয়ে রাখা গোপন কাহিনী।

অনন্তনারায়ণ গেছেন মুসৌরি। সাতদিন ওখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকার কথা। সে যাত্রায় সোনিয়ার মাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সাধ্যসাধনা করেছিলেন। অম্বা কিন্তু শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে তার যাত্রা বাতিল করল। আমি কি তখন জানতাম যে এর ভেতরে তার অন্য একটা পরিকল্পনা, অন্য একটা ছক আছে।

সেবার শরৎকালেও পাহাড়ের ওপর সে কী বৃষ্টি। কূল ভাসিয়ে থই থই করে বয়ে চলেছে ঋষ্পর্ণা।

সে রাতটার কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না। কদিন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেদিন পূর্ণিমা। সোনিয়া তার বেবিকটে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। অম্বা এসে আমার হাত ধরল। আমার চোখে চোখ রেখে বলল, এই বিছানায় কে শুয়ে আছে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন? তোমার সোনিয়া।

অম্বা বলল, আজ থেকে ও আমার নয়, তোমার মেয়ে।

আমি বললাম, আমি ওকে মেয়ের মতো মানুষ করছি, আসলে তুমিই তো ওর মা।

ও কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, আজ থেকে সে পরিচয় মুছে যাক।

হঠাৎ একটু চুপ করে গিয়ে আমার হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, একদিন তোমাকে আমি হরিদ্বারের মৃত্যুপুরী থেকে তুলে এনেছিলাম। তুমি সেদিন তোমার অত্যাচারী শ্বশুরবাড়ির আকর্ষণ ছেড়ে একবস্ত্রে আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে। তোমাকে বন্ধু বলে, নিজের বোন বলে গ্রহণ করেছিলাম।

আমি বললাম, তোমার ঋণ আমি কোনও দিন শোধ করতে পারব না।

সোনিয়ার মা অম্বা হঠাৎ বলল, আজ তোমার সে ঋণ শোধের সময় এসেছে।

আমি আবেগে কৃতজ্ঞতায় বলে উঠলাম, বল, কিভাবে সে ঋণ শোধ হবে?

অম্বা বলল, আমি কোনওদিন যদি না থাকি তাহলে এই মেয়েকে তুমি বুকে করে মানুষ করবে, কথা দাও।

আমি অধীর হয়ে বললাম, কথা না হয় দিলাম, কিন্তু আজ একথা উঠছেই বা কেন?

শুধু আমার অনুরোধটুকু রক্ষা করবে, আর কোনও প্রশ্ন করবে না।

আমার সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে গেল, আমি অম্বার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ও বেবিকটের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে কতক্ষণ চেয়ে রইল সোনিয়ার মুখের দিকে। যখন মুখ ফেরাল তখন চাঁদের আলোয় দেখলাম অম্বার চোখে জল। অস্ফুটে এই কটি কথা সেদিন উচ্চারণ করেছিল অম্বা, সোনিয়া, আমি তোর মা নই, নিষ্ঠুর এক রাক্ষসী।

সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারিনি, একথা বলার অর্থ কি ?

ও যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আমি প্রশ্ন করলাম, এত রাতে কোথায় চললে?

অম্বা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আজ পূর্ণিমার রাতে ঋষ্পর্ণাতে স্নানের ইচ্ছে হয়েছে।

আমি বললাম, অদ্ভুত ইচ্ছে তোমার! জল এত ঠাণ্ডা, তুমি স্নান করবে কি করে?

ও বলল, আমাকে বারন কোরো না, আমার ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করতে দাও।

তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

আজ আমাকে একা যেতে দাও, শুধু তোমার মেয়েটিকে তুমি দেখো।

ও চলে গেল। আমার মনটা অস্থির হয়ে উঠল। আমি প্রাসাদে বসে থাকতে পারলাম না। অম্বার যেন আমি সেদিন নতুন এক রূপ দেখলাম। কেমন যেন চিনতে পারছিলাম না তাকে।

এই প্রথম অম্বার নির্দেশ অমান্য করলাম। আমি খানিক পরেই আমাদের পরিচিত পথে ওকে অনুসরণ করে বনের ভেতর ঢুকলাম।

আড়ালে থেকেই আমি গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম ও ঋষ্পর্ণা নদীর কাছে পৌঁছে গেছে। নদীর ওই অংশে দুটো বড় বড় গাছ, ওরই আড়ালে আমি আর অম্বা দুজনে দিনের বেলায় স্নান করি।

অম্বা তার স্নানের পোশাক গাছের তলাতেই রেখে দিল। সে কিন্তু জলে নামল না, তাকিয়ে রইল নদীর ওপারের জঙ্গলের দিকে।

সেদিন যে দৃশ্য দেখলাম আজও সে কথা মনে পড়লে আমার বুকে সেদিনের মতো ভীষণ একটা কাঁপুনি জাগে।

ওপারের জঙ্গল চিরে একটা ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল। সামান্য সময় ঘোড়া থামিয়ে এপারের দিকে তাকাল। তারপর সেই ঘোড়াকে নামাল ঋষ্পর্ণা নদীতে। স্রোত প্রবল কিন্তু গভীরতা নেই তাই ঘোড়সওয়ার পেরিয়ে এল এপারে। ঘোড়া থেকে যে মানুষটি নামল সে আমার বহু চেনা, বহুবার দেখা ডাক্তার পাওলো।

আমার সারা শরীর তখন কাঁপছিল। আমি দেখলাম ডাক্তার অম্বাকে ধরে ঘোড়ার ওপর তুলে দিলো। সে নিজে তার পোশাকটাকে গুটিয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে অম্বাকে নিয়ে চলল ওপারে।

আমার চৈতন্য তখনও লোপ পায়নি। আমি দেখলাম, ওপারে বনের ধারে আর একটা ঘোড়াকে গাছ থেকে বাঁধন খুলে টেনে আনল ডাক্তার। তার পিঠের থেকে একটা বোঁচকাকে নামানো হলো। ওদের ভেতর কি কথা হচ্ছিল তা আমি শুনতে পাইনি। দেখলাম, সেই বোঁচকাটা নিয়ে বনের আড়ালে চলে গেল অম্বা।

আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। একসময় বন থেকে বেরিয়ে এল সে। দূর থেকেও আমি চিনতে পারলাম সে মেমসাহেবের পোশাকে সেজেছে। এরপর আর মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দুজন দুটো ঘোড়ায় চড়ে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। অম্বাকে আর কোনওদিন আমি দেখতে পাইনি। কিন্তু এর চার দিন পরে ডাক্তারকে আমাদের বাড়িতে দেখে আমার বিস্ময়ের শেষ ছিল না।

ফিরে এলেন রাজা অনন্তনারায়ণ। উন্মাদের মতো অবস্থা। ঋষ্পর্ণা নদীর তীরে স্নানঘাটের পাথরের ওপর রানীর পোশাক দেখে সকলেই অনুমান করল, রানী নদীতে ভেসে চলে গেছেন। ওপরে রাখা শুকনো পোশাক পরার সুযোগ আর হয়নি।

আমাকে যতজন প্রশ্ন করে, আমি শুধু বলি, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে সে রাতে রানী স্নানে গিয়েছিলেন। সম্ভবত পূর্ণিমার শুভযোগে স্নান করতে।

ডাক্তার পাওলো অনন্তনারায়ণকে নানাভাবে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি ভেতরের ঘরে বসে রাজাবাহাদুর আর ডাক্তারের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম।

ডাক্তার পাওলো রাজাকে যা বললেন তার সার কথাটা হলো এখন এ দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই বিদেশীরা অনেকেই ফিরে যাচ্ছে তাদের নিজের নিজের দেশে। পাওলোও তাঁর দেশ ইটালিতে ফিরে যেতে চান। আসলে তিনি বিদায় নিতে এসেছিলেন, এবং অম্বাকে হরণ করার দায় কৌশলে এড়িয়েও গেলেন।

চলে গেলেন ডাক্তার পাওলো। আর তাঁকে আমি কখনও দেখিনি।

মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ত, অনন্তনারায়ণ না থাকলে ডাক্তার এসে অম্বার সঙ্গে আলাপে বসত। এমন ঘনিষ্ঠভাবে দুজনে বসত যা আমার কাছে খুবই দৃষ্টিকটু বলে মনে হতো। যত দিন গেছে আমি বুঝেছি সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই সোনিয়ার জন্ম।

বললাম, একথা কি জোর দিয়ে বলা যায় অহল্যামাঈ?

উনি হেসে বললেন, অনন্তনারায়ণ যা বুঝতে পারেননি, আমি তা সহজেই বুঝে নিয়েছিলাম।

আমি বললাম, তুমি কি শুধু ডাক্তারের সঙ্গে সোনিয়ার মায়ের নিবিড় সম্পর্কটুকু দেখেই এই ধারণায় এসেছ, না অন্য কিছু কারণ আছে?

দিনে দিনে সোনিয়ার চোখের তারার নীল রঙ আর চেহারা বার বার আমাকে ডাক্তারের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। অনন্তনারায়ণ কিংবা তার মা অম্বার কোনও আদলই তার মধ্যে নেই।

বললাম, অহল্যামাঈ, তুমি আমাকে বারণ না করলেও সোনিয়ার জন্মরহস্যের কথা তাকে আমি কোনভাবেই বলতে পারতাম না। আর একজন কিতাব লিখিয়ে জেনে তুমি যেভাবে তার অন্যায় আবদারটুকু রক্ষা করলে সেজন্যে আমি তোমাকে আবারও প্রণাম জানাচ্ছি।

সারাদিন আমি একা একা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কাটালাম। সন্ধ্যোর আগেই কিন্তু বাংলোতে ফিরে এলো সোনিয়া।

বললাম, রাতে ফিরবে বলে ভয় দেখিয়ে গেলে।

ও হেসে বলল, অভয় দেবার জন্য ফিরে এলাম। বলো, সারাদিন একা একা কি করে কাটালে? নির্জন নিবাসে নিঃসঙ্গ ঘুরে ঘুরে তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগেনি।

কে বললে আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম।

ও সবিস্ময়ে বলল, এখানে তুমি আবার সঙ্গী পেলে কোথায়!

তুমি চলে যাবার পর মাতৃদর্শন করলাম।

অতি বুদ্ধিমতী সোনিয়া কথাটাকে ঠিক ধরে ফেলেছে। সে বলল, ধাইমার সঙ্গে আলাপ হল বুঝি?

শুধু আলাপ নয়, অনেক কথাই হল তাঁর সঙ্গে। এমনকি তোমার মায়ের ঋষ্পর্ণা নদীতে ডুবে যাবার খবর পেয়ে বাবা কিভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সেকথাও বলতে ভোলেননি।

সে রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সোনিয়া বলল, এরপর নিশ্চয়ই অতিথির বিশ্রামের প্রয়োজন হবে?

কেন বলো তো? বাঁধাধরা বিশ্রামের নিয়মে আমি অভ্যস্ত নই সোনিয়া।

তাহলে কিছু সময় আমরা একান্তে বসে জীবনের কথা শুরু করতে পারি।

আমি সোৎসাহে বললাম, বক্তার অসুবিধে না হলে অতিথি সারারাত উন্মুখ হয়ে তার কথা শুনতে প্রস্তুত।

সোনিয়া বলল, তাহলে এস আমার ঘরে, আরাম করে সোফায় বস, আমি তোমাকে আমার বিচিত্র জীবনের কিছু কথা শোনাই।

আমরা ওর শোবার ঘরে ঢুকলাম। সোফায় বেশ আরাম করেই বসলাম। ও ডিভানে আমার মুখোমুখি বসল।

অহল্যাবাঈ আজ তোমার ছোটবেলার কথা শোনালেন। তোমার নাকি সাংসারিক বন্ধন বলে কিছু নেই।

ও বলল, আমার আচার আচরণেই তো তার প্রমাণ রয়েছে রঞ্জন। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে সাংসারিক সম্পর্কগুলোকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি। আমার নিজের কোনও সংসারও নেই, সন্তান-সন্ততিও নেই। তাই বোধহয় আমি সব শিশুকেই একই দৃষ্টিতে দেখি, একই রকম ভালোবাসি। ছোট্ট সংসার নেই বলেই বৃহৎ একটা সংসারের স্বপ্ন দেখি।

মনের কৌতূহল মেটাবার জন্যে প্রথমেই আমি একটি প্রশ্ন তুললাম, আচ্ছা, স্ত্রী-বিয়োগে রাজা অনন্তনারায়ণ কি সত্যিই উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছিলেন?

ও বলল, তাঁর দিন-রাত্রির আচরণে কোনওরকম পাগলামো প্রকাশ পেত না, কিন্তু শোবার ঘরে মায়ের যে ফটো ছিল তার দিকে তাকানোমাত্রই তিনি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যেতেন। সে সময় কারোর কথাবার্তা তিনি শুনতে পেতেন না। ডাকলেও সাড়া পাওয়া যেত না। বেশ কিছু সময় পরে আপনিই আবার শান্ত হয়ে যেতেন। তখন স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক আচরণ।

কিন্তু কোনও পূর্ণিমার রাতেই তাঁকে স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হতো না। তাঁর ভেতরে একটা উন্মাদনা দেখা দিত।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, কি ধরনের উন্মাদনা?

তুমি জানো, আমার মা এক পূর্ণিমায় ঋষ্পর্ণা নদীতে স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। সে রাতে নদী আমার মাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি জানতে চাইলাম, পূর্ণিমার রাতে তোমার বাবা কি করতেন?

ধাইমার কাছ থেকে বাবা জেনেছিলেন, সেই সর্বগ্রাসী পূর্ণিমার রাতে যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল তখন রানী অম্বা ঋষ্পর্ণাতে স্নানের জন্য একা বেরিয়ে যান।

তাই বাবা প্রতি পূর্ণিমায় প্রাসাদের ঘড়িতে ন'টা বাজলেই বারান্দায় বেরিয়ে আসতেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। একটা ঘোরের মধ্যে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসতেন। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতেন বনের ওপারে ঋষ্পর্ণা নদীর দিকে। আমরা তখন দূরে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখতাম, কাছে যাওয়ার সাহস হতো না।

হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে উঠতেন, 'ওই আসছে', 'ওই আসছে'।

অনেক সময় আমি ছুটে গিয়ে বলতাম, কে আসছে বাবা?

দেখতে পাচ্ছিস না ঋষ্পর্ণা নদী থেকে তোর মা স্নান সেরে প্রাসাদের দিকে উঠে আসছে। ওই যে উড়ছে তার সিফনের শাড়ির সাদা আঁচল।

হঠাৎ পাগলের মতো বলে উঠতেন, 'কোথায় হারিয়ে গেল!' 'কোথায় হারিয়ে গেল!'

তিনি ঠিক তার পরেই মূর্ছিতের মতো বিছনায় লুটিয়ে পড়তেন। ভোরের আগে আর উঠতেন না।

পূর্ণিমা হলেই অহল্যামাঈ রাত ন'টা বাজার আগেই বাবাকে রাতের খাবার খাইয়ে দিত।

একবার বাবার সঙ্গে আমি কেদারনাথ দর্শনে যাই। অপূর্ব মন্দিরটির পেছনে ঝকঝকে তুষারশুভ্র পটভূমি। সে রাতে চাঁদ উঠেছিল। কিন্তু তিথিটা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ বাবা দেখলাম নিশি পাওয়ার মতো আমাদের ছোট্ট আস্তানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি টর্চ জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঠিক ঠিক ন'টা বেজেছে। আমি নিশ্চিত জানি, অন্ধকারে বাবার হাতঘড়ি দেখার কোনওরকম সুযোগ ছিল না।

আমি বাবার গলায় 'ওই আসছে', 'ওই আসছে' শব্দ শুনে বাইরে বেরোলাম। বাবার কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, এত ঠাণ্ডায় কেন বাইরে বেরোলে বাবা?

দেখতে পাচ্ছিস না ওই পর্বতশিখর থেকে কেমন করে সাদা আঁচল উড়িয়ে তোর মা এদিকে নেমে আসছে।

বলতে বলতেই বাবা 'কোথায় গেল', 'কোথায় গেল' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম। তিনি তেমনি মূর্ছিতের মতো শয্যায় পড়ে রইলেন।

পরের দিন জানতে পারলাম, গত রাতটি ছিল পূর্ণিমা তিথি।

কথায় ছেদ টেনে দিয়ে সোনিয়া বলল, অনেক কথা হলো, এবার একটু কফি ব্রেক, কি বল?

উত্তম।

তিন

খাজুরাহো মন্দির প্রাঙ্গণে রাত্রি তখন ভাসছে আলোর জোয়ারে। কাণ্ডারিয়া মহাদেও মন্দিরের অগণিত দেবদেবী মূর্তি, মিথুন মূর্তি, নর্তক-নর্তকীর মূর্তি আলোছায়ার অন্তরাল থেকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছে, উৎসবে অংশগ্রহণকারী নর্তকীদের নৃত্যলীলা। ভরতনাট্যম, মোহিনীআট্টম, ওড়িশী হয়ে যাবার পর প্রায় মাঝরাতে ডাক পড়ল আমার। আমি সে বছর একমাত্র নিমন্ত্রিত কথকশিল্পী। লক্ষ্ণৌ থেকে একাই গেছি খাজুরাহো। বন্ধুরা সঙ্গী হতে চেয়েছিল, আমি তাদের সহাস্যে নিরস্ত করে

বলেছি, আমার পরাজয়টা তোরা স্বচক্ষে নাইবা দেখলি। বরং ঘরে বসে কলালক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করে যা, যদি ভাগ্যের একটি প্রসাদী ফুল বন্ধুর কপালে এসে পড়ে।

ওরা বলল, বুকের পাটা বটে তোর। বলিহারি সাহস। টিকিট কাটার ব্যাপারেও কি সাহায্য করতে পারি না?

বললাম, অকারণে ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আমি ঠিক যেতে পারব। বরং তোরা আমাকে ট্রেনে তুলে দিবি।

আমি জানতে চাইলাম, ওরা তোমার কি রকমের বন্ধু সোনিয়া?

সোনিয়া বলল, কিছু কলেজের কিছু বা নাচের স্কুলের।

সহাস্যে বললাম, এখন বল সাহসিকা, তোমার নৃত্য অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ও হেসে বলল, রোমাঞ্চই বটে। সমস্ত ঘটনাটা শুনলে যে কেউ রোমাঞ্চিত হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সোনিয়া। মনে হলো সে স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে সেদিনের দৃশ্যগুলো তুলে আনার চেষ্টা করছে।

একসময় সে শুরু করল, মাঝরাতে আমার ডাক আসার আগে পর্যন্ত আমি সুসজ্জিত হয়ে বসে ওদের নাচ দেখছিলাম।

ভরতনাট্যমের সরিতা মেনন যেন পদ্মের এক একটা পাপড়ি খুলতে খুলতে তাকে পূর্ণ শতদলে বিকশিত করে তুলল। তার সৌন্দর্য, সৌরভ যেন দর্শনে, ঘ্রাণে প্রাণকে পূর্ণ করে দিল।

শ্রীরাধা কুট্টি যখন মোহিনীআট্টম পরিবেশন করে পাদপ্রদীপের আড়ালে চলে গেল তখন মনে হলো, পূর্ণকুম্ভ থেকে মোহিনী দর্শকদের তৃষিত হৃদয়ে বর্ষণ করে গেল অমৃত বিন্দু।

সুরভি পাণিগ্রাহী ওড়িশী নাচতে নাচতে রাশি রাশি সাদা কুন্দফুল ছড়িয়ে দিল। তার এক একরকম দেহবিভঙ্গ এক একটি মন্দির ভাস্কর্য হয়ে যাচ্ছিল।

আমার গায়ক-বাদকের দলটি আগেই লক্ষ্ণৌ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারা জব্বলপুর দিয়ে মার্বেল রক ইত্যাদি দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে সাতনা হয়ে নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌঁছেছিল খাজুরাহো।

মঞ্চের পর্দা সরে গেল। আমি মনে মনে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে নাচ শুরু করলাম।

ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল পটভূমি। আমি নেচে চলেছি সমুদ্রতীরের বালুবেলায়। ফেনার ফুল ফুটিয়ে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের জন্য এগিয়ে আসছে সাগরতরঙ্গ। প্রিয়তমকে দেখতে না পেয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। আবার ফিরে চলেছে পেছনে তীব্র অভিমানে।

আমি যেন সেই প্রেমে-উন্মাদ সাগরতরঙ্গ। এগিয়ে চলেছি মিলনের আকুলতায়, পিছিয়ে আসছি নিদারুণ হতাশায়। উদ্বেল হৃদয়ে উঠছে উত্তাল তরঙ্গ। ঘূর্ণির পাকে পাকে ঘুরছে অশান্ত ঘাগরা। নূপুরের বোলে তরঙ্গের উচ্ছলিত ধ্বনি।

আমি প্রণামের মুদ্রায় যখন নাচ শেষ করলাম তখন মনে হলো, শত শত পারাবত পাখায় করতালিধ্বনি তুলে খাজুরাহোর আকাশে উড়ে চলেছে।

তৃপ্তিতে, কৃতজ্ঞতায় মুহূর্তে ভরে উঠল মন! আমি দর্শকদের নিরাশ করিনি, এই আনন্দে বসন্তের পুষ্পমঞ্জরীর মতো রোমাঞ্চিত হতে লাগল আমার সারা দেহ।

আমি মন্তব্য করলাম, আমার দুর্ভাগ্য তোমার সেদিনের নাচ আমি দেখতে পেলাম না সোনিয়া।

ও তদগত হয়ে বলল, যা আমার স্বপ্নেরও অতীত তাই ঘটল সেদিন। আমি বিচারকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর শিরোপাটি লাভ করলাম। কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো দুটি যুবক। তারা নাচের আকর্ষণে চলে এসেছে খাজুরাহো।

একজন বলল, অসাধারণ পারফরমেন্স আপনার।

অন্যজন বলল, আপনি লক্ষ্ণৌর মান রেখেছেন।

আমি বললাম, আপনারা কি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন?

আমরা দুজনেই লক্ষ্ণৌয়ের বাসিন্দে। পেপার থেকে জেনেছি, আপনি খাজুরাহো যাচ্ছেন নৃত্যোৎসবে যোগ দিতে। তাই আমরাও এখানে এসে পড়েছি আপনার নাচ দেখব বলে।

আমি বললাম, আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে আমিও দারুণ আনন্দ পেলাম। আচ্ছা, আমি যে একজন নৃত্যশিল্পী এটা আপনারা জানলেন কি করে?

কুসুম কার্লেকার আপনাদের কলেজ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি না?

হ্যাঁ, কুসুমদিই সেক্রেটারি।

তাঁর দৌলতে আপনাদের অ্যানুয়েল ফাংশান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। সেখানেই আপনার নাচের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

কলেজ ফাংশানের শেষে অনেকেই এসেছিলেন উৎসাহিত করতে কিন্তু সেদিন আপনাদের দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

ওদের একজন বলল, আসলে আমরা সেদিন একটু ঘোরা পথে গেস্টকার্ড সংগ্রহ করেছিলাম তাই ফাংশান শেষে সোজা বেরিয়ে এসেছি। সাহস পাইনি গ্রিনরুমে ঢোকার।

কথা শুনে আমি হেসে উঠলাম।

হাসলেন যে?

ও কিছু না। আপনাদের সেদিন হল ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ছবিটা কল্পনা করতেই হাসি পেল।

ওরা দুজনে এবার হেসে উঠল।

আমি বললাম, আজ আপনারা আসাতে আমার খুব ভাল লাগছে।

ওদের একজন হঠাৎ বলে উঠল, আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এখুনি বহুজনে ভিড় জমাবেন। তখন আমাদের এই সামান্য সাধুবাদ ভেসে যাবে ওঁদের উচ্ছ্বাস আর প্রশংসার তোড়ে।

বললাম, আপনারা আমার আপনজন, তাই আপনাদের ভাল লাগার মূল্য আমার কাছে অনেকখানি।

কবে ফিরছেন?

আপনারা?

একজন বলল, জব্বলপুর ঘুরে লক্ষ্ণৌ ফিরব।

কথার ভেতরেই মাইকে শোনা গেল অ্যানাউন্সমেন্ট।

অপ্রত্যাশিত ঘোষণাটি শোনামাত্র আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। ওরা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, হিপ্ হিপ্ হুররে।

আনন্দের আতিশয্যে ওরা সবকিছু ভুলে দুজনে আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরল।

মাইকে ততক্ষণে আমার নাম ঘোষণা চলেছে, আমি যেন দ্রুত মঞ্চে চলে আসি।

দর্শকরা ইতিমধ্যেই গ্রিনরুমের সামনে ভিড় করে এসেছে। ওদের উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনে সত্যিই আমি ভেসে গেলাম।

ভোরবেলা বেড-টি-র পর বাইরে এসে দেখি ওরা দু'বন্ধু অতিথি-নিবাসের গেটে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

আমি গতরাতে উৎসব মঞ্চে আনন্দ অনুষ্ঠানের পর ওদের আর খুঁজে পাইনি। ভোরবেলা একেবারে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে দারুণ খুশিতে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলাম।

ওরাও খুশি আমিও খুশি।

বললাম, কবে যাচ্ছ জব্বলপুর?

একজন হেসে বলল, এই তো বেশ।

বললাম, বেশটা কি?

অন্যজন বলল, এই যে তুমি 'আপনি', 'আজ্ঞে'র বাধাটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অনেক কাছে সরে এলে।

ও এই কথা, বলে বাতাস কাঁপিয়ে হেসে উঠলাম।

হাসি থামলে বললাম, আমরা তিনবন্ধু, একই জায়গার বাসিন্দে, কি বল?

তিনজন মহা উৎসাহে হাতে হাত মেলালাম।

বললে না তো কবে জব্বলপুর যাচ্ছ?

একজন বলল, আজ দুপুরের পর।

অনুযোগের সুরে বললাম, দিব্যি দু'বন্ধুতে চললে!

কেন, তুমি সঙ্গী হবে নাকি ?

জব্বলপুর ঘুরে আসতে আমার কোনো অসুবিধে নেই।

তোমার অন্য সঙ্গীরা?

আমি একাই এসেছি লক্ষ্ণৌ থেকে, ফিরেও যাব একা। আজ গুরুজিকে শুধু একটা টেলিগ্রাম করে খবরটা জানিয়ে দেব। তারপর যথা ইচ্ছা তথা যাই।

একজন বলল. এখন থেকে আমরা থ্রি কমরেডস্, কি বল?

এবার আমি হাত তুলে বললাম, হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে।

ওরাও আমার সঙ্গে যোগ দিল।

আশ্চর্য! তখনও পর্যন্ত ওদের নাম জানা হয়নি আমার। কে কি করে তাও নয়।

আমি বললাম, এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রাথমিক পরিচয় পর্বটা সম্পূর্ণ হয়নি, সেটা এখন সেরে নেওয়া যাক।

ওরা আমার কথাটা ধরতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, আমার পিতৃদত্ত নাম সোনিয়া অগ্নিহোত্রী। ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী। প্রথম প্রেম—নৃত্য।

একজন বলল, তোমার নাম আগেই আমাদের জানা। অনার্সের ছাত্রী, সে খবরও রাখি। আর ভারতবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী, সে তো প্রমাণিত।

অন্যজন বলল, যে তোমার প্রশংসা করছে তার নাম, চন্দ্রভানু কাশ্যপ। লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজ থেকে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে বেরিয়েছে। এখন সারা ভারত ঘুরছে বিষয়বস্তুর সন্ধানে।

শিল্পী বলল, আমার পরিচয় যে দিচ্ছে তার পরিচয়টা এবার আমার মুখেই শোন। দেরাদুন মিলিটারি একাডেমি থেকে ট্রেনিং নিয়ে ও এখন ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিয়েছে। সম্প্রতি ছুটি কাটাচ্ছে আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে।

একটু থেমে চন্দ্রভানু আবার বলল, ওর গুণের শেষ নেই। তরুণ সঙ্গীতশিল্পীদের সামনের সারিতে ওর আসন। গুরু আসফ আলি বলেন, এমন সুরে ভরা নিটোল রেয়াজি কণ্ঠ কালেভদ্রে মেলে। ওর নামটিও বেশ লাগসই, যুধাজিৎ মেহ্‌রা।

আমি বললাম, তাহলে আমাদের জব্বলপুর যাত্রা দারুণ জমবে, কি বল? একদিকে চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে সঙ্গীতশিল্পী।

আর আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী।

বিস্তীর্ণ পাথুরে সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে আসছে নর্মদা। উচ্ছল গতিতে নামছে সে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই গভীর কুণ্ড। তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর্মদা। বিপুল ফেন-তরঙ্গ সৃষ্টি করে প্রবল বেগে গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে সে।

আমরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে নর্মদার গতি ও নৃত্যলীলা দেখছিলাম। হঠাৎ যুধাজিৎ কুণ্ডের ওপারে আমাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি যুবকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

যুবকটির পরণে সাদা একটিমাত্র ধুতি, তাও হাঁটুর ওপরে তোলা। ঐটুকু অংশ ছাড়া সারা শরীর অনাবৃত। লম্বা নিটোল ফর্সা দেহ, মেদের বিন্দুমাত্র প্রকাশ কোথাও নেই। একমাথা কুচকুচে ঘন কালো চুলে তাকে বেশ মানিয়েছিল।

আমরা যুবকটিকে দেখছিলাম, কিন্তু সে কাউকে দেখছিল না। তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঐ কুণ্ডের গভীরে।

চন্দ্রভানু বলল, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?

আমরা দুজনেই বলে উঠলাম, কি ?

ওপারের বন্ধুটির কাপড় ভেজা, নিশ্চয়ই কোথাও থেকে স্নান করে এসেছে।

কথা শেষ হতে না হতেই যুবকটি এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসল। নর্মদা নিচে যে গভীর কুণ্ডটিতে পড়ে ফেনা ওগরাচ্ছিল, তারই ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা তিনজনেই চিৎকার করে উঠলাম। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় কি করব ভেবে না পেয়ে ঐ বিরাট গহ্বরের দিকে চেয়ে রইলাম। চন্দ্রভানু বলল, আশ্চর্য! মানুষটা একেবারে পাতালে চলে গেল নাকি ! বলকে বলকে জল উঠছে, ঐ জলই তো ওকে ঠেলে ওপরে তুলে দেবে। শরীরে প্রাণ থাক আর নাই থাক।

যুধাজিৎ চেঁচিয়ে উঠল, ঐ দেখ, ঐ দেখ!

যুবকটি লাফিয়ে পড়েই নদীর স্রোত ধরে ডুব সাঁতারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন ওপরে উঠছে, পাড়ের পাথরগুলো ধরে ধরে।

পাড়ে উঠে কাপড়ের জল নিঙড়ে আবার নদীর পাড় ধরে এগিয়ে এসে ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়াল। কোনোদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমি মন্তব্য করলাম, এ এক অবাক দৃশ্য সোনিয়া। বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়।

সোনিয়া বলল, আমরা দ্বিতীয়বার আর ঐ দৃশ্য দেখতে চাইনা। নর্মদাকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে যাব।

পথে আমাদের ভেতর ভারি মজার কথা হলো।

আমি সোৎসাহে বললাম, কি রকম ঝাঁপখানা, দেখলে তো?

যুধাজিৎ বলল, তুই এমনি ঝাঁপ দিতে পারবি চন্দ্রভানু?

ও পাল্‌টা জিজ্ঞেস করল, তুই?

যুধাজিৎ বেশ মজা করে উত্তর দিল, একটা বিশেষ কোনো জীবন্ত প্রিয় বস্তুর অধিকার নিয়ে যদি বাজি ধরা যায়, তাহলে হয়তো কেউ ফলাফল না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

চন্দ্রভানু বলল, তোর জীবন্ত প্রিয় বস্তুটি নিশ্চয় কোনো প্রেমিকা?

যুধাজিৎ বলল, যেমন-তেমন প্রেমিকা হলে চলবে না।

চন্দ্রভানু অমনি বলল, এই ধর সোনিয়ার মতো রূপ, গুণবতী প্রেমিকাকে লাভ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকদের ভেতর যে কেউ ঐ মরণ কূপে ঝাঁপ দিতে পারে।

আমি ওদের ঠ্যালা দিয়ে বললাম, খুব হয়েছে, আর ঝাঁপ দিয়ে কাজ নেই। শেষে হাত-পা হারাবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমিকাকেও।

যুধাজিৎ কপালে হাত চাপড়ে বলল, তুমি কি সত্যিই এত নিষ্ঠুর সোনিয়া!

পরক্ষণেই হা হা করে হেসে উঠলাম তিনজনে।

আমি মন্তব্য করলাম, বেশ লাগছে তোমার ঐ তরুণ বন্ধুদের কাহিনী।

সোনিয়া কিছু সময় চুপচাপ বসে রইল। একসময় বলল, রঞ্জন, মানুষের মন নদীর মতো। সে যে কখন কোনদিকে বাঁক নেবে তা আগে থেকে অনুমান করা যায় না।

আমার মনে হলো, সহজ, সুন্দর একটা পরিবেশ হঠাৎ ভারী হয়ে উঠছে। অমনি আমি বললাম, তুমি তোমার দু'বন্ধুর কথা যেখানে শেষ করেছিলে, সেখান থেকে শুরু কর।

আমার কথায় সোনিয়ার মনের ওপর থেকে মেঘের ছায়াটা সরে গেল। আবার ঝলমল করে উঠল আগের পরিবেশ।

রঞ্জন, সেদিন চন্দ্রভানু আমাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কিছু দূরেই বিরাট জায়গা জুড়ে

মার্বেল পাথর তোলার কাজ চলছিল। বহু শ্রমিক আর কারিগর কাজ করছিল সেখানে। দু'চার খানা লরিতেও মাল বোঝাই হচ্ছিল।

আমরা নিচের প্রান্তরে একটি পথ ধরে নামতে গিয়ে দেখি সেই সংকীর্ণ পথের দু-দিকে ছোট ছোট ছাউনি ফেলে এক একটি দোকান তৈরি হয়েছে। ওই দোকানগুলিতে কারিগররা শ্বেতপাথরের টুকরো থেকে ছোট ছোট মূর্তি তৈরি করছে। সবাই প্রায় একইরকম হাতির মূর্তি গড়ে চলেছে। বড় থেকে ক্রমশ ছোট সাতটা হাতির সারি। প্রত্যেকেই প্রায় নিপুণ হাতে এই কর্মটি করে যাচ্ছে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ একটা দোকানে বসে পড়ল চন্দ্রভানু। একটা পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে দোকানের কারিগরকে বলল, আমি একটা হাতি তোমাদের তৈরি করে দেখাব!

লোকটি অবাক হয়ে চন্দ্রভানুর দিকে তাকিয়ে হাসল। মুখে বলল, এ সব বানানো অত সহজ নয় বাবুসাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রভানু আর কথা না বাড়িয়ে কারিগরের যন্ত্র হাতে তুলে নিয়ে পাথরের টুকরোটাকে কাটতে শুরু করে দিল। প্রায় ঘণ্টা আড়াই লাগল তিন ইঞ্চি মাপের একটা সুসজ্জিত শ্বেতহস্তী বানাতে। এত দ্রুত তার হাত চলছিল যে আমাদের সঙ্গে দোকানের কারিগরও অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়েছিল।

ওদের মতো একটা বিশেষ ধারার দু'পাশ চ্যাপ্টা হাতি নয়, একেবারে নিটোল, সুন্দর কাজ করা শ্বেতহস্তী।

কাজটা শেষ হতে কারিগর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সাবাস! আমি চেষ্টা করলেও এমনটা পারব না।

চন্দ্রভানু বলল, এ হাতিটা তোমার জন্য তৈরি করেছি, তোমাকে উপহার দিলাম। তোমার পাথর নষ্ট করেছি বলে তার দাম হিসেবে এই কুড়িটা টাকাও তোমাকে দিচ্ছি।

কারিগর টাকাটা নিল না। মাথায় দু'হাত ঠেকিয়ে বলল, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু গুণে অনেক বড়, তাই আপনাকে নমস্কার জানালাম। আপনার উপহার দেওয়া হাতিটি আমি যত্ন করে আমার ঘরে রেখে দেব। ওই হাতি দেখলে আপনাদের কথা মনে পড়ে যাবে।

আমি মন্তব্য করলাম, চন্দ্রভানু দারুণ ট্যালেন্টেড ছেলে তো!

সোনিয়া বলল, ওর ক্ষমতার পরিচয় পরে তুমি আরো পাবে। এখন যুধাজিতের একটি গুণের কথা শোনো। আগে বলেছি ও গায়ক। কিন্তু কত বড় গায়ক তার পরিচয় পেলাম নর্মদার মার্বেলরকে বোটিং করতে গিয়ে।

দু-দিকে উঁচু মার্বেল পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে নর্মদা। কোথাও কালো মার্বেল, কোথাও আবার সাদা মার্বেলের পাহাড়।

নৌকোর মাঝি বলল, ওই দেখুন জলের স্রোতে পাহাড় ক্ষয়ে ক্ষয়ে কেমন তৈরি হয়েছে হাতির আকার।

আমরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই, একটা সাদা হাতির রিলিফ।

বিভিন্ন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নদীটা বেরিয়ে এসেছে। কোনদিক দিয়ে ঢুকছি আর কোনদিক দিয়েই বা বেরোব তা একমাত্র মাঝি ছাড়া আমরা বুঝতে পারছি না। এ যেন অদ্ভুত এক ভুলভুলাইয়া।

ওই ছলছল শব্দে বয়ে চলা নদীর গান শুনতে শুনতে, সাদা-কালো পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বেজে উঠল যুধাজিতের গলায় সুরেলা এক সঙ্গীত। সেই পরিবেশে যুধাজিতের গানটা অপূর্ব এক মাত্রা পেল। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম ওর গান। সেদিন প্রথম ওই দু'বন্ধুর গুণের যে পরিচয় পেলাম তাতে ওদের ভাল না বেসে পারলাম না।

লক্ষ্ণৌ ফিরে আসার পর মাত্র দু'দিন যুধাজিৎকে আমরা সঙ্গে পেয়েছিলাম। ছুটি ফুরোতেই ও চলে গেল। বলল, কাশ্মীরে আরো বছর-খানেকের মেয়াদ। তার ভেতর তোমবা কি একবার আসবে ওখানে?

আমি বললাম, একেবারে এক বছরের অদর্শন সইতে হবে! সামনে গরমের ছুটিতে আমরা অবশ্যই কাশ্মীরে তোমার সঙ্গে দেখা করে আসব।

যুধাজিৎ আবেগে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাদের জন্য আমি কিন্তু দিন গুনব সোনিয়া।

আমি বললাম, যাব যখন কথা দিয়েছি, তখন যাবই। এর ভেতর মাসে অন্তত দুখানা করে তোমার চিঠি চাই। ঘন ঘন চিঠিপত্রের ব্যাপারে মিলিটারি থেকে কোনও বারণ নেই তো?

তুমি নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে চিঠি দিতে পারো। চিঠি যত মোটাই হোক না কেন, কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

আমি আর চন্দ্রভানু ওর শেষের কথায় হেসে উঠলাম।

ইতিমধ্যে যুধাজিতের এক ডজনের বেশি গান আমি শুনে ফেলেছি। সবকটাই রাগভিত্তিক, দারুণ গলার কাজ। ওই গলা সহস্র কাজের ভেতর থেকে টেনে এনে ঠায় বসিয়ে রেখে দেবে।

যুধাজিৎ চলে গেল। আমরা স্টেশনে তাকে বিদায় জানালাম। নিজের হাতে অনেক খাবার করে ওর ব্যাগে ভরে দিয়েছিলাম। প্রিয়জন ঘরের বাইরে গেলে যেমন আপনজনেরা তার পথের খাবার গুছিয়ে দেয়।

চার

দেওয়াল ঘড়ি ঢং ঢং শব্দে রাত দুটো ঘোষণা করল। আমি সোনিয়াকে বললাম, একটানা অনেক সময় তোমার জীবনের প্রথম পর্বটি শুনলাম। পরের পর্বগুলো শোনার জন্যে দারুণ ইচ্ছে থাকলেও শেষ রাতের বিশ্রামটুকু থেকে তোমাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

সোনিয়া বলল, তুমি আমার অতিথি রঞ্জন, তাই তোমার কথা ভেবে এ রাতের মতো কথায় ইতি টানছি।

ও উঠে দাঁড়াতেই আমি বললাম, আমার কিন্তু একটা ব্যাপারে অব্‌জেকশন আছে।

অব্‌জেকশন! কি ব্যাপারে?

আমি কি তোমার অতিথি সোনিয়া?

ও চোখ ছোট করে মৃদু হেসে বলল, সরি, তুমি আমার বন্ধু। চলার পথে কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।

আমি বললাম, আর এক মিনিট বসে যাও, বন্ধুর আর দু'একটি প্রশ্ন আছে।

সোনিয়া আমার মুখোমুখি বসে পড়ল।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তোমার ভেতর গোপনতা বলে কিছু নেই। তাই সাহস করে দু'একটা কথা বলব ভাবছি।

বলেই ফেলো না, সংকোচ কিসের?

আমি বললাম, আচ্ছা, তোমার জীবনের ওই পর্বে দুজনের ভেতর কাকে তোমার বেশি ভালো লেগেছিল?

সোনিয়া বলল, দুজনকেই।

অসম্ভব।

ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, অসম্ভব কেন?

নিক্তির ওজনে দুজনকে সমান ভালোবাসা যায় না।

তাহলে সত্য বলি।

আমি হেসে বললাম, এতক্ষণ কি তাহলে মিথ্যে বলছিলে?

প্রথম দিকে আমি দ্বিধায় পড়েছিলাম। দুজনেই প্রতিভাবান। একজন চিত্রশিল্পী, অন্যজন সঙ্গীতশিল্পী। আমার ভেতরে যে শিল্পসত্তা আছে তা ওই দুই শিল্পীর ভেতরেই আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।

কখনও মনে হতো চন্দ্রভানুর ওপরে আমার টান বেশি আবার কখনও যুধাজিতের গান শুনে ওর দিকে মন টানত।

যুধাজিৎ যেদিন চলে যায়, তাকে ট্রেনে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এসে চোখের জলে ভেসেছিলাম। যেন সব হারানোর কান্না ঢেউয়ের মতো উঠে আসছিল আমার বুক ঠেলে। কাল ভোর হলে ওকে আর দেখতে পাব না এটা ভাবতে আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু দু'চারদিন পরেই একটা ঘটনার ভেতর আমি জড়িয়ে পড়লাম। আর সেই ঘটনার নায়ককে আমার হৃদয়ের সঙ্গে না জড়িয়ে পারলাম না।

সে কি চন্দ্রভানু না অন্য কেউ?

এবার তুমিই অনুমান কর।

সে সময় তুমি যে দুজনের মাঝখানে ছিলে, এবং যারা তোমার স্বপ্নের সঙ্গী ছিল তারা ছাড়া তৃতীয় আর কোনও ব্যক্তিকে তোমার পাশে বসাতে মন চাইছে না।

এবার আমি সোজাসুজি তাকে বললাম, সে সময় যুধাজিৎ দূরে গেলে চন্দ্রভানুই তোমার মনকে জয় করেছিল।

সোনিয়া বলল, তুমি লেখক, তাই আমার মনের ছবিটা তুমি সহজেই দেখতে পেলে।

আমি বললাম, একটা কি ঘটনার ভেতর তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে বলে বললে না, সেটা কি?

ওর মূর্তি গড়ার মডেল হতে হয়েছিল আমাকে। ও ছিল আর্ট কলেজে ভাস্কর্য বিভাগের সেরা ছাত্র। গুরু শ্রীধর মহাপাত্র বলতেন, আমার তিরিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ওর মতো ট্যালেনটেড দ্বিতীয় আর একটি পাইনি।

চন্দ্রভানু কি ধরনের মূর্তি তৈরি করত?

ভারতের মন্দিরে মন্দিরে যে সব শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য রয়েছে, প্রধানত সেগুলিই নতুন রূপ পেত ওর কাজের ভেতর দিয়ে। মডার্ন ইঙ্গিতধর্মী ভাস্কর্য নিয়ে ওর কোনো আগ্রহ ছিল না।

আমি সকৌতুকে বললাম, হার হাইনেসের হাই উঠেছে, এখন আর কোনো কথা নয়। কাল তোমার মডেল-জীবনের কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনার আশা রেখে আজ শুভরাত্রি জানাচ্ছি।

ও উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে হাত নেড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। শেষ রাতের বিছানায় একখানা কম্বল গায়ে টেনে নিয়ে আমি চোখ বুজলাম।

ভোরে উঠে জানালা খুলে দেখি, অনেক আগেই শিবালিকের শৃঙ্গ ছাড়িয়ে সূর্য নীলাকাশ পরিক্রমা শুরু করেছে। চারদিক ভেসে যাচ্ছে সোনালী আলোর জোয়ারে।

পেছনের বাগানে চোখ ফিরিয়ে দেখি, গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর ওপর বসে আছে সোনিয়া। তার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা। একটা বড় কৌটো থেকে মেঠাই বের করে সে সবাইকে একটি একটি করে বিতরণ করছে।

মনে হচ্ছে, শুভ বিজয়া স্মরণে আজ মেঠাই দিয়েই বাল-ভোজন।

ব্রেকফাস্টের আগেই কেয়ারটেকার এসে গেল সপরিবারে। সে কাল ছুটি নিয়েছিল।

সোনিয়া চাপা গলায় বলল, যাবে নাকি মুসৌরি? ওখানেই ব্রেকফাস্ট সারা যাবে।

বললাম, যেমন অভিরুচি রাজকুমারীর।

তড়িঘড়ি ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেল। টিফিন কৌটোতে সব ভরে দিল কেয়ারটেকারের বউ।

আমরা কয়েকদিনের মতো সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

মুসৌরি শহরের বুকে আমাদের ছেড়ে দিয়ে রাজপুর বাংলোতে ফিরে গেল গাড়ি। কথা হলো, নির্দিষ্ট দিনে গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

ক্যামেলস্ ব্যাক, অনেকখানি উঁচুতে। কোনো রকম গাড়ির ঐ পাহাড় টপে ওঠার রাস্তা নেই। ওদের বাংলো হিল টপের গায়ে। একটি দেওয়াল পুবো পাহাড়ের গা পালিশ করে তৈরি হয়েছে। বাংলোর বাঁদিকে শহরের জল সরবরাহের রিজার্ভার।

একটি পাহাড়ী লোক আমাদের মালপত্র পৌঁছে দিল বাংলোতে। সে-ই যোগাড় করে আনল একটি রান্নার মেয়েকে। মেয়েটি রান্না থেকে বাজারহাট সবই করবে।

ছোট ছবির মতো বাংলো, সামনে ফুলের কেয়ারি। একদিন অন্তর মালি এসে বাগান পরিচর্যা করে যায়। এত ওপরে ধুলো ওড়াউড়ি করে না বললেই চলে। মালিই এখানকার কেয়ারটেকার। বাংলোর চারদিক ঘিরে কাচের শার্সি। একটি চাবি রেখেছে মালি, ডুপ্লিকেটটা মালিক।

সোনিয়া সামনের তালা খুলে ঘরে ঢুকল। বাংলোর ভেতরটা একেবারে ছিমছাম সাজানো। ঝকঝক করছে মেঝে। ড্রইংরুমে পুরু একটি কার্পেট পাতা। শোবার ঘরে টান টান বিছানা, সাদার ওপর লাল ফুল তোলা চাদর। ড্রইংরুমে ড্রাগন আঁকা সাদা পোর্সিলেনের বড় ফ্লাওয়ার ভাসে মরশুমি ফুল সাজানো। তরতাজা বাগান থেকে তোলা ফুল।

বললাম, আরব্য রজনীর দৈত্য এসে এগুলো সাজিয়ে দিয়ে গেল নাকি ?

সোনিয়া হেসে বলল, আমাদের মালির চেহারাটা ঠিক দৈত্যের মতো না হলেও কাজেকর্মে ও একটা ছোটখাটো দৈত্য বিশেষ। এখানকার বেশির ভাগ হোটেলের বাগান ওর হেপাজতে। হোটেলে ফুল সাজানোর ভারও ওর ওপর। আমার বাংলোতে নিয়ম করে ও সাতদিন অন্তর ফুল সাজায়।

জানতে চাইলাম, পুরো সপ্তাহ ধরে ফুল কি তাজা থাকে ?

অবশ্যই। শীতের জায়গায় ফুল সহজে ম্লান হয় না।

আজ চতুর্দশীর চাঁদ আকাশ আলো করে উঠেছে। আমরা হাত ধরাধরি করে ওয়াটার রিজার্ভারের চাতালে বসে আছি। আমাদের পেছনে একটা স্ট্যান্ডে মিটমিট করে ল্যাম্প জ্বলছে।

হঠাৎ আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সোনিয়া দূরের দিকে আঙুল তুলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আমি দেখলাম, বহু দূরে অনেক নিচে আলোর ফুল তোলা একখানা কার্পেট পাতা আছে। কোন দক্ষ কারিগর যেন লাল, নীল, হলুদ ফুলের একখানা কার্পেট তৈরি করেছে।

পাশ থেকে সোনিয়া প্রশ্ন করল, কেমন?

বললাম, অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু বস্তুটা কী! ঝিকমিক করছে তাই আলো বলে মনে হচ্ছে।

এটা একটা শহরের সম্পূর্ণ আলোর খেলা তুমি দেখছ।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, একটা শহরের!

হাঁ, অনুমান কর।

কিছুক্ষণ বসে থেকে ভাবলাম, কিন্তু কোনওরকম আন্দাজ করতে পারলাম না। মুখে বললাম, হার মানছি।

ও বলল, এটা অনুমান করা তোমার উচিত ছিল। মুসৌরির নিচে দেরাদুন শহর। রাতে ও শহরের আলোগুলো এমনি রঙিন ফুলতোলা একটা কার্পেট তৈরি করে। অবশ্য মুসৌরির পটভূমি থেকে দেখলে।

আমি মন্তব্য করলাম, দৃশ্যটি অতীব মনোরম।

সোনিয়া এবার বলল, রঞ্জন, ঠিক এমনি করে আর একজন সুদূর এক রাতে আমার পাশটিতে বসেছিল। সেদিনও আকাশে ছিল এমনি উজ্জ্বল একটা চাঁদ। বয়স অনেক কম ছিল। যার হাত ধরে সেদিন বসেছিলাম, সে ছিল এক শিল্পী।

তোমার কথার ভেতর আমি কিছু অনুমান করতে পারি কি ?

বলো, কি অনুমান করলে।

সেদিন তোমার পাশে বসেছিল চন্দ্রভানু। স্থান বদলায়নি। কাল আর পাত্র বদলে গেছে।

তোমার অনুভূতি আর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। আমাকে এই মুসৌরির বাংলোতেও মডেলের সিটিং দিতে হয়েছে। অবশ্য মূল সিটিংগুলো হয়েছিল আমার লক্ষ্ণৌর বাড়িতে।

আমার গুস্তাকি যদি মাফ কর তাহলে জানতে ইচ্ছে করে সিটিং-এর সাবজেক্টগুলো কি ছিল।

প্রথমেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, চন্দ্রভানু কেবল স্কালপ্টরই ছিল না, অসাধারণ অয়েল পেইন্টিংও করতে পারত। মুসৌরির বাংলোতে ও আমার একাধিক অয়েল পেইন্টিং করেছে।

বললাম, ছবিগুলো কোথায়?

বাংলোয় আমার শোবার ঘরের তিনটি দেওয়ালে আমাকে নিয়ে ওর তিনখানা অয়েল পেইন্টিং রয়েছে। বাকিগুলো সব ও নিয়ে গেছে।

তোমাকে মডেল করে কোনও মূর্তি তৈরি করেনি?

সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত মিলে অনেকগুলি। সবই মন্দির-ভাস্কর্যের আদলে।

তার কোনো নিদর্শন আছে?

তিনটি মাত্র রয়েছে আমার কাছে, বাকি সবগুলোই ওর হেফাজতে।

সেগুলি কি আমার দেখার সৌভাগ্য হবে?

তার দুটি আপাতত তোমাকে দেখাতে পারব, ও দুটি আমার বাংলোতে রয়েছে। অন্যটি লক্ষ্ণৌতে। 'অগ্নিহোত্রী ভবনের' সিংদরজা পেরোলেই প্রশস্ত বারান্দা। ঐ বারান্দার মাঝামাঝি অন্দরমহলে প্রবেশের গেট। তার মাথায় পাথরের কাজ করা তোরণ। ঐ তোরণের ভেতব পুরোনো দিনের পঁচিশ ইঞ্চি দেওয়াল কেটে তৈরি করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য গর্ভগৃহ। তার ভেতর রাখা আছে পিঙ্ক কালারের একটি প্রস্তরমূর্তি।

আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, মূর্তির বিষয়বস্তু কি?

প্রেমিক তুলে ধরেছে প্রেম-মুগ্ধ নায়িকার মুখমণ্ডল। আবেগের প্রান্তসীমায় পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেছে দুটি মুখ। অনুভূতির গভীরে মগ্ন হয়ে আস্বাদ করছে দুজন দুজনকে। চোখ-মুখ, ওষ্ঠের রেখায়, হাতের বাঁধনে নিবিড় প্রেমের এক নিখুঁত প্রকাশ। কটিদেশ পর্যন্ত নেমে এসে থেমে গেছে মূর্তিটি। স্তব্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে অনন্ত যৌবন।

সোনিয়া বেশ আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল ইংরেজিতে। ওর অনুভূতি আর এক্সপ্রেশান আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করছিল।

আমি বললাম, তুমি যেভাবে মূর্তিটির বর্ণনা দিয়ে গেলে তাতে আমার চোখে দেখার আর কিছু বাকি রইল না।

সোনিয়া বলল, ঐ বিখ্যাত মূর্তিটি কোনারকের। এমন অভিব্যক্তি সত্যিই দুর্লভ।

আমি জানতে চাইলাম, মূর্তিটি কি চন্দ্রভানু ওরিজিনাল ফটো দেখে খোদাই করেছিল?

একটি ইংরেজি আর্ট বুক থেকে ও ফটোখানা পেয়েছিল। তার আগে কোনারক গিয়ে ও দেখে এসেছিল আসল মূর্তি।

তৈরির সময় কিন্তু আমিই মডেল হয়েছিলাম। একটি দেওয়াল জোড়া আয়নার সামনে আমার মুখখানা আবেগে আশ্লেষে তুলে ধরেছিল চন্দ্রভানু। আমার পরনে ছিল পাতলা কুয়াশার মতো সাদা ...ড়রে মসলিন। সমস্ত অনাবৃত উর্ধ্ব অঙ্গ সাজানো ছিল ওড়িশা এম্পোরিয়াম থেকে আনা রুপোর অলংকারে। কোমরে রুপোর কাজ করা কটি-বন্ধনী। নাভিনিম্নে পানপাতার চমৎকার কাজ।

সোনিয়া একজন পরপুরুষের সামনে এমন অসংকোচে নিজের দেহের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল, যা শুনে মাঝে মাঝে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। কিন্তু বক্তা নির্বিকার। তার চোখে-মুখে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের আভাস ছিল না।

এবার আমি বললাম. তোমার রাজপুরের বাংলোতে রাখা দ্বিতীয় মূর্তিটির বিষয়বস্তু কি?

ও বলল, নিজের চোখে দেখবে।

আগাম বলতে খুব আপত্তি আছে কি?

ওর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। ও বলল, লক্ষ্ণৌর মূর্তিতে আছে যুগল প্রেমের প্রকাশ, আর রাজপুরে রাখা মূর্তিতে রয়েছে সৃষ্টির সুষমা।

আমি ওর কথার ভাবটি ধরতে না পেরে বললাম, আর একটু ব্যাখ্যা করে বল, কুয়াশাটা কেটে যাক।

ও বলল, রাজপুরে রাখা দ্বিতীয় মূর্তিটি মা ও ছেলের। আনন্দের আবেগে পূর্ণ মা তাঁর সৃষ্ট শিশুটিকে করতলে ধরে রেখেছেন। আনন্দময় শিশুটি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নৃত্যের ভঙ্গিতে। এখানেও মায়ের বেশবাস লক্ষ্ণৌর সেই মিথুন মূর্তির মতো। পীন পয়োধরের মাঝখানে নেমে এসেছে কারুকার্য খচিত কণ্ঠহার। পৃথুল নিতম্ব ঘিরে বস্ত্রের রেখা। কটিদেশে ঘন্টি-মেখলা। মুক্তোমালা দিয়ে সাজানো কবরী বাঁধা হয়েছে কানাড়া ছন্দে। সূক্ষ্ম বক্ষাবরণী উড়ছে ডান কাঁধ ছুঁয়ে।

বললাম, কি দারুণ তোমার বর্ণনা! একেবারে একটা মূর্তি গড়ে দিলে।

ও হেসে বলল, মিলিয়ে নিও বর্ণনার সঙ্গে।

আমার মনে হলো, অত্যন্ত মুক্ত মনের অধিকারিণী এই মহিলা।

বললাম, আমি কি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি তোমাকে ?

সোনিয়া বলল, আমার বর্ণনা শুনে কি তোমার মনে হচ্ছে, আমি খুব কনজারভেটিভ ?

তাই তো সাহসী হচ্ছি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে।

ও কোনো উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন শোনার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর চোখে-মুখে মৃদু হাসির রেখা।

প্রায় অনাবৃত দেহে এক পরিণত যুবকের মুগ্ধ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা তার সঙ্গে মিথুন মূর্তির লীলায় অভিনয় করে তোমার কোনো চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি?

চন্দ্রভানু যখন তার হাতের পাতায় আমার মুখখানা তুলে ধরে আবেগভরা চোখের দৃষ্টি আমার চোখে রেখেছিল, তখন প্রেমের আবেশে থরথর করে কেঁপে উঠছিল আমার সারা দেহ। চোখের পাতা প্রায় বুজে এসেছিল প্রেমিকের হাতের উত্তাপভরা স্পর্শের অনুভূতিতে।

এবার আমি লজ্জার আবরণ না রেখে প্রশ্ন করলাম, কোনো রকম অঘটন ঘটেনি?

ও সহজভাবেই বলল, কোনোকিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না, তবে আমি কাজের শেষে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যেতাম। এ বিষয়ে অহল্যামাঈ-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম। ছোটবেলা থেকে অহল্যামাঈ আমাকে নানাভাবে শিখিয়েছিল সংযমের সৌন্দর্য। বলত, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে কিন্তু সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নয়। মুহূর্তের আবেগে নিজেকে উজাড় করে দিলে, শেষে সব হারানোর দুঃখ সইতে হবে। তুমি সংযত হলে অন্যের আকর্ষণ বাড়বে। ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে হয়। কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটার ভেতরে বেশ কয়েকটা পর্ব থাকে। সে ধীরে ধীরে পূর্ণতাকে পায়, মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই। সঠিক সময়ে তার ভেতর মধু জমে উঠে, গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দিনে দিনে প্রকাশ পায় রঙের উজ্জ্বলতা আর মহিমা। বর্ণে গন্ধে পূর্ণ বিকশিত ফুলটিকে লাভ করার জন্য দেবতাও অপেক্ষা করেন অধীর আগ্রহে। সমর্পণ সব্বার শেষে। আগে নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে হয়।

অবাক হয়ে বললাম, এমনভাবে কথা বলতে পারেন অহল্যামাঈ।

আমি যেভাবে যে ভাষায় বললাম, ঠিক সে ভাষায় না হলেও কথাগুলো সবই অহল্যামাঈর।

বললাম, তাই তুমি এতখানি প্রলোভনের ভেতরেও নিজেকে সংযত রাখতে পেরেছিলে।

মিথ্যে বলব না রঞ্জন, চন্দ্রভানুর প্রতিভা আমাকে দিনে দিনে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। ও আমাকে নিয়ে বেশি সময় কাজ করুক, এটা আমি চাইতাম। অধীর হয়ে উঠতাম, ওর আসার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে। আসলে আমি ওকে হৃদয় ভরে চাইতাম। কিন্তু ....

ও চুপ করে বসে রইল দেখে বললাম, কিন্তু কি সোনিয়া?

কিন্তু ওকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতাম বলে চাইতাম না ওর পতন।

আমি বললাম, এ তো স্বভাবধর্ম সোনিয়া। এক তরুণ যুবা পুরুষ আর এক তরুণীকে দেহে মনে চাইতে পারে।

সোনিয়া বলল, খুবই স্বাভাবিক, তবে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আগে চন্দ্রভানু আমার দেহ নিয়ে মেতে উঠুক, এটা আমি মনে-প্রাণে চাইতাম না।

কেন, দাম্পত্য জীবন-যাপন করলে কি প্রতিভার বিকাশ ঘটে না?

সোনিয়া বলল, যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি পাওয়া যায় না ততক্ষণ অন্তরে তাকে লাভ করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকে, কিন্তু একেবার পাওয়া গেলে ব্যাকুলতা, বেদনা মন থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়। প্রতিভাবানের কাছে প্রেমিকা এক প্রেরণা। সে প্রেমিকের অন্তরে সৃষ্টির দীপ জ্বালায়। আর বিবাহিতা বধূ সংসারে জ্বালায় মঙ্গল দীপ। সে দীপের আলোতে সংসারের কল্যাণ থাকতে পারে কিন্তু প্রতিভাবান স্বামীকে তা সৃষ্টির পথে কতখানি আলো দেখাতে পারে সেবিষয়ে সংশয় থেকে যায়। সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন প্রতিভাধরের কাছে প্রেরণার উৎস নয়।

আমি বললাম, তুমি কি তাহলে চন্দ্রভানুর কেবল প্রেরণাদাত্রী হিসেবে থাকতে চেয়েছিলে, স্ত্রী হিসেবে নয়?

আমি ভেবেছিলাম, ও যেদিন দশজন গুণীর কাছে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে, সেদিন ওর কাছে নীড় বাঁধার প্রস্তাব রাখব।

এবার আমি অন্য একটি প্রশ্ন করলাম, তোমাকে নিয়ে ও যখন কাজ করছিল তখন ওর মনের কোনো রকম ভাবান্তর কি তুমি লক্ষ্য করেছ?

করেছিলাম।

কি রকম?

একদিনের ঘটনাই বলি। ঘটনাটি ঘটার মাসখানেক আগে আমরা দুজনে ওড়িশা ট্যুরে গিয়েছিলাম। রাজারানী মন্দিরে 'অলসকন্যা'র একটি বেশ বড় মূর্তি দেখে আমরা আকৃষ্ট হই। কারুকার্য করা পাথরের দেওয়ালে সংলগ্ন হয়ে আছে মূর্তিটি। দাঁড়িয়ে আছে অলস বিভঙ্গে। যেন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ-যাপন। তরুণীর দেহ-সৌষ্ঠব অসাধারণ।

মূর্তিটি দেখতে দেখতে চন্দ্রভানু বলল, ভাল করে দেখে নাও ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুড আর এক্সপ্রেশানগুলো।

বললাম, সত্যিই অপূর্ব, আমি সবকিছু বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ও বলল, এবার একটা বড় মাপের পিঙ্ক স্টোন যোগাড় করতে হবে। ঐ পাথরেই তৈরি হবে অলসকন্যার মূর্তি। একটু লম্বা গাঢ় হলুদ আর ব্রাউন মেশা স্যাণ্ড স্টোন তোমাদের লক্ষ্ণৌর 'অগ্নিহোত্রী' ভবনে রাখা আছে। এখান থেকে একখণ্ড গ্রিনিশ-ব্লু নীলগিরি স্টোন নিয়ে যাব। জব্বলপুরের হোয়াইট মার্বেল স্টোনের টুকরো আমার শোবার ঘরের চৌকির তলায় রয়েছে। এগুলো দিয়েই তৈরি হয়ে যাবে আমাব ধ্যানের মূর্তি।

আমি বললাম, পিঙ্ক স্টোন দিয়ে মূর্তি তৈরি হবে এটা জানলাম, কিন্তু বাকি তিন রকম স্টোনের কাজ কি?

অনুমান কর।

মাথায় আসছে না।

এত কম ভাবলে কি আসে।

তোমার মতো দক্ষ ভাস্কর হলে ঝট করে মাথায় এসে যেত।

ও বলল, তবে শোন, ঐ লম্বা স্যান্ড স্টোনটা থেকে আমি গাছের গুঁড়ি আর কয়েকটা বাঁকাচোরা ডাল তৈরি করে নিতে পারব। তার সঙ্গে জুড়ে দেব নীলচে সবুজ পাথরের পাতা। হোয়াইট স্টোনে ডালে ডালে ফুটবে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল।

আমি বললাম, ওয়ান্ডারফুল। ঐ গাছের একটা ফুলে ভরা ডাল ছুঁয়ে যখন গোলাপী আভালাগা রমণীটি দাঁড়াবে তখন সেই অন্যমনা অলসকন্যাকে কেউ ভাল না বেসে পারবে না।

আমার কথা শুনে চন্দ্রভানু মিষ্টি হেসে বলল, সেই গোলাপী আভালাগা কন্যাটি আমার অনেকদিনের চেনা, আমার মানসপুরের একান্ত নিভৃতে তার বাস। বড় কাছাকাছি, তবু ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আমি সোনিয়াকে প্রশ্ন করলাম, মূর্তিটি কোথায়?

এটিও রয়েছে রাজপুরের বাংলোতে। লক্ষ্ণৌ থেকে প্যাক করে এনে রাখা হয়েছে মূর্তি।

আমি তো দেখিনি।

ওখানে আমার একটি একান্ত নির্জন-নিবাস আছে, তারই ভেতর দাঁড়িয়ে আছে অলসকন্যা।

এবার তোমার সব সঞ্চয়গুলোই আমি খুঁটিয়ে দেখব। হ্যাঁ, আসল প্রশ্ন থেকে কিন্তু আমরা অনেকটা সরে এসেছি। তুমি একদিনের কি ঘটনা যেন বলবে বলেছিলে? তোমাকে নিয়ে কাজের ভেতর চন্দ্রভানুর কোনো ভাবান্তরের ঘটনা।

সোনিয়া বলল, এই অলসকন্যার মূর্তিটি যেদিন শেষ হলো, সেদিনই ঘটল ঘটনাটা।

আমি আর কোনো প্রশ্ন না করে সোনিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

মূর্তিটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও চলে গেল ওর আস্তানায়। কলেজ ছাড়ার পর চন্দ্রভানু এক ভদ্রলোকের আউট হাউসে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকত। ওখানেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের ব্যবস্থা। ভদ্রলোক অসম্ভব নিয়মনিষ্ঠ। পেয়িং গেস্ট হিসেবে ঢোকার সময় চন্দ্রভানুকে বলেছিলেন, আমার এখানে আসা যাওয়া খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় মেইনটেন করতে হবে। তুমি শিল্পী, পারবে কি?

ও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, পারব।

তাই ও কাঁটায় কাঁটায় দীর্ঘদিন ওর কথা রেখেছে।

মূর্তিটি শেষ করেই ও উঠে পড়ল। লাঞ্চ টাইমের আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি।

যাবার সময় বলে গেল, তুমি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে এই সিটিংয়ের সময়কার পোশাক পরে মূর্তির কাছে দাঁড়াবে। আমি শেষবারের মতো মূর্তির সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে দেখব।

আমি ওর কথা মতো পিঙ্ক রঙে ছোপানো মসলিন পরে, ফিলগিরির সূক্ষ্ম ধবধবে অলঙ্কারে সেজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

চন্দ্রভানু লাঞ্চ শেষ করেই চলে এলো। পোশাক বদলে এসেছে। চুড়িদার, গুরু পাঞ্জাবির ওপর চাপিয়েছে ঘি রঙের জহরকোট। একেবারে ছিমছাম পরিষ্কার। মানিয়েছে বেশ। চন্দ্রভানুর রঙ ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দারুণ পৌরুষ-দীপ্ত চেহারা। বন্ধু যুধাজিতের রূপ ঈশ্বরদত্ত। ওরা পাঞ্জাবি হিন্দু। যেমন হৃদয়বান তেমনি সেন্টিমেন্টাল। কি করে যে ও আর্মিতে গেল কে জানে। যেখানেই যাক, মাসে একটি করে দীর্ঘ চিঠি ওর আসবেই। আমরা দুজনে যেন ওর প্রাণ।

ও একটু থেমে বলল, আসল ঘটনা থেকে ক্রমে দূরে সরে আসছি। এখন চন্দ্রভানুর কথাই শোনো।

সেদিন ওর নির্দেশমতো আমি তৈবি মূর্তিটির ওই অনন্যভঙ্গি অনুকরণ করে দাঁড়ালাম। আমার সূক্ষ্ম পোশাক আর অলঙ্কার সম্ভবত আমার উদ্ধত যৌবনকে আবৃত করতে পারেনি। ওই গোলাপি আভার বস্ত্রের আড়ালে হয়তো আগুনের মতো জ্বলছিল আমার যৌবনশ্রী।

হঠাৎ আমার মগ্নতা ভেঙে গেল। আমি চমকে উঠলাম। পেছন থেকে চন্দ্রভানু তার বলিষ্ঠ দুটো হাতে আমার প্রায় নিরাভরণ দেহটাকে জড়িয়ে ধরেছে। শুধু তাই নয়, ও সবলে আকর্ষণ করছে আমাকে।

প্রথমটায় আমি হতচকিত হয়ে গেলাম। আত্মরক্ষার একটা শক্তি যেন তখন আমার ওপর ভর করেছে। মুহূর্তের মধ্যে আমি ফিরে দাঁড়িয়ে ওকে প্রবল আঘাতে সরিয়ে দিলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল, ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষ।

অল্প সময়ের ভেতরেই আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। ওকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনলাম, এত শক্তি তোমার!

আমি যেমন ওর কাছে থেকে এ ধরনের ব্যবহার আশা করিনি, চন্দ্রভানুও তেমনি কল্পনা করতে পারেনি তার প্রিয় নায়িকার কাছ থেকে এ ধরনের প্রত্যাখ্যান। ও বিস্মিত, হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

তখনও চন্দ্রভানুর বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

ওকে প্রবলশক্তিতে সরিয়ে দিয়েই আমার মনে অনুশোচনা এসেছিল। সেটা প্রকাশ না করেই আমি বললাম, চন্দ্রভানু, শক্তিটা অমার দেহের নয়, এ দেহের ভেতরে থেকে যিনি আমাকে সবসময় রক্ষা কবছেন, তাঁর।

নির্বাক চন্দ্রভানু শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, পলক পড়ছিল না তার চোখে।

এবার আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ওর দুটো হাত আমার বুকের কাছে তুলে নিয়ে বললাম, আমার এই শরীর আর মন একদিন তোমাকে উৎসর্গ করব বলে সযত্নে রক্ষা করছি চন্দ্রভানু। সেই সবকিছু সঁপে দেবার দিন এখনও আসেনি। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি তোমার সবকিছু শেখা। তোমাকে অনেক ওপরে উঠতে হবে, এখুনি সংসারের ছোট্ট গণ্ডিটুকুর ভেতর জড়িয়ে পড়লে চলবে না।

আমার কথাগুলো ওর ভেতর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তা আমি বুঝতে পারলাম না। একসময় ও আমার বুকের ওপর ধরে রাখা হাত দুটোকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিল। একটুকরো ম্লান বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। ও মেঝের দিকে চোখ রেখে অগ্নিহোত্রী ভবনের গেট পেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

বললাম, ও নিশ্চয়ই তোমার কাছে আবার ফিরে এসেছিল।

এসেছিল সাতদিন পরে, তবে এবার একা নয়, এক বন্ধুকে সঙ্গে করে।

বন্ধু!

হ্যাঁ, বন্ধু। তোমার বিশেষ চেনা।

আমার পরিচিত কোনো মানুষ সেদিন ওর সঙ্গী হয়ে এসেছিল এ কথায় সত্যি আমি অবাক হলাম।

আমাকে বিমূঢ় অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সোনিয়া হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, তোমাকে আর হাতড়ে খুঁজতে হবে না। এবার বল, তুমি যুধাজিৎ নামের কোনো যুবককে চেন?

বললাম, ব্যক্তিগতভাবে না হলেও সে আমার খুবই চেনা। আর সেই চেনাজানার মাধ্যম এক ভারতবিখ্যাত নর্তকী।

তুমি দয়া করে ঐ বিশেষণটা এখন আর আমার নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিও না। সে ছিল আমার অতীত কোনো জন্মের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সে আলোর ঔজ্জ্বল্য এখন একেবারেই নিষ্প্রভ। আমি অনেক আগেই পাদপ্রদীপের সামনে থেকে সরে এসেছি।

আমি বললাম, তুমি এখন যুধাজিতের কথা বল। তোমাদের তো কাশ্মীরে ওর কাছে যাবার কথা ছিল।

সোনিয়া বলল, নানা কারণে ওকে কথা দিয়েও আমরা কাশ্মীরে যেতে পারিনি। ও কিন্তু চিঠিতে আমাদের কিছু না জানিয়েই দেরাদুনে বিশেষ একটা কাজ নিয়ে এসেছিল। ঐ পথেই পুরানো দোস্তি ঝালিয়ে নিতে লক্ষ্ণৌতে আবির্ভাব।

কদিন ও ছিল তোমাদের সঙ্গে?

মাত্র দুটো দিন। তাতেই ওর উচ্ছল হাসি-গানে আমরা থ্রি কমরেডস আমাদের পুরানো বন্ধুত্ব ফিরে পাই। শুধু তাই নয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও সে সময় আমরা নিয়ে ফেলি।

প্রসঙ্গটা আমিই উত্থাপন করলাম। চন্দ্রভানু কেবল আমাদের দেশে পড়ে থেকেই তার শিল্পচর্চা চালিয়ে যাক, এটা আমার মনঃপূত নয়।

যুধাজিৎ বলল, তুমি কি চাও?

আমি চাই ও ইতালিতে চলে যাক। মিকেলাঞ্জেলোর মতো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের কাজগুলো ও নিজের চোখে দেখুক। ওখানে যেসব গুণী স্কাল্পটর এখনও রয়েছেন তাঁদেব কাছে প্রয়োজন হলে কাজ শিখুক।

যুধাজিৎ চেঁচিয়ে উঠল, উত্তম প্রস্তাব।

তাকে বাধা দিয়ে চন্দ্রভানু বলল, তুই আমার খরচ যোগাবি?

আমার মাইনের বড় অংশটা তোর জন্য রেখে দিতে পারি। সংসারে মা-বাবাকে হারিয়েছি

ছোটবেলায়। বলতে গেলে নিজের চেষ্টাতেই দাঁড়িয়েছি। তাই কারো দায়-দায়িত্ব আমাকে নিতে হয় না।

চন্দ্রভানু কৌতুক করে বলল, তোর অ্যামাউন্ট যতটাই হোক, সমুদ্রে বারিবিন্দু।

যুধাজিৎ হতাশ গলায় বলল, আমার সঞ্চয়ের ঘরে শূন্য। এর বেশি দেওয়ার ক্ষমতা তো আমার নেই রে।

আমি বললাম, ইতালিতে যাবার জন্যে তুমি মনে মনে তৈরি আছো কি?

অকারণে অক্ষমের মনে আশা জাগাচ্ছ কেন?

আমি বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললাম, তুমি যাবার সমস্ত আয়োজন কর, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

যুধাজিৎ খপ করে আমার হাত ধরে ফেলল, এ নইলে বন্ধু!

এবার চন্দ্রভানুর দিকে ফিরে বলল, আমার বেলা সিন্ধুতে বিন্দু দেখছিলে, এবার বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন কর।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, মাসখানেকের ভেতরে হেভি একটা অ্যামাউন্ট আমার হাতে আসবে। এর মধ্যে তুমি বিদেশে যাওয়ার খুঁটিনাটি সব কিছু সেরে ফেলো।

আমি দেখলাম, নতুন প্রস্তাবে চন্দ্রভানুর মুখে উত্তেজনার একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে। ওর মনের ভেতরেও যে দূরদেশে কাজ করতে যাবার একটা বাসনা জেগেছে এতে আমি মনে মনে দারুণ তৃপ্তি পেলাম। আসলে আমি মনেপ্রাণে চাইতাম, ও বড় হোক।

চলে গেল চন্দ্রভানু। আমি ওকে এয়ারপোর্টে বিদায় দিতে গিয়েছিলাম। ওকে ছেড়ে থাকার হাহাকারটুকু আমি সযত্নে চেপে রেখেছিলাম আমার বুকের মধ্যে। বিদায়টা হাসিমুখেই দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সাধনায় সফল হয়ে ফিরে এসো।

ওর চোখ দুটো ছোট হয়ে এসেছিল। ও করুণ চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। নতুন দেশে যাবার উৎসাহ, উদ্যম, আর নিজের দেশ, নিজের মানুষকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ একাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ওর চোখে-মুখে।

এবার আমি বললাম, সোনিয়া সত্যিই তুমি একটি মহৎ কাজ করলে। অর্থ অনেকের আছে, সেটা সঞ্চয়ের ভেতরেই আবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাকে তুমি সফলতার পথ দেখিয়েছ।

ও স্থির হয়ে কিছু সময় বসে রইল। তারপর বলল, আমি জানি না আমার ওই অর্থ সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছিল কিনা।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, তোমার এ কথার অর্থ?

তরুণ বয়সে আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করতাম না। নিজের শক্তিতে বড় বেশি বিশ্বাস ছিল আমার। কিন্তু একদিন আমার সে ভুল ভাঙল। আমার সকল শক্তির অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল।

একথা কেন সোনিয়া?

ও ম্লান একটি হাসি হেসে বলল, এ পর্বের শেষটা এখন থাক, সময়ে সব জানতে পারবে। এখন চল কাশ্মীরে যাই।

চন্দ্রভানুর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চার মাস পরে আমি কাশ্মীরে গেলাম। একা একা বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল। আমি টাকা পাঠানোর একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। ও প্রাপ্তি স্বীকার করে চিঠি দিত। ওখানে এক ল্যান্ডলেডির বাড়িতে ও থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। খরচ কিছু কম পড়ত। ভদ্রমহিলার বাগানে পাথর কেটে কাজ করার সুবিধা ছিল। উনি চন্দ্রভানুকে বেশ স্নেহের চোখেই দেখতেন। সেকথা আমি ওর চিঠি থেকেই জানতে পারি। এমনকি প্রথমদিকে উনি ওখানকার শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সঙ্গে চন্দ্রভানুর পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলেন।

ওর চিঠিতে আমার জন্য উত্তাপ থাকত। বন্ধু যুধাজিতের খোঁজখবরও নিত। পরে সম্ভবত কাজের চাপে ওর চিঠির পরিসর ও সংখ্যা কমে আসতে থাকে।

এবার আমিই বললাম, তোমার কাশ্মীর যাত্রার কি হলো?

আমার একা একা খুব খারাপ লাগছিল, তাই যুধাজিতকে লিখলাম, তুমি দু-চারটে দিন ছুটি নেবার ব্যবস্থা কর, আমি কাশ্মীর যাচ্ছি। থাকার সব রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেরত ডাকে আমাকে চিঠি দিও।

যুধাজিতের চিঠি এল, অতীব শুভ সংবাদ দিচ্ছি, তোমার সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। কবে রওয়ানা দিচ্ছ সত্বর জানাও।

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, সাতদিনের ছুটির জন্য আবেদন করেছি। লেফটেনান্ট কর্নেল মিঃ অরোরার বড়ই স্নেহধন্য আমি। তাঁর কাছে আবেদনটি রেখেছি। মঞ্জুর হবে সেন্ট পারসেন্ট ভরসা।

আমি তারিখ জানিয়ে ওকে চিঠি দিলাম। ফুটনোটে লিখলাম, মিঃ অরোরার তোমাকে দামাদ করার অভিপ্রায় নেই তো?

শেষ শরতের কাশ্মীর। শীতকাতুরে দোয়েলরা ডানা মেলে উড়ে গেছে আর একটু উষ্ণতার সন্ধানে। উত্তুরে হাওয়ার দমকে মাঝে মাঝে ছুরির ধার ঝলসে ওঠে। এখন দিশি টুরিস্টরা ঘরমুখো। একে একে বিদেশি টুরিস্টরা আসতে শুরু করেছে গুলমার্গে স্কী-র আসর জমাবে বলে।

কাশ্মীরে এ আমার প্রথম যাত্রা। স্বপ্নে দেখেছি কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন হয়নি। জম্মুর বাস পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা হয়ে গেল। যুধাজিৎ বাস স্ট্যান্ডে বহু সময় ধরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি বাসে ও আমাকে সন্ধান করে ফিরেছে।

দীর্ঘ পথযাত্রায় যাত্রীরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বাস স্ট্যান্ডে ওকে দেখতে পেয়েই আমার সমস্ত ক্লান্তি কেটে গেল।

আমি মাঝপথেই গরম পোশাক পরে নিয়েছিলাম। বাসের ভেতর জানলা বন্ধ ছিল। তাই বড় একটা শীত বোধ করিনি। কিন্তু বাস স্ট্যান্ডে নামামাত্র কনকনে হাড় কাঁপানো শীত আমাকে যেন জড়িয়ে ধরল। আমি যুধাজিতকে দেখছি, মনের খুশি প্রকাশ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠক ঠক করে কেঁপে উঠছে আমার সারাদেহ।

ও আমার অবস্থাটা বুঝে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। একটা টাঙ্গায় আমার জিনিসপত্র তুলে দিয়ে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে ও উঠে বসল। অন্ধকার গাছপালার ভেতর দিয়ে টাঙ্গাটা ছুটে চলল গন্তব্যস্থানের দিকে। শীতের রাত কাঁপিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আওয়াজ।

অন্ধকার টাঙ্গার ভেতরে যুধাজিৎ আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে নিয়ে বসেছিল। কিন্তু আমি ওর ভেতরে কোনওরকম উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিনি।

অন্ধকার আকাশ। চাঁদ মায়াময় হয়ে নিজেকে লুকিয়েছিল পাতলা কুয়াশার আড়ালে। ট্যুরিস্ট সিজন্, তাই রাত দশটাতেও ঝলমল করছিল ডাল লেক। সুসজ্জিত হাউসবোটগুলো আলোর মালায় সেজেছিল। তাদের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বগুলো কাঁপছিল লেকের জলে। তখনও শিকারাগুলো তীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছিল যাত্রীর আশায়।

আমরা সুসজ্জিত একটা শিকারায় উঠে বসে নির্দিষ্ট হাউসবোটের দিকে রওয়ানা দিলাম।

ধবধবে সাদা তিন কামরার আলোঝলমল হাউসবোট রাজহংসীর মতো ডালের জলে ভেসেছিল। আমরা ঢুকলাম ভেতরে। আগাগোড়া মেঝে লাল পুরু কার্পেটে মোড়া। ছোট-বড় দুটো বেডরুম, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, বিশাল ডাইনিং কাম ড্রইংরুম, আলমারিতে ঝকঝকে সব বই সাজানো। ঘরে ঘরে ঝুলছে দামি পর্দা। কাচের শার্সি দেওয়া জানালা, সেখানেও টাঙানো আছে হাল্‌কা রঙের পর্দা, দু'প্রান্তে সাদা লেসের কাজ। বাহারি সব আলো ঝুলছে সিলিং থেকে।

একটা ঘরে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে আমি পোশাক পাল্টে নিলাম।

দরজায় কেউ নক করছিল, এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলাম। যুধাজিৎ।

প্রিন্‌সেসের পছন্দ হয়েছে?

হেসে মাথা নাড়লাম। মুখে বললাম, তুমি থাকছ তো?

সিওর। এখন ছুটিতে। বন্ধু এসেছে, তাকে ছেড়ে ব্যারাকে কাটাব নাকি?

দারুণ উৎসাহে বলে উঠলাম, দিল খুশ হয়ে গেল।

ও বলল, এখন চল, ডিনার সার্ভ করছে। খুশবু ছড়িয়ে পড়ছে প্লেট থেকে।

ডিনার টেবিলে বসে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাকিংহাম প্যালেসে এনে তুলেছ দেখছি।

যুধাজিৎ বলল, দ্রোণগ্রামের রাজকুমারী আর লক্ষ্ণৌ-এর বাদশাজাদীর একটা সম্মান আছে না? নীল আকাশের নিচে, ঘাসের জাজিমের ওপর, জ্যোৎস্নার ফিনফিনে মশারি টাঙিয়ে তো আর তাকে শোয়ানো যায় না।

বললাম, তোমার বিবেচনায় আমি বিগলিত। এখন ভোজ শুরু হোক।

বন্ধু হিসেবে যুধাজিৎ সত্যিই তুলনাহীন। ওর দেহের সৌন্দর্য আর মনের ঐশ্বর্য যে কোনো নারীর কামনার বস্তু।

আমরা শিকারায় চাঁদোয়া টাঙানো যুগল সিংহাসনে বসে ডাল, নাগিন, মানসবল লেকে হংসমিথুনের মতো উড়ে বেড়ালাম। শালিমার বাগে চিনার গাছের সোনালী, ব্রাউন পাতা ঝরা দেখতে দেখতে, ঝর্ণার গান শুনতে শুনতে, আর বাতাসে গান ভাসিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম।

যুধাজিৎ বলল, বেশ সুরেলা গলাটি তো তোমার।

ভাগ্যিস আর কেউ শোনেনি।

কেন আমি কি বানিয়ে বলছি নাকি?

থাক। যদিও বা উচ্ছ্বাসে এক-আধটা গাইতাম, অকারণ প্রশংসায় ওটি বন্ধ হয়ে গেল।

তোমার রাজ্যে আমি আর অনধিকার প্রবেশ করতে চাই না।

শোনমার্গ, গুলমার্গ, ইউস্‌মার্গ দেখা শেষ করে আমরা পহেলগাঁওতে চলে গেলাম। সেখানে দুজনে হাত ধরাধরি করে লিডারের জলে পা ডুবিয়ে হাঁটলাম। পাহাড়ের পর পাহাড়, সারি সারি পাইন সারিবদ্ধ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে এখুনি পাহাড় থেকে নেমে আসবে।

যুধাজিৎ বলল, এই পহেলগাঁ হয়ে শত শত যাত্রী চলে যায় অমরনাথ দর্শনে।

আমি অভিমানের সুরে বললাম, আমার ভাগ্যে আর অমরনাথ দর্শন হবে না।

তুমি যাবে? আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দেব।

উঁহু, একা যাব না, গেলে তোমার মতো একজন সঙ্গী চাই।

এ বছর তো আর শ্রাবণী পূর্ণিমা আসবে না, পরের বছরের জন্য তৈরি থেকো। আমি ডিউটি নিয়ে নেব। হয়তো তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, কিন্তু দেখভাল করতে পারব।

বললাম, যাত্রাপথ খুবই দুর্গম, কিন্তু মনোরম।

যুধাজিৎ বলল, আমি দেখে এসেছি, তুমি দারুণ এনজয় করবে। শেষনাগের হ্রদ, মহাগুণাসের দুর্গম পথ, পঞ্চতরণীর জলপ্রবাহ আর যেদিকে তাকাই বরফ, বরফ আর বরফ—এসব চিরদিনের মতো তোমার মনে গাঁথা হয়ে থাকবে।

বললাম, প্লিজ, আর লোভ দেখিও না, অমরনাথের কৃপা হলে ঠিক এসে পৌঁছব, তোমার সঙ্গে দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ভোরবেলা থেকেই হাউসবোটগুলোতে অজস্র নৌকো ভিড় করে আসে। শালওয়ালা শাল নিয়ে আসে, ফুলওয়ালি ফুল নিয়ে আসে, সবজিওয়ালা আনে সবজি আর ফলওয়ালা আনে টাটকা রঙিন সব আপেল।

একদিন শ্রীনগরের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে পথের একটা শোকেসে দারুণ সুন্দর কাজ করা একটি লেডিস ক্লোক দেখলাম।

যুধাজিৎ বলল, এ ক্লোকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমার কেমন লাগছে?

কেন, কোনও বান্ধবীকে দেবে নাকি?

হ্যাঁ, আমার খুবই পরিচিতা একটি মেয়ে। অনেকদিন থেকে ভাবছি তাকে কিছু একটা দেব আজ হঠাৎ ক্লোকটা চোখে পড়ে গেল। তা হলে কিনেই ফেলি, কি বলো। আমার উপহারটুকু পেয়ে হয়তো সে খুশি হবে।

ক্লোকটা কেনা হলো। অফ-হোয়াইটের ওপরে দু-রকম ব্লু আর পিংকের কাজ। হাঁসের পায়ের পাতার মতো চিনার আর ঝুঁটিওয়ালা বুলবুল ক্লোকটার বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে আছে।

আমি দোকানিকে ক্লোকটা ভালভাবে প্যাক করে দিতে বললাম।

যুধাজিৎ অমনি বলল, আরে তুমি একটু পরো, দেখি, মেয়েটিকে মানাবে কিনা।

বললাম, তোমার কোনও বন্ধুর বোন বুঝি?

না, আমার বন্ধুর প্রেমিকা।

আমি ক্লোকটা গায়ে চাপালাম।

পাশ থেকে যুধাজিৎ বলে উঠল, অপূর্ব!

আমি কান্নার সুরে বললাম, আমি কিন্তু পুরোটা দেখতে পেলাম না। হাউসবোট হলে ড্রেসিং টেবিলের মিররে সবটাই দেখতে পেতাম।

যুধাজিৎ বলল, আর আক্ষেপের দরকার নেই, ওটা তোমার অঙ্গেই থাক।

আমি বললাম, না না, তা কেন হবে, তুমি আর একজনের কথা ভেবে কিনেছ, আমি তাতে ভাগ বসাতে যাব কেন? এটা ঠিক নয়।

যুধাজিৎ আমার দুটো হাত ধরে আমার গায়ের ক্লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, ভারি চমৎকার মানিয়েছে, ওটা তোমার জন্যেই কিনেছি।

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, তাহলে বললে কেন তোমার বন্ধুর প্রেমিকার জন্য কিনেছ?

যুধাজিৎ অদ্ভুত একটি হাসি উপহার দিয়ে বলল, আমি কি খুব ভুল বলেছি।

আমিও সোজসুজি বললাম, তুমি কি করে জানলে যে আমি চন্দ্রভানুর প্রেমিকা?

এটা জানার জন্য কি খুব গবেষণার দরকার?

আমি কোনও কথা না বাড়িয়ে স্থির হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

যুধাজিৎ বলল, তোমাকে মডেল করে ও যে মূর্তিগুলো তৈরি করেছে, তার প্রতিটিতেই তোমার চোখ-মুখের এবং ভাবনার ছবি ফুটে উঠেছে। কেউ কাউকে ভাল না বাসলে এমন ভাবটি ফোটাতে পারে?

বললাম, তোমার অনুমানকে মিথ্যে বলে সরিয়ে দিতে পারব না, তবে চন্দ্রভানুকে যুধাজিতের চেয়ে বেশি ভালোবাসি একথা জোর দিয়ে বলার সময় এখনও আসেনি।

একটু থেমে বললাম, সেদিন যখন শিকারায় চেপে মোগল গার্ডেনের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একটা সাদা হাঁস বড় বড় দুটো পাখা মেলে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তার পায়ের ছোঁয়ায় মুক্তোর দানার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল জলের কণা। সেদিকে প্রথম তুমিই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলে।

আমি বলেছিলাম, অপূর্ব। দুটো ডানা সমস্ত দেহটার ভার বয়ে নিয়ে চলেছে। তাই পাখিটা তার পেছনে তৈরি করতে পারছে মুক্তোর ঝালর।

যুধাজিৎ বলল, হাঁ, তুমি তাই বলেছিলে।

বললাম, সে পাখিটা আমি। আর তার দুটো সুদৃশ্য শক্তিমান ডানা তুমি আর চন্দ্রভানু। আমার সমস্ত গতি, সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা!

ওর হাতের চাপে সেদিন আমি অনুভব করেছিলাম, আমার কথাগুলো ওকে স্পর্শ করেছে।

দিন ফুরিয়ে এল রঞ্জন, আনন্দের দিন। সেবার আমি আর যুধাজিৎ কাশ্মীরে বড় আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। ভূস্বর্গকে দুজনে উপভোগ করেছিলাম, নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধনে থেকে।

যুধাজিৎ আমার একদিন আগেই চলে গেল। তার ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে আক্ষেপের শেষ ছিল না। পাঠানকোটে ট্রেনের রিজার্ভেশন অনুযায়ী শ্রীনগরে আমাকে একদিন বন্ধুবিহীন কাটাতে

হলো। আমি ভোরবেলা যুধাজিৎকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।

ভোরের গাড়িতে ও চলে গেল, আর সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম যুধাজিৎকে।

ও থামল দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি স্বপ্ন দেখলে সোনিয়া?

স্বপ্নের ভেতর কাশ্মীর ছিল না, ছিল বহুদিন আগেকার দেখা খাজুরাহো।

আমি সহাস্যে বললাম, স্বপ্নের ল্যাজামুড়ো কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সোনিয়া বলল, শোনই না। খাজুরাহো উৎসবে নাচের পরদিন আমরা খুঁটিয়ে দেখছিলাম, খাজুরাহো মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো।

যুধাজিৎই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটি মূর্তির দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি মূর্তি ?

বর্শাধারী এক সৈনিক তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি। যোদ্ধার হাত ধরে টেনে রেখেছে তার স্ত্রী। সারা হৃদয় বলছে, 'যেতে নাহি দিব।'

আমি বললাম, তবু যেতে দিতে হয়।

সোনিয়া বলল, আমার মতো শক্ত মনের মেয়েরও সকালে ওকে গাড়িতে তুলে দেবার সময় ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমার চোখে জল ছিল না, তবে ও আমার যে হাতখানা ধরে রেখেছিল, সেটা কাঁপছিল আমার মনের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে। আর কি আশ্চর্য! ঐ রাতেই আমি খাজুরাহোর মূর্তির স্বপ্নটা দেখলাম। শুধু তাই নয়, শেষে ঐ মূর্তিটা প্রাণ পেল, আর নরনারীর আকার ধারণ করল। তুমি শুনলে অবাক হবে, যোদ্ধার অবয়বটি ছিল অবিকল যুধাজিতের মতো।

ও থামলে আমি বললাম, এবারের সংযোজনটা আমাকে করতে দাও।

ও আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, স্বপ্নে দেখা যোদ্ধার প্রিয়তমার মুখটি নিশ্চয়ই এক সুন্দরী তরুণী বধূর ছিল, যার নাম সোনিয়া অগ্নিহোত্রী।

তোমার অনুমানটি একেবারে সত্য। কিন্তু সে রাতে যুধাজিতকে নিয়ে কেন এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম, বল তো রঞ্জন? আমি তো চন্দ্রভানুকে ওর শিক্ষাশেষে ফিরে আসার পর বরণ করব বলে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

আসলে দুজনকেই তুমি সমানভাবে মনেপ্রাণে ভালবেসেছিলে।

অন্যমনে সোনিয়া বলল, হয়তো তাই। একদিকে ভাস্কর আর চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে সংগীত-সাধক আর যোদ্ধা। দুজনেই তুল্যমূল্য। আমার প্রাণের অন্দরমহলে নিত্য ওদের আসা-যাওয়া। যে যখন কাছে থাকে, প্রবল আকর্ষণে সে তার কাছে টানে।

আমি বললাম, দুজনের সঙ্গেই তুমি আলাদা আলাদাভাবে কয়েক দিন করে কাটিয়েছ। এখন বল, দু-বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে কি ধারণা তোমার?

সোনিয়া বলল, দুজনের প্রতিভার দিকটা বাদ দিয়েই বলছি, যুধাজিতের নামটা সত্যিই সার্থক। ও ঘরে-বাইরে যোদ্ধা। ও বাইরের যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য তৈরি হয়েছে। আবার নিজের প্রথম রিপুটির সঙ্গে যুদ্ধ করেও সার্থক করেছে তার নাম। এত সান্নিধ্য তবু এমন সংযম।

আমি বললাম, তোমার শেষ কথাটা কিন্তু চন্দ্রভানু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

জানি, তুমি কি বলতে চাইছ। যুধাজিতের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই চন্দ্রভানুর। কিন্তু আমি ওর প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিলেও অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলে মনে করি না।

আমি সোনিয়ার প্রশংসা করেই বললাম, এটা তোমার মুক্ত মনের বিচার।

মুসৌরির বাংলোয় চন্দ্রভানুর আঁকা তিনটি ছবি দেখলাম। তিনটিই অয়েলের কাজ। সব কটাই অরণ্য আর নারীকে নিয়ে। নারীর ভূমিকায় বলাই বাহুল্য সোনিয়া অগ্নিহোত্রী।

বর্ষায় ভিজছে একটি কদম্ব তরু। তরুণ বয়সী বৃক্ষটির দুটিমাত্র পুষ্ট ডাল দু'দিকে প্রসারিত। ডাল থেকে অঙ্গুলির মতো বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি শাখা-প্রশাখা। তাদেরই ওপর সবুজ পাতার সমারোহ।

দুটি গোলাকার কদম ফুল ফুটেছে ডাল দুটির বাহুমূলে। ঝকঝকে সবুজ পাতার প্রান্ত থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল।

তরুতলে দুটি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী, পরনে অতি মিহি শাড়ি। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা। ভেতরের অবয়ব বেরিয়ে এসেছে সিক্ত মিহি বস্ত্রের আড়াল ভেদ করে।

নিচে লেখা আছে, 'বর্ষা-সিক্ত কদম্ব'।

দ্বিতীয় চিত্রটি আঁকা হয়েছে শীতের পরিবেশে। হাহাকার করছে পত্র-শূন্য ডাল। বৃক্ষের তলায় সেই রমণী। পরনে শ্বেত বসন। উত্তুরে হাওয়ায় উড়ছে তার আঁচল। রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে কপালে, স্কন্ধে আর পৃষ্ঠে। করুণ, বিষণ্ণ ছবি ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। ছবিতে হৈমন্তী-হিমের একটুখানি ছোঁওয়া লাগানো আছে।

ছবির নামকরণ করা হয়েছে, 'শীতের শাসন'।

শেষ ছবি, 'বসন্ত বাহার'। পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে আছে লাস্যময়ী রমণী। পরণে রক্তাম্বর। কণ্ঠে অশোক কুসুমের মালা। কবরী ঘিরে কিংশুকের প্রদীপ্ত প্রদীপ। অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে দুরন্ত যৌবন।

ছবি দেখছি আর মনে মনে বার বার বাহবা দিচ্ছি শিল্পীকে।

সব ছবি দেখা শেষ হলে বললাম, চন্দ্রভানু স্কাল্পটর না পেইন্টার?

সোনিয়া বলল, আগে তুমি ওর হাতে গড়া মূর্তি দেখ, তারপর বিচার কর।

আমি বললাম, তোমার মুখে ওর তৈরি ভাস্কর্যগুলির যে বর্ণনা শুনেছি, তাতে সবকটা মূর্তিই চোখের সামনে ভাসছে।

তবে বল?

ও নিজের প্রতিভায় শিল্পের এমন এক স্তরে উঠে গেছে যেখানে প্রতিটি মিডিয়ামে ও সার্থক। শিল্পের দেবতা ওর ললাটে এঁকে দিয়েছেন জয়তিলক।

সোনিয়া বলল, ও সত্যিই প্রতিভাধর। আমি ওর প্রতিভা বিকাশের জন্যই ওকে এত দূরে এত খরচ করে পাঠিয়েছিলাম। নিজের লাভালাভ অথবা স্বার্থরক্ষার কথা একবারও ভাবিনি।

পাঁচ

সে রাতে হঠাৎ বেশি রকমের শীত পড়ল। দুটো পুরু কম্বলের তলায় থেকেও ঘুম ভেঙে গেল। পরের দিন আমরা নেমে যাব রাজপুরের বাংলোয়। তার পরের দিনই দিল্লি রওনা হয়ে যাব। এবার আর দিল্লিতে থাকা হবে না। ট্রেনের রিজার্ভেশান হয়ে আছে।

শীতে প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে কম্বলের তলায় কাঁপছি। একসময় অনুভব করলাম, কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে কমে আসছে। মনে হলো, সারা ঘরে বেশ খানিকটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি কম্বল দুটো গলা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তাকালাম। কি আশ্চর্য! হালকা একটা লালের আভা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম। ঘরের কোণে চোখ পড়ল। বড়সড় একটা রুমহিটার জ্বালিয়ে তারই তাপে হাত সেঁকছে সোনিয়া।

আমার দিকে চোখ পড়তেই সোনিয়া বলল, কেমন শীত?

আগে ছিল, এখন নেই।

আমি হিটার এনে জ্বালালাম, তুমি জানতেই পারনি।

তুমি যে উত্তাপ ছড়িয়ে দেবে তা আমি জানব কি করে!

সোনিয়ার মুখে কৌতুকের হাসি, তুমি ভাবলে কি করে যে আমি একেবারে নিরুত্তাপ!

নিশি জাগরণের এমন অভ্যেস আছে তা তো জানতাম না।

বন্ধুদের সামান্যতম কষ্টও আমাকে জাগিয়ে দেয়।

আমি জানতে চাইলাম এখন রাত কত ?

তিনটে বেজে গেছে।

তুমি এখন শোবে, না আমরা শেষ রাতে দু'বন্ধুতে গল্পের আসর বসাব?

তোমার অভিপ্রায়টা বল, আমার কোনোকিছুতে আপত্তি নেই।

বললাম, মুসৌরির শেষ রাতটা তাহলে গল্পেই কাটুক।

ও বলল, বেশ। তোমার ঘরেই জমে উঠুক আরব্য রজনীর গল্প।

আমি বললাম, শাহ্‌রাজাদী, আমাদের বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আমার অজানা কিছু তথ্য তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই।

প্রশ্ন কর। তোমার গল্পের শেষ উপাদানগুলো আমি যোগান দিয়ে যাই। প্রশ্ন করতে কোনোরকম দ্বিধা রেখো না মনে।

আমি দেখছি, বর্তমানে সংসারের পথে তুমি একাই বিচরণ করছ, এই নিঃসঙ্গতাই কি তোমার সারা জীবনের সঙ্গী?

আমি কখনো নিজেকে নিঃসঙ্গ ভাবি না রঞ্জন। স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসারী মানুষের মতো আমি একটি সুখ-নীড় রচনা করতে পারিনি ঠিক কিন্তু তাতে আমার কোনো খেদ নেই। আমি ছোট সংসার হারিয়ে অনেক বড় একটি সংসারের স্বাদ পেয়েছি, এতেই আমার আনন্দ, আমার তৃপ্তি আর পূর্ণতা।

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গে আসছি, আশা করি উত্তর পাব।

অসংকোচে সব কথা বল, আমি নির্দ্বিধায় উত্তর দেব।

আজও তোমাব দিকে যে কেউ তাকাবে সে-ই বলবে যৌবনে তোমার রূপ ছিল অগ্নিশিখার মতো।

আমি সামান্য সময় কথায় বিরতি দিতেই ও বলল, সেই শিখায় কোনো আলোক-প্রেমী পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে কিনা জানতে চাও?

সে আগুনে পড়া এবং পোড়া যে একান্ত স্বাভাবিক তা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু আমার প্রশ্নটি সম্পূর্ণ আলাদা।

বল. কি জানতে চাও?

যৌবনে তোমার দিকে অনেক পুরুষই যে এগিয়ে আসবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু তুমি তাদের কিভাবে গ্রহণ করেছ?

বন্ধুর মতো।

তোমার নিজের কোনো দৈহিক কামনা ছিল না?

একসময় অন্যভাবে এ প্রশ্নের উত্তর তুমি পেয়েছ। অহল্যামাঈর উপদেশের উল্লেখ করেছিলাম আমি। কিন্তু আজ তোমাকে একটা উত্তর দিই।

আমিও রক্তমাংসে গড়া একটি মেয়ে। কেবল মনের নয় দেহের ক্ষুধাও আমার আর পাঁচ জনের মতো স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু রুচির দিকটা সাধারণের থেকে কিছু ভিন্ন হবার জন্য আমি সমাজের তথাকথিত ব্রাইট আর ব্রিলিয়েন্ট যুবকদের জীবনসাথী হিসেবে ভাবতে পারিনি। আমি তাদের কথাই বলছি, যারা ক্যারিয়ার তৈরির এক একটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র বিশেষ। রঞ্জন, দেহ দেওয়া-নেওয়া করে বেশিদিন বাঁচা যায় না, মনের মিল, রুচির মিল চাই। আমার দুর্ভাগ্য, সে রকম পুরুষের সন্ধান আমি বড় একটা পাইনি।

চন্দ্রভানু, যুধাজিৎ সম্বন্ধেও কি তোমার এরকম ধারণা?

আমার সৌভাগ্য, চলার পথে ওরকম প্রতিভাবান দুজন বন্ধুর দেখা আমি পেয়েছিলাম। আমার মনের বড় কাছে এসেছিল তারা।

তাহলে কি এমন বাধা ছিল, ওদের যে কোনো একজনকে নিয়ে সংসার রচনার?

বাধাকে মানুষ প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত বাধাকে অতিক্রম করা হয়তো সম্ভব নয়। অন্তত আমি তা পারিনি।

প্রথমেই আমি জানতে চাই চন্দ্রভানুর কথা, যে তোমার অর্থ-সাহায্য নিয়ে উচ্চতর শিল্প শিক্ষার জন্য ইতালি গিয়েছিল?

সে আর নিজের দেশে ফিরে আসেনি রঞ্জন।

আশ্চর্য! দেশের প্রতি তার এই বিমুখতার কারণ জানতে পেরেছ কি ?

ম্লান একটুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের রেখায়।

ও একসময় বলতে শুরু করল, আমি ওর খরচের টাকা, এক বছর সাত মাস মাত্র যুগিয়েছিলাম। তারপর ও চিঠিতেই আমাকে টাকা পাঠাতে বারণ করল। কারণ হিসেবে লিখল, ওর একটা মূর্তি দেখে ওখানকার এক ধনকুবের নাকি বহু অর্থ দিয়ে ওটিকে কিনে নিয়েছেন এবং কয়েকটি নতুন মূর্তির অর্ডারও পেশ করেছেন। এখন ওর হাতে নাকি আসছে অপর্যাপ্ত অর্থ।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, ওর চিঠিতে উত্তাপ আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেত নিশ্চয়ই?

ও ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই ওর চিঠিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারটা আমি ভাবতেই পারতাম না। তবে প্রথম দিকের চিঠিতে যে উষ্ণতার স্পর্শ থাকত তা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল।

এজন্যে তোমার মনে কি কোনোরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি?

না বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে আমার ভেতরে সহনশীলতা আর সবকিছু মানিয়ে নেবার একটা ক্ষমতা আছে। ওটাকে আমার আত্মরক্ষার একপ্রকার বর্ম বলেও ধরে নিতে পার।

এবার বল, তোমার ঐ নিষ্প্রভ হয়ে আসা উষ্ণতার পরিণতি কি ?

মনে আছে, পনেরোই ডিসেম্বরের একটি দিন। সেবার প্রবল কোল্ড ওয়েভে থরথর করে কাঁপছিল উত্তর ভারত। মৃত্যুসংখ্যাও বাড়ছিল দিনে দিনে। সেসময় আমি একটুখানি সেবার কাজ হাতে নিয়েছিলাম।

ও কথার মাঝে কিছু সময় থেমে যেতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ধরনের কাজ?

সোনিয়া বলল, আমি কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে পথে পথে ঘুরতাম। বিপন্ন বৃদ্ধবৃদ্ধা দেখলে তুলে নিতাম গাড়িতে। তাদের পৌঁছে দিতাম একটি সেবা প্রতিষ্ঠানে। ওখানে ওদের সেবা ও প্রতিপালনের জন্য বেশ কিছু অর্থ আমি ডোনেট করেছিলাম।

তারপর?

তুমি বুঝতেই পারছ রঞ্জন, সে সময় একটা উন্মাদনার ভেতর কেটে যাচ্ছিল আমার দিন। ঠিক পনেরোই ডিসেম্বর ইতালি থেকে ডাকে এলো একটি বড় প্যাকেট। খুলে দেখি, দশখানা বড় বড় ফটো।

ও অন্যমনস্ক হলে আমি বললাম, কিসের ফটো?

সোনিয়া বলল, লিজেন্ডস্ অব গ্রিস অ্যান্ড রোমের কাহিনীগুলো নিয়ে চন্দ্রভানু যেসব কাজ করছে তারই ফটোগ্রাফ।

অসাধারণ সব ভাস্কর্য রঞ্জন! ফটোগুলো দেখা শেষ করে আর একখানা মুখবন্ধ খাম খুললাম। ওতেও ছিল একখানা চমৎকার ফটো। অনুমান কর দেখি, কার ফটো?

নিশ্চয়ই ভাস্কর চন্দ্রভানুর।

তোমার অনুমান সঠিক, তবে অসম্পূর্ণ।

তুমি সম্পূর্ণ করে দাও।

দুজনের ফটোগ্রাফ। তার নিচে লেখা আছে, 'ভাস্কর ও তার মডেল'।

সঙ্গে অতিক্ষুদ্র একটি চিঠি। লিখেছে, চন্দ্রভানু।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল। মডেল লুইসা ভালমোরির সঙ্গে চন্দ্রভানুর অঙ্গুরি বিনিময় হয়ে গেছে। নববর্ষের প্রথম দিনে বিরাট এক পার্টির আয়োজন করেছে লুইসার বাবা।

সংক্ষিপ্ত সমাচারের পর পুনশ্চ দিয়ে চন্দ্রভানু লিখেছে, বিদেশে সম্পূর্ণ বিত্তহীন এক ভাস্করকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য যে সাহায্য তুমি পাঠিয়েছিলে, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের বিয়েতে প্রদত্ত পার্টির পর একটা ভাল অ্যামাউন্ট লুইসার হাতে আসবে। আশা করছি ওতেই তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব।

আমি মন্তব্য করলাম, চমৎকার!

সোনিয়া বলল, আমি কিন্তু চন্দ্রভানুকে ঐ চিঠির জন্য অপরাধী বলে ভাবতে পারিনি। কারণ আমিই প্রথম ওর যৌবনের আবেগকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। জান রঞ্জন, ওর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আমি কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারিনি।

আমি এ বিষয়ে আর কোনোরকম বিতর্কে গেলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, ঋণ পরিশোধের পর চন্দ্রভানু কি তোমার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রেখেছিল?

সোনিয়ার মুখে বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, আমার পাঠানো অর্থ পরিশোধের সুযোগ আমি চন্দ্রভানুকে দিইনি। ফেরৎ ডাকেই ওর কাজের প্রশংসা করে চিঠি পাঠালাম। লুইসার মতো রূপবতী মেয়েকে নির্বাচনের জন্যে ওকে আন্তরিক সাধুবাদ জানালাম। শেষে পুনশ্চ দিয়ে আমিও লিখলাম, ঐ অ্যামাউন্ট আমার কাছে আর পাঠিও না। বন্ধুর নববধূর জন্য ওটুকু আমার সামান্য উপহার হিসেবে গ্রহণ করলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

আমি বললাম, তারপর ওদিক থেকে কোনোরকম সংবাদ কি আর এসেছিল?

না, আর সেজন্যে আমি আজও ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ জানাই।

এবার আমি প্রশ্ন করলাম, জীবনের এতখানি পথ পেরিয়ে আসার সময় কোনোদিন কি তোমার মনে হয়নি চন্দ্রভানুকে হাতের নাগালের ভেতর পেয়েও তুমি হারিয়েছ?

তা কেন হবে রঞ্জন, আমি তো চন্দ্রভানু বলে একজন রক্তমাংসে গড়া, কামনা-বাসনায় পূর্ণ পুরুষকে ভালবাসিনি, আমি নিজে শিল্পী, তাই যথার্থ একজন শিল্পীকে ভালবেসেছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই একমত হবে যে, একজন শিল্পীর পরিচয় তার শিল্পে। তাই আমার মনে হয়, চন্দ্রভানু নামের শিল্পীটিকে কোনোভাবেই আমি হারাইনি। আমাকে নিয়ে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি আমারই কাছে থেকে গেছে। আমি তার পাথর কাটার হাতুড়ির ধ্বনি আজও আমার বুকের ভেতর শুনতে পাই।

এতগুলো কথা একটানা বলার পর ও চুপচাপ বসে রইল।

আমি বললাম, এখন চন্দ্রভানু পর্বের ইতি হোক।

ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, রাতও এখন এসে ঠেকেছে শেষ পর্বে। কফি খাওয়া যাক কি বল?

উত্তম। তবে কফি ব্রেকের পর কি আমরা শেষ পর্বটা শুরু করব?

নইলে আর সময় কোথায়? ভোর হলেই তো ডানা মেলতে হবে।

আমি বললাম, আজ বরং টুকরো কথাতেই রাতটা কেটে যাক। কাল রাজপুরে পৌঁছে শুরু করা যাবে যুধাজিৎ-পর্ব।

সোনিয়া বলল, ঠিক আছে। তবে কাল রাজপুরে তোমার আর নিশি জাগরণ চলবে না।

এ কথা কেন সোনিয়া?

তুমি কি ভুলে গেছ, পরশু ভোরেই আমাদের দিল্লি যাত্রা!

আমি মহা উল্লাসে বললাম, কি সৌভাগ্য, দিল্লি যাত্রায় তুমি হবে আমার সঙ্গী!

ও বলল, অতিথিকে কিছু পথ এগিয়ে দিতে হয়। আমি কেয়ারটেকারকে ফোনে আগেই বলে দিয়েছি, গাড়িটা রেডি করে রাখতে। ও-ই আমাদের পৌঁছে দেবে।

মুসৌরির শেষ রাতটা আমরা নানা কথার ফুলঝুরি ঝরালাম। মুখে তারানার বোল তুলে কয়েক টুকরো নাচ দেখাল সোনিয়া। আমি ভাঙা গলায় গান গাইলাম দু'এক কলি।

আমাদের শেষ রাতের আসরে আমরা দুজনেই দর্শক, দুজনেই শ্রোতা, দুজনেই শিল্পী।

ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল আমাদের শৈলপুরীর মিলন মেলা।

ঠিক সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রেডি হয়ে রইলাম। সোনিয়া আমাকে উপহার দিল ওর বাগানের চমৎকার দুটো ক্রিমসন গ্লোরি রোজ। বেঁধে দিল সোনালী একটুকরো সুতোয়।

দেবার সময় বলল, আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট হোক।

আবার রাজপুর, সেই বাঁধানো রুদ্রাক্ষ গাছের তলা, অহল্যামাঈর কুঠি, দূরে কুয়াশার ছোঁয়ালাগা

শিবালিক পর্বতমালা। অপর পারে কিষাণপুরে নীলাকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমান্বিত মন্দির।

দুপুরে লাঞ্চের পর সোনিয়া প্রস্তাব দিল, হেথা নয়, হেথা নয়, 'চল যাই', অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।

বলাকা কবিতাটি দেখছি একেবারে আয়ত্ত করে ফেলেছ। কেবল আয়ত্ত নয়, যথাস্থানে প্রয়োগও। এখন বল কোথায় যেতে চাও?

ও প্রথমেই দুটো হাত কপালে ছুঁইয়ে বলল, আমার বাংলা বিদ্যের সবটুকুই অরুণদাদার দান। এখন আমরা যাব পায়দলে।

কোথায়?

ও আমার হাত ধরে বলল, এসো না আমার সঙ্গে।

কিছুটা উৎরাইতে হেঁটে আমরা আবার এসে পৌঁছলাম ঋষ্পর্ণা নদীর ধারে। প্রথম দিন যেখানে বসেছিলাম, জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মাঝবরাবর সেই শিলাস্তূপের ওপর দুজনে উঠে বসলাম।

সোনিয়া শুরু করল, বল লেখক, এবার তুমি কার কথা জানতে চাও? নিশ্চয়ই যুধাজিতের।

আমি হেসে মাথা নাড়লাম।

সোনিয়া বলল, বিস্ময়কর জীবন যুধাজিতের।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, কি রকম?

ইন্ডিয়ান আর্মির একজন লেফটেনেন্ট হিসেবেই ও পরিচিত। কিন্তু ওর হৃদয় আর জীবনের রহস্য সত্যিই অলৌকিকের পর্যায়ে পড়ে।

তুমি যুধাজিতের জীবনকে রহস্যাবৃত করছ না তো?

সবটুকু শোনার পরে মন্তব্য কর।

বেশ, আমি আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি শুরু কর তোমার কাহিনী।

সোনিয়া বলল, চন্দ্রভানুর চিঠি পেয়ে আমি একেবারেই আহত হইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। ও ফিরে এলে আমি যে ওকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতাম, তা ও জানত। তবু ওর আকস্মিক বিয়ের সংবাদটা আমাকে যত না আহত করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছিলাম ওর কৃতজ্ঞতা স্বীকার আর টাকা ফিরিয়েদেবার প্রস্তাবে। এর ফলে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্কটাও ছিন্ন হলো।

রঞ্জন, পাখির একটা ডানায় আঘাত লাগলে সে যেমন অন্য ডানাটাকে একমাত্র অবলম্বন ভেবে বিপুল বেগে ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করে, আমি তেমনি আহত অবস্থায় যুধাজিতকেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম। অন্য কোনো রূপে নয়, একজন নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে।

বললাম, তোমার যন্ত্রণার দিনে এ ভাবনাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

রঞ্জন, আমি একটি চিঠিতে ওকে শুধু লিখলাম, বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। যদিও জানি, সহজে ছুটি পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাতদিনও পেরোয়নি, লক্ষ্ণৌর 'অগ্নিহোত্রী ভবনে' বেল বেজে উঠল।

রঞ্জন, সব পাওয়ার আনন্দ মানুষ সহ্য করতে পারে না, চোখের জলে তার প্রকাশ ঘটে। আমি দরজা খুলে সামনে যাকে দেখলাম, তাকে জড়িয়ে ধরেই চোখের জলে ভাসতে লাগলাম।

হতবাক যুধাজিৎ। সে কিছু না বুঝেই আমাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল।

একটিমাত্র ব্যাগ ওর পাশে রাখা ছিল। আমি বললাম, তুমি একটা ফোন করলে না কেন, আমি গাড়ি নিয়ে স্টেশানে যেতাম।

ও অবলীলায় ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, এর জন্যে তোমাকে স্টেশানে টেনে নিয়ে যাব!

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ও বলল, রাত জেগে আসছি, আধঘণ্টা শাওয়ার খুলে চান করব। পেটে দাউ দাউ করে চুলো জ্বলছে, তাতে খাবার বোঝাই হাঁড়ি চড়াতে হবে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চানঘরে ঢোক তো আগে, বেরোতে না বেরোতেই দেখবে, খাবার রেডি।

খেতে খেতেই কথা হলো। আমি চন্দ্রভানুর খবরটা বিশদভাবে দিলাম।

শুনতে শুনতে ওর খাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, তুমি ঐ বেল্লিকটাকে পুরো টাকাটা ছেড়ে দিলে!

আমি তো টাকাটা ওকে ঋণ হিসাবে দিইনি, যে ফিরিয়ে নেব। যা দান তা একেবারেই নিঃশর্ত দিয়ে দেওয়া।

ও জানতে চাইল, তোমার চিঠি পাঠানোর পর আর কোনো চিঠি আসেনি?

আজ অবধি নয়।

ও বেশ জোর দিয়েই বলল, আর আসবেও না। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হলো না বলে ও সুখেই নিদ্রা যাবে।

ও কিন্তু টাকাটা ফিরিয়ে দিতেই চেয়েছিল।

তার কারণ, তোমার চেয়ে ও তোমাকে অনেক বেশি চেনে। তুমি যে টাকাটা একেবারেই নেবে না তা ও ভাল করেই জানত।

রঞ্জন, মাত্র কয়েকটা দিনের ছুটি নিয়ে যুধাজিৎ এসেছিল, যাবার সময় আমার সমস্ত হৃদয়টাকে হরণ করে নিয়ে চলে গেল। ও তখন আমার কাছে একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমার প্রিয়, আমার সচিব, আমার সখা।

এবার একটা প্রশ্ন করি, হয়তো তালভঙ্গ হবে, অপরাধ নিও না।

বল কি জানতে চাও?

যুধাজিৎ চলে যাবার আগে তোমাদের ভবিষ্যৎ সংসার রচনার কোনো কথা কি হয়েছিল?

এ বিষয় নিয়ে খোলাখুলি কোনো আলোচনা না হলেও আমরা যে পরস্পরকে নিবিড় করে পেতে চাই, এটা দুজনেই অনুভব করেছিলাম।

তারপর কি হলো, সেটা জানার জন্য আমি এখন উদ্‌গ্রীব।

সোনিয়া বলল, তুমি তো দেখছ, আজও আমি সংসারে সন্ন্যাসিনী। একাই আনন্দ সৃষ্টি করছি, একাই ভোগ করছি।

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলম, এখন যুধাজিতের খবর দাও, সেও কি চন্দ্রভানুর পথ অনুসরণ করল নাকি?

রঞ্জন, আমার এ বন্ধুটি অন্য ধাতুতে গড়া। ও শেষ চিঠিতে লিখেছিল, তুমি নিশ্চয়ই কাগজ থেকে জানতে পারছ, তুমুল লড়াই বেঁধেছে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের ভেতর। আমি কালই চলে যাচ্ছি কচ্ছের রান অঞ্চলে। ঐ ফ্রন্টে এখন চলেছে দু'পক্ষের মুখোমুখি লড়াই। আমার চিঠি না পেলে অস্থির হয়ো না। দেখা আমাদের হবেই।

ও চুপ করে যেতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

সব শেষ।

কি রকম!

পুরো একটি মাস আমার কি উদ্বেগের ভেতর কেটেছে তা বলে বোঝাতে পারব না। শেষে আমার সব উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের ছাপমারা চিঠি এলো, যুধাজিৎ মেহ্‌রা রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে।

খবর পেয়ে আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বুকের ওপর তখন বিপুল একটা পাথরের ভার। প্রায় তিন দিন মূর্ছিতের মতো পড়েছিলাম বিছানার ওপর।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজ থেকে জানা গেল, দু'পক্ষের যুদ্ধবিরতি ঘটেছে। শান্তির একটি সীমারেখাও টানা হয়েছে। রুক্ষ মরুসীমার পরে কিছুটা সবুজ অংশ এসেছে ভারতের দিকে।

আমার হঠাৎ কেমন যেন একটু সন্দেহ হলো। মৃত্যুর যে তারিখ দেওয়া আছে তা প্রায় একমাস আগেকার। কিন্তু এতটা লম্বা সময় পরে তো মৃত্যুর খবর আসার কথা নয়।

সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে আমি নানা সূত্রে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে দেখা হয়ে গেল মালহোত্রা সাহেবের সঙ্গে। উনি ঐ সেক্টরে যুধাজিতের বস ছিলেন। ওঁর নাম যুধাজিতের মুখে আমি বার বার শুনেছি। উনি যুধাজিতকে খুবই ভালোবাসতেন।

আমি অনেক খুঁজে ওঁকে আবিষ্কার করলাম। উনি আমার কথা শুনলেন খুব সহানুভূতির সঙ্গে। ওঁর মুখ থেকেই আমি জানতে পারি যুদ্ধের সব খবর।

ও স্থির হয়ে কিছু সময় বসে রইল দেখে আমি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বল, কি খবর জানলে?

মালহোত্রা সাহেবের আদেশ পেয়ে প্রায় একশো আর্মড ফোর্স নিয়ে সূর্যাস্তের অল্প পরেই যুধাজিৎ বেরিয়ে যায়। একটা ঢালু জায়গাতে নেমে গেলেই সামনে পাওয়া যাবে সবুজ সমতল। ওরা ঢালুতে নামার পর ঘাপটি মেরে বসে থাকবে চাঁদ ওঠা অবধি। চাঁদ ওঠা মাত্র ওরা বিপুল বেগে ধেয়ে যাবে বিপক্ষের ঘাঁটির দিকে।

অল্প দূরেই ট্রেঞ্চের ভেতব রয়েছে শত্রু সৈন্য। অতর্কিতে তাদের ওপর বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইন্ডিয়ান ফোর্স।

চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। ঝাঁক ঝাঁক গুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল বাতাসে। মালহোত্রা সাহেব ক্যাম্পে বসেই শুনতে পাচ্ছিলেন সে শব্দ।

একসময় গুলিগোলার আওয়াজ থেমে গেল।

মালহোত্রা সাহেব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, একটা কিছু খবর পাওয়ার জন্যে। কিন্তু সারা রাতের ভেতর একজনও ফিরে এলো না।

পরের দিন বিপুল সংখ্যক ইন্ডিয়ান ফোর্স এগিয়ে গেল কামান থেকে গুলিগোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

শত্রুপক্ষের সাড়া নেই। মার্চ করে অতি দ্রুত ইন্ডিয়ান আর্মি ঐ ঢালের কাছে পৌঁছে গেল।

হল্ট বলে বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে থামিয়ে দিল কমেন্ডার।

সামনে পড়ে আছে বিপুল সংখ্যক শব। ভারী মিলিটারি পোশাক পরা।

সবচেয়ে আশ্চর্য! ঢালের পরে শুরু হয়েছে যে সমতল তার কিছুটা অবধি কর্দমাক্ত একটা ডিচ্। ঐ ডিচ্‌টাব ওপর শত্রুরা ঘাসের চাপড়া, লতাপাতা এমনভাবে বসিয়ে দিয়েছে যাতে ওটাকেও সমতল বলে ভ্রম হয়।

সেই ফাঁদে আগের অধিকাংশ ব্যাটেলিয়ান পড়ে গিয়েছিল। তারা ভারী মিলিটারি পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাঁকে ভরা ডিচে পড়ে যাবার ফলে আর ওপর উঠতে পারেনি। শত্রু ওৎ পেতেই ছিল, তারা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সব কটিকে হত্যা করেছে। যে কজন ডিচের ওপরে ছিল, ভাগ্যক্রমে নামেনি, তারাও রক্ষা পায়নি শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে।

বেশ কিছু মৃতদেহ থেকে তাদের পরিচয় চিহ্নগুলি খুলে নেওয়া সম্ভব হলো। বাকি যারা ডিচে ডুবে গেছে, অথবা কোনো রকমে ওপারে উঠে গিয়ে হয়তো প্রিজনার হিসেবে ধরা পড়েছে, তাদের সবাইকেই মিসিং বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুধাজিৎ প্রথমে মিসিং লিস্টেই ছিল। তারপর ভারত, পাকিস্তানের যখন যুদ্ধবিরতি ঘটল, তখন বন্দী বিনিময়ও হলো। কিন্তু বন্দীদের লিস্টেও যাদের নাম পাওয়া গেল না তাঁদের ধরে নেওয়া হলো মৃত বলে। যুধাজিতও পড়ল ঐ মৃতের দলে। তাই তার ডেথ নিউজটা আসতে এতটা দেরি হয়েছিল।

আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার জীবন থেকে এমনিভাবে হারিয়ে গেল দু'দুজন বন্ধু!

মনের থেকে হারায়নি রঞ্জন। আজও তারা আমার অন্তরঙ্গ হয়ে আছে। আর তাই ...

ও চুপ করে রইল দেখে আমি সাগ্রহে বললাম, আর তাই কি?

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অস্বাভাবিক মনে করবে। কিন্তু আমি জীবনে আমার দেহে আর কোনো পুরুষের স্পর্শ নিতে পারিনি।

শুধু কি ঐ দুজন বন্ধুর কথা ভেবে?

অন্য কারণটা তোমার অজানা নয়। রুচি সম্বন্ধে একটা ভিন্নতর ভাবনা আমাকে ঘিরে রেখেছে রক্ষাকবচের মতো। যাদের জন্য ছিল আমার আকুল প্রতীক্ষা, তাদের অশ্বের ধ্বনি শুনলাম, কিন্তু সে ধ্বনি কাছে এলো না, মিলিয়ে গেল শ্রুতিপারে।

কথা বলতে বলতে কেমন যেন উদাস হয়ে গিয়েছিল সোনিয়া। ও তাকিয়ে রইল ওর জন্মস্থান, কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, তারুণ্যের স্বপ্নলোক সেই দ্রোণগ্রামের দিকে।

সোনিয়া শিল্পী, বহু ভাষাবিদ, কবি আর মরমী। সে স্বপ্নচারিণীও বটে।

কতক্ষণ পরে ও দ্রোণগ্রাম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

বর্ষাধোয়া এক ঝলক হাসি মুখে টেনে এনে বলল, এখন আমরা শেষ পর্বের শেষ পরিচ্ছেদে এসে গেছি, কি বল?

আর একটিমাত্র প্রশ্ন করব তোমাকে, তারপর তুমি বন্ধ করে দিও তোমার আত্মকথার মলাট।

ও বলল, বন্ধুর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করার জন্য আমি তৈরি।

বললাম, পরমার্থ নিকেতনের সেই সৌম্য পুরোহিতের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

ও হঠাৎ আমার একখানা হাত ধরে উদ্ভাসিত মুখে বলল, অসীম কৌতূহল তোমার, নইলে গঙ্গাঘাটের ঐ পুরোহিতের কথা জানতে চাইবে কেন?

বন্ধুর আরও একটি কৌতূহল ওর সঙ্গে যোগ করে নাও।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী সোনিয়া বলল, কয়েক দিন আমরা দুজনেই কেন গঙ্গার ঘাট থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলাম, এই কৌতূহল তো?

তোমার তীক্ষ্ণ ধী-র কাছে হার মানছি সোনিয়া।

ও এবার আমার হাতখানা নেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিল।

আমি গঙ্গাকে বড় ভালবাসি রঞ্জন। গঙ্গা আমার প্রাণ। গঙ্গার একটানা কুলু কুলু ধ্বনির সঙ্গে আমার নাড়ির ধ্বনি মিশে আছে। তাই হরদোয়ার, হৃষিকেশে আমি প্রায়ই চলে আসি।

আমি যখনই দিল্লি অথবা লক্ষ্ণৌ থেকে রাজপুরে আসি তখনই একবার গাড়ি নিয়ে এ দুটো জায়গায় ঘুরে যাই।

হরদোয়ার গঙ্গাতীরের হোটেলে থেকেছি কয়েকবার, সন্ধ্যায় পত্রপুষ্পের আধারে প্রদীপ ভাসিয়েছি গঙ্গার স্রোতে। ভক্তদের ভাসানো দীপগুলি আলোর মালার মতো ভেসে গেছে। সে এক আনন্দময় পবিত্র অনুভূতি রঞ্জন।

হৃষিকেশে এলে গঙ্গা আর গীতাভবন দর্শন করে রাজপুরে ফিরে যেতাম সন্ধ্যার আগেই। রাত্রিবাস করিনি কোনোবারেই।

হঠাৎ একদিন হৃষিকেশে বানপ্রস্থ আশ্রম তৈরির খবর পেলাম। একেবারে নতুন ঝকঝকে আশ্রম বিশাল জায়গা জুড়ে। পার্ক, মন্দির, অগণিত বাড়ি, শান্ত রম্য পরিবেশ, অত্যাধুনিক থাকার ব্যবস্থা।

জীবনের এতগুলো পর্ব পেরিয়ে এসে এবারই কেবল বাস করতে এলাম হৃষিকেশের নতুন গড়ে ওঠা বানপ্রস্থ আশ্রমে।

আমি মন্তব্য করলাম, সত্যি, জায়গাটি মনোরম।

সোনিয়া বলল, এ আশ্রমের খবর তুমি কি করে পেলে?

এক তরুণ দম্পতি তাদের ফুলের মতো একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে এখানে এসেছিল। ছোট সংসার, বড় আনন্দময় ভক্ত পরিবার। ওদের মুখ থেকে বানপ্রস্থ আশ্রমের খবর শুনি।

সন্ন্যাস গহণের আগের স্টেজ বানপ্রস্থ। তাই সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা একজন মানুষের পক্ষে ঐ আশ্রমের নামটা বড় শ্রুতিসুখকর নয়। আমারও মনে, আসার আগে খুঁতখুঁতুনি ছিল। কিন্তু ঐ মার্জিত তরুণ দম্পতির কথায় চলে এলাম। এসেই বুঝলাম, না এলে কত বড় আনন্দ থেকেই না আমি বঞ্চিত হতাম। প্রাপ্তির ষোল কলা অবশ্য পূর্ণ হলো তোমার সান্নিধ্যে এসে।

সোনিয়া বলল, এবার তোমার কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করব।

রঞ্জন, তোমার আসার আগে থেকেই আমি প্রায় একমাস কাল বানপ্রস্থ আশ্রমের বাসিন্দা। দোতলায় একটা বড় রুম, ব্যালকনি ইত্যাদি নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ আমার সংসার। অবশ্য সংসারটা সাময়িক।

বললাম, সামনে গঙ্গা, পেছনে পাহাড়, এই প্রথম সারির গঙ্গামুখো ঘরগুলো সত্যিই অপূর্ব।

সোনিয়া বলল, নিচেই ক্যানটিন, তবু আমি খাই স্বপাকে। পথের ধারের স্টল থেকে দরকারী সব জিনিস কিনে আনি। এখন শোন, বিশেষ এক দিনের কাহিনী।

সেদিন সন্ধ্যায় বাজারের পথে যেতে যেতে হঠাৎ কোনো একটা ঘাট থেকে ভেসে এলো গঙ্গাস্তোত্র। আশ্চর্য মাধুর্যে ভরা কণ্ঠস্বর। মনে হলো, ঐ স্বর আমার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করছে। এই ধ্যানগম্ভীর পর্বতমালা, এই প্রবাহিনী গঙ্গা, সেই সুর শুনছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুরের উৎস-সন্ধানে এগিয়ে গেলাম।

পরমার্থ নিকেতনের শ্বেতপাথর বাঁধানো ঘাটে তখন সুদৃশ্য দীপাধারে প্রজ্বলিত প্রদীপগুলি দুলিয়ে আরতি হচ্ছিল। শ্বেত বস্ত্র আর গৈরিক উত্তরীয়ে আবৃত এক দীর্ঘদেহী পুরোহিত আরতি করছিলেন। প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছিল তাঁর শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য মুখখানা। চাতালে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছিল বেশ কিছু ভক্ত নরনারী আর কয়েকজন ব্রহ্মচারী।

বুঝলাম, পাশের মন্দির থেকে ক্যাসেট চালিয়ে আরতির সময় ভক্তদের গঙ্গাস্তোত্র শোনানো হচ্ছে। ঐ ভরাট সুরেলা গলায় পরিবেশিত গান আমাকে যেন অতীত জন্মের কোনো সঙ্গীত-বাসরে নিয়ে যাচ্ছিল।

আরতি শেষ হলো। গঙ্গায় ভাসানো হলো, ফুলের অর্ঘ্য। থেমে গেল গান।

এবার শ্বেত প্রস্তরের বেদীতে এসে বসলেন পুরোহিত। ভক্তরাও বসল অল্প ব্যবধানে। বিশ-তিরিশ মিনিট ধর্ম প্রসঙ্গে কিছু কথা হলো। বেশ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে পুরোহিতের।

আমি সোনিয়াকে প্রশ্ন করলাম, কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেদিন?

সত্যি বলতে কি আমার মন সে সন্ধ্যায় ধর্ম প্রসঙ্গ শোনার মুডে ছিল না। কেবল পুরোহিতের দেহ-সৌষ্ঠব আর কণ্ঠস্বর আমাকে হন্ট করে ফিরছিল। হ্যাঁ, তবে একটি কথা মনে আছে। বানপ্রস্থ আশ্রমে ফিরে আসার সময়ে, যে মেয়েটি পুরোহিতকে প্রশ্ন করেছিল, কৌতূহল বশে তার নামটাও জেনে নিয়েছিলাম। ছাব্বিশ, সাতাশ বছরের ভারী সুন্দর মেয়েটি। মুখখানা করুণ, আর কেমন যেন বৃষ্টিভেজা।

ও কিছু সময় থেমে গেল দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি নাম মেয়েটির?

বিদিশা নাভাল।

কি প্রশ্ন ছিল মেয়েটির? তার উত্তরই বা কি দিয়েছিলেন পুরোহিত?

সোনিয়া বলল, কোনোরকম ভণিতা না করে, কোনোভাবে গোপনতার আশ্রয় না নিয়ে মেয়েটি অসংকোচে বলে উঠল, আমি যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি মহাত্মা।

এই শব্দ কটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল তার গলায় স্বর। বাকি কথাটুকু সে আর বলতে পারল না।

পুরোহিত বললেন, এই বোধ যখন এসেছে তখন সব পচনই পূর্ণ হয়ে যাবে। নিরাময়ের ওষুধ তো তুমি পেয়েই গেছ।

নাভাল বললেন, কিসের জন্য এই উচ্ছিষ্ট রোগপূর্ণ দেহটাকে রাখব?

অস্তিত্বের জন্যই দেহকে রাখতে হয়। দেহ জীবনকে ধারণ করে। মনের উত্তরণ, পরমাত্মার অন্বেষণ, সবই এই দেহ-নির্ভর জানবে। তবে দেহকেই সর্বস্ব বলে ভাবতে নেই। দেহ, দেবতার লীলাভূমি। তাকে মার্জনা করা, শুদ্ধ করা তোমার দায়িত্ব।

নাভাল আবার বলল, আপনি ভরসা দিচ্ছেন মহারাজ, এই পাপ দেহ ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়ে আসবে?

সেই সৌম্য পুরোহিতের মুখে প্রসন্ন হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, এখুনি গঙ্গার স্রোতে একতাল কাদা গুলে দাও, দেখবে হঠাৎ স্বচ্ছ জল ঘোলাটে হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখবে, জল একেবারে নির্মল, কাদার চিহ্নমাত্র নেই। বহতা জীবনও তাই, ময়লা তার ওপর চিরস্থায়ী দাগ রাখতে পারে না। একদিন সব ময়লা জীবনের স্রোতে ধুয়ে মুছে, ভেসে চলে যায়।

এবার কথায় অনেকখানি বিরতি ফেলল সোনিয়া। আমিও ওকে কোনোরকম প্রশ্ন করলাম না।

ও হঠাৎ কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল শিলাস্তূপটার ওপর। আমার হাত ধরে টেনে তুলল।

বাঁ হাতখানা রাজপুরের দিকে প্রসারিত করে বলল, দেখ, কেমন অসাধারণ সূর্যাস্তের দৃশ্য!

বড় বড় গাছপালার আড়ালে আটকে পড়েছেন দিনান্তের সূর্য। ফলার মতো ঝকঝকে হিরণ্ময় রশ্মিগুলো বেরিয়ে আসছে পত্রান্তরাল থেকে। তেজহীন কিরণ চোখের পীড়া না ঘটিয়ে আনন্দবর্ধন করছে।

ও কতক্ষণ পরে নিজে বসল, আমার হাত ধরে বসাল।

আমি বললাম, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। জল ঠেলে, বন চিরে, চড়াই ভেঙে যেতে পারবে?

পরম নির্ভরতায় হাতটি আমার হাতের ওপর রেখে সোনিয়া সংক্ষেপে বলল, চেনা পথ, চন্দ্রোদয়ের দেরি নেই।

পুরোহিত কয়েকদিনের জন্য কেদারনাথ যাবেন, এটা আমি এক ব্রহ্মচারীর মুখ থেকে শুনেছিলাম। তাই যথাসময়ে ওঁকে অনুসরণ করতে আমার অসুবিধে হয়নি। ওঁর নামটিও জেনে নিয়েছিলাম, আনন্দতীর্থ।

উনি কি জানতেন, তুমি ওঁর সঙ্গ নিয়েছ?

না, যাওয়ার পথে আমি ওঁর কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতাম।

বললাম, কার্যকারণ না জানলে মানুষের মনে কত না ভুল ধারণার জন্ম দেয়। তারপর?

উনি পায়ে হেঁটেই এগোচ্ছিলেন, আমি কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা বাসে চেপে এগোচ্ছিলাম। বাসে এগিয়ে গেলে কোনো একটা আস্তানায় ঠাঁই নিয়ে দূরে থেকে ওঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতাম।

গৌরীকুণ্ড থেকে শেষ পথটুকু আমি ঘোড়া নিয়ে ওঁর আগেই এগিয়ে গেলাম। দুপুরে পৌঁছে গেলাম কেদারনাথে। এত উচ্চতায় গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। এই পরিবেশে যিনি প্রথম মন্দির-পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি অসাধারণ এক সাধক-শিল্পী। পেছনে সুউচ্চ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তুষারশৈল। তার দুটি প্রসারিত বাহুর মতো দুদিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। মন্দিরের ডানদিকে বাসুকিতাল। তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা। তুষার পর্বতের কোলে নীলাকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব প্রস্তর নির্মিত দেবাদিদেব কেদারনাথের মন্দির।

আমি একটি আশ্রয় খুঁজে নিলাম। মন্দিরে সন্ধ্যারতি, দেখার মতো এক অনুষ্ঠান। বিশেষভাবে নৃত্যভঙ্গিমায় প্রজ্বলিত দীপগুলির বিগ্রহ-প্রদক্ষিণ।

আমি আরতি দর্শনের ফাঁকে ফাঁকে তাকিয়ে দেখছিলাম বাইরে সমবেত দর্শনার্থীর দিকে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি পরিচিত সাধুটিকে সে সন্ধ্যায় দেখতে পেলাম না।

পরদিন অপরাহ্নে মন্দিরের বাঁদিকের পাহাড় থেকে হৃষিকেশের ঐ সাধুটিকে নেমে আসতে দেখলাম। ওটি কিন্তু কেদারনাথে আসার পথ নয়। সাধু কখন এসে পৌঁছেছেন, কখনই বা ও পাহাড়ে উঠেছেন তা জানতে পারিনি।

আমি নিজেকে আড়ালে রেখে দেখতে লাগলাম। সাধু মন্দিরে এসে দাঁড়ালেন। ঝোলা থেকে বের করলেন কয়েকটি ব্রহ্মকমল।

মন্দিরের ভেতর থেকে অল্পবয়সী এক পুরোহিত বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে সাধু তুলে দিলেন ব্রহ্মকমলগুলি। কিছু পরে ফিরে গেলেন ঐ পাহাড়ের দিকে।

সকালেই মন্দিরের ঐ যুবক পুরোহিতটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর হাতেই আমি মন্দিরে পূজা পাঠিয়েছিলাম।

সাধু চলে গেলে আমি মন্দির অঙ্গনে পূজারীর কাছে উপস্থিত হলাম।

তাঁর কাছ থেকে সাধু সম্বন্ধে যা শুনলাম তাতে আমার শরীর হিম হয়ে গেল।

ঐ বাঁদিকের পাহাড়ের কিছু ওপরে ব্রহ্মকমল ফোটে। ওর কিছুদূরে সামান্য গুহার মতো একটি জায়গা আছে। ঐখানে সাধু থাকেন।

এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় উনি কি করে ঐ গুহায় থাকবেন, তা ভেবে আমি অস্থির হলাম। কিন্তু আমার মনে মনে অস্থির হওয়া ছাড়া কোনো কিছু করার ছিল না।

দু'দিন দু'বার কেদারনাথ মন্দির অঙ্গনে ওঁকে দেখেছি। তৃতীয় দিন ঘটনাটা ঘটল।

সোনিয়া সামান্য সময় থেমে আবার শুরু করল, সেদিন সন্ধ্যার আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। বিড়লা পরিবারের কয়েকজন আত্মীয় এসে উঠেছেন, বিড়লা আশ্রয় ভবনে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই বেশি। তাঁদের দুজনে এসেছেন একটি ডাণ্ডী ও একটি কাণ্ডীতে চেপে। বাকিরা সব ঘোড়ায়। ওঁরা পরদিন ভোরেই চলে যাবেন।

সন্ধ্যায় ছিল বিশেষ পূজা, আরতি। ঐ যুবক পুরোহিতটির কৃপায় আমি ঐ বিশেষ পূজা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সমারোহপূর্ণ আরতি দর্শনের শেষে আমি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, আমার পরিচিত যুবা পুরোহিতটি উদ্বিগ্ন মুখে প্রাঙ্গণে পায়চারি করছেন।

আমি কেমন যেন একটা বিপদের গন্ধ পেয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। কোনোকিছু জিজ্ঞেস করার আগেই উনি বললেন, অসুস্থ সাধুটি এইমাত্র নিচে নেমে গেলেন। টলতে টলতে চলেছেন।

আমি বললাম, যিনি আপনাকে ব্রহ্মকমল দিয়ে যেতেন?

আমার গলা কাঁপছিল।

হাঁ, ঐ সাধু।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, একটা ডাণ্ডী কিংবা কাণ্ডী কি আপাতত পাওয়া যাবে?

পুরোহিত বললেন, প্রায় অসম্ভব, তবু আমি দেখছি।

এই বলে উনি নিচে অতিথি বিশ্রামশালার দিকে নেমে গেলেন। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ফিরে এসে পুরোহিত বললেন, একটা ডাণ্ডী যেতে রাজী হয়েছে, তবে রামওয়াড়ায় নামিয়ে দিয়ে রাতারাতি এখানে ফিরে আসতে হবে। যাঁরা ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের ভোরবেলা নিয়ে যেতে হবে গৌরীকুণ্ডে। অনেক টাকা চাইছে।

ওরা যা চায় তাই দেব। কথা কটি এক নিঃশ্বাসে বলেই আমি আমার ব্যাগটা ঘর থেকে টেনে নিয়ে এসে অতিথিশালার দিকে নেমে যাচ্ছিলাম, পুরোহিত পেছন থেকে বললেন, হাই অলটিচিউডে অনেক সময় শ্বাসকষ্ট হয়, কিছুটা নিচে নেমে যেতে পারলে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে।

আমার তখন আর কোনো কথা বলার সময় বা অবস্থা ছিল না। আমি ফিরে তাঁকে শুধু একটি নমস্কার জানালাম। তারপর ডাণ্ডীবাহকদের সঙ্গে অতি দ্রুত নেমে গেলাম উৎরাই পথে।

উনি এই রাত্রিতে অসুস্থ অবস্থায় প্রবল শীতে কিভাবে পথে চলেছেন, তাই ভেবে আমি আকুল হচ্ছিলাম। শেষে আমার আশঙ্কাই সত্য হলো। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম, একটা বোল্ডারের পাশে পড়ে আছেন।

ডাণ্ডীবাহকরা আমার নির্দেশে ওঁর বুক ম্যাসেজ করে দিয়ে ওঁকে ডাণ্ডীতে তুলে নিল। উনি তখন আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ছিলেন। শ্বাস টানছিলেন দ্রুত।

কি করে যে সেদিন ডাণ্ডীওয়ালাদের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে আমি কেদারনাথ থেকে প্রায় চার হাজার ফিট নিচে রামওয়াড়াতে নেমে এসেছিলাম তা মুখে বলে বোঝাতে পারব না।

ডাণ্ডীওয়ালারা চলে গেলে আমি ওঁকে নিয়ে একটা চটিতে রইলাম। এত রাতে চটিওয়ালা উঠে আমাদের যেরকম সাহায্য, আপ্যায়ন করল তা কোনোদিনই ভুলতে পারব না।

ধুনি জ্বালিয়ে ঘর গরম করে দিল।

আমি সারারাত সাধুর মাথাটি কোলে নিয়ে বসে রইলাম। আমার ব্যাগ থেকে কম্বলটা বের করে ওঁর গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলাম।

ওঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হয়ে এল। উত্তপ্ত ঘরে বেশ আরামে উনি ঘুমোতে লাগলেন।

ভোরবেলা আমার ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার কোল থেকে উনি মাথাটা তুলতেই আমার চমক ভেঙে গেল।

ঘরের মেঝেতে বসে উনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

একসময় সবিস্ময়ে বললেন, আপনি এখানে! এই চটিতে আমাকে কে নিয়ে এল?

আমি সমস্ত পরিস্থিতিটা ওঁকে বুঝিয়ে বললাম।

উনি বললেন, আপনাকে আমি হৃষিকেশে পরমার্থনিকেতনের ঘাটে দেখেছি।

বললাম, আচ্ছা ভাবুন তো, আমাকে কি আগে আর কোথাও দেখেছেন?

হয়তো কাউকে দেখে থাকব, কিন্তু মেলাতে পারছি না।

আমি বললাম, আপনি কি কখনও লক্ষ্ণৌতে ছিলেন?

উনি চুপ করে থেকে বললেন, সে আমার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত। সাধু হবার পর পূর্ব জীবনের কথা ভুলে যেতে হয়। আমি সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি।

আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

একেবারে সুস্থ। হঠাৎ শ্বাসকষ্টে প্রায় জীবনসংশয় হয়েছিল। আপনি না এলে আমাকে হয়তো ওই পথেই পড়ে থাকতে হতো। অবশ্য আমি মনে করি, বাবা কেদারনাথই আমার জীবনরক্ষার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন।

এবার আমি বললাম, নিশ্চয় আমি আপনাকে লক্ষ্ণৌতে আগে দেখেছি। বিশ বছরের অদর্শনে আপনার চেহারার অনেক পরিবর্তন হলেও কণ্ঠস্বর, বিশেষ করে সঙ্গীতের কণ্ঠ আপনার অপরিবর্তিতই আছে।

ভোরের আলো যেমন ধীরে ধীরে অন্ধকারের আবরণটাকে সরিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক তেমনিভাবে সাধু আনন্দতীর্থ তাঁর বর্তমান আবরণটাকে সরিয়ে দিয়ে অতীতের দিকে তাকালেন।

আত্মমগ্ন অবস্থায় সাধু বললেন, আমি আমার যৌবনকালে লক্ষ্ণৌতে গান শিখেছিলাম। সে সময় সেখানে অনেক অনুষ্ঠানে আমি গান গেয়েছি।

আপনার গানের অনুরাগী কোনো বন্ধুর কথা কি আপনার মনে পড়ে?

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সাধুর দুটি চোখ। আমার মুখের দিকে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে থেকে একসময় বলে উঠলেন, তুমি কি সোনিয়া অগ্নিহোত্রী?

আমি সাধুর দুটো হাত ধরে বললাম, হ্যাঁ যুধাজিৎ, আমি তোমার ফেলে আসা জীবনের বন্ধু সোনিয়া।

নিজের হাতে চোখ দুটো ঢেকে কতক্ষণ বসে রইল সাধু যুধাজিৎ। একসময় চোখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, অগ্নিহোত্রীরা আগুনকে লালন করে, কোনও অবস্থাতেই তাকে নিভতে দেয় না। তুমিও তোমার বন্ধুত্বের আগুনকে এতকাল মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছ সোনিয়া।

আমি তখন আবেগে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারছিলাম না। বলে উঠলাম, তুমি এই মুহূর্তে আমার কাছে সাধু আনন্দতীর্থ নও, তুমি আমার বন্ধু যুধাজিৎ, যাকে এতদিন হারিয়ে আমি নতুন করে ফিরে পেয়েছি।

যুধাজিৎ বলল, তুমি আমার মৃত্যুসংবাদ পাওনি?

পেয়েছিলাম, অনেক দেরিতে আর সে খবরটাকে বিশ্বাসও করেছিলাম। ভগবান হৃষিকেশে আমাকে টেনে এনে আমার সে বিশ্বাসকে ভেঙে দিলেন।

যুধাজিৎ বলল, আমার গুরু পরমানন্দতীর্থ আমাকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেবার সময় বলেছিলেন, আজ থেকে তোমার পূর্বজীবনের মৃত্যু হলো, তুমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলে।

আমি জানতে চাইলাম, যুধাজিৎ, তুমি মৃত্যুকে এড়িয়ে এ জীবনে প্রবেশ করলে কি করে?

সে অনেক কথা, আজ তার প্রয়োজনও নেই। তুমি জানতে চাইছ তাই সংক্ষেপে বলি, এক আহত বন্ধুকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি গুলিবিদ্ধ হই। অচৈতন্য অবস্থায় কতক্ষণ পড়েছিলাম জানিনা, এক ভ্রাম্যমান সাধু আমাকে দেখতে পেয়ে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যান। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তিনি। পূর্ব জীবনে ছিলেন এক বিখ্যাত সার্জেন। তিনিই আমার শরীর থেকে অপারেশন করে গুলি বের করে। বুক থেকে গুলি বের করেছিলেন, তাই সুস্থ হয়ে উঠতে আমার সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে সংবাদপত্র থেকে জানতে পারি, আমাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমি সেই থেকে আমার গুরু পরমানন্দতীর্থ মহারাজের আশ্রয়ে থেকে গেছি। সব দিক থেকেই আমি ওঁর কাছে নতুন জীবন লাভ করেছি সোনিয়া।

আমি বললাম, তুমি এ জীবনে সুখী তো যুধাজিৎ?

ও বলল, আজ আমি আর যুধাজিৎ নই সোনিয়া, আমি আজ আনন্দতীর্থ।

উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর পরের ঘটনা কি সোনিয়া?

গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত দুজনে একসঙ্গে এসেছিলাম। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। ঐ পথটুকু পেরিয়ে আসার সময় আমার বন্ধু যুধাজিৎ বলেছিল, এরপর তোমাকে ভোলা আমারপক্ষে সহজ হবে না। তবে একটিমাত্র পথ আছে তোমাকে ভোলার।

আমি ব্যগ্র হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, কি পথ যুধাজিৎ?

আমার সাংসারিক মোহ ছিন্ন করার জন্য ঈশ্বরের কাছে তোমার নিরন্তর প্রার্থনা।

আমি বলেছিলাম, আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি সে চেষ্টা করে যাব যুধাজিৎ।

ওর কাছ থেকেই কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, গুরুর নির্দেশে পরমার্থ নিকেতনে থাকার মেয়াদ ওর দশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার ও চলে যাবে বদ্রীনাথের দিকে কোন এক পাহাড়ের কোলে গুরুর আশ্রমে। পাহাড়ী ছেলেদের নিয়ে গুরু পরমানন্দতীর্থ সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম ও কৃষিকর্মের ওপর এক উন্নত যজ্ঞশালা তৈরি করেছেন। তিনি অশক্ত হয়ে পড়ায় সেই বৃহৎ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ডাক পড়েছে শিষ্য আনন্দতীর্থের।

আমি মন্তব্য করলাম, হিমালয়ের প্রশান্ত পরিবেশে নিজেকে কেবল আধ্যাত্মিক সাধনায় সঁপে না দিয়ে, এই যে সার্থক মানুষ গড়ার ভূমিকাটি গ্রহণ করতে চললেন আনন্দতীর্থ, এতে বন্ধু হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই গর্বিত হবে।

রোজ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাব, যুধাজিৎ যেন সবকিছু ভুলে এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে।

দিল্লিতে সোনিয়া আমাকে রাজধানী এক্সপ্রেসে তুলে দিতে এসে বলল, রঞ্জন, আমি মুক্তি চাই না, বন্ধন চাই। যত বন্ধন তত দুঃখ, আর এই আনন্দময় স্মৃতির দুঃখগুলো নিয়েই আমি শেষ জীবনটুকু বাঁচতে চাই।

গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পতাকার মতো হাত নাড়তে নাড়তে সোনিয়া জলভাসা চোখে রোদ্দুরের হাসি ছড়িয়ে উচ্চারণ করল এই কটি ছত্র :

'এই ভালো আজ এ সঙ্গমে
কান্না হাসির গঙ্গা যমুনায়,
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি,
ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।'

অধরা মাধুরী

।।১।।

বাসুন চাই বাসুন।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটি বাসনউলি ঢুকে পড়েছে আমার কম্পাউণ্ডের ভেতরে।

চেঁচিয়ে বললাম, আমার বাসন চাই না।

বাসনউলি বেরিয়ে গেল না। কোমরে বাঁ হাতখানা রেখে বলল, মাইজীকে বলুন সাহেব, তাঁর দরকার থাকতে পারে।

মনে মনে হাসলাম। মুখে বললাম, মাইজী এখন নেই, মাইজী এলে তখন এসো।

কোথা গেছে? কবতক আসবে?

সে এখন বলতে পারব না। দরকার থাকলে খোঁজ নিও। এলে তখন বাসন বেচ। এখন আসতে পারো তুমি।

আমি ঘরের বাইরে এসে শেষ কথাটা উচ্চারণ করলাম।

ওর তখুনি চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় বলল, কি নাম তোমার সাহেব?

গা জ্বলে গেল। বললাম, তাতে তোমার দরকার?

মানুষই তো মানুষের নাম জানতে চায় সাহেব।

বিরক্তির সঙ্গে বললাম, প্রতাপ রায়। এবার দরকার মিটেছে তো? আর বকিও না, পথ দেখ।

আশ্চর্য! মেয়েটি বাঁ চোখখানা ছোট করে মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলল।

মেয়েটার মতলব কি! সে যা হোক, আমি ঘরের ভেতর ঢোকার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছি, এমন সময় ও মিহি একটা সুরেলা গলায় বলে উঠল, আর একটা কথা সাহেব।

আমি অনিচ্ছায় ঘুরে দাঁড়ালাম।

সিংহদের মহালের পাশেই কি আপনাদের চকবাড়ী ছিল?

আমি হতবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম। সামান্য সময় মাত্র, পরক্ষণেই ওর সেই বাঁ চোখ টিপে ঠোঁটের বাঁকা হাসিটার কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বহুদিনের হারানো একখণ্ড মানিক আমি হঠাৎ খুঁজে পেয়েছি।

বিস্ময় আর খুশিতে ভরা গলায় বললাম, শাহরাজাদী না।

তাহলে এতক্ষণে চিনতে পারলে মালেক।

আরে এসো এসো।

শাহরাজাদী আমার পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকল। মোড়াটা এগিয়ে দিলাম। ও ডান হাতে সেটাকে দেয়ালের একধারে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হাঁটু মুড়ে মেঝেতেই বসে পড়ল।

কি হলো, মোড়ায় বসলে না?

আবার সেই চোখ কুঁচকে মুখ টিপে হাসি। বলল, এত সোহাগ বরাতে সইবে না সাহেব।

একটু থেমে বলল, তুমি এই দশ-দশটা বছর পরেও চিনতে পারলে, ঘরের ভেতর ডেকে বসালে, এতেই আমার দিল খুশ হয়ে গেছে।

বললাম, এখন বল কোন্ মুলুক থেকে হঠাৎ উদয় হলে?

তামাম দুনিয়া ঢুঁড়ছি, ঘুম্‌তে ঘুম্‌তে তোমার কাছে এসে গেলাম।

আমার এ আস্তানাটা খুঁজে বের করলে কি করে?

হঠাৎ। বাসন দিয়ে পুরানো কাপড় কিনতে বেরিয়েছিলাম, গেটের বাইরে আপছা অক্ষরে তোমার নামটা দেখলাম।

তুমি পড়তে পারলে?

শাহরাজাদী আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল, কেন, আমাকে লিখাপড়া শিখায়নি!

তারপর অভিযোগের ভঙ্গীতে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, তুমি কমটি ছিলে না সাহেব, ফাক পেলেই আমার শিলেট ভেঙে দিতে।

আর তুমি, মায়ের কাছে একরাশ চোখের জল ঝরিয়ে আমাকে বকুনি খাওয়াতে।

শাহরাজাদী অমনি প্রতিবাদের গলায় বলল, আমি মুখ ফুটে কোনদিনও তোমার নাম ম ায়ের কাছে বলিনি সাহেব।

তোমার কান্নাই ছিল যথেষ্ট, মা ঠিক বুঝতে পারত কীর্তিটা কার।

এবার অন্য কথা পাড়ল শাহরাজাদী—হাঁ গো, মাকে তো কই দেখছি না? মুলুক থেকে এখানে আননি বুঝি?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললাম, তিন বছর আগে মা মারা গেছে।

মা নেই!—চাপা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল শাহরাজাদীর বুক ঠেলে। বড় বড় দুটো চোখ আমার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল, যেন পাথর হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখলাম পাথর ভাসিয়ে বেরিয়ে এল জলের ধারা। মুখ ঘুরিয়ে নিল শাহরাজাদী। তার আগেই দু'ফোঁটা জল টপটপ করে ঝরে পড়ল ঘরের লাল মেঝের ওপর।

নিজেকে এক সময় সামলে নিয়ে বলল, আমার বহুৎ ঘাট হয়ে গেছে সাহেব, মা আমার জন্য এত করল আর আমি বেইমান, দশ বরষের মধ্যে একবারও তেনার পা ছুঁতে গেলাম না।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কাজের টানে কখন কে কোথায় ভেসে যায় তার কি কোন ঠিক আছে। আর মানুষের মরণকে তো কারু জন্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এই যে আমি, আমিও কি মার শেষ সময়ে তার কাছে থাকতে পেরেছি।

তুমিও ছিলে না! মা চোখ বোজার আগে তোমাকে কত খুঁজেছে—হায়, হায়—!

বললাম, ত্রিনাথকে মনে আছে? মায়ের মারা যাবার সময় ঐ তো কাছে ছিল। খুব সেবা করেছে। শেষ সময় মুখে জল দিয়েছে।

ত্রিনাথের প্রসঙ্গে দেখলাম শাহরাজাদী একটুখানি আনমনা হয়ে গেল। পরে আমার দিকে চেয়ে বলল, ত্রিনাথদা কিন্তু মায়ের সত্যিকারের ছেলের কাজ করেছে। তুমি আমি মায়ের কাছে শুধু নিয়েই গেলাম, কিন্তু ত্রিনাথদা সেবা দিয়ে মায়ের ঋণ কিছুটা শোধ করে গেল।

এর পর আমি আর শাহরাজাদী কতক্ষণ বসে রইলাম স্মৃতির বন্ধ দরজাটা খুলে দিয়ে।

এক সময় ওর কথায় চমক ভাঙল, বহুরানী কোথায়? বাপের বাড়ি বুঝি? বালবাচ্চা ক'টি?

দেখলাম প্রশ্নগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ওর কৌতূহল যেন উপচে পড়ছে।

আমি মুখটা টিপে হাসলাম। রসিকতা করে বললাম, থাকলে খুশি হও, না—না থাকলে?

এ কি বলছ সাহেব, তুমি সাদি করনি?

ছোটবেলা থেকেই দেখছি খর বুদ্ধি তোমার। ঠোঁট নড়লেই সব কিছু বুঝে নিতে পার।

শাহরাজাদী এ প্রশংসাটুকুর ধার-কাছ দিয়েও গেল না। সে আক্ষেপের গলায় বলল, তাই মা এমন কষ্ট পেয়ে গেল। বহু থাকলে এমনটি হতো না। চিরদিন তুমি উদাস হয়ে রইলে।

বললাম, তোমার কথা বল শাহরাজাদী, কোথায় ঘর বেঁধেছ, সংসার পেতেছ? ছেলেপুলে ক'টি? মানুষটিই বা কেমন?

শাহরাজাদী বলল, সে তোমার শুনে কাজ নেই সাহেব। আপাতত মাস কয়েক একটা গাছতলায় ঘরসংসার পেতে আছি।

গাছতলায়!

অবাক হবার কি আছে?

রোদ-জল আটকায়?

শীত কেটেছে, গরম চলছে।

বড়গাছ, ডালপাতা অনেক, হাওয়াটা বড় ঠাণ্ডা আর মিঠে। বারিষ নামলে লাগোয়া ফুটপাথের একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় উঠে যাব।

তুমি বস, আমি এখুনি আসছি শাহ্‌রাজাদী।

মালেকের মিঠাই খাওয়াবার সাধ হয়েছে বুঝি?

না হেসে পারলাম না। বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, এতদিন পরে এলে, মেঠাই না খাওয়ালে স্বর্গে থেকে মা-ই কষ্ট পাবে।

তাহলে না খেয়ে উঠতে পারব না।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, ও পেছন থেকে বলল, সাহস তোমার দেখছি কম নয় সাহেব।

ফিরে বললাম, কেন?

একটা বেদেনীর জিম্মায় ঘরবাড়ি ফেলে রেখে চললে! চুরির ভয় নেই?

গেট পেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, চোরের হাতে সর্বস্ব তুলে দিলে চুরি করে কার সাধ্যি।

পাঁচিলের বাইরে দেখলাম এক পাঁজা বাসন আর একটা কাপড়ের পোঁটলা পড়ে আছে। হাঁক দিয়ে বললাম, বাসন আর কাপড়ের পোঁটলাটা ঘরের ভেতর তুলে রাখ।

শহরতলিতে ঘর বেঁধেছি, তাই হাতের কাছে চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। মিষ্টির ভাল একটা দোকান হয়েছে ট্রেন লাইনের ধারে। মোতিচুর মেঠাই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে-গাঁয়ে মোতিচুর মেঠাই-এর বড় চলন ছিল। কুটুমবাড়ি থেকে অন্য সব জিনিসপত্রের সঙ্গে ঐ মিষ্টিটা প্রায়ই আসত। আমার বেশ মনে আছে মিষ্টি এলে ত্রিনাথ আর শাহ্‌রাজাদীর ডাক পড়ত। মা ওদের কাছে বসিয়ে মোতিচুর মেঠাই খাওয়াতো। সেই ছেলেবেলার মোতিচুরের স্মৃতিটা মনে পড়ে গেল।

ফিরে এসে দেখি তাজ্জব কাণ্ড। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সারা ঘর ঝাঁট দিয়ে সাফ করছে শাহ্‌রাজাদী। দুপুরের খাওয়ার বাসন তিন চারখানা ইতিমধ্যেই ধুয়ে মুছে তুলে রাখা হয়েছে।

হৈ হৈ করে উঠলাম, তুমি এসব করতে গেলে কেন? বিকেলের দিকে ঠিকে ঝি আসবে। সে-ই সব ঠিক করে দিয়ে যায়।

ও দাওয়ায় ঝাড়ু চালাতে চালাতে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আর কোনদিন এদিকে এলে ঘরের ঝুলটাও ঝেড়ে দিয়ে যাব।

ঝাঁটপাটের কাজ শেষ করে ও আবার মেঝেতে এসে বসল। ততক্ষণে আমি একখানা থালায় ওর খাবার সাজিয়ে ফেলেছি। ওকে খেতে দিয়ে বললাম, দেখ তো মেঠাইটা চিনতে পার কিনা?

মোতিচুরের দিকে চোখ পড়তেই মোতির দানার মত শাহ্‌রাজাদীর চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। এক সময় চোখ মুছে বলল, এ মিঠাই আমাকে কেন খেতে দিলে সাহেব, খালি মায়ের কথা মনে পড়ছে। আঁখ ভরে আঁসু নামছে।

বললাম, তুমি খাও, আমিও খাব, আড়ালে থেকে মা বড় তৃপ্তি পাবে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, বাসনের বদলে কাপড় যোগাড়করে কি কর তুমি?

ওসব তুমি বুঝবে না সাহেব। আমিও কি ছাই সব বুঝি। ওসব বাসন যারা দিয়ে যায় তারাই কাপড়চোপড় নিয়ে চলে যায়। মাঝের থেকে আমরা কিছু কামিয়ে নিই। ওতেই কোনরকমে দিন গুজরান হয়।

কিন্তু শাহ্‌রাজাদী, যেসব বাসনউলি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাসন ফিরি করে বেড়ায় তাদের সঙ্গে তোমার চেহারার তো কোন মিল নেই।

হেসে ফেলল শাহ্‌রাজাদী। বলল, চেহারায় কি আসে যায় সাহেব, কাজটা তো একই।

কাপড় কি শুধু বাসনের বদলেই নাও?

না, দরে দামে পোষালে টাকা দিয়েও কিনি। সবার তো আর বাসনের দরকার হয় না। তবে টাকার চেয়ে বাসনের দিকে মেয়েদের লোভটা বেশি।

খাওয়া শেষ হলে যখন আমরা আবার গল্প করতে শুরু করলাম তখন হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওর পোঁটলাটা দেখতে চাইলাম।

ও অমনি পোঁটলাটা খুলতে খুলতে বলল, অনেক হীরে জহরতের সন্ধান পেয়ে যেতে পার এর ভেতর। পোঁটলা খোলা হলে ও কাপড়গুলো বিছিয়ে দিল মেঝেতে। রঙীন সব শাড়ি। বেশির ভাগ পুরোনো বেনারসী।

বললাম, সত্যি, হীরে জহরতই বটে। কত রঙ, কত সুন্দর সব নক্সা।

শাহ্‌রাজাদী কিন্তু অন্য কথা তুলল, কাপড় কেনার কাজটা ছেড়ে দেব সাহেব।

হেসে বললাম, হঠাৎ ব্যবসা বদলের মতলব কেন?

ও আমার কথার উত্তর না দিয়ে গোলাপী রঙের বেনারসীটা হাতে তুলে ধরে বলল, সাহেব, এ কাপড়খানা কিনতে গিয়ে আমার বুকের পাঁজর ভেঙে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, সেকি!

শাহ্‌রাজাদী বলল, গোলাপী রঙটা দিলে নেশা ধরিয়ে দেয় সাহেব। সাদির কনে একদিন যখন এই বেনারসীখানা পরে পিঁড়িতে বসেছিল তখন তার আঁখের সামনে একটা গোলাপ ফুল ফুটে উঠেছিল।

আমি কল্পনায় কোন এক বিয়ের বাসরে ঢুকে গোলাপী বেনারসী পরা সালংকারা এক কন্যাকে দেখতে লাগলাম।

একটুখানি থেমে শাহ্‌রাজাদী বলল, যে মেয়েটি এই বেনারসীখানা পরে একদিন পিঁড়িতে বসেছিল সে আঁসু ফেলতে ফেলতে আমার হাতে ক'টা টাকার জন্য শাড়িখানা সেদিন তুলে দিলে।

বললাম, মানুষ বড় দুঃখে না পড়লে এ কাজ করতে পারে না শাহ্‌রাজাদী।

ও বলল, একদিন দুপুরে ছাদের ওপর থেকে মেয়েটি হাতছানি দিয়ে ডাকে। কাছে গেলে পেছনের দরজা খুলে আমাকে একবারে ওর শোবার ঘরে নিয়ে যায়। তারপর একটা তোরঙ্গ খুলে এই শাড়িটা বের করে দিয়ে বলে, এ শাড়িটার জন্য তুমি আমাকে কত টাকা দেবে?

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। একটা কান্না সে চোখে থমকে আছে। দরদাম করতে মন চাইল না। বললাম, সাচ্ বলছি, তিরিশের বেশি এ শাড়িতে আমরা দিই না, তোমাকে আমি পঁয়তাল্লিশ টাকা দিতে পারি, এর বেশি নয়।

মেয়েটি কতক্ষণ শাড়িখানা গালে চেপে চোখ বুজে বসে রইল।

এক সময় চোখ মেলে আমার হাতে শাড়িখানা তুলে দিয়ে বলল, যা হয় দিয়ে যাও ভাই, আমার বড় দরকার।

শাড়ি কিনি, সবাই দরদাম করে কিন্তু একে দেখলাম একেবারে আলাদা তাই বললাম, দিদি আমার মনে হচ্ছে শাড়িটা বেচে দেবার ইচ্ছে তোমার নেই, ক'টা টাকার জন্য কেন বেচবে?

ও আমার হাতখানা ধরে ফেলে বলল, না না, তা হয় না, ও শাড়ি তোমার কাছেই থাক, বরং তুমি যদি ভাই ক'দিন পরে ও শাড়িখানা আমাকে একবার দেখিয়ে যাও আর আমি যদি তখন টাকাটা যোগাড় করতে পারি তাহলে নিজের কাছে কাপড়খানা রেখে দেব।

দিন পনের পরে ফিরে গিয়ে ওকে বিধবার বেশে দেখলাম। শাড়ির কথা নিয়ে আর কোন রকম আলোচনা করতে মন চাইছিল না। ও নিজেই কথাটা পাড়ল। বলল, তোমাকে ভাই মিছিমিছি আসতে বলে কষ্ট দিলাম। শাড়ির দরকার আমার এ জন্মের মত ফুরিয়ে গেছে।

শাহ্‌রাজাদীর হাতে শাড়িখানা তেমনি ধরা রইল। কতক্ষণ পরে পোঁটলার ভেতর সেটিকে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, এ শাড়ি আর আমি ব্যাপারীর হাতে তুলে দিতে পারব না সাহেব।

বললাম, তোমার গল্প শোনার পর আমার মনে হয়েছিল শাড়িখানা তুমি নিজের কাছেই রাখবে।

শাহরাজাদী বলল, এ আমার এক যন্ত্রণা। তুমি দেখ সাহেব প্রতিটি শাড়িতে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আপনার মানুষ কত সোহাগ করে এসব শাড়ি কিনে দিয়েছে, কত আনন্দেব দিনে শাড়িগুলো যত্ন করে পরা হয়েছে, কত লোক তারিফ করেছে, আর এখন সেগুলো এক ব্যাপারীর হাতে।

জীবনটা এ রকমই শাহরাজাদী। আনন্দের দিনগুলো বড় ছোট। উদাসী চোখ দুটো আকাশের দিকে মেলে দিয়ে শাহরাজাদী আপন মনেই বলল, কেন এমন হয় সাহেব!

আলোর রঙ সোনালী মধুর মত হয়ে আসছিল। আমার বাগানের কোণায় ছোট একটা নারকেল গাছে বেলা শেষের আলো এসে পড়ছিল। প্রথম কাঁদিতে লাবণ্যে ভরা পুষ্ট ক'টি ডাব। আলো মেখে কিশোরী কন্যার মুখের মত মনে হচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমি ফেলে আসা একটা জীবনের ছবি দেখতে লাগলাম।

আস্তে করে শাহরাজাদী বলল, বেলা যায়, উঠি মালেক।

বললাম, কতটুকুই বা কথা হলো, এসো একদিন।

যে ক'টা দিন রুটি আছে এ শহরে, আসবো তোমাকে দেখতে।

।। ২।।

আমাদের চকবাড়ির লাগোয়া ছিল সিংহদের বিশাল তালুক। নদীর চরের জঙ্গল কাটাই করে এক সময় এই সব চকের পত্তন হয়েছিল। জেলে, বাগ্দী আর চাষাভুষো সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এইসব লোনামালে বসবাস করত। বাগ্দীদের পূর্বপুরুষরা বাঘ, বনবরা আর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে জঙ্গল সাফ করেছিল। নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল জেলে বস্তি। ওরা চকের মালিকদের কাছ থেকে জমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া খাল ইজারা নিত। কোটালের সময় নদী বেয়ে সমুদ্রের যে জল খালে এসে ঢুকত, সেই লোনা জলের সঙ্গে ধেয়ে আসত মণ মণ ভেট্‌কি, পারসে, গুলে, আরও কত রকমের মাছ! সেই সব মাছ সারা বছর ধরত ওরা। আর ওই সব আবাদী জমিতে চাষের কাজ করত সেই সব চাষারা যাদের পূর্বপুরুষ প্রথম চক-পত্তনীর সময় থেকে চাষের কাজ শুরু করেছিল।

সে অনেক কাল আগেকার কথা! আমাদের ছোটবেলায় চকের শ্রী ফিরে গিয়েছিল। চারদিকে গড়খাই-এর মাঝে ছিল আমাদের চকবাড়ি। বাড়ির সামনে বাঁধানো পুকুর। পুকুরের চারদিক ঘিরে বড় বড় তালগাছ। বর্ষার জলে পূর্ণ থাকত সে পুকুর, তবু লোনা অঞ্চল বলে পুকুরের পানীয় জলেও অল্প অল্প নুনের স্বাদ পাওয়া যেত। চকের জমিনের মাঝে মাঝে দু'একটা আদিম বনস্পতি ঝাঁকড়া জুটাজুট আর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। চরের অজস্র মৎস্যভুক ও শস্যভুক পাখি ওই সব গাছে বংশানুক্রমে বাসা বেঁধে সুখে কাল কাটাত।

আমার বিধবা মা তখন গোমস্তাদের নিয়ে চকের জমিজমা দেখাশোনা করত। আমরা থাকতাম চক থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে পৈতৃক ভিটায়। ওখানে স্কুলে পড়াশোনা করতাম, আর ছুটি পড়লেই পালাতাম চকে। সেখানে আশ্চর্য মুক্তি। গোমস্তার একটি ছেলে ছিল আমার সমবয়সী, মা তাকে খুবই স্নেহ করত। বাড়ি না গিয়ে সারাদিন সে থাকত মায়ের কাছে কাছে। অসম্ভব লোভ ছিল তার গল্প শোনার। মা গল্প বলত দক্ষ জাদুকরের মত। শ্রোতাদের সারাক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। রূপকথার ডালিমকুমার, রাজকাহিনীর শিলাদিত্য, আরব্য রজনীর আলাদীনরা মায়ের গল্প বলার জাদুতে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত।

আমি চকে গেলেই আমার সমবয়সী ত্রিনাথ আমার শাকরেদী করত। আমাদের গড়খাই-এর সঙ্গে একটা খালের যোগ ছিল। ঐ খালের মুখে আমাদের একটা নৌকো বাঁধা থাকত। ছোট্ট ডিঙি নৌকো। অদূরে গঞ্জের বাজার থেকে ঐ নৌকো করে দরকারে সওদা নিয়ে আসত নন্দ মাঝি।

আমি চকে গেলেই ঐ নৌকোটা থাকত আমার অধিকারে। সারা দুপুর ত্রিনাথকে নিয়ে খাল বেয়ে পড়তাম নদীতে। জেলেদের পাতা জালের পাশ কাটিয়ে অনেক দূর চলে যেতাম। বছর চোদ্দ বয়েস হলে কি হয়, ত্রিনাথ ছিল দক্ষ মাঝি। তিথি নক্ষত্র জোয়ার ভাঁটা ওর নখদর্পনে। নৌকো বেয়ে নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে যাওয়াতেই ছিল ওর আনন্দ।

এক সময় ত্রিনাথ আমাকে অবাক করে দিয়েছিল একটা নতুন চরের সন্ধান দিয়ে। চরটা জোয়ারের জলে ডুবে যেত আর জেগে উঠত ভাঁটায়। কিছুকাল পরে দেখতাম, জোয়ার এলেও চরটা আর ডোবে না। বছরখানেক পরে দেখি চরের ওপর গাছপালা, ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। ঐ নতুন চরের পলিমাটির ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতাম। হাততালি দিয়ে অজস্র পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দিতাম।

চকে আমাদের আর এক আকর্ষণ ছিল সিংহবাড়ির বাগান। কিরণ সিং মফঃস্বল শহরে থাকতেন আর তাঁর পাইক গোমস্তারা চক শাসন করত। কিরণ সিং-এর শখের বাগানটি ছিল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢোকা সম্ভব ছিল না। বাগানের দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকত। দরজার ভেতরে বাগানের রক্ষক উদয় সিং-এর একটা ডেরা ছিল। আমরা যখন চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে তখন উদয় সিং ষাট ছুঁই ছুঁই। তার বিরাট গোঁফজোড়া আর পেতল-বাঁধানো লাঠিটি ছিল আমাদের আকর্ষণের বস্তু।

মাঝে মাঝে দরজা খুলে গেলেই দূর থেকে নতুন একটা জগৎ আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠত। গাছপালা, ফুলেফলে সে এক সমারোহ।

ঐ বাগানে ঢোকা আমাদের নিষেধ ছিল। বাড়ি থেকে মা-ই নিষেধ করে দিয়েছি না। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারি কেউ কোন কথা বললে আমাদের মহাশয় বংশের মর্যাদায় ঘা লাগতে পারে, তাই এ বারণ।

দূর থেকে দেখতাম, রঙীন ঘাঘরা আর চোলি পরে একটা দশ-এগারো বছরের মেয়ে ছুটোছুটি করছে। আমাদের দিকে সে তাকাত না। তাতে আমার আত্মসম্মানে খুব লাগত। তাই একদিন যখন তাকে আমাদের পুকুর পাড়ে তাল কুড়োতে দেখলাম তখন তেড়ে গিয়ে বললাম, বেরোও গেটের বাইরে, ফের এলে আস্ত রাখব না।

তার ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল সেদিন, সে ঠায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একটুও নড়েনি।

ওর ট্যাঁটামি শায়েস্তা করতে ত্রিনাথকে যখন একটা কঞ্চি আনার জন্যে চেঁচিয়ে আদেশ করছি তখন কোথা থেকে মা এসে গেল।

ওকে অমন করে শাসন করছিস কেন? কি করেছে ও?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মা এমনিতে আমাদের কোন কাজে বাধা দিত না, কিন্তু মায়ের মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস ছিল না আমাদের।

মা আবার বলল, ভারী ভাল মেয়ে পান্না, ওকে অমন করে কখনও শাসন ক'রো না।

এবার একটু সাহস সঞ্চয় করে বললাম, ও তাল কুড়োচ্ছিল মা।

আমি ওকে একদিন বলেছি, তাল দেব বলে। আমার কাছে আসার পথে ও গাছতলায় তাল দেখতে পেয়েছে, তাই কুড়িয়েছে।

ততক্ষণে পান্না মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

মা আর কিছু না বলে পান্নাকে নিয়ে চলে গেল।

এরপর পান্নার সঙ্গে আমার আর ত্রিনাথের কিন্তু ভাব জমে গেল।

সিংহীদের বাগানের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় একদিন গেটের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাদের দেখেই ও বাঁ চোখটা ছোট করে ঠোঁট টিপে একটু হাসল। কি জানি কেন রাগ চেপে গেল। চাপা গলায় বললাম, মারব টেনে এক চড়।

ত্রিনাথ অমনি বলল, ও তো কিছু করেনি, তুই খামোকা ওকে ধমকাচ্ছিস কেন?

বললাম, তুই থাম, মায়ের আসকারা পেয়ে মেয়েটার বড্ড বাড় বেড়েছে।

বেড়িয়ে ফিরে আসছি, দেখলাম ও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ওর দিকে চেয়ে ত্রিনাথ হাসল। অমনি ও হাতছানি দিয়ে বাগানের ভেতর ডাকল আমাদের।

এবার আর প্রবল কৌতূহল কোন রকম আত্মমর্যাদার বিনিময়েই চেপে রাখতে পারলাম না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে প্রবল আগ্রহেই ঢুকে পড়লাম।

সামনের কোঠিতে পান্নার বাবা উদয় সিং বসে রামায়ণ পড়ছিল। তখনও হিন্দির সঙ্গে বড় একটা পরিচয় হয়নি, তাই রামায়ণটা কার তা বুঝতে পারিনি। পরে অবশ্য পান্নার কাছেই জেনেছিলাম, ওটি তুলসীদাসের রামায়ণ।

কি সুন্দর গলায় ও ওদের বাগানের একটা অশোকগাছের তলায় বসে আমাদের সেদিন রামায়ণ গান করে শুনিয়েছিল। অবশ্য তখন পান্নার সঙ্গে আমাদের দারুণ ভাব জমে গিয়েছে।

দেখা হলেই বলতাম, একটুখানি রামায়ণ শোনাবে?

আমার রামায়ণ শুনতে যত না আগ্রহ ছিল পান্নার মিঠে গলার আওয়াজ শুনতে আগ্রহ ছিল তার চেয়েও বেশি।

রাম চলেছেন আগে আগে, মাঝে সীতা আর সবশেষে লক্ষ্মণ। তাঁরা পার হয়ে চলেছেন বনপথ। সীতাকে ক্লান্ত দেখে রাম বসলেন বটের ছায়ায়। বনবাসী মানুষজন তাঁদের মনোহর মূর্তি দেখে মুগ্ধ হলো। মেয়েরা সীতাকে প্রণাম করে তাঁর পাশে একে একে বসল। কৌতূহলী হয়ে তারা জানতে চাইল, রাম-লক্ষ্মণ সীতার কে হন?

সঙ্কোচে আর মধুর হাসিতে ভরে উঠল সীতার মুখ। তিনি কোকিলের মত মিষ্টি গলায় দেবর আর স্বামীর পরিচয় দিয়ে বললেন,

'সহজ সুভায় সুভগ তন গোরে।
নামু লখনু লঘু দেবর মোরে।
বহুরী বদনু বিধু অঞ্চল ঢাঁকী।।
পিয় তন চিতই ভৌহঁ করি বাঁকী।
খঞ্জন মঞ্জু তিরীছে নয়ননি।
নিজ পতি কহেউ তিন্হহি সিয়ঁ সয়ননি।।'

সরল স্বভাবের গৌরবর্ণ যিনি, তিনি আমার দেবর লক্ষ্মণ। তারপর আঁচলে চাঁদের মত সুন্দর মখুখানা ঢেকে ভুরু বাঁকিয়ে প্রিয়তম রামচন্দ্রকে একবার দেখে নিলেন। এবার সুন্দর খঞ্জন পাখির মত বাঁকা চোখের ইশারায় স্বামীর পরিচয়টি জানিয়ে দিলেন।

আজ মনে হয় এতটা সাজিয়ে না হলেও বেশ সহজ করে গুছিয়ে তুলসীদাসের রামায়ণের মানেটা বলে যেতে পারত পান্না। ঐ বয়সে ওর কৃতিত্ব দেখে আমি আর ত্রিনাথ 'থ' মেরে বসে থাকতাম।

পান্নার গলায় একটা টান ছিল। যদিও ঐ বাগানবাড়ীতে ওর জন্ম হয়েছিল আর মেলামেশা ছিল ওর বাংলাভাষাভাষীদের সঙ্গে তবু হিন্দিভাষার কয়েকটা শব্দ আর টান ও লুকোতে পারেনি।

উদয় সিং অনেক বয়সে পান্নার মাকে বিয়ে করেছিল। পান্নাকে জন্ম দিতে গিয়ে তার তরুণী মা মারা যায়। তারপর থেকে পান্নাবাঈ তার বাপকেই শুধু জানত। উদয় সিং বউ মারা যাবার পর কিছুকাল বড় উদাস হয়ে থাকত। শেষে তুলসীদাসের রামায়ণের ভেতরেই শান্তি খুঁজে পায়। মেয়ে পান্নাকে প্রতিদিন নিয়ম করে রামায়ণ শোনাত। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী পান্না অল্পদিনের ভেতরেই পুরো রামায়ণখানা মুখস্ত করে ফেলেছিল।

বাবার কাছে সে মানেগুলো জেনে নিত, তারপর আমার মায়ের কাছে সেগুলো গিয়ে শোনাত ভাঙা ভাঙা বাংলায়। মা সুন্দর বাংলা করে বুঝিয়ে দিত পান্নাকে। শেষে শ্লেটে ওকে বাংলা লেখাও শিখিয়েছিল মা।

মায়ের কাছে পান্নার এই ঘন ঘন যাতায়াতের খবরটা আমি রাখতাম না। ছুটি পড়লে উড়ো পাখির মত চকে উড়ে আসতাম। পুকুরে মাছ ধরে, খালে নদীতে নৌকো বেয়ে দস্যুবৃত্তি করে অল্পদিনের ভেতরেই যথাস্থানে উড়ে পালাতাম। তাই পান্নার সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠতার খবরটা আমার প্রায় অজানাই ছিল। ত্রিনাথ কিন্তু পান্নার অনেকদিনের পরিচিত সহচর। মায়ের কাছে গল্প শোনার টানে হাজির হতো দু'জনেই।

পরে মায়ের মুখ থেকেই শুনেছিলাম, পান্নার মা উদয় সিংকে সাদি করে চকে আসার পর মায়ের কাছে প্রায়ই চলে আসত। উদয় সিং শহরে মালিকের কাছে কাজে গেলে বউকে আমার মায়ের

জিম্মাতেই রেখে যেত। পান্নার মা তাই অকালে মারা গেলে পান্নাকে বড় স্নেহে আগলে রাখত আমার মা।

পান্নার সঙ্গে পরিচয়ের পর চকে গেলেই আমি, ত্রিনাথ আর পান্না একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। উদয় সিং আমাকে খুব খাতির করত। ফলের বাগানে ঢুকলেই বিভিন্ন ঋতুর ফল পেড়ে আমাদের হাত ভরে দিত।

চকের একপ্রান্তে নদীর ধারে খানিকটা জঙ্গল ছিল আমাদের। প্রাচীন ও নবীন গাছের সমাবেশে জঙ্গলটা বেশ জমজমাট ছিল। ছোট একটা নাশি খাল ঐ বনের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে নদীতে পড়েছিল। চকের ওপর দিয়ে একটা উঁচু মাটির রাস্তা নদী পারাপারের ঘাট অব্দি গিয়ে থেমেছিল। ঐ পথ আর জঙ্গলের মাঝে বিরাট একটা প্রান্তর ছিল গোচারণের জন্য নির্দিষ্ট। বাগ্‌দী ছেলেরা সকালে গরুর পাল নিয়ে ঐ প্রান্তরে চরাতে আসত। বেলা পড়ে এলে পাল পাল গরু নিয়ে ফিরত তারা, গরুর খুরে খুরে ধুলো উড়ে মেঘ তৈরী হতো।

কোনদিন ভরদুপুরে আমি, পান্না আর ত্রিনাথ নদীর ধারের জঙ্গলে চলে যেতাম। রামায়ণের প্রভাবে তখন আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। ত্রিনাথের কুশলী হাতে তৈরী বাতার ধনুক। সুপুরি গাছের বাগলায় বানানো তূণীর। তার মধ্যে পাটকাঠির শর। দু'টি ধনুক দু'জনের কাঁধে। আমি চলেছি আগে আগে, ত্রিনাথ পেছনে, মাঝে সীতার বেশে পান্না। একটা দোপাট্টায় সে ঘোমটার মত করে মাথা ঢেকে রাখত। পান্নার দুটো ভূমিকা। সে নিজে সীতা, তার ওপর রামায়ণের গায়িকা।

চলতে চলতে হঠাৎ তার গলায় সুর গুনগুনিয়ে উঠত।

'প্রভু পদ রেখ বীচ বিচ সীতা।
ধরতি চরণ মগ চলতি সভীতা।।
সীয় রাম পদ অঙ্ক বরাত্রঁ।
লখন চলহিঁ মগু দাহিন লাএঁ।।'

এবার মায়ের শেখান ব্যাখ্যা শোনা যেত পান্নার গলায়।

শ্রীরাম আগে আগে চলেছেন, ধুলোয় আঁকা হচ্ছে তাঁর পায়ের চিহ্ন। সীতা সভয়ে দু'টি পদচিহ্নের মাঝখানে অতি সাবধানে ফেলছেন তাঁর পা। পাছে প্রভুর পায়ের চিহ্নে পা ঠেকে যায়। এদিকে ভক্ত লক্ষ্মণ চলেছেন রাম আর সীতা দুজনেরই পায়ের চিহ্নগুলি বাঁচিয়ে।

জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গিয়ে সে কি আনন্দ! জগৎ সংসার থেকে যেন তিনজনেই আলাদা। নাশি খালের ধারে ধারে বেগুনি ফুল ফুটে আছে ছোট ছোট হরকচ গাছে। তাই তুলে এনে দিতাম পান্নার হাতে। হাব্‌লি গাছে আমি উঠতে পারতাম না। ত্রিনাথ উঠে হলুদ আর লাল ফুল নীচে ফেলত, আমরা কুড়িয়ে জড়ো করতাম। শেষে সবই উৎসর্গ করতাম পান্নার আঁচলে। এ যেন পঞ্চবটী বন। সীতাকে নিয়ে আমরা একটা নিভৃত আশ্রয় গড়ে তুলেছি। ত্রিনাথ ধনুক হাতে জঙ্গলের চারদিক ঢুঁড়ে বেড়াত, আর আমরা দুজন গল্প করতাম।

একদিন পান্না আমার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, দূর, তোমাকে একটুও রাম মানায় না।

আমার পনের বছরের আত্মসম্মানে ঘা লেগে গেল।

সক্ষোভে বললাম, কেন?

ও অমনি বলল, তুমি তো ফর্সা, তুমি কি করে রাম হবে? মা বলেছে, রামের গায়ের রঙ দূর্বাঘাসের রঙের মত। তুমি কি তাই?

রাম হবার প্রবল বাসনা তখন আমার সারা মনকে অধিকার করে আছে। রামের পদাধিকার ছাড়লে সীতাকেও হারাতে হয়। এ অসম্ভব। তাই বললাম, আমার রঙকে ফর্সা বলে না। দেখতে আমার ছোটদাদুকে, তাহলে ফর্সা কাকে বলে বুঝতে!

ও আমার যুক্তিকে আমল না দিয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল। আমি দেখলাম, সীতা হাতছাড়া হয়ে যায়, অমনি নিজের অধিকার পাকা করবার জন্যে, বেয়াড়া সীতার গালে একটি চড় কষে বসালাম।

অশ্চর্য! মেয়েটা চেঁচিয়ে কাঁদল না। একখানা হাত জ্বলে যাওয়া গালটায় চেপে ধরে ঠায় আমার দিকে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে রইল।

আমি ওর সেই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখলাম, বড় বড় জলের ফোঁটা ওর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অমনি নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো, কিন্তু এমন সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না যাতে পান্নাকে সেই মুহূর্তে প্রবোধ দিই।

শেষে হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। চেঁচিয়ে উঠলাম, পালিয়ে এস পান্না, ঐ দূরে একটা বুনো শুয়োরের মুখ দেখা যাচ্ছে।

ভয়ের হাওয়ায় মুহূর্তে কোথায় উড়ে গেল কান্নার মেঘ। পান্না একটা কাঠবেড়ালীর মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আমিও পান্নাকে দুটো হাতের বাঁধনে বেঁধে বললাম, ভয় কি, আমার কাছে তীর-ধনুক আছে না? একেবারে গেঁথে দেব চোখ।

আমার বীরত্বপূর্ণ কথায় পান্না সাহস পেল কিনা বলতে পারি না, তবে সে আমাকে তেমনি জড়িয়ে ধরে ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকাতে লাগল।

ভয় পেয়ে আমার কাছে ছুটে আসার সময় ও চেঁচিয়েছিল একবার। বনের ভেতর থেকে সে ডাক শুনতে পেয়েছিল ত্রিনাথ। সে বন চিরে আমাদের কাছে এসে হাজির হলো।

ত্রিনাথ বলল, পান্না চেঁচিয়ে উঠল না?

আমি পান্নাকে আমার কাছ থেকে ঠেলে দিয়ে বললাম, ভীতু, ভীতু কোথাকার। রাজপুতের মেয়ে না ছাই। একটা শেয়ালের কথা শুনে ভয়ে ভির্মি খাচ্ছে।

পান্না বর্ষণহীন মেঘের গর্জন গলায় তুলে বলল, শেয়াল বুঝি? তুমি বুনো শুয়োর বললে না?

ত্রিনাথ বলল, বুনো শুয়োর তো হয়েছে কি?

পান্না বলল, বুনো শুয়োরের কাছে সাহস বেরিয়ে যাবে। বাবা বলে, শুয়োর দাঁত ঢুকিয়ে দিলে পেট এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়।

শুয়োর সম্বন্ধে পান্নার পিতৃদত্ত জ্ঞানের কাছে আমাদের হার মানতে হলো। কারণ তখনও বই-এর পাতায় ছাড়া শুয়োর দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

অনেক গান, গল্প আর ঘোরাঘুরির পরে এক সময় আমরা পঞ্চবটী বন ছাড়লাম। পঞ্চবটী বন ছেড়ে কিন্তু পা বাড়াতে হলো অযোধ্যার পথে। ভরদুপুরে পালিয়ে এসেছি চুপি চুপি, স্বয়ং রামচন্দ্র হয়েও সীতাহরণ করে। এবার অনেক দেরী হলে সীতার খোঁজ পড়তে পারে তাই চটপট পা চালিয়ে ঘরের পথে ফিরলাম।

পান্নাকে তার বাবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। উদয় সিং জানে, মেয়ে তার চোখের সামনে না থাকলে নিশ্চিত আছে আমার মায়ের জিম্মায়।

এমনি বেশ কয়েকটি দুপুর সবার অগোচরে পঞ্চবটী বনে কেটে যাবার পর একদিন লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল।

জঙ্গলের সীমার বাইরে গোচারণের মাঠ। মাঠের মাঝখানে একটা বিশাল বটগাছ। ডালপালা ছড়িয়ে গাছটি দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুরের ঠা-ঠা রোদ্দুরে বাগ্‌দীপাড়ার রাখাল ছেলেরা ঐ গাছটার ছায়ার তলায় জড়ো হয়। পাল পাল গরু যখন মাঠে চরতে থাকে তখন ওরা ডাংগুলি খেলে, নয়তো পরস্পর কুস্তির প্যাঁচ কষে খালি হাতে লড়াই-এ মাতে। একজন হয়ত পেছন থেকে অতর্কিতে গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে চেপে বসে, অমনি অন্যজন তাকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানাভাবে কসরৎ চালিয়ে যায়।

কখনও বা বীরবিক্রমে দৌড় শুরু করে দেয় অবাধ্য কোন শিংওলা পলাতক গরুকে বাগে আনার জন্যে। হাতে ছোট ছোট খেজুর ডাঁটার ছড়ি, মুখে অদ্ভুত সব শব্দ, যা একমাত্র গরুদেরই বোধগম্য।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চবটী যাবার পথে ত্রিনাথের মাথায় আইডিয়াটা খেলে গেল। সে আমাকে বলল, আজ আর পঞ্চবটী গিয়ে কাজ নেই, চল্ আমরা ঐ বাগ্দীদের নিয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ লাগাই।

ভারী ভাল লেগে গেল ওর পরিকল্পনাটা। দারুণ উত্তেজনা এক ঝলক গরম হাওয়ার ঘূর্ণির মত ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল।

ত্রিনাথই এগিয়ে গেল ওদের কাছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি সীতাকে নিয়ে। হঠাৎ সীতার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে মনটা টনটন করে উঠল। আমি পান্নার হাতখানা চেপে ধরে গভীর উত্তেজনা আর হাহাকার প্রকাশ করতে লাগলাম।

আমার মুখে কোন কথা ছিল না। আমি জোর করে চেপে ধরেছিলাম পান্নার হাত।

এক সময় ও ডুকরে কেঁদে উঠল। আমার তখন সীতাহরণের ভাব লেগে গেছে মনে। ভাবলাম, আমার সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের কথা ভেবে সীতা কাঁদছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। দেখি, সীতা তার হাতের রেশমী চুড়িগুলো চেপে ধরে কাঁদছে।

আমার হাতের চাপে পান্নার লাল কাচের কয়েকখানা চুড়ি ভেঙে গেছে, তাই কান্না।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বললাম, ভারী তো চুড়ি, তার জন্যে আবার কান্না! আমি রথের মেলা থেকে যত খুশি তত কিনে দেব।

হৈ-হৈ করে রাখাল ছেলেরা এগিয়ে আসছে দেখে পান্নার কান্না থেমে গেল। ত্রিনাথ ওদের আমার কাছে এনে হাজির করল।

ত্রিনাথ মোটামুটি রামায়ণ আর লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। এখন ত্রিনাথই ওদের দু'দলে ভাগ করে দিলে। একদল রামভক্ত কপিসেনা, অন্য দল রাক্ষসরাজ রাবণের চেলা-চামুণ্ডা।

সীতাকে বসান হলো অশোক গাছের বদলে বটগাছের তলায়। তাকে ঘিরে রইল রাবণের বাহিনী। অন্যদিকে নাশি খাল পেরিয়ে আমি দাঁড়ালাম কপি সৈন্যদের নিয়ে।

আমি বানরদের নিয়ে খাল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে বটগাছের তলা থেকে সীতাকে টেনে আনব আর রাক্ষসেরা আমাকে বাধা দেবে, এই হলো যুদ্ধের পরিকল্পনা।

প্রথমে খালের এপার ওপার দু'পক্ষ চিৎকারে, তর্জনে গর্জনে গা গরম করে নেওয়া হলো। আমার আদেশে বীর হনুমান প্রচণ্ড এক লাফে নাশি খাল পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কূলে গিয়ে পদস্খলন হলো। অমনি উল্টে পড়ল খালে। আঁচড়ে কামড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই খালের ধারে পাহারাদার রাক্ষস সেনারা তাকে পাঁকে পেড়ে ফেলল।

ভক্ত হনুমান পঙ্কশয্যায় গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে আমার পক্ষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। আমি আমার কপি সৈন্যদের উৎসাহিত করে বললাম, ভাইসব, প্রাণ যায় তবু লাফ দাও। ওপারে গিয়ে ওই বর্বর অসভ্য রাক্ষসগুলোর কাঁধে চেপে বসে শায়েস্তা কর।

অদূরে ঐ নাশি খালটা পারাপারের জন্যে গাছের একটা মোটা ডাল ফেলা থাকত। আমরা কিন্তু সেই সেতুপথ ব্যবহার না করে সোজাসুজি খাল পেরিয়ে রণভূমিতে প্রবেশ করতে চাইলাম। হুঙ্কারে, গর্জনে, উত্তেজনায় তখন আকাশ কাঁপছে। খালের স্রোতে কয়েকজন দুর্বল কপি কিছুদূরে ভেসে গেল। রাক্ষস সেনারা তাদের যেন গিলে খেতে ছুটল।

আমাদের কিছু সৈন্য ততক্ষণে পারে উঠে ঘোরতর যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। এদিকে যেসব বানরকে পারে ওঠার সময় রাক্ষসেরা আবার জলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, তারা যুদ্ধের নতুন একটা কায়দা আবিষ্কার করল। তারা খালের কাদা হাতে তুলে রাক্ষসদের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে লাগল। দু'চারজন চোখে হাত চেপে ভূমিশয্যা গ্রহণ করল।

আমি তখনও খালে ঝাঁপ দিইনি। শেষ বানরটি যতক্ষণ না ওপারে গিয়ে ওঠে ততক্ষণ আমি এপারে দাঁড়িয়ে প্রবল চিৎকারে ওদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি।

দেখতে দেখতে ওপারে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ত্রিনাথ ততক্ষণে খালের পাড়ে উঠে সীতা

উদ্ধারের জন্য বট গাছ লক্ষ্য করে ছুটেছে। রাক্ষসেরা সবাইকে ছেড়ে হৈ-হৈ করে ছুটল ত্রিনাথের পেছনে। খালের পাড় তখন শূন্য। আমি সেই সুবর্ণ সুযোগে খাল পার হলাম। নিজেকে সামলাতে গিয়ে হাতের ধনুক ভেসে গেল খালের জলে। এখন আমার সঙ্গে বাগ্‌দী রাখালদের কোন তফাৎ নেই। কাপড়চোপড় কাদায় মাখামাখি। গায়ে মুখে কাদার ছোপ।

দূরে রাবণরাজা ত্রিনাথকে পেড়ে ফেলে চেপে বসেছে। কেউ বা তার হাত-পা টেনে ধরে আছে। ত্রিনাথের সম্ভবত আঘাত লেগেছে। সে রাক্ষসের পীড়নে পরিত্রাহি চিৎকারে আকাশ কাঁপাচ্ছে।

দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি ত্রিনাথের দিকে ছুটে গেলাম। প্রধান সেনাপতিকে উদ্ধার করা এখন আমার আশু কর্তব্য।

ত্রিনাথের কাছে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সুগ্রীবকে ছেড়ে রাবণ উঠে দাঁড়াল আমার মুখোমুখি। শুরু হয়ে গেল রাম রাবণের যুদ্ধ। কপি আর রাক্ষসসেনারা ছুটে এল যে যার প্রভুর হাত শক্ত করবার জন্যে। চড়-চাপড়, কিল ঘুষির সঙ্গে প্রবল চিৎকার। তখন রক্তে লেগে গেছে যুদ্ধের নেশা। প্রবল বিক্রমে আমি রাবণের গলা পাকড়ে ধরেছি। ভাঙা কাঁসির মত আর্ত চিৎকার বেরুচ্ছে রাবণের গলা দিয়ে। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। আমার সমস্ত বিক্রমকে শূন্যে তুলে কে যেন মুহূর্তে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলে। আমি ভয়ানক এক যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান হলে দেখলাম ঘরে মায়ের বিছানায় শুয়ে আছি। মা আমার মাথার কাছে বসে আছে।

চোখের দৃষ্টি চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঘরের মেঝেতে একটা হেরিকেন বসান। ওখানে বসে আছে পান্না আর ত্রিনাথ। ওরা হেরিকেনের মাথায় একটা নুনের পুঁটুলির মত কি যেন বসিয়ে রেখেছে। কিছুক্ষণ পরে পুঁটুলিটা মায়ের হাতে এনে দিল পান্না। মা আমার পিঠের একধারে সেঁক দিতে লাগল।

এতক্ষণে আমি সারা গায়ে যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

দু'দিন পরে আমি অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার পতন ও মূর্ছার কারণটাও জেনে ফেলেছি পান্নার কাছ থেকে। আমি যখন রাবণের গলা জড়িয়ে ধরি তখন তার অতি দক্ষ এক যোদ্ধা আমাদের পরাস্ত করার একটা উপায় আবিষ্কার করে। সে তার দলবলসহ একপাল শিংওলা গরুকে আমাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে। সবাই সরে যায় কিন্তু আমি আর রাবণ সরে যেতে পারিনি। আমারই দুর্ভাগ্য, একটা গরু ল্যাজে মোচড় খেয়ে দিগ্বিদি ক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমারই পাশ দিয়ে তার পলায়নের পথটি আবিষ্কার করে। যাবার সময় যেহেতু রাবণের গরু সেজন্যে তাকে কিছু না বলে আমাকে শিংএর গুঁতোয় শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে দেয়। পিঠের ভেতর বেশ খানিকটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিল আমার। পান্নার বাবাই ক্ষতস্থানে গাছগাছালির মলম লাগিয়ে বেঁধে দেয়।

আরও জানতে পারলাম, আমার পতনে রাবণপক্ষ ঘাবড়ে যায়। এদিকে পতিব্রতা সীতা পতিদেবতার পতনের দৃশ্যে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় তার বাবার কাছে। উদয় সিং সকন্যা তার বাঁধানো লাঠি উঁচিয়ে ছুটে আসে রণক্ষেত্রে। তাকে তেড়ে আসতে দেখেই রাবণপক্ষ মুহূর্তে জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা দেয়। অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ত্রিনাথ আর পান্নার সাহায্যে উদয় সিং পরাভূত শ্রীরামচন্দ্রকে বাড়ীতে বয়ে আনে।

হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শুনে আমি জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম। ত্রিনাথের বাবা বাগ্‌দীপাড়ার মাতব্বরদের ধমকাচ্ছে। মাতব্বররা একবার করে হাতজোড় করছে, তারপর পাশে দাঁড়ান ছেলেদের গালে পিঠে চড় চাপড় মারছে। দেখলাম, সেদিনের রাবণ মাথায় একটা চাঁটি খেল।

ইতিমধ্যে ভেতর মহল থেকে বাইরের উঠোনে মায়ের আবির্ভাব। মা বলল, কি ব্যাপার? এত হৈ-চৈ কেন বক্‌সীবাবু?

ত্রিনাথের বাবা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। মাতব্বররা সেদিনের ঘটনার জন্যে ছেলেদের নিয়ে মার কাছে মাপ চাইতে এসেছে।

মা অমনি বলে উঠল, কি হয়েছে এতে, ছেলেরা তো দৌড়ঝাঁপ করবেই। কাটা ছেঁড়া ওদের লেগেই আছে। আর তাছাড়া আমি যতটুকু জেনেছি তাতে মারামারির কথাটা আমার ছেলে আর ত্রিনাথই আগে পেড়েছিল। দোষ হয়ে থাকলে ওদেরই আগে শাস্তি দিতে হয়।

মাতব্বরেরা হাতজোড় করে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যাতে ভাবখানা বোঝাল এই, ছি ছি, মা জননী কি বলছেন! বাবুর বাড়ীর ছেলে কি কখনও দোষ করতে পারে।

রাবণরাজার বাবা তার ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল মায়ের দিকে। উদ্দেশ্য মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া। মা রাবণকে ধরে ফেলে বলল, তুমিই যুদ্ধে জিতেছ। রাম হেরে গেছে। তোমরা দলবল নিয়ে পরশু এস এখানে খেয়ে যাবে।

মাতব্বরদের দিকে চেয়ে মা বলল, তোমাদের পাড়ার সব ক'টি ছেলে-মেয়েকেই পাঠিয়ে দিও সেদিন।

আমি সারা রামায়ণখানা মনে মনে একবার ঘেঁটে দেখলাম। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের পরে রাবণের গোষ্ঠিকে রামের মা ভোজের নেমন্তন্ন দিয়েছে বলে মনে করতে পারলাম না।

।।৩।।

পিতৃদত্ত কিছু অর্থ আর সম্পত্তি পেয়ে ভেবেছিলাম পরের চাকরি আর করব না। স্বাধীনভাবে ঘুরেফিরে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হলো। একঘেয়ে ঘরে বসে থাকা ধাতে সইল না। এক আত্মীয়ের পরামর্শে ধানের ব্যবসায়ে নেমে পড়লাম। নিজের জমির ধান আর বড় বড় জোতদারদের ধান সংগ্রহ করে দুটো বড় নৌকোয় ভরে নদীর মোহনার কাছে রাইস মিলে চালান দিতাম। বেশ দু'পয়সা হাতে আসছিলও। কিন্তু একদিন প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণির মুখে পড়ে দুটো বোঝাই নৌকোরই ভরাডুবি হলো। কেউ কেউ বলে ধানগুলো বেচে দিয়ে গোমস্তা আর মাঝিমাল্লারাই ঝড়ের সুযোগে ষড় করে নৌকো দুটো ডুবিয়ে দেয়।

আমি ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। আমার কপালে ব্যবসা নেই, এই সত্য মেনে নিয়ে আমি লক্ষ্মীপুজোর পাট তুলে দি।

কিন্তু ব্যবসার পাট তুলে দিয়ে ঘরে বসতেই আর এক উপদ্রব শুরু হলো। কনে পক্ষের ভীড় জমতে লাগল। মা তাদের আদর আপ্যায়ন করে বসায় আর আমি ফাঁক বুঝে পালাই। মায়ের সাধ, একমাত্র ছেলেকে বিয়ে করিয়ে সংসারী সাজায় কিন্তু আমি যে মনে মনে বৈরাগী সেজে বসে আছি তা কাকে বোঝাই! অবশেষে মায়ের চোখের জল আর আত্মীয়দের পীড়ন আমাকে ঘরছাড়া করল। আমি কিছু টাকা এনে শহরতলীতে ছোট্ট একটি বাড়ী তুললাম।

একটু দূরেই ট্রেন লাইন। মাঠের বুক চিরে ছুটে চলেছে ট্রেন। মাঝে মাঝে গাছগাছালির ফাঁকে আড়াল হচ্ছে, বাঁশি বাজছে, আবার চোখের সামনে দুরন্ত ছুট।

এদিকে সন্ধ্যার ছায়া নামলেই আকাশ জুড়ে পাখিরা উড়ে চলে। কত দল তার লেখাজোখা নেই। আকাশে গুণটানা ধনুকের ছবি এঁকে ওরা সুন্দরবনের দিকে উড়ে যায়। কোথাকার পাখি কোথায় আসে তার কি লেখাজোখা আছে।

ওদের দেখে মনে হয় আমিও উড়ব। ঘরের বাঁধন আমার জন্যে নয়। দিক দেশে ঘুরে বেড়ানোই আমার বিধিলিপি, আমার আনন্দ।

সেদিন সন্ধ্যায় পান্না এল। আরাম চেয়ারে বসে পাখির ওড়া দেখছিলাম, ও গেটের ভেতর ঢুকল।

আমি অমনি বলে উঠলাম, বাইরে পোঁটলা রেখে এলে কেন শাহরাজাদী, ঘরের ভেতরে নিয়ে এস।

ও কাছে এগিয়ে আসতে আসতে তেমন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বাঁ চোখটা ছোট করে মুখ টিপে হেসে বলল, সেদিন থেকে দেখছি তোমার পোঁটলাটার দিকেই নজর, যে মানুষটা রোদে জলে-ঝড়ে পোঁটলা বয়ে বেড়াচ্ছে, তার খোঁজ নেই।

হেসে বললাম, শাহরাজাদী, প্রদীপটা আছে বলেই তো আলাদীন বেঁচে আছে, প্রদীপ না থাকলে আলাদীনও নেই।

ও অমনি পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তবে সেলাম বাদশা, বাঁদী চলল।

আমি তো তোমাকে যেতে বলিনি শাহ্‌রাজাদী, পাছে চোরে তুলে নিয়ে যায় তাই অন্দরে নিয়ে আসতে বলছিলাম।

ও আপদ বালাই ঝেড়ে বিদেয় করে দিয়েছি সাহেব।

সে কি!

খুশি হওনি মনে হচ্ছে।

না, না, তা কেন। এতদিনের কাজটা হঠাৎ করে ছাড়লে কেন তাই ভাবছি।

ও কোন কথা না বলে দাওয়ায় উঠে পিলারে হেলান দিয়ে আমার মুখোমুখি বসল।

আচ্ছা সাহেব, এখনও তুমি চকে যাও?

যাই, তবে খুবই কম। রাজত্ব আর নেই। শাঁসহীন খোসাটুকুই পড়ে আছে।

ভারী দুঃখ হয় সাহেব।

হেসে বললাম, দুঃখ কেন শাহ্‌রাজাদী। নতুন জমানায় বর্গাদাররাই জমির মালিক। এটা মেনে না নিলে আমাদের দুঃখ পেতে হবে।

তা মান ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার দুঃখ অন্য জায়গায়। আমি ভাবছি আমার জীবনের সেরা মোহরগুলো আমি ছড়িয়ে রেখে এসেছি তোমাদের ঐ চকে। আর কোনদিন আমি আমার সে মোহরগুলো কুড়িয়ে পাব না।

বুঝলাম কৈশোর স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে শাহ্‌রাজাদীর মন।

বললাম, ঘরটা এখনও আছে। পুকুরটাও বেচিনি। তবে জমি জায়গাগুলোর বিলি ব্যবস্থা করে ফেলেছি। যদি যেতে চাও, একবার ঘুরিয়ে আনতে পারি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল শাহ্‌রাজাদীর চোখ-মুখ, সত্যি বলছ মালেক, আমাকে নিয়ে যাবে?

তুমি যেতে চাইলেই নিয়ে যাব।

আচ্ছা, নদীর ধারের সেই জঙ্গলে আমাকে নিয়ে যাবে তো?

আমি অমনি বললাম, সে পঞ্চবটী বনের এক টুকরো ডালপাতাও তুমি দেখতে পাবে না। সব সাফ হয়ে গেছে।

শাহ্‌রাজাদীর মুখ থেকে বিস্ময় আর শোকের তীব্র একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

ওকে প্রবোধ দিয়ে বললাম, শাহ্‌রাজাদী, বন তো বনে নেই, বন আছে মনে। তোমার, আমার, সকলের ছেলেবেলার দিনগুলো বাঁধা আছে স্মৃতিতে।

শাহ্‌রাজাদীর চোখে মনে হয় জল এসে গিয়েছিল। দোপাট্টার কোণায় সেই জল মুছে নিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল সে।

এক সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমার আর চরে যাবার সাধ নেই মালেক।

ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম, জঙ্গল না থাকলেও ঐ খাল আর নদী তেমনি রয়েছে। জোয়ারে খাল উপচে লোনা জল আমাদের গড়খাই অব্দি উঠে আসে।

শাহ্‌রাজাদী বলল, কই আগে তো তোমাদের গড়খাইতে লোনা জল ঢুকতো না। তোমাদের সেই নৌকোটা বাঁধা থাকত গড়খাই-এর পাড়ে খেজুর গাছটায়। কিন্তু ভাসত খালের জলে।

বললাম, এখন খালের পাড়ে মাটি দিয়ে উঁচু বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লোনা জল আর পাশের জমিতে ঢুকে ক্ষেতের চাষ নষ্ট করতে পারে না। ধান এখন ভাল ফলছে।

শাহ্‌রাজাদী খুশি হয়ে বলল, বড় কষ্টে দিন কাটত চাষী আর বাগ্‌দীপাড়ার লোকদের। সারা বছর বস্তা নিয়ে গোমস্তাবাবুর কাছে খোরাকির ধান চাইতে আসত। কত ধমক খেত, কত চোখের জল ফেলত বেচারারা। এখন দুটো খেয়ে বাঁচবে সাহেব।

বললাম, তা ঠিক।

কিন্তু তোমার গড়খাইতে লোনা জল ঢুকল কি করে, তা তো বললে না?

হেসে বললাম, চারদিকে পথ বন্ধ হলে সে বেচারা যাবে কোথায়? তাই আমার ক্ষয়ে-যাওয়া পাড় উপচে গড়খাইতে ঢুকে পড়ছে।

গড়খাই-এর পাড়ে তোমাদের সেই সর্ষেক্ষেতের চাষ এখনও আছে?

হয়ত আছে, হয়ত নেই।

একথা কেন বলছ সাহেব?

তোমার রাবণকে মনে আছে?

ও, সেই তিনু যার নাম?

হ্যাঁ, সেই তিনুকেই ও জমিটা তদারকির ভার আমি দিয়েছি। জমিটার খাজনা আমি দিই, কিন্তু ফসল ভোগ করে সে।

তুমি কিছুই নাও না?

এরই ভেতর ও তিন-তিনটে ছেলের বাবা হয়ে বসে আছে। আমার চলে যায়, ওর চলে না।

তুমি ঠিক মায়ের মত দাতা হয়েছ।

বললাম, মা দান করলেও সম্পত্তি রক্ষা করতে জানত, আমার ও গুণটি নেই।

শাহরাজাদী অমনি হাত পেতে বলল, বাদশা—সবাইকে সব কিছু বিলিয়ে দিচ্ছ, এ বাঁদীকেও কিছু দাও।

হেসে বললাম, যখন বাদশা ছিলাম তখন যে যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। এখন ফকিরের কাছে চাইতে এসেছ, কি দেব বল?

দুঃখীরাই তো দুঃখীকে দিতে পারে সাহেব। তোমার কিছু নেই বলেই তুমি দিতে পারবে, থাকলে দেবার আগে পাঁচবার ভাবতে।

বললাম, আমার ক্ষমতার মধ্যে হলে তোমার কোন চাওয়াই বিফল হবে না।

শাহরাজাদীর চোখে-মুখে দারুণ খুশির আভা ফুটে উঠল। সে অমনি বলল, চেয়ে নিলেই তো ফুরিয়ে যাবে মালেক, তার চেয়ে জমা থাক তোমার কাছে। আমি সুযোগ বুঝে চেয়ে নেব।

বেশ, তাই হবে, কিন্তু তোমার চাইবার জিনিসটার হদিশ পেলে আমার দেবার ক্ষমতাটা যাচাই করে নিতে পারতাম।

ওটি বলা হবে না সাহেব। তুমি যে আগে-ভাগে ভেবেচিন্তে তৈরী হয়ে থাকবে, সে সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। চাইবা মাত্রই দেনেওলা মনের ইচ্ছাটি মিটিয়ে দেবে, তাকেই তো বলব পাওয়া।

বললাম, আমি কি তোমার মত আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটি হাতে নিয়ে বসে আছি যে চাইবা মাত্রই সব হাতের কাছে এসে যাবে।

শাহরাজাদী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাদশা, সে আশ্চর্য প্রদীপটা কোথায় যে হারিয়ে গেল, তার হদিশ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললাম, না শাহরাজাদী না, সে প্রদীপ হারাবার নয়। তোমার ঘরের কোণেই সেটা অযত্নে উপেক্ষায় পড়ে আছে। একবার কুড়িয়ে নিয়ে ঘষে দিলেই দেখবে দৈত্য তোমাকে কুর্ণিশ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ম্লান হেসে শাহরাজাদী বলল, বড় যত্ন করে তাকে রেখেছিলাম সাহেব, সব কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

বললাম, তুমি আরব্য রাজনীর শাহরাজাদী, গল্পের খনি তোমার কাছে। এই সব হিরে মানিক কি হারাবার?

ওপরের দিকে মুখ তুলে কপালে হাত ঠেকিয়ে ও বলল, সবই মায়ের কৃপা। জান সাহেব, কি যত্ন করে যে মা আমাকে ঐ আরব্য রজনীর গল্পগুলো শিখিয়েছিল তা বলে শেষ করতে পারব না। আর আমি ঐ গল্পগুলো যেন গিলে খেতাম। ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে, ফিন্‌ফিনে জোছনা রাতে আমি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি, আর মা সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৌলতে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কত দেশ বিদেশ পাহাড় পর্বত, নদী-সাগর, বন-উপবনের উপর দিয়ে।

আক্ষেপ করে বললাম, আমি ছেলে হয়েও মায়ের কাছে চকে বেশি দিন থাকতে পাইনি, দেশের

বাড়িতে পড়ার জন্যে থাকতে হয়েছে, কিন্তু তুমি আর ত্রিনাথ সেদিক থেকে ভাগ্য করে জন্মেছিলে।

শাহরাজাদী হেসে বলল, ত্রিনাথদা গল্প শুনতে বড় ভালবাসত কিন্তু একটুও মনে রাখতে পারত না।

সেই ত্রিনাথ কিন্তু এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে শাহরাজাদী।

কি রকম?

জমিজায়গা কিনে ঘোরতর সংসারী হয়ে বসে আছে। আমি কোন সময় যদি চকে যাই, ওকে খুঁজে পাওয়াই যায় না।

সত্যি! কিন্তু তুমি যে সেদিন বললে, ত্রিনাথদা মায়ের শেষ সময়ে খুব সেবা করেছে?

আমি সেকথা অস্বীকার করছি না শাহরাজাদী। তবে ওর ভেতরের সেই কিশোর মানুষটি মরে গেছে।

বড় দুঃখ পেলাম সাহেব।

আমি একবার চকে ওকে কাছে পেয়ে ছেলেবেলার কথা তুলেছিলাম। ও কিন্তু ওসব কথায় বিশেষ আমল দিল না। শুধু আমার কাছ থেকে সস্তায় কি করে জমিজিায়গাগুলো পাবে, সেই সব কথাই বলে গেল।

সত্যি, মানুষ কত বদলে যায় সাহেব। ত্রিনাথদা এক সময় আমাদের জন্যে কত কিছুই না করেছে!

আমি সে সব কথা ভুলিনি শাহরাজাদী। কিন্তু আজ ওসব কথা থাক, এখন তোমার কথা বল। কত যুগ পরে সেদিন তুমি হঠাৎ উদয় হলে।

শাহরাজাদী হাতে ধরে রাখা একটা বটুয়ার ভেতর থেকে একটা কৌটো বের করল। আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নাও খোল।

কি আছে ওতে?

খোলই না মালেক।

কি জানি, তুমি তো জাদুকরী। জাদুর বাক্স থেকে কিছু একটা না বেরিয়ে পড়ে!

খুলে দেখলাম, সেই মোতিচুর মিষ্টি। বললাম, আরেব্বাস, ঠিক জাদুর খেলা দেখিয়ে দিলে শাহরাজাদী।

বড়বাজার থেকে তোমার জন্যে দরবেশ নিয়ে এলাম। খুর্জা ঘি-এর তৈরী মেঠাই।

বললাম, ত্রিনাথটা হতভাগা, এসময় কাছে থাকলে ভাগ পেত।

ও বলল, তুমি কিন্তু এখনও ওকে ভুলতে পারনি সাহেব।

বললাম, কি করে ভুলি বল। সেই রথের মেলায় তিনজনের বৃষ্টিতে ভেজা, গাছতলায় উবু হয়ে বসে কাদা বাঁচিয়ে খাজা কাঁঠাল ছাড়িয়ে খাওয়া, কাঁঠাল ছাড়াবার জন্যে দু'আনার তেলেভাজা কিনে একটু তেল চেয়ে আনা, এসব কি ভোলা যায়!

সংক্রান্তির মেলায় গরুর গাড়িতে জুনপুটে গিয়ে মাকে বাংলোয় বসিয়ে রেখে তিনজনে সাগরে ঢেউ ভেঙে চান করেছিলাম, মনে আছে সাহেব?

খুব মনে আছে। শীতে তোমার দাঁত ঠক্ ঠক্ করে কেঁপেছিল, ত্রিনাথ তার খদ্দরের চাদর খানা তোমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল।

এখানে থামলে কেন সাহেব, মনে নেই, ত্রিনাথদার চাদরখানা আমার গা থেকে খুলে নিয়ে তুমি তোমার পশমের চাদর আমার গায়ে তুলে দিয়েছিলে।

একটু থেমে শাহরাজাদী বাঁকা চোখে আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল। বলল, আমার ওপর আর কেউ ভাগ বসাক, এটা তুমি কোনদিনই চাইতে না সাহেব।

তাহলে বোঝ, আমি শাহরাজাদীকে কি পরিমাণে আপনার করে নিয়েছিলাম।

ও অমনি বলল, তা ঠিক, তোমার ধরতেও যতক্ষণ, ছাড়তেও ততক্ষণ।

আমার স্বভাবের এই ক্রটিটুকুর জন্যে আমি কি কম কষ্ট পেয়েছি! আজও পেয়ে যাচ্ছি শাহরাজাদী।

আমার গলাটা ভারী হয়ে উঠল দেখে শাহরাজাদী বলল, তোমার এই স্বভাবটটুকুর জন্যই তো এ বাঁদী তোমাকে মন থেকে চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে পারল না।

ঠিকে ঝি ঘরে এসে ঢুকল। সে একটু অবাক হয়েছে বৈকি। ব্যাচিলার জামাইবাবুকে সে বসে বসে শেষ বিকেলে বই-এর পাতা ওলটাতে দেখে, আজ কিন্তু অন্য ছবি। এক সুন্দরী মেয়ে মেঝেতে বসে আর খাটের ওপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে জামাইবাবু।

এই জামাইবাবু নামটা যে কে কবে প্রথম চালু করেছিল তা মনে নেই, তবে কাজকর্মে যেসব লোক আমার বাড়িতে আসে, তাদের সবার জামাইবাবু যে কি করে আমি হয়ে গেলাম তা আজও আমার কাছে এক গবেষণার ব্যাপার। সবাই জানত আমি ব্যাচিলার মানুষ, তাই বুঝি আমাকে জামাই বানাবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। অথবা মহাশয় বংশের ছেলেদের অভ্যেস মত কোঁচান ধুতি পাঞ্জাবি পরে আমি ঘোরাফেরা করতাম, তাই হয়ত সবার কাছ থেকে জামাই খেতাব পেয়ে গিয়েছিলাম।

আমার কাজের মেয়ের আসল নামটি শশিকলা। এককালে সে নিশ্চয় শশিকলার মতই বেড়ে উঠেছিল কিন্তু এখন তাকে শশিকলা না ডেকে পূর্ণশশী নামে ডাকাই উচিত। অবশ্য তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিধাতার এক পরিহাস। সে কালো। চোখে পড়ার মত। কিন্তু নিটোল গোল মুখখানা শ্রীমণ্ডিত। তাই ও আমার ঘরে ঢুকলেই মনে হতো, ও যেন অমবস্যার চাঁদ।

আমি স্বপাকে খাই। রাঁধুনী রাখার সামর্থ্য নেই বলে নয়, ঘরে বসে একটা কিছু কাজ তো আমাকে করতে হবে, তাই নিজের রান্না নিজেই করি।

শশি একদিন আমাকে সরিয়ে রান্না করে দিতে চেয়েছিল। আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে শশি।

ও অমনি বলেছিল, কি পিতিজ্ঞে জামাইবাবু?

বিয়ে করে টুকটুকে একটা বউ এনে তার হাতেই প্রথম রান্নাটা খাব।

শশিকলা রসিকতাটা ধরতে পেরেছিল কিনা জানি না, শুধু ছোট্ট একটা উত্তর দিয়েছিল, খেও।

হয়ত এটা ওর অভিমানের উক্তি। জামাইবাবুকে নিজের হাতে খাওয়াতে পারল না বলে অভিমান।

আজ শাহরাজাদীকে ভাবনার ভেতর ডুবে থাকতে দেখে ও কি ভাবল কে জানে? শাহরাজাদী কিন্তু শশিকলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভেতরে চলে গেল। আমি বাইরে একা একা বসে রইলাম, ওরা ভেতরে গিয়ে দুজনে মিলে কিছু একটা করতে লাগল।

বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পর বাইরের ঘরে এল শাহরাজাদী। কাঁসার থালায় চক্রাকার কয়েকখানা নিমকি সাজান। নিজের হাতে ভেজে এনেছে। পাশে সেই বড়বাজার থেকে আনা মেঠাই। সবচেয়ে অবাক হলাম, ডান হাতে ও চুম্‌কি ভরে জল এনেছে। ঝক্‌ঝকে মাজা পেতলের চুম্‌কি, সোনার মত ঝিলিক দিচ্ছে।

এই চুম্‌কিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। চকে গেলেই আমি ওতে জল খেতে চাইতাম। মা এটা জানত বলে আমি চকে পৌঁছলেই চুম্‌কিটার খোঁজ পড়ত। পান্না এলে মা তাকে আদর করে ওটাকে মেজে দিতে বলত। পান্না তেল আর মাথার চুল দিয়ে চটের ওপর চুম্‌কিটা ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাজত। কলঙ্ক বের করে দিয়ে যখন ধুয়ে মুছে আনত তখন পেতলের চুম্‌কিটা সোনার বরণ হয়ে যেত।

মা মারা যাবার পর চক থেকে কিছু বাসন এনেছিলাম। তার ভেতর ঐ চুম্‌কিটাও ছিল। কিন্তু ওটা ঐ বাসনের পাঁজার ভেতর অনাদরে পড়েছিল। ওকে প্রতিদিন মেজে ওতে জল খাবার উৎসাহ আর ছিল না।

এই মুহূর্তে শাহরাজাদীর হাতে জলভরা মাজা চুম্‌কিটা দেখে চোখে জল এসে গেল। মায়ের কথা মনে পড়ল, আর মনে পড়ল পান্না নামের একটি কিশোরী মেয়ের মুখ।

ঘরের কোণে টিপয়ের ওপর থালা আর গ্লাস রেখে শাহরাজাদী সেটা আমার কাছে এগিয়ে নিয়ে এল।

আমি বললাম, শাহরাজাদী, তুমি কি সত্যিই জাদু জান?

কেন মালেক?

এই যে তুমি আমার পুরোনো পেতলের কলঙ্ক পড়া চুম্‌কিটাকে হাতের ছোঁয়ায় সোনা করে এনে দিলে।

শাহরাজাদী বলল, হঠাৎ তোমার সংসার নেড়ে-চেড়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ে গেল। ভাবলাম, চকে ঐ চুম্‌কিটা না হলে তুমি জল খেতে না। আজ ওটা বাসনের পাঁজার তলায় পড়ে আছে। তাই ওটাকে মেজে জল ভরে আনলাম।

তুমি শুধু চুম্‌কিটাই এনে হাজির করনি শাহরাজাদী, পান্না নামের একটি মেয়েকেও আমার সামনে এনে হাজির করেছ।

শাহরাজাদী বলল, গরম গরম ভেজে এনেছি, খাও। খেতে খেতে কথা বল।

বলালম, তোমার কই?

তুমি আগে খাও মালেক।

সত্যি করে বল, নিজের জন্যে কিছু রেখেছ?

শুধু কি আমার জন্যে রেখেছি, তোমার ঐ শশিকলার জন্যেও।

বললাম, ভারী ভাল মেয়ে শশিকলা।

তাই তুমি ওকে এত দুঃখ দিয়েছ।

কি রকম?

ওর হাতের রান্না নাকি তুমি খেতে চাওনি। ও কালো বলে ঘেন্না আছে তোমার।

সে কি! তাই ও বলেছে বুঝি?

না না, ও নিজের থেকে প্রথমে কোন কথাই বলতে চায়নি। আমি যখন খাবার তৈরী করতে গিয়ে ওকে ডাকলাম তখন ও মুখ গোঁজ করে বলল, আপনিই তৈরী করে দিন দিদি, জামাইবাবু সকলের হাতের ছোঁয়া খান না।

আমি ওর কথা শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। খাওয়ার বাছবিচার তো আমার সাহেবের কোনদিন ছিল না, তাহলে এ কথা ও বলছে কেন! পরে কথায় কথায় জানলাম, তুমি নাকি বলেছ, টুকটুকে বউ বিয়ে করে এনে তার হাতের রান্না আগে খাবে।

বেচারার রঙ একটু ময়লা বলেই কি তুমি ওর হাতে খেতে চাওনি?

আমি বললাম, এ ভুল তোমারও হলো কি করে শাহরাজাদী? আমি কি রঙে ভোলার মানুষ?

তাই তো আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম বাদশা, এ কেমন করে হলো!

স্রেফ রসিকতা করেছিলাম। একেবারে গাঁয়ের সহজ সরল মেয়েটি আমার মজার রসিকতাটুকু ধরতে পারেনি।

আমিও পারিনি সাহেব। আমার বড় কষ্ট হয়েছিল। ওর সঙ্গে গল্প করে ওর জীবনের অনেক দুঃখের কথাই জেনেছি।

শশিকলা কি এখনও ভেতরে কাজ করছে?

অনেক আগেই ও পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় কি বলে গেছে জান?

কি?

ও বলেছে, আপনার কি ভাগ্য দিদি, জামাইবাবু আজ আপনার হাতের তৈরী খাবার খাবে।

হেসে বললাম, টুকটুকে নতুন বউ-এর হাতের খাবার আর কি!

রঙ্গ রাখ বাদশা, মেয়েটার জীবনের দুঃখের কথা তুমি জান?

মেয়েদের মনের কথা জানার চেষ্টা তো করিনি কোনদিন। ও আসে, নিজের মনে কাজ করে চলে যায়। দু'চারটে কথা হয়। বুঝতে পারি মেয়েটি সরল। ওর মন বলে একটা বস্তু আছে।

শশিকলার সাদি হয়েছিল তুমি জান?

ও না বললে কেমন করে জানব বল?

ওর সাদি হয়েছিল সাহেব। খুব গরিব বাড়ির মেয়ে গরিব লোকের সঙ্গেই সাদি হয়েছিল।

তারপর?

ওর মানুষটি কাজ করত এক মৌ-এর ব্যবসাদারের কাছে।

মৌ-এর ব্যবসাদার?

হাঁগো, মধু, মধু। যারা সুন্দরবনে গিয়ে জঙ্গল থেকে মধুর চাক ভেঙে মৌ নিয়ে আসে।

তারপর?

কাজটা বড় ঝামেলার। বিপদ ঘোরে পায় পায়।

তুমি সুন্দরবনের বাঘের উৎপাতের কথা বলছ তো? প্রতি বছর বেশ কতক মানুষ এই কাজ করতে গিয়ে বাঘের পেটে যায়।

ওর মানুষটাও এমনি একদিন বাঘের পেটে গেল।

সত্যি!

ও তাই বলল সাহেব। বলল, মহাজন এসে প্রতিবার ওর মরদের হাতে করকরে দশ-বিশ টাকার নোট গুঁজে দিলেই ও উঠে দাঁড়াত। ওর প্রতিজ্ঞার কথা আর মনে থাকত না।

কিসের প্রতিজ্ঞা?

শশিকলা যখন কেঁদে-কেটে সারা হতো তখন ওর মানুষটা প্রতিজ্ঞা করত ও আর সুন্দরবনের জঙ্গলে যাবে না।

বললাম, গরিব মানুষের এসব প্রতিজ্ঞার কি দাম আছে শাহরাজাদী!

ঠিক তাই। ওই মানুষটাকে যেন একটা কালপুরুষে টেনে নিয়ে যেত। মানুষটা যখন ঘর ছাড়ত তখন শশিকলার আসল কষ্ট শুরু হতো। একা ঘরে কান্নাকাটি তো আছেই, তার ওপর ভয়ে মরে থাকত। রাতে খোয়াব দেখে চেঁচিয়ে উঠত। ভোর হলে ছুটত পীরের আস্তানায় অথবা বুড়ো শিবতলায় মানত করত মানুষটার ভালয় ভালয় ফিরে আসার জন্য।

একটু থামল শাহরাজাদী। এক বুক শ্বাস উজাড় করে বলল, সে কিন্তু ফিরে এল না। যে ফিরে এল সে মহাজন।

বললাম, মহাজনেরা কোনদিন বাঘের পেটে যায় না শাহরাজাদী, দুঃখী মানুষগুলোই মরে।

জান সাহেব, ঐ মহাজনই ওকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

কি রকম?

বাঘের থাবায় মানুষটা জখম হলেও বেঁচে আছে, তার সেবা আর ওষুধের দরকার বলে মহাজন ওকে নৌকোয় করে সুন্দরবনে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল।

তারপর?

নৌকোয় চেপে যেতে যেতে একটা দ্বীপে রাতের বিশ্রামের জন্য নোঙর করে। মহাজন ঘুমিয়ে পড়লে এক বুড়ো মাঝি শশিকলাকে সব কথা খুলে বলে। শশিকলা ভয়ে ভাবনায় জীর্ণ হয়ে যায়। মাঝি ওকে নৌকো থেকে চুপি চুপি নেমে অন্ধকারের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে পালাতে বলে। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে শশিকলা অন্ধকার চিরে পালায়। পরে ঐ দ্বীপেরই অন্য একটা নৌকোয় করে ও ঘরে ফিরে আসে।

সে লোকটা আর আসেনি ওর খোঁজে?

পাছে তার সঙ্গে আবার মুখোমুখি হতে হয়, সেই ভয়ে ও দেশ ছেড়ে কলকাতায় কাজ করে বেড়াচ্ছে।

ওর ঘরবাড়ির কি হলো?

গরিবের আবার ঘরবাড়ি। যেখানে থাকে সেখানেই তার ঘর। এই যেমন তোমার শাহরাজাদী।

তোমাকে দেখলে অবাক হতে হয় শাহরাজাদী। যেখানে তুমি সেরা ধনীর প্রাসাদে গিয়ে উঠতে পার সেখানে নিজের ইচ্ছায় গাছতলায় আশ্রয়টুকু বেছে নিলে।

সুখ তো ধনে নেই মালেক, সুখ আছে মনে। আমি বড় সুখী বাদশা। রাতদিন সুখে মৌজ হয়ে থাকি।

আচ্ছা শাহরাজাদী, তুমি তোমার কাজ ছেড়ে এখন রয়েছ কোথায়?

শাহরাজাদী আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঘরের চেয়ে খোলা আকাশের তলায় থাকতে আমি ভালবাসি সাহেব। যেখানে ছিলাম আপাতত সেখানেই আছি।

সেই গাছতলায়?

গাছ সবচেয়ে বড় আশ্রদাতা। পাখিকে আশ্রয় দেয়, মানুষকেও দেয়। শুধু ছায়া নয়, ফুল-ফল, ডাল-পাতা সবই দেয়। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জান সাহেব, যাকে সে আশ্রয় দেয়, তার কাছ থেকে কিছু চায় না।

তুমি যদি কাজই ছেড়ে দাও তাহলে আয় উপায়ের রাস্তা কি?

হাসিতে ভেঙে পড়ে শাহরাজাদী দু'হাতে শূন্যে একটা ভিক্ষা পাত্র বাড়িয়ে ধরার অভিনয় করে বলল, তুমি আমাকে দু'মুঠো খাওয়াতে পারবে না মালেক?

আমিও সকৌতুকে বললাম, পারব না কেন শাহরাজাদী, তোমার রুচবে না। তোমাকে কি চিনতে আমার বাকী আছে। কেউ খাওয়াবে তোমাকে, আর বসে বসে তুমি খাবে, সে মানুষই তুমি নও।

শাহরাজাদী এবার আর ও প্রসঙ্গের ধার দিয়ে গেল না। সে বলল, ও সাহেব, আকাশে তারা ফুটল যে! অনেক সময় তোমাকে জ্বালালাম, এবার যাই।

বললাম, আবার কবে আসছ?

ও উঠে দাঁড়িয়েই বলল, কেউ কি হলফ করে বলতে পারে বাদশা। তবে দীনদুনিয়ার মালেক যখন যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যেতে হবে।

ও আমার এক চিলতে ছোট্ট বাগানের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে চলতে শুরু করল। আমি বললাম, কত দিন তোমার মুখে আরব্য রজনীর গল্প শুনিনি। ভারী ইচ্ছে করে পুরোনো দিনের মত মুখোমুখি বসে গল্প শুনতে।

ও চলতে চলতেই থামল। মুখখানা ঘুরিয়ে বলল, শুনিয়ে যাব সাহেব, শুনিয়ে যাব। বাদশার দিল্ যখন একবার চেয়েছে তখন বাঁদী জরুর শুনিয়ে যাবে।

ও বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি সন্ধ্যার পাখিদের উড়ে চলার আওয়াজ পেলাম। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, আমারই ভুল। মাথার খানিক ওপর দিয়ে একটা দলছাড়া নিঃসঙ্গ পাখি দিশাহারা আঁধার আকাশে উড়ে চলেছে।

• সে রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এলো না আমার চোখে। অনেক দিনের হারানো প্রিয় বস্তুটি খুঁজে পেলে যেমন মন ভরে ওঠে এক অদ্ভুত আনন্দে, ঠিক তেমনি আজ রাতটা খুশির জোয়ারে ভেসে যেতে লাগল। দূরে মাছের ভেড়ি আর সংলগ্ন মাঠ জ্যোৎস্নায় চিক চিক করছিল। আশ্চর্য এক মায়াময় রাত্রি আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। আমি সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এড়াতে পারলাম না। নতুন মাটি ফেলা বাঁধের ওপর দিয়ে ভেড়ির দিকে চললাম। অগ্রহায়ণের শেষে সবে শুরু হয়েছে শীতের আমেজ, গায়ে জড়িয়ে নিয়েছি একখানা শাল, মাঠের মাঝখানে হাল্কা কুয়াশার একখানা আস্তরণ পড়েছে। মাঠ পেরিয়ে সেই মাছের ভেড়ি। মস্ত বড় পাড় পুরোনো দিনের গাছ-গাছালিতে ভরা। আমি একটা গাছের চওড়া গুড়িতে গিয়ে বসলাম। একেবারে পাড়ের ধারে হোগলা আর শরবন। মাঝখানের জলটা চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে। আমার মনে হলো ওই টুকরো ঝিলিমিলিগুলো আমার ফেলে-আসা দিনের উজ্জ্বল স্মৃতির মণি-মাণিক্য।

আজ কেন আমার ঘুম এলো না, কেনই বা আমি মাঝরাতে নিঃসঙ্গ পথে এমন করে এখানে চলে এলাম তা বিশ্লেষণ করতে মন চাইল না। মনের ভেতরে বিপুল একটা খুশির হাওয়া যেন ঠেলতে ঠেলতে আমাকে এখানে এনে ফেলল।

নিঃসঙ্গ নির্জনে মানুষ যখন এসে বসে তখন কিন্তু সে একাকী থাকে না। ভাবনার সহস্র পাখী তার

চারদিক ঘিরে উড়তে থাকে। আমি ভাবতে লাগলাম। একটাই আমার ভাবনা। শাহরাজাদী এখন কী করছে?

সে কি এখন কোন সম্পন্ন মানুষের গাড়ীবারান্দার তলায় শীতের আশ্রয় নিয়েছে? অথবা তার সেই গাছতলাতে বসে শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন পোহাচ্ছে? ধিক্ ধিক্ আগুন জ্বলছে, শাহরাজাদী হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে ভাবছে তার জীবনের কথা। সে জানতেও পারছে না আজ তারই মত আর একটি মানুষও নিদ্রাহীন রাতটুকু কাটিয়ে দিচ্ছে একটি ঝিলের ধারে বসে। এই মুহূর্তে মনে হলো শাহরাজাদীর সঙ্গে এই বিচ্ছেদের ব্যবধানটুকু বড়ো যন্ত্রণাময়। যদিও সে যন্ত্রণা আমার মনের মধ্যে এক অননুভূত আনন্দের শিহরণ তুলে দিয়ে গেল।

কি আশ্চর্য এই মানুষের মন, বারে বারে তার জীবনের ছক তৈরী হয়। আবার কোন্ দুর্নিবার স্রোত তার সেই ছক ভেঙে ভেঙে দিয়ে যায়। একক জীবনের যে ছকটি আমি মনের অনেকখানি শক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছিলাম, একটা চোরা স্রোত হঠাৎ এসে তাকে ভাঙতে শুরু করে দিল। কিন্তু সে বাঁধনকে আরো শক্ত করার কোন চেষ্টা বা শক্তি আজ আমার মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। আমি যেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টার ভুমিকায় বসে আছি, সেই গোপন সঞ্চারী স্রোতধারা আমার জীবনের ছকটাকে নাড়া দিয়ে তার বাঁধনের শক্তিটুকুকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিয়ে যাচ্ছে। এ আনন্দ কি বেদনা আমি বুঝতে পারছি না। আমার নিঃসঙ্গ জীবন এই শীতের রাতে কেন এক উত্তপ্ত সঙ্গ কামনা করছে! আমার উদাসী মন কার হাতছানিতে ঘরে ফেরার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে! এই শীতের কাঁপনের মধ্যে জ্যোৎস্নার জলে স্নান করতে করতে আমি ঘরের পথে ফিরে চললাম। আমার মনে হতে লাগল আমার ঘরের মধ্যে কে যেন আমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে।

।। ৪ ।।

ভারী মিষ্টি দেখতে ছিল পান্নাকে। ও যখন সিংহীদের বাগান থেকে মায়ের কাছে আসত তখন পথঘাটে চলতি লোকেরা থমকে দাঁড়াত। এক পলক দেখে নিত ঘাঘরা পরা, দোপাট্টা উড়িয়ে নাচের ভঙ্গীতে ছুটে চলা মেয়েটিকে।

সেবার পলাশডাঙায় রথ দেখতে যাব বলে মায়ের কাছে আর্জি পেশ করেছি। দেশের বাড়ি থেকে শুধু এই কারণেই আমার চকে আসা।

মা কোন কাজেই আমাকে পারতপক্ষে বাধা দিতে চাইত না। তাই আর্জি পেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর হলো। আমি আর ত্রিনাথ যাব মেলায়। রথ উপলক্ষে তিন-চারখানা যাত্রী বোঝাই নৌকো ছাড়ে নদী-ঘাট থেকে। ঐ নৌকোর যে কোন একটাতে যাওয়া সাব্যস্ত হলো। পায়ে হেঁটে অবশ্য পলাশডাঙা যাওয়া যায় কিন্তু সে অনেকখানি পথ। বৃষ্টি হলে কাদায় কাদায় পথঘাট মাঠ একাকার। তাই রথের মেলায় যাওয়া-আসার বাহন হলো নৌকো।

সব ঠিক ছিল, কিন্তু প্ল্যান বদলে দিল পান্না। আমাদের যাবার কথা শুনে সে মায়ের কাছে কেঁদে-কেটে পড়ল। মা পান্নার বাবাকে ডাকিয়ে এনে তার মেয়ের ইচ্ছার কথা বলতেই উদয় সিং বলল, আপনি যা বেওস্তা করবেন তাই হোবে বহুরাণী। এ পাগ্‌লি তো আপনার লেড়কি আছে।

এর পর পান্নাকে ঠেকায় কে। পান্নার দৌলতে আমাদের যানবাহনের আলাদা ব্যবস্থা হলো। মা নন্দ মাঝিকে ডেকে তার নৌকোটা ভাড়া করে আমাদের মেলায় পাঠিয়ে দিল।

নন্দ মাঝি নৌকোয় বসে আর আমরা তিনজনে মেলা চষে বেড়াচ্ছি।

এক ঝাঁকা রেশমী চুড়ি দেখে পান্না সেখান থেকে আর নড়ে না। চুড়িওয়ালী বুঝে নিয়েছে এ খদ্দের হাতছাড়া হবার নয়। তাই সে আর পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

পান্না পছন্দসই বেশ কিছু চুড়ি বেছে নিয়ে হাতে পরল। অমনি আমি পকেট থেকে দাম বের করে দিলাম। মা মেলায় বেরুবার সময় আমার পকেটে হাতখরচ দিয়ে দিয়েছিল। পান্না আর ত্রিনাথের জন্যে কিছু কিনে-কেটে দিতে বলেছিল।

পান্না লাল আর সুবজ চুড়ি পরে উঠে দাঁড়াতেই একটা খুশির হাওয়া যেন বয়ে গেল। চুড়িওয়ালী একমুখ হেসে বলল, আমার চুড়ি বেচা সাথ্যক হলো মেয়ে। কি সোন্দর মানিয়েছে ঐ রাঙা হাতে।

ত্রিনাথ রসিকতা করে বলল, তাহলে চুড়িওলী তোমার সব ক'গাছা চুড়ি পরিয়ে দাও এই মেয়েটাকে। তোমাকে কষ্ট করে আর বেচতে হবে না, এক মিনিটে ঝাঁকা খালি হয়ে যাবে।

চুড়িওয়ালী বলল, এত সুখ সইবে না বাছা, গরিব মানুষকে কষ্ট করেই সব বেচতে হয়।

এর পর সারা মেলা পাখির মত খুশির হাওয়ায় উড়তে লাগল পান্না। আমি মেঠাই, চিনির রথ আর কদমা কিনে ওদের খাওয়ালাম। পান্নার মুখে মেঠাই ছাড়া আর কিছু রুচল না। ও তেলেভাজা আর পাঁপড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, পিতাজী মেলার খরচা দিয়েছে, আমি তোমাদের বড়াভাজা খাওয়াব।

আমি হৈ-হৈ করে উঠলাম, মায়ের বারণ আছে পান্না, তেলেভাজা খাওয়া চলবে না।

মায়ের কথা পান্নার কাছে দেবীর আদেশ। সে মাথা নেড়ে জানাল, তেলে-ভাজার কথা সে আর তুলবে না।

ত্রিনাথের পয়সা রাখার একটা বটুয়া ছিল। সে পয়সা বের করে বলল, চল, তোদের খাজা কাঁঠাল খাওয়াই।

আপত্তি ছিল না পান্নার। কাঁঠাল কেনা হতে না হতেই এক পশলা বৃষ্টি পড়ল চড়বড়িয়ে। আমরা একটা আশ্রয়ের দিকে দৌড়লাম। পান্নার হাত আমি মুঠো করে ধরেছি। সে ছুটছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। গদার মত আস্ত কাঁঠালখানা কাঁধে ফেলে ভীমবেগে আগে আগে ছুটছে ত্রিনাথ। আমি ক্লাস নাইনের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' পড়া হয়ে গেছে। আমি পান্নার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বললাম, তোমাকে ঠিক রাধারাণীর মত লাগছে।

পান্না বলল, রাধারাণী কে?

খুব ভাল একটা মেয়ে, তবে বড় গরিব ছিল। তার সঙ্গে রথের মেলায় বৃষ্টির ভেতরে যে লোকটির দেখা হয়েছিল, সে তাকে পরে বিয়ে করেছিল।

পান্না কি ভাবল কে জানে? অমনি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, ধ্যেৎ।

আমি ফের ওর হাত ধরে বললাম, পিছলে আছাড় খেলে ধ্যেৎ বেরিয়ে যাবে।

ও এবার আমার হাত শক্ত করে ধরল। সামনে ত্রিনাথ বৃষ্টির মুখে আর এগোতে না পেরে জগন্নাথের রথের তলায় ঢুকে পড়ল। আমরাও সেই পথ ধরে সবার চোখের আড়ালে অদৃশ্য হলাম।

সন্ধ্যা নামার আয়োজন চলেছে পুব আকাশে। পশ্চিমে মেঘের গায়ে মেটে সিঁদুর ছড়ান। ত্রিনাথ, পান্না আর আমি পিছল পথের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল টিপে টিপে ছুটছি। এখন যাত্রীদের ঘরে ফেরার তাড়া। রথ অনেক আগেই কাঁসর, ঘন্টা, খোল-করতালের আওয়াজ তুলে মাসীর বাড়ি গিয়ে ঢুকেছে। ছোট ছোট বাচ্চাদের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে বড়রা। তারা মহা আনন্দে কাঁধে চেপে সদ্য কেনা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে। কেউ বা বায়নার জিনিসটি পায়নি বলে হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে।

নৌকোয় ওঠার জন্যে যাত্রীদের হুড়োহুড়ি। মাঝি হুঁশিয়ারী দিচ্ছে নৌকোয় আর নয়, আর নয়।

নন্দ মাঝির নৌকো গেল কোথায়? যেখানে ছিল সেখানে নেই। নদীর ঘাটে থিকথিক করছে লোক।

আমাদের উদ্বেগ যত বাড়ছে, পান্না তত সাহস দিয়ে চলেছে। ত্রিনাথ বলল, আমাদের দেরী দেখে নন্দ মাঝি নৌকো নিয়ে চলে যায়নি তো? এখন চল, যে কোন একটা নৌকোয় চেপে চলে যাই।

কিন্তু একটি নৌকোও খালি নেই। সব ক'টাই লোকে ঠাসা।

পান্না বলল, নাই বা হলো নৌকোয় যাওয়া, আমরা, হাঁটা পথে ফিরে যাব।

ত্রিনাথ ধমকে উঠল। প্রায় সব ক'টা নৌকোই একে একে ছেড়ে দিল। আমাদের মুখে তখন আষাঢ়-মেঘের থমথমে ছায়া। ভাঙা মেলায় ফিরে গিয়ে কোন আশ্রয়ের চেষ্টা করব নাকি যখন ভাবছি তখন হঠাৎ পেছন থেকে ডাক, দাদাবাবু-উ।

নন্দ মাঝি দেরী হচ্ছে দেখে নদীর সংলগ্ন খালের ভেতর নৌকো ঢুকিয়ে আমাদের খুঁজতে গিয়েছিল মেলায়। সেখানে বহু সময় ঢুঁড়েও কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এসেছে।

আমাদের ধড়ে প্রাণ এল। পান্না কিন্তু মনে হলো খুশি হয়নি। নৌকোয় উঠে সে বলল, অন্ধকারে পথ হেঁটে চলায় ভারী মজা আছে কিন্তু।

আবার ধমক লাগাল ত্রিনাথ, তুই থামবি।

ফেরার পথে বেশ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের। স্রোতের টানে নৌকো ছুটে চলেছে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে নন্দ মাঝি। তার উল্টো দিকে দাঁড়ে হাত লাগিয়ে বসে আছে ত্রিনাথ, দরকার হলেই দাঁড় নামবে জলে। আমি আর পান্না ছইয়ের তলায় হাতে হাত রেখে বসে আছি। নদীর ধারে গাছগাছালির জটলা। গাছের রঙ সন্ধ্যার আবছায়ায় ধূসর হয়ে গেছে। কিন্তু সাদা সাদা শালুক ফুলের মত বকগুলো ফুটে আছে গাছের ডালপাতা ছেয়ে। পান্না যে ভীষণ খুশি হয়েছে তা বোঝা গেল আমার হাতে ওর আঙুলের চাপ অনুভব করে।

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। মেঘের আড়ালে দ্বিতীয়ার চাঁদ কখন উঠল আর অস্তে নামল তা বোঝা গেল না। তারা নেই আকাশে, মেঘের আস্তরণে আদিগন্ত ঢাকা। আমরা এখন আর কেউ কারু মুখ দেখতে পাচ্ছি না। জানিনা কোথায় ভেসে চলেছি! নন্দ মাঝি কি করে নৌকো চালাচ্ছে কে জানে?

হঠাৎ পান্না আমার কাঁধে তার চুলে ভরা মাথাটা ঠেকিয়ে চুপিচুপি বলল, খু-উ-ব ভাল লাগছে।

কি ভাল লাগছে?

ও মাথাটা তেমনি ঠেকিয়ে রেখে অনেক আস্তে বলল, জানি না।

দূরে টিম্ টিম্ করছে কতকগুলো আলো। ক্রমে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে তারার মত ফুটে উঠতে লাগল।

আমি ত্রিনাথের উদ্দেশ্যে বললাম, ওগুলো কিসের আলো রে?

অভিজ্ঞ ত্রিনাথ বলল, জেলে-নৌকোর আলো।

কি করছে ওরা?

ত্রিনাথ অমনি বলল, জাল বুনছে, রান্নাবান্না করছে।

নদীতে নৌকোয় বসে কেন? ওদের কি ঘরবাড়ি নেইছ

ত্রিনাথ বলল, আছে হয়ত এক আধখানা খড়ের চালা। কিন্তু সেটা ওদের আসাল ঘর নয়। ওদের প্রায় বার মাস জলে বাস।

ভারী মজার জীবন কিন্তু।

পান্না বলল, এমনি করে নৌকোর বাড়িতে আমরা যদি থাকতে পারতাম!

ত্রিনাথ পান্নাকে আবার ধমকে দিল, থেকেই দেখ্ না। ওই নৌকোয় থাকতে গেলে কেটি জেলের বউ হতে হবে।

হঠাৎ অন্ধকারে পান্না আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। মুখে বলল, ভাল হবে না কিন্তু ত্রিনাথদা। অসভ্য কথা বলছ, মাকে বলে দেব।

মায়ের নামে সব চোর। যত ভক্তি তত ভয়।

ত্রিনাথ নন্দ মাঝিকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তীর ঘেঁষে চল নন্দদা, নইলে নৌকো জালে জড়িয়ে পড়বে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। জেলে-নৌকোর আলোগুলো জলের চিকে আবছা হয়ে নাচতে লাগল। রাতকানা বুড়ো নন্দ মাঝি নৌকো নিয়ে সিধে ঢুকল জেলেদের পাতা জালের মাঝ বরাবর।

হৈ-রৈ করে উঠল আশপাশের জেলে-নৌকোগুলো।

ভয় পেয়ে পান্না আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। নন্দ মাঝির নৌকো কিছুটা জাল টেনে নিয়ে গিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দড়ির টানে।

ততক্ষণে প্রায় মার মার করে ক'টা জেলে ঘিরে ফেলেছে আমাদের নৌকোটাকে। নন্দ চেঁচিয়ে উঠল, ও ভাই—বুড়ো মানুষ, দেখতে পাইনি তোমাদের জালখানা।

ত্রিনাথ বলল, তার ওপর বৃষ্টিতে তোমাদের আলোগুলো সব আবছা হয়ে গেছে।

ওদের ভেতর থেকে হেঁড়ে গলায় একজন চেঁচাল, কুন ঘাটের লৌকা?

মহিষমুণ্ডির ঘাট।

ওদের ভেতর কিছু আলোচনা হচ্ছে শোনা গেলেও স্পষ্ট কোন কথা বোঝা গেল না।

একজন আবার গলা চড়িয়ে বলল, কে আছে লৌকায়?

নন্দ মাঝি হঠাৎ আমার মৃত বাবার নাম উচ্চারণ করে বলল, তেনার ছেলে বউকে রথের মেলা থিকে লিয়ে ফিরছি ভাই।

একজন চেঁচাল, যাও ভাই যাও, আমরা তেনার চকে আগে মাছের বন্দোবস্ত লিয়েছিলাম। বড় ভাল লোক ছিলেন বাবু।

ওরা নিজেরাই বৃষ্টির ভেতর ঠেলাঠেলি করে আমাদের নৌকোটাকে নিরাপদে বের করে দিল।

নৌকোটা নদীর ধার ঘেঁষে চলতে লাগল। এবার চেঁচিয়ে ত্রিনাথই নন্দ মাঝিকে সাবধান করতে লাগল। তীরে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ত্রিনাথ লগির ঠেলায় নৌকোটাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এমনি করে নৌকো এগিয়ে চলল মহিষমুণ্ডির ঘাটের দিকে।

পান্না এক সময় আমাকে শুনিয়ে বলল, নন্দ মাঝি বড় পাজি। বুড়োকে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দেব আমি।

বললাম, ওর তো দাঁত নেই, ভাঙবে কি? আর তাছাড়া ওই বুড়োর ওপর হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে কেন? বেচারা চোখে দেখতে পায় না বলেই তো নৌকোটাকে জালে জড়াল।

পান্না বলল, ও কি বলেছে জান?

কি বলেছে?

তুমি কি কিচ্ছুই শুনতে পাও না?

বলই না কি বলেছে?

আমি বলতে পারব না।

হেসে বললাম, তবে আমি বলি।

পান্না অমনি ঝট করে ওর হাতের পাতা আমার মুখে চেপে ধরে বলল, খবরদার, ভাল হবে না বলছি।

একটু ফাঁক পেয়েই বললাম, তোমাকে আমার বউ বলেছে বুড়ো।

পান্না আমার পিঠে ক'টা কিল বসিয়ে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, তুমি ত্রিনাথদার চেয়েও অসভ্য। চল একবার মায়ের কাছে, দেখবে কেমন বকুনিটা খাওয়াই।

পান্নার কথায় আমি বিশেষ ভীত হলাম না। পান্না যে আমাকে ভালবাসে আর সে যে আমাকে কিছুতেই বকুনি খাওয়াতে পারে না, সে বিশ্বাস সে বয়সেই আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

এবার নৌকোটা কোথায় যেন ঢুকতে যাচ্ছে অথচ ঢুকতে পারছে না। ভারী দোলা লেগেছে নৌকোয়। কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ একটা শব্দ ভেসে আসছে, পান্না আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, ও কিসের শব্দ?

আমি ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে ত্রিনাথকে বললাম, কিসের শব্দ ত্রিনাথ?

কোথায় তখন ত্রিনাথ। আমরা যখন ছইয়ের ভেতরে গল্পে মত্ত তখন নৌকো ভিড়েছে আমাদের নাশি খালের মুখে। কিন্তু খর ভাঁটায় নাশি খাল থেকে তোড়ে জল গড়িয়ে আসছে নদীতে। নৌকো খালে ঢোকায় কার সাধ্যি।

আমাদের নৌকো যে চকের সীমানায় ঢুকেছে সে খবরটুকু দিয়ে নন্দ বলল, ত্রিনাথ দাদা তীরে নেমে নোঙর ফেলে দিয়েছে।

হেঁকে বললাম, ত্রিনাথ, পাঁকের ভেতর কি করছিস? উঠে আয়।

ও বলল, চুপচাপ বসে থাক্, কেন আমাকে ঘাঁটাচ্ছিস?

নৌকোটা স্রোতে দুলছে। আধঘন্টা চুপচাপ বসে থাকার পর মনে হলো ভাঁটাব টান কমেছে। এখন নদীর জল থমথমে। ধীরে ধীরে এবার সমুদ্র থেকে উঠে আসবে জোয়ার।

নড়ে উঠল আমাদের নৌকো। মনে হলো নৌকোটা চলেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করতে পারছি।

ত্রিনাথের গলা শোনা গেল, নন্দদা, আমি খালে ঢুকছি, তুমি লগি মেরে নৌকোর মুখ ঠিক রাখ।

নন্দ মাঝি যৌবনে নাকি খুব ডাকসাইটে চালক ছিল। বাহার গাঙে সে বহুবার তার নৌকো নিয়ে গেছে। কিন্তু কালধর্মে সে এখন বৃদ্ধ, তাই তার আগের দাপটের একটুও আর অবশিষ্ট নেই। তবু একটা জিনিস এখনও তার রয়েছে, সেটা হলো দীর্ঘদিনের নৌকো চালানোর অভিজ্ঞতা।

নন্দ অন্ধকারেই আন্দাজ করে লগি মেরে নৌকোর মুখটাকে খালের মুখোমুখি করে দিলে। আর তার পরেই একটা ঝাঁকানি খেয়ে নৌকোটা ঢুকে পড়ল খালে।

পান্না আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, ত্রিনাথদা কোথায়? তাকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না নৌকোয়?

কথাটা নন্দ মাঝির কানে গিয়েছিল। সে অমনি বলল, ত্রিনাথদাদাই তো গুণ টেনে নৌকো নিয়ে চলেছে গো। আমি রাতকানা, দুকূলে শুধু লগির ঠেলা দিয়ে যাচ্ছি।

রাত তখন অনেকখানি হয়ে গেছে, আমরা নৌকো করে ঘরে ফিরে এলাম।

পান্নার বাবা এসে বসেছিল আমাদের কাছারি ঘরের দাওয়ায়। মেয়ের জন্যে উদ্বেগে মুখখানা তার থমথম করছিল। হেরিকেনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সে মুখ। মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উদয় সিংকে সম্ভবত সাহস দিচ্ছিল।

আমি বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে এ দৃশ্য দেখে খিড়কির দিকে পা বাড়াতে যাব, এমন সময় বাবাকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পান্না, আমরা এসে গেছি বাপুজী।

বলতে বলতেই দু'হাত তুলে ছুটে গেল দাওয়ার দিকে। হাতের চুড়ি দেখিয়ে বলল, দেখ, বাবুদাদা কত চুড়ি কিনে দিয়েছে।

উদয় সিং মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, বেটী, এত দেরী করলি, বড় ভাবনা লাগিয়ে দিয়েছিলি।

এর পর মেয়েকে অন্দরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, মাঈজীকে সব খবর দিয়ে আয়।

পান্না ছুটল মায়ের কাছে। আমি আর ত্রিনাথ খিড়কীর পথ ধরলাম।

যেতে যেতে কানে এল, মা উদয় সিংকে শুনিয়ে বলছে, পান্না রাতে আমার এখানে খেয়ে যাবে। খাওয়া হয়ে গেলে আমি লোক দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব।

উদয় সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার কির্‌পা বহুরানী।

।।৫।।

সেদিন ছিল রোববার। আমি ম্যাটিনি শোতে একটা ইংরাজী বই দেখতে গিয়েছিলাম। একটি জিপসী মেয়ের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনী। খোলা আকাশের তলায় তাদের মুক্ত মন আর বন্ধনহীন সংসারেব একটা আশ্চর্য আকর্ষণীয় ছবি আঁকা হয়েছে। বইটি দেখতে দেখতে নিজেকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি ওদেরই সঙ্গী। ওদের সঙ্গেই আমি রোদ-জল-ঝড়, প্রকৃতির সবুজ গায়ে মেখে অনন্তকাল হেঁটে চলেছি। আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলাম। বইটি শেষ হলে হলের বাইরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। মহানগরীর আলোর সাজ, যানবাহনের নিত্যকার জট আমার মনকে পিষ্ট করতে লাগল। মনে হলো এইমাত্র আমি আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক পরিবেশে নির্বাসিত হয়েছি। সারাটা পথ ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলাম। শশিকলাকে বিকেলের কাজে আসতে বারণ করে দিয়েছিলাম।

আজ রাতে অরন্ধন। নিজের হাতে কষ্ট করে রান্নার প্রবৃত্তি ছিল না। পথ থেকে রুটি, ডিম সেদ্ধ আর কলা কিনে ঘরে ঢুকলাম।

দূর থেকে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি দেয়ালে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

কে? শশিকলা?

ঝুমুর বাজানো হাসি হেসে শাহ্‌রাজাদী বলল, মানুষ চেনা তোমার কর্ম নয় সাহেব।

দারুণ খুশি হয়ে উঠলাম। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, কখন এলে? আজ মনে মনে কিন্তু তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সত্যি বলছ মালেক?

তোমাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ?

মরে যাই। কি ভালই যে লাগছে তোমার কথাগুলো শুনে! রাস্তার একটা মেয়ের কথা ভাবছে ইমানদার এক আদমি।

দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকলাম। খাবারগুলো টিপয়ের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, ঘর বন্ধ দেখে যে চলে যাওনি, এতেই আমি খুশি। তোমার আরব্য রজনীর গল্প শুনিয়ে যাবার কথা ছিল না?

তাই তো এসেছি মালেক।

এবার টুক করে সুইচটা টিপে দিতে ঘর আলোয় ভরে গেল। ও কিন্তু ঘরের ভেতর এল না। আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি, শাহ্‌রাজাদী তেমনি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, বাইরে কেন, ভেতরে এস।

ও পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে মেঝের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল।

আমি একটা বেতের চেয়ার ভেতর থেকে নিয়ে এসে বললাম, রোজ রোজ তোমার ঐ মেঝেতে বসা চলবে না, আরাম করে বস এই চেয়ারটায়।

হায় মালেক, আরাম তো আমার মাটিতে। তোমার ঐ কুর্সিতে বসলেই দেহ জ্বলবে। দয়া করে মেঝেতে বসার অনুমতিটুকু দাও বাদশা।

বললাম, তোমাকে তো সুখী করার ক্ষমতা আমার নেই, তুমি নিজে যাতে সুখ পাও তাই কর।

দোপাট্টার কাপড় মাথায় তুলে দিয়ে রঙীন ঘাঘরাখানা নর্তকীর মত ছড়িয়ে একদিকে দুটো পা মুড়ে বসল শাহ্‌রাজাদী।

আজ চাঁদের ভরা যৌবন। শাহ্‌রাজাদী জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। আমিও মুখখানা কাত ক'রে দেখলাম চাঁদকে। সেই মুহূর্তে বাঁশি বাজিয়ে দূরের রহস্যময় নিসর্গের ভেতর দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল।

আলোটা নিভিয়ে দিলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে শাহ্‌রাজাদী?

হবে বৈকি মালেক। আমিও বুড়ি বনে যাইনি আর তুমিও বুড্ঢা বনে যাওনি।—কথা ক'টি উচ্চারণ করেই ও সর্বাঙ্গ নাচিয়ে হাসতে লাগল।

আমি ওকে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে আলোর সুইচটা অফ করে দিলাম।

কি আশ্চর্য! অদ্ভুত স্নিগ্ধ আর একটা আলো ওর গায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। বিদ্যুতের সামান্য বাতি এতক্ষণ যাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি, সে যেন প্রথম সুযোগে ঘরের ভেতর এসে পূর্ণ বিকশিত একটি নিশি-কুসুমকে আদরে সোহাগে ভরে দিল।

আমি এখন চাঁদের আলোয় শাহ্‌রাজাদীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার ওপর সোজাসুজি আলো এসে না পড়লেও ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়া চাঁদের আলোর প্রতিফলনে আমিও আর অদৃশ্য নই।

দু'টি মানুষই কেবল শুনতে পায় এমন গলায় বললাম, শাহ্‌রাজাদী, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, আজ শুধু তোমার মুখ থেকে গল্প শুনতে প্রাণ চাইছে। শেষবার যখন তোমার মুখ থেকে গল্প শুনেছিলাম তখনও আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহ্‌রাজাদী যেন আপন মনেই বলল, সেই শেষ গল্প শোনাবার পর কোথা

দিয়ে কেটে গেছে দশ-দশটা বছর। কত ঝড় বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে, তবু একেবারে ভেঙে পড়িনি। রোদে পুড়েছি, বারিষে ভিজেছি, তবু হারিয়ে ফেলিনি নিজেকে। শোনাবে মালেক, তোমার শাহ্‌রাজাদী আজ জরুর তোমাকে গল্প শোনাবে।

ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল শহরের উপান্তে আমার তৈরী করা বাড়িঘর। আমি চলে গেলাম অন্য এক জগতে।

সেদিনটা ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। চকে পুজোর আয়োজন করেছিল আমার মা। তখন মফঃস্বলের একটা কলেজে পড়ি। সেটা ছিল কলেজের শেষ বছর। পড়াশোনার চাপে বছর তিনেক দেশের বাড়িতে গেলেও চকে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মাসীর বাড়িতে থেকে পড়তাম, মা মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেত।

চকে সেই প্রথম পুজো। গজলক্ষ্মীর প্রতিমা তৈরী করান হয়েছে। লক্ষ্মীর দু'দিকে দু'টি হাতি শুঁড় উচিয়ে আছে। তাদের শুঁড়ে ধরা রয়েছে দু'টি পদ্ম। ঢাকঢোল পিটিয়ে আসর সরগরম। জেলে, বাগ্‌দী আর চাষী প্রজারা ভীড় করে পুজো দেখতে এসেছে। রাতে তাদের খাবার নিমন্ত্রণ। পুজো আর খাবার পাট চুকতে বেশ রাত হয়ে গেল।

ত্রিনাথ এক ফাঁকে আমাকে এসে বলল, যাবি এক জায়গায়?

কোথায় রে?

সে শুনে কাজ নেই, গেলেই দেখতে পাবি।

বললাম, মাকে বলে আসি।

ত্রিনাথ বলল, সে সব বলা-কওয়া হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে পান্নাও যাবে।

আমি পুজোর দিন দুপুরবেলা এসেছি। পান্নাকে এর ভেতর দেখিনি। হয়ত সে অন্দরমহলে ছিল। আমি রাতে লোক খাওয়ানোর ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

ত্রিনাথ পান্নার নাম করতে আমি বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তিন বছর আগে সেই রথের মেলা থেকে পান্নাকে পাশে নিয়ে ফেরার ছবিটা চোখের ওপর ফুটে উঠল।

ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করলেও মুখে বললাম, পান্না এখন তো বেশ বড় হয়ে গেছে, ওকে কি ওর বাবা এত রাতে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে?

সে ভাবনা ভাবতে হবে না। আজ রাতে ও মায়ের কাছে থাকবে বলে এসেছে। আমি খোদ মায়ের কাছ্ থেকেই মতটা নিয়েছি।

পান্না যেতে রাজী?

রাজী মানে! আমি মায়ের কাছে তোর আমার যাবার কথাটা তুলতেই ও একেবারে হাউমাউ করে উঠল। মা সঙ্গে সঙ্গে ওর যাবার মতটা দিয়ে দিলে। অবশ্য বেশী দূরে কোথাও না যাই সাবধান করে দিয়েছে।

তবু আমি ত্রিনাথের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বলে মায়ের অনুমতি নিয়ে নিলাম।

গড়খাই-এর ওপর তৈরী তালগাছের সাঁকো পেরিয়ে খালে এসে নৌকোয় উঠলাম। আমি আর পান্না ত্রিনাথের নির্দেশে সামনের গুলুই-এ বসলাম। ত্রিনাথ পেছনের গলুই-এ দাঁড়িয়ে লগি ঠেলে নৌকো চালাতে লাগল।

মাঝির কাজে ইতিমধ্যে আরও দক্ষ হয়ে উঠেছে ত্রিনাথ। পূর্ণিমার কোটালে ভরা জোয়ার। নৌকোর তলায় স্রোতের ছলছল গান।

টগর ফুলের মত সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত ছোঁয়া ধানের ক্ষেতে। আকাশের গাঢ় নীল রঙটা যেন স্পষ্ট চেনা যায়। ঝকঝক করছে চাঁদ।

আমি চারদিকের সমারোহ দেখছিলাম। হঠাৎ পাশে বসে থাকা পান্নার দিকে তাকালাম। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে।

এতক্ষণ একটিও কথা হয়নি পান্নার সঙ্গে। দু'জনের কেউই সংকোচ কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পারিনি।

পান্নাকে ভাল করে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এত পরিণত হয়ে উঠেছে পান্না! পঞ্চদশী মেয়েটি নিজেকে যেন আর গোপন করে রাখতে পারছে না। লাল ঘাগরা, লাল চোলি আর হলুদ রঙের ওড়নায় ওকে বেহেস্তের হুরী বলে মনে হতে লাগল। ওর মুখের একটি পাশ চাঁদের আলো মেখে ভারী সুন্দর লাবণ্য ছড়াচ্ছিল।

আমিই প্রথম কথা বললাম, তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি পান্না।

ও থুতনিটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে রেখেই বলল, এখন চিনতে পেরেছ তো?

সেই কৌতুকী কথার ভঙ্গী।

বললাম, না চিনে কি উপায় আছে, তুমিই চিনিয়ে ছাড়বে।

ও এবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে মুখ ঘোরাল।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ঠোঁটে টেপা হাসি আর বাঁ চোখ ছোট করে দিল্ ছুঁয়ে যাওয়া চাউনি।

মুখটা আবার ও স্বস্থানে ফিরিয়ে নিল। কোন কথা না বলেও পান্না অনেক কথাই বলল।

ত্রিনাথ খালের পাড়ে লগির একটা খোঁচা লাগিয়ে নৌকোটাকে সিধে করে দিয়ে বলল, এমন একটা জায়গায় আজ তোদের নিয়ে যাব, যেখানে যাবার কথা কোনদিন কল্পনাও করিসনি।

পান্না সোজা হয়ে বসে হৈ-হৈ করে উঠল, সত্যি ত্রিনাথদা, তোমার মত মানুষ আমি আর দু'টি দেখিনি।

পান্নার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, আমি মানুষটা বোধহয় খুব সুবিধের নয়?

নয়ই তো।

পান্নার গালার আওয়াজ বোধহয় একটুখানি জোর হয়ে গিয়েছিল। ত্রিনাথ বলল, কি নয় রে?

পান্না অমনি কথা ঘুরিয়ে বলল, কেউ নয়, কেউ নয়, তোমার মতটি কেউ নয়।

ত্রিনাথ খুব কাজের কিন্তু বুদ্ধিটা একটু মোটা। সে পান্নার কথা বিশ্বাস করে নিয়ে খুশিই হলো।

আবার চুপি চুপি বললাম, খুব কথা ঘোরাতে পার দেখছি।

ও তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বলল, ত্রিনাথদা তোমার মত নয়, ও অল্পেতেই খুশি হয়।

আমি বুঝি খুব বেশি চাই?

চাওই তো।

আমার সবে বিশ বছরের যৌবনে যেন পূর্ণিমার জোয়ার জেগে উঠল, বললাম, তিন বছর তোমার সঙ্গে দেখা নেই, কিছু চেয়েছি কি?

ও আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, এতদিন কোথায় ছিলে?

পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলাম।

এলে কেন?

সোজাসুজি বললাম, তোমাকে দেখতে।

আহা, মরে যাই!

কেন, মিথ্যে বলেছি নাকি?

মিথ্যে বলবে কেন, তুমি যে যুধিষ্ঠির।

ত্রিনাথ চেঁচিয়ে উঠল, সামলে বস।

নৌকোটা খাল থেকে বেরিয়ে সাঁ করে ঘুরে গেল নদীর ডান দিকে। ত্রিনাথ একাই দাঁড় টানতে লাগল দেখে আমি বললাম, তুই বরং হাল ধরে থাক, আমি দাঁড় টানছি।

শহুরে বাবু, চুপচাপ দয়া করে একটু বসে থাক। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

এবার ত্রিনাথ হাল ধরল। স্রোতের টানে ভেসে চলল নৌকো।

আমি আর পান্না নীচু গলায় কথা বলে চলেছি। অজস্র অর্থহীন টুকরো কথার জাল বুনতে বুনতে তারই ভেতর জড়িয়ে পড়ছি আমরা। চাঁদ, চরাচর, ত্রিনাথ, সব কিছু আমাদের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে।

সময়ের হিসেব ছিল না, তাই কতক্ষণ কত পথ উজানে এসেছি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ত্রিনাথের গলার শব্দে ধ্যান ভাঙল, কি রে ভাল লাগছে জায়গাটা?

চেয়ে দেখি বুকের মাঝে একটা চর জাগিয়ে নদী দু'দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে।

আমি নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বললাম, অসাধারণ! কি অদ্ভুত জায়গাটা আবিষ্কার করেছিস তুই!

চরের ধারে নৌকোটা ঠেকিয়ে ও বলল, নেমে পড়, আমি প্রায়ই এখানে আসি, তোরা বরং ঘুরে ফিরে দেখ।

পান্না বলল, ত্রিনাথদা, ভাল হবে না বলছি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে।

ত্রিনাথ নিজস্ব ভঙ্গীতেই বলল, আসতেই হবে? কেন আসতে হবে? বেশ, তোদের সঙ্গে আসতে পারি কিন্তু কথা দিতে হবে।

পান্না বলল, কি কথা বল?

মায়ের কাছ থেকে যে গল্প শিখেছিস তা আজ আমাদের শোনোতে হবে। আজ রাতে তুই হবি গল্পের শাহরাজাদী।

বললাম, শাহরাজাদী কে রে?

ত্রিনাথ বলল, উজীরের মেয়ে, যে বাদশা শাহরিয়ারকে গল্প শুনিয়েছিল।

চমৎকার আইডিয়া তোর। আমরা এই দারুণ চাঁদনী রাতে পান্নার মুখে গল্প শুনব।

ত্রিনাথ ধমক দিল, কি রে পান্না, চুপ করে রইলি কেন?

পান্না বলল, গল্প আমি শোনাব, কিন্তু গল্প শুনে ভাল লাগলে তোমরা আমাকে কি দেবে বল?

ত্রিনাথ বলল, খুব ব্যবসা বুঝেছিস তো। আচ্ছা, মালিক তোর সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে খুশি করতে পারলে যা চাইবি, পাবি।

আমার অনুমতি নেবার দরকারও মনে করল না ত্রিনাথ। আমার দানের অসীম ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে বসল।

আমরা প্রথমে সারা চর ঘুরে বেড়ালাম। পলি পড়েছে। বালি আর মাটিতে মিশে বেশ শক্ত একটা আস্তরণ তৈরী হয়েছে। হাঁটলে পায়ে কাদা লাগে না। কিন্তু সবচেয়ে আমাদের যা মুগ্ধ করল তা অসংখ্য আন্দোলিত কাশের চামর। ঐ কাশবনের মাঝে শাখাবাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোর অশথ গাছ। তার তলায় একটি মাটির ঢিবি। জায়গাটা আমাদের দারুণ ভাল লেগে গেল।

ত্রিনাথ বলল, এইখানে বসা যাক। আমরা ত্রিনাথের কথামত ঐ ঢিবিটার ওপর জুৎ করে বসলাম। পান্না তার ঘাঘরা সেই শুকনো মসৃণ পলিমাটির ওপর ছড়িয়ে দুটো হাঁটু জোড়া লাগিয়ে বসল। ত্রিনাথ অশথ গাছটার একটা ডালে তার বসার আসন বানিয়ে নিল।

অদূরে নদীর জলে জ্যোৎস্নার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে। চরের মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলের সঞ্চয়। ধবধবে চাঁদের আলোয় জলচর দু'একটা পাখি মাছের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশের এক কোণে টুকুরো দুটো মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে যেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগ করছে। এক একবার হাওয়া বয়ে এলেই পরস্পরের গায়ে খুশিতে লুটিয়ে পড়ছে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ।

কোজাগরীর রাতে রহস্যময় নির্জন পরিবেশে আমরা তিনজন বসে আছি। ত্রিনাথ বলল, পান্না, শুরু কর তোর গল্প।

পান্না আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আজ রাতে তুমি আমাদের বাদশা। তোমার দিকে চেয়েই আমি গল্প শুরু করব।

বেশ, তাই হবে—বলেই আমি নড়েচড়ে বসলাম।

পান্না মুসলিম প্রথায় তসলিম করে তার সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বাঁ চোখ ছোট করে মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, তোমাদের গুণের কথা দিয়ে শুরু হোক্ বাদশা।

সে অনেক অনেক কাল আগের কথা, ইরাণে এক বাদশা ছিলেন, যাঁর নাম ছিল শাহরিয়ার।

বাদশা একদিন হঠাৎ ক্ষেপে ওঠেন তাঁর বেগমের ওপর।

প্রশ্ন করলাম, বাদশা হঠাৎ ক্ষেপল কেন?

বেগম খুব একটা দোষের কাজ করেছিল।

কি এমন দোষের কাজ?

পান্না বলল, জানি না যাও। এমন কথার পিঠে কথা চড়ালে গল্প বলতে পারব না।

বললাম, আর একটিও কথা বলব না, তুমি তোমার গল্প বলে যাও পান্না।

পান্না আবার শুরু করল, বাদশার রাগ এমন চড়ে গেল যে তিনি জল্লাদকে আদেশ করলেন তাঁর বেগমের গর্দান নিতে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর প্রধান উজীরকে ডেকে বললেন, প্রতিদিন তুমি একটি কুমারী মেয়েকে নিয়ে আসবে আমার প্রাসাদে। আমি তাকে মহা আড়ম্বরে সাদি করব। একটি রাত সে পাবে বেগমের মর্যাদা। পরের দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে দেওয়া হবে জল্লাদের হাতে।

বাদশা শাহরিয়ার-এর এ আদেশ প্রতিদিন পালিত হতে লাগল। রোজ কান্নার রব ওঠে যে কোন একটি বাড়ি থেকে। বাদশার প্রাসাদে ধরে নিরে আসা হয় ফুলের মত সুন্দর আর কোমল একটি মেয়েকে। সাদি হয় তার বাদশার সঙ্গে। একটি রাত মাত্র সে ভোগ করে বেগমের সম্মান। তারপর ভোর হলেই জল্লাদের অস্ত্রের মুখে দিতে হয় তাকে গর্দান।

এমনি করে বাদশার কোপে প্রায় উজাড় হেয় গেল সারা দেশের কুমারী মেয়ের দল। বৃদ্ধ উজীর ভাবনায় পড়ে গেলেন। এখন কুমারী মেয়ে পাওয়াই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা।

একদিন উজীর গালে হাত দিয়ে ভাবছেন, এমন সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল তাঁর মেয়ে শাহরাজাদী। বসরোর গোলাপের মত অপরূপ সৌন্দর্য তার।

গাছের ওপর থেকে ত্রিনাথ বলল, ঠিক আমাদের পান্নার মত।

পান্না অমনি কান্নাভাঙা গলায় ত্রিনাথের দিকে হাত উঁচিয়ে বলল, তুমি আস্ত একটি হনুমান।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, হচ্ছে কি ত্রিনাথ, গল্পটা সবে জমে উঠছে আর তুই বাগড়া দিচ্ছিস।

ত্রিনাথ বলল, সত্যি, আমার ঘাট হয়ে গেছে। খোঁড়াকে খোঁড় বলতে নেই, ভালকে ভাল বলতে নেই।

আমি পান্নাকে বললাম, শুরু কর তোমার গল্প।

পান্না শাহরাজাদীর সূত্র ধরে আবার শুরু করল।

মেয়ে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, আব্বাজান, একা বসে বসে কি এত ভাবছ বলত?

উজীর বললেন, বাদশার খেয়াল মেটাতে গিয়ে দেশে যে আর কুমারী মেয়ে রইল না রে বেটী। আজ রাতে কোথা থেকে যে একটি মেয়ে যোগাড় করি তাই ভাবছি।

কেন আব্বা, আমি কি কুমারী নই? আমার কি সাদির সময় হয়নি?

চমকে উঠে উজীর বললেন, পাগলের মত কি বলছিস তুই বেটী! বাপ হয়ে সব জেনেশুনে তোকে পাঠাব জল্লাদের কাছে!

শাহরাজাদী অমনি বলল, যে মেয়েদের তুমি এতকাল বাদশার হাতে তুলে দিয়েছ তাদেরও বাবা-মা ছিল। তারাও তাদের মেয়ের জন্যে কেঁদে-কেটে বুক ফাটিয়েছে। শোন আব্বা, আজ আমি বাদশার মহলে যাব বলে আগে থেকেই ঠিক করে ফেলেছি। একটা ফন্দী এঁটেছি মাথায়, যদি ফন্দীটা ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কেবল আমি নয়, সারা দেশের কুমারী মেয়েরা রক্ষা পেয়ে যাবে।

কি আর করেন উজীর, শাহরাজাদী মেয়েটি তাঁর বড় জেদী, তাকে বাধা দিয়ে কোন ফল হবে না।

যাবার সময় হয়ে এলে শাহরাজাদীকে সাজাতে বসল ছোট বোন দুনিয়াজাদী। তার চোখ দিয়ে আঁসু ঝরছিল।

শাহরাজাদী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বাদশার সঙ্গে সাদি হয়ে যাবার পর আমি জন্মের মত তোকে একবার চোখের দেখা দেখব বলে ডেকে পাঠাব। তুই বাদশার মহলে গিয়ে আমার কাছ থেকে একটা গল্প শুনতে চাইবি।

বোনকে এই কথা বলে শাহরাজাদী তার আব্বাজানের সঙ্গে বাদশা মহলে গিয়ে হাজির হলো।

বাদশা চোখের সামনে বেহেস্তের হুরীর মত অপরূপা সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুরমা-টানা চোখের আশ্চর্য চাহনি বাদশাকে জাদু করে ফেলল।

বাদশা মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলেন। উজীর বললেন, মালেক, এটি আমারই মেয়ে।

বাদশা চমকে উঠে বললেন, এ কি করেছ তুমি উজীর! সব জেনেশুনে নিজের মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিলে!

উজীর হাতজোড় করে বললেন, ও নিজের ইচ্ছায় এসেছে মালেক।

বাদশা দেখলেন, মেয়েটি কেবল সুন্দরী নয়, দুঃসাহসীও। তিনি মনে মনে ভারী খুশি হলেন।

যথানিয়মে বাদশাহী জাঁকজমকের সঙ্গে শাহরাজাদীর সাদি হয়ে গেল। বাদশা নতুন বেগমকে অনেক পেয়ার করলেন।

এক সময় শাহরাজাদী বাদশাকে বলল, জাঁহাপনা বাড়িতে আমার একটি ছোট বোন আছে। শেষ রাতের মত তাকে একটুখানি কাছে পেতে চাই।

বাদশা অমনি লোক পাঠিয়ে দুনিয়াজাদীকে ডেকে আনলেন। দু'বোনে কতক্ষণ বসে রইল দুজনকে জড়িয়ে ধরে।

এক সময় দুনিয়াজাদী কান্নাভেজা গলায় বলল, দিদি, কত গল্প শুনেছি তোর মুখে, জন্মের শোধ আজ আমাকে একটা গল্প শুনিয়ে যা।

শাহরাজাদী অমনি বলে উঠল, বোন—আমি বাদশার অধীন। তিনি অনুমতি করলে তবেই আমি শোনাতে পারি।

বাদশা আগ্রহভরে বললেন, তুমি বুঝি গল্প বলতে পার? তা বেশ বোনকে শোনাও তোমার গল্প, আমিও একটু শুনি।

খোদাকে মনে মনে স্মরণ করে শাহরাজাদী শুরু করল তার গল্প। সে রাতে পান্নাও শুরু করল তার শেখা আরব্য রজনীর দীর্ঘ একটি কাহিনী। জোবেদা আর আমিনা দু'টি বোনের আশ্চর্য ভাগ্য বিপর্যয়ের গল্প। শেষে কেমন করে তাদের ভাঙা ভাগ্য আবার জোড়া লাগল তার কিছুটা ফিরিস্তি দিয়েই কাহিনীতে ছেদ ফেলে দিলে সে।

তখন আমার পুরো গল্পটার পরিণতি জানার আগ্রহ বেড়ে গেছে। বললাম, থামলে কেন, বলে যাও। সত্যি অবাক হয়ে শোনার মত কাহিনী।

পান্না পুব আকাশের দিকে তার লাল চুড়িপরা হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মালেক, চেয়ে দেখ আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে, এখন ত্রিনাথদার নৌকোয় চেপে ঘরে ফিরতে হবে।

মনের মধ্যে দারুণ অতৃপ্তি নিয়ে সেদিন নৌকোতে উঠেছিলাম।

নৌকো ভাঁটার টানে তর্‌তর্ করে এগিয়ে চলেছে। হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে বসে আছে পান্না। বড় রহস্যময়ী মনে হচ্ছে তাকে।

বললাম, গল্প কিন্তু তোমার শেষ হলো না।

পান্না বলল, শাহরাজাদীর গল্প একরাতে শেষ হয়নি। বাদশাকে রাতের পর রাত তার গল্প শুনতে হয়েছে। গল্পের জের রেখেছিল শাহরাজাদী, তাই বাদশার আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল।

শাহরাজাদী তাহলে অমনি করে গল্প বলতে বলতে জহ্লাদের খাঁড়াকে ঠেকিয়ে রেখেছিল বল!

পান্না বলল, শুধু ঠেকিয়ে রাখেনি, নিজে বাঁচার মত বেঁচেছিল বাদশার পেয়ারের বেগম হয়ে আর বাঁচিয়েছিল সারা দেশের কুমারী মেয়েদের।

বললাম, তুমি যে এত সুন্দর গল্প বলতে শিখেছ তা কিন্তু আমার জানা ছিল না। সত্যি পুরস্কার পাবার মতই গল্প বলেছ তুমি।

পান্না তার হাঁটুর ওপর প্রসারিত হাতখানা গুটিয়ে নিয়ে অস্ফুটে বলল, আমি আমার পুরস্কার পেয়ে গেছি মালেক।

ভোরের একঝাঁক পাখি অদূর সমুদ্রের দিকে কলরব করতে করতে উড়ে গেল। আমি শাহ্‌রাজাদীর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে বসে রইলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না, সেদিন ওর হাত কাঁপছিল, না আমার। না দুজনেই মনে মনে প্রথম ভালবাসার রোমাঞ্চে কেঁপে উঠেছিলাম।

পরের দিনই আমাকে কলেজের আসন্ন পরীক্ষার জন্যে চক থেকে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সারা পথ পান্না আমার সঙ্গী ছিল। ক'দিন তাকে নিয়েই মনে মনে আমার কল্পনার বাদশাহী মহল রচনা করেছিলাম।

ছ'মাস চকে যাওয়া হয়নি। বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুবার পর চকে গেলাম। না গেলেই বুঝি ভাল ছিল। ত্রিনাথ আমাকে নিভৃতে বলল, আর ক'টা দিন আগে আসতে পারলি না? দেখা হয়ে যেত মেয়েটার সঙ্গে।

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, কার কথা বলছিস, শাহ্‌রাজাদী?

হ্যাঁ। তোর শাহ্‌রাজাদী। যাবার সময় গড়খাই-এর পাড়ে চোখের জল ঝরিয়ে আমার দুটো হাতে ধরে বলল, বাদশাকে বলো তার গল্পটা শেষ হয়নি। আমিনার কি হলো তা বাদশা জেনে যেতে পারেনি। বেঁচে থাকলে আমি বাদশাকে গল্পের শেষটা শুনিয়ে যাব।

বিভ্রান্ত হয়ে বললাম, সে কোথায়?

ত্রিনাথ সংক্ষেপে যা বলল তা হলো, মাসখানেক আগে বৃদ্ধ উদয় সিং অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেশে চিঠি পাঠাতে তার দাদা চলে আসে। টাউন থেকে বাগানের মালিক কিরণ সিং ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওষুধ খাওয়াই সার হলো। উদয় সিং মারা গেল।

ভাই-এর কাজকর্ম চুকিয়ে পান্নাকে সঙ্গে নিয়ে দিন-তিনেক আগে তার জ্যেঠা দেশে চলে গেছে।

যেতে চায়নি পান্না। মায়ের কাছে কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু মা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে তার জ্যেঠার সঙ্গে পাঠিয়েছে।

সেই মুহূর্তে বিশ বছরের একটি যুবকের মন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

বেশ কয়েক বছর পরে আমার মনের ওপর শাহ্‌রাজাদীর স্মৃতিটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। আমি কাজের চাকায় ঘুরে চলেছিলাম। কিন্তু আমার মধ্যে একটা নিস্পৃহ উদাসী মন জেগে উঠছিল। সেটা বেশ বোঝা যেত আত্মীয়েরা যখন আমাকে বিয়ে করে ঘোরতর সংসারী হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত আর আমি সমানে অস্বীকার করে যেতাম। জানি না, আমার অবচেতন মনে সেই পঞ্চদশী শাহ্‌রাজাদীর স্মৃতি আমাকে সংসারে বিবাগী করে তুলেছিল কিনা।

সারাদিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরে এসেছি ক্লান্ত হয়ে। বসে আছি পুবের জানালাটি খুলে। একটি ঝিলের পরে দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বাড়ী উঠেছে। শুনেছি, মাঠের প্রায় সব জমিই একটা কোম্পানী প্লট করে বিক্রি করছে। দু'চারখানা লরি দেখলাম কাজের শেষে ফিরে যাচ্ছে তাদের ডেরায়। এখন ঘন ঘন বাঁশি বাজিয়ে অফিস আর কাজ-ফেরতা লোকদের বয়ে নিয়ে চলেছে ট্রেন।

সবাই শ্রান্ত। দিনের শেষে তারা একটু বিশ্রাম চায়। নিজের নিভৃত একটু আশ্রয়, কারু মায়াময় হাতের সেবা। ভালবাসার একটু ছোঁয়া।

আজ হঠাৎ ভালবাসার কথা আমার মনে এল কেন? আমি তো নিঃসঙ্গ পথিক। নিজের শ্রান্তি দূর নিজেই করে চলেছি এতদিন। একটা অভ্যস্ত চক্রে মধ্য-যৌবনের দিনগুলো আবর্তিত হয়ে চলেছে। কাউকে কেন যে এতদিন গ্রহণ করিনি জীবনে তা আমি নিজেই জানি না।

ভাবনার জগতে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে অন্ধকার নেমেছে তা আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ টুক করে কে সুইচটা টিপল আর সারা ঘর ভরে গেল আলোয়। ফিরে দেখি, শাহ্‌রাজাদী আমার দিকে চেয়ে ঐ জ্বলে-ওঠা আলোর মত হাসছে।

কখন এলে?

ও বলল, বলে কি হবে। আলো যদি না জ্বলত জগত সংসার ভুলে তুমি এমনিই বসে রইতে বাদশা। চোর এসে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেলেও জানতে পারতে না।

নিজের অন্যমনস্কতায় লজ্জিত হলাম। আজকাল কেন যে সব কাজে বেহুঁস হয়ে পড়েছি তা বুঝতেই পারি না।

বললাম, যে আমার সর্বস্ব তুলে নিয়ে যাবে না, কেবল সে-ই নিঃশব্দে ঢুকবে আমার ঘরে।

এই বাঁদির ওপর এখনও তোমার এত ভরসা মালেক।

তুমি কোনদিনই দরিদ্র ছিলে না শাহরাজাদী, আজও নয়।

ও অন্য কথার অবতারণা করল, আজ তোমার কাজের মেয়েটি কই আসেনি তো? ছুটি নিয়েছে নাকি?

বললাম, সে তার মর্জি মত আসে। তোমার আসার আগে বরং ও নিয়ম মত আসা-যাওয়া করত।

শাহরাজাদী বলল, না না, সে হয় না। আমার জন্য কাজে ও ঢিলে দেবে সে আমি বরদাস্ত করতে পারব না। তার চেয়ে আমিই না-হয় আর আসব না মালেকের বাড়ী।

বললাম, তাহলে তোমার বাদশার দুর্ভাগ্যের আর শেষ থাকবে না। কাজের লোক আর শাহরাজাদীকে হারিয়ে বাদশা গোলাম বনে যাবে।

ও বাতাসে ঢেউ তুলে হাসল। পরক্ষণেই বলল, বুঝেছি, ফিরে এসে মুখে কিছু তোলা হয়নি।, একটু বস, আমি তোমার খাবার আনছি। ততক্ষণে হাত মুখটা ভাল করে ধুয়ে মুছে নাও।

ও রান্না ঘরে গেল। আমি কাপ প্লেটের টুংটাং শব্দ শুনতে পেলাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বসতে না বসতেই চা আর সিঙাড়া এসে গেল। বললাম, কোথায় পেলে সিঙাড়া?

ও বলল, একদিন মোড়ের দোকানের সিঙাড়ার তারিফ করেছিলে না? তাই আসার সময় ওখান থেকে নিয়ে এলাম। জানি না, বাদশার রুচি ঘন ঘন পাল্টায় কিনা।

কথাটা বলেই ও হাসল ঠোঁট টিপে।

বললাম, সিঙাড়া আমি ভালবাসি, আর খেলে ঐ দোকানটা থেকেই আনিয়ে খাই। কিন্তু আমার জন্যে তো আনলে, তোমার কই?

আছে, আছে মালেক, তুমি খাও তো।

বললাম, তুমি নিজের জন্যে কি রেখেছ না রেখেছ জানিনা, তবে এখন আমার তিনখানা সিঙাড়ার দেড়খানা তোমার আর বাকীটা আমার।

ও কিছুতেই নেবে না, আমিও খাব না। শেষে ও বলল, তুমি খাও মালেক, খাবার শেষে এককণা প্রসাদ রেখ আমার জন্য।

আমি খাচ্ছি আর ও দেখছে। পরম পরিতৃপ্তির একটা ভাব খেলা করছে ওর মুখে। স্বামী অথবা সন্তানকে খাওয়াবার সময় নারীর মুখে যে ভাবটি ফুটে ওঠে ঠিক তেমনি।

ওর অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও একটা সিঙাড়া প্লেটে রেখে দিলাম। ও বলল, তোমার খাওয়া দেখতে দেখতে আমার অনেক খাওয়া হয়ে গেছে মালেক।

ও প্লেট নিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বসল আমার পাশে।

খাওনি।

খেয়েছি বইকি। প্রসাদ কি ফেলে দেবার?

বললাম, রথের মেলায় ছেলেবেলা সেই খাজা কাঠাল ছাড়িয়ে খাবার কথা ভুলতে পারি না। সেদিন কিন্তু তুমি আমার সামনে বসে খেয়েছিলে।

ও বলল, তখন ছোট ছিলাম, অতশত বুঝতাম না। মরদের সামনে জেনানার অমন করে খেতে নেই।

বললাম খেলেই হলো।

ও মাথা নেড়ে বলল, না না, জেনানাদের এমন কাজ ভারী সরমের বাত।

কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে ও বলল, মালেক, আমার হাতে যদি খানা খেতে তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে রাতের জন্য খানকতক রুটি পাকিয়ে রেখে যাই। তোমার রসুইএর মেমসাব আজ আসবে না বলে মনে হয়।

বললাম, তুমি যদি খানা পাকিয়ে দাও তাহলে আমার তৃপ্তির শেষ থাকবে না শাহরাজাদী। তবে রাতের খাবারটা আমার সঙ্গে তোমাকেও খেতে হবে।

আরে রামো।

আমি কিন্তু খাবার সময় ওর কথা শুনলাম না। ওকে পাশে বসিয়ে দুজনে গল্প করতে করতে খেতে লাগলাম।

তাজ্জব এক গল্প শুরু করেছিল শাহরাজাদী। বসোরার হাসানের কাহিনী। হঠাৎ গল্পে ছেদ ফেলে দিয়ে বলল, বাদশার আজ গল্প শোনার মেজাজ নেই মনে হচ্ছে।

নিজেকে গোপন না করেই বললাম, আমি গল্প শুনেছিলাম, আর গল্পটা বলেছিল আমার শাহরাজাদী। তবে সেটা বসোরার হাসানের কাহিনী নয়, তিন কালন্দর, জোবেদা আর আমিনার কাহিনী।

বুঝেছি মালেক, তুমি দশটা বছর আগের একটা রাতে ফিরে গেছ।

ঠিক তাই, শাহারাজাদী।

সেদিন গল্পটা শেষ হয়নি, তাই না?

হ্যাঁ, আমিনার জন্যে বুকের মধ্যে একটা দুঃখ রয়েছে।

তবে শোন, খালিফা হারুণ-অল-রসিদ আমিনার মুখে তার কাহিনী শোনার পর যখন জানতে পারলেন যে তাঁর নিজের বেটাই আমিনার ওপর অন্যায় করে তাকে আঘাত করেছে তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাজি, সাক্ষী ডাকিয়ে আমিনার সঙ্গে শাহজাদার সাদি দিয়ে দিলেন।

বললাম, তোমার মুখে গল্পের পরিণতিটা জানতে পেরে মনে বেশ একটা শান্তি পাওয়া গেল শাহরাজাদী।

শাহরাজাদী হেসে বললে, জীবনটা কি একটানা দুঃখের বাদশা? দুনিয়ায় শুধু মরুভূমি থাকবে, নদী থাকবে না?

বললাম, দুটোই সত্যি শাহরাজাদী।

ও বলল, বাদশা, তোমার শাহরাজাদী জীবনে তো কম দুঃখ পায়নি। কিন্তু সেই দুঃখের আঘাতে যদি সে ভেঙে পড়ত তাহলে আজকে এখানে বসে যে শান্তি পাচ্ছে তা আর পাওয়া হতো না।

হঠাৎ কি মনে এল জানি না, বলে বসলাম, শাহরাজাদী, আজ আর তোমার আস্তানায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই, পূর্ণিমার রাতটা এস গল্প করেই কাটিয়ে দিই।

সাহস তো তোমার কম নয় বাদশা! আমি না হয় রাস্তার মেয়ে, কেউ কোন টিটকিরি দিলে গায়ে লাগবে না, কিন্তু তুমি তো ইমানদার আদমি, পাড়া-প্রতিবেশী কিছু বললে তোমার মান হানি হবে না?

হেসে বললাম, বাদশা কখনও মানহানির ভয় করে না।

বেশ, বল কি গল্প শুনবে? রাজপুত-কাহিনীর শিলাদিত্য, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনীদের কথা, না আরব্য রজনীর দশ উজীর আর আজাদ বখতের কাহিনী।

বললাম, ওসব কোন গল্পই আজ শুনতে মন চাইছে না, শুধু তোমার গল্প শুনব শাহরাজাদী।

আমার গল্প!

হ্যাঁ, একটি মেয়ের গল্প। সেই যে পনের বছরের মেয়েটি হারিয়ে গেল চকের নির্জন জগৎ থেকে, তারপর দশটি বছর স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ উঠে এল কূলে।

তার কথা আর কি শুনবে মালেক, সে মেয়েটা তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।

সে মরেনি, শাহরাজাদী, অন্তত একজনের মনের ভেতর সে চিরদিনই বেঁচে থাকবে।

শাহরাজাদী গালে হাত ঠেকিয়ে অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, সত্যি মালেক! এখনও তুমি সেই মেয়েটাকে মনে রেখেছ!

আমি শুনতে চাই শুধু সেই মেয়েটির কাহিনী।

শাহরাজাদী হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল কতক্ষণ। এক সময় হাঁটু ভেঙে সিধে হয়ে বসে বলল, সেই মেয়েটির গল্প শুনতে হলে আর একটি মেয়েও এসে পড়বে। আচ্ছা শুনতে যখন চাইছ তখন শোন।

জ্যেঠার সঙ্গে চক থেকে চলে আসার দিন মাকে জড়িয়ে ধরে বড় কেঁদেছি।

তুমি আর একজনের হাত ধরেও কেঁদেছিলে শাহরাজাদী।

ত্রিনাথদার কাছ থেকে তাও তোমার জানা হয়ে গেছে!

ত্রিনাথই তো চক থেকে তোমার চলে যাওয়ার সাক্ষী ছিল।

শাহরাজাদী বলতে লাগল, জন্ম আমার বাংলা মুলুকে। মিশেছি বাঙালীদের সঙ্গে কিন্তু ভাগ্যের ফেরে যে আত্মীয়দের কোনদিন চোখে দেখিনি, তাদের মাঝে গিয়েই পড়তে হলো।

তোমার জ্যেঠার বাড়িতে গিয়েই তো উঠলে?

হ্যাঁ মালেক। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এক পাল ছেলেমেয়ে নাতি-নাত্‌নী নিয়ে জ্যেঠা সংসার সাজিয়ে বসে আছে। জ্যেঠার সব ক'টি মেয়েরই সাদি হয়ে গেছে। দু'টি মেয়ে শুনলাম বয়সে আমার মায়ের চেয়ে বড়।

জ্যেঠা তাহলে তোমার বেশ সম্পন্ন লোক বল?

না বাদশা, গিয়ে দেখলাম, অবস্থা তার আদৌ ভাল নয়। দু'এক বিঘে ক্ষেতিতে ফসল ফলে। তিন ছেলে অন্যের জমিতে কাজকাম করে। অনেকগুলো নাতি নাত্‌নী আর পুষ্যি নিয়ে মস্তবড় সংসার।

তুমি গিয়ে আবার তাদের সংখ্যা বাড়ালে!

সে অনেক কথা বাদশা। সংক্ষেপে বলি, আমি যাওয়াতে ওরা দু'দিক থেকে বেঁচে গেল।

কি রকম?

প্রথম প্রথম জ্যেঠা আর জ্যেঠিমা আমাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। গায়ে আঁচটি লাগতে দিত না। আমি ভাবলাম, সদ্য বাবাকে হারিয়েছি, তাই ওরা আমাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চাইছে।

পরে আমাকে দিয়ে জ্যেঠা কয়েকটা কগজে সই করিয়ে নেয়। তার কিছুদিন পরের থেকেই দেখলাম, আমার আর তেমন খাতির নেই। প্রথমে জ্যেঠিমা সংসারের কাজে হাত লাগাতে ডাকল। তারপর একদিন অত বড় সংসারের রান্নাবান্নার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিলে।

বললাম, তোমার বাবার নামে কোন জমিজায়গা কি ওখানে ছিল?

মাঝে মাঝে চক থেকে শহরে গিয়ে বাবা দেশে টাকা পাঠাত বলে শুনেছি।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই ওই টাকার দু'এক বিঘে জমি কেনা হয়েছে। আর ওই জমির স্বত্ব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার জন্যেই সই নেওয়া হয়েছিল।

তোমার অনুমানই ঠিক। আমার বন্ধু রতনবাঈও তাই বলেছিল।

রতনবাঈ কে?

জমিনদার অমর সিংজীর মেয়ে। তার কথাই তোমাকে বলব বলে বলছিলাম। ঐ রতনই ছিল সেই দুঃখের দিনগুলোতেও আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

কি করে পরিচয় হলো তার সঙ্গে?

আমার জ্যেঠার ছেলেরা অমর সিংজীর জমিতে কাজ করত। আমি ওদের জন্য ক্ষেতিতে খাবার নিয়ে যেতাম। একদিন কাজ হচ্ছিল জমিনদারের কোঠির সামনে। দাদাদের খাবার দিয়ে ফিরছি, এমন সময় আমারই বয়সী একটি মেয়ে দোতলার জানালা খুলে আমাকে ডাকল।

অমর সিংজীর কোঠি থেকে ডাকছে, তাই আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণের ভেতরেই একটি কাজের মেয়ে এসে আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

অমর সিংজীর একটি মাত্র মেয়ে এই রতনবাঈ। ভারী ভাল স্বভাবের মেয়েটি। আমাকে নিজের পাশে বসিয়ে বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে ভাই। রোজ দেখি তুমি আমার কোঠির সামনের পথ ধরে চলে যাও। তোমার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে হলো, তাই ডাকলাম।

আমি ওর কথা শুনে খুশি হয়ে হাসলাম। ও অমনি আমার হাতটা নিজের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, তোমার হাসির দাম লাখ টাকা।

আমি আবার একমুখ হেসে হাত পাতলাম। ও খুশি হয়ে আমার হাতখানা দোলাতে দোলাতে বলল, আমরা আজ থেকে বন্ধু। তুমি রোজ আমার কাছে একবার করে আসবে। দুজনে অনেক গল্প করব, কেমন?

বললাম, আমি জ্যেঠার বাড়ি রান্নাবান্নার কাজ করি। আমার বড় দাদারা তোমাদের ক্ষেতিতে কাজ করে। তাদের খাবার দিতে এই পথে আসা-যাওয়া করি. তাই তুমি আমাকে দেখে থাকবে।

তোমার মা-বাবা কোথায় থাকেন?

আমি মুখ নীচু করে মাথা নাড়লাম।

ও আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরে আমাকে সমবেদনা জানাল।

আমি এক সময় মুখ তুলে বললাম, দুপুরের দিকে কাজ কিছু কম থাকে, আমি সে সময় যদি আসি, তোমার কি খুব অসুবিধা হবে?

ও বলল, একটুও না। আমি গেটে দারোয়ানকে বলে রাখব। তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। তুমি সোজা ওপরে চলে আসবে।

আমি প্রায় রোজই ওখানে আসতে লাগলাম।

তোমার জ্যেঠামশাইয়ের বাড়িতে বারণ করত না?

জ্যেঠিমা প্রথম দিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জ্যেঠা তাকে ধমক লাগাল। জ্যেঠা বুঝতে পেরেছিল, জমিনদার অমর সিংজীর কোঠিতে কোন আর্জি নিয়ে যাবার একটা পথ খোলা রইল।

তারপর তোমার বন্ধুটির কথা বল।

রোজ দুপুরে ওকে আমার জানা গল্পগুলো একটি একটি করে বলতে হতো। ও যেন হাঁ করে গিলত। গল্পের ভেতর ওর মত এমন করে মজে যেতে আর কাউকে কখনো দেখিনি বাদশা।

অমর সিংজীর স্ত্রী ছিল না। রতন তাই অল্প বয়স থেকেই সারা সংসারের কর্ত্রী ছিল। অমর সিংজী জমিনদার হিসেবে বড় কড়া মানুষ ছিলেন কিন্তু অন্দর মহলে রতনের শাসন তিনি খুশি হয়ে মেনে নিতেন। আমি ছিলাম তাঁর একজন সামান্য প্রজার বাড়ির মেয়ে, কিন্তু মেয়ের বন্ধু বলে তিনি আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন।

একদিন রতন আমাকে বলল, অমর সিংজী নাকি বলেছেন, ছেলে থাকলে আমাকে বউ করে ঘরে তুলে নিতেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলাম, বিধাতার কি নিষ্ঠুর বিচার, অমর সিংকে একটি ছেলে দিলে এমন কি ক্ষতি হয়ে যেত তাঁর!

শাহরাজাদী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি মনে কর রতনের কথা শুনে আমি খুব খুসি হয়েছিলাম?

তোমার সে সময়কার মনের অবস্থা আমার জানার কথা নয় শাহরাজাদী।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই হয় মালেক। ক্ষত যার বুকের মাঝে, সেই বোঝে তার যন্ত্রণা।

একটু থেমে আবার বলল, আমার সে সময়কার মনের ব্যথা বুঝত আর একজন।

বললাম, শাহরাজাদী, মনে হয় তুমি রতনের কথাই বলছ।

ঠিক ধরেছ মালেক, আমার দুঃখের দিনে রতনের কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা পেয়েছি। ওর কাছে যত চোখের জল ঝরাতাম, বুকটা আমার ততই হাল্‌কা হয়ে যেত।

রতন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমাদের কথা জানতে চাইত। আমি চকের কথা বলতাম। মায়ের গল্প শোনানোর কথা, তার ভালবাসার কথা বলতে বলতে আমার চোখে জল এসে যেত। রতন নিজের ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিত।

ত্রিনাথদার নৌকোয় আমাদের এখানে ওখানে যাওয়ার কথা শুনে সে কি উত্তেজনা ওর। খালি বলত, কত সুখেই না ছিলে তুমি! একটা উড়ে চলা পঙ্খীর জীবন ছিল তোমার।

ত্রিনাথদার কথা তুললেই হেসে গাড়িয়ে পড়ত ও।

কেন?

ঐ যে কোজাগরীর রাতে গাছে বসে আমার গল্প শুনছিল ত্রিনাথদা। শাহ্‌রাজাদীর রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমি বললাম, বসোরার গোলাপ। ত্রিনাথদা অমনি বলল, ঠিক আমাদের পান্নার মত। আমি ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলাম, তুমি একটি হনুমান। সেই কথা শুনে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল রতন। এর পর থেকে ত্রিনাথদার কথা উঠলেই ও বলত মহাবীর হনুমানজীর কথা বল পান্না।

ত্রিনাথকে হনুমানজী বললে, আমাকে কি নামে ডাকত তোমার বান্ধবী?

শাহ্‌রাজাদী অমনি বলল, তোমাকে রঘুনাথজী বলে ডাকত ও।

কি সৌভাগ্য আমার!

থাম বাদশা, ছোটবেলা থেকে তুমি আমাকে যে দুঃখ দিয়েছ তা রামায়ণের সীতার দুঃখকেও হার মানায়।

একটু থেমে আবার বলল, আমি যখন তোমার কথা বলে চোখের জল ফেলতাম তখন ও আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিত।

বললাম, শাহ্‌রাজাদী, ইচ্ছা করে তোমাকে দুঃখ দিয়েছি বলে তো কই মনে পড়ে না।

তুমি দুঃখ দিয়েছ বলে আমি কোনদিন অভিযোগ করিনি মালেক। দুঃখ যা পেয়েছি, সে আমার নিজের মনের থেকেই।

বললাম, আমার জন্যে তুমি এত ভাবতে শাহ্‌রাজাদী, কি এমন দিয়েছি আমি তোমাকে?

হাসল শাহ্‌রাজাদী, ভাবনাটা আমার রোগ মালেক, তোমার দেওয়া না দেওয়ার ওপর সেটা নির্ভর করে না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, এক একদিন ভারী মন খারাপ করত আমার। কোন কাজে একটুও মন বসত না। খালি কোথাও পালাই পালাই ভাব। একটা উড়ন্ত পাখি দেখলে তার দিকে চেয়ে থাকতাম।

রতন আমার ভাবসাব দেখে বলত, যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি, তুই তোর বাদশার দেশে গিয়ে তাকে একবার দেখে আয়।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতাম, মায়ের একটা ছেলে সে, এখনও কি সাদি না করে বসে আছে।

ও বলত দেখেই আয় না।

আমি বলতাম, সে সাহস নেই ভাই। ও যদি সংসারী হয়, আমি দূরে থেকেই ওর সুখ চাইব। কাছে গিয়ে আঁখ থেকে আঁসু ফেলে ওর অমঙ্গল চাইব না।

তুমি আমাকে এত ভালবাসতে শাহ্‌রাজাদী?

সে সময়, সত্যি বাদশা, আমি তোমার কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। রতন কাছে না থাকলে আমার যে কি হতো তাই ভাবি।

তারপর রতনের সঙ্গে, জ্যেঠার সংসারের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হলো কি করে?

শাহ্‌রাজাদী বলল, রতনের সাদির সব ব্যবস্থা যখন পাকা হয়ে গেল তখন অমর সিংজীর কাছে রতন বায়না ধরল, আমাকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে।

মেয়ের আবদার রক্ষা করলেন সিংজী। আমার জ্যেঠার সঙ্গে তাঁর কি কথা হলো জানি না, তবে আমি বড় একটা সংসারের ঘানি টানার হাত থেকে মুক্তি পেলাম।

রতন বাঈয়ের সঙ্গে চলে এলাম অনেক দূর , আজমীড়ে তার শ্বশুরবাড়ীতে। কয়েকদিন আনন্দ উৎসবে কাটল। বিরাট বাড়ী, লোক লস্করে ঠাসা। ক্ষেত খামার, ব্যবসাপাতি, হাঁকডাকে তল্লাট সরগরম।

আমি খুশি হয়ে বললাম, সেখানে তুমি তাহলে রানীর হালে ছিলে শাহ্‌রাজাদী।

ও আমার দিকে মুখ তুলে বলল, এমন কথা বলছ কেন মালেক? আমি হয়ত বাঁদী ছিলাম না, কিন্তু রানী হতে যাব কোন্ দুঃখে।

এবার বল তোমার আজমীড়ের কাহিনী?

শাহরাজাদী বলতে লাগল, উৎসবের ভেতর রতনবাঈ সকলের সঙ্গে আমাকে তার মা-বাপ মরা সহেলী (সই) বলে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। এতে সকলের কাছেই আমার সমাদর বেড়ে গেল।

এক সময় উৎসবের বাতি নিভল, আনন্দ কোলাহল থেমে গেল। সংসারটি যথা নিয়মে চলতে লাগল। আমরা ধীরে ধীরে সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলাম।

রতনবাঈয়ের ভালবাসা আমাকে ঘিরে ধীরে ধীরে বেড়েই চলল। আমি আর রতনবাঈ যেন অভিন্ন। নিজের হাতে সব করবে, তবু কুটোটি নাড়তে দেবে না আমাকে।

কিছুদিনের ভেতর আমি কিন্তু মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলাম বাদশা। এত সুখ আমার কপালে সইবার নয়। তবে দিন দুনিয়ার মালেক এরই ভেতর আমাকে একটা পথ করে দিলেন। রতনবাঈয়ের শ্বশুরমশায় অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। বৃদ্ধ মানুষটির সেবা যত্নের জন্য অনেক লোক ছিল, কিন্তু আমি দেখলাম সকলের ভেতর প্রাণের ছোঁয়া নেই।

একদিন রতনবাঈকে বললাম, তুমি তোমার শ্বশুরমশায়ের সেবার ভারটা আমার হাতে তুলে দাও। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবে না।

এ ব্যাপারটায় ও আমাকে না বলতে পারল না। আমি যখন বৃদ্ধটির কাছে যেতাম, মালিশ লাগাতাম, তখন একটি শিশুর মতন হাসতেন তিনি। আমাকে কি করে যে তাঁর কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা জানাবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না।

আমার সেবা-যত্নে তিনি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিছানায় উঠে বসলেন। ঘরের ভেতর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটাচলা শুরু করলেন। চারদিকে আমার খুব সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ডাক্তারবাবু বললেন, অসম্ভব একটা কাজ তুমি সম্ভব করেছ মা। আর কয়েকদিনের ভেতরেই বাইরের চত্তরে, বাগানে একা একাই উনি ঘোরাফেরা করতে পারবেন।

এই এক বছরে রতনবাঈয়ের একেবারে নিজস্ব সংসারের খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিই মালেক। রতনবাঈয়ের স্বামী দিলীপ সিংজী ভারী আমুদে আর দিলখোলা একটি মানুষ ছিলেন। বাপের এক ছেলে, এতবড় জমিন্দারীর মালিক কিন্তু এতটুকু অহঙ্কার ছিল না।

প্রতি রাতে আমার ওপর একটি করে কাজ চাপিয়ে রেখেছিল রতনবাঈ। আমাকে আরব্য রজনীর গল্প বলতে হতো। সে নেশা তার তখনও যায়নি। আবার একা শুনে শান্তি ছিল না তার। স্বামীটিকে কাছে নিয়ে ছাদের ওপর বসে গল্প শোনা চলত।

রতনবাঈ আমার গল্পের স্বাদ পেয়েছিল আগেই, কিন্তু দিলীপ সিংজীর কাছে একেবারেই নতুন। তাঁর চোখ-মুখ দেখে বুঝতাম, তিনি গল্পে একেবারে মজে গিয়েছেন।

জ্যোৎস্না রাত, তারাভরা রাত আসত এক একটা জাদুর জগৎ নিয়ে। আমরা তিনজনেই তার ভেতর হারিয়ে যেতাম!

কিন্তু বাদশা, গল্প বলতে বলতে আমি দিলীপ সিংজীর চোখে কেমন যেন একটা ঘোর দেখতাম। রাতে বিছানায় শুয়ে আমি তাঁর সেই ভাবটিকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করে উঠতে পারতাম না। একি গল্প শোনার মাদকতা, না গল্প বলিয়ের ওপর কিছু একটা আকর্ষণ? আবার সারাদিনের আচরণে একেবারে ভিন্ন মানুষ। ভারী হাসিখুশি, বড় সৌজন্যে ভরা ব্যবহার। এতটুকু কপটতার চিহ্ন মাত্র নেই।

রতনবাঈ বড় স্বামী-সোহাগী মেয়ে। আভাসে ইংগিতে দিলীপ সিংকেও দেখেছি স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা যেন তাঁর উপচে পড়ত।

এক সময় রতনবাঈ ক'দিনের জন্য গেল বাপের বাড়ী। বাপের শরীরটা ঠিক ছিল না তাই একবার বাপকে চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিল।

আমি বৃদ্ধের কাছে থাকতাম। তাই আমার আর যাওয়া হলো না।

দু'টি রাত পার হয়ে গেল, আমাদের আর গল্পের আসর বসল না।

তৃতীয় রাতে ফিন্‌কি দিয়ে জোৎস্না ফুটেছে। দিলীপ সিংজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, তুমি কি কেবল রতনবাঈকে গল্প শোনাবার জন্যে ছাদের ওপর আসর পাততে?

আমি একটু থম্‌কে থেমে হেসে বললাম, একথা কেন বলছেন, আপনিও তো একজন সমঝদার মানুষ।

তাহলে আজ তোমার গল্পের আসর শুরু কর।

আমি না বলতে পারলাম না। কারণ আমি সব কিছুকেই স্বাভাবিকভাবে দিলীপ সিংজীর কাছে ধরে তুলতে চাই।

সে রাতে আমি গল্প বলছি আর দিলীপ সিংজী গল্প শুনছেন। শুনতে শুনতে দিলীপ সিংজীর সেই মোহাচ্ছন্ন মুখটি আমার চোখের ওপর ফুটে উঠল। সেই আশ্চর্য ঘোর-লাগা দু'টি চোখ।

সেই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে এমন একটা ভয় আমার চারদিকে উঁকিঝুঁকি মারলেও আমি তাকে আমল দিলাম না।

এক সময় গল্পের বিশেষ একটা জায়গায় ছেদ টেনে দিয়ে বললাম, আজ ক্ষমা করুন, কাল বাকিটুকু শোনাব।

মুহূর্তে ঘোর কেটে গেল দিলীপ সিংজীর। ঠিক সেই আগের মত সৌজন্যে ভরা ব্যবহার। বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

দু'চারদিনের ভেতরেই বাবা অমর সিংজীকে দেখে ফিরে এল রতনবাঈ। আমি রতন আর দিলীপ সিংজীর মনের মধ্যে এতটুকু চিড় ধরে তার কোন সুযোগই রাখতে চাইলাম না।

এদিকে দিলীপ সিংজীর বাবা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেই এখন বাইরে বেরুতে শুরু করেছেন। আমাকে একদিন কাছে ডেকে বললনে, মা তুমি আমাকে যে ঋণের জালে জড়িয়েছ তার থেকে কোনদিনই আমি মুক্তি পাব না। আমাকে একটুখানি অন্তত ঋণশোধ করতে দাও। টাকা পয়সা যা চাও আমি দেব, সাধী করতে চাইলে তো কথাই নেই।

আমার তখন এ বাড়ী থেকে যে কোন রকমে চলে যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি বিনীতভাবে বললাম, যদি আপনি আমাকে কিছু অনুগ্রহ করে দিতে চান তাহলে যে কোন রকমের একটা কাজ আমাকে পাইয়ে দিন। আমি যেন সেবার ভেতর দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

উনি বললেন, এখানে কি তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে মা।

একটুও না বাবা, আপনার সেবা করে আমি ভারী তৃপ্তি পেয়েছি। এখন আপনি একেবারে সুস্থ। আমাকে এমনি কোন একটা সেবার কাজ দিন।

বৃদ্ধ মানুষটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, পুষ্কর-তীর্থে আমার এক বন্ধু পাণ্ডা আছে। সে কয়েকদিন আগেই আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। মানুষটি ভারী সজ্জন। তাঁর একটি জলসত্র আছে। সেই জলসত্রে টাঙ্গাওয়ালারা গিয়ে পশুদের জল খাওয়ায়। অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে যাত্রী নিয়ে যাবার সময় ঘোড়াগুলো জখম হয়ে যায়, তাদের জন্যে এই জলসত্র। ও চিঠির এক জায়গায় লিখেছে, যে লোকটা ইঁদারা থেকে জল তুলে টব ভরত সে নাকি কাজ ছেড়ে দিয়ে তার দেশে চলে গেছে। আমি দেখে এসেছি মা ইঁদারার সামনে সুন্দর কোয়াটার। অনেক বিশ্বাসী পুরোনো এক দরওয়ানও থাকে। তুমি যদি এই সেবার কাজটা করতে চাও মা আমি হয়ত তার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সাতদিনের ভেতর চিঠির জবাব এসে গেল। আমার চাকরী পাকা।

কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিল রতনবাঈ। আমি তাকে অনেক বোঝালাম। আমার নিজের একটা জীবনের রাস্তা চাই সে-কথা তাকে খোলাখুলি জানালাম। বললাম, এমন সুন্দর ঘর-বর পেয়েছ, দুঃখ কিসের? দিলীপ সিংজীর মত এমন একটি মানুষ ভূ-ভারত ঢুঁড়লেও তুমি পাবে না রতনবাঈ। বিনা কাজে আমার জীবনটা হাঁপিয়ে উঠবে। তুমি আমাকে এইটুকু সেবার কাজ করতে বাধা দিও না।

অনেক শোকতাপ আর চোখের জল ঝরানোর পরে রতনবাঈ আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো, বলল, তোমার জিয়াজী তোমাকে নিজে গিয়ে সব দেখেশুনে দিয়ে আসবে। তবেই আমি শান্তি পাব।

পরের দিন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিলীপ সিংজীর সঙ্গে আমি পুষ্করতীর্থের পথে রওনা দিলাম। আজমীড় শহর থেকে একটি টাঙ্গা ভাড়া করা হয়েছিল। ডাইনে আনা সাগর হ্রদের জল

গরমের দিনে সুর্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। হ্রদের সামনে পাঁচটি ভারী সুন্দর শ্বেতপাথরের মণ্ডপ। হ্রদের ওপারে অনেকটা দূরে সাদা সাদা বাড়ীর সারি আরব্য রজনীর সুলতানের দীর্ঘ প্রাসাদ বলে মনে হচ্ছিল।

দুটো উট আমাদের পাশ দিয়ে আরোহী নিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। মাথার ওপর সূর্য প্রচণ্ড তাপ ছড়াচ্ছে। ঘোড়া গাড়ী নিয়ে উঠছে টিলার ওপর। থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার হ্যাঁচকা টানে কিছু পথ গাড়ী নিয়ে ওপরে উঠছে। ঘোড়ার কষে সাদা ফেনা জমে উঠেছে। হাপরের মত শ্বাস টানার শব্দ হচ্ছে।

ঘোড়া হঠাৎ থেমে দাঁড়াতেই চাবুক কষাল কোচওয়ান।

সেই ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর প্রচণ্ড রোদ্দুরে বুকে হাঁপরের টান টানতে টানতে ঘোড়া গাড়ী টেনে নিয়ে উঠল টিলার ওপর।

আমি দিলীপ সিংজীকে বললাম, এখানে একটু গাড়ীটাকে বাঁধতে বলুন। ঘোড়াটা যে রকম জখম হয়ে গেছে গাড়ী সমেত না নিচে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে।

দিলীপ সিংজীর ইংগিতে গাড়ীটা কোচওয়ান ঐখানে রেখে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। সুযোগ পেয়ে সে লেগে গেল ঘোড়ার পরিচর্যায়।

হঠাৎ দিলীপ সিংজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, পান্নাবাঈ, তুমি তোমার সাজানো সংসারটা এমন করে ভেঙে দিয়ে এলে কেন?

আমি খুব অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি জিয়াজী। আমি আপনার সংসার ভেঙে দিয়ে এলাম?

বেশ করে ভেবে দেখ, কথাটা আমি ভুল বলছি কিনা?

আমি ভারী ধাঁধায় পড়ে গেলাম মালেক। আকাশ পাতাল ঢুঁড়েও দিলীপ সিংজীর কথার মানেটা বুঝে উঠতে পারলাম না।

শেষে দিপীল সিংজী নিজেই বললেন, তুমি প্রতি রাত্রে গল্পের যে প্রাসাদ তৈরী করেছিলে, তাকে নিজের হাতে কেমন করে ভেঙে দিতে পারলে পান্নাবাঈ।

আমি হেসে বললাম, গল্পের প্রাসাদ এমনি আসমানেই মিলিয়ে যায়।

দিলীপ সিংজী বললেন, আমরা আরো দুজন প্রাণী তোমার সেই প্রাসাদের বাসিন্দা ছিলাম পান্নাবঈ। তুমি যখন প্রাসাদ ভেঙে দিলে, তাদের কথা একটিবারও ভাবলে না। তারা ভয়ঙ্কর একটা ধুলোর ঝড়ের ভেতর নিজেদের হারিয়ে ফেলল।

হঠাৎ কোচওয়ান হেঁকে বলল, আঁধি-সাব আঁধি। সামাল।

নিচ থেকে বালির ঝড় ঝলকে ঝলকে ওপরের দিকে উঠে আসতে লাগল। আমরা প্রায় অন্ধকারের ভেতরে ঢাকা পড়ে গেলাম। গরম বালির একটা পাতলা আস্তরণের নিচে আমরা যেন দম বন্ধ করে পড়ে রইলাম। কতক্ষণ পরে আঁধি সরে গেল। আমরা ঝেড়ে উঠে বসলাম, আকাশ ঝকঝক করছে, কোথাও যেন কিছুই হয়নি। কোচওয়ান গাড়ীতে উঠে এসে বসল। ঘোড়া তৈরী।

আমি মৃদু হেসে দিলীপ সিংজীকে বললাম, আঁধি চিরদিনের নয়, আমি যদি আপনাদের কোন দুঃখ দিয়ে থাকি দিন-দুনিয়ার মালেক সে দুঃখটুকুও আপনাদের মন থেকে মুছে দেবেন।

এরপর আমি পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দিরের কাছাকাছি সেই পাণ্ডার বাড়িতে থাকতাম। ভোরবেলা বেশ খানিক পথ হেঁটে গিয়ে পশুদের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে জল ভরে দিয়ে আসতাম। সারাদিন ফুল যোগাতাম যাত্রীদের। পুষ্কর হ্রদে মেয়েদের পুজো দেবার নিয়ম। কত যাত্রী আসত, কত শ্রদ্ধায় তারা হ্রদের পবিত্র জলে পুজো নিবেদন করে যেত। আমি প্রতিদিন যাত্রীদের ভেতর খুঁজতাম, বাংলা মুলুক থেকে আসা মানুষদের। কি আগ্রহে যে খুঁজতাম সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না মালেক।

বাঙালী দেখতে পেলেই তাকে পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়িতে এনে তুলবার চেষ্টা করতাম। আমি অবাঙালী মেয়ে হয়েও সুন্দর বাংলা বলছি দেখে ওরা একেবারে তাজ্জব বনে যেত। আমি জিজ্ঞেস করতাম, ওরা কোন্ জেলার লোক। মিলে গেলে আরও কাছের জায়গাগুলোর খোঁজ নিতাম। বুক

আমার কেঁপে কেঁপে উঠত। কিন্তু আমাদের সেই চকের হদিশ কারু মুখে কোনদিন পাইনি।

একদিন শুধু স্বপ্নে তোমাকে দেখেছিলাম বাদশা।

সত্যি?

শুধু তোমাকে নয়, তোমার নতুন বিয়ে করা বউকেও।

হেসে বললাম, মা এত চেষ্টা করেও আমার বিয়ে দিতে পারল না আর তুমি স্বপ্নে হোক্ আর যাই হোক্ আমার বউ এনে দিলে।

শাহরাজাদী বলল, পুষ্কর হ্রদে ঢোকার আগে গাছতলার বেদিটার ওপর তুমি বসেছিলে। আমাকে তুমি দেখতে পাওনি, আমি কিন্তু তোমার সুন্দরী বউটিকে দেখছিলাম। ও যখন পুজো দিতে হ্রদের ধারে গেল তখন আমি আমার দোকান থেকে অনেক ফুল আর মালা নিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

ও হেসে বলল, এত ফুল, এত মালা আমি কি করব।

বললাম, ফুলগুলো তোমার হ্রদে, আর মন্দিরে পুজো দিতে লাগবে। মালাগুলো নিয়ে যাও, ঘরের মানুষের গলায় পরাবে।

ও আমার হাতের একখানা মালা নিয়ে ছুটল সেই গাছতলায়, যেখানে তুমি বসেছিলে। কিন্তু একটু পরে ছুটে এল আমার কাছে, ভাই, তিনি কোথায় গেলেন, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কেউ তার খবর দিতে পারল না।

তোমার বউকে বললাম, ঐ যে হ্রদের ওপারে পাহাড় দেখছ, ওটি সাবিত্রী পাহাড়। ওখানে যে পুজো দেয়, তার স্বামী কখনও হারায় না।

ও ছুটল সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে। দূর থেকে দেখলাম, ও পাহাড়ে উঠছে। মনে মনে চোখ বুজে প্রার্থনা করলাম, বাদশাকে যেন তাঁর বউ ফিরে পায় ঠাকুর।

চোখ মেললাম, কেউ কোথাও নেই, আমি বিছানায় শুয়ে আছি। মনটা একদম দমে গেল। তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম গাছতলায় বসে থাকতে, তারপর তুমি কোথায় গেলে।

দিনে দুপুরে ঐ স্বপ্নটা আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। আমি পুষ্করে আর থাকতে পারলাম না, এক পুরোনো কাপড়ের ব্যবসায়ী বাংলাদেশে আসছিল, তার কাজ করব বলে তার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম।

তারপর?

শাহরাজাদী বলল, তারপর কেমন করে দেবতা তোমার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিলেন তা তো তুমি জান মালেক।

আমি শাহরাজাদীর কথা শুনে গালে হাত দিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম। মনে হলো, যে মেয়েটি জীবনের শুরু থেকে শত বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়েও তার মনের মানুষটিকে, ভালবাসা উজাড় করে দেবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে ফেরাই কোন শক্তিতে।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, শাহরাজাদী, কৈশোরের ভালবাসা কখনও মরে না। সেই কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে চরে বসে তুমি যাকে বাদশা শাহরিয়ার ভেবে গল্প শুনিয়েছিলে, আর শাহরাজাদী ভেবে যে তরুণ তোমাকে তার প্রাণের ভেতর গ্রহণ করেছিল, তাদের দু'জনের কেউই আজ হারিয়ে যায়নি। সেই পূর্ণিমার রাত দশটি বছর পরে আবার ফিরে এসেছে। আজ কি তাকে বৃথায় যেতে দেবে?

আমি শাহরাজাদীর হাত ধরে জানালার ধারে নিয়ে এলাম।

দেখ কত সুখী, কত পরিপূর্ণ চাঁদ আজ আকাশ থেকে আমাদের চেয়ে দেখছে।

শাহরাজাদী চোখভরা অশ্রুর নদী মুছতে মুছতে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

কল্যাণপুর স্টেশন ছুঁয়ে রাতের শেষ ট্রেনখানা উলুধ্বনির মত একটা বাঁশী বাজাতে বাজাতে দিগন্তের দিকে ছুটে গেল।

বোবা বসন্ত

টিনের চালে চড়বড় করে এক পশলা বৃষ্টি বেজে উঠল। শেষবেলার রোদে তেজ নেই, শুধু একটা লাবণ্য। মৌ মাখান হলুদ রঙটুকু বৃষ্টির ওপাশ থেকে ঝিলিক দিচ্ছিল। সুগতর মনে হল পুজো শেষ হয়ে গেছে আগের দিন। ঢাকীরা চলে যাবার আগে উঠোনে দাঁড়িয়ে শেষ বাজনাটা বাজাচ্ছে।

অনেকখানি দূরে মাতঙ্গী নদীর বাঁকে দুটো তালগাছ দাঁড়িয়ে। একটা নৌকো চলেছে। নৌকোটা দেখা যাচ্ছে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে। ঠিক নৌকোটা দেখা যাচ্ছে না, হাওয়ায় ফোলানো পালটা দেখা যাচ্ছে। গেরুয়া রঙের পাল। শেষবেলার রঙের সঙ্গে পালের রঙটা অদ্ভুত মিলে গেছে। এক ঝাঁক শাঁখের মত সাদা বক উড়ে গেল। সুগত জানে ওদের সন্ধ্যার ডেরার ঠিকানা। ঝিলের ধারে ডালপালা আকাশে ছড়িয়ে, পাতাপত্তর বাতাসে উড়িয়ে যে সব গাছপালা জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে তাতেই ওদের বাসা। শুধু বক নয়, কাক, শালিক, প্যাঁচা, আরও কত শত পাখি। হাজার হাজার বাদুড় ডালে ডালে এক এক টুকরো কালো ন্যাকড়ার মত ঝুলে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা গাছের ডালে বসে পাখিগুলো যখন কিচমিচ কিচমিচ শব্দ তোলে তখন এক আশ্চর্য অর্কেস্ট্রার আওয়াজ বলে মনে হয় সুগতর।

পাখির ওপর রিসার্চ করবার মত জায়গা এ জঙ্গল মহল। সুগত কিন্তু এসেছে মৌমাছির খোঁজে। ওর ইচ্ছে মৌমাছির ওপর রিসার্চ করে।

ডক্টর সেন ওকে পাঠিয়েছেন তাঁর এই জঙ্গল মহলে। মৌমাছি, মাছ, প্রজাপতি, পাখি, পোকামাকড় সব কিছুর ওপর রিসার্চ করবার এক আদর্শ জায়গা এই জালপাই মহল। যার যা খুশি বেছে নাও।

মাতঙ্গী নদী দিয়ে একবার শিকারে এসেছিলেন ডক্টর সেন তাঁর বন্ধু ডিহি মুকুন্দপুরের বড় কুমার বাহাদুরের সঙ্গে। এই অঞ্চলে তাঁরা পাখি শিকার করেছিলেন। কুমারবাহাদুরের বিরাট বাগানবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পাশেই কয়েক একর জুড়ে যে স্বরশঙ্কার ঝিল, তাতে মাছও ধরা হয়েছিল। ক'দিন একটা নেশার ঘোরে কেটে গিয়েছিল ডক্টর সেনের।

ফেরার দিন তাঁর বন্ধুর কাছে মনের ইচ্ছাটাকে গোপন রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, এমন একটা জায়গা তাঁর রিসার্চের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

কুমারবাহাদুর মুডে ছিলেন। তিনি বলে উঠেছিলেন, ডক্টর সেনের রিসার্চের জন্যে তিনি তাঁর এই জালপাই মহল সানন্দে দান করতে প্রস্তুত আছেন।

ঠিক সে সময় জমিদারী প্রথা বিলোপের আইন পাশ হতে চলেছিল। কুমার বাহাদুর জানতেন, তিনি তাঁর ছড়িয়ে থাকা এতগুলি মহল ধরে রাখতে পারবেন না। হয়ত তাই একটা সৎ কাজে ডক্টর সেনকে দান করতে চেয়েছিলেন এই মহল।

সে আজ অনেকগুলি বছরের কথা।

ডক্টর সেন এরই ভেতর তাঁর একাধিক ছাত্রছাত্রীকে এই অঞ্চলে রিসার্চের জন্য পাঠিয়েছেন।

এই নির্জন নিবিড় বুনো জায়গায় এলে মনে হয় যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে এসে পড়া গেছে। সুগতরও প্রথম কয়েক দিন তাই মনে হয়েছিল। বড় একা একা ঠেকেছিল তার এই জায়গায় এসে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই ও কেমন একটা বাঁধন অনুভব করছে। মানুষের সংস্পর্শ বর্জিত এখানকার গাছপালা, ঝিল, নদী, পাখি, কীটপতঙ্গ সব যেন বিশেষ বিশেষ এক অস্তিত্ব নিয়ে এখানে অবস্থান করছে। প্রথমে সুগতর মনে হয়েছিল এই সব মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাকে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত বলে এক ঘরে করবে। হয়েছিলও তাই। দুপুরে যে ঘুঘুটা গলা ফুলিয়ে করুণ সুরে বাতাসকে ভারী করে তুলত, সে সুগতর পায়ের সাড়া পেলেই চুপ করে যেত। একেবারে অচেনার কাছে যেমন আমরা চাই না

কোন রকম দুঃখ কিংবা সুখের মনোভাব প্রকাশ করতে। সকালে ও যখন ঝিলের ধারে গাছ-গাছালির ভেতর ঘুরে বেড়াত, তখন কাঠবেড়ালীগুলো পর্যন্ত তির্ তির্ করে অনেকখানি গাছে উঠে ওর দিকে সন্দেহের চোখে স্থির তাকাত।

এখন ওরা ওকে আর তেমন অপরিচিত বলে ভাবে না। ওদের সঙ্গে সুগতর সম্পর্কটা এখন অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে। ওকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সেদিন তো ওর কাছে এসে লেজ তুলে দাঁড়িয়েছিল একটা কাঠবেড়ালী। সামনের দুটো পায়ে উঁচু করে তুলে ধরেছিল বকুলের একটা পাকা ফল। ভাবখানা এই, খাবে? চাও তো দিতে পারি।

বকগুলো ওকে দেখলেই আগের মত আর কোঁক কোঁক আওয়াজ করে উড়ে যায় না জলার ধার থেকে। সম্ভ্রমে খানিকটা সরে দাঁড়ায় মাত্র।

দূরে অস্পষ্ট নীলাভ একটা পাহাড়ের শ্রেণী আরও দূরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনেকগুলো ছোট-বড় শালগাছ উঁচুনীচু পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকে দৌড়ে যেতে যেতে কি কারণে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সুগতর মনে হয়, ঐ পাহাড়, নদী, ঝিল, জঙ্গল সব মিলে একটা স্বতন্ত্র দেশ। এখানে ক্ষণিকের অতিথি হিসেবে তারা আমন্ত্রিত। দু'দিন দুচোখে বিস্ময় নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখা। তারপর এক দিন আসার পথ ধরে নিঃশব্দে চলে যাওয়া। চিরস্থায়ী কোন বন্দোবস্ত এখানে নেই।

কেবল একটা বিরাট থামওয়ালা বাড়ি এই প্রকৃতি রাজ্যে খাপছাড়া দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটি রাজাবাহাদুরের কোন পুরুষ তৈরি করতে গিয়ে কি কারণে যেন অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে যান। ডক্টর সেন যখন গভীর বন্ধুত্বের সূত্রে এই জঙ্গল মহলটি লাভ করেন কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে তখন তিনি আর ঐ বাড়িটি সংস্কারের কথা ভাবেননি। কয়েকটি টিনের কুটীর স্বরশঙ্কা ঝিলের এপারে তৈরী করিয়েছিলেন। তিনি কিংবা তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা এসে এই টিনের চালওয়ালা ঘরগুলোতেই সাময়িক ডেরা বাঁধত। ঝিলের ওপারের ঐ অসমাপ্ত বাড়িটার দিকে যেত না। ঐ বাড়িটা অনেক বছর রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সামনের বড় দুটো থামের থেকে চুণ সুরকীর পলস্তারা প্রায় খসে গিয়ে হাড় পাঁজর বের করা বহু দিনের রুগীর মত দেখাচ্ছিল। ওদিকে জঙ্গল গভীর। তাই কৌতূহলী হয়েও নতুন আগন্তুকেরা বড় একটা কেউ ওদিকে যেতে চাইত না।

জুলজি ডিপার্টমেন্টের সেরা ছাত্ররা ইউনিভারসিটি ছাড়ার পর এখানে ডক্টর সেনের অধীনে রিসার্চের কাজ নিয়ে আসে। তাদের উপাদান সংগ্রহের দিক থেকে এ অঞ্চলটিকে নিঃসন্দেহে সব পেয়েছির দেশ বলা যেতে পারে।

সুগত খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যেদিন তার চোখে এসে পড়েছিল এক টুকরো আলো। সেদিনটা ছিল ঝড়ের রাত। এমন রাতগুলোতে তাকে যেন নিশিতে পেয়ে বসে। সে একটুও ঘুমোতে পারে না। প্রতিদিনের তথ্যসন্ধানী সুগতর সঙ্গে সেই বিশেষ দিনের সুগতর কোন মিলই থাকে না। ঝিঁঝির একটানা ঝিঁ ঝিঁ আওয়াজ অন্ধকার ঝড়ের রাতটাকে মিহি করাত দিয়ে কাটতে থাকে। সুগত বসে বসে মেঘের ডাক, ঝড়ের গোঙানি, ঝিঁঝির একটানা আওয়াজ আর বিদ্যুতের হঠাৎ করে জ্বলে ওঠার ভেতর কিসের যেন একটা চাপা মন্ত্রণার আভাস পায়। সেদিন বৃষ্টি বেশী ছিল না, কিন্তু ঝড়ের দাপট ছিল। সুগত তারই ভেতর দেখতে পেয়েছিল একটা কাঁপা কাঁপা আলো স্বরশঙ্কা ঝিলের ওপার থেকে তাঁর ক্ষীণ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। ও বেশ অনুমান করতে পারছিল যে ঐ পড়ো থামওয়ালা বাড়িটাই এ আলোর নির্জন উৎস।

যদি সুগত স্বাভাবিক স্বভাবের ছেলে হত তাহলে এ অবস্থায় ভয় পেয়ে যেত, কিন্তু সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বোঝার একটা প্রবণতা ছিল ওর। তাই ভয়টাকে অন্য পাঁচজনের মত সহজে সে আমল দিত না।

তার মনটা জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল, কেউ কি তাহলে ঐ পড়ো বাড়িতে বাস করে? তাদের পরিচয়ই বা কি? এমন নির্জন নির্বাসনে তাদের কাটাবার কারণই বা কি?

এসব প্রশ্ন তার মনে ভীড় করে এসেছিল, আবার ঝড় থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে যেতেও দেরি লাগেনি। অকারণ কৌতূহলের ওপর চিরদিনই তার একটা অনাগ্রহ ছিল। তাই প্রশ্নের ঢেউ মনের ভেতর উঠলেও আবার তা তলিয়ে যেতে বেশী সময় লাগত না।

পরের দিন ঝিলের ওপারের সরু রাস্তাটা ধরে সুগত একটি লোককে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখল। সাইকেলটাকে সে দু'একটা বাঁক ঘুরতে দেখলেও, মনে হল শেষ অবধি ঐ পড়ো বাড়িটার ভেতরেই গিয়ে ঢুকল।

একটা ছোট্ট রহস্য সুগতর মনে টুকরো মেঘের ছায়া ঘনালেও আবার তা বর্ষাশেষের মেঘের মত হাওয়ায় ভেসে গেল। সুগত নিজের কাজে মন দিল। কয়েকদিন পরে অবশ্য স্বাভাবিক বোধ থেকেই সে জানতে পারল ঐ লোকটি সপ্তাহে দু'দিন কোথা থেকে যেন সাইকেল চালিয়ে আসে, আবার সন্ধ্যার আগেই চলে যায়।

আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহের কোন একটা দিন। সুগত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল নীল রঙের বিরাট একখানা সাটিনের ওপর একরাশ শিমুলের ধবধবে সাদা তুলো কে যেন জড়ো করে রেখে গেছে। সারা বর্ষাকাল যে ধুনুরী পিটিয়ে বাজিয়ে তুলো ধুনে গেল, হয়ত লেপ তৈরির জন্যে সে-ই ফেলে রেখে গেছে এই পেঁজা তুলোর রাশ।

একটা রাম বোকা ফটিকজল পাখি ভারি উৎসাহে কাকে যেন কি বলতে বলতে উড়ে গেল ঐ থেমে থাকা মেঘটার দিকে। একফোঁটা জল নেই তবু ঘুরে ফিরে ওড়ার কি সমারোহ।

একটু পরেই একটা দৃশ্য চোখে পড়ল সুগতর। দূর আকাশের বুকে কয়েকটা কালো বিন্দু। ধীরে ধীরে সে বিন্দুগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন বিন্দু মনে হচ্ছে না, কয়েকটা রেখা আকাশের বুক চিরে এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই ওরা এসে পড়ল। সুগতর কাছে এ এক অভাবিত দৃশ্যপট। ঝাঁকে ঝাঁকে যাযাবর হাঁস উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝিলের জলে। স্বরশঙ্কা কানায় কানায় ভরা। আশপাশের পথ, মাঠ, জঙ্গলের অনেকখানি সারা বর্ষা যুদ্ধ চালিয়ে সে দখল করে নিয়েছে। হাঁসগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ঝিলে, আর একরাশ ছোট-বড় মোতির দানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছিল চারদিকে।

দু'দিন ধরে চলল এই হাঁসেদের আগমনপর্ব। সারা ঝিল ভরে গেল। জল দেখা যায় না। দমকলের জাহাজের মত সর্ সর্ করে এগিয়ে গিয়ে ঠেকা খেয়ে থেমে যাওয়া হাজার হাজার হাঁসের কলরোল, সে এক দেখার মত শোনার মত ব্যাপার।

সুগত দেখতে লাগল ঝাঁক ঝাঁক পাখিদের উড়ে আসা। কতদূরের হ্রদ, পাহাড়, জলজঙ্গলের গন্ধ লেগে আছে ওদের ডানায়। কত দেশ দেশান্তরের মানচিত্রের আঁকিবুকির ওপর দিয়ে পথ চিনে এসেছে ওরা।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতে বিপাশার কথা মনে এল সুগতর।

রিসার্চের সাবজেক্ট হিসেবে যাযাবর পাখি বেছে নিয়েছে বিপাশা। ডক্টর সেনের একমাত্র মেয়ে বিপাশা। এই রিসার্চ সেন্টারেরও অনাগত দিনের উত্তরাধিকারিণী সে।

বিপাশার কথা মনে এল সুগতর। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ডক্টর সেনের বাড়িখানা ছবির মত ফুটে উঠল তার চোখের ওপর। কলেজ কিংবা ইউনিভারসিটির ছুটিছাটা থাকলেই ডক্টর সেনের গাড়িখানা এসে দাঁড়াত তার হোস্টেলের সামনে। সুগতকে যেতে হত ডক্টর সেনের বাড়ি। মিসেস সেনকে সে মা বলেই ডাকত। মিসেস সেন কথা বলতেন কম, কিন্তু ছোটখাট আচার-আচরণে পাওয়া যেত তাঁর অভিজাত মনের ছোঁয়া।

বিপাশাকে সে ছোটবেলা দু'একবার দেখলেও কলেজে পড়ার দিনগুলোতেই তাকে দেখেছে বেশি। দেখাশোনা হলেও একেবারে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ কোনদিনই হয়নি তার। একই কলেজে পড়েছে, সতীর্থ তারা ইউনিভারসিটিতেও, তাছাড়া সাবজেক্টও অভিন্ন তবু সৌজন্যমূলক বাক্যালাপের বেশি তাদের পরিচয় এগোয়নি। হয়ত সুগতর স্বভাবের স্বাভাবিক উত্তাপহীনতা স্পর্শ করতে পারেনি বিপাশার উচ্ছল মনটাকে। বিপাশা বন্ধুবান্ধব নিয়ে যখন কথার নদীতে কল্লোল তুলেছে তখন দূরে

দাঁড়িয়ে তা দেখেছে সুগত। বিপাশাকে তার কোন কোন মুহূর্তে ভাল লেগেছে, কিন্তু ভাল লাগার অনুভূতিগুলোকে গুছিয়ে সে মেলে ধরতে পারেনি বিপাশার কাছে। ভাল লাগা আর ভাল লাগাকে প্রকাশ করার আর্ট, এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। দুটোকে যে মিলিয়ে নিতে পারে বহু পঠিত গল্পের নায়ক হবার ক্ষমতা থাকে তারই হাতে। সেদিক থেকে পাঠককে নিরাশ হতে হবে সুগতর দিকে তাকিয়ে। ও যেন কতকটা রবি ঠাকুরের শেষের কবিতার শোভনলালের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সংক্ষিপ্ত এই জন্যে যে শোভনলাল যতটুকু বা এগিয়েছিল সুগতর পক্ষে ততটা এগোনও সম্ভব হয়নি। শোভনলাল লাবণ্যের ফটোখানা অন্ততঃ বন্ধুকে দিয়ে আঁকিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। ভাল লাগার ব্যাপারে এ ধরনের কোন একটা পরিকল্পনাও সুগতর মাথায় কোনদিন খেলেনি।

ভালবাসা বৃত্তিটার চেয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ সুগতর মনটাকে বিশেষ ভাবে অধিকার করে রেখেছিল। মা বাবার স্মৃতি সুগতর কাছে আশা করা সম্ভব নয়। রায়টের নির্মম বলি হয়েছিলেন যখন তাঁরা তখন এক বছরের শিশু সুগত ভাগ্যক্রমে একটি নার্সিংহোমে শিশু রোগ নিরাময়ের জন্য বন্দী। তারপর কি করে যে সে ডক্টর সেনের করুণা লাভ করল, তা আজও তার কাছে অজ্ঞাত। মাত্রাতিরিক্ত জোরে কথা বলা আর প্রবল হাসিতে ফেটে পড়া এই মানুষটাকে সুগত দেখছে প্রায় তার স্মরণকাল থেকে। ইউনিভারসিটিতে তো ডক্টর সেনের ছাত্রই ছিল সে। কোন ছাত্র বড় টেবিলটা পেরিয়ে যদি ডক্টর সেনের হাতের নাগালের ভেতর গিয়ে কথা বলতে চাইত তাহলে তিনি প্রথমেই তার পিঠে একটি কীল বসিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। কীলের ব্যথার চেয়ে ডক্টর সেনের সান্নিধ্যের আনন্দটা বেশি ছিল বলে ছাত্রেরা বেমালুম, সেগুলো হজম করত। ডক্টর সেনের ভেতর বিধাতাপুরুষ প্রাণ নামক বস্তুটাকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় পুরে দিয়েছিলেন, তাই সবক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটত মাত্রাতিরিক্তভাবে। খেতে ভালবাসতেন যতখানি, খাওয়াতে তার চেয়ে কম নয়। গল্প হাসিতে জমে গেলে সময়ের জ্ঞান থাকত না তাঁর কখনও। আবার মনোযোগী ছাত্র পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়ে তার সঙ্গে ধৈর্যের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। এ বয়সেও সিজিন টিকিট কেটে সারা রাত জেগে মার্গ সঙ্গীত শুনতে তাঁর উৎসাহের অভাব হয়নি। তাঁর পীড়াপীড়িতে মিসেস সেন সকন্যা তাঁর সঙ্গী হলেও বড় জোর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কোন রকমে স্বামীকে সঙ্গদান করতেন। তারপর একের পর এক অবাধ হাইগুলোকে হাত দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে ডক্টর সেনের দিকে তাকাতেন। ডক্টর সেন অমনি বলতেন, হার হাইনেসের হাই উঠেছে, আর তো ধরে রাখা যায় না।

নিজের রসিকতায় হা হা করে হেসে উঠতে গিয়ে হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে থেমে যেতেন। ভাবটা এই, বড় সামলে নিয়েছি।

মিসেস সেন উঠে দাঁড়ালে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখে-মুখে মিনতি ফোটাতেন ডক্টর সেন। ভাবখানা এই মিসেস সেনের সঙ্গে তিনি যেতে পারছেন না বলে মিসেস সেন যেন কিছু মনে না করেন।

মিসেস সেন কথা বলতেন কম, কিন্তু স্বামীটিকে চিনতেন অনেক বেশি। তিনি অধিক রাত না জাগার উপদেশ দিয়ে মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে আসতেন। যদিও জানতেন, আসর ভাঙবে তবু সেন সাহেব নড়বেন না। গুণিজন সংবর্ধনা সেরে তবে বাড়ি ফিরবেন।

দ্বিতীয় দিন থেকে অবশ্য দৃশ্যপটে আমূল পরিবর্তন ঘটত। মিসেস সেনের বদলে আসত বিপাশা বাবার সঙ্গে। কোনদিন বিপাশা না এলে ডেকে আনতেন সুগতকে। কখন বা সুগত না এলে অন্য কোনজন। মোট কথা ডক্টর সেন একা কোন কিছু ভোগ করতে চাইতেন না। ভাগ করে ভোগ করার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

কোন শিল্পীর মীড়ের সূক্ষ্ম টান শুনলে তিনি গলা ছেড়ে বাহবা দিয়ে উঠতেন। বিস্তারের জাল বুনে বুনে শিল্পী যখন শ্রোতাদের সুরের গভীরে নিয়ে যেতেন তখন ডক্টর সেন ভুলে যেতেন যে তিনি একজন একান্ত বাস্তববাদী বিজ্ঞানী। একটা সম্পূর্ণ আলাদা আনন্দের জগতে তিনি বিচরণ করতেন। শিল্পী যখন রেওয়াজি গলায় সাপট তানের লহর জাগাতেন তখন তিনি পাশে বসে থাকা সুগত কিংবা মেয়ে বিপাশার পিঠে হাত চাপড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

এ হেন ডক্টর সেনকে সুগত মনে মনে যতখানি শ্রদ্ধা নিবেদন করত তার পরিমাণ হৃদয়ের অন্য কোন বৃত্তির চেয়ে কম নয়।

সে যখন স্কুলের ওপর ক্লাসের ছাত্র তখন একদিন কি এক প্রসঙ্গে ডক্টর সেন তাকে কাছে ডেকে নিয়ে কটি কথা বলেছিলেন। আজও সুগতর কানে বাজছে সে কথাগুলো।

তুমি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছ সুগত, নিজের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তোমার মন ভেতরে ভেতরে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠবে, এই তো স্বাভাবিক। আমি তোমাকে না জানার অন্ধকারে অন্ধ করে রাখতে চাই না, আবার অনাবশ্যক অতিরিক্ত আলো ফেলে চোখ ধাঁধিয়েও দিতে চাই না। তোমার মা বাবা রায়টের বলি হয়েছিলেন, তুমি তখন শিশু হাসপাতালে অসুস্থ। তারপর থেকে তোমার যা কিছু ভার তা মিসেস সেন আর আমাকেই বইতে হচ্ছে। এ জন্যে আমার মনে কোন পীড়া নেই। মানুষের এটুকু ধর্ম পালন করতে পারায় আমি সুখী জানবে। তোমার খরচপত্রের জন্যে ভেবো না এখন থেকে। ওটা আমার পক্ষে জোগান দিতে যতখানি অসুবিধে তার চেয়ে বেশি অসুবিধে তোমার নিজের পক্ষে জোগাড় করে নেওয়া। অতএব যতদিন না সমর্থ হচ্ছ ততদিন ও ভারটুকু আমাকেই বইতে দাও। আমি তোমাকে আমার বাড়িতে রেখে পড়াতে পারতাম কিন্তু তাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে। কেউ বলবে, আমার ঔদার্যের কথা কেউবা ইঙ্গিত করবে আমার উদ্দেশ্যের ওপর। তাতে আমার গায়ে আঁচড় না পড়লেও মিসেস সেন আহত হবেন। তাই তোমাকে আমি হোস্টেলে রেখেই পড়াতে চাই। তুমি যখন কৃতী হয়ে তোমার পথ দেখে নেবে তখন আমার দায়িত্বের ছুটি। আর একথাটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রেখ, আমি প্রত্যাশা নিয়ে কারো জন্যে কোন কিছু করতে ভালবাসি না। আমার কাছে তাই প্রতিদান দেবার ইচ্ছে নিয়ে কোনদিন এসো না, তাহলে দুঃখ পাব।

সে কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে সুগতর।

একবার সে নিজেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ডক্টর সেনের কাছে। বি. এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার খবর পেয়েছিল সেদিন। ডক্টর সেন তাকে দেখেই বললেন, আমি তোমার রেজাল্ট আগেই জেনেছিলাম সুগত। তবে ফল বেরোবার আগে তা প্রকাশ করা নিয়ম নয় তাই জানাইনি। বিপাশাকেও জানাইনি যে সে থার্ড স্ট্যান্ড করেছে।

দু'দশটা কথার পর সুগত ভেতরে গিয়ে মিসেস সেনকে প্রণাম করে এল। তিনি মিষ্টি খাওয়ালেন। আশীর্বাদ করলেন। বেরিয়ে যাবার সময় কি মনে করে সুগত আর একবার ঢুকল ডক্টর সেনের স্টাডিতে।

তিনি বই এর ভেতর ডুবে ছিলেন। কি করে এক এক ধরনের পাখি একটানা অবিশ্বাস্য দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সে সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক পেপার পড়ছিলেন। দেহ গঠনের ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

সুগত সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডক্টর সেন মুখ তুলে তাকালেন।

সুগত বলল, আমি এবার একটা স্কলারশিপ পাব। আমার অভিভাবকের আয় যদি পাঁচশো টাকার ওপরে হয় তাহলে আমি ও স্কলারশিপটা পাবার হকদার নই। এখন আমি কি করব।

পাখির বইটা সরিয়ে রেখে ডক্টর সেন একবার ভাল করে তাকালেন সুগতর মুখের দিকে। বললেন, তুমি নিশ্চয় কিছু একটা ভেবেছ, সেই কথাটাই আগে আমি জানতে চাই।

সুগত সঙ্গে সঙ্গে মনের কথাটা বলতে পারল না। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে মনে মনে একবার মক্স দিয়ে নিল তার বক্তব্যটার ওপর।

এক সময় মুখ তুলে বলল, স্কলারশিপটা পেলে আমি আমার খরচ চালিয়ে নিতে পারব।

ডক্টর সেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন। এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর বললেন, তোমার এ ডিসিসান আমাকে খুবই খুশি করেছে সুগত।

সুগত অমনি বলল, কেবল একটা বিষয়ে বাধছে, আমার অভিভাবকের আয়ের অঙ্কটার ব্যাপারে।

ডক্টর সেন হেসে বললেন, আজ থেকে সুগত সরকার স্বাধীন স্বরাট। সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। এর চেয়ে একটা মানুষের বড় পরিচয় কি হতে পারে।

সুগত মাথা নামাল।

ডক্টর সেন বলে চললেন, না না, তুমি ভেবো না যে তোমাকে আমি অকৃতজ্ঞ ভাবছি, কিংবা একথাও ভেবো না যে তোমাকে আর খরচ জোগাতে হবে না বলে আমি এসব কথা বলছি। একটা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখার মত আনন্দ নেই। আজ তোমার মস্ত বড় গর্বের দিন সুগত।

ডক্টর সেনের পায়ে হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সুগত সেদিন বেরিয়ে এসেছিল তাঁর বাড়ি থেকে।

তারপর এম-এস-সি ক্লাশে সুগত পেল ডক্টর সেনের নিবিড় সান্নিধ্য। প্রতিটি ছাত্রের ওপর কি অপরিসীম দরদ আর তীক্ষ্ণ নজর তাঁর। সবচেয়ে বড় কথা, কারো ওপর ছিল না তাঁর অধিক পক্ষপাতিত্ব। কখনো কখনো পড়াশোনার ব্যাপারে গাফিলতি দেখলে তিনি দারুণভাবে চটে যেতেন। তাঁর ধমক খেয়ে বিশেষ করে মেয়েদের চোখে জল এসে যেত। তিনি কিন্তু চোখের জল দেখলেই সান্ত্বনা দিতেন না। আরও ধমকাতেন।

তারপর হঠাৎ দেখা যেত যাকে দুপুরে ধমক দিয়েছেন, সন্ধ্যায় তার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডক্টর সেনের গাড়ি।

কই রেখা কোথায়? দ্যি বেস্ট নটি গার্ল অব দ্যি ইয়ার।

হন্তদন্ত হয়ে রেখা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডক্টর সেনের পায়ের ধুলো নিল। তার মুখে মেঘভাঙা রোদ্দুরের হাসি।

ডক্টর সেন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, রেখা, দেখছি চোখের জলের রেখাগুলো একদম মুছে গেছে। হাসিতে ঝলমল করছে মুখখানা। এ হাসি যেন আর কোনদিন না মেলায় বুঝলে?

হয়তো বসেই গেলেন রেখার বাড়িতে তাকে কোনকিছু কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দিতে।

একটি দিনের কথা মনে পড়ছে সুগতর। সায়েন্স কলেজের করিডোর দিয়ে যাচ্ছিল সে। সামনে এসে দাঁড়াল বিপাশা।

সুগতর কাছে বিপাশা অপরিচিত নয়, তাই তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সুগত।

বিপাশা যেন দম দেওয়া পুতুল। সে বলে গেল, আজ সন্ধ্যায় মা আপনাকে আমাদের বাড়িতে ডেকেছেন। রাতে ওখান থেকেই ডিনার সেরে ফিরবেন।

হেসে বলল সুগত, উপলক্ষটা জানতে পারি কি?

যিনি ডেকেছেন, তিনি জানেন। কথাটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার।

ব্যস আর দাঁড়াল না বিপাশা। উজ্জ্বল একটা পতঙ্গের মত উড়ে চলে গেল।

কি হতে পারে, এই নিয়ে ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে লাগল সুগত। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন একটা সমাধানে পৌঁছতে পারল না সে। মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল বিপাশার দিকে। বিপাশা সখিদের সঙ্গে তখন কথার স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত। একটু বেশি রকম উচ্ছল দেখাচ্ছিল তাকে।

সুগত যখন ডক্টর সেনের সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতে এসে হাজির হল তখন ঘরের ভেতর আলো ঝলমল সন্ধ্যার আয়োজন; ও দেখল তাদের ক্লাশের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ এসে গেছে। সামনের টেবিলে তাদেরই আনা কয়েক প্যাকেট উপহার সামগ্রী। ফুল হয়ত কেউ এনেছিল, দু'একটা খসে পড়া পাপড়িতে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। ফুলের উপহার নিয়ে ভেতরে চলে গেছে আজকের উৎসবের নায়িকা।

আজ খুব বিব্রত বোধ করল সুগত। তার মনেও কথাটা যে না উঠেছিল তা নয়। এমন একটা উৎসব হলেও হতে পারে। নিশ্চয়ই বিপাশার জন্মদিনের উৎসব। কিন্তু সুগত কি করে একটা অনুমানের ওপর ভর করে বিপাশার জন্যে উপহার আনবে। সবার সামনে ওকে এমন করে অপ্রস্তুত না করলেই কি চলত না। কাউকে যদি না বলে এমনি ডেকে আনত তাহলে সবার লজ্জায় একার লজ্জা ঢাকা পড়ল।

সবাইকে প্রস্তুত করে তাকে অপ্রস্তুত করে দেওয়া, এ কেমন খেলা বিপাশার। মনে মনে দুঃখ পেল সুগত। কিছু বলার নেই তার, তাই চুপচাপ বসে রইল।

কাকলী একটু বেশি কথা বলে। সে বলল, আজ কি সৌভাগ্য, শ্রীমান সুগত সরকার লেখা পড় ছেড়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছেন। আজ পয়লা শ্রাবণ সন্ধ্যাটা তাই কেঁদে কেঁদে উঠছে।

অরিন্দম সুগতর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

সবাই জানে সুগত কম কথা বলে। তাই ওকে নিয়ে একটুখানি নাজেহাল করার লোভ সামলান দায় হয়ে পড়ে সহপাঠিনীদের।

আজ সুগত কিন্তু মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিপাশার ওপর তার ক্ষোভটা এখন ছড়িয়ে পড়ল সবার ওপর।

সে বলল, শ্রাবণ সন্ধ্যার কান্নাটা কেবল আমার জন্যেই নয় কাকলী, অনেকের জন্যেই শ্রাবণ তার কান্নাটা তুলে রাখবে।

অরিন্দম ক্লাশের দ্বিতীয় সেরা ছাত্র। সবাই মনে করে সে বিপাশার প্রথম নির্বাচিত পুরুষ। অরিন্দমের ওপর বিপাশার অনেক আশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় আশ্চর্য কিছু একটা ঘটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া বুদ্ধিতে ঝকঝক করছে অরিন্দম। খরশান কথা বলতে সে ওস্তাদ। বাইরে তার আচরণের ভেতর পড়াশোনার চেয়ে আড্ডার লক্ষণটাই সুস্পষ্ট। তবু রেজাল্ট বেরোলে দেখা যায় একজন ছাড়া সবাইকে টপকে সে উঠে গেছে অনেক ওপরে। সিনেমার কোন নতুন বই তার সমালোচনার কড়া হাত থেকে রেহাই পেয়ে ফিরে যায়নি। মহানগরীর কোন্ প্রান্তের কোন্ রেস্টুরেন্ট চাইনিজ ফুডের গোল্ড মেডালিস্ট তা তার নখদর্পণে।

এ হেন সব্যসাচী অরিন্দম কাকলীর পক্ষ নিল। বলল, কাকলীকে অনেক ধন্যবাদ, সে আমাদের নির্বাক বন্ধুর ভাষার উৎসমুখ আজ খুলে দিয়েছে।

সুগতর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার এ জন্যে কাকলীর ওপর রাগ না করে ধন্যবাদ জানান উচিত।

সুগত বলল, কথা বলার একচেটিয়া অধিকার আমি নিশ্চয়ই ছিনিয়ে নিতে চাই না আমার বন্ধুর কাছ থেকে। তবে সত্যটুকুকে স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে যদি কারো কষ্টের কারণ হয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা চাইছি।

অরিন্দম এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। রেসের অব্যবহিত আগে ঘোড়াগুলো যেমন টগবগিয়ে ওঠে। সে হেসে উঠল ক্লাশের আর সবার দিকে তাকিয়ে।

বলল, অল মাইটির ভর হয়েছে আমাদের বন্ধুর ওপর।

অতসী হেসে বলল, কি রকম?

অরিন্দম বলল, মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।

সবাই হেসে উঠল। কাকলী হাসি থামিয়ে বলল, রাগ করো না সুগত। নিছক কৌতুক।

অরিন্দম অমনি বলল, কাকলীর কথা শুন না বন্ধু, রাগ না করলে অনুরাগ মেলে না।

সুগত মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে চুপচাপ বসে রইল। সে জানে, অরিন্দমের সঙ্গে কথা বলে সে পারবে না। অরিন্দম কথা বলতে বলতে সৌজন্যের সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে অনেক নীচে লাফিয়ে পড়তে পারে। সুগতর পক্ষে যা অসম্ভব।

সুগত রাগ করল না দেখে অরিন্দম ক্ষেপে উঠল মনে মনে। এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতে কোন মতেই রাজী নয় সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হলঘরে এসে ঢুকল বিপাশা।

জাপানী সিল্কের পিঙ্ক শাড়ি পরেছে সে। খোঁপায় আধফোটা একটা অসময়ের গোলাপ।

সুগতর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আজ আমার জন্মদিন, আপনি এসেছেন, খুব খুশি হয়েছি।

সাধারণ সৌজন্য থেকে কথাগুলো বলল বিপাশা। কিন্তু আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। জ্বলে উঠল অরিন্দম।

সে পুরোনো লড়াই-এর জিগির তুলে বলল, বিপাশা, আজ তোমার জন্মদিন সত্যিই সার্থক হয়েছে। আমার মূক বন্ধুকেও তুমি মুখর করেছ।

বিপাশা বিশেষ কিছু না জেনেও হাসিতে ভরে তুলল তার মুখ।

সুগত বিপাশার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আজ অরিন্দমকে বাক্‌যুদ্ধে পেয়েছে। ও লড়াই না করে কিছুতেই থামবে না।

পুলক অমনি বলে উঠল, এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই কোরাস ধরল, এ লড়াই লড়তে হবে। এ লড়াই জিততে হবে।

দু' লড়িয়েকে লড়াই এ লাগিয়ে দেবার জন্যে ওরা তখন তৃতীয় পক্ষ সেজে তাল ঠুকছে।

অরিন্দম বাঁ হাতখানা অন্য বন্ধুদের দিকে তুলে মুখে বলল, থাম্। লড়াই হয় সমানে সমানে। অসমানে লড়াই অচল।

সুগত বলল, আমি মানছি ভাই। আর এও বলছি লড়াই দেখবার শখ যাদের তারা নিজেরা আসরে নেমে এক এক হাত লড়ে যাও। আমার লড়াইযের ক্ষমতাও নেই আর ইচ্ছেও নেই।

অরিন্দম বলল, অনিচ্ছায় এত দূর, না জানি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে আরও কত দূর গড়াবে।

লঘু হলেও একটা তর্কের পরিবেশ গড়ে উঠছে দেখে বিপাশা বলল, খাবার আয়োজন আমার সামান্য, লড়াই করে ক্ষিদে বাড়ালে আমার দীন ভাণ্ডারে কিন্তু কুলিয়ে উঠবে না।

অরিন্দম বলল, আজ তোমার জন্মদিন বিপাশা, আজই তো পিপাসা মেটাবারও দিন। এমন দিনে তোমার কৃপণতা মানায় না।

বিপাশা চোখে মুখে অরিন্দমকে শাসনের একটা লঘু ভঙ্গি তুলে ফিরে দাঁড়াতেই হলঘরটা উচ্ছ্বসিত হাসি আর করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়ল।

এবার ঘরোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিল বন্ধুরা। একুশটি মোমবাতি জ্বলবে বিপাশার জীবনে একুশটি বর্ষা ঋতুকে স্মরণ করে। দশটি বন্ধু এসেছে সর্বসাকুল্যে। সবাই দুটি করে জ্বালিয়ে দিলে। এখন শেষ একটি বাকী। কে জ্বালাবে এই বাতি। সবাই জানে অরিন্দমই সেই পুরুষ যে পেয়েছে অতিরিক্ত একটি জ্বালাবার অলিখিত অধিকার। কিছু সময় সবাই চুপচাপ। যেন একটা অদৃশ্য নিষেধ সবাইকে বেঁধে রেখে দিয়েছে।

সুদীপ্তা বলল, যাও অরিন্দম, বাতি জ্বালানোর কাজটা তোমার হাতেই শেষ হোক্।

বিপাশার দু'চোখেও মিনতির একটা সকরুণ ছবি ফুটে উঠল।

অরিন্দম বুঝি এক পা এগিয়েছিল। তারপর পিছু হটে বিপাশার দিকে ফিরে বলল, দোহাই তোমার, আজকের এই শুভ দিনটিতে তুমি আমাকে শত্রু করে দিও না। তিনটে জ্বালিয়ে কিছুতেই চিরদিনের জন্যে তোমার বিরাগভাজন হতে চাই না।

বড় সমস্যায় পড়ল সবাই। অরিন্দমের এ ধরনের কথা বলার পরে কেউ আর এগিয়ে গিয়ে শেষ বাতিটা জ্বালতে চাইল না।

সুগতর কোন সংস্কারই ছিল না। তবে আগ বাড়িয়ে কোন কিছু করতে যাওয়া ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। এখন সে দেখল বিপাশা অসহায়ের মত তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। সুগত কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। বিপাশার হাত থেকে জ্বলন্ত প্রদীপটা নিয়ে সে শেষ বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। প্রদীপটা এবার বিপাশার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, যে বাতিওলা রোজ রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তাকে আমরা কেই বা মনে রাখি। সে হতভাগা কোন্ দূর অন্ধকার শহরতলীর একটা ভাঙা টালির ঘরে হয়ত বাস করে। আমি আজ তোমার জীবনের একবিংশতিতম বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে ঐ অখ্যাত বাতিওয়ালার ভূমিকাই পালন করলাম। নামহীন গোত্রহীন ভেবে আমাকে তোমার অপরিচয়ের অন্ধকারে ফেললে ততটা দুঃখ পাব না যতটা পাব আমাকে আজকের শুভ দিনটিতে শত্রু বলে ভাবলে।

সুগতর কথা শেষ হলে সবাই তাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল।

অরিন্দম হেরে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। সে অমনি বলে উঠল, বন্ধু সুগতব কথাগুলো বড় চেনা চেনা ঠেকছে। কোন এক বিখ্যাত কবির কবিতার গদ্যরূপ বলে মনে হচ্ছে।

কাকলী জুগিয়ে দিলে, সুকান্তের।

সবাই এতক্ষণে আবিষ্কার করল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাকে হাত সাফাই করে চালিয়েছে সুগত।

সুগত বলল, তোমাদের জানার পরিধি যে অনেকখানি তা আমার অজানা নয়। তাছাড়া অরিন্দমের মত অরিজিনাল কথা বলার সাধ্য কি আমার। তবে যে কোন জীবন-সন্ধানী কবির কথাকেই আমি সবার কথা বলে জানি। সুকান্তের কথা শুধু যদি সুকান্তেরই হত তাহলে তাকে এমন করে মনে রাখার দরকারই হত না। সে তার কবিতার থেকে নিজের স্বত্বটুকু ছেড়ে দিয়েছে বলেই আজ সবার মনে, সবার কথায় ঠাঁই পেয়েছে।

অতসী বলে উঠল, ওয়ান্ডারফুল।

অরিন্দম কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আর বলা হল না। পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস সেন। চেহারার ভেতর আভিজাত্য আছে। সে আভিজাত্য প্রশান্ত গাম্ভীর্যের স্পর্শ মাখা। এসেই বললেন, বিপাশা খাবার তৈরি, বন্ধুদের নিয়ে এসো।

সুগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, তাই বিপাশাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলাম তুমি যেন নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এসে দেখা কর।

সুগত এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল মিসেস সেনকে। একে একে সবাই তখন প্রণাম করতে লাগল বিপাশার মাকে। বিপাশা পরিচয় করিয়ে দিলে সবার সঙ্গে তার মায়ের। মৃদু হেসে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বললেন, আজ বিপাশার জন্মদিনে তোমাদের দেখে খুব আনন্দ পেলাম। মনে হচ্ছে, বিদেশ বিভুঁয়ে কাজকর্ম নিয়ে যে সব ছেলে-মেয়েরা পড়ে থাকে তারা হঠাৎ কোন উৎসবের বাড়িতে মায়ের কাছে এসেছে।

অতসী বলল, মাসীমা, আপনার কথা শুনে খুব ভাল লাগল। আমরা বিপাশার বন্ধু, আপনার ছেলে মেয়ে ছাড়া আর কি।

অরিন্দম নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, আপনাকে দেখে আমার শুধু একটি ছবিই মনে পড়ছে, ম্যাডোনা।

নিজের আবিষ্কারের আনন্দে সে যেন বেশ একটু গর্বিত। এমনি ভাব করে তাকাতে লাগল বন্ধুদের দিকে।

মিসেস সেন তাকালেন অরিন্দমের দিকে। তাঁর মুখে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ছাড়া অন্য কোন ভাব ছিল না। বিপাশাকে বললেন, কি নাম তোমার বন্ধুটির।

অরিন্দম বসুরায়।

মিসেস সেন অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, মাকে মা বলেই জানতে হয় তাহলেই সম্পর্কটা সহজ হয়ে যায়। ম্যাডোনা, যশোদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মায়ের স্বাভাবিক ছবিটা অনেকখানি কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

অরিন্দম মাথা নিচু করল। তার মনে হল, আজকের দিনটা তার পক্ষে বড়ই অশুভ। পরাজয়গুলো যেন মিছিল করে তার ওপর এসে পড়ছে। বিশেষ করে সব ব্যাপারটা ঘটছে বিপাশারই সামনে।

বিপাশা পরিস্থিতিটা ঘোরাবার জন্য বলল, জানো মা অরিন্দম আমাদের ক্লাশের একজন সেরা ছেলে। সব দিক থেকেই।

মিসেস সেন অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরও কৃতী হও।

কথা কটি বলে আর একবার খাবার টেবিলে বসবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

সুগত বিপাশাকে বলল, তোমার বাবা কি ওপরে স্টাডিতে রয়েছেন?

বিপাশা মাথা নেড়ে জানাল যে সুগতর অনুমান ঠিক।

একটু দেখা করে আসি। তোমরা বস, আমি আসছি।

সুগত চলে গেল ডক্টর সেনের স্টাডিতে। তিনি তখন কি যেন নোট করছিলেন।

পায়ের সাড়া পেয়ে তাকালেন। যেন অবাক হয়ে গেছেন সুগতকে দেখে।

বস বস সুগত। এমন বৃষ্টি মাথায় করে এসেছ। কিছু দরকার থাকলে কালও তো-আমাকে বলতে পারতে।

আমি বিপাশার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এসেছি।

ওহো, একেবারে ভুলে বসে আছি। তোমার মা কয়েক বারই মনে করিয়ে দিয়ে গেছেন। জানো সুগত, এই ভোমরাগুলোর চরিত্র নিয়ে লেখা বইখানা পড়ছিলাম। এখন দেখছি ঐ ভোমরাগুলোই সব কিছু ভোঁ ভাঁ করে দিয়ে গেছে।

নিজের রসিকতায় নিজে হা হা করে হেসে উঠলেন।

চল যাই তোমার ক্লাশের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি। রোজকার দেখাশোনা আর আজ বিশেষ দিনটির দেখাশোনার ভেতর তফাৎ আছে বইকি।

ডক্টর সেন উঠতে যাচ্ছিলেন। সুগত বলল, ওরা ডাইনিং রুমে রয়েছে। বসে পড়লেন ডক্টর সেন।

এখন তাহলে থাক। আমাকে দেখলে ওরা অস্বস্তি ফিল করতে পারে। না পারবে ভাল করে খেতে না পারবে কথা বলবে।

তারপর খানিক সময় চুপ করে থেকে বললেন, বস সুগত, দেখ মৌমাছিদের দিক চিনে ফুলের কাছে যাওয়া আবার নির্দিষ্ট পথে ফিরে আসার কি আশ্চর্য ক্ষমতা। ওদের যাওয়া—আসা ঠিক যেন একটা জ্যামিতির পথ ধরে চলেছে।

সুগত বলল, আমি যদি আপনার সঙ্গে খেতে বসি তাহলে এটুকু বুঝে নিতে পারব।

নিশ্চয় নিশ্চয়!

ডক্টর সেন বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, সুগতর খাবারটা এখন দিও না, ও আমার সঙ্গে টেবিলে বসবে।

সবার কানেই কথাটা পৌঁছল। সবচেয়ে খুশি হল অরিন্দম। সুগতর উপস্থিতিটা সে যেন আর সইতে পারছিল না।

এদিকে গুরুশিষ্যে কিছুক্ষণ ধরে চলল পতঙ্গ চরিতাবলী পাঠ, ব্যাখ্যা সহযোগে। চিরদিনই সুগত কৌতূহলী। গভীর জিজ্ঞাসু মনটা তার পঠন-পাঠনের সময় জেগে থাকে। ওতেই ডক্টর সেনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের স্পৃহা বেড়ে যায়।

বিষয়টা শেষ হয়নি তখনও ঘরে এসে ঢুকলেন মিসেস সেন।

বললেন, ছেলেটা কি আজও তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। খাবার টেবিলে তুমি ওকে আটকালে। এখন আবার পড়েছ পোকামাকড় নিয়ে।

ডক্টর সেন অপরাধীর মত উচ্চারণ করে চললেন, ঠিক কথা, আর নয়, আর নয়। সুগত তুমি বরং আগেভাগেই খেয়ে নাও।

এখন নয়। ওদের শেষ হয়ে এল বলে। তারপর তোমরা দুজনে বসবে একসঙ্গে।

কথা কটি বলে চলে যাচ্ছিলেন মিসেস সেন। দরজার একটু আগে ফিরে দাঁড়ালেন।

ওদের খাবার পরে তোমাদের খেয়ে উঠতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এত রাতে হোস্টেলে ফিরে কাজ নেই সুগত। আজ এখানেই থাকবে।

মিসেস সেন প্রতিপক্ষের কোন বক্তব্য শোনার জন্য দাঁড়ালেন না, একতরফা রায় দিয়েই চলে গেলেন।

মিসেস সেন চলে গেলে ডক্টর সেন বললেন, পড়াশোনাটা আমাদের কাছে একটা মানসিক ফুড। ওতে ব্রেন ট্যাক্সড হয় না, বরং বিক্ষিপ্ত মনটা কনসেনট্রেটেড হবার সুযোগ পায়।

একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, আজ থাক। উনি যখন মানা করে গেলেন তখন আর নয়।

কথা কটি বলে ডক্টর সেন বক্তব্য বিষয়টা অসমাপ্ত থাকার জন্য কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

সুগত ডক্টর সেনের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পেরে বলল, আর বড় বেশি একটা বাকি নেই, এটুকু খেতে বসার আগেই আমরা আলোচনা করে নিতে পারব মনে হচ্ছে।

ডক্টর সেন হাতের ইসারায় সুগতকে বসতে বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন। সুগত পাশের জানালা দিয়ে দেখতে পেল, ডক্টর সেন ঝুল বারান্দায় অনেকখানি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

সুগত বুঝল, ডক্টর সেন, মিসেস সেনের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই নির্ভয়ে পড়াশোনায় বসতে চান।

ফিরে এলেন ডক্টর সেন। সম্ভবতঃ মিসেস সেনের সঠিক নিশানা তিনি তখনও পাননি। সুগত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে বলল, আজ থাক, বরং কাল ওটা আমি আপনার কাছ থেকে ইউনিভারসিটিতে এক সময় বুঝে নেব।

ডক্টর সেন বললেন, সেই ভাল সুগত।

এরপর উনি নিজেই সায়েন্স জার্নালখানা হাতে তুলে নিয়ে মুহূর্তে ডুবে গেলেন।

সুগত চলে এল বিপাশার পড়ার ঘরে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। আজ বিপাশার জন্মদিনে সবাই উপহার এনেছে, কেবল সে-ই আনতে পারেনি। বলা যেতে পারে তাকে আনতে দেওয়া হয়নি। এ আচরণ কেন করতে গেল বিপাশা। সে কি চাইছিল না তার উপস্থিতি এমন একটা দিনে। যখন মিসেস সেন অনুষ্ঠানের শেষে নেড়ে চেড়ে দেখবেন বন্ধুদের আনা উপহারগুলো তখন সেখানে দেখা যাবে না সুগতর সামান্য কোন উপহার। দৃশ্যটা কল্পনা করে খুব খারাপ লাগল সুগতর। সে বিপাশার টেবিল থেকে প্যাডটা টেনে নিয়ে ভাবতে বসল কিছু লেখার কথা।

বৃষ্টি থেমে গেছে। জানালার বাইরে দেখা যাচ্ছে আকাশ। চাঁদটা তারাদের নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক পাহাড়প্রমাণ মেঘের ভেতর থেকে। আকাশটা নীলচে কালো। এ যেন শ্রাবণের বৃষ্টির ধ্বনিভরা রাত নয়।

সুগত লিখল ঃ

তোমার জন্মদিনে সামান্য স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবার সুযোগ তুমি দিলে না। মূল্যবান কিছু দেবার সামর্থ্য না থাকলেও প্রিয়জনের হাতে প্রীতির নিদর্শনভরা কিছু দিতে পারলে তৃপ্ত হত মন। সে সুযোগ যখন আর নেই তখন নিছক একটি কবিতা রেখে গেলাম। একে জন্মদিনের উপহার বলে জোর করে চালাতে গেলে হতভাগ্য কবির ভাগ্যে হয়ত ঘটবে বিদ্রূপ। তাই সংকোচে দিয়ে গেলাম। একান্ত তোমার জন্যে। পাঁচ জনের চোখের কৌতুকে এই সামান্য কবিতার যেন প্রাণান্ত না ঘটে, এই প্রার্থনা।

বিপাশার উদ্দেশে ঐটুকু ভূমিকা করেই কবিতাটা লিখে ফেলল সুগত।

প্রজাপতি।।

কালচে নীল ডানা ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে,
তারার বুটিগুলো জ্বলছে মরা সোনার মত
মাঝখানে শুক্লা তিথির কলাপূর্ণ চাঁদ।
কাঁপছে ডানা,
আলোয় হাওয়ায় অন্ধকারে দুলছে নিসর্গ।
সে প্রজাপতি আসছে অনেক দূর থেকে
আলোর গাঙে যেখানে লেগেছে হাওয়ার জোয়ার
সেখানে ঘন নীল পাল তুলে
এগিয়ে আসছে সে প্রজাপতি।
কিন্তু অবাক করেছে সে
ভেঙে দিয়েছে সব নিয়মের শাসন।

অনেক দূরের বিন্দু থেকে
সে উঠছে না বৃহৎ হয়ে ;
সে আসছে নিজের নিয়ম রচনা করে
অনেক বড় থেকে ছোট হয়ে।
সে চিত্রিত প্রজাপতি
আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে
চোখের তারার ভেতর হারিয়ে গেল।

কবিতাটা লিখে সে বিপাশার পড়ার টেবিলেই রেখে দিলে।

রাতে শুয়েছিল সুগত। অনেকক্ষণ ঘুম এল না চোখে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুন গুন করে গাইছিল বিপাশা। কানে ভেসে আসছে সুরের কাজগুলো, সকরুণ বৃষ্টির বিন্দু ভরা। বড় মগ্ন হয়ে গাইছে বিপাশা। শ্রাবণ রাতের গান।

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারারাতি
অনিমেষে আছে জেগে।।

সুগতর মনে হল বিপাশা সুন্দর। তার জীবনে বুঝি এই প্রথম দিন যে দিনটিতে ভাল লাগার একটা অনুভূতি তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হল, জুলজি বই এর থেকে বেরিয়ে ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে চলেছে চারদিকে। রঙ ছড়িয়ে, পাখার ওড়না উড়িয়ে সে কি নাচ তাদের। কয়েকটা সুগতকে ঘিরে একটি সুন্দর ব্যালে নাচের আসর জমাল। গুন গুন গুন গুন সুর তুলে এল কারা! ছাড়া পেয়েছে মৌমাছির দল। আর তারা বই এর ভেতর বন্দী থাকবে না। সুগতর মনে হল, সবাই তাকে বলছে, কখনো বইএর শুকনো কটা পাতার ভেতর নাচকে থামিয়ে রাখতে নেই। বই এর পাতা ছেড়ে বনে বনে মৌমাছি আর মধুর খোঁজে ফিরতে হয়।

সুগত জানালার ফাঁকে তাকিয়ে রইল। বিপাশাকে মনে হল তার আশ্চর্য রঙীন এক প্রজাপতি।

পরের দিন ডক্টর সেনের সঙ্গে দেখা হল সুগতর ইউনিভারসিটিতে, কিন্তু সে তখন ভুলে গেছে গত রাতের বাকি পড়াটুকু বুঝে নেবার কথা।

আজ বড় বেশি করে তাকাতে ইচ্ছে করছিল তার বিপাশার দিকে। মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ আশা লঘু মেঘের মত ভেসে এসে আবার উড়ে চলে যাচ্ছিল। বিপাশা কি একটিবারও আজ তাকাবে না তার দিকে। না থাক কোন চাওয়া বিপাশার মনে, তবু অকারণ একটু চোখাচোখি হতে ক্ষতি কি। সে একটি মুহূর্তের জন্যে দেখতে চায় বিপাশাব চোখের ছবি। সেখানে সে দেখে নেবে কাল রাতের কোন ছায়া পড়েছে কি না।

শেষ ঘণ্টায় স্পেশাল পেপার এন্‌টোমলজির ক্লাশ। এ ক্লাশে সুগতর সঙ্গে বিপাশার যোগ। অরিন্দমের স্পেশাল পেপার ফিসারি। বিপাশা অবিন্দমের মত স্পেশাল পেপার ফিসারি রাখতে চেয়েছিল কিন্তু ডক্টর সেনের নির্দেশে এন্‌টোমলজিতেই থেকে যেতে হল তাকে।

এই দুটো স্পেশাল পেপারের বন্ধুদের ভেতর কিছু কৌতুক রসিকতা চলে।

ফিসারির ছাত্রীদের এন্‌টোমলজির বন্ধুরা বলে 'মেছুনি' : ওরাও উল্টে এ পক্ষের ছেলেদের ডাকে 'মাকড়' বলে।

করিডোরে চলতে চলতে কোন মেয়ে হয়ত ফিসারির ছেলেকে দেখে বলে উঠল, এই যে গভীর জলের রুই, ক'দিন পাত্তা নেই, বলি ব্যাপার স্যাপার কি?

ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে কীট পতঙ্গ বিভাগের মেয়েকে উত্তর দিল, গিয়েছিলাম বুনো মৌমাছির খোঁজে।

অমনি মেয়েটি ফোড়ন কাটল, হুল ফুটিয়ে দিয়েছে তো?

ছেলেটি বলল, তা আর বলতে। তবে জ্বালা ধরতে দেয়নি, তার আগেই কিছু মধুর বরাদ্দ হয়েছে।

অন্য কোনদিন হয়ত ফিসারির ছেলে এন্‌টোমলজির একটি মেয়েকে বলে উঠল, এই যে শ্রীমতী প্রজাপতি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

মেয়েটি হেসে উত্তর দিল, ফুলের বনে।

কোন্ ফুল?

গোলাপ।

ছেলেটি বলল, বড় যে কাঁটা সেখানে।

মেয়েটি উত্তর করল, তা হোক, আমার কাঁটাই সই। সে ফুলেই হোক আর মাছেই হোক। বেলে মাছগুলো আমার দু'চোক্ষের বিষ।

এমনি সতীর্থে সতীর্থে নানা হালকা রসালাপ। ওরা কীটপতঙ্গ আর মাছেদের ভেতর থেকে পরস্পরের নাম দিয়ে রেখেছে। ঐ নামেই একের কাছে অন্যের পরিচিতি। পরস্পরের নামের আদ্য অক্ষর নিয়ে এই নামকরণ। যেমন নবারুণ ঘোষের নাম 'ন্যাদোস'। তপন গুহের নাম 'তপসে'। ললিত সেনের নাম 'ল্যাঠা'। চিন্ময় পাত্রের নাম 'চিংড়ি'।

চিন্ময় আপত্তি তুলেছিল, চিংড়ি ফিসারি ডিপার্টমেন্টে পড়ে না। ওটা আসলে মাছই নয়।

সবাই ওকে চেপে ধরেছিল। ওদের মধ্যে কেউ বলেছিল, তামাম দুনিয়ার মৎস্যকুল লোপ পেয়ে যায় যাক্, তবু চিংড়ি মাছ, মাছ হয়েই থাক। চিন্ময়ের আপত্তির অবশ্য অন্য কারণ ছিল। সে ছিল রোগা, আর কথায় কথায় উঠে দাঁড়াত ; ছটফট করত। বন্ধুরা তাই বেচারার ভাগ্যে চিংড়ি নামটিই বরাদ্দ করেছিল।

মেয়েরাও বাদ যায়নি। বিনতার নাম ছিল 'বেলে'। প্রায়ই সে ক্লাশ পালাত।

তাই তাকে দেখতে পেলেই বন্ধুরা ক্ষ্যাপাত।

এই যে 'বেলে'
কখন এলে
কখন গেলে
জাস্তি পারলাম না।

মণিকা সান্যালকে ছেলেরা ক্ষ্যাপাতে চেষ্টা করত 'মাগুর' মাছ বলে। মণিকার রঙটা ময়লা ছিল, তাই কোন নিপুণ নামকরণবিদ তাকে এই নামটাই দিয়েছিল।

এতে কিন্তু মণিকা একটুও রাগ করত না।

কেউ যদি বলত, এই যে 'মাগুর' মৎস্য, বলি দাম আর কত বাড়াবে?

অমনি মণিকা হেসে উত্তর দিত, তবু তো ছাই মেখে আসিনি।

অর্থাৎ মণিকা পাউডার প্রসাধনে ভূষিতা হয়ে আবির্ভূতা হননি। তা হলে দাম আরও দু'তিন গুণ বেড়ে যেত।

কীটপতঙ্গ বিভাগের ছেলে মেয়েদের নামও এমন বিচিত্র। প্রণতি দাসের নাম ছিল প্রজাপতি। সে খুব রঙীণ শাড়ি পরে রোজ আসতে ভালবাসত।

গোপাল বসাকের নাম ছিল 'গুব্‌রে'। উপানন্দ সেনকে ছেলেরা 'উচ্চিংড়ে' বলে আপ্যায়ন করত।

এমনি নামাবলী গায়ে চড়িয়ে ঘোরাফেরা করত ডক্টর সেনের জুলজি ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা।

সেদিন শেষ ঘণ্টায় এন্‌টমোলজির ক্লাশে মুখোমুখি হল সুগত আর বিপাশা। ক্লাশে তখনও প্রফেসার আসেননি। তিনটি মাত্র মেয়ের মধ্যে দুটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় কি একটা মিছিল দেখছিল। ছেলেরা তখনও বেপাত্তা। সুগতর কাছে এগিয়ে এসে বিপাশা তার হাতে একখানা খাম দিয়ে নিজের সিটে ফিরে গেল।

সুগতর সেই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল বন্ধ খামখানা খুলে পড়ে। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে খাতার ভেতর সেখানা রেখে দিল।

প্রফেসার এলেন। পড়াতে শুরু করলেন। সুগতর কানে কিন্তু এই প্রথম দিন কোন কিছু পৌছল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, শেষের ঘণ্টাটা কি দীর্ঘ।

ক্লাশে সুগত একবারও আর তাকাল না বিপাশার দিকে। না জানি চোখাচুখি হলে যদি বিপাশার মুখে সে অন্য ছবি দেখতে পায়। যদি দেখে বিপাশার চোখে ঘৃণা কিংবা বিদ্রূপ। কাল রাতের বর্ষাধোয়া পরিবেশে যে কবিতা সে লিখে এসে মনে মনে তৃপ্তি পেয়েছিল আজ দিনের রূঢ় আলোয় তার কাছে তা কেমন যেন অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল।

হোস্টেলে না যাওয়া পর্যন্ত মন শান্ত হল না সুগতর।

নিজের পড়ার টেবিলটিতে খামখানা রেখে সুগত ভাবতে লাগল, চিঠি খুলে সে কি দেখতে পাবে। হয় তার কবিতার জন্যে কিছু পরিমাণ সৌজন্য প্রকাশ, নয়ত ভর্ৎসনা। যা হোক, কবিতা যখন সে লিখে এসেছে তখন পুরস্কার তিরস্কার দুটোর যে কোন একটার জন্যে তাকে তৈরি থাকতেই হবে।

চিঠিখানা খুলে এবার পড়তে লাগল সুগত। কোন সম্বোধন নেই।

আপনার কাল রাতের কবিতা আর চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে আপনার যে অনুযোগ, সে সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই, কেবল মাপ চেয়ে নেওয়া ছাড়া। তবু একটুখানি না বললে হয়ত আপনার ক্ষোভ যাবে না, তাই বলি, মায়ের ওপর রাগ করেই জন্মদিনের কথাটা আপনার কাছে বলিনি। মা আপনাকে বিশেষ করে ডেকে আনতে বলেছিলেন, যেটা সে সময় আমার কাছে ভাল লাগেনি। তাই আপনাকে ডাকার ব্যাপারে একটুও সহজ হতে পারিনি। সে কথা থাক্, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। যদি অসুবিধে মনে না করেন তাহলে আগামী কাল প্রিন্সেপ ঘাটে ইউনিভারসিটি ছুটির পর একবার কিছু সময়ের জন্যে চলে আসুন। বিপাশা।

পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখেছে ঃ

আপনার কবিতার নীল প্রজাপতি সুন্দর। বাইরে থেকে সে কবির মনের গভীরে প্রবেশ করেছে।

পরের দিন ইউনিভারসিটির ক্লাশ শেষ হতেই সুগত গেল প্রিন্সেপ ঘাটে। তার জন্যে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল বিপাশা। সুগতর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই সে একটু মিষ্টি করে হাসল। সুগত আরও কাছাকাছি এলে বিপাশা বলল, বড় ভীড় জমেছে এখানে, চলুন হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে যাই।

সুগত আর বিপাশা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জীবনে কোন তরুণীর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটার অভিজ্ঞতা এই প্রথম সুগতর। সে কেমন যেন একটা অচেনা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল।

ওরা এসে পৌছল ফোর্টের কাছ বরাবর একটা উঁচু ঢিবির ওপর। কি যেন একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। তার তলাটাতে ঘাসের জাজিম বিছানো। মাটি কিছুটা শুকনো হলেও একেবারে খটখটে নয়। বর্ষাকালে এটুকুই যথেষ্ট। বিপাশা জায়গাটা একটুখানি পরীক্ষা করে নিয়ে বলল, আসুন বসা যাক্।

দু'জনে বসল। সুগত নির্বাক। অবশ্য আমন্ত্রণটা বিপাশার। বক্তা মুখ্যতঃ সেই। সুগতর ভূমিকা আজ শ্রোতার।

বিপাশা বলল, আপনাকে এখানে আমার ডেকে আনা ঠিক হয়েছে কি না জানি না তবে না ডেকে আমার উপায় ছিল না।

সুগত বলল, যা বলার অসংকোচে বলতে পার। আমি অনেক দিন থেকে নিজেকে বড় অপরাধী ভাবছি। তোমার বাবা-মা আমার জীবনে কতখানি সে তো আমি ছাড়া কেউ জানবে না। অথচ দেখ তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকে তুমি বলে ডাকলেও সাধারণ পরিচয়ের ওপরে কোনদিনই আমরা উঠতে পারলাম না।

বিপাশা বলল, আমারও ঠিক সেই একই কথা। ক্লাশের যে কোন ছেলের চেয়ে আপনার সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব বেশি হওয়া উচিত ছিল না কি? অথচ দেখুন, আমরা এখন কত দূরে সরে আছি।

সুগত বলল, তুমি তো জান বিপাশা আমি বেশি কথা কোনদিনই বলতে পারি না। মনে মনে কোন বিষয়ে দুঃখ পেলেও সে দুঃখটুকুকে একান্ত আপনার করেই রাখতে ভালবাসি। কারো কাছে প্রকাশ করে অকারণে তার দুঃখ বা বিরক্তির কারণ হতে চাই না।

বিপাশা বলল, আমার অভিযোগ ঠিক সেইখানেই। আপনি আমার পরিবারে যে অধিকারটুকু পেয়েছিলেন তাকে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারেননি, তাই আপনার আমার মাঝে ব্যবধানটা ধীরে ধীরে বেড়ে গেল।

সুগত চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তাপর এক সময় বলল, আগেই তো আমি আমার অপরাধের কথা মেনে নিয়েছি বিপাশা। তবু একটা বিষয়ে আমার সামান্য কিছু বলার থাকতে পারে। আশা করি তুমি তোমার সহানুভূতি দিয়ে সেটুকু বোঝার চেষ্টা করবে।

বিপাশা চেয়ে রইল সুগতর মুখের দিকে।

সুগত একটু থেমে বলল, আমার মা বাবা যে কেমন ছিলেন তা আমি জানি না বিপাশা। তাঁদের আকার যেমন আজ আমার কষ্ট কল্পনার বিষয়, তাঁদের স্নেহ ভালবাসাও ঠিক তেমনি। তাঁরা যতখানি আমার কল্পনার, তোমার মা বাবা ঠিক ততখানি আমার কাছে বাস্তব। তবু পারলাম না তাঁদের অগাধ স্নেহে ডুবে যেতে। প্রতি মুহূর্তে কেমন যেন মনে হত, আমি একক, আমি একেবারে আলাদা। তাঁদের ভালবাসায় আমার অধিকার, এ জোরটুকু যে কোন কারণেই হোক আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব হল না। তাই স্নেহের দাবীর বদলে কৃতজ্ঞতার প্রকাশই ঘটল আমার মধ্যে বেশি। মনে হয়, যে কোন আশ্রিতের পক্ষে নিজেকে করুণার পাত্র বলে একটিবারও না ভাবা সম্ভব নয়। তাই যখনই তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মন আমার উৎসুক হয়েছে তখনই একটা ভাবনা আমার মনের গভীর থেকে উঠে এসেছে। সে ভাবনাটা তোমার বাবা-মার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। মনে হয়েছে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলি তাহলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে তাঁদের প্রতি।

ওরা দুজন বসে রইল কিছুক্ষণ। হাওয়া দিচ্ছিল। গঙ্গায় একটা জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করল। বিপাশা হাঁটুর ওপর থুতনিটা ঠেকিয়ে বসেছিল, সে এবার মুখ তুলল। সুগতর দিকে তাকিয়ে এই প্রথম তাকে তুমি বলে সম্বোধন করল।

তোমার দুঃখ বুঝি সুগত কিন্তু বল আমার দুঃখ আমি কাকে জানাই। জন্মদিনের রাতে তোমার কাছ থেকে ঐ এক টুকরো কবিতা পেয়ে সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। কেবল ঐ আকাশের মেঘগুলোর মত এলোমেলো অজস্র ভাবনা আমার মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে।

থামল বিপাশা। সুগতর মন সেই মুহূর্তে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মত ফুটে উঠল। তবু সে নিজেকে সংযত করে বসে রইল।

বিপাশা বলতে লাগল, সেদিন তোমার লেখাটুকুই ছিল আমার কাছে সব সেরা উপহার।

সুগত মৃদু হাসল। তারপর বলল, আজ কিন্তু আমি আমার জন্মদিনের উপহার পেয়ে গেছি।

বিপাশা কিছু না বুঝে অমনি বলে উঠল, আজ তোমার জন্মদিন বুঝি?

সুগত হেসে বলল, যে দিনটিতে আমার জন্ম হয়েছিল সে দিনটি আমার কাছে কি করে স্মরণীয় হতে পারে বল। সেদিন সম্পূর্ণ বোধহীন একটা অন্ধকারের ভেতর আমার কেটেছে। আজ এই মুহূর্তে জীবনের যে আলোটুকু আমাকে ছুঁয়ে গেল তাতেই আমি নতুন করে জন্ম নিলাম। তাই বলছিলাম, আজই আমার জন্মদিন। আর তুমি আমাকে এই প্রথম 'তুমি' বলে উচ্চারণ করলে, এর চেয়ে বড় উপহার আমার কি হতে পারে।

বিপাশা কিছুক্ষণ সুগতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমার জন্মদিনের শেষ দীপের শিখাটা তুমি কেন জ্বালিয়ে দিলে সুগত। সে আলোর শিখা যে একটিমাত্র ফুঁতে নেবানো যায় না। আমার সমস্ত পুরাতন জীবন সে আলোয় ছায়ার মত দূরে সরে যাচ্ছে। সেই আলোর সামনে এসে আজ দাঁড়িয়েছে নতুন দিনের এক অতিথি। আমার সমস্ত মন প্রদীপ হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করতে চাইছে সুগত।

হঠাৎ সুগতর চোখের সামনে বিপাশার জন্মদিনের সেই দীপ জ্বালানোর ছবিটা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে দূরাগত ধ্বনির মত বাজল অরিন্দমের কথাগুলো, 'দোহাই তোমার আজকের এই শুভদিনটিতে তুমি আমাকে শত্রু করে দিওনা।'

কথাগুলো সুগতর কানে বেজে উঠতেই একটা আশ্চর্য ভাবান্তর দেখা গেল তার মধ্যে। একটু আগে যে সুগত বিপাশার সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে এই মুহূর্তের সুগতর যেন কোন মিল নেই। অরিন্দমকে তার বড় অসহায় বলে মনে হতে লাগল। যে অরিন্দম এতকাল বিপাশাকে তার নিপুণ কথা দিয়ে গড়া প্রাসাদখানার ভেতর ইন্দ্রাণীর মর্যাদায় রেখেছিল আজ সেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিপাশা। সুগতর মনে হল বঞ্চিত অরিন্দমের দুঃখগুলো যেন একা অরিন্দমের নয়, তাকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে সে দুঃখ। কিন্তু বিপাশার মত মেয়ে অরিন্দমকে করবে প্রতারণা! যে বিপাশা একটা সুন্দর কবিতা পড়ে মগ্ন হতে পারে, সে কি করে প্রতারকের ভূমিকা নিতে পারে! তাছাড়া আর একটা চিন্তাও ধীরে ধীরে তার মনকে অধিকার করল। আজ সে যদি অরিন্দমকে দুঃখ দিয়ে, পরাজিত করে বিপাশাকে ছিনিয়েও নেয়, আগামী কোনদিন এমনি করে আর কারো হাতে যে তার পরাভব ঘটবেনা সে কথা কে বলতে পারে। সুগতর মনে হল, এই সুন্দর মেয়েটিকে সে ছোট হতে দেবে না কোনমতেই। একটা মুহূর্তের উত্তেজনাই মানুষের জীবনের সব নয়। যে সাময়িক লোভকে সুগত এই মুহূর্তে জয় করে নিতে পারল, বিপাশাও এমনি করে তার দুর্বলতাকে দূর করতে পারবে, একথা মনে হল সুগতর।

এই শুভ চিন্তা সুগতর মনে অনেক শক্তি এনে দিল। সে বিপাশার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ একটি প্রার্থনা আছে তোমার কাছে, কথা দাও তা তুমি পূর্ণ করবে।

বিপাশা বলল, প্রার্থনা কথাটা আজ বড় করুণ শোনাচ্ছে সুগত ; তার চেয়ে বল, দাবী।

সুগত বলল, যে ভাষাতে তাকে সাজাই না কেন শেষ পর্যন্ত তা তোমার কাছে চাওয়াই হয়ে দাঁড়াবে।

বল কি আজ আমার দেবার আছে তোমাকে?

বড় বড় দুটো চোখ তুলে তাকাল বিপাশা।

আমাকে তুমি তোমার চিরদিনের বন্ধু করে নাও বিপাশা। অরিন্দম থাক তোমার নিত্যদিনের সঙ্গী। কাউকে দুঃখ দিয়ে আমি সুখী হতে চাই না। তোমাকে একান্ত করে পেতে চাই বলেই এমন করে দূরে রাখতে চাইছি। তুমি তোমার হাতটি একবার আমাকে নির্ভয়ে ধরতে দাও বিপাশা। শুধু বল, তুমি আমার বন্ধু।

বিপাশার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর টেনে নিল সুগত। বেশ বুঝতে পারল সে, বিপাশার সারা দেহখানা কাঁপছে।

বিপাশা সুগতর হাতের ভেতর হাত রেখে মাথা নেড়ে জানাল যে, সে সুগতর কথা রাখবে।

ওপরের আকাশে তখন মেঘের সমারোহ। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। ওরা উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ কেমন কান্না পেল বিপাশার। হাত দিয়ে সে তার গড়িয়ে পড়া চোখের জল সুগতর আড়ালে মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, চল সুগত, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল বলে।

পরীক্ষার ফল বের হতেই ডক্টর সেন সুগতকে ডেকে বললেন, সুগত তোমার ওপর আমার আশা অগাধ। আর আমি মনে করি সে আশা তোমার দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে। তুমি জান, এক কুমার বাহাদুর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে আমাকে একটা জঙ্গল মহল দান করে গেছেন। তিনি বর্তমানে সংসারবিবাগী সাধু। আমার ইচ্ছে ঐ জঙ্গল মহলকে আমি পরিপূর্ণ রিসার্চ সেন্টার রূপে গড়ে তুলি। তুমি ওখানে গিয়ে ঘরবাড়িগুলো মেরামত করে তোল। দরোয়ান তোমাকে সাহায্য করবে। আগে কয়েকটি ছাত্র ওখানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এসেছে। তারাও আমাকে বলেছে রিসার্চের পক্ষে ওটা একটা আদর্শ জায়গা। দেখ, তুমি যদি পার ওকে গড়ে তুলতে তাহলে অনেক দিনের স্বপ্ন আমার সার্থক হয়।

সুগত ডক্টর সেনের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে এসেছে জঙ্গলমহলে। মাসখানেক অক্লান্ত পরিশ্রম করে নদীর ওপার থেকে দড়ি বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে পুরনো জীর্ণ ঘরগুলো মেরামত করে নিয়েছে। এখন মোটামুটি পরিচ্ছন্ন একটা রূপ পেয়েছে ডক্টর সেনের পরিকল্পিত রিসার্চ সেন্টারটি।

সুগত পাখিদের উড়ে আসার ছবি দেখতে দেখতে ভাবছিল বিপাশাদের কথা। ওদের আসার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন ডক্টর সেন। সুগতর কাছে জানতে চেয়েছিলেন সেন্টার মেরামতের কাজ আর কত বাকি। সুগত মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করে ডক্টর সেনকে চিঠি দিয়েছে রিসার্চ স্কলারদের পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সে প্রতিদিনই ভাবছে, ওরা আসবে, কিন্তু দিন কেটে যেতে লাগল স্বাভাবিক নিয়মে, ওরা কেউ এসে পৌছল না। সুগত কেবল ভাবতে লাগল বিপাশার কথা। যাযাবর পাখির ওপর কাজ করতে গেলে এই তো সময়। দল বেঁধে ওরা উড়ে আসছে। এ সময় একটি মুহূর্তও যে অনেক মূল্যবান। ওদের গতিবিধি, আচার-আচরণ সবকিছুই যে লক্ষ্য করতে হবে। সুগতর প্রতীক্ষাকে পূর্ণ করে ওরা কিন্তু কেউ এসে পৌছল না যথাসময়ে।

সেদিনটা ছিল রোববার। তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফুটে ওঠেনি। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ স্বরশঙ্কা ঝিলের ওপারে শালবনের মাথায় তার বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। হঠাৎ একঝাঁক গুলির আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্ত হাজার হাজার পাখির করুণ আর্তনাদ সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সুগতর অনেকক্ষণ। শুধু একটা আমেজি আলসেমিতে সে বাঁধা পড়েছিল বিছানার সঙ্গে। পাশের খোলা জানালা দিয়ে সে এতক্ষণ দেখছিল দূর পাহাড়ের গায়ে শালবনে চাঁদটার ধীরে ধীরে নেমে যাবার দৃশ্য। হঠাৎ সমস্ত জলস্থল আকাশ অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে ঘন ঘন গুলির আওয়াজ উঠতে লাগল। গুলি থামলেই ভেসে আসছে সেই কাতর আর্তনাদ।

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুগত। স্বরশঙ্কার দিকে তাকিয়ে দেখল শত শত হাঁস আকাশ কালো করে উড়ছে। ঝিলের জলে মনে হল কালো কি একটা বস্তু নড়াচড়া করছে। সুগত ভাল করে দেখার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল, সালতি জাতীয় কোনকিছু এগিয়ে আসছে। সবুজ ডালপালা দিয়ে ঢাকা তার সর্বাঙ্গ। পাখিরা যাতে একদৃষ্টিতে শিকারীকে বুঝতে না পারে, যাতে তারা ঐ ভাসমান বস্তুটিকে জলজ উদ্ভিদ বলে ভ্রম করে প্রতারিত হয় সেজন্যে শিকারীদের এ ধরনের সতর্ক ব্যবস্থা।

কতক্ষণ এমনি চলল শিকারপর্ব। পাখিদের চক্রাকারে উড়ে উড়ে ভয়ার্ত কান্না। রিসার্চ সেন্টারের বাইরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে সুগত দেখল এই নিষ্ঠুর হত্যালীলা।

লাল সূর্য আকাশে রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে, ছেঁড়া মেঘে লেগেছে সে রক্তের ছোপ। ঐ রক্ত মেঘের ছায়া টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঢেউ ওঠা স্বরশঙ্কার জলে। সুগতর মনে হল ঐ চাপ চাপ রক্তের টুকরোগুলো যেন হতভাগ্য পাখিদের ছিন্নভিন্ন হৃৎপিণ্ড।

সূর্য রঙ পাল্টাতেই শিকারীদের শিকারপর্ব শেষ হল। তারা ঝিলের ওপর থেকে পাখি কুড়িয়ে নিয়ে ওপারে শাল-জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে মাতঙ্গী নদী বরাবর চলে গেল। সুগত তাকিয়ে রইল ঝিলের দিকে। যে সব আতঙ্কগ্রস্ত পাখি তখনও আকাশে উড়ছিল তারা একটি একটি করে ঝিলের বুকে ফিরে আসতে লাগল।

সুগত জানে এইসব যাযাবর পাখিরা হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে নির্দিষ্ট কোন খাল বিল ঝিলে বর্ষা শেষে এসে পৌছয়। আবার যখন বসন্তের হাওয়া দেয় তখন তারা ফিরে যায় তাদের ফেলে আসা জন্মভূমিতে। প্রবল শীত থেকে পালিয়ে এসে গ্রীষ্মপ্রধান কোন অঞ্চলে এইভাবে তারা আত্মরক্ষা করে।

অবাক করে দেয় ওদের ক্রিয়াকলাপ। যে গাছের ডালে যে পাখিটি গত বছর এসে বসেছিল, পরের বছরগুলিতে তাকে সেই বিশেষ ডালটিতেই বসতে দেখা গেছে। যে ঝিলে যে পাখিদের ঝাঁক একবার এসে ভেসেছে, তারা বছরের পর বছর ঐ ঝিলে এসেই পড়বে। কত পাখি বুড়ো হয়ে মারা গেছে, আবার তাদের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ পাখির দল। পরিণতদের সঙ্গে বছরের পর বছর উড়ে তারা চিনে নিয়েছে হাজার হাজার মাইল পথ। কোন্ নির্দিষ্ট সংকেত চিহ্ন যে তাদের পথ চিনিয়ে এতদূর নিয়ে আসে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। তবে অকূল রাতের সমুদ্রে যেমন নৌকোর নাবিকরা

আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করে নেয়, পাখিরাও তেমনি তারাদের দেখে নাবিকের মত নির্ভুল দিক চিনে নিতে পারে।

আবার এমন এক শ্রেণীর যাযাবর পাখি আছে, যারা একেবারে বিশ্রাম না নিয়ে শত শত মাইল পথ উড়ে আসতে পারে। তাদের দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধারণ পাখিদের থেকে একেবারেই আলাদা। প্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে এ নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য ঘটনা।

পাখিগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ঝিলের বুকে আর তাদের দিকে তাকিয়ে সুগত ভাবছিল এইসব কথা।

ওরা তখনও ঝিলের জলে স্থির হতে পারেনি। এক অজানা ভীতি তাদের মাঝে মাঝে চমকে দিচ্ছিল। ত্রাসে এক একটা দল হঠাৎ হঠাৎ পাখার ঝাপট মেরে আর্ত চীৎকার তুলে ঝিলের জলে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল।

সুগত আর একটি দৃশ্য দেখতে পেল, যা তাকে সত্যি অবাক করে দিল। ওপারের যে জংলা জায়গাটা দিয়ে উঠে গিয়েছিল শিকারীর দল, সেখান থেকে জল আর জঙ্গল কেটে বেরিয়ে আসছে একটা সালতি। সুগতর মনে হল, শিকারীরা এই ভেলাটাই ব্যবহার করেছিল হাঁস শিকারের সময়। কিন্তু তাকে যা আশ্চর্য করল, তা হল ঐ সালতির আরোহী। একটি মেয়ে সালতিটা চালিয়ে আসছিল। সূর্যের আলো তখনও তার কোমলতা হারায়নি। মেয়েটির মুখে চোখে, দেহের অনাবৃত জায়গাগুলোতে সে আলো স্নিগ্ধ একরকম লাবণ্য মাখিয়ে দিচ্ছিল।

সুগত দেখল, মেয়েটি সালতিখানা চালিয়ে এদিক ওদিক ফিরছে, আর কখনো বা বাঁ হাত দিয়ে রোদ্দুর আড়াল করে কি যেন খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে। সুগত পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা শিশুগাছের আড়ালে নিজেকে গোপন করে মেয়েটিকে দেখতে লাগল।

অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর মেয়েটি তার সালতি বেয়ে আসতে লাগল ঝিলের এপারে রিসার্চ সেন্টারের দিকে। পাখিগুলো আওয়াজ তুলে সালতির পাশ কাটিয়ে সরে সরে যাচ্ছিল।

সুগত দেখল মেয়েটি আশ্চর্যরকম আকর্ষণীয়। চোখে দেখা আর পাঁচটি মেয়ের থেকে সে একেবারে আলাদা। সতেরো আঠারো বছরের নিটোল দেহখানা বিশ্বকর্মা অতি যত্ন করে গড়েছেন বলে তার মনে হল। বাইরের জগৎ আর চলমান জীবনের সঙ্গে মেয়েটির বড় একটা পরিচয় আছে বলে সুগতর মনে হল না। তার দুটো চোখে দারুণ একটা উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল।

মেয়েটি সালতি নিয়ে ঝিলের যেখানে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে সুগতর আত্মগোপনের চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে উঠবে জেনে সে শিশুগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। সে কোন কিছু খোঁজার ব্যাপারে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে একটি জলজ্যান্ত পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না।

অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই অবশ্য দুজনের চোখাচোখি হল। কিছু পরিমাণ বিস্ময়ের ছায়া পড়ল মেয়েটির চোখে। পরক্ষণেই কিন্তু সে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সুগতর দিকে তাকিয়ে অসংকোচে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার হাঁসটাকে এদিকে দেখেছেন?

সুগত একেবারে বিব্রত। এই ঝিলে হাজার হাজার হাঁসের ভেতর কোথায় মেয়েটির হাঁস ডুব দিয়েছে তার ঠিকানা কোন গণক ঠাকুরের পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

তবু সুগত কথা বলল, হাঁসটা দেখতে কেমন?

গভীর কালো ভুরুর তলায় দুটো বড় বড় চোখ মেলে মেয়েটি বলল, সাদা, ধবধবে সাদা রঙের। এই ঝিলের হাঁসেদের সঙ্গে ওর একটুও মিল নেই।

তারপর নিজের মনেই বলে চলল, বড় বোকা। পথ চিনে ঘরে ফিরতেও জানে না। আবার একা একা ঘোরার সখ কম নয়। অন্য হাঁসদের সঙ্গে তাই ফিরতে পারে না। রোজ আমাকে এমনি করে জ্বালিয়ে মারে।

শেষের কথা কটিতে ক্ষোভ আর দুঃখের রেশ বাজছিল।

সুগত বলল, এদিকে তো তোমার ঐ হাঁসটাকে আসতে দেখেছি বলে মনে হয় না।

মেয়েটি বলল, দেখবে কি করে, ও তো এদিকে বড় একটা আসে না। কাছেপিঠে ঝোপঝাড়ের আড়ালেই থাকে বরাবর।

সুগত বলল, তাহলে তুমি ওকে এদিকে খুঁজতে এসেছ কেন?

মেয়েটির ভাব দেখে মনে হল, সে দারুণ অবাক হয়েছে সুগতর কথায়। এই মানুষটার সঙ্গে তার বোকা হাঁসটার বিশেষ কোন পার্থক্য আছে বলে তার মনে হল না।

সে প্রথমে একটু রাগ করেই সুগতর কথার জবাব দিল, এমনি খুঁজতে এসেছি।

মুখ নামিয়ে সালতিখানাকে অন্যদিকে ঘোরাল সে। তারপর কি আবার তার মনে এল। সুগতর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আপনি গুলির আওয়াজ পাননি?

সুগত বলল, পেয়েছি। আর এও ঠিক, তোমার ঐ সালতিখানাই তারা ডালপালা পাতাপত্তরে সাজিয়ে ব্যবহার করেছিল।

মেয়েটি সালতিখানা বেয়ে সুগতর পাশে কাছ কাছে বরাবর এসে দাঁড়াল। আপনি কি মনে করেন আমি তা জানি না। ঘুমিয়ে ছিলাম, তাই ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আবার রেখে দিয়ে গেছে আমার ঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

সুগত বলল, ওরা কারা? আর এ ঝিলে হাঁসেদের মারার অধিকার ওদের কেইবা দিয়েছে। এ তো ডক্টর সেনের এলাকা।

হরদয়ালদার কাছে তাই শুনেছি, মেয়েটি বলল। তবে এখানে আপনারা তো কেউ থাকেন না, তাই ওরা লুটপাট করে যায়। কারো কোন বারণই শোনে না।

সুগত হেসে বলল, থাকলেও ওরা মালিকের বড় একটা ধার ধারত বলে মনে হয় না।

মেয়েটি আর বিশেষ কোন কথা বাড়াল না। হঠাৎ চোখ দুটো তার ছলছল করে উঠল। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, সে আর বেঁচে নেই। ঐ ডাকাত চৌধুরীদের লোকগুলো ওকে নিশ্চয়ই মেরে নিয়ে গেছে। এদিকে পালিয়ে এলে রাজুদা আমাকে বলে দিত।

ডক্টর সেনের নিযুক্ত দরোয়ান রাজেন সিং যে মেয়েটির পরিচিত, সে কথা সুগত এই প্রথম জানল। বৃদ্ধ রাজেন সিংতো এই মাসাধিককালের মধ্যে একবারও এদের কথা বলেনি। সুগত পরক্ষণেই ভাবল, সেও তো বড় একটা ঘরোয়া কথাবার্তা কারো সঙ্গে উপযাচক হয়ে বলে না, তাই এদের কথা বৃদ্ধ তাকে কোন প্রসঙ্গে বলবার সুযোগ পায়নি।

সুগতকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মেয়েটি তার সালতিটা চালিয়ে জল কেটে কেটে, হাঁসেদের উড়িয়ে উড়িয়ে ওপারে চলে গেল। সুগত ঝিলের বাঁকের জঙ্গলে মেয়েটাকে হারিয়ে যেতে দেখল।

এই অল্প সময়ের ভেতর মেয়েটি তার দেহের তরুণ লাবণ্য নিয়ে সুগতর চোখের ওপর যে ছায়া ফেলে গেল তা সহজে মুছে গেল না। তাছাড়া মেয়েটি আমাদের নাগরিক সমাজের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়নি বলে তার স্বভাবটুকুকে নির্ভেজাল রাখতে পেরেছিল। মেয়েটির মনের সহজ প্রকাশ তাই বারবার ছুঁয়ে গেল সুগতর মন। রিসার্চ সেন্টারে ফিরে এসেও সুগত ঐ মেয়েটিকে তার এলোমেলো ভাবনার থেকে কোন রকমেই সবাতে পারল না।

দুপুরে খাবার পরে বিশ্রামের অভ্যেস নেই সুগতর। সে হয় বসে বসে পড়াশোনা করে, নয়তো বনে-জঙ্গলে ঝিলের ধারে পোকামাকড়, মৌমাছি প্রজাপতির খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। যেদিন সকালে পাখি শিকারপর্ব হল, তারপর নতুন মেয়েটির আবির্ভাব ঘটল, সেদিন দুপুরে কিন্তু ঘুম এল সুগতর চোখে। অনেক কালের নিয়মের বেড়াটা ভেঙে ঘুমের প্রজাপতি নেচে চলল তার চোখের তারায়। ওদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাকে গুনগুন করে গান শোনাতে লাগল। সুগত বুকের ওপর এনটমোলজির একখানা ভারী বই খুলে রেখে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল।

কি যেন একটা ডেকে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল সুগতর। সে একটা ঝাঁকি মেরে উঠে বসল বিছানার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে বুকের থেকে বইখানা গাড়িয়ে পড়ে গেল একপাশে। বইটা তুলতে যেতেই

জানালার বাইরে সে দেখতে পেল সকালের দেখা মেয়েটিকে। একটা ধবধবে সাদা হাঁস বুকে চেপে ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

সুগত বুঝল এই হাঁসের ডাকেই তার ঘুম ভেঙেছে। সে বইখানা কুড়িয়ে যথাস্থানে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল।

কি, এটি আবার কোথায় পেলে? সকালের হারান মানিক নাকি?

সুগত হাসিমুখে প্রশ্ন করল।

মেয়েটির ক্ষোভ যেন ঝরে পড়ল কথায়, আর বলবেন না। আমাকে জ্বালিয়ে খেল এই হাড়জ্বালানেটা। কম কাঁদিয়েছে ও আমাকে।

কথাগুলো বলা শেষ করে ও ক্ষোভেই হোক আর আদরেই হোক হাঁসটাকে এমন জোরে চেপে ধরল যে মেয়েটার বুকের মধ্যে থেকে সে প্যাঁক প্যাঁক করে প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

সুগত বলল, অমন করে অবলা জীবটিকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ বল।

মেয়েটি অমনি বলে উঠল, আপনিও ওর পক্ষ নিচ্ছেন। আমাকে কম কষ্ট দিয়েছে ও।

মেয়েটির চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা ব্যথার ছায়া।

সুগত ভাবতেই পারল না এত সহজ একটা কারণে কোন মেয়ের চোখ এমন করে ছলছলিয়ে উঠতে পারে। সে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, এখন বলতো শুনি কোথায় পেলে তোমার এই বোকা হাঁদা হাঁসটাকে।

সকালে যে মেয়েটি তার হাঁসকে নিজেই বোকা বলে সম্বোধন করেছিল, সেই আবার হাঁসের পক্ষ নিয়ে বলল, ওমা, বোকা কি বলছেন, একেবারে চালাকের শিরোমণি। এত গুলিগোলার ভেতর ও ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়নি। আমার সালতিখানার ওপরে বসার জন্যে যে পিঁড়িখানা পেতে রেখেছি, তারই ভেতর সারারাত ও সিঁধিয়ে বসেছিল। ডাকাতগুলো যখন পাখি শিকারের জন্যে আমার সালতিখানাতে ডালপালা ভরে নিয়ে যায় তখনও ও টুঁ শব্দটি করেনি। করলে আর রক্ষে ছিল।

সুগত বলল, অবাক কাণ্ড। চালাক বলে চালাক, এমন করে মানুষকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে রাখলে।

তারপর শুনুন না, মেয়েটি বলল, সকালে আমি যখন ওকে খুঁজে বেড়াই সালতি নিয়ে তখনও উনি ভেতরেই ছিলেন।

সুগত বলল, সে কি ব্যাপার, ভেতরেই ছিল!

হাঁ তখনও বিপদ কেটেছে কি না ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে বেরোয়নি। তারপর যখন আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল, তখনই ও টের পেয়েছিল যে আমি রয়েছি সালতির ওপর। তবু বেরোয়নি কেন জানেন?

কেন?

আপনার গলা শুনতে পাচ্ছিল, সেটা ওর চেনা নয়। তারপর আমি যখন সালতিখানা গাছে বেঁধে ডাঙায় লাফিয়ে উঠলাম, তখন ও আর থাকতে না পেরে পিঁড়ির তলা থেকে ঝটপট বেরিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে চেঁচিয়ে আমাকে ডাকতে লাগল।

সুগত বলল, অবাক কাণ্ড তো!

মেয়েটি বলল, জানেন, ওকে রাগে দুঃখে ডানা ধরে ঝাঁকি দিয়ে যতবার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ততবার ও ডাঙায় উঠে এসেছে আমার কাছে। আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্যাঁক প্যাঁক করে সে কি কান্না। এখন বলুন তো, আর কি রাগ থাকে ওর ওপর।

সুগত কৌতুক করে বলল, ওর গলায় একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে অথবা ছোট ছোট লাল পুঁতির মালা পরিয়ে ওর বুদ্ধির জন্য একটা পুরস্কার দেওয়া উচিত।

মেয়েটি সুগতর কথাটাকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিল বলে মনে হল। সে বলল, আমাদের এখানে ওসব কিছু পাওয়া যায় না। দেখি হরদয়ালদাকে বলে, যদি ওগুলো আনতে পারে।

সুগত বলল, হরদয়ালদা কে? তিনি কি তোমার দাদা?

দাদাই তো, বলল মেয়েটি, দেখেননি তাকে? সাইকেল চালিয়ে ঐ যে রাস্তা দিয়ে প্রতি শনি মঙ্গলবার আসে আমাদের বাড়ি। নদীর ওপারে হাট থেকে বাজার করে এনে দিয়ে যায়। আমার জন্য স্টেশন লাইব্রেরি থেকে গল্পের বই এনে দেয়। ঐ তো আমার হরদয়ালদা।

সুগত বুঝল, যে মানুষটিকে সে মাঝে মাঝে সাইকেল চালিয়ে ওপারের ঐ পড়ো বাড়িটার দিকে যেতে দেখেছে সেই হল মেয়েটির হরদয়ালদা।

সুগত বলল, এই দেখ, এত কথার ভেতর তোমার নামটাই জানা হল না আমার।

আমাকে সুধা বলে ডাকবেন। রাজুদা, হরদয়ালদা, মা, সব্বাইর এই নামটা খুব পছন্দ কিনা।

সুগত বলল, নামটার ওপর তোমারও খুব টান আছে মনে হচ্ছে।

বাঃ কি যে বলেন, সুধা বলে ডাকলে ভাল লাগবে না!

সুগত বলল, আমি কিন্তু সবার ডাকা নামে ডাকতে ভালবাসি না, সে নাম যত মিষ্টিই হোক না কেন।

সুধা চুপ করে সুগতর মুখের ওপর তার বড় বড় দুটো চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল।

সুগত আবার বলল, তোমার এমন মৌ মিষ্টি নামটা বাদ দিতে চাইছি বলে খুব রাগ হচ্ছে তো? আচ্ছা ঐ নামেই না হয় তোমাকে ডাকব।

সুধা বলল, আপনার যে নামে খুশি ডাকবেন।

সুগত বলল, তোমার সঠিক নাম হওয়া উচিত ছিল, হংসেশ্বরী। খুব ছোট করে বড় জোর, হাঁসু।

মেনে নিচ্ছি, বলল, সুধা।

সুগত অমনি বলল, যারা সবকিছু মেনে নেয় তাদের নাম বদলের দরকার হয় না। তাদের পুরনো নামই বহাল থাকে। আমি তোমাকে সুধা বলেই ডাকব।

সুধা খুব খুশি হয়ে উঠল। হাঁসের পালকের মত একরাশ সাদা হাসি ছড়িয়ে দিল সে। শরতের শেষবেলার আলোয় স্থলে জলে বনতলে তখন অফুরন্ত সুধা ঝরে ঝরে পড়ছিল।

সুধা হাঁস নিয়ে তার সালতিতে উঠতে যাচ্ছিল হঠাৎ ফিরে বলল, তোমাকে কি বলে ডাকব?

সুগত।

ততক্ষণে সুধা তার ভুলটা বুঝতে পেরেছে। সে জিভ কেটে বলল, কি ভুল দেখতো, তোমাকে আমি 'তুমি' বলে ফেলেছি!

সুগত অমনি বলল, তোমাকে তুমিই বলে।

তারপর হেসে বলল, ভুল করে এমনি এমনি পার পাওয়া যায় না। ভুলের মাশুল দিতে হয়।

কি দেব বলুন? সুধা বলল।

সুগত বলল, নাম ধরে ডাকবে আর তুমি বলবে, এই মাশুল।

প্রথমটা পারব না, শেষেরটা পারব। তোমাকে আমি বরং সুগতদা বলেই ডাকব।

তাই ঠিক রইল। ডুব সূর্যের আলো গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে ততক্ষণে। একটা কালো ছায়া ঝিলের তীরের গাছগুলো থেকে ধীরে ধীরে সবটুকু জলের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে। কেবল ঘন গাছগাছালির ফাঁকে এক টুকরো শেষ সূর্যের সোনা ঝিলের কালো বুকটাকে কোনাকুনি দুভাগ করে দিয়েছিল। সেই আলোর অসিটাতে শান দিতে দিতে যেন এগিয়ে গেল সুধার সালতিখানা। আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল সোনালী জলের কণা কাঠের বৈঠার ঘায়ে। সুগত এপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ছবি দেখতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, সুধার সালতিখানা মিলিয়ে গেল এক আলো আঁধারি রহস্যালোকের গভীরে।·

সেই যে হাঁসটি ফিরে পাবার আনন্দে ডগমগ হয়ে আসামীসহ খবর জানাতে এসেছিল সুধা, তারপর আর দেখা নেই।

তিনদিন সুগত এই অদ্ভুত মেয়েটির জন্য মনে মনে অপেক্ষা করেছিল। এখন সে নিজের কাজে

ডুব দিয়েছে। রিসার্চের কাজ, এদিক ওদিক ভাবলে তাকালে চলবে কেন। হঠাৎ ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। একটু বেশি রকমই ছোঁয়া দিয়েছিল মনের মধ্যে। তা হোক, সুগত আর কারো কথা ভাববে না। কেবল ভাববে তার মৌমাছিদের কথা। আজ তিন তিনটে দিন ঝিলের ধারে আমবাগানের ভেতর মৌচাকটির কাছে যাওয়া হয়নি। সে আজ যাবে সেখানে। অন্ততঃ তিন চার ঘণ্টা তার ওখানে বসে বসে স্টাডি করতেই কেটে যাবে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চটপট সেরে কাঁধে ঝেলান ব্যাগে বইখাতাপত্তর নিয়ে সুগত বেরিয়ে পড়ল আমবাগানের মৌমাছিদের খবর নিতে।

রিসার্চ সেন্টার ছাড়িয়ে অনেকখানি বনবাদাড় ভেঙে ঝিলের ধারে ধারে চললে তবে পাওয়া যাবে আমবাগান। ঐ আমবাগানের ভেতরেই মস্তবড় একখানা চাক বেঁধেছে মৌমাছিরা। সুগত খবরটা পেয়েছিল বুড়ো দরোয়ান রাজেন সিং-এর কাছ থেকেই। সেই থেকে ওর কাজের ভারি সুবিধে হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে মৌমাছিদের আচাব-আচরণ ও সরজমিনে দেখে আসে।

সুগত আপন মনে ঝিলের ধার দিয়ে চলছিল। অনেক গাছের জটলা। আলোছায়ার আঁকিবুকি কাটা পথ। প্রায় আমবাগানের কাছাকাছি এসে পড়েছে সে এমন সময় দারুণ একটা চেঁচানি শোনা গেল। কেউ যেন কাকে কিছু বারণ করছে। থমকে দাঁড়াল সুগত। কান পেতে ভাল করে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করতেই বুঝল তারই উদ্দেশে কথাগুলো ভেসে আসছে।

আর একটুও এগোবেন না সুগতদা। কামড়ে শেষ করে দেবে। ওরা ভীষণ ক্ষেপে গেছে।

স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সুগতর উপায়ই বা কি!

কিছুক্ষণ পরে সুগতর পাশের উলুখাগড়ার বনটা নড়ে উঠল। সর্ সর্ করে তার ভেতর এসে ঢুকল সালতিখানা। সুধা নেমে এল তার থেকে।

সুগতর কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ভাগ্যিস বসেছিলাম, তাই রক্ষে। নইলে এই পাগলা মৌমাছিগুলোর হাত থেকে আপনাকে বাঁচানই দায় হত।

সুগত বলল, বড় কৃপা করেছ। আমি কি তোমার কাছে হাত জোড় করে বলছিলাম যে আমাকে বাঁচাও নইলে আমি মরে যাব।

সুধা স্তম্ভিত। এমন একটা কথা যে সুগতর মুখ থেকে শুনবে তা সে ভাবতেই পারেনি। পুরো তিনটে দিন একরকম নাওয়া খাওয়া ছেড়ে সে পাহারা দিয়েছে এই চাকটা। রাজুদার কাছে শুনেছিল, মৌচাকটা নিয়ে নাকি বাবুসাহেবের অনেক কাজ করতে হবে। তাই সুধা একবার এসে চাকটা দেখে গিয়েছিল। তারপর বিকেলবেলা সালতিখানা চালিয়ে যখন আসছিল, তখন আমবাগানে কাদের ফিসফিসানি শুনতে পেল। চুপি চুপি উঠে এসে দেখল তিন চারটে ছেলে চাক ভাঙার তালে আছে। ওরা ঐ দূরের শাল জঙ্গলে কাঠকুড়ুনিদের ছেলে। সুযোগ পেলেই ফলপাকড় চুরি করে, চাক ভেঙে মধু নিয়ে পালায়। হাটবারে বাজারে বিক্রি করে দিয়ে আসে। কয়েকটা ধমক দিতেই ওরা পালিয়েছিল তখন। কিন্তু সুধা জানত ওরা আবার ফিরে আসবে, তাই ঘুম আর খাবার সময়টুকু বাদে সে এই আমবাগানে এসেই বসে থাকত। আজ দুপুরে সে খেতে গিয়েছিল। ফিরেও এসেছিল তাড়াতাড়ি। কিন্তু তখন ঢিল মেরে মৌমাছিদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ওরা পালিয়েছে। চাকের একদিকটায় একটু ফুটোও হয়ে গেছে।

এত করেও যখন সুগতর মুখ থেকে ঐ ধরনের একটা কথা শুনল তখন প্রথমে সে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বাদল মেঘ থেকে যেমন করে বৃষ্টি ঝরে, তেমনি দরদর ধারায় চোখমুখ ভাসিয়ে কান্না ঝরতে লাগল সুধার।

সুগত হতবাক। সে ধরে ফেলল সুধার হাত। বলল, অবাক করলে তুমি সুধা। কি হল কান্নার?

হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সুধা পালাল সেখান থেকে। সালতিতে উঠে চলে গেল ওপারে। একটিবারও ফিরে তাকাল না। অভিমানে তখন তার সারা বুক ফুলে ফুলে উঠছিল।

অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে সুগত ফিরে এল আস্তানায়।

পরের দিন সকালবেলা সুগত বসে বসে কাজ করছিল, রাজেন সিং এসে তাকে চারটে ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা দিল।

সুগত খুশি হয়ে বলল, পেয়ারাগুলো কোথায় পেলে রাজুদা।

বুড়ো দরোয়ান চোখের ইসারায় জানাল, বলতে মানা। তারপর হেসে আঙুল দেখিয়ে দিল।

সুগত দেখল ঝিলের ঘাটের এক কোনায় জলে পা চুবিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে বসে আছে সুধা।

রাজেন সিং সুধার চাক পাহারা দেবার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলল, বাবু সাহেব, এ মেয়েটা আমাদের ঘরের মেয়ে নয়, সগ্গের পরী। মনটা ওর একেবারে জলের মত সাদা। বড় দুঃখী মেয়েটা।

সুগত উঠল। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সুধার পাশে। মিষ্টি করে বলল, সুধা দোষ যদি করে থাকি তাহলে তুমি কি এমন করে শাস্তি দেবে। আজ তিন-চার দিন তুমি একবারটিও এখানে আসনি। সেদিন কিইবা বললাম, আর অমনি তুমি রাগ করে কেঁদে চলে গেলে। আমি শুনেছি তোমার মৌচাক পাহারা দেবার কথা। কেন তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট করতে গেলে সুধা?

সুধা উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটিতে তার ঝিকমিক করছে কচি রোদ্দুরের হাসি। বলল, রাজুদা তোমার কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে বুঝি। বৈঠার ঘায়ে বুড়োকে একদিন যদি না আমি শেষ করে দি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রাজেন সিং হাসছিল। সুধা দৌড়ে গিয়ে বুড়োর পিঠে দুটো কীল বসিয়ে দিয়ে বলল, দাও আমার পেয়ারা।

সুগত বাঁ হাতে চেপে রাখা পেয়ারা একটা বের করে দেখাতেই ফিরে এল সুধা। বলতে বলতে এল আর যদি কোনদিন কিছু বলেছ রাজুদা তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।

সুগত বলল, ওকে মিছিমিছি বকুনি দিচ্ছ কেন সুধা। বুড়ো মানুষ ও কি তোমার কীল হজম করতে পারবে। তার চেয়ে আমরা না হয় চেষ্টা করে দেখতে পারি।

হাসল সুধা। বলল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে সুগতদা। বস তুমি এইখানে।

দুজনে ঘাটের পাটে বসল। সুধা বললে, সেদিন অমন করে আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে কথা বলেছিলে কেন সুগতদা। বাঁচা মরার কথাই বা তুলেছিলে কেন?

সুগত বলল, তোমার তো বেশ মনে থাকে দেখছি সব। তাহলে এও মনে আছে নিশ্চয়, তুমি আমাকে সেদিন আপনি আজ্ঞে কবে কথা বলেছিলে। আর সেজন্যেই আমি রাগ করে তোমাকে ওসব কথা বলেছিলাম। এখন আবার 'তুমি' বলছ, তাই নতুন করে আমাদের ভাব ভাব।

আবার মিষ্টি করে হেসে বলল সুধা, ঘাট হয়েছে আমার। এখন থেকে আপনিগুলোকে ঝিলের জলে ডুবিয়ে দেব চিরদিনের মত।

সুগত বলল, ও গুলোতে কোন ভার নেই, শোলার মত হালকা, আবার কোন ফাঁকে হুস করে ভেসে উঠবে।

ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

ওদের হাস্‌রি শব্দে হাজার হাঁস ঝিলের জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে কলকল খলখল করে উঠল।

সুধা বলল, ওটা কি পাখি ডাকছে বল তো সুগতদা?

সুগত কান পাতল।

কিছু দূরে কোন একটা গাছের আড়ালে বসে একটা পাখি ভারি মিষ্টি সুর তুলছিল।

সুগত সুর শুনে চিনতে পারল না পাখিটাকে। বলল, হেরে গেলাম, তুমিই বল।

দূর তাও জান না, ওটা শ্যামা। ঐ পাহাড়টার দিক থেকে রোজ উড়ে আসে আর এমনি করে ডাকে।

হঠাৎ মাথায় কি চাপল সুধার। বলল, দাঁড়াও দেখে আসি, কোন গাছে আজ লুকিয়েছে।

বলতে বলতেই উধাও হয়ে গেল সুধা।

এদিকে সুগতর মাথায়ও একটা খেয়াল চাপল। সে ঘরের ভেতর গিয়ে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে শ্যামা পাখির সুরেলা ডাকটা তুলে নিল।

কিছুক্ষণ পরে সুধা ফিরে এল। সুগতকে কিছু দূরে থেকে হাত ইশারায় ডাক দিল। সুগত কাছে গেলে চুপি চুপি বলল, খুব আস্তে পা টিপে চল। শব্দ উঠলেই ও পালাবে।

সুগত সুধার পেছন পেছন এসে পৌঁছল একটা ছাতিম গাছের তলায়। সুধা প্রথমে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে সুগতকে অতি সাবধান হবার ইঙ্গিত করল। তারপর ছাতিম গাছের ছত্রাকার পাতার ফাঁকে আঙুল দেখিয়ে দিল। সুগত কিছুতেই আর পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সুধা আকারে ইঙ্গিতে নানা ভাবে চেষ্টা করেও যখন সুগতকে পাখিটা দেখাতে পারল না তখন একটা ঠ্যালা দিয়ে বলল, কোন কিছু খুঁজে বের করা তোমার সাধ্য নয় সুগতদা।

সুধার কথায় প্রথমে পাখিটার গান বন্ধ হল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছাতিমতলাকে বিশেষ নিরাপদ নয় ভেবে ঝটপট ডানা মেলে উড়ল।

ঐ যে ঐ সুগতদা। পিঠের ওপর দিকটা কালো, আবার শেষের দিকটা সাদা। কালো সাদায় মিশে আছে লেজটা। পেটের দিকটা ঐ যে দেখা যাচ্ছে বাদামী রঙের। চিনে রেখো এই হল শ্যামা পাখি।

সুগত বলল, তুমি তো বেশ পাখি চেন দেখছি। আমাকে যদি চিনিয়ে দাও কয়েকটা পাখি তাহলে খুব উপকার হয় আমার।

হেসে ফেলল সুধা, তুমি খুব মজা করে কথা বলতে পার সুগতদা। পাখি চিনে আবার কি উপকার হবে। আচ্ছা সে কথা থাক, তুমি যখন চাইছ তখন অনেক অনেক পাখি চিনিয়ে দেব তোমাকে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ঐ ঝিলটার বাঁকে, তাহলে ওখানে দেখতে পাবে গাছ ভরে হরেক রকম পাখি। সারাদিন যেন পাখির মেলা বসে যায়।

সুগত সেই মুহূর্তে রাজি। সে সুধার পেছন পেছন এসে বসল সালতির ওপর। সুধা ঝিলের পাশ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলল সালতিখানা।

তুমি সাঁতার জান সুগতদা?

এই একটু একটু। তবে এ ঝিলে পড়লে আর উঠতে পারব না।

সে কথা তো আগে বলতে হয়, তাহলে তোমাকে ঘুর পথে নিয়ে যেতাম। সালতিতে চাপাতাম না।

সুগত হেসে বলল, সালতির ওপর আমার খুব একটা ভরসা না থাকলেও যে চালাচ্ছে তার ওপব ভরসা আছে, তাই নির্ভয়ে বসে আছি।

সুধা বলল, চুপচাপ বসে থাক, একটুও নড়বে না কিন্তু। নড়লেই জল উঠবে।

তারপর আপন মনে গজ গজ করতে করতে বলল, বললাম হরদয়ালদাকে সালতিটা মেরামত করে দাও, তা কানেই নেয় না। একটা দুষ্টু হাঁসকে ধরতে গিয়ে সেদিন কি হাল হল আমার। পাশের ফুটো দিয়ে জল উঠল, আর ঘাটে পৌঁছবার আগেই সালতিখানা একেবারে জলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

সভয়ে সুগত বলল, জলে পড়ে গেলে তুমি!

জলে তো পড়লাম। এক হাতে সালতি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ঘাটে!

সুগত শিউরে উঠল। এই গভীর ঝিলের কালো জল, দুদিকের জঙ্গল, এর মাঝে জলে পড়ে একটি মেয়ে তার সালতিখানা টেনে নিয়ে চলেছে, ভাবতেও গা ছম ছম করে।

ওরা এসে পৌঁছল সেই পাখির জগতে। কত রঙ, কত ডাক, কত আকারের পাখি যেন বিরাট মেলা বসিয়েছে সেখানে।

সুধা একটা সরু নালার মত খাঁজের ভেতর তার সালতিখানা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, চুপচাপ বসে থাক এর ওপর, আর দেখে যাও কত রকম পাখি রয়েছে ঐ সব গাছের ডালে। কলকে ফুলের অনেকগুলো গাছ ঐ নালার ধারে হলুদ ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ফাঁকে দুজনে সালতির ওপর বসে পাখি দেখতে লাগল।

ঐ যে পিপুল গাছের যে ডালটা নুয়ে পড়েছে জলার দিকে, ওর সরু ডালে যে পাখিটা বসে আছে তাকে দেখতে পাচ্ছ?

সুগত মাথা নেড়ে জানাল যে সে দেখতে পাচ্ছে। তারপর নিশ্চিত হয়ে নেবার জন্য বলল, ঐ যে ঘন সবুজ পিঠ, পেটের দিকে হালকা হলুদ ছোপ, কপালের ওপর লালচে দাগ, ঐ পাখিটা তো?

হাঁ, ওটা হল, বসন্ত বৌরী।

বসন্ত বৌরী পাখিটা কি যেন একটা ফল খাচ্ছিল। খাওয়া শেষ হতেই সে মনের খুশীতে গান জুড়ল। গান বলা যায় না, একটা তুঙ্, তুঙ্, তুঙ্, তুঙ্ ডাক। পাখিটা ডাকছে. আর তার গলাটা এগিয়ে পিছিয়ে বিচিত্র এক ভঙ্গীর সৃষ্টি করছে।

এক ঝাঁক কালো কালো ফিঙে বসেছিল ওদিকে বাঁশ ঝাড়ের মেলে দেওয়া কঞ্চিগুলোর ওপর। তাদের মাঝ থেকে একটা গান উঠছিল থেমে থেমে। পিলো—পিলো লো।

সুগত বলল, ফিঙেরা বুঝি এমনি করে ডাকে।

খিল খিল করে হেসে উঠল সুধা।

নাঃ, তুমি কিছুই শেখনি। তোমাকে হরদয়ালদার পাঠশালায় ঢুকিয়ে না দিলে আর চলছে না।

ঐ যে ঐ যে দেখ উড়ে পালাচ্ছে। সোনার বরণ পাখিটা আকাশ ঝলকে চলে গেল, ওটা হল বেণে বউ। ওদের গান শুনতে ফিঙেরা খুব ভালবাসে। বড় ভীতু পাখি, তাই ফিঙেদের কাছে কাছে থাকে।

সুগত হেসে বলল, যেমন আমি তোমার কাছে রয়েছি। সাঁতার জানি না তাই ভয়ে ভয়ে আছি।

সুধা বলল, পুরুষ মানুষ ভয় পেলে ইচ্ছে করে তাকে জলে ঠেলে ফেলে দি।

হাত দুটো ঠেলে দেবার ভঙ্গীতে দ্রুত এগিয়ে আনল সুধা। সুগত ওর রকম সকম দেখে হাসছিল।

তাই সুধা বলল, নাঃ, তুমি মোটেই ভীতু নও। আর কেউ হলে ঠেলা দেবার আগেই ভয়ে জলে পড়ে যেত।

প্রায় দুপুরেই সুগতর ঘরে আসে সুধা। যদি দেখে সুগত কাজে ব্যস্ত অমনি সে উঁকি দিয়েই চলে যায় বুড়ো দরোয়ানের ঘরে। সেখানে এক ঝুড়ি কথা বেচে ফিরে যাবার সময় সুগতর জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, খুব ব্যস্ত বুঝি, তা আমার কাজ আছে চললাম।

সুগত অমনি খাতাপত্র সরিয়ে রেখে বলে, চলে যেও না সুধা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক দরকারী কথা আছে।

দরকারী কথা না ছাই। তোমার দরকার তো ঐ, আচ্ছা সুধা জলপিপি দেখতে কেমন? আমাকে একদিন পানকৌড়ি দেখাতে নিয়ে যাবে? নীলকণ্ঠ পাখির শুধু গলাটাই নীল না সবটা? মুনিয়া পাখি কি খায়, কোথায় থাকে? তোমার দরকারের কি আর শেষ আছে।

কথা বলতে বলতে সালতির দিকে পা বাড়ায় সুধা।

সুগত ঘরের বাইরে এসে বলে, দেখে নিও সুধা, আর একবারটিও যদি পাখির কথা বলেছি। কাল থেকে পাখি ডাকলেই কানে আঙুল চেপে বসে থাকব।

সুধা ফিরে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে সুগতর ঘরে এসে ঢোকে। বলে, এত রাগ তোমার কি করে জুড়োই সুগতদা।

সুগত বলে, জুড়োবে জুড়োবে, আচ্ছা তুমি ঐ কবিতাটা একবার বল তো। সেই যে সেদিন সালতিতে যেতে যেতে শুনিয়েছিলে। যে কবিতাটা তোমার হরদয়ালদা তোমাকে শিখিয়েছিলেন।

সুধা অমনি বলে উঠল, রবি ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটার কথা বলছ তো?

হাঁ ঠিক, ঐ কবিতাটাই।

সুধা বলল, তোমার বুঝি খুব ভাল লেগেছে?

খুব।

আমারও খুব ভাল লাগে। জান সুগতদা, মা যখন কোন কিছুতে খুব কষ্ট পায়, তখন আমাকে ঐ কবিতাটা বলতে বলে।

সুগত একখণ্ড টিন দিয়ে তার ঘরটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। যে অংশটা একটু বড়

সেটাতেই তার শোয়া বসা চলত। ছোট অংশটাতে থাকত তার টুকিটাকি জিনিসপত্র। ঐ ঘরেই সে তার টেপ রেকর্ডারটাও রেখেছিল। সুধা যখন কবিতাটা বলার জন্যে তৈরী হল, সে তখন চুপি চুপি তার টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিয়ে এল।

কবিতা বলা শেষ হল। তারপর কতক্ষণ চলল টুকরো কথা টুকরো গল্প। বেলা যখন গাছের পাতায় পাতায় তখন সুধা উঠে বলল, আর আসব না সুগতদা। আমি এলে ভারি বক্‌বক্ করি, তোমার কাজের বড্ড ক্ষতি হয়।

তুমি না এলেই বরঞ্চ কাজ আমার একটুও এগোবে না। তাই বলি কি, আমার কাজটা এগিয়ে দেবার জন্যে রোজই একবার করে এসো অন্ততঃ।

সুধা বলল, মহারাজের আদেশ শিরোধার্য না করে কি পারি! আচ্ছা সুগতদা, ভেবেছ কি তুমি? আমার কোন কাজ নেই, আমি শুধু বনবাদাড় ঝিলবিল তোলপাড় করেই বেড়াই। আমাকে রান্না করতে হয় না? পঙ্গু মায়ের সেবা করতে হয় না? হাঁসেদের তদারকী করতে হয় না?

সুগত বলল, যে কিছু পারে না তার কথা আলাদা। আবার যে কাজ করে সে তার ফাঁকটুকুও খুঁজে নেয়। তোমার অনেক কাজের ভেতর থেকে একটুখানি ফাঁক খুঁজে পেলেই চলে এসো আমার কাছে।

সুধা হেসে বলল, আচ্ছা সে দেখা যাবে, এখন তো চলি। ওদিকে ঝিলের জলে যে আঁধার ঘনিয়ে উঠল।

পরের দিন সুগত এক কাণ্ড করে বসল। ও যেই দেখল সালতি চালিয়ে সুধা এসে উঠল এপারের ঘাটে অমনি সে খাটের তলায় এনে টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলে। শ্যামা পাখির মিষ্টি ডাক উঠতে লাগল। কিছুদিন আগে এই ডাকটাই সে তুলে নিয়েছিল।

চমকে থমকে দাঁড়াল সুধা। কোথায় পাখিটা ডাকছে সে ঠিক ঠাহর না করতে পেরে পায়ে পায়ে ছাতিম গাছের দিকে এগিয়ে চলল। সুগত দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে অনেক কৌশল করে সুধা পাখিটাকে খুঁজছে। শেষে এক সময় ডাক থামল শ্যামার। ফিরে এল সুধা সুগতর ঘরে। এখন সুগত ঘুমের ভান করে চোখের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি রেখে বিছানায় পড়ে।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠল সুধা। ঠিক তারই গলায় একটি মেয়ে ব্রাহ্মণ কবিতাটি আবৃত্তি করে চলেছে।

> 'হেন কালে সত্যকাম
> কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম ;
> মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
> আচার্য আশিস করি শুধাইলা তবে,
> 'কী গোত্র তোমার সৌম্য, প্রিয় দরশন?'
> তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবন্',
> নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
> জননীরে, কহিলেন তিনি—সত্যকাম,
> বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
> জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
> গোত্র তব নাহি জানি।'

জীবনে এমন আশ্চর্য কোন কিছুতেই হয়নি সুধা। কবিতাটা থামলে সে ঘরে এসে ঢুকল। চারদিকে তাকিয়ে সে আরও অবাক। কোন মেয়ের দেখা নেই। শুধু বিছানায় পড়ে আছে সুগত।

সুধা কি ভয় পেল! সুধার চোখে থম থম করছে কান্নার মেঘ। আকুল হয়ে সে ডাকল সুগতদা, সুগতদা।

সুগত লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানার ওপর।

কি হয়েছে সুধা?

সুধা সুগতর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে জল, সারা মুখে অজানা একটা উদ্বেগের ছায়া।

তোমার ঘরে কে সুগতদা?

সুগত বলল, তুমি।

আমি ত এই এলাম। তার আগে একটি মেয়ের গলায় আমার আবৃত্তি করা কবিতাটা স্পষ্ট শুনলাম।

দরজা তো একটি, তুমি কি তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ? সুগত বলল।

না, তাই তো ভাবছি এ কি হল।

সুগত বলল, আচ্ছা সুধা কিছু আগে কি কোন পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলে?

হাঁ, শ্যামা ডাকছিল। কিন্তু অনেক খুঁজেও তাকে দেখতে পেলাম না।

সুগত গম্ভীরভাবে বলল, পাবে না তাকে দেখতে।

এ কথা বলছ কেন সুগতদা?

যাদু কাকে বলে জান? আমি সেই যাদুর বলে শ্যামা পাখিটাকে বন্দী করেছি। আমি যাদুকর, তাই ঐ কবিতা বলা মেয়েটিকেও যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে আমার কাছে এনে রেখেছি।

হঠাৎ সুধা সুগতর বুকের ওপর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমাকে এমন করে কষ্ট দিও না সুগতদা। আমাকে সব বল, খুলে বল, আমার যে বড় ভয় করছে।

সুগত সুধার কান্না ভেজা মুখখানা তুলে ধরে বলল, তোমাকে আজ আমার ভয় দেখান সার্থক হয়েছে সুধা। যাদুর খেলা যারা দেখায় দর্শক তাদের দাম দিয়ে দেয়। আজ আমি খেলা দেখিয়ে যে দাম পেলাম তা একজন মহারাজের সারা রাজ্যের বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

আবার নিজের হাতে দুটি চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগল সুধা।

আমাকে এত দাম দিও না সুগতদা। আমি অতি সাধারণ একটা মেয়ে। আমাকে কাঁদিয়ে কি সুখ পাবে তুমি বল। আমি যেখানে বাস করি সেখানে শুধু গাছপালা পাখপাখালির ভিড়। ওরাই আমার এতকালের সঙ্গী। আমার সব কথা, সব দুঃখ সুখ ওদেরই ঘিরে। আমার এ জগতে কেন তুমি এলে সুগতদা।

সুগত হঠাৎ বলল, এই পাখিদের রাজ্যে জানিনা কে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিতে এসেছি সুধা।

চোখ মুছে জানালার বাইরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুধা। দূরে ঝিলের ওপারে থামওয়ালা কোঠা বাড়িখানা দেখা যাচ্ছিল।

সুধা বলল, বাঁধন ছিঁড়ে গেলেই তো আর উড়ে যাওয়া যায় না সুগতদা। আমার পঙ্গু মা পড়ে রয়েছে। কতদিন হরদয়ালদা মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে তার নিজের বাড়িতে তবু মা যেতে চায়নি। এই নির্জন বাড়িতে আমরা শুধু দুটি প্রাণী, ভগবানের মুখ চেয়ে পড়ে আছি।

সুগত বলল, তোমার বাবা কি তোমার ছোটবেলাতেই মারা যান? তিনি কি চিরদিন এখানকারই বাসিন্দা ছিলেন?

বাবার কথায় জল এল আবার সুধার চোখে। বলল, কোনদিন মিথ্যে বলার সুযোগ ঘটেনি আমার সুগতদা। তাই তুমি ঘৃণা করলেও সত্যিই আজ আমাকে বলতে হবে। তুমি যদি ধৈর্য ধরে শোন তাহলে আমি তোমাকে আমার জীবনের দু'চারটে কথা শোনাতে পারি।

সুগত বলল, বল সুধা, নিশ্চয়ই শুনব। আজ এক সামান্য কৌতুক আমার কাছে কি অসামান্য হয়েই না দেখা দিল।

সুধা বলল, যে কথা কাউকে বলা যায় না সে কথা আজ তোমার কাছে কেন প্রাণ উজাড় করে বলতে চাইছি তা জানি না। শুধু আজ এটুকু মনে হয়েছে, তোমাকে কথাটা না বলতে পারলে আমি আর তার ভার বইতে পারব না।

কিছুক্ষণ থেমে নিজের আবেগকে একটুখানি সামলে নিয়ে বলল সুধা, আমি তোমার কাছে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ কবিতা আবৃত্তি করেছি। আমি—আমি সেই সত্যকাম সুগতদা।

কথা বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সুধা।

সুগত তার মাথায় হাত রেখে বলল, তুমি চিরদিনের সত্য সুধা। তুমি আকাশের ঐ সোনার আলোর মত আমার কাছে পবিত্র।

সুধা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এ অঞ্চল ছিল ডিহি মুকুন্দপুরের রাজাবাহাদুরদের। এই ঝিলে তাঁরা পাখি শিকার করতে আসতেন। ঐ বড় বাড়িতে যে দারোয়ান থাকতেন তিনি ছিলেন জাতিতে রাজপুত। আর আমার মা ছিলেন ঐ দরোয়ানের স্ত্রীর ছোট বোন। যখন দরোয়ানের স্ত্রী মারা যান তখন আমার মা প্রায় নাবালিকা বললেও চলে। কিন্তু এত দূর দেশে একা একা কি করেই বা কাটাবে, তাই বয়েসের অনেক তফাৎ হলেও দরোয়ান আমার মাকেই বিয়ে করেন। কিন্তু বয়েস তাঁর অনেক হয়েছিল, তাই মা যখন সবে ষোল বছরে পা দিয়েছেন তখন দরোয়ান মারা যান। মা অসহায় অবস্থায় এখানেই থাকতে বাধ্য হন। রাজাবাহাদুরেরা দয়া করে তাঁর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দেন। বড় কুমারবাহাদুর চিরকুমার ছিলেন। সবাই তাঁকে নাকি দেবতার মত ভক্তি করত। তিনি ছোট ভাইকে সংসারি করে তাঁকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেন। শুধু শিকারের সখ ছিল বলে এই ঝিল ও এর সংলগ্ন জঙ্গলমহলটুকু নিজে রেখে দেন। পরে আবার যখন সংসার ছেড়ে বিবাগি হয়ে যান তখন এই জঙ্গলমহলও তাঁর এক বন্ধুকে দান করে যান। সেই জমিতেই এখন তোমাদের ঘরবাড়ি যা কিছু উঠেছে।

এখন আমার মায়ের কথায় আসি। মা ছিলেন খুব সুন্দরী মেয়ে। খাঁটি রাজপুতের গড়ন ছিল তাঁর। বড় রাজাবাহাদুর যখন পাখি শিকার করে আনতেন তখন মা অন্তঃপুরে থেকে তাঁকে রান্না করে দিতেন। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বাইরের মহলে থাকলেও মাঝে মাঝে ভেতর মহলে এসে তিনি মায়ের রান্নার তারিফ করে যেতেন। জানি না, কি করে সেই চিরকুমার মাকে দেখে একদিন মুগ্ধ হন, আর তার ফলেই আমি পৃথিবীর আলো দেখলাম। আমার জন্মের আগেই কুমার বাহাদুর কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। যাবার সময় হরদয়ালদাকে কেন জানি না সব কথা তিনি বলে যান। তাকে সামান্য কিছু জমি দান করে মায়ের দেখাশোনার ভারও তার ওপর দিয়ে যান।

একটু থেমে বলল সুধা, আজ মা পঙ্গু, কিন্তু এই জঙ্গলমহল ছেড়ে কোনদিনই কোথাও তিনি যেতে চাননি। একটা স্মৃতি বুকে নিয়ে মা আজও এখানে পড়ে জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় আছেন। এখন বল সুগতদা তুমি আমার বাঁধন ছিঁড়ে দিলেও আমি মুক্তি পাই কি করে। জানো, আমারই জন্যে মা একদিন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্যেই যে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি এই সত্যটুকু তিনি সহ্য করতে পারেননি বলেই নিজেকে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। আমি ত জানি কত বড় স্মৃতি আগলে তিনি পড়ে আছেন এই পাষাণপুরীতে। জানো, সুগতদা, মায়ের জীবনের এই স্মৃতিটুকুতে কিছু কলঙ্ক আছে বলে কেউ তাঁকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি এ পাপ হতে পারে না। জীবনের স্বাভাবিক সত্যকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

থামল সুধা। বেলা শেষের আলো এসে পড়েছিল তার ওপর। সুগত দেখল, কি বলিষ্ঠ এক সত্য স্থির হয়ে আছে সুধার মুখে।

সুগত বলল, আমাকে মাপ কর সুধা। কর্তব্যের কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিই এমন শক্তি আমার নেই।

সুধা বলল, ও কথা বলে কেন আমার দুঃখকে বাড়াচ্ছ সুগতদা। যে দুঃখ আমি ছড়িয়ে দিয়েছি ঝিলের জলে. ঐ শালুক পদ্মের বনে, যে দুঃখ উড়িয়ে দিয়েছি পাখিদের পাখায়, তাদের গানে, সে দুঃখ আমি আব মানুষের ঘরে টেনে আনতে চাই না। আজ সত্য করে বলি সুগতদা, তোমার আসার আগে আমি গান গেয়েছি পাখিদের সুরে, বৈঠার ঘায়ে ঝিলে যে জলতরঙ্গ বেজেছে তার সঙ্গে আমার হাসি ছড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু আজ বড় ভয় করছে আমার। তোমাকে দেখার দিন থেকে আমার দুচোখ ভরে কেন এমন করে জল উপচে পড়ে। মনে হয় কোথায় যেন আমার ভেতরে একটা ভাঙন শুরু হয়েছে।

সেদিন চলে গেল সুধা। তার চলে যাবার আগে তাকে সহজ করে দেবার জন্যে খাটের তলা থেকে টেপ রেকর্ডারখানা টেনে এনে পুরোটা বাজিয়ে শোনাল সুগত।

সুধা যাবার সময় শুধু একটি কথা বলে গেল, তুমি সত্যিই যাদুকর সুগতদা।

যে সন্ধ্যায় সুধা সুগতর কাছে তার সকল কথা উজাড় করে দিয়ে গেল, ঠিক সেই সন্ধ্যায় রিসার্চ সেন্টারে একাই এসে পৌঁছল বিপাশা। ট্রেন লেট থাকার দরুণ আসতে তার কিছুটা বিলম্ব ঘটে গেল।

কিছু না জানিয়ে আসার জন্য সবাই কিছুটা বিব্রত হল।

চায়ের টেবিলে বসে সুগত বলল, তুমি এসেছ খুব খুশি হলাম বিপাশা, কিন্তু এত দেরিতে এলে কেন? তোমার বুনো হাঁসেদের আর কতকাল আমি আটকে রাখি বল? শরৎ, হেমন্ত কেটে গেছে, এখন শীতও যে যাই যাই করছে।

হেসে বলল বিপাশা, বুনো হাঁস ধরে রাখার দায়িত্ব নিয়েছ জানলে আমি আগেভাগেই চলে আসতাম।

সুগত বলল, হাসি নয় বিপাশা, তোমার কাজের সুবিধের জন্যে আমি পাখিদের অনেক তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছি, তাছাড়া টেপরেকর্ডারে পাখিদের বিভিন্ন রকমের ডাকও তুলে রেখেছি।

আবার হাসল বিপাশা। বলল, আমার কাজ এতটা এগিয়ে রেখেছ সেজন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমাকে পাখি চেনাল কে সুগত? সেই বুনো হাঁস বুঝি?

সুগত কিছুটা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল বিপাশার মুখের দিকে।

আবার হেঁয়ালি করে বলল বিপাশা, দেখ সুগত, মানুষ মানুষকে যেমন চিনিয়ে দেয়, পাখিতেও পাখি চেনায়। এখানে একটি মাত্র বুনো হাঁসকে আমি জানি যে এই পাখির জগতকে চেনে।

সুগত ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে নেবার জন্য বললে, বড় হেঁয়ালি করে বলছ বিপাশা, আর একটু স্পষ্ট করে বল।

এবার সোজাসুজি বলল বিপাশা, সুধার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার আলাপ হয়েছে, নইলে পাখির খবর তো তোমার পাবার কথা নয়। একমাত্র ঐ জানে পাখির ঠিকানা।

সুগত বিস্মিত হল। সে ভাবটা মনে গোপন করে রেখে বলল, তুমি চেন নাকি সুধাকে।

না চিনলে তার সম্বন্ধে এতগুলো কথাই বা বলব কি করে।

এবার সহজ হল বিপাশা। বলল, বাবার সঙ্গে আগে যখন এসেছি তখন সুধাই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

সুগত বলল, সুধাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, তার পরিচয়-পত্রখানা এই জঙ্গলমহলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

সুধার প্রসঙ্গে থেকে সরে এল সুগত। সে বলল, দেখ বিপাশা আমি কিন্তু আজ তোমাকে একা একা আশা করিনি এখানে। অরিন্দমও ছিল আমাদের বহু প্রত্যাশিত অতিথি।

হঠাৎ বিপাশার সারা মুখে কিসের যেন একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠল। সে ছায়া ব্যথার, ঘৃণার কি পরাভবের তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সেই ছায়া কেটে গিয়ে মুখে ফুটে উঠল একঝলক হাসি।

অরিন্দম আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিয়েছে সুগত। সে বিয়ে করেছে কাকলীকে।

সুগত মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে রইল কতক্ষণ। নিজেকে কেমন যেন তার অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। বিপাশাকে একদিন প্রত্যাখান করে সে কি অরিন্দমের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের বীজটাকে রোপণ করেনি।

কথা বলল বিপাশা, সে সব অনেক দিন চুকেবুকে গেছে সুগত। ক্ষত এখন নিরাময়ের পথে। যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা তার ভোঁতা হয়ে এসেছে।

পরের দিন রিসার্চের ব্যাপার নিয়ে দুজন যখন মত্ত তখন সালতি বেয়ে ঘাটে এসে পৌঁছল সুধা। ঘাট থেকে উঠে এসে সে সুগতর ভেজান দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি খোল সুগতদা, হাতে আমার জিনিস রয়েছে।

সুগত উঠতে যাচ্ছিল, তাকে ইসারায় বাধা দিয়ে নিজেই উঠে গেল বিপাশা। ভেজান দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল সুধার দুহাতই জোড়া। এক হাতে এক ঘটি দুধ, অন্য হাতে বাটিভরা পিঠে।

তুমি বিপাশাদি!

বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল সুধা।

হেসে বলল বিপাশা, অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে নাকি? চেহারার আমার খুব পরিবর্তন হয়েছে এ ক'বছরে তাই না সুধা?

তা হয়ত হয়েছে, তবু চিনতে ভুল করিনি তোমাকে।

কথাগুলো বলে সুধা দুধ আর পিঠে বিপাশার হাতে তুলে দিতে যেতেই বিপাশা বলল, উহুঁ, এ আমি কেমন করে নিই বল। অন্যের জিনিস নিতে গেলেই চুরি করা হয়। যার জন্যে এনেছ তার হাতেই তোমাকে তুলে দিতে হবে। তারপর প্রসাদ বিলি করে দেবার ভার মালিকের। তিনি নিজের হাতে দিলেই খুশি হব।

সুধা খাটের একপাশে দুধের ঘটি আর পিঠের বাটি বসিয়ে রেখে বলল, অতসত বুঝি না বিপাশাদি, তোমাদের জিনিস তোমরা ভাগ করে নিও।

কথা কটি বলেই সে ঘরের বাইরে পালাল। তারপর একেবারে গিয়ে উঠল তার সালতিতে।

সুগত চেঁচিয়ে বলল, সুধা তোমার পাত্রগুলো নিয়ে যাও।

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে বৈঠার ঘায়ে জলে মুক্তোর দানা উড়িয়ে সুধার সালতি এগিয়ে চলেছে।

বিপাশা বলল, ভয় নেই সুগত, ওগুলো নেবার জন্যেও অন্ততঃ সুধা আবার এখানে আসবে।

পরের দিন সুধা এলে বিপাশা বলল, এতদিন সবকিছুই তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে সুধা। মৌমাছিকে তুমি পাখি বলে ভেবে বসে আছ। আসলে সুগতর কারবার মৌমাছি নিয়ে আর আমার দরবার পাখিদের কাছে। এখন থেকে তুমি করবে আমাকেই সাহায্য।

ক'দিন ধরে তাই হল। রিসার্চ সেন্টারে একা একা কাজের ভেতর কাটাতে লাগল সুগত। এদিকে বিপাশা দিন নেই রাত নেই ঘুরতে লাগল সুধার সঙ্গে।

সুগত যখন কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন তার মনে পড়ত সুধার কথা। একটুখানি কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠত তার মন। কিন্তু তখন হয়ত সুধা তার সালতি বেয়ে নিয়ে চলেছে বিপাশাকে হাঁসেদের পাশ কাটিয়ে। বিপাশা লক্ষ্য করছে যাযাবর হাঁসের গতিপ্রকৃতি।

একদিন বিপাশা জিজ্ঞেস করল সুধাকে, আচ্ছা সুধা তোমার ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে না?

এ কথা কেন বিপাশাদি!

বিপাশা বলল, সব মেয়েরই তো এক সময় তাই ইচ্ছে করে।

সুধা বলল, এ ব্যাপারে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই বিপাশাদি।

একথা কেন বলছ সুধা?

সবার জীবন তো সমান ধারায় বয় না বিপাশাদি। কোন কিছু ভাল লাগলেই কি তা পাওয়া যায়। তাই যাকে পাব না তার পিছে না দৌড়ে যা আমার আছে তাই নিয়েই থাকতে চাই।

বিপাশা এর কোন উত্তর দিতে পারল না। তার নিজের জীবনের গভীরে গিয়ে এ ব্যথা বেজে উঠল।

আপন মনে সালতিখানা বেয়ে চলল সুধা। বিপাশা লক্ষ্য করল, সুধার চোখের কোণে দুটি ছোট ছোট বেলকুঁড়ি ফুটে রয়েছে।

সেদিনটির পর সুধাকে আর দেখা গেল না। তার সেই সালতিখানা হাঁসেদের উড়িয়ে জল কেটে কেটে এলনা এপারের রিসার্চ সেন্টারে। কদিন বিপাশা সুধার কথা বলল, তারপর ডুবে গেল নিজের রিসার্চের কাজে।

সুগত কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল রিসার্চের নাম করে ঝিলের ধারে ধারে। মনে আশা, যদি একবার দেখতে পায় সুধাকে। এই কটি মাস ধরে সুধা তার হাসিকান্নার ফুল তাকে উপহার দিয়ে গেছে। সে স্মৃতি সে ভুলবে কি করে।

চিঠি এল কলকাতা থেকে সুগতর নামে। চিঠি পাঠিয়েছেন ডক্টর সেন।

কল্যাণীয়

সুগত, আশা করি তোমাদের রিসার্চের কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে তোমাদের ডাক পাঠাতে হল। আমি আমার সবকিছু উইল করে যেতে চাই। আমার ইচ্ছে নয় যে কোন একটা কলেজে মামুলি কাজ নিয়ে তুমি তোমার জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমি যে রিসার্চ সেন্টারটি গড়ে তুলেছি, তুমি যদি তার পুরো দায়িত্ব নাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ঐ সেন্টারের পরিচালনার জন্য আমি ট্রাস্ট গঠন করে দিয়ে যেতে চাই। তোমার নিষ্ঠা আর কর্মক্ষমতায় আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমি জানি তুমিই ঐ সেন্টার পরিচালনার কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি।

বিপাশাকে বলো আমার পরিকল্পনার কথা। তাকে সঙ্গে নিয়ে যত সত্বর সম্ভব চলে এসো।

পরের দিন দুপুরবেলা গোছগাছের ব্যবস্থা করছিল সুগত, এমন সময় বুড়ো দারোয়ান রাজেন সিং ঘরে ঢুকল।

সুগত টুকিটাকি জিনিসগুলো সুটকেশে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, রাজুদা খবর কি তোমার?

খবর আছে বাবুসাহেব। হরদয়ালবাবু আপনার সঙ্গে কি কথার জন্য বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুগত সব ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সুগতকে নমস্কার করে বলল, আমি সুধার হরদয়ালদা।

সুগত প্রতি নমস্কার করে বলল, কি খবর হরদয়ালদা? সুধা কেমন আছে?

খুব কঠিন অসুখের থেকে সুধা আজ কদিন হল ভাল হয়ে উঠেছে। সে এখনও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। বার বার আপনার নাম করছে, তাই এলাম।

সুগত বলল, চলুন আমি এখুনি যাব আপনার সঙ্গে।

ওরা অনেক পথ ঘুরে এসে পৌঁছল সেই জীর্ণ অর্ধসমাপ্ত বাড়িটার সামনে। হরদয়ালদা সুগতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। অনেকগুলো প্রায়ান্ধকার ঘর পেরিয়ে যেখানে এসে থামল ওরা সেখানে বেলা শেষের একটুখানি আলো এসে পড়েছিল। ঐখানে দাঁড়িয়ে হরদয়ালদা হেঁকে বললেন, সুধা, দেখ কে এসেছেন তোর কাছে।

হরদয়ালদা সুগতকে পাশের ঘরখানা দেখিয়ে চুপি চুপি বললেন, সুধার মায়ের শরীরও ভাল নয়, জোরে কথা বলতে পারেন না, আমি ওঘরে একটু বসি ততক্ষণ। আপনি সুধার সঙ্গে এ ঘরে গল্প করুন।

সুগত সামনের ঘরে ঢুকে দেখল, একটা জীর্ণ বহুদিনের পালঙ্কের ওপর সুধা শুয়ে আছে। সুগতকে দেখে সে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সুগত তার পাশে গিয়ে বসল। মাথায় হাত রেখে বলল, এতদিন তুমি আমাকে তোমার অসুখের কথা জানাওনি কেন সুধা। আমি রোজ কত ভেবেছি তোমার কথা।

সুধার মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল। ক্ষীণ গলায় বলল, তুমি আমার কথা ভাব সুগতদা?

ভাবি না আবার। পড়াশোনার ফাঁকে রোজ কতবার করে যে ঝিলের দিকে তাকাই তার হিসেব আছে। ভাবি, ঐ বুঝি তোমার সালতিখানা চোখের ওপর ভেসে উঠল। আবার কোন কোনদিন টেপরেকর্ডার চালিয়ে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে তোমার আবৃত্তি কথাবার্তা শুনি। মনে হয় তুমি কাছে রয়েছ।

সুধা বলল, কতদিন তোমাকে দেখিনি সুগতদা। বিছানায় পড়ে পড়ে কত কেঁদেছি। ঠাকুরকে বলেছি সুগতদাকে ভাল রেখ ঠাকুর। বিপাশাদি যেন আমার সুগতদাকে চিরদিন ভাল করে দেখে।

সুগত বলল, এ কথা বলছ কেন সুধা?

সুধা বলল, আমি যে জানি সুগতদা বিপাশাদির বাবা তোমাকে মানুষ করেছেন। আমার সালতিতে ঘুরে বেড়াবার সময় তোমার সম্বন্ধে কত কথা বলেছেন আমাকে বিপাশাদি। তোমাকে খুব পছন্দ করেন তিনি।

সুগত বলল, বিপাশাকে আমি বন্ধুর মত মনে করি সুধা, তাই সে বার বার আমার কথা বলে আনন্দ পায়।

সুধা বলল, দেখ সুগতদা, আমার সালতিখানা সেই যে কবে বেঁধে রেখে এসেছি আজ অবধি তার কোন একটা খোঁজ পাইনি। কবে যে ভাল হয়ে উঠব, কবে যে সালতিখানা চালিয়ে আবার তোর কাছে যাব তাই ভাবছি। এবার কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাব ঐ পাহাড় আর শাল জঙ্গলের দিকে। দেখবে কত পলাশ আর শিমুল ফুটেছে। কোকিলের ডাক শোনাব তোমাকে।

একটা ব্যথার কাঁটা যেন বিঁধে রইল সুগতর বুকে। সে বলি বলি করেও বলতে পারল না সুধাকে যে কালই এ অঞ্চল ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। সুধার দুর্বল দেহমন সুগতর এই চলে যাওয়াকে কিভাবে গ্রহণ করবে তা সে বুঝতে না পেরে নীরব হয়ে রইল।

সুধার চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। সুগত মুছিয়ে দিতে যেতেই সুধা হাত তুলে তাকে বারণ করে বলল, সব জল কি মোছাতে আছে সুগতদা, এ যে আমার অনেক আনন্দের জল। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' কতবার পড়েছি। যতবার পড়েছি ততবার ফেলেছি চোখের জল। মনে হয়েছে বিভূতিভূষণ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে নিয়ে আসতাম তাঁকে আমার এই জঙ্গলমহলে পাখির রাজ্যে। আজ তুমি এসেছ এখানে সুগতদা। কি যে ভাল লাগছে বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে। মনে থাকবে তো তোমার এই বুনো মেয়ে সুধার কথা?

সুগত মাথা নেড়ে জানাল সে কোনদিন ভুলবেনা তার সুধাকে।

পরের দিন বেলা শেষে ট্রেন ছাড়ল। জানালা দিয়ে সুগত দেখতে পেল তাদের রিসার্চ সেন্টার, ঝিল ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। তারপর শুরু হল একটানা শিমুল আর পলাশের বন। হাওয়ায় হাওয়ায় কে যেন উড়িয়ে দিয়েছে সংখ্যাহীন রঙীন উত্তরীয়। সুগত তাকিয়ে দেখল, তখনও সুধাদের জীর্ণ বাড়িটার থাম দুটো অস্পষ্টভাবে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে।

সুগতর চোখের ওপর একটা ছবি ফুটে উঠল। সুধা তার সালতিখানা চালিয়ে আসছে। তেমনি মুক্তোর দানার মত জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। হাঁসেরা উড়ল আকাশে, আর নামল না। সুধা সালতি থমিয়ে বনজঙ্গল ভেঙে ঐ হাঁসেদের পেছন পেছন আসতে লাগল। হাঁসেরা উড়ে চলল ঝিল ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে তাদের জন্মভূমির উদ্দেশ্যে।

সুগতর মনে হল, ঐ তো সুধা দাঁড়িয়ে আছে পলাশ গাছের তলায়। চেয়ে আছে ছুটন্ত রেলগাড়িটার দিকে।

সুগতর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, আমি আসব, আবার ফিরে আসব সুধা, আমার যে পলাশবনে কোকিলের ডাক শোনা হয়নি।

●

মাসাম্মা

মাসাম্মা বসেছিল গাছের তলায়। মেঘভাঙা চাঁদের আলো গাছের ডালাপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে আলপনা আঁকছিল মাটিতে। মাসাম্মা আনমনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল প্রকৃতির গড়া সেই আলপনা। মেঘের ভেতর চাঁদ ডুবে গেলে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল সে ছবি। আবার ফুটে উঠছিল মেঘের ওপর চাঁদ ভেসে উঠলে।

চারদিকে ঘন নিবিড় অরণ্য। আবছা আলোয় দূরের সবুজ মালভূমি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। মাসাম্মা ভাবছিল আর ভাবছিল। তার জীবনটা ঠিক যেন এই আলপনার মতো, ফুটে উঠছে আবার মুছে যাচ্ছে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে এই সেদিনের ছবি। গভীর বনের ভেতর দিয়ে দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রীরা চলেছে শ্রীশৈলমে প্রভু মল্লিকার্জুনকে পুজো দিতে। চেঞ্চুরাই আবহমানকাল থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তাদের বোঝা বয়, পথে রান্না করে খাওয়ায়, দিনরাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। গভীর বনে ভয় আছে হিংস্র জন্তুর। রাত জেগে চেঞ্চুরা তীর্থযাত্রীদের পাহারা দেয়। কত অথর্ব বুড়ো মানুষদের দীর্ঘ পথ তারা বয়ে নিয়ে যায় ডুলিতে করে। পৌঁছে দেয় দেবতার মন্দিরে। কত আশীর্বাদ কুড়োয় তাদের। চেঞ্চুরা, না থাকলে এ পথে অসম্ভব হয়ে উঠত তীর্থযাত্রীদের দেবদর্শন।

সেই কোন ছোটবেলা থেকে সে মা বাবার সঙ্গে যাত্রী নিয়ে যেত শ্রীশৈলমে প্রভু মল্লিকার্জুনের মন্দিরে। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এইসব যাত্রায়। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে চলা, তাদের একটা কিছু জিনিস অথবা পুঁটুলি হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া, তার কাছে ছিল প্রবল একটা উত্তেজনার মতো।

এক একটি পরিবারের চেঞ্চুরা বিশেষ একটি তীর্থযাত্রীর দল নিয়ে এগোতো। মাসাম্মার বাবা গুরুপ্পার খুব নাম ছিল এ কাজে। তীর্থযাত্রীরা তার সেবার মনোভাবকে খুব তারিফ করত। তারা বনে ঢোকার পর খুঁজে খুঁজে আসত তাদের বাড়িতে। বাবার সঙ্গে যে দলের আগে দেখা হয়ে যেত, তারা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করত।

গুরুপ্পা ও চন্দ্রাম্মার সংসার

বনের ভেতর ম্যররিপালেম অঞ্চলে গুরুপ্পাদের তিনপুরুষের বাস। চারদিকে অরণ্য, কোথাও কোথাও অরণ্য বড় গভীর। পেছনে সবুজের ছোঁয়া লাগা মালভূমি। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে। এসব পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা পাহাড়ী অঞ্চল।

সারা বনটা যেন গুরুপ্পার দখলে। সে বনের সব অন্ধি-সন্ধির খবর রাখে। এ অঞ্চলের কোথায় ঝরনা, কোথায় কূপ সব তার নখদর্পণে।

নাল্লামালাই আর অমরাবাদ অরণ্যের ভেতর দিয়ে কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের যাত্রীরা দল বেঁধে শ্রীশৈলমের মন্দিরে যায় শিবরাত্রির ব্রত উদ্‌যাপন করতে।

যাত্রীরা জানে বনের ভেতর চেঞ্চুদের আড্ডা। বনের ভেতর, পাহাড়ের কোলে ওদের ঘরগুলোই চিনিয়ে দেয় ওদের বসত এলাকা।

ওরা বন থেকে বাঁশ কেটে আনে, ঐ বুনো বাঁশেই তৈরি হয় ওদের ঘর। ঘরের আকারটা একটু বিচিত্র রকমের। মাঝখানে একটা মোটা বাঁশের খুঁটি থাকে, তার ওপরে কচ্ছপের পিঠের মতো কতকটা ডিম্বাকৃতি একটা চালা। সেই চালাটিকে ধরে রাখে চারদিকে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির গায়ে গায়ে বাতা

সাজিয়ে ঐ কচ্ছপের পিঠের মতো গোলাকৃতি ঘর হয়। তার একটি মাত্র দরজা থাকে। বনের থেকে কাঠ কেটে এনে তার থেকে দরজা তৈরি হয়। মেঝেটা উঁচু, পেটানো মাটির মসৃণ মেঝে। তারই ভেতর রান্না খাওয়া শোয়া। গুরুপ্পার সংসার বড় নয়। বউ চন্দ্রাম্মা আর মেয়ে মাসাম্মাকে নিয়ে তার সংসার।

চন্দ্রাম্মা উচ্ছল নয়, একটু চাপা স্বভাবের। সে অত্যন্ত সাহসী, গভীর বনের ভেতরেও একা যেতে তার ভয় নেই। বন থেকে সে একাই শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনে। সারা শরীর দিয়ে যখন তার ঘাম ঝরে তখনও কষ্টের ছবি তার মুখের ওপর ফুটে ওঠে না। সে নীরবেই কাজ করে যায়। প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে জল আনতে গিয়ে সে অযথা হাসি গল্পে সময় কাটায় না। যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুই কথা বলে। কালে ভদ্রে ঠোঁটে হাসির রেখা ফোটে। চন্দ্রাম্মা জলকুণ্ড থেকে জল নিয়ে চলে আসার পর প্রতিবেশিনীরা তাকে নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়। চন্দ্রাম্মা তা অনুমানে বুঝতে পারে কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করার মতো তার একটা মানসিকতা আছে।

কিন্তু প্রতিবেশীদের সব কাজেই সে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানেও চুপচাপ। সব কাজ ঠাণ্ডা মেজাজে সেরে দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আসে।

মহুয়া ফোটার কাল এলে শুরু হয় নাচ গান। মেয়ে পুরুষে নাচে। নাচের শেষে মহুয়ার মদ খেয়ে ফূর্তি করে। হাসির হর্‌রা ওঠে, কিছু ঢলাঢলি হয়। কিন্তু চন্দ্রাম্মা একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে গুম মেরে বসে থাকে। তাকে কেউ কখনও মাতাল অবস্থায় হাসতে দেখেনি।

একটি লোক আসে গুরুপ্পার ঘরে প্রতি মাসে একবার করে। সে দু-তিনদিন থেকে চলে যায়। আসে একটি বিশেষ চিহ্নিত দিনে, যেদিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে।

ঐ দু'তিনটে দিন কেউ কেউ হাসতে দেখেছে চন্দ্রাম্মাকে।

লোকটা আসে চন্দ্রাম্মার বাপের বাড়ি থেকে। মাসাম্মা তাকে ডাকে মামা বলে। আসলে কিন্তু লোকটি মাসাম্মার মামা নয়। ওর মামা বেশ জোয়ান অবস্থায় বনে কাঠ কাটতে গিয়ে ময়ালের পেটে গেছে। এই ভূমানি নাগান্না লোকটি আসলে তার মামার বন্ধু। মাসাম্মা তাই ওকে মামা বলে ডাকে। ভায়ের বন্ধুর সুবাদেই চন্দ্রাম্মার বাড়িতে আসে নাগান্না।

মৌচাক ভাঙার কাজে গুরুপ্পার মতো ওস্তাদ কেউ নেই এ তল্লাটে। এই পাহাড়ী মৌচাক ভাঙা বেশ জটিল কাজ। এতে প্রায়ই দুজন মানুষের সাহায্যের দরকার হয়।

পাহাড়ের অনেকখানি উঁচুতে একটা বেরিয়ে আসা পাথরের তলায় ধরা যাক বিশাল একটা মৌচাক হয়েছে। সেই মৌচাকটা ভাঙতে হবে। একটা বাঁশের সিঁড়ির মাথায় আর নীচে শক্ত চার টুকরো দড়ি বাঁধতে হবে। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা শক্ত সমর্থ লোক সিঁড়ির মাথার দড়ি দুটো টেনে ধরে রাখবে। সে সিঁড়ি ঝুলে থাকবে শূন্যে। সিঁড়ির নীচ থেকে মাটি অবধি ঝুলবে আরও দুটো দড়ি। নীচের দুটো দড়িও ধরে থাকবে আরেকজন লোক, সে বিশেষ বলশালী না হলেও চলবে। সে শুধু নীচের দড়ি দুটো ধরে পাহাড়ের ওপরের মানুষটির নির্দেশে চলাফেরা করবে। এবার মধু সংগ্রহকারী, যে ঐ সিঁড়িতে একটা দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে, সে এগোবে ঐ মৌচাকের দিকে। তাকে শূন্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঐ ওপর আর নীচের দুটো লোক। সে শূন্যে দুলতে দুলতে ঐ মৌচাকের দিকে এগোতে থাকবে। তার পিঠে ঝুলছে একটা বাঁশের ঝাঁপি। তার ডান হাতে ধরা আছে একটা মশাল। মশালের মাথা থেকে বুলবুলিয়ে উঠছে ধোঁয়া। কাঁচা পাতার নুটিতে আগুন ধরিয়ে প্রচুর ধোঁয়া তৈরি করা হয়েছে। সেই ধোঁয়ার গন্ধ পেলেই মৌচাক ছেড়ে পালাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি।

মধু সংগ্রহকারীর আপাদমস্তক জড়ানো থাকবে কাপড় অথবা চটে। শুধু খোলা থাকবে চোখ দুটি। মনে হবে সে যেন কোন মানুষ নয়, অতিপ্রাকৃত জগতের কোন জীব।

ধোঁয়ার তাড়ায় মৌমাছিরা উড়ে গেলে একটা ধারালো কাঠের টুকরো দিয়ে মৌচাকটাকে খণ্ড খণ্ড করা হবে। ঐ মধুভরা টুকরোগুলোকে ভরা হবে বাঁশের ঝাঁপিতে। তারপর কাজ শেষ হলে লোকটা সিঁড়ি বেয়ে, দড়ি ধরে সরসর করে নেমে যাবে অনেক নীচে।

পাহাড়ী বনে দেখা যায় প্রচুর মৌচাক। এক একটা এলাকায় একাধিক মৌচাক গাছের কোটরে বা

পাহাড়ের খাঁজে অথবা গাছের মোটা ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। চেঞ্চুদের বিশেষ বিশেষ এলাকার লোকে তাদের এলাকার মৌচাকের অধিকারী। সেখানে অন্য কোন এলাকার লোক এসে মৌচাক ভাঙতে পারবে না।

মৌচাক ভাঙার ক্ষেত্রে মধু সংগ্রহকারীর প্রাণ-ভোমরাটি রয়েছে পাহাড়ের ওপরে দড়ি ধরে থাকা ঐ লোকটির হাতে। সে যদি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক হাতের দড়ি ছেড়ে দেয় তাহলে মধুসংগ্রহকারীর মৃত্যু অবধারিত। অনেক নীচে পাথরে মাথা ঠুকে পড়ে মরবে। তাই চেঞ্চুরা সাধারণত নিজের ভাই কিংবা জ্ঞাতিগোত্রকে ওপরের দড়ি ধরার জন্যে ডাকে না। তাদের মনের ভেতরে একটা লোভ থাকতে পারে। তারা ঐ লোকটাকে নীচে ফেলে দিলে তার বিধবা বউটাকে বিয়ে করতে পারবে এবং মৃতের যা কিছু সম্পত্তি ভোগ করবে। তাই সাধারণত মধু সংগ্রহকারীরা নিজের শালাকে এই কঠিন কাজটি করার জন্য ডেকে নেয়। সে কখনো ঐ রকম কুকর্ম করে তার বোনের মাথার সিঁদুর মুছে দেবে না।

গুরুপ্‌পার নিজের শালা ময়ালের পেটে যাওয়ায় সে একটা যোগ্য লোকের সন্ধান করে ফেরে। যে লোকটা বিশ্বাসী হবে এবং তাকে মৌচাক ভাঙার কাজে সাহায্য করবে। এ বিষয়ে একদিন সে চন্দ্রাম্‌মার সঙ্গে পরামর্শে বসল।

কি করা যায় বল তো?

কিসের?

এই মৌচাক ভাঙার কাজে কে আমাকে সাহায্য করবে? ভরসা করা যেতে পারে এমন লোক তো চাই।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চন্দ্রাম্‌মা। এক সময় মরদের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, একটা নাম মনে পড়েছে, যদি তুমি রাজি থাক তাহলে বলি।

কে সে?

আমার ভায়ের বন্ধু ভূমানি নাগান্‌না। তুমি আমার বাপের বাড়িতে ওকে দেখেছ।

গুরুপ্‌পা বলল, হাঁ হাঁ, দু তিনবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এখানেও সে একবার এসেছিল।

ওকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। যদি বল, আমি একদিন বাপের বাড়ি গিয়ে ওকে ডেকে আনব।

এ তো খুবই ভাল কথা রে।

সেই থেকে নাগান্‌না প্রতিমাসে পূর্ণিমায় একদিন করে গুরুপ্‌পার বাড়িতে আসে, ওকে মৌচাক ভাঙার কাজে সাহায্য করে, দু তিনদিন থেকে বাড়ি ফিরে যায়।

বেশ কিছুদিন ধরে এমনি নিয়মিত নাগান্‌না আসছে যাচ্ছে। ভাল মানুষ গুরুপ্‌পার মনে নাগান্‌না সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বাপের বাড়ির লোককে কাছে পেয়ে চন্দ্রাম্‌মার মুখে হাসি ফোটে। এ দৃশ্য সরল মনে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে গুরুপ্‌পা।

হাঁ, তাগদ আছে বটে নাগান্‌নার। ওপরের দু-খানা দড়ি ধরে সে যখন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে আর সিঁড়ির ওপর ভর করে দুলতে দুলতে এগোতে থাকে একটা জোয়ান মরদ তখন সে দৃশ্য দর্শকের চোখে সৃষ্টি করে বিপুল এক বিস্ময়! নাগান্‌না আর গুরুপ্‌পা দুজনেই তাগড়াই জোয়ান।

বেশ কয়েকবার মৌচাক ভাঙার কাজে গুরুপ্‌পাকে সাহায্য করেছে নাগান্‌না।

এই মধু সংগ্রহের কাজে প্রতিবেশীরা একমত হয়ে গুরুপ্‌পাকে নির্বাচন করেছে। কারণ সে চেঞ্চুদের ভেতর এ কাজে যোগ্যতম ব্যক্তি।

নাগান্‌না যখন আসে তখন গুরুপ্‌পার বাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা যায়, হয়তো কুণ্ড থেকে জল আনতে গেছে চন্দ্রাম্‌মা, গুরুপ্‌পা মহাসমাদরে নাগান্‌নাকে ডেকে দাওয়ার ওপর বাঁশের চাটাইতে বসায়।

মাসাম্‌মাকে বলে, মামা এসেছে রে, তোর মাকে জলদি ডেকে নিয়ে আয়। একটা খরগোশের মতো লাফাতে লাফাতে মাসাম্‌মা কুণ্ডের দিকে ছোটে। মা, মা মামা— উত্তেজনায় পুরো কথাটা শেষ করতে পারে না সে।

মাসাম্‌মা এই নতুন মামাটিকে পেয়ে একেবারে জমে গেছে। নাগান্‌না যখনই আসে তখনই মাসাম্‌মার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কোনও মেলা থেকে কপালের টিপ অথবা রেশমি চুড়ি, নিদেনপক্ষে কিছু মেঠাই।

নাগান্‌নাকে দূর থেকে দেখলেই, উত্তেজনায় চেঁচাতে থাকে মাসাম্‌মা। এটা তার নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে জেগে ওঠা উচ্ছ্বাস।

মেয়ের গলায় মামা এসেছে ডাকটা বাতাসে ভেসে গেলেই চন্দ্রাম্‌মা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেশিনীদের কাছে সে মনের উচ্ছ্বাসটা চেপে যায়। সে শান্তভাবে কুণ্ড থেকে জল তুলে নিয়ে ঘরের পথ ধরে। কেউ তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখুক এটা সে চায় না। মন চঞ্চল হলেও সে ধীরে ধীরে পা ফেলে কুণ্ডের এলাকা ছাড়িয়ে চলে যায়।

কোন প্রতিবেশিনী হয়তো বলে, তাড়াতাড়ি হাঁটো, ভাই বলে কথা। সে চলার পথে ফিরে তাকিয়ে একটুকরো মৃদু হাসি উপহার দিয়ে যায়।

তার মরদ গুরুপ্‌পার সামনে নাগান্‌নাকে বসে থাকতে দেখে মনে মনে খুশিতে ভরে ওঠে কিন্তু প্রকাশ ঘটে না তার মুখের ভাবে। অবশ্য নাগান্‌নার তিনদিনের অবস্থানের ভেতর কখনও কখনও তার চোখে খুশির ঝিলিক দেখা যায়। সেই খুশিটা ধরা পড়ে গুরুপ্‌পার চোখে। সে নিজেও খুশি হয়। কোনওরকম সন্দেহের মেঘ ঘনায় না তার মনের ওপর।

অতি সাদা সরল মানুষ এই গুরুপ্‌পা। লম্বা সরল একটা বাঁশের মতো বেড়ে উঠেছে সে। তেমনি চিকন শ্যামল রং তার। বউয়ের জন্য, মেয়ের জন্য, চারদিকের মানুষজনের জন্য তার মনটা বাঁশের পাতার মতো তির্‌তির্‌ করে কাঁপতে থাকে।

তার হৃদয়টা যেন চেম্বু, বা একটা গভীর পাত্র যার ভেতরটা পূর্ণ হয়ে আছে দুধে। এই সুধা দিয়েই যেন দেবতা তার মনটাকে ভরে দিয়েছেন।

সে চন্দ্রাম্‌মাকে ডাক দিয়ে বলে, শালা কুটুম এল, তার খাওয়ার কি ব্যবস্থা রেখেছিস?

চন্দ্রাম্‌মা চোখের কোণে তাকিয়ে বলে, তুমি ঘরের মনিব, তোমারই তো ব্যবস্থা করার কথা। আসন ছেড়ে ছিটকে উঠে পড়ে গুরুপ্‌পা, ঘরের কোণ থেকে বের করে আনে তীর আর ধনুক।

চন্দ্রাম্‌মা বাধা দিয়ে বলে, রাখো তোমার বীরত্ব। তোমরা বসে বসে আড্ডা জমাও, আমি খাবার জোগাড় করে আনছি। বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায় পাখি ধরার জাল নিয়ে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দেখা যায় যে খালি হাতে ফেরেনি। লতায় বাঁধা দুটো পাখি ঝুলছে তার হাতে। চন্দ্রাম্‌মা শুধু পাখি ধরাতেই ওস্তাদ নয়, খরগোস, কাঠবেড়ালি সবই তার জালে এসে পড়ে।

দূর থেকে চন্দ্রাম্‌মাকে আসতে দেখে গুরুপ্‌পা চেঁচিয়ে বলে, আজ কি শিকার করে আনলি ভায়ের জন্যে?

মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে চন্দ্রাম্‌মা দুটো হাত তুলে দেখায়। এক হাতে দুটো কবুতর আর অন্য হাতে একখণ্ড মেটে আলু।

তাই দিয়েই রাতে খাবার তৈরি হয়। বনের ভেতর সূর্য ডুবে যাবার আগেই রাতের খাবার কাজটা সেরে নেয় ওরা।

ভালবাসা যে কখন কোন ফাঁকে মনের ভেতর ঢুকে পড়ে তা আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারে না। এ যেন বনের গভীরে চোরা আলোর হঠাৎ ঢুকে পড়া।

একদিন একটা দৃশ্য দেখেছিল মল্‌লাম্‌মা। সে দৃশ্যটা ভালবাসার কি উপভোগের তা স্পষ্ট করে ধরা পড়ার আগেই মুছে গিয়েছিল ছবিটা।

চেঞ্চুদের একটা অলিখিত নিয়ম আছে, ঘরের ভেতর রাতে স্ত্রী পুরুষের দেহ-মিলন ঘটাবে না। বনের ভেতর দিনের বেলা কোন নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষের আড়ালে তারা মিলিত হবে।

মল্‌লাম্‌মা সেদিন তার মরদ গুল্‌লা টোটাইয়াকে নিয়ে নর্মলীলায় মেতেছিল। সুরত ক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন পাশের একটা ঝোপে কিছু শুকনো পাতার ওপর কারুর পায়ের

খসখসানির আওয়াজ পেল। ভালুক কিংবা বাঘ যে নয় তা সে বুঝেছিল। পায়ের আওয়াজে কোন মানুষ বলেই তার মনে হল। হয়ত তারই মতো অন্য কেউ এ বনে এসে যেতে পারে, তাই সে টোটাইয়াকে দু হাতে চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আর কেউ এসেছে।

ওরা ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়ে গেল। টোটাইয়া কোন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু শায়িত অবস্থায় মল্লাম্মা ঝোপের ফাঁকফোকর দিয়ে ওপারের দৃশ্যটা খুব স্পষ্ট না হলেও দেখতে পাচ্ছিল। তার মনে হল, একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রীলোক ওপারে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ও চন্দ্রাম্মার মুখটাকে দেখতে পাচ্ছিল। যে পুরুষটা ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল তাকে মল্লাম্মা চিনতে পারল না। তার কেমন যেন মনে হল ঐ মানুষটা গুরুপ্পা নয়, কারণ সে একটু আগে গুরুপ্পাকে তার দাওয়ায় বসে পাখির খাঁচা তৈরি করতে দেখে এসেছে।

মল্লাম্মার মনে হয়েছিল এ লোকটা কি তাহলে ভূমানি নাগান্না, যাকে চন্দ্রাম্মা দাদা বলে পরিচয় দেয়?

এতদিনে ওরা সকলে জেনে গেছে নাগান্না ওর নিজের দাদা নয়, ভায়ের বন্ধু। গুরুপ্পার চাক ভাঙার কাজে সাহায্য করতে আসে।

কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট হওয়ার আগে চন্দ্রাম্মারা দ্রুত পা চালিয়ে বনের বাইরে চলে গিয়েছিল।

মল্লাম্মা কিন্তু তার গভীর সন্দেহের কথাটা ফাঁস করে দেয়নি টোটাইয়ার কাছে। সে জানে টোটাইয়া পেট আল্‌গা লোক, কথাটা শোনামাত্র চাউর করে দেবে বন্ধুবান্ধবের কাছে, সারা এলাকায়। টোটাইয়া চাক ভাঙার ব্যাপারে গুরুপ্পার প্রতিদ্বন্দ্বী। এ তল্লাটের চেঞ্চুরা তাকে ফেলে গুরুপ্পাকেই মধু সংগ্রহের কাজটা দিয়েছিল, তাই গুরুপ্পার ওপরে মনে মনে রাগ ছিল টোটাইয়ার।

এসব খবর মল্লাম্মার অজানা নয়, তাই সে আজকের দৃশ্যটা মনে মনে যা বুঝল, বাইরে প্রকাশ করল না।

সাঁঝবেলায় কুণ্ডে জল আনতে গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাম্মার সঙ্গে। সে তীক্ষ্ণ চোখ মেলে খুঁজছিল ওবেলার কোন ছবি চন্দ্রাম্মার মুখে চোখে ফুটে ওঠে কিনা। কিন্তু না চোখ মুখ একেবারে স্থির। দুরন্ত বাতাসের ছোঁয়ায় একটি চুলও নড়েনি, চোখের একটি পাতাও কাঁপেনি।

চন্দ্রাম্মা যখন জল নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখনও পেছন থেকে তাকে তাড়া করছিল মল্লাম্মার কৌতূহল। কে সেই পুরুষ যে তাকে আজ গভীর বনের ভেতর ভোগ করেছে। কৌতূহলটা মল্লাম্মার মগজের ভেতর থেকেই গেল, কোনরকম সমাধানে সে পৌঁছতে পারল না।

কিছুদিন ধরে যাত্রী নিয়ে শ্রীশৈলম মন্দিরে যাওয়ার সময় নাগান্না সঙ্গ দিচ্ছে গুরুপ্পাকে। মেয়ে বউ এর সঙ্গে সেও হয়ে গেছে গুরুপ্পা পরিবারের একজন। যাত্রীদের সেবা যত্নে সেও অংশ নিচ্ছে, গুরুপ্পা আর চন্দ্রাম্মাকে সাহায্য করছে নানাভাবে।

সাপের দেবতা নাগেন্দ্র উৎসব হয় কার্তিক মাসে। চেঞ্চুদের ভেতর তিনদিন ধরে চলে এ উৎসব। মেয়েরা নানারকম পূজার উপকরণ নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ঢিবির কাছে যায়। সে ঢিবির মাঝখানে একটা গর্ত। ঐ ঢিবিতেই সর্পদেবতা নাগেন্দ্রের বাস। মেয়েরা ঢিবির ওপরে ধূপ আর প্রদীপ জ্বেলে দেয়, দুধ আর ফলমূল রেখে দেয় গর্তের বাইরে। তাদের ধারণা সাপের দেবতা এসে তাদের ভোগ খেয়ে যাবে।

গর্তের চারদিকে সিঁদুর আর হলুদ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, উপচার সাজিয়ে নাগ-পূজা করল চন্দ্রাম্মা। আশপাশে কেউ ছিল না। চোখ বন্ধ করে করজোড়ে বসে ছিল সে। যেহেতু পুরুষেরা এ পূজায় অংশ নেয় না, সেজন্য কাছে পিঠে কোন পুরুষ ছিল না।

সাধারণত মেয়েরা দল বেঁধে যায় কিন্তু সেদিন অসময়ে একাই গিয়েছিল চন্দ্রাম্মা। কিছুদূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওর পূজা দেখছিল নাগান্না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সর্পদেবতা গর্ত থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে তার ফণা দোলাচ্ছে। চোখ বন্ধ ছিল চন্দ্রাম্মার তাই সে দেখতে পায়নি নাগেন্দ্রকে।

একটা ভয়াবহ কিছু ঘটতে চলেছে অনুমান করেই সেদিকে ছুটল নাগান্না। হাতে একটা ঢিল তুলে

নিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে মারল সাপের ফণায়। সাপটা আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু না। সে ছোবল না মেরে ফণা গুটিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল গর্তের ভেতর।

চোখ বন্ধ ছিল বলে পুরো ঘটনাটা দেখতে পেল না চন্দ্রাম্মা। সে ঢিল পড়ার একটা শব্দ শুনে কিছু পরে ধীরে ধীরে চোখ মেলেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল সাপের মাথাটা গর্তের ভেতর ডুবে যাচ্ছে, অমনি সে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, নাগেন্দ্র তার পূজা গ্রহণ করেছেন।

সেদিন কিন্তু চন্দ্রাম্মার কাছে ঘটনাটা ভেঙে বলেনি নাগান্না। কারণ সে জানত, নাগ দেবতার অসম্মান সইতে পারবে না মেয়েরা। নাগান্না কিন্তু সেই বিভীষিকার হাত থেকে চন্দ্রাম্মাকে রক্ষা করতে পেরে মনে মনে গভীর নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছিল।

এমনি একটি ভালবাসার পাকে জড়িয়ে পড়েছিল দুজনে। সকলের দৃষ্টির অগোচরে এই দুটি নারী পুরুষকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছিল একটা অজগর।

নাগেন্দ্রের রূপ ধরে শেষ ছোবলটা মারল কিন্তু নাগান্না। এই দংশনটা গিয়ে পড়ল সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর একটি মানুষের শিরে। সে মানুষটা অতি নির্বোধ আর নিরেট, গুরুপ্পা।

সেদিন পূর্ণিমার আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। এমনকি গাছের পাতাপত্র থেকে গড়িয়ে পড়ছে সে আলো মাটিতে। দোল উৎসবের দিন সেটি। জমে উঠেছে নাচগানের আসর। মাঝে মাঝে মহুয়ার মদ খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পুরুষগুলো। মেয়েরা সে দৃশ্য দেখে হাসছে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছিল, তখনও কিছুটা ঘোরের ভেতর ছিল গুরুপ্পা। সে যেন সেই ঘোরের ভেতর থেকেই দেখল, তার স্ত্রীর অর্ধেক কাপড় কখন টেনে নিয়ে নিজের গায়ে জড়িয়েছে নাগান্না। রাতে সে এমনি করেই শীত তাড়াবার চেষ্টা করছিল নিশ্চয়ই। এ রীতিটা আছে চেঞ্চুদের ভেতর, তবে সেটা স্বামী স্ত্রীর ভেতরই সীমাবদ্ধ।

একটা ছোট্ট শাড়ি কেনা হয় স্ত্রীর জন্যে, তার সামান্য খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে লেঙট করে পরে পুরুষেরা। বাকি শাড়িটুকু নারীর পরিধেয়। কিন্তু বনপাহাড়ী অঞ্চলে রাতে শীত নামে, তখন স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাগাভাগি করে গায়ে দেয় স্ত্রীর ঐ পরিধেয় শাড়িটা।

একই বিছানায় একটু তফাতে শোয় নাগান্না, কিন্তু আজ রাতে যেন সে বড় কাছে সরে এসেছে। চন্দ্রাম্মার নিজের পরিধেয় শাড়ির একাংশ নাগান্নার গায়ে জড়ানো। দুজনে রাতে বড় কাছাকাড়ি সরে এসেছিল মনে হয়। তবু সব দেখেও মনের স্বাভাবিক উদারতাটা বিসর্জন দিল না গুরুপ্পা। সে বিচার করে ভাবল, মদের নেশায় এমনটা হলেও হতে পারে। এটাকে একটা অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে ধরা যায়।

গুরুপ্পা সব ঘটনাটাকে লঘু করে দিয়ে বলল, ওঠ হে স্যাঙাৎ, মৌচাক ভাঙার কাজটা শেষ রাতেই সেরে নিই। আমি বাইরে বেরুলাম, এখুনি আসছি, তুমি তৈরি হয়ে থেকো। ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেল ঝটপট একটা কাপড় টেনে নেওয়ার শব্দ।

উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বিশাল মৌচাক। একটা কালো ভালুক যেন পাহাড়ের খাঁজ ধরে ঝুলে আছে। শেষ রাতেও চাঁদের আলো ফিন্‌কি দিয়ে ফুটছে। পাহাড় বেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, নাগান্না, তার দুহাতে ধরা দুখণ্ড দড়ি। সিঁড়িটা গুরুপ্পাকে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে শূন্যে। একটা দৈত্য যেন দু হাতে ধরে রেখেছে প্রাণ-রজ্জু। সিঁড়ির নীচের দুটো দড়ি সাপের মত সর্‌সর্‌ করে নেমে গেল নীচে। খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রাম্মা। ঘরের ভেতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মাসাম্মা। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এরা তিনজন। আজ সবচেয়ে বড় মৌচাকটা ভাঙবে গুরুপ্পা। সূর্য উঠলেই এই বিশাল মৌচাক ভাঙার দৃশ্যটি দেখবার জন্য জড়ো হয়ে যাবে কৌতূহলী জনতা। তাই শেষ রাতেই এই বিশাল কাজটি করার ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে।

ওরা জানে, ফাগুয়ার রঙ মাখামাখি আর হুল্লোড়ের পর বেলা অবধি ঘুমোবে মহল্লার লোকেরা।

দুটো দড়ির মাঝখানে দোল উৎসবের দোলনার মতো শূন্যে দুলছে সিঁড়িটা। হাতে একটা ধোঁয়ার মশাল নিয়ে সেই সিঁড়ির ওপর নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে গুরুপ্পা। এবার দোল খেতে খেতে সিঁড়ির

ওপর দাঁড়ানো মানুষটা এগিয়ে চলল ঐ খাঁজ আঁকড়ে ধরা ভালুকটাকে বধ করতে। প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে ঘাতক। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে গেছে মৌমাছিগুলো। সদ্য ঘুম ভাঙা পাখা মেলে তারা বাসা ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

এবার পিঠের ঝাঁপি থেকে খাঁড়ার মতো পাতলা কাঠের টুকরোটাকে বের করে আনল গুরুপ্পা। তারপর মহা বিক্রমে সে চাকভাঙার জন্য শূন্যে তুলল অস্ত্রটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা। খসে পড়ল নাগান্নার দুহাতের দড়ি। শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে সিঁড়ি সমেত নামতে লাগল গুরুপ্পা। মাঝে একটা গাছের ডাল ধরে সে বাঁচার শেষ চেষ্টা করল কিন্তু সরু ডালটা তার ভার সইতে পারল না, মড় মড় করে ভেঙে পড়ল।

খাদের কিনারে পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল গুরুপ্পা। সরল নিষ্পাপ একটা মানুষ কুটিল নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে ধরাশায়ী হল।

বেলা তখন বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে। মাসাম্মার কান্না শুনে জড়ো হয়ে গেল প্রতিবেশীরা। মা বাবা আর মামাকে দেখতে না পেয়ে সে তারস্বরে চিৎকার করছিল। তার কান্নার শব্দ শুনেই জড়ো হয়ে গিয়েছিল সবাই।

চেঞ্চুরা জানত, যে কোনদিন গুরুপ্পা ভাঙবে ঐ মৌচাকটা। ওরা সবাই মিলে ছুটল পাহাড়ের দিকে। দূর থেকে দেখল কালো ভালুকের মতো সেই মৌচাকটা তখনও ঝুলে আছে, কেউ হাত দেয়নি তার গায়ে।

কাছে গিয়ে দেখা গেল এক বিভৎস দৃশ্য। সিঁড়ি সমেত পড়ে আছে গুরুপ্পা, তার দেহের নিম্নাংশ বাঘে খেয়ে গেছে। চারদিক শুনশান, কেউ কোথাও নেই। না, চন্দ্রাম্মা আর না, নাগান্না।

কোথায় গেল ওরা! চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলল কিন্তু কেউ হদিশ পেল না তাদের।

কেউ মন্তব্য করল, ওদের দুজনকে আগেই হয়ত একটা বাঘ আর বাঘিনী ধরে নিয়ে গেছে, পরে বাঘটা এসে গুরুপ্পার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছে।

বুদ্ধিমান কেউ প্রশ্ন তোলে, নাগান্না তো ছিল পাহাড়ের ওপরে, সে কি করে নীচে পড়ল? বাঘ তো আর তাকে ধরবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে না।

কেউ নাগান্নার পক্ষ সমর্থন করে বলল, দড়ি হাত থেকে খসে যাওয়ার সময় সে ধরে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টায় কিনারা পর্যন্ত এসেছিল, তাই অসাবধানে উল্টে পড়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বিতর্কের কোন সমাধান হল না, কেবল মল্লাম্মার মুখে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে নিশ্চিত বুঝতে পারল, সেদিন বনের ভেতর যে পুরুষটাকে সে চিনতে পারেনি, সে নাগান্না ছাড়া আর কেউ নয়। ওরা দুজনে অবশ্যই হতভাগ্য গুরুপ্পাকে বধ করে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু কোন কথাই সে কাউকে মুখ ফুটে বলল না।

মাসাম্মার নতুন মুনিব

মা বাপ সংসার থেকে মুছে যাবার পর কিছুকাল শুকনো পাতার মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালো মাসাম্মা। কোথাও কেউ দুটি কৃপা করে খেতে দেয় তো খায়, যেদিন কিছু জোটেনা সেদিন শুধু এক পেট কুণ্ডের জল খেয়ে সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ঘুমোয়। বেশীরভাগ রাত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে।

কোনদিন বা বন থেকে শাকপাতা মেটে আলু তার কপালে জুটে যায়। সেদিন শুকনো ডালপালা জ্বালিয়ে সে উনুন ধরায়। ঐ স্বাদে গন্ধে ভরপুর আহার্যগুলি সে সেদ্ধ করে খায়। একটুখানি নুনের জন্য মাসাম্মা গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবেশীদের উঠোনের ধারে। মুখ নিচু করে থাকে, দরকারের কথাটুকু জানায় অতি মৃদু শব্দে।

চেঞ্চুরা দিন আনে দিন খায়। সাধ থাকলেও কোনরকম খয়রাতি করার সাধ্য থাকে না তাদের।

মল্লাম্মা মেয়েটাকে ভালবাসে। সে-ই কেবল স্থির নিশ্চিত জানে, চন্দ্রাম্মার পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী। মেয়েটাকে দেখে তার দুঃখ হয়, চেঞ্চুদের ভেতর এমন সুন্দরী মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। কলাপাতার মতো চিকন গা মেয়েটার, মুখের আদলখানা লম্বা, মাথায় তেলহীন লাল চুলের বোঝা। মায়ের কাকুই দিয়ে ওই চুলই সে আঁচড়ে রাখে প্রতিদিন দু'বেলা চান করে, মায়ের ফেলে যাওয়া কাপড় রোজ ধুয়ে শুকিয়ে পরে।

শ্রীশৈলমে পুজোর মরসুমে এ বছরও যাত্রীরা খোঁজ করেছে গুরুপ্পাকে। তার জীবনের নিদারুণ পরিণতির কথা শুনে তারা হায় হায় করেছে। অনেক সান্ত্বনার সঙ্গে কিছু কিছু টাকাপয়সাও পেয়েছে মাসাম্মা। সে সাধ্যমতো তাদের সেবা করেছে, কিন্তু সঙ্গে যায়নি।

পরের বছর গুল্লা টোটাইয়ার সঙ্গে মাসাম্মাকে যাত্রী তদারকির কাজে পাঠিয়ে দিল মল্লাম্মা। প্রতিবছর যাত্রী নিয়ে অন্যদের মতো টোটাইয়া একাই যেত। এবছর মাসাম্মা তার সঙ্গে।

টোটাইয়ার সঙ্গে মাসাম্মা যাচ্ছে শুনে অনেক যাত্রী ওই দলে ভিড়ে গেল। টোটাইয়ার সঙ্গে থাকায় মাসাম্মা-র খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হল না।

শ্রীশৈলমে যাওয়ার মাঝপথে খুদে আকারের একটা পাহাড়ী শহর পড়ে। একরাত সেই শহরের চটিতে কাটায় যাত্রীরা। দু-চারঘর খ্রিস্টানও অনেকদিন থেকে বাসা বেঁধে আছে সে শহরে। সেসিল অরওয়েল প্রথম জীবনে হায়দ্রাবাদে কাজ করতেন। এখন এই বন-পাহাড়ী শহরে রিটায়ার জীবনযাপন করেন। ছেলে ডিক পড়ে হায়দ্রাবাদের একটা কনভেন্টের হায়ারক্লাসে। ওই একমাত্রই ছেলে, তাই মায়ের নয়নের মণি। মিসেস পেগি আজ দু-বছর হল প্যারালিসিসে পঙ্গু, বহু চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু আখেরে শূন্য। ছেলে বাইরে, সেসিলই দেখাশোনা করেন স্ত্রীর। পুরুষ মানুষ তাই সবদিক একহাতে সামলে উঠতে পারেন না।

যাত্রীরা আজ রাতে বিশ্রাম নেবে এই শহরের চটিতে। কাল ভোর পর্যন্ত কোনও কাজ নেই টোটাইয়ার। সে মাসাম্মাকে বলল, যাবি এক জায়গায়?

বড় বড় দুটো চোখ টোটাইয়ার মুখের ওপর রেখে সে একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকল।

টোটাইয়া তার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, চল না আমার সঙ্গে, গেলেই দেখতে পাবি। খুব ভাল মানুষ ওরা, কিশ্চান।

মাসাম্মা কখনও কিশ্চান বলে কী ধরনের জীব তা জানে না, তাই সে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠল। সন্ধ্যার আগেই টোটাইয়ার সঙ্গে ও গিয়ে উঠল অরওয়েল সাহেবের বাড়ি।

বেলাশেষের গাঢ় হলুদ রংটা এসে পড়েছিল মি. সেসিলের বাগানে। বেশ সাজানো বাগান। দু-চাররকম সিজন ফ্লাওয়ার, আর কয়েকটা ফলের গাছ রয়েছে। কোনও একটা গাছের পাতার আড়ালে বসে হলুদ পাখিটা ভারী মিষ্টি সুর তুলে ডাকছিল, কিন্তু তাকে কোনও ভাবেই দেখা যাচ্ছিল না। মাসাম্মা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোঁজ করল পাখিটার কিন্তু হদিশ পেল না।

টোটাইয়ার ডাকে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন অরওয়েল সাহেব। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল তিনি টোটাইয়াকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন।

আরে এসো এসো। দু-দুটো বছর তোমার পাত্তাই নেই।

টোটাইয়া বলল, এ দু-বছর এ শহরে ডেরা পড়েনি। যাত্রীরা আরও এগিয়ে গিয়েছিল, তাই আসা আর হয়ে ওঠেনি।

ঘর থেকে বড় মাপের একটা চাটাই এনে দাওয়ার ওপর বিছিয়ে দিলেন সেসিল সাহেব।

ওটি কে?

টোটাইয়ার ইঙ্গিতে মাসাম্মা সাহেবকে নত হয়ে নমস্কার করল।

টোটাইয়া বলল, কিছুকাল আগে বেচারার মা-বাপ বাঘের পেটে গেছে, ওকে দেখভাল করার কেউ নেই তাই ওকে এবছর আমার সঙ্গে নিয়ে চলেছি। খুব কাজের মেয়ে। যাত্রীরা ওকে দারুণ পছন্দ করে।

সাহেবের কথায় ওরা চাটাইয়ের ওপর বসল।

দাওয়ায় একটা সাদা আর্মচেয়ার পাতা ছিল, ওটাতে সেসিল সাহেব বসলেন না, তিনি বসে পড়লেন চাটাইয়ের একপ্রান্তে।

টোটাইয়া, আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চেয়েছিলাম, মনে আছে?

টোটাইয়ার যেন হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল, সে অমনি বলে উঠল, হ্যাঁ সাহেব।

আমি যে আর পারছি না, টোটাইয়া। একটা মেয়েকে কোনও রকমে জোগাড় করেছি। সে দু'চারটে কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়। তার পর সারা দিন আর রাত্রি আমি এই দুটো হাতে হাল ধরে আছি।

হাঁ সাহেব, বুঝতে পারছি আপনার খুবই কষ্ট।

সেসিল সাহেব হঠাৎ টোটাইয়ার দুটো হাত ধরে ফেললেন। বললেন, তুমি কিছু একটা করলে আমি বেঁচে যাই।

টোটাইয়া ধীরে ধীরে সাহেবের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মাথা ঠুকে নমস্কার করল, তারপর মাথা তুলে বলল, সেবারের কথা ভুলিনি সাহেব, যাত্রীরা সব চটিতে আর আমি গাছতলায়। রাতে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি, অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না। ঝড়ে তার ছিঁড়ে সব বাতি নিভে গেছে। বিদ্যুতের চমক ছাড়া আলো নেই। আমি অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটেছি কোনও একটা আশ্রয়ের খোঁজে। আপনার বাড়ির দাওয়ায় এসে আছড়ে পড়েছিলাম। আপনি শব্দ শুনে মাঝরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন।

হাতের টর্চটা জ্বলে উঠেছিল। সারা শরীরটা তখন ভিজে গেছে আমার। আপনি আমাকে হাত ধরে তুলে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়েছিলেন। বৃষ্টির সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভেজা কাপড়ে আমি থর থর করে কাঁপছিলাম। উঃ, সে রাতে কত করলেন আমার জন্যে। গা ধোওয়ার জন্যে গরমজল করে দিলেন। আপনার পুরনো একটা পোশাক পরতে দিলেন আমাকে। তারপর গরম দুধ খাইয়ে আপনি আমাকে একটা বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলেন।

সে কথা থাক টোটাইয়া। একজন অসহায় মানুষের জন্যে সেদিন আমি যেটুকু করেছি তাকে আমি আর মনে রাখিনি। আমার প্রভুই সে কাজ আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন।

চুপচাপ কতক্ষণ বসে রইল টোটাইয়া। সে যেন সেদিনের সেই ঝড়বাদলের শব্দটা কান পেতে শুনছিল। হঠাৎ তার মনের ভেতরে একটা আবেগ জোয়ারের মতো ফুলে ফেঁপে উঠল।

সে বলল, দেখুন তো সাহেব, এই মেয়েটাকে নিয়ে আপনার চলবে কিনা? বড় ভাল মেয়ে, কোনদিন মুখ তুলে একটা কথা বলতে জানে না, সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কোনওদিনই ওকে ঝগড়া করতে দেখিনি। আমার পল্লীর সকলে ওকে একডাকে চেনে আর ভালবাসে।

সাহেব বলল, এমন একটি মেয়ে পেলে তো আমি হাতে স্বর্গ পাই টোটাইয়া।

সাহেব, বড় অভাবী মেয়েটা। যেখানে একটু ভালবাসা পায় সেখানেই জড়িয়ে থাকে।

সাহেব অধীর হয়ে বলেন, কবে কখন পাব? ওর আর কে আছে?

মা বাপ, ভাইবোন কেউ নেই ওর। আমি চেষ্টা করব মন্দির থেকে ফেরার পথে ওকে এখানে রেখে যেতে।

টোটাইয়া এবার মাসাম্মার দিকে ফিরে বলল, কি রে সাহেবের কাছে থাকবি তো? ভাল পরবি, ভাল খাবি, অনেক আদর পাবি।

এরকম একটা জায়গায় থাকতে পারবে, এ ছিল মাসাম্মার স্বপ্নেরও বাইরে।

সাহেব ভেতরে গিয়ে ওদের জন্য কফি বানিয়ে আনলেন। একটা প্লেটে নিয়ে এলেন কিছু বিস্কিট। তোমরা এখন এটুকু খেয়ে নাও, রাতে আমার এখানেই তোমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা।

টোটাইয়া ব্যস্ত হয়ে বলল, সেদিনের মতো আজ তো আর ঝড়-বাদল নেই, গাছতলাতেই রান্না করে খাব, শোব।

তা হয় না, আমার বাড়িতে না এলে হত, এখন আর হয় না।

টোটাইয়া বলল, আপনার তো রান্নার লোক নেই, এতগুলো মানুষের রান্না কে করবে?

যে করে হোক, খেতে তো হবে। দুজনের হলে আর দুজনেরও হয়ে যাবে।

রাত নামল। বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মাসাম্‌মা খুশিতে ঘর বার করতে লাগল।

সাহেব একফাঁকে মাসাম্‌মাকে মিসেস পেগির কাছে নিয়ে গেলেন। একটা মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিলেন।

মিসেস পেগির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মাসাম্‌মাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন।

সেই রাত থেকেই কিন্তু ঘরের টুকিটাকি অনেক কাজে হাত লাগাল মাসাম্‌মা। পরের দিন যাবার ইচ্ছে না থাকলেও টৌটাইয়ার মুখের ওপর সে কথা বলতে পারল না। সাহেব গত রাতের কিছু খাবার ওদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

টৌটাইয়া পরে নেমে যাওয়ার আগে হাত তুলে সাহেবকে নমস্কার করে বলল, ফেরার পথে মাসাম্‌মাকে আপনার কাছে আমি ঠিক দিয়ে যাব সাহেব।

মি. সেসিলের বাড়িতে তিনমাস কাজে যোগ দেওয়া হয়ে গেল মাসাম্‌মার। মিসেস পেগির প্রায় সব কাজই আজকাল মাসাম্‌মা করে দিতে পারে। মিসেস পেগি একটু বদরাগী মানুষ। ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটা রাখতে ভুল হয়ে গেলেই তিনি ক্ষেপে যান। তখন মুখে যা আসে তাই বলেন। ভয় পেয়ে মাসাম্‌মা ভুলের পর ভুল করতে থাকে। হাতের প্লেট মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দ ওঠে। আরও ক্ষেপে যান মিসেস পেগি। তারপর কখনও গরম কাপ থেকে চলকে পড়ে কমপ্লান।

একসময় বকুনি থামিয়ে শুধু বড় বড় চোখ বের করে তাকিয়ে থাকেন মিসেস পেগি।

মাঝে মধ্যে বেশি চেঁচামেচি শুনে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েন সেসিল সাহেব। তিনি স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনও রকমে পরিস্থিতি সামাল দেন।

অন্যসময়ে মিসেস পেগি অন্য মানুষ। কখনও বা দেখা যায় দুপুরে খাওয়া দাওয়ার শেষে মিসেস পেগির মাথার চুল নিয়ে খেলা করছে মাসাম্‌মা। তখন কিন্তু মিসেস অন্য মানুষ। বেশ স্নেহপ্রবণ। তিনি ওকে ঈশপের গল্প শোনান। ইতিমধ্যে মি. সেসিল সকালে একঘণ্টা করে নিয়মিত ইংরেজি পড়ান মাসাম্‌মাকে। এখন ও ইংরেজি বাক্য কিছু কিছু বুঝতে পারে, নিজেও দু-চারটে কথা বলে ফেলে। মি. সেসিলের ধারণা, আর মাস দুয়েকের ভেতর ও ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে পারবে।

ডিসেম্বরে কাজের পাঁচমাস পূর্ণ হল মাসাম্‌মার। মি. সেসিলের বাড়িতেও সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। বড়দিনের ছুটিতে ডিক আসবে বাড়িতে। বয়স হলে কী হবে উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি মি. সেসিলের। তিনি বাজার থেকে নানারকম জিনিস কিনে এনে ঘর সাজাতে লেগে গেছেন। এমনকি সান্তাক্লজকেও একটা গাছের তলায় হরিণে টানা রথের ওপর বসিয়ে দিয়েছেন। সান্তাক্লজের হাতে ঝলমল করছে রূপালি সোনালি অনেকগুলো কার্ড।

মি. সেসিলের প্রতিটি কাজে দৌড়ে দৌড়ে সাহায্য করছে মাসাম্‌মা। সব কিছু দেখে খুশিতে তার সারা মন ভরে উঠেছে। তা বলে সে একটুও ফাঁকি দিচ্ছে না মিসেস পেগির কাজে।

মাসাম্‌মাকে সঙ্গে পেলে কেমন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যান মি. সেসিল। তিনি সাজানো গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাততালি দিতে থাকেন। আর তার পেছন পেছন তালি দিয়ে ঘুরতে থাকে মাসাম্‌মা।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়স হলে কী হয়, মাসাম্‌মা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেছে। সে এখন কিশোরী। প্রকৃতির একটা আশ্চর্য হাওয়া মাঝে মাঝে তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আজকাল তার মনের ভেতর কি সব ভাবনা যেন জেগে ওঠে। সে ভাবনা নিয়ে কিছু মনে মনে ভাববার আগেই সে সব কোথায় যেন ভেসে চলে যায়। আসলে ও মনে প্রাণে বড় শুদ্ধ। কিন্তু উদ্দাম প্রকৃতিকে ঠেকাবে কী ভাবে?

একটা হলুদ পাখি মাঝে মাঝে এসে ডাক দিয়ে যায়, আর ঠিক সে সময়ে তার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে মিসেস পেগির কাছে জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলেও মুহূর্তে লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় পাখিটার খোঁজে।

মি. সেসিলের কাছে পড়তে বসেও ওই একই দশা। পাখিটা তার মন কেড়ে নিয়ে পালায়। আবার কখন ওর ডাক শুনতে পাবে সেই আশায় ওর সব কাজের ভেতরে ও কান পেতে থাকে।

অনেক আলো, অনেক সাজসজ্জার ভেতরে এক সন্ধ্যায় এসে পড়ল মি. সেসিলের একমাত্র ছেলে ডিক। মিসেস পেগির মুখে ডিক সম্বন্ধে প্রায় সব কথাই শুনে ফেলেছে মাসাম্মা। পড়াশোনায় ভাল, ক্রিকেট খেলায় ওস্তাদ আর সর্বোপরি বেশ লম্বা হ্যাণ্ডসাম ছেলে।

চোখে দেখে মিসেস পেগির কথার সত্যতা বুঝতে পারল মাসাম্মা। যা মিসেস পেগি বলেননি তাও দেখা গেল ষোল-সতেরো বছরের তরুণ মি. ডিকের মুখে। সুন্দর গোঁফ দাড়ি প্রকাশ করছে ডিকের পৌরুষ।

আড়ালে আবডালে থেকে মাসাম্মা চকিতে দেখে নিচ্ছে ডিককে। কিন্তু লজ্জায়, সঙ্কোচে কাছে ভিড়তে পারছে না।

মি. সেসিল একসময় কাছে ডাকলেন মাসাম্মাকে। তখন ড্রয়িংরুমে পিতাপুত্রের বসে গল্প হচ্ছিল। কী একটা কথায় প্রাণ উজাড় করা হাসি হাসছিল ডিক। মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকল মাসাম্মা। চাপা দৃষ্টিতে তাকাল মি. সেসিলের দিকে।

ডিক, এই হল মাসাম্মা।

চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম, এই হল সেই, তোমার মায়ের সেবিকা। নার্স-এর সব কাজ ও করতে পারে। একে বলা যায় কিশোরী-নার্স। ডিক মাথা ঘুরিয়ে হেসে হাত নাড়ল।

সংকুচিত একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল মাসাম্মার মুখে। সেও হাত তুলে পতাকার মতো নাড়তে লাগল।

লেসের কাজ করা হলুদ রঙের ভারী সুন্দর একটা ফ্রক পরেছে মাসাম্মা। এটা তার ক্রিসমাসের উপহার। পনি-টেল করে লাল রিবন দিয়ে চুল বাঁধা। এই কেশ সজ্জাটুকু অনেক কষ্টে তাকে করে দিয়েছে মিসেস পেগি।

তিনি তাকে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ও ঘরে গিয়ে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নে। সে লজ্জায় দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে দেখতে ভোলেনি সে।

নারসিসাসের মতো নিজেকে দেখে সে নিজের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এমন সুন্দর সে! নিজের সঙ্গে মাসাম্মার যেন আজ নতুন করে পরিচয় হল।

দু-তিন বছরের বড় ছোট দুটি ছেলে মেয়ের লজ্জা ডিঙিয়ে ভাব জমতে বেশি সময় লাগল না।

উৎসবের দিন সূর্যের সোনালি আলো গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছিল বলগা হরিণগুলোর ওপর। মনে হচ্ছিল, সান্তাক্লজ হরিণের মুখে বাঁধা সোনার বলগাগুলো ধরে আছে। তারে বাঁধা হরিণের গলার রূপোর ঘণ্টাগুলো মাঝে মাঝে বেজে উঠছে।

উঠোন ভরে অতিথিরা ক্যারল গাইল। তাদের প্লেটে প্লেটে খাবার পরিবেশন করল মাসাম্মা। ঘরের ভেতরে থেকে সে খাবারগুলো সাজিয়ে দিল ডিক।

উৎসব শেষ হল, কিন্তু তার রেশ রয়ে গেল মাসাম্মার মনে। স্বপ্নে জাগরণে সে দৃশ্য ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

হায়দ্রাবাদ ফিরে যাবার কদিন আগে বাড়ির সকলের কাছে একটা প্রস্তাব রাখল ডিক। সে খ্রিস্টান হলেও একবার শ্রীশৈলমের মন্দির দেখতে যাবে। পায়ে হেঁটে দু-তিনদিনের পথচলা দারুণ এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলে মনে হয়েছে তার কাছে।

মি. সেসিল চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে আমার ঘরেই রয়েছে শ্রীশৈলমে যাবার গাইড।

কী রকম?

কেন, এখানে আসার আগে মাসাম্মা কত যাত্রীকে নিয়ে গেছে শ্রীশৈলমে।

বিস্ময় প্রকাশ করল ডিক, মাসাম্মা!

হাঁ হাঁ, ছোটবেলা থেকে ও ওর বাবার সঙ্গে যাত্রী নিয়ে যেতে যেতে পথঘাট সব চিনে ফেলেছে। ও-ই তোমাকে নিয়ে যাবে।

ডিক উল্লসিত হয়ে বলল, তা হলে বেশ মজা হবে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে একসঙ্গে পথ চিনে যাওয়ার এক আলাদা রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু.....।

মিঃ সেসিল বললেন, কিন্তু কি?

আমার সঙ্গে মাসাম্মা গেলে তিন চারটে দিন মায়ের যে বড় অসুবিধে হয়ে যাবে।

মিঃ সেসিল ডিকের কথাটাকে একদম উড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই আমি তো রয়েছি। মাসাম্মা আসার আগে তোমার মায়ের সব কিছু কাজ কে করেছে?

নম্র হয়ে এবার জবাব দিল ডিক, সে কথা ঠিক বাবা।

ছেলে আর স্বামীর কথা শুনে মিসেস পেগি বিছানায় শুয়ে হাসতে লাগলেন।

একদিনের ভেতরেই যাত্রার সব প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেল।

হায়দ্রাবাদ থেকে আসার সময় মায়েব নতুন সেবিকাটির কথা ভেবে একটা ব্যাগ উপহার হিসেবে দেবে বলে নিয়ে এসেছিল ডিক। সেটাতে নিজের পোশাক থালা, গ্লাস সব গুছিয়ে নিল মাসাম্মা। ইস্পাতের একটা ধারাল ছোট্ট কুড়ুল ছিল বাবার, সেটাকে সে ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেলল। কোমরে ফিতের সঙ্গে বেঁধে নিল আংটা পরানো একটা কোদাভালি বা হাঁসুয়া।

ভোর হতে না হতেই সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে বনের পথে পা চালাল।

এই ক-মাসে মাসাম্মার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। চিকচিক করছে তার গায়ের শ্যামলা রং। পনিটেল করেছে, আজকাল দু-একটা ফুলও গোঁজে মাথায়। তা ছাড়া মনের অনেক ভাব প্রকাশ করতে পারছে ইংরেজিতে।

আগে যারা মাসাম্মাকে দেখেছে তারা হঠাৎ মুখোমুখি হলে একেবারে চিনতেই পারবে না। এত পরিবর্তন!

কিছু পথ পা চালিয়ে যাওয়ার পর পাহাড় আর বনের আড়াল থেকে লাল সূর্যটাকে উঁকি দিতে দেখা গেল। চলার পথে দাঁড়িয়ে পড়ল মাসাম্মা। সে নত হয়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল। ওর পেছনে আসছিল ডিক, সেও থেমে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখছিল নম্র, নত মাসাম্মাকে।

এক সময় ডিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে মাসাম্মা বলল, তোমাকে দেরি করিয়ে দিলাম।

একথা কেন বলছ?

এগিয়ে যেতে যেতে মাসাম্মা বলল, তোমরা তো সূর্য প্রণাম কর না, কেবল আমার জন্যে তোমাকে দাঁড়াতে হল।

না না ওইটুকু দাঁড়ানোতে কি এসে যায়। আমি দেখেছি তোমরা বহু দেবদেবীর পূজা কর।

মাসাম্মা বলল, আমাদের ধারণা, আমাদের চারদিকে যত বিপদ আপদ রয়েছে, তার থেকে উদ্ধার করেন আমাদের দেবদেবীরা।

ডিক হেসে উঠল।

থমকে দাঁড়িয়ে মাসাম্মা বলল, তুমি হাসলে যে?

তোমাদের এই সব বিশ্বাসের কথা শুনে।

না, না হাসির কথা নয়। এই বনজঙ্গলে আমাদের থাকতে হয়। সাপের মুখে পা পড়ে যায়। সাপ কামড়ালে অনেক সময় বাঁচার উপায় থাকে না, তাই আমরা সাপের দেবতা নাগেন্দ্রের পূজা করি। তা ছাড়া আমাদের রোগের দেবতা রয়েছেন, ভূত-প্রেত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেও আমরা দেবতার পূজা করে থাকি। তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই বনটা পেরিয়ে গিয়ে যে সবুজ ভ্যালিটা পড়বে সেখানে তুমি আমাদের এক দেবীকে দেখতে পাবে। চলো, আমরা পা চালিয়ে যাই, ওঁর পাশ দিয়েই আমাদেব যেতে হবে।

মিনিট দশেক চলার পরেই সেই সবুজে ছাওয়া স্বপ্নের মতো মনোরম উপত্যকাটা এসে গেল। একটা টিলার কোলে সবুজ একখানা গালচে যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। টিলার গায়ে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় অনেক রকমের গাছ।

মাসাম্মা ওই লনের ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ভ্যালির ওপারে গিয়ে পৌঁছল। ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে ডিককে বলল, ওই যে গাছের তলায় একটা উঁচু পাথর দেখছ না?

হাঁ।

ওই গাছের ওপার থেকে শুরু হয়েছে একটা গাঁও। উনিই ওই পল্লীর দেবী। সারা গাঁওকে উনি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। বিজয়া-দশমীর দিনে গ্রাম থেকে মেয়ে-পুরুষেরা দলে দলে এসে দেবীর পুজো দিয়ে যায়।

ডিক বলল, তোমাদের দেবদেবীর তো অনেক রকম নাম থাকে, এই পাথরের টুকরোটির কি নাম?

মাসাম্মা অমনি বলে উঠল, এমন করে বলতে নেই ডিক, ইনি বড় জাগ্রত দেবী।

কি নাম বললে না তো?

কনক দুর্গাম্মা।

নামটি বলে ও দুর্গাম্মার কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। ডিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখল।

আবার শুরু হল পথ চলা। বহু পাখি আকাশের কোলে ডানা মেলে সূর্যের সোনা মাখতে মাখতে উড়ে গেল।

এখনও অনেক পাখি গাছের ডালে বসে কলরব করছিল। তাদের ভেতর কেউ কেউ কথা শেষ করে উড়ে গেল। কেউবা ওই ডালে বসেই প্রভাতী আড্ডা জমাতে লাগল।

ডিক বলল, ওদেরও বোধহয় ক্রিসমাস হলিডে, তাই বসে বসে গল্পে মেতেছে।

ঝকঝকে দাঁতে খিলখিল করে হাসি ছড়াল মাসাম্মা। তার পর হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দিল সবকটা পাখিকে।

ডিক বলল, এটা কী করলে? ওরা দিব্যি মনের সুখে ঘরের দাওয়ায় বসে আড্ডা দিচ্ছিল।

মাসাম্মা গম্ভীর হয়ে বলল, অলসদের এমনি করেই তাড়া দিয়ে কাজে পাঠাতে হয়। তারপর ডিকের হাতখানা ধরে জোরে টানতে টানতে বলল, চল, ওদের মতোই আমরা উড়ে চলে যাই।

দুজনে বনের ভেতর দিয়ে হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে মাসাম্মা বলল, এসো আমরা এই গাছের তলায় বসি।

ডিক বলল, কেন? এখুনি কি চলার শেষ হয়ে গেল?

না না, তুমি তো ঘরে ফিরে গিয়ে মাকে বলবে, ঠিক সময়ে মাসাম্মা আমাকে ব্রেকফাস্ট দেয়নি।

আরে, পথ চলার সময় অত কেউ নিয়ম কানুন মানে না।

তা হোক, তুমি বোস।

দুজনে বসল সেই গাছতলায়।

সবুজে সোনায় মিলে অপরূপ রোদ মাখা বন, তার মধ্যে এই একজোড়া কিশোর-কিশোরীকে দেখে মনে হল ওরা ভিন্ন জগতের মানুষ।

গাছটার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বুনো লতা। এমন শীতেও কিন্তু তার পাতা ঝরেনি, সে গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল ফুটিয়েছে। অতি মৃদু আর মিষ্টি একটা সৌরভ ছড়াচ্ছে সে ফুলগুলো।

বাড়িতে রোজ সকালে ডিকের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করে মাসাম্মা। সে ডিমসেদ্ধ, কেক আর কলা নিয়ে এসেছে। ডিমসেদ্ধ সে রাতেই করে রেখেছিল। ও ডিককে প্লাস্টিকের প্লেটে খেতে দিল।

ডিক চুপচাপ বসে আছে দেখে মাসাম্মা বলল, কি হল?

তোমার কই?

মাসাম্মা হেসে বলল, আমার না রেখে কি তোমায় সব দিয়ে দেব।

না, তা নয়, এক যাত্রায় এক সঙ্গে খাব।

মাসাম্‌মা নিজের খাবারটাও এবার বের করে প্লেটে সাজাল। হেসে বলল, এবার খাও।

ডিক নিজের প্লেট থেকে একটা কলা তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এটা তুমি নাও।

মাসাম্‌মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওমা কেন, আমারও তো কলা রয়েছে।

ডিক গম্ভীর হয়ে বলল, তোমারটা আমাকে দাও, আমারটা তুমি নাও।

খুব অবাক হয়ে মাসাম্‌মা তাই করল। কিন্তু এ ব্যাপারটার কোনও অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম হল না।

ডিক বলল, কিছু বুঝলে?

মাসাম্‌মা যথারীতি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সে কিছু বোঝেনি।

ডিক বলল, খাবার বিনিময়ের ভেতর দিয়ে আজ আমরা বন্ধু হলাম।

কিশোরী মেয়েটি সেই মুহূর্তে নিজের ভেতর অদ্ভুত এক ধরনের শিহরণ অনুভব করল। কোনও দিন কোনও পুরুষ ছেলে এমন করে তাকে বন্ধু বলে ডাকেনি। সে বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। কেবল দু এক টুকরো খাবার মুখে ফেলে চিবোতে লাগল।

নতুন বন্ধুটি তাকে কিভাবে গ্রহণ করল, তাই দেখার জন্য ডিক খেতে খেতে তাকাচ্ছিল মাসাম্‌মার দিকে। মাসাম্‌মা কিন্তু মুখ তুলে আর তাকাল না।

শীতের হাওয়াতে কি ছোঁয়া লাগল বসন্তের! সে কি দুলিয়ে দিয়ে গেল ওই হলুদ রঙের পুষ্পগুচ্ছকে?

ডিক মাসাম্‌মাকে নীরব থাকতে দেখে আবার বলল, আমার কথাটা তোমার পছন্দ হল না তো।

মাসাম্‌মা মাথাটাকে ডাইনে-বাঁয়ে আর ওপর-নীচে বারবার দোলাতে লাগল। ওতে হাঁ না দুটোই মেশানো।

আনন্দে ওরা পথ চলছে। সন্ধে সকালের কোনও হিসেব নেই। ঝড় উঠলে টিলার কোলে কোনও পাথরের আড়ালে অথবা গুহার ভেতর আশ্রয় খুঁজছে, আবার চাঁদের বুকে জ্যোৎস্নার ঢেউ উঠলে ওরা কোনও গাছের তলায় পাশাপাশি বসে সুন্দরী চাঁদকে দেখছে। কি অপরূপ মাজা রূপোর কান্তি। নীলে রূপোয় সারা গগনমণ্ডল ঝলমল।

দ্বিতীয় দিনে বেলা পড়ে এসেছে। সূর্যের হলুদ আলো বনস্থলী থেকে চুইয়ে পড়ছে সবুজ ঘাসের গালিচায়।

মাসাম্‌মা হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করে হাঁটছিল ডিক। সে-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাসাম্‌মা হঠাৎ ডিকের হাতখানা জোরে টেনে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

এই ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখ, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

বিস্ময়ে চাপা গলায় ডিক বলল, কি?

ফিসফিস করে মাসাম্‌মা বলল, একদম কথা নয়। ওই যে সামনে দেখ। ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় কয়েকটা লাফ দিতে দিতে যেন উড়ে চলে গেল একটা সম্বর।

মাসাম্‌মা বলল, কোন ডাক শুনতে পাচ্ছ?

কান পাতল ডিক। সত্যিই তো, ঘুপ্‌ ঘুপ্‌ ঘুপ্‌, একটা শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে আসছে।

ডিক বলল, কিসের আওয়াজ?

মাসাম্‌মা কোনও উত্তর দেবার আগেই আওয়াজটা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে ছড়িয়ে পড়ল ওই ছোট্ট প্রান্তরে।

ডিক ঝোপের আড়াল থেকে দেখল, সম্বরটা যেদিকে ছুটে গেছে, সেই পথরেখা ধরে একঝাঁক গুলি যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল।

ডিকের গলাটা মুখের কাছে টেনে এনে মাসাম্‌মা ফিসফিস করে বলল, বুনো কুকুরের পাল সম্বরটাকে ধরতে ছুটছে।

অল্প সময়ের ভেতরেই ওরা পশুকণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। বন কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সে শব্দটা বাজছিল। মন্থর হাওয়াটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল সে শব্দে। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে আওয়াজটা স্তিমিত হয়ে এল।

প্রায় একঘণ্টা পরে সূর্য ডুবে গিয়ে চাঁদ উঠল। মাসাম্‌মা বলল, আরও খানিকটা এগিয়ে যাই চলো, তারপর কোনও গাছতলায় বসে রাতের খাবার তৈরি করব।

কিন্তু যদি ওই কুকুরগুলোর মুখোমুখি পড়ে যাই?

মাসাম্‌মা হাসি ছড়িয়ে বলল, এমন সাহসী তুমি?

এটা সাহসের ব্যাপার নয় মাসাম্‌মা, প্রাণরক্ষার তাগিদ।

ওরা বনের পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে গাছের তলায় একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। হরিণের কঙ্কাল। শিং, সাদা হাড়, পায়ের খুর ছাড়া নাড়িভুড়ি রক্তমাংসের লেশমাত্র নেই। চেচেপুছে সব খেয়ে গেছে।

মাসাম্‌মা বলল, ওই কুকুরগুলোর সামনে যারা পড়বে তাদেরই এই দশা হবে।

ডিক শুধু বলল, ভয়ঙ্কর!

গাছের তলায় ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে। এ যেন মজার বনভোজনের আয়োজন।

বন্দুক ছুঁড়ে পাখি শিকার করতে পারে ডিক। তার হাতের নিশানা প্রায় অব্যর্থ। সে কিন্তু এ যাত্রায় বন্দুক নিয়ে আসেনি আর তার নিয়ে আসার কথাও নয়। সে সঙ্গে এনেছে দুটো গুলতি, আর তাই দিয়ে সে আমিষের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ঘুঘু, কবুতর তার পাল্লার ভেতর এলেই নিস্তার নেই।

মাসাম্‌মার মাংস ভোজনে কোনও অনিচ্ছা নেই। কিন্তু সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও প্রাণীবধ পছন্দ করে না। একটি কবুতর হলেই তাদের দুজনেব পক্ষে যথেষ্ট, তার বেশি নয়।

একদিন হাতের কাছে পেয়ে তিন তিনটে পাখি মেরেছিল বলে সব মাংসটুকু ও ডিকের প্লেটে দিয়ে দিয়েছিল। ডিক বিস্মিত হয়ে বলেছিল, তুমি খাবে না?

এত মাংস খেতে আমার ভাল লাগে না। তোমার জন্যে একটি মেরে এনো, আমি রান্না করে দেব।

ডিক বলল, এটা তোমার রাগের কথা মাসাম্‌মা। তুমি না খেলে আমিও খাব না।

সে কি? তোমাদের মাংস না হলে চলে না, দেখেছি।

তুমিও তো খাও, হঠাৎ বন্ধ করে দিলে কেন?

মাসাম্‌মা করুণ গলায় বলল, দেখো, ওরা গাছের ডালে বসে বসে যখন গান করে, কথা বলে, তখন তুমি ওদের গুলতি মেরে নামাও। কেন জানি না আমার বড় কষ্ট হয়।

ডিক বলল, আমি যদি একটা পাখিকে কোনও গাছের ডালে বসতে দেখি আর তাকে গুল্‌তি চালিয়ে নামাই, তা হলে কি তুমি তার মাংস খাবে?

মাসাম্‌মা বলল, ঠিক আছে তাই কোরো।

ডিকের কাঠকুটো কুড়োবার অভ্যেস নেই। মাসাম্‌মার সঙ্গে পড়ে সে গাছের শুকনো ডাল ভাঙতে লাগল। কেবল রান্নার জন্যে নয়, শীতকালে কিছু রাত অবধি জ্বালিয়ে রাখতে হয় শুকনো ডলপালাগুলো। তারপরেই ওরা ঘুমিয়ে পড়ে কম্বল ঢাকা দিয়ে।

ডিক বড় ঘুমকাতুরে। গল্পের ভেতর যতরাতই হোক সে জেগে থাকে, কিন্তু একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর তাকে তোলা যাবে না। উঠবে সেই একেবারে ভোরবেলায়।

মাসাম্‌মা কিন্তু রাতে ঘুমের ভেতরেও কয়েকবার জেগে উঠে বসে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কোনও জন্তু জানোয়ার কাছে পিঠে রয়েছে কিনা।

একরাতে শ্বাস টানতে শুনে সে চমকে উঠে বসেছিল। কোনও জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দ কি সে শুনছে? না, ডিক আরামে ঘুমোচ্ছে, তারই শব্দিত নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে লাগছে। সে মৃদু হেসে তার কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাতের অন্ধকারে সে বনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূর থেকে দেখে, কোনও জন্তুর চোখ জ্বলছে কিনা। হাতের কাছে, ছোট্ট কুঠারটা সে রেখে দেয়। এইটুকু বয়স কিন্তু প্রচণ্ড সাহস আর শক্তি তার। সে বাঘ কিংবা ভালুকের সঙ্গে নির্ভীকভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে, জয় পরাজয় যাই হোক না কেন।

একবার সে একটা ভালুকের সামনে পড়ে গিয়েছিল। তখনও ডিক কনভেন্ট থেকে আসেনি তার বাড়িতে। সে গিয়েছিল মিসেস পেগির জন্য বিশেষ একটি ঝরনা থেকে জল আনতে। সে জানত না বেলাশেষে জানোয়াররা ওই ঝরনায় এসে জল খেয়ে যায়।

ও তখন জল ভরছিল। ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল ভালুকটা। সে ভাবতেই পারেনি তার জল খাওয়ার জায়গায় অন্য কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ভালুক তার থাবাটা ওর পিঠের ওপর রাখল। ও ছিটকে অনেকটা দূরে গড়িয়ে পড়ল। ভরা কলসী গব্ গব্ করে জল ওগরাতে ওগরাতে চলে গেল ঝরনায়।

মাসাম্‌মা ফিরে দেখল, একটা ভালুক ওর দিকে চেয়ে আছে। দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। সাদা সাদা হিংস্র দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে।

মুহূর্তে মাসাম্‌মা তার কোমর থেকে ঝুলে থাকা কুড়ুলখানা টেনে নিল। এখন থপ থপ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে ভালুকটা। একটা হিংস্র ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছে সে। নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের মতো নিঃশ্বাস।

মাসাম্‌মা বুঝে নিল, এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার হাত থেকে নিষ্কৃতির কোনও উপায় নেই। ছুটে পালাতে গেলে সে ধরে ফেলবে।

ঠিক সেই সময় কে যেন তার পেছন থেকে বলল, ভয় কি, এগিয়ে যা। কুড়ুলটা তো তোর হাতেই রয়েছে।

মাসাম্‌মা কোনও দিকে না তাকিয়ে ডান হাতে কুড়ুলটা নিয়ে চালিয়ে দিহ ভালুকটার নাক আর কপালের মাঝখানে। আশ্চর্য! ভালুকটা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

মাসাম্‌মা পেতলের কলসীটা ঝরনা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে জল তুলল। আর্ত পশুটার মুখে মাথায় কিছুটা জল ঢেলে দিয়ে বাড়ির পথে রওনা হল। কিন্তু তার এই বীরত্বের কথা কারও কাছে আর সে বলল না।

পরের দিন মৃত ভালুকটাকে দেখতে পেয়ে শহরতলীর কিছু লোক সোরগোল তুলেছিল। মি. সেসিল শহরের কারও কারও মুখ থেকে সে খবর শুনেছিলেন। তিনি বাড়িতে এসে মিসেস পেগির কাছে বলেছিলেন, তুমি আর মাসাম্‌মাকে ওই ঝরনায় জল আনতে পাঠিও না। অনেকে বলেছে, ওখানে জানোয়াররা জল খেতে আসে। ওখানে একটা ভালুককে নাকি মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

মিসেস পেগির কাছে বসেছিল মাসাম্‌মা। সে সব শুনল, কিন্তু একটা কথাও মুখ ফুটে বের করল না।

অনেক পরে অবশ্য কথাপ্রসঙ্গে মি. সেসিল ঘটনাটা জানতে পেরেছিলেন। তিনি খুশি হয়ে মাসাম্‌মাকে একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন।

মাসাম্‌মা বলেছিল, তোমার ঘড়ি নেব বাবা, কিন্তু আগে বলো, তুমি শহরে এ কথাটা রটনা করে বেড়াবে না।

আরে, আমি কেন, তোর এই বীরত্বের জন্য গভর্ণমেন্টই তোকে পুরস্কার দেবে।

মাসাম্‌মা বলেছিল, আমার কোনও পুরস্কারই চাই না বাবা। ভালুকের থাবা এড়িয়ে মায়ের জন্য জল আনতে পেরেছি, এতেই আনন্দ।

গভীর জঙ্গলের ভেতর শুয়ে রাতে ঘুম এলো না মাসাম্‌মার। স্মৃতিগুলো নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে জোনাকির মতো, ভিড় জমাচ্ছে মগজের চারধারে। আবার চলে যাচ্ছে নাচতে নাচতে। রাতে বনের কি অদ্ভুত রূপ। বুনো ফুলের গন্ধ, নানা ধরনের পাতার গন্ধ, ঘাসের গন্ধ মিলেমিশে বাতাসে ভর করে ভেসে আসে। দিনে কিন্তু সেই মিশ্রিত সুবাস কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এরপর শব্দ। শত শত কীটপতঙ্গের সম্মিলিত ধ্বনি যেন বনের আসরকে মাতিয়ে রাখে। তার ওপর আছে নাটকের কুশীলবেরা। বাঘ, ভালুক, হরিণ, কুকুর থেকে রাতচরা পাখি আর বিচিত্র দর্শন পেঁচা। অরণ্যের রঙ্গমঞ্চে সহসা জেগে উঠেছে প্রচণ্ড আর্তনাদ। মৃত্যুপথযাত্রী সম্বরের করুণ চিৎকার। বাঘের হুংকারও শোনা যায়। তখন থরথর করে বন কেঁপে ওঠে। বিশাল অজগর যখন জ্যান্ত পশুটাকে গ্রাস করতে থাকে তখন অতি সূক্ষ্ম করুণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে বাতাস চিরে চিরে।

আবছা জ্যোৎস্নায় পেঁচাগুলো গাছের কোটর থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নখে গেঁথে তুলে নিয়ে যায় ধেড়ে ইঁদুরগুলোকে। সুযোগসন্ধানী সাপ রাতের আবছা অন্ধকারে গাছের উপর উঠে গিয়ে পাখির ছানাগুলোকে গিলতে থাকে। পাখিদের পাড়ায় তখন শুরু হয় ভীষণ কোলাহল। তারা পাখা ঝাপটে কিছুটা ওপরে উড়ে যায়, আবার ফিরে আসে তাদের বাসায়। মমতার বাঁধন ছিঁড়ে তারা বাচ্চাগুলোকে বাসায় ফেলে রেখে দূরে সরে যেতে পারে না।

রাত আর দিনের সব খবরই রাখে মাসাম্‌মা। চেঞ্চুদের কন্যা বনের অন্ধিসন্ধি চেনে, বনবাসী জীবজন্তুদের সমস্ত আচার আচরণ।

পাশে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ডিক। এ কি তার মাসাম্‌মার ওপর একান্ত নির্ভরতা?

ভোর হলেই সমস্ত বন চঞ্চল হয়ে ওঠে। আলোর একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে সমস্ত জড়তাকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে দেয়।

ডিককে কিন্তু ঘুম থেকে ঠেলে ওঠাতে হল। সে বোধহয় ঠিকমতো ছুটিটাকে উপভোগ করতে জানে। এ যাত্রায় ঘুম আর বনভোজন তার আনন্দের পাত্রকে পূর্ণ করে দিয়েছে।

ওই বনের ভেতরেই দু-চারটে মিষ্টি ফলের গাছ দেখা গেল। পাথর ছুঁড়ে বা গুলতি চালিয়ে বেশ কিছু ফল পাড়ল ডিক। বলল, অজানা অচেনা গাছপালার ভেতরে এমন সুস্বাদু ফলের গাছ জন্মায় কি করে?

মাসাম্‌মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওগুলো বানজারাদের কাজ। চেঞ্চুদের ভেতরেও বানজারা সম্প্রদায় রয়েছে। তারা কখনও একজায়গায় ঘরবেঁধে থাকে না। তারা বনের ভেতর যেখানে সেখানে সরস ফলের গাছ লাগায়। শুধু তাই নয়, রোগ উপশমের জন্য যে সব লতাপাতার দরকার হয় সেগুলোও ওরা বনের যেখানে সেখানে রোপণ করে।

অনেকে বানজারাদের চোর বলে অপবাদ দেয়। ওরা সুযোগ পেলে গৃহস্থদের টুকিটাকি হাতসাফাহ করে নিয়ে পালায়। ছাগল মুরগিও তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু উপকার করে অনেক বেশি। ফল আর রোগ নিরাময়ের গাছ লাগিয়ে ওরা মানুষের জীবন বাঁচায়।

ডিক বলল, সত্যিই বিচিত্র এই সব মানুষ!

ওরা শ্রীশৈলমের দেবমন্দির দর্শন করল। দারুণ ভক্তিমতী মাসাম্‌মা।

সে আগেও বহুযাত্রী নিয়ে এই দেবমন্দিরে এসেছে। তবু যখনই আসে তখনই তার সবকিছু নতুন বলে মনে হয়।

সে কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে দেব-বিগ্রহকে প্রণাম করল। একসময় পাশে তাকিয়ে দেখল, ডিক মন্দিরে নেই। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, ডিক মন্দিরের দিকে পেছন করে সামনে দোকানপাটের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে আহত হল মাসাম্‌মা।

ফেরার পথে মাসাম্‌মা জানতে চাইল, সে দেবতাকে প্রণাম করেছে কিনা?

ডিক বলল, তোমাদের ওই দেবতাকে প্রণাম করতে যাব কেন? আমি তো পৌত্তলিক নই।

মাসাম্‌মা বলল, আমি কিন্তু তোমাদের চার্চের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে নমস্কার করি।

ডিক বলল, আমরা মূর্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী, এটা কি তুমি জান না?

মাসাম্‌মা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তা হলে এত পথ পেরিয়ে তুমি মন্দির দেখতে এলে কেন?

রাগ কোরো না মাসাম্‌মা, আমি বনের ভেতর দিয়ে পথচলার আনন্দটুকু উপভোগ করতে এসেছিলাম। দেবদর্শন উপলক্ষ্য মাত্র। এবার বলো, এতটা পথ এসে তুমি খুশি হয়েছো তো?

মাসাম্‌মা বলল, তুমি পথ চলার আনন্দটুকু পেয়েছ এতেই আমি খুশি।

ফিরে যেতে যেতে ডিক বলল, বনের সত্যিই একটা আশ্চর্য টান আছে। গাছগুলো কথা বলে না, কিন্তু কাছে টানে, তা ছাড়া..........

মাসাম্‌মা বলল, তা ছাড়া কি?

এই যে প্রতিদিনের বনভোজন, এ আনন্দের কি তুলনা আছে?

ফেরার পথেও সেই আনন্দ, সেই উত্তেজনা। ডিক তার গুলতি দিয়ে পাখি মারে, মাসাম্‌মা তৈরি করে মুখরোচক খানা।

চলতে চলতে কথা হয়। ডিক বলে, শুনেছি তোমাদের অজস্র দেবদেবী। ওরা কি তোমাদেব পুজোয় কেবল তুষ্ট হয়ে থাকেন, না ওদের আলাদা কিছু কাজকর্ম আছে।

মাসাম্‌মা বলল, আমাদের সব সুখদুঃখের পেছনে দেবতার হাত থাকে। কনক দুর্গাম্‌মা-র কথা তোমাকে আগেই বলেছি, দেবী পলের্‌রাও গ্রামবাসীদের ভীষণ সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই যারা শিকারে যায়, বনের পশুদের দেবীর কাছে তাদের পুজো দিতে হয়। এতেই তারা বাঘ ভালুকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, ভাল ভাল শিকারও জোটে তাদের ভাগ্যে।

ডিক বলল, তোমাদের এই পশুদের দেবীটির কোনও নাম আছে নাকি?

আছে বইকি। ওর নাম, গর্‌লা মইসাম্‌মা। একটি নয়, হাজারো দেবদেবী রয়েছেন। ওঁদের কাছ থেকেই তো আমরা নানা রকম শক্তি পেয়ে থাকি।

পথে পড়ল মার্‌লিপালেম গ্রাম। এ গ্রামটাতে সাপুড়েদের বাস। যাওয়ার সময় এ পথ দিয়ে যায়নি ওরা, একটা নতুন রাস্তা দিয়ে ফিরবে ডিককে নিয়ে তাই এ গ্রামে ঢুকে পড়েছে মাসাম্‌মা।

ওরা দেখল, একটা গাছের তলায় ঢিবিতে দেবী নাগিনার পুজো করছে কতকগুলো লোক।

মেয়েরা যেমন দেব নাগেন্দ্রের পুজো করে, দেবী নাগিনার পুজো করে পুরুষরা।

সাপ ধরতে গিয়ে সাপে যাতে না কাটে তাই দেবীর পুজো দিয়ে ওরা বেরোয়।

ডিক বলল, তোমাদের এ দেশেই আমার জন্ম। দু-একটা সাপও যে দেখিনি তা নয়, তবে ওদের নাম গোত্র কিছুই আমার জানা নেই। দু-একটা নাম বলবে? এই সাপুড়েরা যে সব সাপ ধরে।

মাসাম্‌মা বলল, এই যেমন জের্‌রিপুট, বাতালিপুট, দাসারিপানু, এদের বিষ আছে কিন্তু গোখরোর মতন নয়।

ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এমন সময় সর্পদেবীর পুজো শেষ করে সাপুড়েরা গ্রামের ভেতর চলে গেল। যে লোকটিকে দলের পাণ্ডা বলে মনে হচ্ছিল সে অন্য সাপুড়েদের সঙ্গে গেল না। বসে বসে কতক্ষণ চোখবন্ধ করে বিড়বিড় করতে লাগল।

একসময় পুজো শেষ করে উঠে দাঁড়াল সাপুড়েদের সর্দার। এতক্ষণে তার চোখ পড়ল মাসাম্‌মা আর ডিকের ওপর। বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। এরা আবার এলো কোথা থেকে।

একজন ধবধবে ফর্সা সাহেব অন্যজন ময়লা রঙের চেঞ্চু।

সর্দারকে উঠতে দেখে ডিক বলল, চলো, ওর কাছে যাই।

মাসাম্‌মা বলল, কি করবে ওর কাছে গিয়ে?

সাপে কাটার মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে কিনা দেখি।

মাসাম্‌মা বলল, ওসবে তো তুমি বিশ্বাস কর না।

না না, সাপুড়েদের কাছে ও সব শিখে নিতে হয়।

এখন ডিক প্রবল বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। মাসাম্‌মা ডিকের সঙ্গে এগিয়ে গেল। সাপুড়েদের সর্দার জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

মাসাম্‌মা বলল, শ্রীশৈলম মন্দির থেকে।

যাচ্ছ কোথায়?

মাসাম্মা জবাব দিল, পুল্লাইপল্লী।

সাপুড়ের সর্দার সব জানে। সে বলল পুল্লাইপল্লীর রাস্তা তো এটা নয়।

মাসাম্মা এবার বলল, রাস্তাটা দক্ষিণে আমরা ছেড়ে এসেছি। এদিকে ঢুকে পড়েছি গ্রামটা দেখব বলে, তারপর আবার দক্ষিণের পথ ধরে এগোবো।

সাপুড়ের সর্দার বলল, কি নাম তোমাদের বাপ?

ডিক বলল, ও মাসাম্মা, আমি ডিক।

তোমার কি নাম সর্দার?

হুন্‌টি আক্কাটাইয়া।

এবার আবদার ধরল ডিক, সর্দার একটা কথা রাখবে আমার।

বলো কি কথা?

তুমি কি আমাকে একটা সাপে কাটার মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?

বেশ কিছুক্ষণ আপনমনে কি যেন ভাবল আক্কাটাইয়া। একসময় ডিকের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি কিছু খরচ করতে পারবে? আমার কাছে এমন কিছু আছে, কিছুদূর থেকে তার গন্ধ পেলেই সাপের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

দাও সর্দার, ওটা আমাকে দাও।

আগেই বলেছি এটার অনেক দাম, বড় কষ্ট করে এ জিনিস সংগ্রহ করতে হয়।

ডিকের গলায় একটা সোনার চেন ছিল, তাতে ঝুলছিল যিশুর প্রতিকৃতি আঁকা একটি লকেট। সে বলল, আমার কাছে বেশি টাকা পয়সা নেই, তোমাকে এই সোনার চেনটা দিলে তুমি আমাকে ওই বস্তুটি দেবে?

সর্দারের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সে বলল, তুমি যখন এত করে বলছ তখন দিতে পারি। মাঝে মাঝে এটিকে দুধে চুবিয়ে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে রাখবে।

মাসাম্মার চোখও বড় বড় হয়ে উঠল, যেন পরশমণির সন্ধান পাওয়া গেছে। সে বলে উঠল, তোমাব ও জিনিসটি কি 'নাগমুষ্ঠি চেক্‌কা'?

হেসে মাথা নাড়ল সাপুড়ে সর্দার।

এবার ট্যাক থেকে একটা শেকড় বের করে ওদের সামনে তুলে ধরল সে।

অমনি গলা থেকে ডিক খুলে ফেলল তার সোনার চেনটা। যিশুর লকেটটা বের করে নিয়ে চেনটা সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, দাও আমায় ওই শেকড়। কি যেন নাম বললে ওর?

সর্দার বলল, 'নাগমুষ্ঠি চেক্‌কা'।

ডিক শেকড়টা হাতে নিয়ে মাথায় ছুঁইয়ে সযত্নে পকেটে রেখে দিতেই মাসাম্মা বলল, এতদিনে তোমার আমাদের দেবদেবীর ওপর ভক্তি হল।

ডিক তখন হীরের খনি পাবার আনন্দে ভরপুর। সে শুধু খুশিতে ডগমগ হয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

ঘরে ফেরার এইটি শেষ রাত। সারা পথ ওই দুর্লভ বস্তুটি লাভের উত্তেজনায় বুঁদ হয়ে ছিল ডিক। পথে শিকার করেছে মনের আনন্দে।

মাসাম্মার নির্দেশ মেনে সে কিন্তু একটির বেশি পাখি শিকার করেনি। মাসাম্মা মাটি খুঁড়ে একটি মেটে আলু সংগ্রহ করেছিল, সেটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল মাংসের সুস্বাদু কারী। দুজনে কাছাকাছি বসে বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাতের আহার শেষ করেছিল। ডিক জোর করে নিজের প্লেট থেকে দু'এক টুকরো মাংস তুলে নিয়ে মাসাম্মার প্লেটে রেখে বলেছিল, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে।

মাসাম্মা মাথা নেড়ে বলেছিল, তুমি জানো আমি বেশি খেতে পারি না।

আমার অনুরোধ ওই দু-টুকরো খেয়ে নাও।

মাসাম্মা আর কোনও প্রতিবাদ না করে অতিরিক্ত দু-টুকরো মাংস খেয়ে নিয়েছিল।

এরপর ডিক একটি কাণ্ড করে বসল, যা ছিল মাসাম্‌মার ভাবনার বাইরে। ডিক খাওয়া শেষ করে তার ব্যাগের চেনটা খুলে ফেলে তার ভেতর থেকে টেনে বের করল একটা হুইস্কির বোতল।

ততক্ষণে মাসাম্‌মার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। সে মি. সেসিলকে ড্রিংক করতে দেখেছে। মিসেস পেগিও দু-এক পেগ খান। কিন্তু ডিককে তার বাড়িতে কিংবা বেড়াতে আসার পথে একবারও খেতে দেখেনি, তাই সে অবাক হল। ও বস্তু খাবার মতো বয়স ডিকের এখনও হয়নি।

ডিক বলল, আজ আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

বুদ্ধিমতি মাসাম্‌মা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল। সে ক্ষোভের সঙ্গে বলল, তুমি ওই বস্তুটি খাবার কথা বলবে তো? আমি এখনও আমার মহল্লার মেয়েদের সঙ্গে বসে একবিন্দু মহুয়ার মদ খাইনি। অন্যকিছু অনুরোধ থাকলে করতে পার।

ডিক কাতর চোখে তাকিয়ে বলল, ছোট্ট একটা পেগ কি তুমি আমার অনুরোধে খেতে পার না?

তুমি আমাকে বার বার ও কথা বললে আমি কষ্ট পাব ডিক।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে পেট ভর্তি করে ডিক হুইস্কি খেতে লাগল।

সেদিকে না তাকিয়ে মাসাম্‌মা আপনমনে কাজকর্ম সেরে নিল।

তার মনে হল, গুলতি ছুঁড়ে ডিক তার বুকের একটা পাঁজর খসিয়ে দিয়েছে।

সব কিছু ধুয়ে মুছে গোছগাছ করে সে বিছানা পাতল। ডিকের দিকে না তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, হুইস্কির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হাসছে, অসংলগ্ন কতকগুলো কথা বলে যাচ্ছে ডিক।

একবার মাসাম্‌মা সোজাসুজি তাকাল ডিকের দিকে। বলল, বিছানা তৈরি, শুয়ে পড়ো।

ডিক টলতে টলতে উল্টোদিকে চলে যাচ্ছিল। মাসাম্‌মা তাকে জোর করে ধরে এনে শুইয়ে দিল।

ডিক কতক্ষণ আপনমনে বকবক করে গেল। মাসাম্‌মা কিন্তু তার বিছানায় শুয়ে অন্ধকারের ভেতরেও জেগে ছিল। ডিক যখন একেবারে চুপ করে গেল তখন মাসাম্‌মা বোঝার চেষ্টা করল সত্যিই ডিক ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা।

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল ডিকের। মাসাম্‌মার মনে হল সে ঘুমোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল মাসাম্‌মা। অল্প সময়ের ভেতরেই তার চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে।

স্বপ্ন দেখছে মাসাম্‌মা—হাজার হাজার সাপ কিলবিল করে খেলা করছে ভ্যালির সবুজ ঘাসের মধ্যে। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। কেউ ফণা তুলে বার বার ছোবল মারছে মাটিতে। ও কেবলই ভাবছে, কোথায় গেল সেই নাগমুষ্ঠি চেক্‌কা।

হঠাৎ অনুভব করল, একটা বিশাল অজগর সহসা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে, মুখে এসে লাগছে তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। সে হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরছে সে সরীসৃপটা। এ কি! ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে লজ্জাবস্ত্র। সে মরিয়া হয়ে কোমর থেকে টেনে বের করল তার কোদাভালি। আক্রমণকারীর শরীরে বসিয়ে দিল একটা কোপ।

তীব্র একটা আর্তনাদ উঠল। আহত আজগর তো এমন করে শব্দ করে না। সরীসৃপটা দেহ ছেড়ে মনে হল পাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

স্বপ্ন ও ঘুমের ঘোরে মাসাম্‌মা যা দেখছিল আর ভাবছিল, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

গাছের ফাঁকে সেই মুহূর্তে এসে পড়ল রহস্যময় একটুকরো আলো। সে ভাল করে চোখমুখ মুছে চারদিকে দেখতে লাগল।

সে দেখল পাশের বিছানায় ডিক উপুড় হয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। যে অজগরটা একটু আগে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, সে ডিক ছাড়া আর কেউ নয়। ডিকই তাহলে তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টায় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তার পরিধেয়।

কোথায় গেল তার কোদাভালি? সে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখল, ডিকের পিঠে অস্ত্রটা তখনও গেঁথে আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টেনে বের করে আনল। এই মুহূর্তে ভয়ের সঙ্গে একটা করুণা জন্ম নিল তার মনে।

ভয় মি. সেসিলের কথা ভেবে। এই আঘাতের জন্য ডিকের মা বাবার কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে! তার সঙ্গেই ডিককে ওরা ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ছেলেকে ও নিজের হাতে তীব্র আঘাত হেনেছে। এ জন্যে তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে। অন্যদিকে তার একান্ত সসঙ্গীটিকে আঘাত দেওয়ার জন্যে মনে জেগে উঠল করুণা।

মাসাম্‌মা পাগলের মতো ছুটলো লতাপাতা সংগ্রহ করতে। আজন্ম বনবাসীরা জ্ঞানে, লতাপাতার বিচিত্র সব গুণ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সে কতকগুলো পাতা আর শেকড় থেঁতো করে আনল। সে নিজের কাপড়ের কিছু অংশ ছিঁড়ে পাতার মণ্ডগুলো দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। থেঁতো করা শেকড়টা খাইয়ে দিল জলের সঙ্গে।

অল্প সময়ের ভেতরেই ঘুম এসে গেল ডিকের। ওর যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

পাতার গুণে ইতিমধ্যেই রক্ত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাতে যে শেকড়টা খাইয়েছিল তার অবশিষ্ট অংশটা আজও থেঁতো করে খাওয়াল। ওই শেকড়টি ছিল যন্ত্রণা হরণের মহৌষধ।

নিজের মনের দুঃখ আর অপমানকে সে চেপে রেখে ডিকের সেবা করতে লাগল।

সঞ্চিত খাবারও ফুরিয়ে এসেছিল, একদিনের বেশি কোনওমতেই আর থাকা চলে না। ডিককে তার বাড়িতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে দিতে হবে।

মাসাম্‌মার ওপর ভর রেখে ধীরে ধীরে চলতে লাগল ডিক। কোনও কিছু না বলে অবশিষ্ট খাবারটুকু ডিককে খাওয়াতে লাগল মাসাম্‌মা।

পথ চলতে চলতে মাসাম্‌মা ভাবতে লাগল, ডিক কি অর্ধচেতন অবস্থায় তাকে আক্রমণ করেছিল? না তীব্র একটা প্রলোভন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে?

এর কিছু সমাধান সে খুঁজে পেল না। সে যা করেছে তা তার আত্মরক্ষার তাগিদেই করেছে। সে জ্ঞাতসারে কোন অন্যায় করেনি।

বহু যত্নে, বহু সেবায়, বহু কষ্টে পরদিন সন্ধ্যায় মাসাম্‌মা ডিককে নিয়ে তুলল মি. সেসিলের বাড়িতে।

ছেলের অবস্থা দেখে মিসেস পেগি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। পেছনের কিচেন গার্ডেনে কাজ করছিলেন মি. সেসিল। স্ত্রীর কান্না শুনে ছুটে এলেন তিনি।

একি অবস্থা হয়েছে ডিকের। তিনি ছেলেকে ধরে শুইয়ে দিলেন মিসেস পেগির পাশের কটে। স্ত্রীর সেবার জন্যে এখানেই মি. সেসিল রাত্রিযাপন করেন।

মি. সেসিলের নির্দেশে মাসাম্‌মা ছুটল হাউস ফিজিসিয়ান ডঃ গিলবার্টকে খবর দিতে।

ডাক্তার এসে অ্যান্টি টিটেনাস দিয়ে বাকি ওষুধপত্র প্রেসক্রাইব করে গেলেন। ডিসপেনসারি থেকে ওষুধও নিয়ে এল মাসাম্‌মা।

ঘটনা বর্ণনার সময়ে সে যে অজগর ভেবে অস্ত্র চালিয়ে ডিককে আহত করেছে সে কথা ডিকের মা-বাবাকে বলতে ভুলল না। কিন্তু কোনও মতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না ডিকের নগ্ন বিকৃত কামনার কথা।

মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মিসেস পেগি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে ওই ডাইনীটাকে ঘর থেকে বের করে দাও। ডাক্তারের নির্দেশ মতো তুমিও ওর পরিচর্যা করতে পারবে। দু-চারদিনের ভেতরে নিশ্চয়ই ও ভাল হয়ে উঠবে।

জলভরা চোখে সমস্ত শাস্তিটুকু মাথা পেতে নিল মাসাম্‌মা। একটিও কথা উচ্চারণ করল না, ডিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই সে করল না। সবার উদ্দেশ্যে একবার শুধু মাথা নত করে ঘর থেকে পথে নেমে গেল মাসাম্‌মা।

পশ্চিম আকাশে তখন সন্ধ্যা নামছে। সে চলতে লাগল তার ছেড়ে আসা বাড়ি লক্ষ করে। সমস্ত বুক ভরে উঠেছে তার কান্নায়।

পেছন থেকে এসে কে তার মাথায় হাত রাখল! সে থমকে ফিরে দাঁড়াল। মি. সেসিল দু-হাতে তার মুখখানি তুলে ধরেছেন। টপ্ টপ্ করে দু-ফোঁটা জল মি. সেসিলের হাতে এসে পড়ল। তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি না বললেও সমস্ত ঘটনাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি ডিককে আঘাত করে অন্যায় করনি।

মি. সেসিল একবাণ্ডিল নোট মাসাম্মার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, অসুস্থ স্ত্রীর মনে কোনওভাবেই আমি আঘাত দিতে চাই না, তাই প্রবল ইচ্ছে থাকলেও তোমাকে আমি রাখতে পারলাম না। এই টাকা কটা তোমার কাজে লাগলে আমি বড় আনন্দ পাব মাসাম্‌মা।

ও মাটিতে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মি. সেসিলের জানু স্পর্শ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার স্নেহ ভালবাসার কথা আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না মি. সেসিল, শুধু একটা অনুরোধ, এই টাকাগুলো দিয়ে আপনাদের কাছে আর ঋণী করে রাখবেন না।

করুণ চোখে মি. সেসিলের দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে মাসাম্‌মা সন্ধ্যার অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

নাল্‌লাপটুলা ও মাসাম্‌মা

নিজের গাঁও-তে গিয়ে পৌঁছতেই হ‍ই হই পড়ে গেল চারদিকে। মাসাম্‌মা ঘরে ফিরে এসেছে খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ফেলে ছুটে এল সবাই। মেয়েরা তাকে ঘিরে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল।

পুরুষদের সঙ্গে মুখিয়া গুরুপ্পার উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, এখন বেশ ডাগর ডোগরটি হয়েছ, নিজের বাড়িঘর সামলাও, করে কর্মে খাও. বিয়ে সাদি হয়নি, গাঁয়ের মেয়ে বাইরে থাকবে কেন, সকলের সঙ্গে থকলে একটা পেট খুব চলে যাবে।

সকলের ভরসায় বাপের ঘরে ঝাঁটপাট দিল মাসাম্‌মা। জ্ঞাতিরা এসে উড়ে যাওয়া চালে খড় চাপিয়ে দিয়ে গেল। সব বাড়ির মেয়েরা এক একদিন করে ডেকে খাওয়ালো। তাকে ঘিরে বসে সাহেব বাড়ির গল্প শুনল কৌতূহলী মেয়েরা। কিন্তু কি কারণে সে কাজ ছেড়ে এসেছে সে কথা একবারও বলল না কারও কাছে।

নিজের বাড়ির চারদিকের জমিটুকু খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু ফসল তৈরি করল সে। ফাঁদ পেতে পাখি আর খরগোস ধরে জীবন নির্বাহ করতে লাগল। যে ডাকে, তারই কাজে সাহায্য করতে ছুটে যায় মাসাম্‌মা।

বছরখানেক এইভাবে কাটল। জীবনের একটা ধর্ম আছে, যৌবনের একটা চাবিদা আছে, মহুয়া গন্ধ ছড়ায় বনে আর মনে। বসন্তের বাতাসে কার যেন ডাক ভেসে আসে, রঙিন ফুলে রাঙা হয়ে ওঠে বন, অনুরাগের রং লাগে ষোড়শী মাসাম্‌মার মনে। কুণ্ডে জল আনতে গিয়ে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পায় সে।

একদিন গাঁও-তে এল এক টাট্‌টৌ (উল্‌কি) আঁকনেওয়ালা। মেয়েরা বাহুতে, হাতে উল্‌কি আঁকতে লাগল। বেশির ভাগ, বীর হনুমানের লম্ফ দেওয়ামূর্তি। সবার ধারণা, বীর হনুমান তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

উল্‌কি পরার সময় সব মেয়েই প্রায় ব্যথা পেয়ে একটু চেঁচামেচি করতে লাগল। কিন্তু ঠায় বসে রইল মাসাম্‌মা। মুখে তার কষ্টের এতটুকু চিহ্ন নেই।

বয়স্ক শিল্পীটি একটু অবাক হল। তার কাজ শেষ হলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাঁয়ের মুখিয়াকে সে বলল, অসম্ভব সহ্য শক্তি এই মেয়েটির। এ যে ঘরে যাবে, সে ঘর ভরে উঠবে লক্ষ্মীর দানে।

মোড়ল অমনি বলল, তুমি তো সব জায়গায় ঘোরো, মাসাম্‌মার একটা পাত্র জোগাড় করে দাও না?

একটু ভেবে নিয়ে লোকটি বলল, অবস্থা ভাল তবে দোজবর। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছিল. ছেলেপুলে না রেখে বউ মরেছে। বাপ বাঁশের কাজ করে, ব্যবসা জমজমাট। ছেলেটাও বেশ

রোজগেরে। গবরমেণ্টের বন বিভাগে চৌকিদার। সে পাত্রী খুঁজছে। যদি রাজি থাকো, আগামী মাসেই শুভকাজটা সেরে দেওয়া যাবে।

মোড়ল দু-চারজনের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলোচনা করল, তার পর একজনকে উল্‌কি আঁকনেওয়ালার সঙ্গে পাঠিয়ে দিল ওই পাত্রটির গাঁয়ে।

কনেপক্ষের লোককে বেশ খাতির যত্ন করল বরপক্ষের লোক। কনের বাড়িও এলো বরপক্ষের লোকেরা। পাকা হয়ে গেল কথাবার্তা। বরের বাপ একশো টাকা দেবে মুখিয়াকে কন্যাপণ বাবদ। সঙ্গে এক কুইণ্টাল চাল, একটা পাঁঠা আর কয়েক বোতল মহুয়ার মদ।

গাঁয়ের কেউ মাসাম্‌মাকে তার বিয়ের ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করল না। কেবল মেয়েরা তাকে ঘিরে নানারকম কৌতুক করতে লাগল। বর সরকারী চাকুরে, এত বড় সৌভাগ্য এই পাঁচসাতটা তল্লাটে কারই বা হয়েছে। সেদিক থেকে মাসাম্‌মা ভাগ্যবতী বই কি।

বিয়ের দিন মুখিয়ার নেতৃত্বে বিয়ের প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। বরপক্ষের প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন এসে পড়ল মাসাম্‌মাদের গাঁয়ে।

বিয়ের আগে আলাদা আলাদা জায়গায় স্নান করানো হল বর আর কনেকে। এরপর ওরা একটি করে সাদা কাপড় পরল, মেয়ের ব্লাউজটিও সাদা। কেবল পাড়টি তৈরী করা হয়েছে হলুদ রঙ দিয়ে। বর আর বধূর একই রকম। হলুদ জলে ছোপানো একটুকরো কাপড় বাঁধা আছে বরের ডান হাতে। ঠিক এমনি একটুকরো কাপড় বাঁধা রয়েছে মেয়ের বাম হাতে।

কোলাগাদু বা পুরোহিত বসে আছে বরের পাশে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে। বরের পাশে একটা থালায় রাখা আছে কিছু আতপচাল, তাতে হলুদের গুঁড়ো ছড়ানো। ছেলের কাপড়ের খুঁটের সঙ্গে একসময় বেঁধে দেওয়া হল মেয়ের আঁচলের একটা অংশ। বর বধূর এই বাঁধনটা বরের বাড়ি অবধি অটুট থাকবে। পুরোহিতের নির্দেশে ওরা হলুদ গুঁড়ো মাখানো চাল পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে দিল।

ইতিমধ্যে কোলাগাদু রূপোর একটি তালিবট্‌টু (লকেট) বরের হাতে দিয়ে বলল, এটি মেয়ের গলায় পরিয়ে দাও।

বর নাল্‌লাপটুলা পুরোহিতের কথায় নববধূর গলায় ঐ রূপোর লকেটটি পরিয়ে দিল।

এবার আর একটি মজার ব্যাপার ঘটল। এককুচি সুপারীসহ একটি ভাঁজ করা পানের পাতার অর্ধেক পুরোহিতের নির্দেশে নববধূ মুখে পুরলো। এখন মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকা পাতার বাকি অংশটুকুকে বর দাঁত দিয়ে কেটে নেবে। কেটে নেওয়ার সময় একটা শব্দ যেন ওঠে। উপস্থিত সকলে বলবে, তারা শব্দটা শুনেছে। কৌতুক করে তারা যদি বলে, তাদের কানে শব্দ পৌঁছয়নি তাহলে বরকে আবার ঐ পানের কিছু অংশ শব্দ করে দাঁতে কাটতে হবে। এই ক্রিয়াটি মেয়েকেও করতে হবে বরের মুখের পান দাঁতে কেটে।

এ হল বিয়ের আসরের নিছক এক কৌতুক।

বিয়ের পর মাসাম্‌মা চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। সেখানেও কিছু অনুষ্ঠান হল।

নিয়মমত বিবাহিত পুত্রের জন্য বাপকে আলাদা জায়গায় একটা ঘর তুলে দিতে হয়, কিন্তু বিয়ে করে এসেই বউকে নিয়ে ছেলে বাবার বাড়িতে ওঠে। তারপর তিনদিন নিয়মমত ওদের বনবাস যাপন করতে হয়। একে হানিমুনও বলা যায়। ঐ তিনদিন ওরা সবার অলক্ষ্যে বনের মধ্যে কাটাবে। গাছের ফল ছাড়া ঐ কদিন ওরা অন্য কিছু খেতে পাবে না। মাসাম্‌মাকে পেয়ে মনে হল শ্বশুরবাড়ির সবাই খুশি হয়েছে।

শ্বশুর কুদুমুল্‌লা নতুন বউকে বাঁশের ঝুড়ি বোনা শেখাতে লাগল। শহরে ওগুলো বেশ দামেই বিক্রি হয়। তাছাড়া আজকাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি হয়েছে, সেখানে ওরা এসব বাঁশের কাজ বিক্রির জন্য রাখে।

অতি বুদ্ধিমতী মাসাম্‌মা। তার হাতের সব কাজই নিখুঁত। তার আচার আচরণ সাধারণ চেঞ্চুদের থেকে অনেক উন্নত।

বিয়ের বছর খানেকের ভেতরেই বন-রক্ষক চৌকিদার হিসেবে নাল্‌লাপটুলা বনের ভেতরেই একটা ছোট্ট কোয়ার্টার পেল। যদিও ওদের গ্রাম থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বেশি দূরে নয়, তবুও কোয়ার্টারটা ওকে দেওয়া হল। এটা ওর অনেক দিনের প্রাপ্য। কিন্তু বউকে নিয়ে সেখানে চলে যাবার সাধ থাকলেও বাবাকে সেকথা বলার সাহস ছিল না তার। মাসাম্‌মা আগের মত শ্বশুরের কাজেই লেগে রইল।

নাল্‌লাপটুলা চার দিন থাকে বনের কোয়ার্টারে। একাই হাত পুড়িয়ে রান্না করে খায়, বাকি দু দিন ঘর থেকে যাতায়াত করে।

এমনি ব্যবস্থা বহাল রইল পুরো দুটো বছর। এরপর হঠাৎ কুদুমুল্‌লা মারা গেল। বাপ মারা যাবার পর পাল্টে গেল বাড়ির সব ব্যবস্থা। নাল্‌লাপটুলার মা আগেই মারা গিয়েছিল। একমাত্র বোন পাশের গাঁয়ে সংসারী। এখন বাড়ির সব ভারটা এসে পড়ল মাসাম্‌মার ওপর। সে বাড়ি ঘর গুছিয়ে সংসার চালাতে লাগল। স্বামী-সেবার ত্রুটি ছিল না তার। যে তিনটে দিন নাল্‌লাপটুলা বাড়িতে থাকত সে দিনগুলোতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর সঙ্গে নানারকম গল্প করে কাটাত সে। কিন্তু ধীরে ধীরে পাড়া প্রতিবেশীরা নিজেদের ভেতর একটা কথা বলাবলি করতে লাগল, মাসাম্‌মা কি বাঁজা? কারণ, বিয়ের পর দু'দুটো বছর পার হয়ে গেছে, সে এখনও তার স্বামীকে কোন সন্তান উপহার দিতে পারল না।

যতদিন যেতে লাগল গুঞ্জন ক্রমশ কলরবে পরিণত হল। পথে ঘাটে দেখা হলেই বন্ধুরা নাল্‌লাপটুলাকে ক্ষ্যাপায়, এবার আরেকটা বিয়ে কর, দু'দুটো বাঁজা বউ নিয়ে সংসার করেছিস এতদিন, এবার শেষ চেষ্টা করে দেখ। বলিস তো আমরা কনে খুঁজি।

নাল্‌লাপটুলা কোন জবাব দেয় না, কেবল মুচকি মুচকি হাসে।

এবার সে ঠিকই করে ফেলল বউকে নিয়ে বনের কোয়ার্টারে গিয়ে উঠবে। মাসাম্‌মাকে সে কথা জানাতেই সে বলল, বাঁশের ব্যবসার কি হবে? এতে তো তোমার বেশ কিছু রোজগার হচ্ছে। বাবা কষ্ট করে ব্যবসাটা ফেঁদেছেন, তাকে তুলে দেওয়া কি ঠিক হবে?

নাল্‌লাপটুলা বউকে একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল, তুই তাহলে তোর ঐ ব্যবসা নিয়েই থাক, আমি এবার থেকে সপ্তাহের সাতদিন ঐ বনবাসেই কাটাব।

অগত্যা মাসাম্‌মাকে বাঁশ বাখারির কারবার ছাড়তে হল। ঘরের পাট গুটিয়ে একদিন সে স্বামীর সঙ্গে চলল বনের কোয়ার্টারে।

এই তার প্রথম বনবাস-যাত্রা।

নাল্‌লাপটুলা আজ দামী প্যান্ট জুতো পরেছে, হাতে একটা লাঠি। লাঠিটা আকারে একটু ছোট, ছড়ির মত সরু। আগে আগে চলেছে ছড়ি উঁচিয়ে বনের চৌকিদার, পেছনে ঘোমটায় মুখ ঢাকা তার বউ।

মাসাম্‌মা অতখানি ঘোমটা টেনে চলার মেয়ে নয়, কিন্তু স্বামীর কড়া নির্দেশে তাকে এমনি কলা বউটি সেজে চলতে হয়েছে। কেউ তার সুন্দরী বউ এর ওপর কুনজর দিক এটা চায় না নাল্‌লাপটুলা।

ইজারাদারের লোক গাছ কাটছে। পথ দিয়ে যেতে যেতে অকারণে ছড়ি ঘুরিয়ে তাদের শাসাচ্ছে বনের চৌকিদার, দেখ চারাগাছের ওপর যেন কাটাগাছটা না পড়ে যায়, তাহলে রক্ষে থাকবে না কিন্তু।

ওর বাহাদুরী দেখে ইজারাদারের লোকেরা কৌতুক বোধ করে। মাসাম্‌মা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে লোকগুলোর দিকে তাকায়। সে বুঝতে পারে ওদের মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মাসাম্‌মাকে ঘোমটা ফাঁক করতে দেখে ওরা তার দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে তাকাতে থাকে।

মাসাম্‌মা বোঝে মানুষটা তার ক্ষমতা দেখাবার জন্যেই লোকেদের ওপর এমন হাঁক ডাক করছে। এটা নতুন বউ-এর কাছে একটা ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা।

কোয়ার্টারটা মন্দ নয়। সামনে দু চারটে ফলকর গাছ আছে, যদিও কোয়ার্টার একখানা ঘরেরই। সে এতেই খুশি। পরিজনদের কাছ থেকে চলে আসার একটা কষ্ট আছে ঠিক কিন্তু মাসাম্‌মা চিরদিনই

একটু কম কথা বলে, নীরবতাই তার প্রথম পছন্দ। সে মানিয়েও নিয়েছিল, দু চারদিনের ভেতরেই গুছিয়ে নিয়েছিল তার সংসার।

একদিন নাল্‌লাপটুলা কাজ থেকে ফিরে এসে বলল, দু হাত দূরে রেঞ্জার সাহেবের বাংলো, তাঁর বউ দেশে গেছেন, তুই যদি ক'দিন তাঁর কাজ করে দিস তাহলে ভাল হয়।

মাসাম্‌মা বলল, কেমন মানুষ তেমার রেঞ্জার সাব?

একেবারে দেবতা। অফিসে তাঁর অনেক কাজ আমিই তো করে দিই রে। উনি তো শিগগির বদলি হয়ে যাচ্ছেন, আবার কিরকম মূর্তি আসবে কে জানে।

স্বামীর কথায় মাসাম্‌মা রেঞ্জার সাহেবের বাড়িতে কাজে যেতে লাগল।

মানুষটিকে চোখে দেখে ভাল লাগল মাসাম্‌মার। তিনি যখন কোনকিছু বলেন তখন মনে হয় সাহেব নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। গলার স্বর বেশ নরম থাকে, কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে না। মাসাম্‌মা এই মানুষটিকে রান্না করে দেয়। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ থেকে ডিনার সবই।

রেঞ্জার সাহেব বলেন, তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে মা। তোমার স্বামীর জন্যেও টিফিন কেরিয়ারে করে নিয়ে যেও।

এক একটি মানুষ আছেন যাদের আচার আচরণ কথাবার্তা মানুষের মনে শান্তি এনে দেয়। রেঞ্জার সাহেব ঠিক সেই প্রকৃতিরই মানুষ।

মাসাম্‌মার মনে হয়েছিল, ছোটবেলা সে বাবার কাছ থেকে যেমন ভালবাসা পেয়েছিল, এ মানুষটিও সেই ভালবাসার সুরে কথা বলছেন।

কিন্তু এ সুখ দীর্ঘদিন মাসাম্‌মার কপালে জুটল না, সাহেব অন্যত্র ডি.এফ.ও-র পোস্টে প্রমোশন পেয়ে বদলি হয়ে গেলেন।

এবার তাঁর পোস্টে এলেন অন্য এক রেঞ্জার। মানুষটি বেশ সুদর্শন, অনেক কম বয়স। ক'দিন দেখা গেল ড্রাইভারকে পাশে বসিয়ে রেখে নিজেই জীপ চালাচ্ছেন। বনের আঁকা বাঁকা পথে গাড়ি যেন উড়ে চলেছে। হাঁকডাকে অধস্তন কর্মচারীরা তটস্থ হয়ে উঠল।

মাসাম্‌মা স্বামীকে বলল, আমি আর সাহেবের কোয়ার্টারে কাজ করতে যাব না।

নাল্‌লাপটুলা বউকে দাবড়ানি দিয়ে বলল, কেন যাবি না? তুই সাহেবের কাজে থাকলে আমার ওপর সাহেবের নজর খুশ্ থাকবে। তোকে তো নতুন সাহেব কাজ করতে বারণ করেনি।

মাসাম্‌মা মেঝের ওপর বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, একবার মানুষটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছিল আমার, কেমন যেন ভাল লাগেনি।

নাল্‌লাপটুলা রাগ করে বলল, তুই তোর ভাললাগা, মন্দলাগা নিয়েই থাক। তোকে আর বনের কোয়ার্টারে থাকতে হবে না, গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যা। ইচ্ছে হলে গাঁয়ে যাব না হলে এখানেই থেকে যাব। হাত পুড়িয়ে না হয় রান্নাই করতে হবে, ওতে আমি ভয় পাই না।

ওর প্রবল রাগ গোঁসা দেখে মাসাম্‌মা একটু পিছিয়ে গেল। সে বলল, ঠিক আছে, তুমি যেমন ভাল বোঝো তাই হবে।

নাল্‌লাপটুলার মুখে খুশির হাওয়া বয়ে গেল। সাহেব তার বউকে দুচারদিন ভাল করে তো দেখুন। বুঝুন, এ তল্লাটে এমন একটা মেয়ে খুঁজে পাওযা যাবে না। এমন সুন্দরী আর এমন কাজের মেয়ে।

ভোরবেলা নতুন সাহেব তাঁর কোয়ার্টারে ছিলেন। নাল্‌লাপটুলা তাঁর কাছে গিয়ে লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বলল, সাহেব আপনার খানা পাকাবার কি বন্দোবস্ত হবে?

সাহেব বললেন, কেন চৌকিদারই তো রান্না করে দেবে।

নাল্‌লাপটুলা মাথা চুলকে বলল, ওর হাতের রান্না কি আপনি খেতে পারবেন সাব?

আগের সাহেব কি করে খেতেন?

একটি মেয়ে তাঁকে রান্না করে দিত। আপনি যদি চান সে মেয়ে আপনাকেও রান্না করে দেবে।

কোথায় সে?

হুজুর সে আমার কোয়ার্টারেই থাকে, আমার ঘরওয়ালি।

সাহেব বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, আমি কাল একটি মেয়েকে প্লেট ধুয়ে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, সে কি তোমার বউ?

আজ্ঞে হুজুর।

বেশ তো কাল থেকে সেই খানা পাকাবে। চৌকিদারকে অন্য কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া যাবে।

সাহেবের খানা পাকানো, প্লেট সাফ করার কাজে থেকে গেল মাসাম্‌মা।

এমন কি আগের মত বিছানা পাতা, পরিষ্কার করার দায়িত্বও থেকে গেল তার ওপর।

কয়েকটা দিন নিরুপদ্রবে কাটল মাসাম্‌মার। নাওয়া খাওয়ার হিসেব ছিল না নতুন রেঞ্জারের। ক্রমাগত ছুটোছুটি করে বুঝে নিচ্ছিলেন নতুন এরিয়ার কাজকর্ম। ওপরওয়ালার তাগিদ এসেছে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য। তাই চোখে কানে দেখতে পাচ্ছিলেন না রেঞ্জার।

অনেকরাতে ফেরেন অফিস থেকে। কর্মীদের ওভারটাইম দিয়ে বকেয়া কাজকর্ম সেরে নিচ্ছিলেন।

গভীররাতে ফিরেই নাকি মুখে কিছু গুঁজে শুয়ে পড়েন পাতা বিছানায়।

টেবিলে সব খাবার সাজিয়ে রেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে মাসাম্‌মা দেখে সাহেবের ভোজনপর্ব।

টলতে টলতে সাহেব এসে বসেন খাবার টেবিলে। কয়েক গ্রাস গেলেন ঢুলতে ঢুলতে। তারপর কোনরকমে মুখটা ধুয়ে গড়িয়ে পড়েন পাতা বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

মাসাম্‌মা উঁকি দিয়ে দেখে, সাহেব পোশাকগুলো না ছেড়েই শুয়ে পড়েছেন। হাত পা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। মশারি ফেলার সময়ই নেই।

মাসাম্‌মা চিন্তিত হয়ে পড়ে, মশা ছেঁকে ধরবে এখুনি। তাছাড়া বিচিত্র সব পোকামাকড় উড়ছে। কোন কোনটা মুখের ওপর দিয়ে চলে গেলেই, চামড়া পুড়িয়ে দাগ টেনে দেবে।

পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মাসাম্‌মা। অনেক রকম পরীক্ষার পর সে সাহেবের ঝুলে থাকা হাত-পাগুলোকে টেনে বিছানার ওপর তুলে দেয়। মাশারি ফেলে গুঁজে দেয় চারদিক। বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সে কাজ সেরে কোনরকমে ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে। নিজের কোয়ার্টারে ছুটে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে।

নাইটগার্ডটা হাতের বন্দুক নামিয়ে রেখে গেটের দরজা খুলে দেয়। মাসাম্‌মা ছুটে গিয়ে তার কোয়ার্টারে ওঠে।

অন্ধকারে ঘরের ভেতর থেকে শব্দ ওঠে, কি রে, এত দেরী?

গলার স্বরে যেন অভিযোগ।

মাসাম্‌মাও ক্ষোভের সঙ্গে বলে, তোমার সাহেবকে কথাটা জিজ্ঞেস কর।

তেতে ওঠে নাল্‌লাপটুলা, তোর মুখে কি ঘা হয়েছে নাকি রে?

এই তো বন ঢুঁড়ে হাজার কাজ সেরে ফিরল তোমার সাহেব। আমি এতো রাত জেগে হা পিত্যেশ করে বসে থাকি, তোমার সাহেবের ফেরার আর সময়ই হয় না। আমি কাল থেকে আর সাহেবের কাজ করতে পারব না।

গতিক সুবিধের নয় দেখে নরম হল নাল্‌লাপটুলা। বলল, রাগ করছিস কেন? খেতে দিবি না?

কয়েকদিনের ভেতরেই থিতিয়ে পড়ল কাজের চাপ আর ব্যস্ততা। এখন স্বাভাবিক নিয়মে চলতে লাগল ফরেস্ট অফিসের কাজকর্ম।

কাজেব চাপে যে লোকটা মাথা তুলতে পারছিল না সে এখন স্থির হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সে অবাক হয়ে ভাবল, সামনে এত বড় শিকার কিন্তু তাকে ফেলে সে শুধু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে।

থাবার ভেতর শিকার থাকলে বাঘ যেমন নিশ্চিন্তে বসে তার দিকে তাকায় ঠিক তেমনিভাবে কদিন ধরে মাসাম্‌মার ক্রিয়াকর্ম দেখতে লাগল রেঞ্জার সাহেব।

জঙ্গলে শুরু হয়ে গেল ঝড়-বৃষ্টির দিন। বিশাল একটা দৈত্য মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ে ফরেস্টের

ভেতর। ডালপালা ভেঙে পাতাপত্র ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টি নামে, অঝোর বর্ষণ। এক হাত দূরের মানুষকেও দেখা যায় না। সাপের মতো জলের প্রবাহগুলো এঁকে বেঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে যায়।

এমন একটা দিনে রেঞ্জার সাহেব নাল্‌লাপটুলাকে কাছে ডেকে বললেন, চার নম্বর বিটে যে অফিস সেখানে একটা ফাইল নিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ওখানে তিন চারদিন থেকে ওদের ফাইলগুলো আমার কাছে এনে দেবে। বিশ্বাসী লোক ছাড়া কারও হাত দিয়ে এ সব ফাইল চালাচালি করা যাবে না।

নাল্‌লাপটুলা মনে মনে গর্বে ফুলতে লাগল। সাহেব তার ওপর এতখানি ভরসা রাখেন।

সে বাড়ি ফিরে বউকে বলল, তিন-চারটেদিন আমাকে বাইরে যেতে হবে রে, তুই একা সাবধানে থাকিস। সাহেব বড় দায়িত্বের কাজ দিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছেন।

গম্ভীর হয়ে মাসাম্‌মা বলল, কবে যাচ্ছ?

কালই বেরোতে হবে।

ভোরবেলা?

যত ভোরে সম্ভব। তুই আমাকে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে তুলে দিস।

মাসাম্‌মা জিজ্ঞেস করল, কতদিনের জন্য যাচ্ছ?

এই তিন কী চারদিন।

আমিও কাল ভোরে বেরিয়ে যাব তোমার সঙ্গে। দিন সাতেক বাড়িতে থেকে ফিরে আসব এখানে।

তুই কি আমার সঙ্গে রসিকতা শুরু করলি না কি রে?

কেন কিসের রসিকতা? কতদিন দেশে যাইনি। এই সুযোগে সবার সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে।

নাল্‌লাপটুলা নরম গলায় বলল, তুই ভেবে দেখ, সাহেব আমার ওপর কত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। এ সময় তাঁর সামান্যতম অসুবিধে ঘটনো কি আমাদের উচিত হবে? কবে তোর মাথাটা ঠাণ্ডা হবে বল তো? তুই কি চাস সাহেবের কোপে পড়ে আমার চাকরিটা চলে যায়?

মাসাম্‌মা নিরাসক্ত গলায় বলল, বেশ রইলাম।

নাল্‌লাপটুলার চলে যাওয়ার পরের দিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটল।

অনেক রাতে সাহেব ফিরলেন কোয়ার্টারে। তেমনি জেগে বসেছিল মাসাম্‌মা। বাইরে শুরু হয়েছে ঝড়বৃষ্টি।

সাহেব খাবার খেলেন। মুখ ধুয়ে প্রতিরাতের মতো বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। আড়াল থেকে মাসাম্‌মা দেখল, সাহেবের হাতখানা খাট থেকে নীচে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের একটা জানালা ভেজানো ছিল, হঠাৎ খুলে গেল বৃষ্টির ঝাপটায়। একরাশ জল ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

মাসাম্‌মা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বন্ধ করে দিল জানালাটা। এবার ফিরে দাঁড়িয়ে তাকাল সাহেবের দিকে। তেমনি হাতটা ঝুলে আছে। প্রতিদিনের মতো ঘরের কোণে অতি অল্প আলো ছড়াচ্ছে একটা হ্যারিকেন। সে যাবার সময় সাহেবের মশারিটা গুঁজে দিয়ে আলো নিভিয়ে চলে যায়। সাহেব ঘুমের সময় আলো পছন্দ করেন না। তাই এই নিয়ম।

ও আস্তে করে সাহেবের হাতটা খাটের ওপর তুলে রাখল। মাশারিটা ফেলে গুঁজে দিল। পেছন ফিরে বাতিটা নেভানোমাত্র একটা বাজ পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাসাম্‌মার মনে হল, পেছন থেকে একটা হাত তাকে আকর্ষণ করছে। সে বুঝে নিল এটা মানুষেরই হাত।

ঝড় আর মেঘগর্জন চলছে বাইরে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুতের আলোয় মাসাম্‌মা দেখল, মশারির বাইরে বসে তার হাত ধরে টানছে রেঞ্জার।

আবার বিদ্যুৎ।

দুটো ক্ষুধার্ত চোখ জ্বল-জ্বল করছে।

আঁচলটাকে পিঠে তুলে মাসাম্‌মা ডান হাতে টেনে নিল তার কোদাভালি।

সে কোপ বসাবার ভঙ্গিতে হাতটা শূন্যে তুলে চিৎকার করে বলল, শূকরের মরণ আর কি!

ছাড় হাত, নইলে উড়িয়ে দেব ও হাতখানা।

ওর মূর্তি দেখে আর হাতে এই তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রটা দেখে হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল রেঞ্জার।

সেই ঝড় বৃষ্টির রাতেই বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে গাঁয়ে পালিয়ে এল মাসাম্‌মা। সে রাতে কারো সঙ্গে দেখা করল না।

বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ভোরের আলো ফুটলে চুল মুছে, ভেজা কাপড় বদলে সে স্বাভাবিক হল।

অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল সকালে।

প্রতিবেশীরা জানতে চাইল, কখন এলি?

মাসাম্‌মা বলল, এই তো কিছুক্ষণ আগে।

একেবারে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, কোনও অনুযোগ, অভিযোগ নেই।

একজন জিজ্ঞস করল, নাল্‌লাপটুলাকে দেখছি না তো?

ও তিন-চারদিনের জন্য কোয়ার্টার ছেড়ে কাজ নিয়ে বিট অফিসে গেছে, তাই আমি গাঁয়ে চলে এসেছি।

একটি মেয়ে বলল, বেশ করেছিস। ক-দিন একসঙ্গে কুণ্ডে জল আনতে যাওয়া যাবে, তোর বনের গপ্পো শুনবো।

মাসাম্‌মা মনে মনে বলল, অতি বিচিত্র সে গল্প। কাউকে যেন আর তেমন গল্প না শুনতে হয়। মুখে বলল, শুনবি বইকি। বানানো গল্প শুনতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু গল্প সত্যি হলেই বিপদ। তখন গল্পের বাঘ বুকের ওপর আস্ত থাবাটা বসিয়ে দেবে।

কথাগুলো বলে খিল খিল করে হেসে উঠল মাসাম্‌মা।

ওরাও কিছু না বুঝে ওর হাসিতে যোগ দিল।

পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যায় নাল্‌লাপটুলা এসে উঠল তার ঘরে। তখন মেয়েদের সঙ্গে কুণ্ডে জল আনতে গিয়েছিল মাসাম্‌মা। সে ফিরে এসে দেখল ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। যাবার সময় ও ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিল, এখন আবার কে এল? নাল্‌লাপটুলা ছাড়া ভেতর থেকে ঘর কেই বা বন্ধ করবে।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে মাসাম্‌মা নরম গলায় বলল, কি হচ্ছে? দরজাটা খোলো।

কোনও শব্দ নেই।

এবার দরজা ধাক্কালো মাসাম্‌মা। বলল, ভারী কলসী নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল নাল্‌লাপটুলা, জন্মের মতো এ ঘরে ঢোকা তোর বন্ধ হয়ে গেছে। ওই কলসী গলায় বেঁধে কুণ্ডের জলে ডুবে মরগে। আমার চাকরিটা খেয়ে নিলি হারামজাদি।

মাসাম্‌মাও তেজের সঙ্গে বলল, তুমি তো সাহেবের পেয়ারের গোলাম, তা হলে তোমার চাকরি কি করে যায়?

আগে বল, তুই পালিয়ে এলি কেন?

সে কথা তোমাকে বলে কি লাভ। তোমার গায়ের চামড়া বড় মোটা, সেখানে ফোস্কা পড়বে না। তবু যদি শুনতে চাও, শোনো।

ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল।

কি শোনাবি, শোনা!

ঝড়ের রাতে সুযোগ বুঝে ওই শয়তানটা আমার হাত জাপটে ধরেছিল।

বিকৃত ভঙ্গি করে নাল্‌লাপটুলা বলল, আহা, ওইটুকুতে সতীর সোনার অঙ্গ গলে গেল। এদিকে আমার চাকরির যে বারোটা বাজল, তার কি হবে?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে মাসাম্‌মা বলল, বউকে ভেট দিয়ে যে চাকরি রাখতে হয়, সে চাকরিকে বিদায় করে দাও ঝেঁটিয়ে। আমি তোমাকে খাওয়াব। খোন্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ করব, বন থেকে মেটে আলু তুলে আনব, ফল-পাকড় জোগাড় করব, জাল পেতে পাখ-পাখালি ধরব, তোমার খাবার কোনও অভাব রাখব না।

নাল্‌লাপটুলা বলল, সাহেবের বড় দয়ার শরীর। তিনি বলেছেন, তোকে ছেড়ে দিলে আমি চাকরি ফিরে পাব।

মাসাম্‌মা রাগ করে বলল, তা হলে তোমার চাকরি নিয়ে থাকো। যেদিকে দুচোখ যায়, আমি বেরিয়ে গেলাম।

না, অমন করে যাওয়া চলবে না, তোর যাওয়ার পাকা ব্যবস্থাই আমি করে দিচ্ছি।

সত্যি, ঘটনাটা ঘটাল নাল্‌লাপটুলা। সে বুড়োদের সঙ্গে পরামর্শ করল, পঞ্চায়েত ডাকল। পঞ্চায়েত জমায়েতে কেবল পুরুষরা নয়, মেয়েরাও হাজির হল। বিশেষ ডাক দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে মাসাম্‌মাকে।

নাল্‌লাপটুলা আগেভাগেই এসে হাজির হয়েছিল।

বিচারসভা বসেছে। গ্রাম-মোড়লের হাতে বেশ কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছে নাল্‌লাপটুলা।

মোড়লই মুখপাত্র হয়ে বলতে লাগল, তোমাদের কাছে একটা কথা বলি, নাল্‌লাপটুলার ওপরে এ গাঁয়ের অনেকেরই ঈর্ষা আছে। কারণ, সে ব্যবসাদার বাপের ছেলে, তাই পৈতৃক সূত্রে কিছু টাকা পেয়েছে। তা ছাড়া ও নিজে সরকারি অফিসে কাজ করে, তাই ওকে দেখে আমাদের ঈর্ষা হবারই কথা। কিন্তু ও যে কতখানি দুর্ভাগা, তা কি আমরা কোনওদিন ভেবে দেখেছি।

জনতা অবাক হয়ে মোড়লের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মোড়ল বলল, এত টাকা পয়সা মান প্রতিপত্তির ভেতরে থেকেও ওর কিছু নেই।

একজন বলে উঠল, কিছু নেই কি রকম, ওর তো সবই আছে।

মোড়ল গলা চড়িয়ে বলল, উত্তালুরিকে তোরা নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি?

একজন বলল, নাল্‌লাপটুলার প্রথম বউ তো?

হাঁ, সে দু-তিনবছর ঘর করেছে, কিন্তু স্বামীকে একটিও সন্তান দিতে পারেনি। সে মরে প্রাশ্চিত্তির করেছে। তারপর বেচারা বিয়ে করে আনল আর একটা মেয়েকে। এ বউকে নিয়েও বেচারা ঘর করল দু-তিনটে বছর। কিন্তু এখানেও শূন্য। নল্‌লাপটুলার কপালটা দেখ, দুটি বউ-ই বাঁজা। এখন ওকে তো একটা বংশরক্ষা করতে হবে, না হলে বিয়ান্না পরিবারটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় যে।

সবাই তখন সায় দিয়ে মাথা নাড়তে লাগল।

মোড়ল বলল, তা হলে একটা পাত্রীর খোঁজ করো তোমরা। তার আগে নল্‌লাপটুলাকে তার বউকে ত্যাগ করতে হবে।

একটি মেয়ে বলল, মাসাম্‌মা তো কোনও দোষ করেনি।

মোড়ল ধমক দিয়ে বলল, তুমি মেয়েছেলে, বিচারের কি জানো? বাঁজা মেয়েকে সমাজ থেকে সরিয়ে দেবারই নিয়ম। স্বামী যদি বিসর্জন দেয়, তা হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কি হে নাল্‌লাপটুলা, তোমার মতলবটা কি বলো তো? তোমার বাঁজা বউয়ের দিকে তাকিয়ে গাঁয়ের ক-টা নতুন বউ যেন বাঁজা হয়ে না যায়। ওদের ছায়া মাড়ালেই বিপদ।

নাল্‌লাপটুলা বউকে ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করবে বলে উঠেছিল, কিন্তু তার কিছু বলার আগেই মাসাম্‌মা উঠে দাঁড়াল। সে শান্ত গলায় বলল, অকারণে আমার স্বামীকে দিয়ে একটা অন্যায় কাজ কেন করিয়ে নিতে চাইছেন আপনারা। তার চেয়ে আমি স্বেচ্ছায় এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আপনাদের কারও ওপরে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

সবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নত হয়ে নমস্কার করে স্বামীর ঘর থেকে বিদায় নিল মাসম্‌মা।

মেয়েরা এই স্বল্পভাষী মেয়েটিকে মনে মনে খুবই ভালবাসত। ওরা সকলে মাসাম্‌মাকে ঘিরে নিয়ে

বনের ভেতর কিছুদূর এগিয়ে দিতে গেল। অনেক ফল আর খাবার-দাবার দিয়ে দিল ওর সঙ্গে। কেউ কেউ ওকে বেশ কয়েকখানা কাপড়ও উপহার দিল।

এত দুঃখের ভেতরে মাসাম্‌মার চোখ দিয়ে একবিন্দুও জল গড়িয়ে পড়ল না। তার মনে হল, সে যেন একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

পুরো একদিন একরাত্রি বন চিরে চলল মাসাম্‌মা। এদিকে বন অতি নিবিড়। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

মাসম্‌মা এসে থামল একটা টিলার তলায়। টিলার তিনভাগ সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে। নীচে ঘন নিবিড় অরণ্যের ভেতর বিধাতা দু-চারটে ফলকর গাছও রেখে দিয়েছেন। জানি না, কোনও সময় নিবিড় বন চিরে এখানে কোনও বানজারার দল এসেছিল কিনা, যারা এই ফলকর গাছগুলো লাগিয়ে রেখে গেছে।

টিলার তলায় এমন একটা গুহা মিলে যাবে তা ভাবতে পারেনি মাসম্‌মা।

মাসাম্‌মার নতুন মানুষ

কোটি কোটি ভোমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলছিল। পুরো টিলাটা যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। গুহা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মাসাম্‌মা। শেষ বেলা পর্যন্ত খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে বীজ বুনছিল মাসাম্‌মা। তারপর ক্লান্ত হয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিচ্ছিল গুহার ভেতর। এমন সময় এই প্রলয়ঙ্কর গর্জনটা তাকে জাগিয়ে তুলল।

মাসম্‌মা টিলার দিকে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকার আকাশের বুক থেকে ভয়ঙ্কর গর্জন করে নেমে আসছে একটা অগ্নিপিণ্ড। পিণ্ডটা আছড়ে পড়ে যেন ভেঙে দিল টিলার মাথাটা। আরও প্রবলবেগে জ্বলে উঠল আগুন। মাসাম্‌মা ভয় পেয়ে আবার গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। এত আলো ছড়িয়ে পড়ছিল যাতে রাতেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল বনটাকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মুছে গেল আলোর চিহ্ন। সে কিন্তু গুহা থেকে আর বেরিয়ে এল না। সে রাতে সে কিছু খেতে পারল না। তার কাছে রান্নার সব ব্যবস্থাই ছিল কিন্তু রান্না করতেও তার প্রবৃত্তি হল না।

মাঝরাতে মাসাম্‌মা দেখল, নির্মল আকাশে কখন চন্দ্রোদয় হয়েছে সেই চাঁদের আলো গলে ঝরে পড়ছে বনের ভেতর।

সে বেরিয়ে এলো। টিলার মাথা থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছিল। মাঝে মাঝে দগ্‌দগে খানিকটা আগুনের আভাও তার চোখে এসে লাগছিল।

এই বনে প্রায় দু-বছরের বাসিন্দা সে। সব পথঘাট এখন তার নখদর্পণে। সে সোজা পথটা ধরে টিলার দিকে চলল। টিলার যে দিকটা চাঁদের আলো ধুইয়ে দিচ্ছিল সেদিকে গিয়ে পৌঁছল সে। এখানে টিলার তলায় কতকগুলো গাছের জটলা।

এ কি! গাছ থেকে কি যেন একটা বস্তু ঝুলে পড়েছে। সে সেদিকে এগিয়ে গেল। এ যে একটা মানুষ।

মাসাম্‌মা ভাল করে তাকিয়ে দেখল একটা কাপড়ের বিরাট ছাতা কয়েকটা গাছের মাথায় জড়িয়ে আছে আর সেখানে থেকে ঝুলছে কয়েক টুকরো দড়ি, যাতে বাঁধা হয়ে আছে একটা মানুষ। সে মানুষটা যেন পাথুরে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে।

সেদিকে ছুটে গেল মাসাম্‌মা। হাঁ, মানুষই তো বটে। তবে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মি. সেসিলের বাড়িতে একটা বইয়ের ভেতর সে একটা ছবি দেখেছিল। শরীরে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি মানুষ এমনিভাবে বিশাল একটা ছাতার তলায় ঝুলে আছে।

মি. সেসিল বলেছিলেন, প্যারাসুটে ভর করে মানুষ মাটিতে নামছে। এটা তাহলে একটা প্যারাসুট।

কিন্তু মানুষটির কাছে গিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখল, প্রাণে বেঁচে থাকলেও মানুষটি অচৈতন্য, ডান

হাঁটুটা দুমড়ে-মুচড়ে আছে। সে দৌড়ে গিয়ে ঝরণা থেকে খানিকটা জল নিয়ে এলো। লোকটার মুখে মাথায় ঢেলে দিল সে জল।

লোকটা একটু একটু মাথা তোলার চেষ্টা করছিল আর জল খাবার জন্য জিভটা বের করছিল। ও তার কোমর থেকে কোদাভালিটা টেনে নিয়ে লোকটার কোমরের সব কটা দড়ি কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ওরই ওপর ঢলে পড়ল মানুষটা।

এরপর যেন অসুরের বল এলো তার শরীরে। সে মানুষটাকে জাপটে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল তার গুহার ভেতর।

প্রথমে জল ঢেলে ধুইয়ে দিল তার মাথা। চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিল। মুখের ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প জল খাইয়ে দিল। মানুষটা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাতে লাগল।

দুমড়ে যাওয়া ডান পা খানা ধরে সোজা করে দিতেই মানুষটা একটা গোঙানির শব্দ তুলল।

মাসাম্মা ছুটে গেল বাইরে, প্রচণ্ড ব্যথা হরণ করতে পারে এমন ওষুধ তার জানা ছিল। সে কতকগুলো মূল্যবান শেকড় আর পাতা তুলে আনল। পাথরের নোড়ার সাহায্যে বাটল সেগুলো। তারপর খাইয়ে দিল মানুষটাকে।

সে জানে, এ ওষুধ ব্যথা কমাবে আর ঘুম এনে দেবে। পাতা থেঁতো করে মানুষটার ডানপায়ের হাঁটুর ওপর রেখে নিজের কাপড়ের একটা অংশ ছিঁড়ে বেঁধে দিল।

পরের দিন দুপুরে জাগল মানুষটা। কেবল এদিক ওদিক তাকাতে লাগল, কিন্তু ওঠার ক্ষমতা তার ছিল না।

এই অবস্থায় মাসাম্মা মানুষটার সেবা যত্ন করল ছ-মাস ধরে। লোকটির বুকপকেট থেকে একটা ফটো পাওয়া গিয়েছিল। তার ওপর লেখা, এরিখ পেটকফ।

মাসাম্মা বুঝেছিল মানুষটা মি. সেসিলদেরই স্বজাতীয় কেউ। সে ওই টিলার ওপরে প্লেনের একটুকরো ভাঙা পাখাকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। সেই টুকরোটুকু ছ'মাস পরেও সেখানে পড়ে আছে। সূর্যের আলো পড়লে সেটা এখনও চকচকে আলো ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

মানুষটাকে মোটামুটি সচল করে তুলতে প্রায় একটি বছর লেগে গেল মাসাম্মার।

এরিখ বাঁ পায়ে ভর দিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বাঁ হাতটা একটু দুর্বল হলেও অচল নয়। ডান পায়ে ব্যথা না থাকলেও অচল হয়ে গেছে।

মাসাম্মার কাঁধে ভর দিয়ে এরিখ বনের পথে হাঁটার চেষ্টা করে, হঠাৎ হঠাৎ গাছের কাণ্ডকে ধরে ব্যালেন্স রক্ষা করে।

মাসাম্মার সেবা যত্নের যেন কোনও তুলনা নেই। একদিকে নিজে ক্ষেত তৈরি করছে, ফসল ফলাচ্ছে, অন্যদিকে ফল সংগ্রহ করছে গাছ থেকে। রান্নাবান্না করছে, ফাঁদ পেতে পাখি আর খরগোস ধরে এরিখের জন্য সুপ তৈরি করে দিচ্ছে। এমনিভাবে সে সুস্থ করে তুলছে একটা পঙ্গু মানুষকে।

একদিন এরিখ মাসাম্মার পরিচয় জানতে চেয়ে বলেছিল, তুমি কি আজীবন এই গুহাতেই বাস করছ, তোমাকে দেখে যেন তাই মনে হয়।

মাসাম্মা হেসে বলল, এখানে থাকলে আমি কি তোমার ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম।

এরিখ বলল, তাই তো আমি অবাক হয়ে ভাবি, তুমি কি কেবল আমাকে রক্ষা করার জন্যেই এখানে এসেছ?

হয়তো দেবতা মল্লিকার্জুন তোমার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি আগে মানুষের সমাজেই বসবাস করে এসেছি। তোমাদের জাতের এক দয়ালু মানুষ আমাকে তোমাদের ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু দুঃখকে সঙ্গী করে একদিন আমাকে এখানে আসতে হয়েছিল। হয় তো তাই দেব মল্লিকার্জুন তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলেন।

এরপর এরিখের জিজ্ঞাসার উত্তরে একে একে জীবনের সব পাতাগুলো উল্টে গেল মাসাম্মা।

বিস্মিত স্তম্ভিত এরিখ মন্তব্য করল, এইটুকু জীবনে এত অভিজ্ঞতা তোমার!

মাসাম্মা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি একাই প্লেন নিয়ে বেরিয়েছিলে?

হ্যাঁ। একটা কষ্টের ছাপ এরিখের সারা মুখে ফুটে ওঠে। সে বলে, ও নিয়ে আমাকে আর প্রশ্ন কোরো না। ও কথা ভাবতে গেলেই আমার মাথায় তীব্র একটা যন্ত্রণা শুরু হয়। আমি পেছনের জীবনের কথা একেবারেই মনে করতে চাই না। তোমাকে এখানে পেয়ে আমি একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছি। এই আরণ্যক জীবনটাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে চাই না।

এই চেঞ্চু মেয়েটা কি ভানুমতী? তার ভালবাসার, তার মমতার গন্ধে কি মাতাল হয়ে গেল স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ভ্রাম্যমাণ এরিখ পেটকফ?

প্রতিদিনই আজকাল মাসাম্মার সাহায্য ছাড়া গাছ ধরে ধরে হাঁটার চেষ্টা করে এরিখ। আজকাল সে উঁচু টিলাটাতে ওঠার চেষ্টা করে হামা দিয়ে দিয়ে। বেশ কিছুটা ওপরে উঠে সবুজ ঘাসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে রোদ পোহায়।

তার কাছে অবলীলায় উঠে যায় মাসাম্মা। নিজের কোলে এরিখের মাথাটা তুলে নিয়ে আঙুল চালিয়ে তার চুলে বিলি কেটে দেয়। জগৎ সংসারের কেউ নেই কোনদিকে। চারিধার নিভৃত নির্জন। কখনও সুধার পাত্র ভরে নিয়ে চাঁদ ওঠে। সেই অমৃত ছড়িয়ে দেয় সুধাকর। দুটি হৃদয় আকুল হয়ে তা পান করে।

এমনি করে ঋতুপর্ব পার হয়ে যায়। আষ্টেপিষ্ঠে তাদের জড়িয়ে ধরে অরণ্যবাস। বনে ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, হাওয়া বয়ে যায়। এরিখ ভাবে, এ যেন কেবল তাদেরই জন্য।

রাতে দুজনে গুহার অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। দুজনের হাত নিয়ে দুজনে খেলা করে। আঙুল দিয়ে মুখে, বুকে চিত্রলেখা আঁকে। কিন্তু নৈশ মিলনের কোন সুযোগ দেয় না মাসাম্মা। এখানে সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে চেঞ্চুদের রীতি।

এরিখ প্রতীক্ষা করে অরণ্য-গভীরে দিবামিলনের জন্যে। রাতের অন্ধকারে তারা কথা বলে।

নারীকণ্ঠ শোনা যায়, আমার মনে হয়, তোমার জন্যেই আমি এত কষ্টের পথ পার হয়ে এসেছি।

কিন্তু আমি যে পঙ্গু মাসাম্মা। আমি কেবল তোমার সেবা পেয়েই যাচ্ছি, তোমাকে কিছু দিতে পারছি না।

সব দুঃখের শেষে তুমি বসন্তের ফুল হয়ে আমার মনে ফুটে উঠেছ এরিখ।

এরিখ বলল, এই বনেই শুরু হল আমাদের জীবনের খেলা। দেখা যাক ঈশ্বর কত দূরে আমাদের নিয়ে গিয়ে সে খেলায় ইতি টানেন।

এরিখের মুখ চেপে ধরে মাসাম্মা বলে, শুরুতেই শেষের কথা বোলো না এরিখ। তুমি আমার বড় কষ্টের ধন। তোমাকে পেয়ে সব কষ্ট আমার ধুলো হয়ে গেছে।

এরিখ বলল, আমিও ভুলে গেছি আমার অতীতকে। যতবারই সে আমার স্মৃতির পথ ধরে আসতে চায়, আমি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাই। তাই অতীত আমার কাছে মৃত।

মাসাম্মা বলল, এসো আমরা ভাবি, একটা নতুন জগতে দুজনে এসে পড়েছি, সেখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই।

এরিখ বলল, আছে। শুধু পাখির গান আর হাওয়ার বিচিত্র শব্দ। মাসাম্মা, আমি আজকাল যেন গাছের ভাষাও বুঝতে পারি। তারা ফুলে ভরা ডাল নেড়ে আমাকে ডাকে। বলে, তুমি ফুল ছিঁড়ে নিজের হাতে নষ্ট কোরো না, তুমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখ, আমি তোমার মন ভরে দেব মিষ্টি গন্ধ পাঠিয়ে।

মাসাম্মা বলে, তুমি কবি। মি. সেসিল আমাকে অনেক কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। মি. সেসিলকে আমি অল্পদিন পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমার বাবার মতো, আর ওই দেবতা মল্লিকার্জুনের মতো। চলে আসার সন্ধ্যায় আমারে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন।

এরিখ বলল, তোমাকে সকলেই ভালবাসবে মাসাম্মা। তোমার সঙ্গ যে একবার পাবে সে তোমাকে জীবনে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

একটা কষ্টের ঢেউ মাসাম্‌মার বুক ঠেলে উঠে এল। নীরবে সেই ব্যথাটা সে বুকের মধ্যে চেপে রাখল।

ওঃ! কি অসহ্য সেই যন্ত্রণা! একজন নারীকে বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজ থেকে বের করে দেবার নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে তা তার জানা নেই। আজ কেন জানি না, সংশয় জাগল মাসাম্‌মার মনে, সে কি সত্যিই বন্ধ্যা? সে কি কোনও দিন ফুলের মতো একটা শিশুর মুখ দেখতে পাবে না? সে কি তার গায়ের কচি গন্ধটুকু বুক ভরে টেনে নিতে পারবে না? তাকে স্তনদান করে সে কি তার ক্ষুধাটুকু মিটিয়ে দিতে পারবে না? রাতের অন্ধকারে চোখের জলে ভাসতে লাগল মাসাম্‌মা।

কোথায় যেন একটা বেদনার সুর বেজেছে, এটি অন্ধকারের ভেতরেও অনুভব করল এরিখ। তার ডান হাতখানা আপনিই চলে গেল মাসাম্‌মার মুখের ওপর। সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই, চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

এরিখ সেই অন্ধকারে চম্পক ফুলের মতো মাসাম্‌মার মুখখানাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দিল। সে জানে না, কেন মাসাম্‌মার এই কান্না, কিন্তু তার মনের বীণায় বেদনার রাগিণীটি ঠিকই বেজে উঠেছিল।

ভালবাসা এক আশ্চর্য যাদুকর। দেহের মিলনে যখন পুরুষ নারী ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে তার যাদু-প্রদীপটি তুলে ধরে তাদের চোখের সামনে। এই স্নিগ্ধ, শান্ত, উজ্জ্বল প্রদীপটি তাদের আকর্ষণকে আবার ফিরিয়ে দেয়।

মাসাম্‌মা বুঝেছে, এরিখের ভালবাসার ভেতর কামনার উত্তেজনার চেয়ে স্নিগ্ধতার স্পর্শটাই বেশি আছে। সে আমাকে চায়, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল বসন্তের বন। মিলনের সুর তুলে প্রেমিকাকে ডাকছিল বিচিত্র নাম না জানা পাখি। চুপি চুপি বাতাসের পাখায় ভর করে হলুদ প্রজাপতিটির মতো কাঁপতে কাঁপতে বনের ভেতর ঢুকে পড়েছিল একফালি রোদ্দুর, ঠিক সেই মুহূর্তে মহুয়া বনে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো উড়ে এল একটা শব্দ।

টিলার সবুজ গা বেয়ে অনেকটাই ওপরে উঠে গিয়েছিল এরিখ। নীচে বনের ভেতর দাঁড়িয়ে বসন্তের কয়েকটা ফুল নিয়ে খোঁপায় গুঁজছিল মাসাম্‌মা। হঠাৎ তার মনে হল, ভ্রমরের যে গুঞ্জনটা সে শুনতে পাচ্ছিল, সেটা কাছাকাছি কোথাও এসে থেমে গেছে। ওদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সে নিজের মনে নিজেকে সাজাতে লাগল। সত্যিই কত ফুল তাকে উপহার দিয়ে গেছে বসন্ত।

হঠাৎ তার মনে হল, কারা যেন টিলার ওদিকে কথা বলছে। কোনও এক নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বাস শুনে সে ফিরে তাকাল। সে বন থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল টিলার দিকে। কিছু পথ এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। তার চোখের সামনে দেখতে পেল একটি দৃশ্য।

টিলার মাঝখানে নতজানু হয়ে বসে আছে এরিখ। সূর্যের সোনালি আলো তার নগ্ন উর্ধ্বদেহে খেলা করছে। মাসাম্‌মার মনে হল, এ যেন এরিখ নয়, কোনও দেবদূত।

টিলার নীচ থেকে একটি শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী নারী উঠে চলেছে তার দিকে। কোলে ফুলের মতো একটি শিশুকন্যা।

এরিখ! এরিখ! যেন বসন্তের কোন বিরহিণী পাখি ডেকে উঠল।

এরিখ কি স্তব্ধ হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে? সে কি শুনতে পাচ্ছে না সে আহ্বান?

সূর্যের স্পর্শে তুষারশৃঙ্গ যেমন বিগলিত হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে একসময় গলে ঝরে পড়ল এরিখ।

ততক্ষণে যুবতী তার শিশুকন্যাটিকে তুলে দিয়েছে এরিখের কোলে।

চিরন্তনী নারী সমর্পণের ভঙ্গিতে পুরুষের জানুর ভেতর ডুবিয়ে দিয়েছে তার কান্নাভেজা মুখ।

নীচে জিপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এ দেশীয় একটি ড্রাইভার।

সবই বুঝতে পারল মাসাম্‌মা।

ওই মেয়েটি, ওই শিশুটি খুঁজতে এসেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে। পেয়েও গেছে প্রভাতের এক সুন্দর মুহূর্তে।

একটুও ঈর্ষা এল না মাসাম্মার মনে। সেই পবিত্র দৃশ্যটা দু-চোখ ভরে দেখল, সারা মন দিয়ে অনুভব করল।

এতক্ষণে এরিখের চোখ পড়েছে মাসাম্মার ওপর। সে তার প্রিয়জনকে কানে কানে কিছু বলল। মাসাম্মার দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটি। এবার তিনজনই নেমে আসতে লাগল নীচে।

যুবতীর কাঁধে ভর রেখে নামছে এরিখ। মাসাম্মার পাশে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

সহসা নিজের গলার মূল্যবান মুক্তোর মালাটা খুলে নিয়ে যুবতী মাসাম্মার দিকে এগিয়ে ধরল।

তুমি আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমার ঋণ কোনওদিনই শোধ করতে পারব না। এই সামান্য উপহারটুকু তোমাকে দিতে চাই। কৃতজ্ঞতার একটুখানি চিহ্ন।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে মাসাম্মা বলল, মি. সেসিল বলতেন, উপকার করে তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া ঠিক নয়। আমি যদি আপনার স্বামীর সামান্য উপকারও করে থাকি তা হলে তার বিনিময়ে আমি যেটুকু আনন্দ পেয়েছি সেটাই আমার পুরস্কার।

ওরা তিনজনে বিদায় নিয়ে একসময় গাড়িতে গিয়ে উঠল। এই মিলনদৃশ্য দেখে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল মাসাম্মার চোখ ছাপিয়ে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল গাড়ি চলে যাওয়ার একটা গর্জন। তার মনে হল, যে শব্দ ধরে একদিন এই বনের মধ্যে এক দেবদূত আবির্ভূত হয়েছিল, আর এক শব্দের ভেতর দিয়ে ঘটল তার প্রস্থান। এই শব্দটুকুই থেকে গেল মাসাম্মার কানে। তার মনে হল, আর সবটুকুই একটা অলীক স্বপ্ন।

কিন্তু না, এ যে স্বপ্ন নয়, তা সে অল্প কয়েকদিনের ভেতরেই অনুভব করল।

এরিখ জানতে পারল না, সে তার মাসম্মাকে কত বড় একটি উপহার দিয়ে গেছে।

কেবল সন্তান নয়, সে দু'হাত দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে তার বন্ধ্যাত্বের অপবাদ।

একদিন দেখা গেল, এক মা একটি শিশুকে বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে গর্বিত পায়ে বন চিরে এগিয়ে চলেছে তার ফেলে আসা গাঁয়ের দিকে। মায়ের মুখে বিজয়িনীর হাসি।

●

আকাশ হারিয়ে যায়

অমলাভ,

অতল ঘুমের সমুদ্রে তলিয়ে যাবার আগে চোখের ওপর ভেসে উঠছে শুধু তোমার মুখখানা। কি নির্মল চাউনি মেলে তুমি তোমার একান্ত প্রিয় রমণীটির দিকে চেয়ে আছ। কোন সন্দেহের, কোন গ্লানির ছায়ামাত্র নেই ও চোখে। কি আশ্চর্য বিশ্বাস তোমার! এখনও কি নিবিড় নির্ভরতা ঐ দুটো চোখের দৃষ্টিতে আঁকা হয়ে আছে।

আট বছরের বিবাহিত জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যেও মনে পড়ে না, তুমি আমার ওপর তোমার আগ্রহ হারিয়েছ। রোজকার জীবনের একঘেয়েমি কিংবা দেহলীলার একই পুনরাবৃত্তি কখনও তোমাকে ক্লান্ত করেছে বলে মনে হয়নি। তোমার ভেতর যে কোন রকম ক্ষয় পূরণের অমিত এক শক্তিকে কাজ করতে দেখেছি। এ যে কতখানি শক্তি তা নিজে হেরে গিয়ে বুঝেছি।

আমাদের বিয়ে ভালবাসার নয়। আমার ইচ্ছাতেই মা বাবা সৎপাত্র খুঁজে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন। দিদির ভালবাসার ব্যর্থ বিয়েটা তখনও তাঁদের বুকের ভেতর শেলের মত বিঁধেছিল। ঐ বিয়ের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিই বাবার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকের কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

আমার বাবা বড় ভালবাসেন তাঁর বড় মেয়েটিকে। ব্যবসায়ে মায়ের পরামর্শ নিলেও শেষ মতামতটি গড়ে নেন দিদির সঙ্গে আলোচনা করে। দিদি বিয়ের পর যখন বম্বেতে থাকত তখন দরকার পড়লেই ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিতেন। ইউনিভারসিটিতে কোনদিন সেকেন্ড হয়নি দিদি। তাই দিদিকে নিয়ে বাবার গর্বের শেষ ছিল না।

সেই দিদি যেদিন একবুক কষ্টের পাষাণভার নিয়ে দমদমে নামল সেদিন বাবাই তাকে আনতে গিয়েছিলেন। আগের দিন রাতে ফোনে কথা বলতে গিয়ে দিদি কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। স্পষ্ট করে কোন কথা বাবাকে জানায়নি। শুধু বলেছিল, কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে যাচ্ছি, তুমি এয়ারপোর্টে থেকো বাবা।

সারাটা রাত বাবা ঘুমুতে পারেননি, কেবল ঘর আর বাইরের বারান্দায় পায়চারি করেছেন। আমি বারান্দার লাগোয়া দক্ষিণের ঘর থেকে বাবার অসহায় অস্থিরতার ছবিটা দেখছিলাম। মাঝে মাঝে শোবার ঘর থেকে মায়ের চাপা গলার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিল।

আমার মায়ের ভেতর মমতায় ভরা একটি মন আছে। কিন্তু তার কঠিন ব্যক্তিত্বের আবরণ ভেদ করে সেই মনের ছবিটা বাইরের আচরণে কোনদিনই প্রকাশ পায়নি।

আমার বাবা বড় বেশী আবেগপ্রবণ। মা ঠিক তার উল্টো। আবেগকে চেপে রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মায়ের।

শুনেছি এয়ারপোর্টে দিদি বাবার বুকে আছড়ে পড়েছিল। বাবা তাকে কোনরকমে টেনে এনে গাড়িতে তুলেছিলেন।

দিদির প্রথম কথা ছিল, আমি আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা।

বাড়ি গিয়ে সব কথা হবে, এখন এখানে নয়, বাবা বলেছিলেন। বুবাইকে আনলি না?

দিদি কাতর গলায় বলেছিল, ও এখন ওর বাবার জিম্মায়। ওর সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি বাবা।

বুবাইয়ের জন্য দিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

এসব এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসে মায়ের কাছে বর্ণনা দিচ্ছিলেন বাবা।

আমাদের বিয়ের পর দিদির জীবনযাপনের ধারা সম্বন্ধে তোমার অনেকখানিই জানা হয়ে গেছে। এবার আমার নিজের কথাই বলি।

তুমি মাঝে মাঝেই আমাকে অনুযোগের সুরে বল, আঁখি, তুমি এত চাপা কেন?

আমি কখনো চাপা হাসি হেসে তোমার দিকে তাকাই। আবার কখনো বলি, বাবার স্বভাবটা দিদি পেয়েছে, আর মায়েরটা আমি।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমি অনুভব করছি, প্রবল মানসিক আলোড়নকে সংযত করে রাখার যে অসাধারণ ক্ষমতা আমি একসময় মায়ের ভেতর দেখেছিলাম, তার কণামাত্র আমার ভেতর নেই। মা সত্যিই অনন্যা। সেই মায়ের মেয়ে হয়ে আমি হেরে গেলাম।

তুমি জানো, কৌশিকদা কলকাতা এলেই মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যায়। বাবা থাকতে একবারও আসেনি। এখন আসে কিন্তু দিদির সঙ্গে দেখা হয় না। হয়তো দুজনে চায় না কোনভাবেই দুজনের মুখোমুখি হতে। মা কিন্তু কৌশিকদাকে বেশ আদর করেই বসায়, খাওয়ায়। দিদির সম্বন্ধে কিন্তু মা একটি কথাও তোলে না। কেবল বুবাইয়ের সম্বন্ধে দু'চার কথায় খোঁজ নেয়।

কৌশিকদা যে আমাদের বাড়িতে আসে সেটা মায়ের অকপট স্নেহ আর বিপুল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে। আমি দেখেছি, একবার যাকে মা অন্তর থেকে গ্রহণ করে তাকে কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করে না।

আমি একদিন সহ্য করতে না পেরে কৌশিকদা চলে যাবার পর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দিদি যখন আমার মেয়ে টুকাইকে নিয়ে খেলা করে আর হা হা শব্দ তুলে হাসে তখন তার দিকে চেয়ে দেখেছ?

কেন? কি হয়েছে?

ওটা হাসি নয়, হাহাকার।

আমি এ কথার ভেতর কি জানাতে চাইছি তা বুঝে নিতে মায়ের একটুও সময় লাগেনি। মা অদ্ভুত একটা উত্তর দিয়েছিল সেদিন, প্রবল স্রোতের মুখে নৌকো ছেড়ে দেওয়া যত সহজ তাকে টেনে রাখা তত সহজ নয়। কোন কিছু ছেড়ে দিতে কতক্ষণ, ছেড়ে দিলেই তো ভেসে চলে যাবে। দেখি কতক্ষণ টেনে রাখা যায়।

রাগে সারা শরীর জ্বলছিল, বললাম, আর কতক্ষণ টেনে রাখবে মা?

একেবারে শান্ত গলায় মা জবাব দিল, স্রোত একদিকে বয় না মা, উল্টোমুখেও তাকে ফিরতে হবে। সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় আমি বসে আছি।

এতবড় অন্যায়ের শাস্তি নেই মা?

মার গলায় কোন উত্তেজনা নেই। বলল, আমরা সকলেই কমবেশী অন্যায় করে শাস্তির অপেক্ষার বসে আছি।

এ কথা সেদিন কেন মা উচ্চারণ করেছিল? তার নিজের কোন ভ্রান্তি বা অন্যায়ের কথা ভেবে কি এই স্বীকারোক্তি?

সম্ভব। আর সেই ভ্রান্তি বা অন্যায়ের স্বীকারোক্তি দেবার জন্য আমি এই দীর্ঘ পত্রটি রাত্রি জেগে লিখে চলেছি।

আজ আমার অশান্ত আত্মা তোমার কাছে তার সব ভুলভ্রান্তির হিসেব না দিয়ে শান্ত হবে না।

বিয়ের দিন শুভদৃষ্টির সময়ে আমি তোমার মুখ দেখেছি। তার আগে তুমি যেদিন তোমার জিয়াজীর সঙ্গে পাত্রী নির্বাচন করতে এসেছিলে, সেদিন মায়ের পাশে থেকে আমি পরিবেশনে সাহায্য করেছিলাম। কিন্তু একবারও তোমার দিকে তাকিয়ে দেখিনি। আমি স্থির করেছিলাম, দিদির অনেক দেখা, অনেক চেনার পথ ধরে আমি হাঁটব না। তুমি অমলাভ বেদজ্ঞ। বেদবিদ পরিবারের সন্তান তুমি। বৈদিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমি আমার জীবন-সঙ্গীকে বরণ করে নেব। তার আগে কোনভাবেই আমার দৃষ্টি স্পর্শ করবে না তোমার নির্মল আভাযুক্ত মুখ।

শুভদৃষ্টির সময়ে তুমি উচ্চারণ করলে, 'অঘোরচক্ষুর্ অপতিঘ্নী-এধি...'

'তাকাও স্নিগ্ধ নয়নে

চিরদিন থাক পতির সঙ্গে সঙ্গী জীবনে-মরণে'

তোমার সেই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকিয়েছিলাম। তোমার সে মুখ, সে দৃষ্টি আজও ভুলিনি।

আমার বিয়ের সময় বাবা বেনারস থেকে আমাদের পুরনো পুরোহিত বংশের তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন। শুদ্ধ উচ্চারণ আর নিখুঁত অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল আমার বিয়ের কাজ। এ ধরনের পবিত্র অনুভূতি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাকে।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মাঝরাতে বাসরঘর থেকে একে একে বিদায় নিল সকলে। যে একান্ত মুহূর্তটির জন্য মনে মনে কাল গোনে বরবধূ সেই শুভলগ্নটি এসে গেল। আমরা এখন মুখোমুখি দুজনে।

আমি আনত মুখে বসে আছি, কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে আছে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়। অচেনাজন হঠাৎ আপনজন হয়ে দেখা দিলে সমস্ত দেহমনে যে রোমাঞ্চ জাগে তাকে কথা সাজিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

সেদিন প্রথম কথা বলেছিলে তুমি।

আমার হীরে ঝলকানো আংটি পরা আঙুলখানা তোমার আঙুলে আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বলেছিলে,

> 'তমন্নাওকোঁ জিন্দা আরজুওকোঁ জোঁয়া করলূ
> এ শর্মিলি নজর কহে দে তো কুছ গুস্তাকিয়া করলূ।'

'তোমার লাজুক চোখ যদি অনুমতি করে তাহলে আমার ইচ্ছে হচ্ছে মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে সামান্য একটু অন্যায় করে বসি।'

আমার সঙ্গে এই ছিল তোমার প্রথম কথা।

আমি তোমার আর্জির জবাবে কেবল মুখ তুলে তাকিয়েছিলাম। মৃদু হাসি ফুটেছিল আমার মুখে। হয়তো তুমি তাকে প্রশ্রয় ভেবে নিয়েছিলে। শেষ রাতে জানালার ফাঁকে গলে পড়া চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম, ফুলে গড়া আমার হাতের কাঁকন, গলার মালা, মাথার সাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

তুমিই আবার ছিন্ন ফুলের ভেতর থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে অপূর্ব কটি গয়না গড়ে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিলে। আর তাই ভোরের আলোয় অনেক কৌতুকের হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়েছিলাম।

সেই বিয়ের দিন থেকে আমার পাশে আর একজনের উপস্থিতি আমি সবসময় অনুভব করতাম। সে কাজে বাইরে থাকুক অথবা ঘরেই থাকুক, সে আমার মনটাকে ভরে রেখেছে, এই অনুভূতি সবসময় আমার ভেতর কাজ করত।

আমি দিদিকে দেখতাম। বুকের ভেতর কান্না জমিয়ে রেখে কিভাবে রোজকার কাজে খুশীর ঢেউ তোলা যায় তা দিদিকে না দেখলে আমি বুঝতে পারতাম না।

তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, আমরা এ বাড়িতে এসে পৌঁছলে আগেই হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে আসত দিদি। আমার হাত ধরে তোমার দিকে তাকিয়ে বলত, কি মশাই, কাজের চাপ বুঝি এ বাড়ির দিকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছে না? আবার বেটার হাফ্ পাছে চক্ষে হারায় তাই তাকেও এমুখো হতে দিচ্ছেন না?

টুকাই কোলে আসার পরে দিদির সে কি উচ্ছ্বাস! টুকাইয়ের ভেতর সে যেন তার বুবাইকেও দেখতে পেয়েছে। সোহাগে, আদরে, চোখের জলে তার আকুলতার অন্ত নেই।

টুকাইয়ের জন্য রাশি রাশি খেলনা আনে দিদি। নিজে বসে থেকে টুকাইয়ের পুতুলখেলা দেখে। অনেক সময় দিদির চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়, দিদি কেবল টুকাইয়ের খেলা দেখছে না, বুবাই টুকাই দুজনে খেলছে, এমন একটা ছবি দেখছে।

দিদি আবেগপ্রবণ, উচ্ছল কিন্তু অবিবেচনায় নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলে না।

দিদি ভাঙা মন আর বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে এ বাড়িতে কিছুদিন চলে আসার পর ভরদ্বাজদা দেখা করতে এলো।

দিদির সহপাঠি ছিল কৌশিকদা আর ভরদ্বাজদা। একেবারে ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড। ইকনমিক্সে জুয়েল তিন ছাত্রছাত্রী। ইউনিভারসিটির স্যারেরা বলতেন, দিদির নাকি এক্সট্রা অর্ডিনারী ব্রিলিয়েন্স। দশ বিশ বছরের রেকর্ড ব্রেক করা ওর কাছে খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। অন্যদিকে সেকেন্ড আর থার্ড প্লেস নিয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত কৌশিকদা আর ভরদ্বাজদার ভেতর। শেষ পরীক্ষায় ভরদ্বাজদাকে থার্ডপ্লেস পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

কিন্তু নাটকে ভরদ্বাজদা অদ্বিতীয়। ওথেলোতে নাম-ভূমিকায় ওর অভিনয় যে দেখেছে সে কখনো ভুলতে পারবে না। উচ্চারণ, এক্সপ্রেশান, হাঁটাচলা, দর্শকদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে দেবে।

ওর অভিনয়ের সময় দর্শকদের আসনে বসে দিদি আর কৌশিকদা ঘন ঘন হাততালি দিত। উচ্ছ্বাসে কখনো বা সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াত। আমি পাশের সীটে বসে তিনবন্ধুর অকৃত্রিম অনুরাগের ছবি দেখতাম।

দিদির বিয়েতে ভরদ্বাজদা আসতে পারেনি। ওদের ব্যাঙ্গালোরের অফিস থেকে এক কর্মচারী কাজ নিয়ে আসছিল কলকাতায়। তার হাতে দিদির জন্য পাঠিয়েছিল একটা আংটি। বেশ দামী আংটি। মাঝখানে একটুকরো ছোট্ট হীরে, দুদিকে দুটো চুনি।

ভরদ্বাজদা দিদির সঙ্গে চিঠির আদানপ্রদান না রাখলেও দিদির সব খবর রাখত কোন বিশেষ বন্ধুর মাধ্যমে। দিদির সাংসারিক জীবনে দারুণ বিপর্যয়ের খবর পেয়ে একদিন এলো দিদির সঙ্গে দেখা করতে।

দু'বন্ধুতে বারান্দায় বসে কথা হচ্ছিল। আমি ঘরের ভেতর টুকিটাকি কাজ করতে করতে শুনতে পাচ্ছিলাম ওদের কথাবার্তা।

দুজন মুখোমুখি বসে। প্রথম কথা বলল দিদি, কেমন আছ ভরদ্বাজ?

ঠিক আছি।

এবার দিদি কেমন আছে সে প্রশ্ন কিন্তু করল না ভরদ্বাজদা।

দিদি বলল, সেই যে রেজাল্ট বেরোবার পর আমাদের এখানে এসে হৈ হৈ করে গেলে, তারপর উধাও। এতদিন পরে দর্শন মিলল।

আমার সামান্য গিফ্‌ট্‌টা আশা করি পেয়েছিলে?

তোমার বন্ধুত্বের চিহ্ন আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ভরদ্বাজ। ওটা আঙুলে না থাকলেও বহু যত্নে তুলে রেখেছি।

ভরদ্বাজদা বলল, আমি ভাগ্যবান। অনেক উপহারের স্তূপে ওটা হারিয়ে যাবার কথা।

হীরে চুনীর আংটি বলে তুলে রেখেছি যত্ন করে, একথা মনে করো না। ওতে স্মৃতির উজ্জ্বল একটা ছবি আঁকা আছে। তাছাড়া গিফ্‌ট্‌ পেয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হয়তো একটা চিঠি দিতে পারতাম, কিন্তু সেটাকে বাহুল্য বলে মনে করেছি।

এখন বল কি খাওয়াবে?

সামোসা খেতে এখনও ভালবাস তো?

ভরদ্বাজদার গলায় আবেগের ছোঁয়া, আমার পছন্দ অপছন্দের কথা এখনও তুমি মনে রেখেছ!

অনেকগুলো দিন আমরা ইউনিভারসিটি থেকে তেওয়ারীর সামোসা আর জিলাপীর লোভে বড়বাজারের একটা পার্কে হেঁটে গেছি। সেসব দিনের কথা ভোলা যায় না ভরদ্বাজ।

দিদি সামোসা আনাবার জন্য ভেতরে উঠে আসছিল। ভরদ্বাজদা বলল, আমাদের সিস্টারটিকে দেখছি না তো? পতিগৃহে যাত্রা করেছে নাকি?

দিদি হেসে বলল, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, মুখোমুখি হলেই বুঝতে পারবে।

তুমি জান, আমি চিরদিনই কথা কম বলি। আমি ভালবাসি অন্যের কথা শুনতে। তাই ভরদ্বাজদার মুখোমুখি হতে হবে জেনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

দিদি ঘরে ঢুকে বলল, ভরদ্বাজ এসেছে। তোকে দেখতে চাইছে।

বললাম, তুমি তো বেশ গল্প করছিলে, যাও না। আমি শর্মার দোকান থেকে সামোসা আর কিছুটা মিষ্টি এনে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদি একটু ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, যেমন ভাল বুঝিস।

ব্যস, ওতেই কাজ হল। আমি বললাম, ভরদ্বাজদা একা বসে আছে। তুমি কথা বল, আমি একটু পরেই খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

দিদি আমার মুখের দিকে এক লহমা তাকিয়েই বাইরে চলে গেল।

আমি কিছু পরেই একখানা বড় প্লেটে কয়েকখানা সামোসা আর একখানা প্লেটে গুলাবজাম নিয়ে ওদের টেবিলের মাঝখানে রেখে দিলাম।

ভরদ্বাজদা বলে উঠল, আরে কি কাণ্ড! এই খাবারের পাহাড়, একা কেউ ডিঙোতে পারে?

বললাম, দু'বন্ধুতে মিলে গতি কর। আগে তো একখানা প্লেট থেকে তিনবন্ধুতে খাবার তুলে খেতে।

দিদি হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আমি ওদের তিনবন্ধুর কথা তুলে হয়তো ঠিক করিনি।

ভরদ্বাজদা পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়েছিল। অমনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এসো সিস্টার, আমরা তিনজনে মিলে এই অতি উপাদেয় বস্তুগুলো ধ্বংস করি।

তোমরা শুরু কর, আমি এখুনি চা নিয়ে আসছি।

দিদির চোখ এখন আমাদের দিকে। সে চোখে কৌতুকের দৃষ্টি ঝিলিক দিচ্ছে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলাম ভরদ্বাজদার গলা, এমন সুন্দরী বোনকে ঘরে বন্দী করে রেখেছ কেন?

উপযুক্ত পৃথ্বীরাজের আবির্ভাব এখনও ঘটেনি বলে।

দুজনে খুব হাসতে লাগল। চায়ের ট্রে নিয়ে আসছিল কাজের মেয়ে মুনিয়া। আমি ওর হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে বারান্দায় ওদের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

ভরদ্বাজদা বেশ মজা করে বলল, তোমার দ্রাক্ষাসুরার পাত্রগুলি রাখ তরুণী। আমি তোমাকে একটু ভাল করে দেখি। সেই কবে তোমাকে একটি কিশোরী দেখে গিয়েছিলাম। আজ তোমার রূপান্তর ঘটেছে কিন্তু সেই স্মৃতির সুরভি বার বার আমাকে আচ্ছন্ন করে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি কবিতার চার ছত্র বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে।

> 'I have no riches but my thoughts,
> yet these are wealth enough for me ;
> My thoughts of you are golden coins
> stamped in the mint of memory'.

কবিতা বলা শেষ করেই হা হা আওয়াজ তুলে হেসে উঠল ভরদ্বাজদা।

দিদি বলল, আজও তোমার সেই অভিনয়ের গলা আর মেজাজ অক্ষুণ্ণ আছে ভরদ্বাজ।

এটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অনসূয়া।

পনেরো দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল ভরদ্বাজ ত্রিবেদী। ছুটি ফুরোবার চারদিন আগেই চলে গেল। যে কদিন ছিল, প্রতিদিনই আসত আমাদের বাড়ি। দিদির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো হৈ হৈ করে। ভারী আমুদে আর প্রাণচঞ্চল। মাও খুব খুশি হয়ে উঠেছিল একটা দিন। বাবা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন। দিদি কারু সঙ্গে কথা বললেই বাবার চোখ গিয়ে পড়ত সেখানে। আমি লক্ষ্য করতাম, দিদির উচ্ছলতা দেখে বাবার মুখে অনেকদিন পরে তৃপ্তির একটা ছবি ফুটে উঠছিল।

কিন্তু কি যে হল, একদিন ভরদ্বাজদা যেমন না জানিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তেমনি যাবার সময়েও নিঃশব্দে চলে গেল। আমাদের বাড়িতে বিদায় নিতেও এলো না।

মা আর দিদিতে একদিন কথা হচ্ছিল। আমার কানে ভেসে আসছিল সেই কথাগুলো।

মা বলছিল, ভরদ্বাজ ছেলেটি কিন্তু বেশ। হাসি খুশি, গল্পগুজব, আনন্দে ভরা।

মস্ত বড় কোম্পানির এগ্‌জিকিউটিভ পোস্টে কাজ করছে। ও ইচ্ছে করলে আরও ওপরে উঠতে পারে কিন্তু ওখানেই ও ইতি টেনে দিয়েছে। কৌশিকের মত আকাশের শেষ দেখার প্রলোভন ওর নেই। ইচ্ছার সীমাটা ও টানতে জানে তাই উদ্বেগের বাইরেই ও শান্ত একটা জীবনের স্বাদ পেয়েছে। ওর ভেতর কোন বিষয়ে এতটুকু টেনশান নেই মা।

তুই ঠিকই বলেছিস। ওর মুখে কোনদিন আমি উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ দেখিনি।

দিদি বলেছিল, ও হৈ-হুল্লোড়ের ভেতর থাকতে ভালবাসে, কিন্তু ওর ভেতর একটা শান্ত সংযত মন আছে। ওর ওপরটা দেখে ভেতরের গভীরতা মাপা যাবে না।

মা সম্পূর্ণ অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলতে গেল, আচ্ছা, ভরদ্বাজ বিয়ে করছে না কেন? তাকে যদি আমরা একটা ...।

দিদি মায়ের কথাটা লুফে নিয়ে বলল, ভরদ্বাজকে তুমি একটা প্রস্তাব দিতে চাইছ তো। সেটা না দেওয়াই ভাল মা। ও যা কিছু করে তা নিজের ইচ্ছাতেই করে। ওকে কোনকিছু বলে করানো যাবে না। তুমি আঁখির কথা ভাবছিলে তো?

মা সম্ভবত মাথা নেড়ে দিদির কথার সমর্থন করল। আমি মায়ের মাথা নাড়া কিংবা কথা বলা, কোনটাই দেখতে কিংবা শুনতে পেলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম, আমার বিষয়ে মা আর একটুও এগোতে চাইল না।

মায়ের সেদিনের সেই নীরবতা আমাকে আশ্বস্ত করেছিল। আমি কোনভাবেই চাইতাম না, পরিচিত কারু সঙ্গে আমার বিয়ে হোক অথবা ভালবাসা করে সংসার রচনা করি। তাই ভরদ্বাজদার ফাঁড়াটা কেটে গেল বলে মনে মনে খুশিই হয়েছিলাম।

অমলাভ, তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলে। একটি ইংরাজি সানডে ইস্যুতে তোমাদের বিজ্ঞাপন দেখে বাবা যোগাযোগ করেন। উভয়পক্ষের সম্পূর্ণ সম্মতিতেই আমাদের বিয়ে হয়েছে।

আমরা সংসার জীবনে অসুখী একথা বোধহয় শত্রুতেও কল্পনা করতে পারবে না।

তুমি সংস্কৃত সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেছিলে। বেদজ্ঞ পরিবারের সন্তান তুমি, এটা ছিল তোমার উপযুক্ত কাজ। আমার দাদু ছিলেন গরিব মানুষ কিন্তু বেনারসের নামকরা পণ্ডিতরাও তাঁর কাছে সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতেন। তিনি কেবল প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, গভীর উপলব্ধি থেকেই কথা বলতেন। তাঁর আলোচনা শোনার জন্য বহু গুণগ্রাহী ভিড় করে আসতেন আমাদের ছোট, জীর্ণ বাড়িটিতে। দশাশ্বমেধ ঘাটের অল্প দূরেই ছিল আমাদের সেই বাড়ি।

পণ্ডিত মানুষেরা দোতলায় দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছাটি প্রকাশ করা মাত্র আমি আর দিদি জলভরা ঘটি নিয়ে ছুটতাম তাঁদের পা ধুইয়ে দিতে। একজনের হাতে থাকত জলের ঘটি, অন্যজনের হাতে গামছা। পা ধোয়ানোর পর মুছে দেওয়া হত গামছা দিয়ে। অনেকেই বারণ করতেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা। এ ছিল দাদুর নির্দেশ। আমরা তখন খুব ছোট। দাদুর আদেশটি ছিল আমাদের কাছে এক ধরনের ভারী মজার খেলা।

দাদু সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রকাশকের কাছ থেকে যেটুকু টাকা পেতেন তা দিয়ে সংসার চলত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

এই দারিদ্র্যের ভেতরেই খুব বড় এক হীরে জহরত ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার বাবার বিয়ে হয়েছিল। দরিদ্র হলেও শিক্ষিত, সৎ আর অতি সুপুরুষ দেখে আমার দাদামশায় বিগলিত হয়ে গিয়েছিলেন।

দাদামশায়কে আমার দাদু প্রথমেই বলেছিলেন, দেখুন উপাধ্যায়মশায়, ধনীদরিদ্রের মেলবন্ধন সবসময় অটুট থাকে না।

এ কথা কেন বলছেন চতুর্বেদীজী?

জগতের নিয়ম, তবে ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়।

দাদামশায় বলেছিলেন, আমাকেও সেই ব্যতিক্রমের দলে ধরে নেবেন দয়া করে। হীরে জহরত

আমাদের পৈতৃক ব্যবসা হলেও আমাদের পরিবার লেখাপড়ার ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগী। আমার মেয়েটিও বেনারস ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছে।

দাদু বলেছিলেন, বড়ই আনন্দ পেলাম। এ যুগে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য আমি আর কি করতে পারি চতুর্বেদীমশায়?

আপনি কি সত্যিই এই দরিদ্র পরিবারটিকে সুখী করতে চান উপাধ্যায়মশায়?

আমার একমাত্র কন্যাকে আপনার ঘরে দিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনাদের সুখী করতে পারলে আমার কন্যারও সুখ।

দাদু বলেছিলেন, আমাদের সমস্ত পরিবারের সুখের জন্য আপনি একটি কাজ করতে পারেন। আপনি মেয়ে জামাইকে কোনরকম যৌতুক না দিলে আমরা সব থেকে বেশি সুখী হব।

দাদুর কথা শুনে দাদামশায় নাকি বেশ কিছু সময় মাথা নিচু করে চুপচাপ বসেছিলেন। পরে মাথা তুলে বলেছিলেন, তাই হবে।

দাদু হবু বেয়াইয়ের হাত ধরে বলেছিলেন, আপনার পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে এখন আর কোন বাধা রইল না।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

আর সামান্য একটি অনুরোধ।

না না, অনুরোধ নয়, বলুন আদেশ।

দাদু বলেছিলেন, ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠছে যেখানে সেখানে আদেশের কোন স্থান নেই।

তবে বলুন দাদা।

আমার পুত্রবধূ আমার এই ভাঙা ঘরেই থাকবে। আপনি কোনভাবেই আমার জীবদ্দশায় নতুন কোন আস্তানার ব্যবস্থা করতে পারবেন না।

তাই হবে।

এইভাবে আমার মা বাবার বিয়ে হয়েছিল। আর আমার দাদামশায় অক্ষরে অক্ষরে দাদুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে কথা রক্ষা করেছিলেন।

পুত্রের বিয়ের পর দশ বছর বেঁচেছিলেন দাদু। মাকে বড় আদর যত্নে রেখেছিলেন। মাও শ্বশুরমশায়কে বড় শ্রদ্ধাভক্তি আর সেবা করত।

আমার ঠাকুমা অত্যন্ত শান্ত আর ভক্তিমতী ছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্য স্নান করে বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতেন। আমরা ঠাকুমার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকতাম। ঠাকুরমা ঘরে ঢুকেই আমাদের হাতে দিতেন বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। কি পরিতৃপ্তিতে আমরা দুটি বোন পাতা চেটে চেটে সেই প্রসাদ খেতাম। অমলাভ, সে সব স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে আমার মনের মধ্যে।

আজ এতগুলো কথা লিখে চলেছি, কারণ স্মৃতি সততই সুখের।

এবার নিজের কথায় আসি।

গ্র্যাজুয়েশানের পর ইউনিভারসিটিতে ঢুকতে মন চাইল না আমার। আসলে পড়াশোনার ব্যাপারে দিদির যে ঝোঁক আর নিষ্ঠা ছিল তা আমার ভেতর ছিল না।

মা বলল, পড়াশোনা করবি না তো বিয়ের ব্যবস্থা দেখি।

বললাম, লক্ষ্মী মা আমার, বছর দুয়ের সবুর কর।

এই দু'দুটো বছর কি করবি তুই?

কলালক্ষ্মী আমার মুখে কথা যুগিয়ে দিলেন। বললাম, বাড়ির পাশেই ওড়িশি নাচের একটা সেন্টার খুলেছে, ওটাতে ঢোকার ইচ্ছে।

ওড়িশি কেন, তুই তো কত্থকে তালিম নিয়েছিলি।

বললাম, ছোটবেলা বেনারসে তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলে কত্থকের ক্লাশে। কলকাতা এসেও সাত আট বছর ঐ নাচ প্র্যাকটিস করলাম। এখন একটু মুখ বদলের ইচ্ছে আর কি।

মা বলল, আসলে কোন কিছুতে তোর লেগে থাকা নেই।

কেন মা, কত্থক নেচে তো আমি সেই ছোটবেলা থেকে পাঁচ পাঁচটা প্রাইজ জিতে এনেছি। বাবা ড্রইংরুমের শোকেসে সাজিয়ে রেখেছে সেগুলো। বিয়ের বাজারে ওগুলো দেখালে নাকি পাত্রপক্ষের কাছে আমার দাম বাড়বে।

আমার কথা শুনে গম্ভীর প্রকৃতির মাও হেসে ফেলল। বলল, যা ভাল বুঝিস, কর।

বললাম, কত্থকে ডালপালা মেলার কায়দাটা শিখেছি, এখন ফুল ফোটানোর ছন্দটা শিখব ওড়িশি থেকে।

দিদি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, চমৎকার। ঢুকে পড় নাচের ক্লাশে। দরকার হলে আমি তোকে সঙ্গ দেব। তোর মত অমন ফিগার আর বিউটি থাকলে আমি কলেজমুখো হতাম নাকি।

খুব নিষ্ঠার সঙ্গে বছর দুয়েক ওড়িশি শিখলাম। দুটো নাচ শিখে ফেলায় মিশ্রণ ঘটাতে সুবিধে হল। শুদ্ধতার কিছু ঘাটতি হলেও চমৎকারিত্ব বাড়ল। কলকাতার কলাপ্রেমীদের উপস্থিতিতে বসল আমার প্রথম একক নাচের আসর।

রবীন্দ্রসদনের পুষ্পসজ্জিত মঞ্চে আলোর প্লাবনে আমি নাচতে লাগলাম। কখনো মনে হল আমি কোনারক মন্দির ঘিরে নেচে চলেছি। আমার হাতে মন্দির শীর্ষে নৃত্যরতা দেবদাসীর হাতের করতাল। আবার কখনো রাজারানী মন্দিরের অলসকন্যার মত দেহবিভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি ক্লান্তি নিমগ্না।

ঘন ঘন ঝলসে উঠছিল ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ গান। অনেকে নাচের শেষে গ্রীন রুমে ঢুকে উত্তপ্ত অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

এক বিদেশী এলেন। ইংরেজিতে তাঁর ভাল লাগার কথা জানালেন। তিনি রোম নগরীর বাসিন্দা। মুখে, চোখে, অবয়বে অ্যাপোলোর আদলটি ফুটে উঠেছে। শিল্পীসুলভ চেহারা। আমার অ্যাড্রেস চেয়ে নিলেন।

কদিন পেপারে নিজের প্রশংসার অংশগুলো পড়তে পড়তে কাটল। বাবা খুশি, মার মুখে হাসি, দিদি উল্লসিত।

আমি এবার মহাভারত পড়তে লাগলাম। অজস্র ভালবাসার কাহিনী কুড়িয়ে পেলাম। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, একক নাচে ফুটিয়ে তোলা যাবে না এসব প্রণয়-কাহিনী। আর একজন চাই। চেষ্টা করলে পুরুষশিল্পী মিলবে না, এমন নয়। তবে দিদির লাভ ম্যারেজে ছন্দপতন ঘটায় বাবা মা এ ব্যাপারে আগ্রহী হবে না বলেই আমার মনে হল। মেয়েদের অসম্ভব বিশ্বাস করত আমার বাবা। কিন্তু কৌশিকদা আর দিদির ঘটনায় তাদের গভীর বিশ্বাসে একটা ফাটল ধরে গিয়েছিল।

তবু মাকে একান্তে পেয়ে বললাম, সত্যি করে বলতো মা আমার নাচ তোমার ভাল লাগে?

মা একমুখ হাসি হেসে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল।

আমি বুঝলাম, না-এর ভেতর মায়ের খুশির হাঁ রয়েছে।

এবার বললাম, আমি একজন বিখ্যাত নাচিয়ে হই, এটা তুমি চাও না মা।

তুমি বড় হয়েছ, বুদ্ধি, রুচি, বিবেচনা সবই আছে তোমার। এখন তোমার পথ তোমাকেই বেছে নিতে হবে।

বিখ্যাত নাচিয়ের কথা ছাড়। মহাভারতের সুন্দর কতকগুলো গল্পকে নাচে রূপ দেবার ব্যাপারে ভারি সমস্যায় পড়ে গেছি মা।

কিরকম সমস্যা?

অপূর্ব কতকগুলো প্রেমের গল্প আছে। নর্তক নর্তকী দুজনেরই দরকার। তাই বলছিলাম, একার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়।

মা বলল, আগে তুমি স্থির কর বিয়ে করে সংসারী হবে না নাচের জগতে থাকবে।

বললাম, বিয়ে করে বুঝি নাচটাকে ধরে রাখা যায় না?

যায়। সেখানে একজন ডান্সার হবে তোমার নাচ আর সংসার জীবনের পার্টনার। কিন্তু একজন

অন্য প্রফেসানের মানুষকে বিয়ে করে একটি নাচের সঙ্গীর সঙ্গে শো করে বেড়াবে এটা এখনও আমাদের সমাজের সব মানুষ মেনে নিতে পারেনি।

এটা কি উদারতার অভাব নয় মা?

হতে পারে, সামাজিক মানুষের এটা অনুদারতা। কিন্তু তুমি যদি যথার্থ শিল্পী হও তাহলে মঞ্চে প্রেমিকের বুকে আত্মসমর্পণের মুহূর্তে তোমাকে ভাবতে হবে, ঐ শিল্পীই তোমার জীবনের একমাত্রকাম্য পুরুষ। এ না ভাবতে পারলে তোমার সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে না।

মানছি।

এবার বল, দর্শকের আসনে বসে ক'জন উদার-হৃদয় স্বামী সে দৃশ্য উপভোগ করবে?

একটু থেমে মা আবার বলল, অবশ্য একই শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য হলে স্বামী অন্য অভিনেতার সঙ্গে তার স্ত্রীর এ ধরনের অভিনয়কে নিশ্চয়ই মেনে নেবে। তবে ছোট্ট একটি কাঁটার খোঁচা যে তার বুকে লাগবে না, একথা হলপ করে বলা যাবে না।

আমি মায়ের এতখানি বিশ্লেষণের পরে হা হা করে হেসে উঠলাম। দিদি পাশের ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, মা অমাবস্যায় চাঁদের হাসি! এমন অঘটন কি করে ঘটল?

মা ঘরের বাইরে যেতে যেতে বলল, আমার কাজ আছে, যে হাসছে তার কাছ থেকে জেনে নাও।

ছমাস পরে আমার জীবনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। যা এতদিন তোমাকে আমি জানতে দিইনি অমলাভ।

কয়েকখানা ছবি। কালার ছবি। তার ভেতর একখানা বেশ বড় সাইজের।

ছবিগুলো রবীন্দ্রসদনে আমার নাচের অনুষ্ঠানে তোলা হয়েছিল। ঐ ছবি রোম থেকে পাঠিয়েছিল সেই ফটোগ্রাফার যে গ্রীনরুমে ঢুকে আমার নাচের তারিফ করে অ্যাড্রেস চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সেই প্রথম আমি নিজেকে অন্য এক শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখলাম। প্রতিটি ছবির উল্টো পিঠে একটি করে ইংরাজিতে কোটেশান।

নিভৃতে নিজের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। এ তো শুধু দেখে যাওয়া নয় নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা। পাঁচখানা ছবি যেন পাঁচজন স্বতন্ত্র নারী। ভাবের অভিব্যক্তিতে পাঁচজনেই অনন্যা। কেউ লাস্যময়ী, চোখের অপাঙ্গদৃষ্টিতে আমন্ত্রণ। কেউ ঘনঘোর মেঘে বিদ্যুৎচকিত পথে অভিসারিকা। স্ফুরিত অধরে মানিনী বসে আছে তমাল তরুতলে। কোথাও বা বিরহের কাতরতা নিয়ে ভেঙে পড়েছে সজ্জিত শয্যার ওপর। আবার বসন্তবাহারের ছবি। প্রিয় মিলনের উচ্ছ্বাস।

পঞ্চকন্যা যেন মদনের পাঁচটি শরে বিদ্ধ পাঁচটি হরিণী।

কি আশ্চর্য দৃষ্টি এই ফটোগ্রাফারের। বিভিন্ন এক্সপ্রেশানগুলো ক্যামেরাতে ধরে রেখে, পাঠাবার সময় নির্বাচন করে পাঠিয়েছে। মনে হল সার্থক একজন ফটোগ্রাফার, একজন উঁচুদরের শিল্পী। ভাবুক বা কবি না হলে একজন জাতশিল্পী বা ফটোগ্রাফার হওয়া যায় না।

বড় ছবিখানা, প্রিয় সমাগমে আমার আনন্দের প্রকাশ। চোখে, মুখে, হাতের মুদ্রায় সেই আনন্দ যেন শতধারায় উপচে পড়ছে।

একবার মনে হল, এই অপূর্ব ছবিগুলোর ভেতর আমার ভূমিকা কতখানি। আবরণ, আভরণ আর আলোকপাতে আমাকে মঞ্চের মধ্যমণি করে তুলেছে। আমি এখন আর কেবলমাত্র আঁখি চতুর্বেদী নয়, আমি বৃন্দাবন বিহারিণী শ্রীমতী রাধিকা।

গীতগোবিন্দের পদাবলীর সুরে আমি ফিরে পেয়েছি আমার যমুনাতীরের ফেলে আসা জীবন। সুর, সজ্জা, ভাব মানুষের কি অভাবিত রূপান্তরই না ঘটিয়ে দেয়।

ডাকযোগে রোম নগরী থেকে ফটোর যে প্যাকেটটি এলো সেটি আমার হাতেই দিয়ে গিয়েছিল পিয়ন। আমি তিনদিন ঐ সুন্দর ফটোগুলোকে গোপন করে রাখলাম। কেন যে একাজ করলাম তা নিজেই জানি না। হয়তো পাঁচখানা ফটোর পিছনে পাঁচটি প্রেমের কোটেশান ছিল বলে। তাছাড়া একটি আইভরি ফিনিশ্‌ড কার্ডে ওর ঠিকানা লেখা ছিল। কার্ডের পেছনে চারছত্র কোটেশান :

'I never saw so sweet a face
As that I stood before,
My heart has left its dwelling-place
And can return no more.'

এই কোটেশানটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত সেই বিদেশী ভ্রাম্যমাণ দাঁড়িয়েছিল আমার মুখোমুখি। সে আমার মুখে এমন কি ছবি দেখল যাতে তার মনে হল, এ মুখের মত মিষ্টি মুখ সে আর কখনো দেখেনি। তার হৃদয় সেই যে বাসা ছাড়ল, সে আর ফিরে আসতে পারল না।

এই কোটেশানটুকু তিনদিন আমি মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম সব কাজের ভেতরে।

রাতের শয্যায় একটি ইটালিয়ান যুবকের মুখ ভেসে উঠত আমার চোখের ওপর। সে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। কি গভীর এক মুগ্ধতা সে চোখে মাখানো।

চতুর্থ দিনে কেটে গেল সে ঘোর। সুদূর ভূমধ্য সাগরের তীরে জলপাইয়ের গাছ আর আঙুরের কুঞ্জ ছুঁয়ে যে হাওয়াটুকু বয়ে এসেছিল তার স্পর্শ মিলিয়ে গেল দেহমনের ওপর থেকে। যা কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না তার জন্যে স্বপ্ন দেখার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তাছাড়া দিদি আর কৌশিকদার প্রেমের বিয়ে ও তার পরিণতি তখন আমাদের সারা সংসারের ওপর দীর্ঘ ছায়া ফেলে রেখেছে। ও পথ আর নয়, ও পথের ভাবনাও মুছে ফেলতে হবে মনের সমস্ত অন্ধিসন্ধি থেকে।

কিন্তু ফটোগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার না করা দারুণ অভদ্রতা। আবার ভাবলাম, ফটো সম্বন্ধে আমার ভাল লাগার কথা জানালে আবার চিঠি আসতে পারে, আর সেটাই স্বাভাবিক। তখন প্রত্যুত্তরের প্রশ্ন থাকবে।

অনেক ভেবে একটুখানি মিথ্যের আশ্রয় নিলাম।

চিঠি লিখলাম ঃ

বিদেশী বন্ধু, তোমার পাঠানো ছবিগুলো পেয়ে ভাবছি, আমি কি সত্যিই এত সুন্দর! মনে হয় যাদুর ছোঁয়া আছে তোমার ক্যামেরায়, অলৌকিক দৃষ্টি আছে তোমার চোখে।

আমি খুবই খুশি। শিল্পীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার ভাল লাগার পরিমাপ বোঝানো যাবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানাই। অল্পদিনের ভেতরেই আমি নতুন জীবনে প্রবেশ করছি। এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে অন্য আস্তানায়। নতুন বাড়িতে গিয়ে চেষ্টা করব তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। আমার বর্তমান ঠিকানায় তুমি আর চিঠি পাঠানোর চেষ্টা করো না। পাঠালে সে চিঠি আমার হাতে না পৌঁছনই সম্ভব।

আবার বলছি, তোমার পাঠানো ছবিগুলোর দিকে তাকালে আমি নিজের প্রেমে মুগ্ধ নার্সিসাসে রূপান্তরিত হয়ে যাই।

তোমার ক্ষণিকের দেখা বন্ধু।

এ চিঠির কথা গোপন রেখে দিদিকে আমার ঘরে ডেকে আনলাম। তার আগে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিলাম আমার ঘর।

উঁচু টিপয়ের ওপর রাখা ছিল জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার দারুমূর্তি। তার তলার সারিতে ছিল আমার পাঁচখানা কালার ফটোগ্রাফ। সব থেকে বড়টি অবশ্যই ছিল মাঝে। একেবারে তলায় মেঝেতে জ্বেলে দিয়েছিলাম দক্ষিণী পঞ্চপ্রদীপ। ওপরে ত্রিমূর্তির গলায় দুলিয়ে দিয়েছিলাম কুন্দফুলের মালা।

দিদি ঘরে ঢুকেই মুখোমুখি হল অভাবনীয় এক দৃশ্যের। যেন সৌন্দর্যলোক থেকে নেমে আসা অচেনা পাঁচজন নর্তকীকে দিদি চিনে নেবার চেষ্টা করছে অবাক দুটো চোখের দৃষ্টি মেলে।

এক সময় দিদি ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করছে। হঠাৎ আবেগে আমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলল, তুই এত সুন্দর আঁখি! তোকে যেন নতুন করে দেখলাম।

বললাম, এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই রে দিদি। এক ফটোগ্রাফার আমাকে এমনিভাবে তৈরী করে দিয়েছে।

তুই থাম। চাঁদ পাহাড়ের চূড়ায় থাক, গাছের ডালের ফাঁকে থাক অথবা নীল আকাশের বুকে ভাসুক, সে চাঁদই। কেউ নিজে সুন্দর না হলে তাকে শুধু সাজিয়ে সুন্দর করে তোলা যায় না।

এখন বল্, ছবিগুলো কেমন হয়েছে?

এবার দিদি সহজ হল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছবিগুলো ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

একসময় আমার দিকে ফিরে বলল, কোথায় কবে তুললি রে?

আমি কৌতুক করে বললাম, তুই বল না. এগুলো কোন স্টুডিওর ছবি হতে পারে?

দিদি নিবিষ্ট হয়ে কি যেন দেখল।

আরে! এ যে ফাংশানে তোলা ছবি।

কি করে বুঝলি? সেজেগুজে স্টুডিওতে যে তুলিনি তার প্রমাণ?

দিদি ঝুঁকে পড়ে একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই তো ছবির একটা কোণে দেখা যাচ্ছে স্টেজের ওপর রাখা জগন্নাথের অস্পষ্ট মূর্তি।

ওড়িশি নাচের আগে মঞ্চে জগন্নাথ-বন্দনার রীতি আছে। একটি ছবিতে তারই একটুখানি আভাস পাওয়া যাচ্ছে। স্টেজের অস্পষ্ট ডেকোরেশানটুকুও। দিদি ঠিকই ধরে ফেলেছে।

বললাম, ইউনিভারসিটির জুয়েল, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি এত সহজ।

দাঁড়া, মাকে ডেকে আনছি।

দিদি ছুটল মাকে ডেকে আনতে। একটু পরে দেখি মা বাবা দুজনেই ঘরের ভেতর হাজির।

ছবিগুলো দেখে তাঁরাও অভিভূত।

বাবা বললেন, অসাধারণ হাত, কে তুলেছে রে?

মা সঙ্গে সঙ্গে বলল, এ তো রবীন্দ্রসদনে তোলা ছবি।

দিদি অমনি বলল, তুমি কি করে বুঝলে?

আমার মেয়ে বলে। ওর হাসি, চলা, তাকানো, মায় নাচের মুদ্রা আমার চোখে ধরা আছে। কোথায় কেমন করে নাচল, সে সব ভাব ছন্দ ছবি হয়ে গাঁথা আছে আমার মনের মধ্যে।

বাবার কথার জবাব দেওয়া হয়নি এতক্ষণ। এই সোজাসুজি বললাম, রবীন্দ্রসদনে যে ইটালিয়ান ট্যুরিস্ট আমার নাচের প্রশংসা করে গেলেন, এ ছবিগুলো তাঁরই তোলা। রোম থেকে পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বাবা বললেন, দারুণ ফটোগ্রাফার। স্টিল ফটোগ্রাফিতে মুভির এফেক্ট এনে দিয়েছেন। ওঁকে কমপ্লিমেন্ট জানিয়ে চিঠি লিখে দে।

বাবা মা মেয়ের ছবির প্রশংসা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি দিদিকে বললাম, এবার দেখ, চাঁদের উল্টোপিঠে কি আছে।

আমি এক একটা ছবি তুলে তার পেছনের কোটেশান দেখাতে লাগলাম।

'O you,
so perfect and so peerless, are created
of every creature's best.'

দিদি সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ কমপ্লিমেন্ট। এ তো কেবল শেক্সপিয়ারের উদ্ধৃতি নয়, আমাদের শাস্ত্রেও তিল তিল গুণ আর সৌন্দর্য জড়ো করে তিলোত্তমা-মূর্তি নির্মাণের কথা আছে। তবে তোকে যে ঐ বিদেশী তিলোত্তমা রূপে দেখেছে, এ কথা জেনে আমি দিদি হিসেবে বিগলিত।

শ্রীমতী রাধার বিরহপর্বের একটি ছবির পেছনে লেখা আছে ঃ

'There is no love-life without sorrow.'

এই কোটেশানটি দেখে দিদি কোন মন্তব্য করল না। সদ্য আহত জায়গাটায় মনে হল রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

অন্য একটি রয়েছে ঃ

'She is grace itself ... That is what a woman ought to be. She ought to produce the effect of exquisite music.'

নারী সম্বন্ধে জর্জ এলিয়টের এই সুন্দর আর সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তিটি মনে রাখার মত।—দিদি বলে চলল, আর যে মানুষটি ছবির পেছনে এই কোটেশান লিখে দিয়েছেন তিনি ও একটি সম্ভ্রান্ত মনের মানুষ।

'Won't you come into the garden? I would like my roses to see you.'

দিদি মন্তব্য করল, এটা তোর কাছে ঐ ফটোগ্রাফারের ফুলের গন্ধমাখা এক আমন্ত্রণ। অবশ্য ইঙ্গিত ভরা।

শেষ ছবিটির পেছনে লেখা ঃ

'Only tell her that I love ;
Leave the rest to her and fate.'

আরে এ যে একেবারে আত্মসমর্পণ। ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছে প্রেমিক। এর ফল কি হবে সেটা সে ছেড়ে দিয়েছে প্রেমিকা আর তার ভাগ্যের হাতে।

দিদির শেষ মন্তব্য, মানুষটি মস্ত বড় এক ফটোগ্রাফার, তার চেয়েও বড় এক প্রেমিক।

মন্তব্যটা সেদিন আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু আমি আমার মনের ভাবকে গোপন রেখেই বলেছিলাম, এসব তোমরাই ভাল বোঝ।

আমি আমার পরিকল্পনা মতো ইটালিয়ান ফটোগ্রাফারকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখে দিলাম। আস্তানা বদলের ইঙ্গিত দিয়ে জানালাম, পরে সময় সুযোগ মত নতুন ঠিকানা থেকে তার সঙ্গে যোগোযোগের চেষ্টা করব।

কয়েকটি বছর কেটে গেল। অস্পষ্ট হয়ে এলো স্মৃতির উজ্জ্বল রেখাগুলো। আমার বিয়ে হল এক সম্পন্ন শিক্ষিত পরিবারে। একেবারে যোগাযোগ করে বিয়ে। বিধবা মায়ের একটিমাত্র সন্তান তুমি। সুপুরুষ, উচ্চশিক্ষিত। রেজাল্ট ভাল থাকার সুবাদে ঢুকতে পেরেছিলে একটা নামী কলেজের চাকরিতে। সংস্কৃত পাঠের আসর প্রায় উঠে যাচ্ছে। সেখানে ঐ বিষয়ে একটা চাকরি যোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। তুমি তোমার বিশেষ কৃতিত্বের জন্যই পেয়ে গিয়েছিলে চাকরিটা। এত অল্প বয়সে পি. এইচ. ডি আর ডি. লিট কজন পায় বল!

একসময় তোমার কৃতিত্বের খবর বেনারস ইউনিভারসিটিতে পৌঁছল। তুমি সেখানে পেলে রিসার্চ গাইডের দায়িত্ব।

আমার ঠাকুর্দা আর দাদামশায় গত হয়েছিলেন। কেবল জীবিত ছিলেন আমার ঠাকুরমা। বাবা তাঁকে কলকাতার বাড়িতে এনে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাজি হননি। স্বামীর সেই জীর্ণবাড়ি তাঁর কাছে প্রাসাদ বলে মনে হয়েছিল।

বেনারসে চাকরি পেয়ে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে। কলকাতার বিচিত্র সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান আর বৃহৎ কর্মকাণ্ড, মেলা মহোৎসবের এতখানি জৌলুস বেনারসে ছিল না। তবে ভারতের প্রাচীন নগরীগুলির অন্যতমা এই নগরী তীর্থস্থান হিসেবে যেমন প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনি ছিল জ্ঞানচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার অন্যতম পীঠস্থান।

আমরা ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের ভেতরেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলাম।

শাশুড়ি গত হয়েছেন। টুকাই দুবছরেরটি। ভারি দুরন্ত মেয়ে। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ির আদরে সোহাগে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। সেই টুকাইকে নিয়ে বেনারসে আমি একা হিমশিম। তুমি তো প্রাচীন গুরুকূলের আচার্যদের মত লেখাপড়া নিয়েই সারাদিন মত্ত। আমি আর টুকাই ছোট্ট একটুকরো কোয়ার্টারে বন্দী।

মাঝে মাঝে আমি টুকাইকে নিয়ে চলে যেতাম আমার দাদুর সেই জীর্ণ আস্তানায়। তখনও আমার বৃদ্ধা ঠাকুরমা দাদুর স্মৃতি আগলে সেখানে পড়েছিলেন। আমি গেলে ঠাকুরমার খুশির শেষ থাকত না।

কিরে ভাই এলি?

কপট রাগ দেখিয়ে বলতাম, তুমি তো আর নাতজামাইয়ের বাড়ি যাবে না, তাই আমাকেই আসতে হল।

কাতরগলায় ঠাকুরমা বলতেন, সোনা দিদি আমার রাগ করে না। আমি তো ভাই একটা জড় পিণ্ড। মুরালের মা যেমন চালায় তেমনি চলি।

মুরাল নামধারী অধুনা মৃত এক বালকের বিধবা মা ছিল ঠাকুরমার পরিচর্যায় নিযুক্ত।

তোমাকে তো বাবা কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, তুমি গেলে না কেন?

তাঁকে একা এখানে ফেলে রেখে কি করে যাই ভাই।

দাদু চলে যাবার পর বাবা ঠাকুমার মত নিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর মাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

ঠাকুরমা বলেছিলেন, এ বাড়ি ছেড়ে যাই কি করে?

বাবা বলেছিলেন, কেন, বাড়ি বেচে দিয়ে টাকাটা তোমার নামে ফিক্সড করে রেখে দেব।

সে কি রে! মন্দির বেচবি, এমন আহাম্মক কেউ আছে নাকি!

এরপর বাবা আর একটিও কথা বাড়াননি।

ঠাকুরমার কথার পেছনে আমি বলতাম, আচ্ছা ঠাকুরমা তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর দাদু আজও এ ঘরে রয়েছেন?

ঠাকুরমা হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন কতক্ষণ। পরে বলতেন, এখনও ঠিক সকাল সাতটায় গঙ্গার ঘাট থেকে স্নান সেরে তিনি ঘরে ফেরেন। আমি এখানে বসেই তাঁর খড়মের আওয়াজ পাই। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একেবারে নিজের পুজোর ঘরটিতে চলে যান।

আমি ঠাকুরমার মুখে-চোখে অদ্ভুত একটা বিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠতে দেখতাম।

তবু প্রশ্ন তুলতাম, মৃত্যুর পরে দাদুর তো স্বর্গে যাবার কথা ঠাকুরমা?

বিশ্বনাথের ভূমির বাইরে আবার স্বর্গ কোথায় পাব! তিনি তো স্বর্গলোকেই রয়েছেন।

ঠাকুরমা আবার কতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকতেন। পরে বলতেন, আমি তাঁর পড়ার ঘর থেকে এখনও গীতা পাঠের শব্দ শুনি।

এরপর আমার সব প্রশ্ন বন্ধ হয়ে যেত।

বাবার মুখে কতবার শুনেছি দাদুর গল্প। এই বাড়িতে এলেই সেই দরিদ্র বালকটির জীবন-কাহিনী মনে পড়ে যায়। ছায়াছবির মত চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যাবলী।

অক্ষয় চতুর্বেদী, দীননাথ চতুর্বেদী আর সেই গোয়ালিনী মাসির নাটক চলতে থাকে।

আমি নতুন প্রজন্মের মানুষ। আমাদের সংসার জীবন, প্রেম, লোক-ব্যবহারের ধ্যানধারণাই আলাদা। তবু লাগে পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ, জীবনের কথা ভাবতে।

কোথায় যাচ্ছ বাবাঠাকুর?

বারো বছরের দীননাথ পেছন ফিরে তাকাল। তার সমস্ত মুখে কান্নার চিহ্ন। সে কোন কথা বলতে পারল না। শুধু মাথা নেড়ে জানাল, কোথায় যাবে কিছুই জানে না।

গোয়ালিনী মাসি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল, এসো আমার সঙ্গে।

এই সেই দোতলা কুঠি। সুখী গোয়ালিনীর আস্তানা। গঙ্গাতীরের এই কুঠিতে সদ্য পিতৃহারা বালক দীননাথকে সেদিন এনে তুলেছিল এক দয়াময়ী নারী। তিনটি গাভী, দুটি বাছুরকে নিয়ে সুখী গোয়ালিনীর সংসার। সেখানে এসে আশ্রয় পেয়েছিল একটি অনাথ মানবসন্তান।

দীননাথের আদিনিবাস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বাবা অক্ষয় চতুর্বেদী স্বল্পভাষী ও অত্যন্ত বলশালী পুরুষ ছিলেন। মাতৃহারা শিশুসন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো তাঁকে দেখা যেত হৃষিকেশের গীতাভবনে পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায়

মেতে উঠতে। শিশুপুত্রটি পিতার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোনকিছু ধারণা করতে না পারলেও এটুকু বুঝত, আলোচনার শেষে তার বাবাকে ঘিরে অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কোথাও স্থিতু হবার জন্য যে আঠার দরকার সেটি ছিল না অক্ষয় চতুর্বেদীর চরিত্রে।

আবার কখনো দেখা যেত শিশুসন্তানটিকে স্নান করাচ্ছেন বদ্রীনাথধামে অলকানন্দার শীতল জলে। পক্ষকালের ভেতরেই তাঁকে হয়ত পাওয়া যেত কেদারনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে। পার্শ্ববর্তী পর্বত থেকে ব্রহ্মকমল সংগ্রহ করে এনে পুরোহিতের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

দীননাথকে সামান্য মুড়িমুড়কির ঠোঙা হাতে ধরিয়ে দিয়ে মন্দির চত্বরের একটা জায়গায় বসতে বলে উধাও হতেন। যখন ফিরতেন, দেখা যেত একবোঝা পাহাড়ী লতাগুল্ম গামছায় বেঁধে এনেছেন।

বেশিরভাগ পথ পায়ে হেঁটেই ঘুরতেন। ছেলের কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারলেই কাঁধে বসিয়ে নিতেন।

দীননাথ বাবার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ছেলেবেলা থেকেই কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। পথে চলতে চলতেই বাবার কাছ থেকে সে অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের বিদ্যা অর্জন করতে হলে স্থায়ী একটা আস্তানা চাই।

অক্ষয় চতুর্বেদী অবশেষে এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গঙ্গাতীরে বারাণসীধামে এসেছিলেন শেষ আশ্রয়ের খোঁজে।

জমিদার ভবতারণ মিত্রের পূর্বপুরুষ বারাণসীতে একটি টোলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সে টোলে ছাত্রসংখ্যা কমে এসেছিল। নতুন সমাজজীবনে চাকুরিলাভের জন্য অর্থকরী বিদ্যা ছিল অপরিহার্য। তাই কিছুটা দুরবস্থার মাঝে পড়েছিল সংস্কৃত টোলগুলি। জমিদার মিত্রমশায়রা বনেদীয়ানা রক্ষার জন্য যেমন ধুমধাম করে দুর্গোৎসব করতেন, তেমনি পুরাতন টোলটিকে এএকবারে তুলে না দিয়ে কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

মিত্রমশায়দের সেই টোলে আচার্যের পদটি পেয়ে যান অক্ষয় চতুর্বেদী। পরিবর্তে কিছু অর্থ সহ পিতাপুত্রের খাওয়া থাকার একটা ব্যবস্থা হয় জমিদারী সেরেস্তা থেকে।

কিন্তু চারটি বছরমাত্র সেই সুযোগ পেয়েছিলেন অক্ষয় চতুর্বেদী। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। বালক দীননাথও শিক্ষিত হয়ে উঠছিল পিতা অক্ষয় চতুর্বেদীর তত্ত্বাবধানে।

বাবা মারা গেলে আশ্রয়হারা হল দীননাথ। সে পথে নামল। অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রে নাকি অন্নের অভাব হয় না। সত্যিই তাই। মিত্র বাড়িতে দুধের যোগান দিত যে গোয়ালিনী মাসি, সে সদ্য পিতৃহারা ছেলেটিকে পথ থেকে সেদিন ধরে নিয়ে এসেছিল এই বাড়িতে।

বালক দীননাথকে আসা যাওয়ার পথে অনেকবার দেখেছিল গোয়ালিনী মাসি। একবার 'মাসি' ডাকও শুনেছিল ছেলেটির মুখে। স্নেহে সিক্ত হয়েছিল তার মন। মাঝে মাঝে ছেলেটির কথা মনে করে পণ্ডিতমশায়ের দোরগোড়ায় একঘটি দুধ রেখে বলত, ছোট ঠাকুরের সেবার জন্য দিয়ে গেলাম।

সেই ছোটঠাকুর একদিন ভাগ্যবিপর্যয়ে এসে উঠল এই বাড়িতে। বামুনের ছেলে তাই নিজের হাতে রান্না করে খেতে লাগল। সবকিছু যোগান দিতে লাগল মাসি।

ছোটঠাকুর অন্নপ্রসাদ দেবতাকে নিবেদন করার পর ভোগ খেত গোয়ালিনী মাসি।

এমনি করে কয়েকটা বছর কেটে গেল। এদিকে সমানে চলতে লাগল বিদ্যাচর্চা। মাসি সানন্দে লেখাপড়ার খরচ যোগাত।

একসময় লেখাপড়ার চাপ বাড়ল। সংসারের কাজকর্ম সেরে অধ্যয়নের সময়টি বের করে নেওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল।

মাসি ডেকে বলল, পড়াশোনা করতে যদি চাস তাহলে রান্নাবান্না ছাড়।

দীননাথ বললেন, তাহলে তুমি রাঁধ মাসি, আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি।

মাসি ধমকের সুরে বলল, ঐটেই শুধু বাকি। বামুনের জাতটা মেরে দিয়ে পাতকী হই আর কি।

ও আমার কম্ম নয়।

আমি শাস্ত্র পড়ে দেখেছি ওতে জাত যায় না মাসি। হাঁড়িতে জাত নেই।

ঝাঁঝিয়ে উঠে মাসি বলল, তুই থাম, ভারী পণ্ডিত হয়েছিস।

একটু থেমে আবার বলল, উপায় একটা আছে।

দীননাথ যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, বল বল কি উপায়?

মানবি তো আমার কথা?

তোমার কথা মানব না তো কি রাস্তার লোকের কথা মানব।

ঠিক?

ঠিক।

একটা বিয়ে দিয়ে বউ আনব ঘরে। সব সমস্যা মিটে যাবে।

আরো ঝামেলা বাড়বে মাসি।

চুপ কর, সব ঝামেলা আমি পোহাব। তুই শুধু বিয়ে করে খালাস।

ঘটকালি করল মাসি। গরীব ঘরের সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনলেন আমার দাদু।

ঠাকুরমা বলতেন, গোয়ালিনী মা-ই আমাকে হাতে ধরে সব শেখাতেন। আমি তাঁকে মা বলে ডাকতাম। একেবারে শাশুড়ি ঠাকুরণটি।

আচ্ছা ঠাকুমা, গোয়ালিনী মাসির শেষ কাজ করলেন কে?

আবার কে, তোর দাদু। মুখাগ্নি থেকে শ্রাদ্ধ, সব কিছু। মারা যাবার আগে তোর দাদুর নামে লিখে দিয়ে যান বাড়িখানা। গোয়ালিনী মার গঙ্গাপ্রাপ্তির খবর পেয়ে তার ভাইপোরা এসে হাজির। যতদিন মা বেঁচেছিলেন কারু দেখা নেই, এখন বাড়ির ভাগ নিতে ছুটে এসেছে।

তারপর?

উঠোনভর্তি লোক জড়ো করেছে ওরা। তোর দাদু দোতলায় দাঁড়িয়ে গোয়ালিনী মার পাকা দলিলখানা সবাইকে পড়ে শোনালেন। শেষে বললেন, মায়ের এ বাড়িখানা আমার কাছে মন্দির। এ মন্দির আমি কারু হাতে তুলে দিতে পারব না। তবে বঞ্চিত করব না কাউকে। বাড়ির যে মূল্য ধার্য হবে সেটা আমি তোমাদের ভাগ করে দেব।

তাই করলেন বুঝি দাদু?

ওঁর সঞ্চয়ের কিছু টাকা ছিল। বাকি যে টাকাটা অভাব পড়ল আমার গায়ের গয়না বেচে তা যোগাড় করে গোয়ালিনী মার ভাইপোদের হাতে তুলে দিলেন।

গয়নাগুলো দিয়ে দিতে তোমার কষ্ট হয়নি ঠাকুমা?

কষ্ট হবে কেন ভাই। যিনি দিয়েছিলেন তিনিই চেয়ে নিলেন। আর তা ছাড়া ...।

তা ছাড়া কি ঠাকুমা?

আমার গয়না বল, ধনসম্পত্তি বল আর মানমর্যাদা বল, সবই তো উনি।

তুমি এত ভালবাসতে দাদুকে!

এতটুকু এসেছিলাম সংসারে, ভালমন্দ কিছুই বুঝতাম না, তিনিই তো সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়েছেন। অবশ্য সংসারের কাজে আমার পাশে ছিলেন গোয়ালিনী মা।

দাদু এতবড় পণ্ডিত হয়ে তোমাকে লেখাপড়া শেখাননি ঠাকুমা?

সারাক্ষণ তো সূর্যের আলোর তলায় রইলাম, আর আলো জ্বালাবার দরকার কি?

তুমি তো দারুণ একটা কথা বললে ঠাকুমা। আমরা এতগুলো পাশ করেছি, তবু তোমার মত কথা বলতে পারব না।

তা কেন পারবি না। তোরা তোদের মত করে কথা বলিস আর আমি আমার মত।

সত্যি, আমার দাদুর আলোর ছটা তোমার ওপর এসে পড়েছে। তুমি কাচ ছিলে, হীরের মত ঝলসে উঠেছ।

এই তো কেমন সুন্দর কথাটা বললি রে দিদি।

তোমার ছোঁয়া লেগেছে তাই বলতে পারলাম।

ওসব ছলনার কথা রাখ। আমার এতবড় পণ্ডিত নাতজামাইয়ের কাছে থেকে তুই কত কিছুই না শিখছিস।

একটা সত্যিকথা বলব ঠাকুমা?

বল ভাই।

যুগ বদলে গেছে।

কি রকম?

তোমাদের যুগে পতি ছিল পরমগুরু। তাদের সব কথা ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, তোমরা মেনে নিতে। আমরা কিন্তু সহজে মেনে নিই না ঠাকুমা।

স্বামী যদি অসৎ হয় ভাই তাহলে তাঁর কথা শুনে কাজ করতে গেলে দুঃখ আছে কিন্তু স্বামী পণ্ডিত আর সৎ হলে তাঁকে মেনে চলাতেই শান্তি। তবে তোদের মত স্বামীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করার কথা আমরা ভাবতেই পারতাম না।

এ যুগের মেয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছে। তাদের মতের বিরুদ্ধে সহজে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া মুশকিল।

ঠাকুরমার উত্তর, যুগে যুগে সব কিছু বদলায় ভাই। তোরাও বদলে যাবি, এতে আর আশ্চয্যি কি। তোর দাদু বলতেন, কাল বড় বলবান। সে অন্ধের মত এগিয়ে চলে। একঠাঁই কোথাও বেশিক্ষণ থেমে থাকে না। তার চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা নাকি হাওয়া ওঠে। তাকে বলে যুগ বদলের হাওয়া। গাছের পুরাতন পাতাগুলো ঝরিয়ে দিয়ে যায়। নতুন পাতা গজায়।

তুমি দাদুর এতগুলো দামী কথা মনে রাখলে কি করে ঠাকুমা?

ওঁরা সব পড়ার ধরে বসে কত কথা আলোচনা করতেন, আমি কাজকর্মের ভেতরে কান পেতে থাকতাম। ওতেই যা শিক্ষা। সব কি আর মনে আছে ভাই।

অন্য একদিন ঠাকুরমার কাছে গিয়ে তাঁর জীবনের বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনেছিলাম।

সেদিন ঠাকুরমাকে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করে বসলাম, ঠাকুমা আমি জানি তুমি কখনো মিথ্যে বল না।

ঠাকুরমা বললেন, একথা কেন ভাই।

আমি একটা কথা জানতে চাইব তোমার কাছে। তার উত্তরটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হওয়া চাই।

কি জানতে চাস বল, আমার লুকোবার কিছু নেই।

আচ্ছা ঠাকুমা, দাদু ছাড়া অন্য কোন পুরুষ কি কোনদিন তোমার মনে এতটুকুও দাগ টানতে পারেনি? আমি বলতে চাইছি, মনে মনেও কি তুমি কোন পুরুষের প্রতি মুহূর্তের জন্য হলেও আকর্ষণ বোধ করনি?

অনেক ছোটবেলা এ বাড়িতে এসেছি ভাই। কেবল তাঁকে ঘিরেই ছিল আমার মান অভিমান, স্বপ্ন সাধ। আমি অন্য কোন পুরুষের কথা ভাবতেই পারতাম না।

দাদুর কাছে তো অনেক রকমই মানুষ শাস্ত্র আলোচনা করতে আসতেন। তুমিও তখন অতি সুন্দরী পূর্ণ যৌবনবতী এক নারী। তাঁদের কারু ওপর কোন আকর্ষণ বোধ করা কোনরকম অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলে আমি মনে করি না।

তাঁদের দেখেছি, আলোচনাও শুনেছি। মনে মনে তাঁদের জ্ঞানের তারিফও করেছি। কিন্তু এর বেশী অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। তাঁদের ভেতর অনেকেই বেশ সুপুরুষ ছিলেন, তবু ভাই এক লহমার জন্যেও মন টলেনি আমার।

এবার উল্টোটা জানতে চাই।

আমাকে বুঝিয়ে বল।

তোমার মত সুন্দরী খুব কমই আছে ঠাকুমা। যৌবনে তুমি অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছ। তাদের কেউ কি কোনভাবে তোমার কাছে তাদের ভাল লাগার কথা জানায়নি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ঠাকুরমা কিছু সময় চুপ করে রইলেন।

পরে বললেন, সোজাসুজি এর জবাব দেওয়া যাবে না। আগে শোন, বারাণসীর বুঢ়া-মঙ্গল অনুষ্ঠানের কথা। এ অনুষ্ঠান অনেককাল আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, তোদের জন্মেরও আগে।

সে কি রকম অনুষ্ঠান ঠাকুমা?

ছাদে চল, সেখানে বসে বলব।

আমি আর ঠাকুরমা ছাদে উঠে একখানা মাদুর পেতে বসলাম। সামনে গঙ্গা। শেষ সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার জলে। নানাধরনের নৌকো যাওয়া আসা করছে। দাঁড়ের ঘায়ে গঙ্গার তরঙ্গে আলোর ঝিলিমিলি। দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকোর ভিড়। কেউ নামছে, কেউ উঠছে।

ঠাকুরমা শুরু করলেন, প্রতি বছরই বুঢ়া-মঙ্গল উৎসব হত এই গঙ্গার বুকে। চলত প্রায় একমাস কাল।

গঙ্গার বুকে উৎসব! সে কি রকম ঠাকুমা? তাও আবার একমাস ধরে!

যখন উৎসব হত তখন গঙ্গার বুকে আর জল দেখা যেত না। শত শত সাজানো বজরা রাজহাঁসের মত ভেসে বেড়াত গঙ্গার জলে। সে এক দেখবার মত দৃশ্য। বিশেষ করে রাতে যখন বজরাগুলোকে আলো দিয়ে সাজানো হত।

দারুণ দৃশ্য! আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।

যেখানে বজরার ফাঁকে একটুখানি গঙ্গার জল দেখা যেত, সেখানে মনে হত কেউ যেন চাঁদির কুচি ছড়িয়ে দিয়েছে।

উৎসব মানে, বজরাতে কোন পুজোআচ্চা হত কি?

না না, সেসব কিছু নয়। বাঈজীদের জমায়েত হত। পুণা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কলকাতা, বেনারস, আরও কত কত জায়গা থেকে সব বাঈজীরা তাঁদের বাজনদারদের নিয়ে আসতেন। এক একখানা বজরায় থাকতেন মাইফিলকারিণীরা। অনেকগুলো সাজানো নৌকো গানপাগল শ্রোতাদের নিয়ে ঘুরে ফিরত বাঈজীদের বজরা ঘিরে।

আমি জানতে চাইলাম, গান কি একমাস ধরেই চলত?

দিন রাত চব্বিশটি ঘণ্টা গানের বিরাম নেই। এমনি করে পুরো একটি মাস। শুরু হত কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে।

ওরে ব্বাস্!

শুধু কি তাই রে, ঠিক সময়ে ঠিক রাগটি গাইতে হবে। যে রাগ গাওয়া হল সেটি আর দ্বিতীয়বার গাওয়া হবে না। রাগ শুরু করলেন এক বাঈজী। চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একজন গাইছেন তো জবাব দিচ্ছেন অন্যজন। একেবারে জমে উঠত আসর।

দিন রাত চব্বিশটি ঘণ্টা গানের বিরাম নেই। এমনি করে পুরো একটি মাস। শুরু হত কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে।

ওরে ব্বাস্!

শুধু কি তাই রে, ঠিক সময়ে ঠিক রাগটি গাইতে হবে। যে রাগ গাওয়া হল সেটি আর দ্বিতীয়বার গাওয়া হবে না। রাগ শুধু করলেন এক বাঈজী। চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একজন গাইছেন তো জবাব দিচ্ছেন অন্যজন। একেবারে জমে উঠত আসর।

আগে একজন কেউ তো গান শুরু করতেন, তাঁকে নির্বাচন করতেন কারা?

সমঝদাররা। রামনগরের রাজা, কাশীর রাজা, বহু শেঠ আর জমিদার সবকিছু ঠিক করতেন। ভারতজোড়া যাঁর নাম, বয়সেও প্রবীণা, সাধারণতঃ তাঁকে দিয়েই শুরু হত। কোজাগরীর ভোরবেলা তোপ দাগা হত রামনগরের রাজবাড়ি থেকে। গম্‌গম্ করে উঠত গঙ্গার দু'ধার। লোকে লোকারণ্য গোলমালটি নেই।

তোমরা কি শুনতে পেতে সেই কিন্নরীদের গান?

আমাদের উপায় ছিল না নৌকোয় করে গান শুনতে যাবার। কিন্তু দিদি, গোয়ালিনী মার কৃপায় আমি গান শুনতে পেতাম।

কি রকম?

তাকিয়ে দেখ, গোয়ালিনী মার বাড়ি থেকে গঙ্গামাঈকে যেন ছোঁয়া যায়। ভোর হতে না হতেই দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে নেয়ে আসতাম। তারপর লক্ষ্মীর ঘটে প্রণাম করে ছাদে গিয়ে বসতাম।

দাদু তখন কি করতেন?

ছাদে আমার পাশে গিয়ে বসতেন। তানপুরার আওয়াজ ভোরের বাতাসে ভেসে আসত। ললিত রাগিণীতে আলাপ শুরু করে দিতেন সে বছরের সব থেকে মানী গায়িকাটি। তাঁকে অনুসরণ করতেন অন্য একটি বজরার শ্রেষ্ঠ কোন গায়িকা খেয়াল আর ঠুংরিতে। কি বলব ভাই, কিন্নরীদের গলায় কত যে রাগরাগিনী, গমক গিট্‌কিরি শুনেছি, তা বলে বোঝাতে পারব না। এক একদিন গান শুনতে শুনতে মনে হত কিন্নরীদের গলা থেকে মুক্তোর দানা ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যি ভাই, মনে হত যেন স্বপ্নের জগতে বসে আছি। গিট্‌কিরির মুক্তোগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে মালা গাঁথছি।

আমি ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, গানের এত কথা তুমি জানলে কি করে ঠাকুমা। আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি কি গান শিখেছিলে নাকি?

ঐ যিনি ছাদে আমার পাশে বসলেন, তিনিই আমাকে সবকটা রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বলে বুঝিয়ে দিতেন। একসময় নিয়মিত উনি গানের আসরে যেতেন। নিজেও গাইতেন তানপুরা বাজিয়ে।

আমার দাদুর যে এ গুণটি ছিল তা কিন্তু আমি কোনদিন শুনিনি।

তোর বাবা তখন বছর সাতেকের দুরন্ত ছেলে। একদিন আছড়ে ভেঙে ফেলল তানপুরাখানা। আমি রাগে কয়েকঘা বসিয়ে দিলাম। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল পিঠে। উনি বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলেন। তখন আমি তোর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। সব শুনে উনি বললেন, ও ঠিকই করেছে। রাগরাগিণীর স্রষ্টা মহাদেব ওর হাত দিয়ে তানপুরা ভেঙে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তোর দাদুর কথা শুনে আমি তো অবাক! আমার মুখের ভাব দেখে উনি বললেন, প্রতিটি রাগরাগিণী গাইতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে। তার বাইরে গাইলে দোষ স্পর্শ করে। আমি কাল 'মেঘ' রাগটি প্রভাতে না গেয়ে মাঝরাতে ছাদে বসে গেয়েছিলাম। বিশ্বনাথের দরবারে বসে অনাচার করায় একটি শিশুর হাত দিয়ে আমাকে প্রভু শাস্তি দিলেন।

আমি এরপর ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করে করে মহাদেব তাঁর পাঁচটি মুখ দিয়ে কোন্ কোন্ পাঁচটি রাগ সৃষ্টি করেছিলেন তা জেনে নিলাম। বাকি একটি রাগের স্রষ্টা হলেন পার্বতী। মোট ছটি রাগ। ঐ রাগেদের প্রত্যেকের আবার ছটি করে স্ত্রী। তাই রাগিণীর সংখ্যা ছত্রিশ। আশ্চর্য। ঠাকুরমা আঙুলে গুনে গুনে সবকটি রাগরাগিণীর নাম বলে গেলেন। শুধু তাই নয়, কোনটি দিন রাতের কোন সময়ে গাইতে হয় তারও কিছুটা আন্দাজ দিয়ে দিলেন। রাগরাগিণীর মিশ্রণের ফলে যেসব মিশ্ররাগ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলিরও নাম জানা হল। আবার রাগরাগিণীর বিচিত্র সুন্দর সব মূর্তির পরিচয় পেলাম। দু'চারটি মূর্তির বেশভূষা আর ভাবের পরিচয় দিয়ে গেলেন ঠাকুরমা।

আবার মনে হল, ঠাকুরমা চন্দ্র। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছেন তিনি। নইলে আমাদের মত স্কুল কলেজে পড়াশোনা না করেও তিনি এতখানি জ্ঞান অর্জন করলেন কি করে!

সদা আনন্দময় মুখখানা আমার ঠাকুরমার। নিজের ভাবে নিজে বিভোর হয়ে আছেন।

আমি বললাম, ঠাকুমা বুঢ়া-মঙ্গল উৎসব আর গানের বিষয়ে অনেক কথাই শুনলাম, কিন্তু যে কথাটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা যে অনেক দূরে সরে গেল।

ঠাকুরমা বললেন, একটু মনে করিয়ে দে ভাই। আজকাল কেমন যেন সব ভুলে যাই।

তুমি কিছুই ভোল না ঠাকুমা। যদি ভুলে যেতে তাহলে রাগরাগিণীর এত কথা এমন গুছিয়ে বলতে পারতে না। আচ্ছা, আমার আসল প্রশ্নের খেইটা এবার ধরিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওপর কেউ কখনো আকর্ষণ বোধ করেছিল কিনা?

ঠাকুরমা অমনি বললেন, মনে পড়েছে ভাই। আর সেজন্যেই ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে হল। শোন তাহলে আসল কথা :

সেবার বুড়া-মঙ্গলের অনুষ্ঠান চলছিল, হঠাৎ শোনা গেল, গঙ্গার বুকে কয়েকখানা বজরায় লুঠতরাজ হয়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গানের রেশ কেটে যাচ্ছিল, রাজামহারাজ আর পুলিশের চেষ্টায় সেটা আবার তেজী হয়ে উঠল।

এসব আবার ঘটে নাকি?

কয়েক বছর পর পর ঘটাতে বন্ধ হয়ে গেল এতদিনের বুড়া-মঙ্গল। পুলিশ বলল, জলের ওপর এতবড় জমায়েত, আমরা দায়িত্ব নিতে পারব না। এখন তোর আসল প্রশ্নটার কথায় আসি।

তোর দাদু রাতে সাবধান করে দিয়ে বললেন, চারদিকে যে রকম গোল চলছে ভোর রাতে স্নানের ঘাটে নাই বা গেলে কটা দিন।

আমি চুপ করে রইলাম। তোর দাদু শেষ রাতে রোজই ভোর-আরতি দেখতে বিশ্বনাথ মন্দিরে চলে যেতেন। আমার বাড়িতে তখন দিনরাতের একটি কাজের মেয়ে থাকে। তার জিম্মায় তোর বাবাকে রেখে আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে ডুব দিয়ে আসতাম। গঙ্গাস্নান কোন কারণে একটি দিনও বন্ধ থাকলে আমার শরীরটা কেমন অপবিত্র মনে হত। তাই তোর দাদুর কথা না শুনে বেরিয়ে গেলাম স্নানের ঘাটে।

শেষ জ্যোৎস্নার আলো তখনও ছড়িয়ে আছে গঙ্গার বুকে। সারি সারি বজরা ভেসে আছে। আমি ঘাটের এক কোণে ডুব দিয়ে উঠে আসছি, কিন্তু কয়েক পাট সিঁড়ি ভেঙে আর উঠতে পারলাম না। পেছন ফিরে দাঁড়াতে হল।

একটা গানের গলি বাতাসে ভেসে আসছিল, 'কানহাইয়া, কানহাইয়া ফুকারে যশোদা'— ।

গোষ্ঠে গেছে আমার কানাই, সূর্য যে পাটে বসল। সবাই ফিরে আসছে ঘরে, সে কই। —সে কই! মায়ের হৃদয়ের কান্না ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এমন আবেগভরা গলার গান আমি কখনো শুনিনি। স্থির হয়ে কতক্ষণ সেই গানের ভেতর ডুবেছিলাম জানি না, হঠাৎ একটা গলার আওয়াজে আমার চেতনা ফিরে এল। ঘাটের পাশে বাঁধা একটা বজরা থেকে কোন পুরুষ বলে উঠল, আহা রমণীর এমন অপূর্ব রূপ আমি কখনো দেখিনি।

আমি ছাড়া সেখানে তখন অন্য কোন মেয়ে ছিল না। মনে হল, আমার সারা গায়ে যেন বিছের বিষ ছড়িয়ে পড়ল। আমি হাতের গামছাখানা বুকের ওপর ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলে এলাম। মনে হল, গলির মোড় পর্যন্ত কেউ আমার পেছন পেছন এল।

জানতে চাইলাম, পরের দিন কি আবার তুমি স্নানে গেলে ঠাকুমা?

ক্ষেপেছিস। আমার বুকের ধড়ফড়ানি সাতদিন ধরে চলল।

সাতদিন ধরে বলছ কেন ঠাকুমা? সাত দিনের পর কমল কিসে?

আমি তোর দাদুকে কিছু বলিনি, কারণ তাঁর বারণ না শুনে স্নান করতে গিয়েছিলাম।

তারপর?

বেশ কদিন ধরে আমি আড়াল থেকে দেখলাম, একটা লোক দূর থেকে আমার ঘরের দিকে চেয়ে আছে।

লোকটার চেহারা কেমন ছিল ঠাকুমা?

বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। অবশ্য কাপড়চোপড় ভদ্রলোকের মত।

তারপর?

আমি বেশ বুঝতে পারলাম, স্নানের ঘাটে ঐ লোকটাই আমার রূপের কথা তুলেছিল। তারপর আমার পেছন পেছন এসে দূর থেকে আমার বাড়ি দেখে গিয়েছিল।

শেষে কি হল ঠাকুমা?

আমি ভয় চেপে রাখতে না পেরে তোর দাদুর কাছে সব কথা খুলে বললাম। পরের দিন তোর দাদু

আর বাইরে গেলেন না। লোকটা ঠিক সাতদিনের মাথায় এসে দাঁড়াল আমাদের ঘরের সামনের রাস্তার উল্টোদিকে। চেয়ে রইল একদৃষ্টে। আমাকেই যে খুঁজছে, এটা বুঝতে আমার বাকি ছিল না।

দাদু তখন কি করলেন?

উনিও লোকটাকে দেখছিলেন ঘরের ভেতর থেকে। শেষে একটি কাণ্ড করে বসলেন।

কি কাণ্ড, মারামারি নাকি?

আরে না না, সেসব কিছু না। আমাকে বললেন, লুকিয়ে না থেকে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াও। কোন সংকোচ না রেখে তাকাও ওর দিকে।

আমি তাই করলাম। বেরিয়ে গিয়ে ওর দিকে সিধে তাকিয়ে রইলাম। অমনি একটি ঘটনা ঘটল। তুই যা ভাবতেও পারবি না দিদি।

কি এমন ঘটনা ঠাকুমা।

লোকটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে আমাকে প্রণাম করল।

লোকটা কি পাগল না মাতাল!

আমিও চমকে উঠেছিলাম। আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু উনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতে সব ভুল ভাঙল।

কি রকম?

উনি নিচে নেমে লোকটির কাছে এগিয়ে গেলে। ততক্ষণে মানুষটি উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দুটি জোড় করা।

তোর দাদু বেশ নরম গলায় বললেন, আসুন ভেতরে।

লোকটি বলল, আমি বেশ কয়েকদিন মাকে দেখব বলে এখানে আসছি, দেখা মেলেনি। আজ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাকে দেখলাম।

উনি হঠাৎ লোকটির হাত ধরে বললেন, ভেতরে আসুন। অন্নপূর্ণার কাছে এসে প্রসাদ না নিয়ে চলে যাবেন কি করে।

পরে ওঁর মুখে শুনেছিলাম, লোকটির চোখ নাকি জলে ভিজে উঠেছিল।

খাওয়ালে তুমি?

হাঁ ভাই সেদিন দুজনকেই পরিবেশন করে খাওয়ালাম। কথায় বার্তায় অত্যন্ত ভদ্রলোক। কিন্তু সেই যে গেলেন, আর কোনদিন তাঁকে এ মুখো হতে দেখিনি।

আশ্চর্য! একবারও আর এলেন না?

না ভাই, আর আসেননি। আমি গঙ্গা নাইতে গিয়েও তাঁকে আর দেখতে পাইনি।

আমি বললাম, হাঁ ঠাকুমা, এ এক অদ্ভুত আকর্ষণই বটে। সুন্দরকে সকল মানুষ এমন করে ভালবাসতে পারে না।

এবার আমাকে ঘিরে তৈরী হল অভাবিত এক ঘটনার বৃত্ত। যে ঘটনা দেখার জন্য আমি কোনদিনই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার জীবনে আকস্মিক একটা ঝড় উঠল, আর সেই ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার বাঁধা সংসারের সবকটা খড়কুটো।

অমলাভ, তুমি অবাক হচ্ছ আমার এই লেখাগুলো পড়ে। সময় কমে আসছে জেনে পরীক্ষার্থী যেমন উত্তরপত্রে অনেক কিছু জড়ো করে ফেলে তেমনি অগোছালো কিছু কথা জড়ো করে খাতা বেঁধে তোমার হাতে তুলে দিয়ে যাব। কি হবে আর না হবে সে বিচার আর আমার হাতে থাকবে না।

আজ কেন জানি না অনেকের মুখ মনে পড়ছে। আমাদের প্রজন্মের রাগ অনুরাগের সঙ্গে দুপুরুষ আগের মানুষদের ভালবাসার ছবিগুলোর কত তফাৎ। এ প্রজন্মের অনেক শিথিল সংসার জীবনের সঙ্গে বড় বেশী আঁটো করে বাঁধা অতীত মানুষদের সংসার-যাত্রার কি কোন মিল আছে? তেমন মিল

হয়তো খুব একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড় অশান্ত, ভিড়ে ঠাসা যুগ এটা। ঠেলাঠেলি করে সবাই চাইছে নিজের জায়গাটা কায়েম করে নিতে। নইলে বিপন্ন হয়ে পড়বে অস্তিত্ব। সে যুগের মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত নগ্ন আর লোভ এত রাক্ষুসে ছিল না। পরোপকার এখন অপ্রয়োজনীয় ভুলে যাওয়া এক শব্দ। উঠতে হবে নিজেকে। নিচে মই জাপটে ধরে থাকার কেউ নেই। ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, এক ভিনদেশী বুদ্ধভক্ত দাদুর কাছে সারনাথের পথের নির্দেশ চেয়েছিল। দাদু নিজে তাঁকে সঙ্গে করে সারনাথ ঘুরিয়ে এনেছিলেন। এ রকম অযাচিত দাক্ষিণ্য দেখাবার জন্য যে সময় আর মানসিকতার দরকার, এ যুগে তা দুর্লভ।

কাজ নেই, চাকরি নেই, জনসংখ্যার আণবিক বিস্ফোরণ, তার প্রতিক্রিয়া যাবে কোথায়! বিষের ধোঁয়া নগর, শহরতলি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম গ্রামান্তে।

যেসব মাস্টারমশায়রা দাদুর আমলে অথবা তারও আগে মরে গেলেও বিদ্যা বিক্রয় করব না বলে প্রতিজ্ঞা করতেন, সেইসব বিষয় বুদ্ধিহীন মাস্টারমশায়দের যুগ অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন মাস্টারমশায়দের ভেতর দলবাজির কোন্দল তুঙ্গে। বিচারকেরা শিক্ষকদের সাক্ষ্যকে এখন তেমন আলাদা একটা সম্ভ্রমের চোখে দেখেন বলে মনে হয় না।

স্কুল কলেজে যাবার পথে আমার দুটো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ইভটিজাররা বসে থাকত পথের ধারের একটা রকে। আমাদের কাউকে দূর থেকে আসতে দেখলেই শুকনো পাতার রাশে দমকা হাওয়ার ছোঁয়ার মত হৈচৈ লেগে যেত। তোড়ে বেরিয়ে আসত অশ্লীল কথাবার্তা।

আমার বন্ধুরা নার্ভাস হয়ে পড়ত। কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিতে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি বোধ করত। আমি কিন্তু ওদের কথা গায়ে মাখতাম না। পাশ কাটিয়ে চলে আসতে আসতে মনে মনে বলতাম, তোমরা আমার ঘৃণার পাত্র নও, শত্রু নও, সমবয়সী বন্ধু। আমার রক্তেও তোমাদের মত কামনার দাহ আছে। তোমাদের চোখে ভবিষ্যতের কোন ছবি নেই। সংসার গড়ার সামান্যতম রেস্ত নেই তোমাদের পকেটে। শুধু কটি মোক্ষম নেই, নেই তোমাদের ঘিরে। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা আছে তোমাদের উদরে, কামনার অসহ্য আগুন জ্বলছে তোমাদের রক্তে, অস্থি মজ্জায়। তাই অবরুদ্ধ অতিরিক্ত গ্যাস যেভাবে আবরণ ভেদ করে সশব্দে বেরিয়ে আসে তেমনি তোমাদের যৌবনের উত্তেজনাগুলোও বেরিয়ে আসে। যৌবনের উন্মাদনা, উত্তেজনা প্রকাশের একটা পথ চাই।

আমার পথের দ্বিতীয় ছবিটি পুরনো বই বিক্রেতা এক বৃদ্ধের। তাঁর চশমার কাচটি অনেক পুরু। খদ্দের ধারে-কাছে না থাকলে তিনি নিজেই বইয়ের সাগরে মুখ ডুবিয়ে মুক্তো খোঁজেন।

আমি বেশ কয়েকবার তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান সব পুরনো বই কিনেছি। তাই আমি তাঁর কাছে পরিচিত।

তিনি একদিন হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন, যে জল পরিমিত পান করলে প্রাণরক্ষা হয় সে জল অতিরিক্ত পান করলে প্রাণনাশের কারণ হয়।

আমি বললাম, কথাটা ঠিক, কিন্তু কেন বললেন?

উনি মুখ তুলে মৃদু হেসে বললেন, দুনিয়াটার দিকে তাকিয়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবে। এই যেমন দরকারের অতিরিক্ত অর্থ সংসারে ঢুকলেই অনর্থ। আরো আরোর ঠেলায় প্রাণ যাবে। ঐ অর্থ নিয়ে শেষে লাঠালাঠি বেঁধে যাবে, ছেলেপুলে নাতিপুতিতে।

আমি বললাম, খাঁটি সত্যি কথাটি বলেছেন।

আর একদিন অন্য একটি কথা পাড়লেন, দীপে আলো, সূয্যিতেও আলো, একই আলো সাবধানে। যিনি ছোট বড় সব লণ্ঠন জ্বেলে দিয়েছেন, তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

আমি বললাম, কেন দাদু?

তোমার ভেতরে একটা লণ্ঠন আছে, তাকে জ্বালিয়ে নিয়ে খোঁজ। তোমার ভেতর-ঘরের অন্ধকার কুঠরীতেই তিনি বসে আছেন।

এমনি কত বিচিত্র ভাবনার বীজ তিনি ছড়িয়ে যেতেন।

একবার পাঁচ সাতজন বান্ধবীর সঙ্গে আমি কলেজে যাচ্ছিলাম। বসেছিলেন সেই বৃদ্ধ। জীর্ণ শরীর, খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। পরনে আধময়লা একখানা ফতুয়া আর খাটো ধুতি। চশমার মোটা কাচখানা পুরনো বইয়ের পাতায় কিছু একটা সন্ধান করে ফিরছিল।

আমি বান্ধবীদের তাক লাগিয়ে দেব বলে ওঁর কাছে এসে থেমে দাঁড়ালাম।

দাদু, আজ আমাদের বন্ধুরা এসেছে, একটু কিছু শোনান।

সেই অতি সাদামাঠা মুখের দরিদ্র মানুষটি তাঁর চশমার অতি পুরু কাচের ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। চোখ দুটো অনেক বড় আর অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

বন্ধুদের কয়েকজন তাঁকে দেখেই কলেজের দিকে পা চালিয়ে দিয়ে বলল, চলে আয় তো।

যে দু'একজন দাঁড়িয়েছিল, তারাও ঐ ডাকে সাড়া দিয়ে সরে পড়ল। একজন টিপ্পনি কাটল সক্রেটিসকে দেখতে কতকটা এ রকম ছিল না?

ওদের ভেতর রুমা একটু স্থির প্রকৃতির মেয়ে। সে বলল, ওভাবে কথা বলছিস কেন।

আমি কিন্তু লজ্জিত অপমানিত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনাবিল এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। বুঝলাম, কোন অপমানই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বললেন, তুমি দুঃখ পাচ্ছ কেন? ফুল হলে কি হবে, গন্ধ সব আলাদা। মানুষ হলে কি হবে, স্বভাবে সব আলাদা।

ওঁর শেষ কথাটি শুনেছিলাম আমার বিয়ের দুদিন আগে।

কেন জানি না আমি সেদিন ওঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম। কোন কোন পথচারী থমকে দাঁড়িয়ে আড়চোখে সে দৃশ্য দেখেছিল। একজন সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী মেয়ে যে এমন হতকুচ্ছিত একটি ফুটপাতবাসীর পায়ে হাত দিতে পারে, তা ছিল তাদের কল্পনারও অতীত।

বৃদ্ধ মানুষটির চোখ দুটো সেদিন চিক্ চিক্ করে উঠছিল। সম্ভবত আমি তাঁকে প্রণাম করব, এটা তিনি ভাবতেও পারেননি।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি আমার অভিপ্রায়টা বুঝে নিলেন। আবার সেই প্রসন্ন মুখে বৃষ্টিভেজা হাসিটি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, দিনের আলোয় সবকিছু দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে শুধু নিজেকে।

সেদিন এ কথার অর্থ আমি ভাল করে উপলব্ধি করিনি। আজ ধীরে ধীরে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জীবনের আলো থাকতে আমরা অনেক দৃশ্য আর অনের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই। অনেক চরিত্রের আনাগোনা, কোলাহলে ভরে থাকে আমাদের অঙ্গন, আমাদের পৃথিবী। কত দেখলাম, কত জানলাম এই আলোয়ভরা জগতটাকে। কিন্তু আজ এই রাতের নীরবতায় তাকিয়ে আছি নিজের দিকে। ধীরে ধীরে একটা পদধ্বনি এগিয়ে আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি তার পায়ের নূপুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন। সেই ধ্বনিতে আমার পায়েল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোথায় সে আমাকে নিয়ে যাবে। জোনাকির আলোভরা ঝিল্লির ঐকতান মুখরিত কোন রাতের রঙ্গমঞ্চে? আমি তারাভরা রাতের ময়ূরের মত মেলে দেব আমার নৃত্যের কলাপ। সেখানে আমিই আমার নাচের দর্শক, আমিই আমার বোদ্ধা। হে সর্বগ, ব্রহ্মাণ্ডলোকের স্রষ্টা, তুমি কি আসবে আমার সেই নাচের বাসরে?

ডুবে যাবার আগের মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছে, আলোর পৃথিবীটাকে একবার শেষবারের মত দেখে নিই।

অমলাভ, চলে যাবার আগে তোমাকে আমি সবকিছু জানিয়ে যেতে চাই।

আমি কলুষিত কিনা জানি না, তবে গোপনচারিণী। গোপনতা যদি পাপ হয় সে পাপ আমাকে স্পর্শ করেছে।

জার্মানীর আমন্ত্রণে সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর ভাষণ দিতে তুমি ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সে দেশে চলে গেলে। ঠাকুরমা গত হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির একটা বিলিব্যবস্থার জন্য দিদিকে সঙ্গে নিয়ে বাবা এলেন বেনারস।

আমি বললাম, বাবা, বাড়িটা কি বিক্রি না করলেই নয়?

বাবা অমনি বললেন, কেন, তুই নিতে চাস? তাহলে থাক।

আমার নেবার প্রশ্ন নয় বাবা, আমার তো কোয়ার্টার আছে।

তবে?

স্মৃতির প্রশ্ন বাবা। দাদু, ঠাকুমা সবাই এই জীর্ণ বাড়িটার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

আমরা কলকাতাতে সেট্‌ল্ করেছি। তোমার মা তাঁর বাবার এতবড় বাড়িখানা বিক্রি করে দিয়েছেন। বেনারসের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে তোমার মা কলকাতার বিজনেসকেই বাড়িয়ে তুলছেন। আসলে দেখার লোকের অভাব। এ বাড়িটাও জীর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়ে যাবে। তাই ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠছে।

আমি আর কোন কথা বাড়ালাম না।

আমার চোখে কি সেই মুহূর্তে ব্যথার কোন ছায়া দেখছিলেন বাবা।

বিকেলে আমরা দু'বোন, বাবা আর টুকাই দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছি। গঙ্গায় নৌকো চলাচল করছে। দিদি টুকাইকে কোলে বসিয়ে উড়ন্ত পায়রা, ভেসে যাওয়া নৌকো দেখাচ্ছে।

বাবা হঠাৎ বললেন, বাড়িটা তুই রেখে দে আঁখি। দেখাশোনার দায়িত্ব কিন্তু তোর। আমরা যখন বিশ্বনাথ-দর্শনে আসব তখন এ বাড়িটাতেই উঠব।

আমি খুশী হয়ে বললাম, আমি যতদিন আছি তোমাদের কোন অসুবিধেই হবে না। তাছাড়া মুরালের মা রয়েছে। এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট ওর পাঁজর।

দিদি বলল, শেষকালে মুরালের মাকেই না হয় ওটা দিয়ে দেওয়া যাবে।

বাবা হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, তোদের দাদুর জিনিস। দুবোন পরামর্শ করে যা ইচ্ছে তাই করিস। আমি আর তোর মা ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।

দিদি চিরকালই দিলদরিয়া, বেহিসেবী। তবু এ বাড়িখানা মুরালের মার হাতে তুলে দিতে চাইছে জেনে ভারী ভাল লাগল।

কথায় কথায় দিদি বলল, অমল তো মাস দেড়েকের আগে ফিরছে না। তুই একা একা এখানে বসে থেকে কি করবি, টুকাইকে নিয়ে চল কলকাতা।

আমি জানি টুকাইয়ের জন্য দিদি কলকাতায় বসে ছটফট করে। তাই বললাম, বহুকাল ওর বইপত্র ঝেড়েঝুড়ে রোদ্দুরে দেওয়া হয়নি। ও এখন নেই, এই সুযোগে সব গোছগাছ করে রাখি। তুমি বরং এই দস্যিটাকে নিয়ে যাও সঙ্গে করে। আমার কাজের সুরাহা হবে।

দিদি দারুণ খুশী। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে টুকাইকে দোল দিয়ে বলল, 'চল মেরি লুণা'।

পারলে ওকে নিয়ে যেন এখুনি গাড়িতে ওঠে।

দিন পাঁচেক বেনারসে কাটিয়ে বাবা, দিদি আর টুকাই কলকাতার ট্রেনে উঠল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি টুকাইকে দু হাত বাড়িয়ে ডাকলাম। ও আমার মুখের দিকে ভয় মেশানো চোখে তাকিয়ে দিদিকে কাঁকড়ার মত জাপ্‌টে আঁকড়ে রইল।

দিদি বলল, দেখলি তো, বেটি আমার কেমন ন্যাওটা।

কলকাতাতেও ও বেশীরভাগ সময় দিদির কাছে থাকত। এক একজনের কাছে বাচ্চারা ভারী আমোদে থাকে।

ওরা চলে গেলে আমি দাদুর ঘরেই রইলাম। মুরালের মা সারাদিন বকবক করে, আমি শুনি। ও নানা পদ রান্না করে, আমি তারিয়ে তারিয়ে খাই।

ইউনিভারসিটি কোয়ার্টারে থাকতে আমি কলের জলে স্নান করতাম। এখানে গঙ্গা এত কাছে তাই রোজ সকালে স্নান করতে যেতাম দশাশ্বমেধ ঘাটে।

গঙ্গার পূর্বপারে প্রতিদিন স্নানের পর সূর্যোদয়ের মহিমা দু চোখ ভরে দেখতাম। সূর্যের গোলাকার কলস থেকে গাঢ় গলিত সোনা গড়িয়ে পড়ত জলের কিছু অংশে। সে কি মন-মাতানো, প্রাণ-জুড়ানো শোভা! আমি সিক্ত বস্ত্রে সূর্য প্রণাম করতাম।

সেদিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সূর্যপ্রণাম শেষ করে চোখ মেলতেই দেখলাম, একটি নৌকো ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

ভোরবেলা বেশ কয়েকটি নৌকো যাত্রী নিয়ে ঘোরাফেরা করে। তারা ভোরের গঙ্গায় উদিত সূর্যের রঙবাহার দেখে। গঙ্গার মাঝ বরাবর বাঁশের বাঁধা খুঁটিগুলোতে যে পায়রার ঝাঁক বসে থাকে তারা ঢেউয়ের দোলায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়। পাখার ঝাপটে শব্দ তুলে তারা আকাশ ছেড়ে ফেলে। তাদের মেলে দেওয়া পাখায় নবীন সূর্যের আলো এসে পড়ে।

নৌকোটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে আমি জল থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে পোশাক পরিবর্তনের জন্য চাতালের দিকে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা ডাক ভেসে এল, চ-তু-র্বে-দী ...।

আমি চমকে ঐ অবস্থাতেই পেছন ফিরলাম।

নৌকো ততক্ষণে ঘাটে এসে ভিড়েছে।

একজন সাহেব টেলিফটো লেন্স নিয়ে তাক করল। ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে সিঁড়ি টপ্‌কে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

আমি ততক্ষণে বিস্ময়ে আবিষ্ট। রবীন্দ্রসদনে যে ইটালিয়ান ফটোগ্রাফার আমার নাচের ফটো তুলেছিল সেই আন্তোনিও মানুচি আমার সামনে। আমার বিয়ের আগে মঞ্চে সেই শেষ নাচ। বিয়ের পর তোমাদের বাড়ি থেকে আর নাচের অনুমতি পাইনি। এ নিয়ে বেদনা ছিল, ক্ষোভ ছিল কিন্তু কোনদিনই মুখর হইনি প্রতিবাদে। তুমিও এগিয়ে আসনি আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে।

তুমি পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে চিরদিনই আগ্রহী। মার্জিত শিক্ষিত মন তোমার। কিন্তু বেশ কিছুটা প্রাচীনপন্থী বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি তোমার সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারনি। এ যুগে বহু শিক্ষিত মেয়ের মত আমি কিন্তু নিজের জীবনসঙ্গীকে নিজে নির্বাচন করে নিইনি। তবু আমি আশা করেছিলাম, আমার স্বামী তার নিজের হাতে আমার ভেতরের শিল্পীসত্তাটাকে জাগিয়ে তুলবে। তা হয়নি। তাই কিছু ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবে জমে উঠেছিল মনের গভীরে। আসলে শিল্পভাবনায় লালিত একটা মন তার বিকাশ চায়। সে সুযোগ না পেলে তার অবরুদ্ধ মনে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। বাইরে থেকে এ রোগ ধরা খুব শক্ত। তার ওপর আক্রান্ত রোগিণীটি যদি আমার মত কিছুটা চাপা স্বভাবের হয়।

আন্তোনিও সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে। চোখ তার আঠার মত আটকে আছে আমার মুখের ওপর। ক্যামেরাটা এখন কাঁধের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে কোমরের কাছে। বহুদিন পরে হারানো কোন প্রিয়জনকে হঠাৎ দেখতে পেলে বুকের ভেতর যে তুফান ওঠে তার উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে যায় সারা মুখ। আমার আন্তোনিওর দিকে তাকিয়ে তেমনি মনে হচ্ছিল।

ও উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়াল।

অসংকোচে মৃদু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, প্রায় আট বছর পরে দেখা হল, কি করে চিনলে আমাকে?

আন্তোনিও অদ্ভুত একটা কথা বলল, আমি প্রায় প্রতিদিনই তোমাকে দেখতে পাই, আকাশে যেমন চাঁদকে দেখি। কলাবৃদ্ধি, কলাক্ষয় হতে পারে কিন্তু চাঁদ, চাঁদই। তাকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

তুমি ফটোগ্রাফার জানতাম। কিন্তু তুমি যে একজন কবি তা জানতাম না। কবে এলে বেনারস? উঠেছ কোথায়?

ও যা বলল, তাতে ১৫ই আগস্ট দিল্লীর অনুষ্ঠান কভার করে ও ২০শে বেনারসে বেরিয়ে এসেছে। তার মানে, মাত্র দুদিন আগে এসে পৌঁছেছে এখানে। উঠেছে একটি নামকরা হোটেলে।

জানতে চাইলাম, আজকে কি প্রোগ্রাম?

ও বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর প্রোগ্রাম ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

আমি হেসে উঠলাম।

তবু বল, প্রোগ্রামটা কি ছিল?

সারনাথে গিয়ে ছবি তুলব।

বললাম, দুপুর দুটোয় এসো এখানে, তখন সারনাথ যাওয়া যাবে। সঙ্গে কেউ আছে নাকি?

নিঃসঙ্গ যাযাবর।

ওর কথায় আবার হাসলাম।

তোমার নৌকোওয়ালা তোমাকে নিয়ে ঘোরাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

ও বলল, দুটোয় আমি ঠিক আসছি।

এই বলে তর্‌তর্‌ করে নিচে নেমে গেল।

আমি দেখলাম, নৌকো মণিকর্ণিকার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। পোশাক বদলে আমি ঘরে ফিরে এলাম। সারাক্ষণ অদ্ভুত এক রকমের আনন্দে আমি আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। আমার ভেতর যেন এক অবরুদ্ধ শিল্পী জেগে উঠেছে।

অনেক দিন প্রায়ান্ধকার কারাগারে আটক থাকার পর হঠাৎ মুক্তি পেলে বন্দী যেমন উদ্বেলিত আবেগে ভেঙে পড়ে, ঠিক তেমনি হল আমার অবস্থা।

মুরালের মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সে আমার স্বভাবটি এতদিনে জেনে ফেলেছে। আমার আনন্দ আর উচ্ছ্বাস বাইরে খুব কমই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমার খুশীর এমন বাঁধভাঙা প্রকাশ দেখে সে সত্যিই তাজ্জব বনে গেল।

আমি টুকটাক কাজের ফাঁকে দু'এক কলি গান গেয়ে উঠছিলাম। নিজেই কয়েকটুকরো ছানার প্রিপারেশান করে রাখলাম। কিছু ফল মুরালের মাকে দিয়ে আনিয়ে কেটেকুটে ব্যাগে পুরে নিলাম।

এবার মুরালের মার কৌতূহল মাত্রা ছাড়াল।

কলকাতা যাচ্ছ নাকি ছোট মাসি?

যাচ্ছি কোথাও তবে সেটা কলকাতা নয়।

কবে ফিরবে?

আজই।

কাছে পিঠে কোথাও বুঝি?

হাঁ, একটুখানি চক্কর দিয়ে আসব।

সন্ধ্যার আগে ফিরবে তো?

আজ পূর্ণিমা না?

মুরালের মা তিথিনক্ষত্র মেনে কাজ করে, তাই এসব তার কণ্ঠস্থ। বলল, আজ শুক্লা চতুর্দশী।

তাহলে সূয্যি ডুবলেই জ্যোৎস্না। ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

তোমার খাবার তৈরী করে রাখব তো?

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, দু'খানা রুটি আর একটু ভাজি বানিয়ে রেখ মাসি। সে রকম বুঝলে ওটুকুতেই হয়ে যাবে।

মাসি আগাপাস্তলা কিছুই বুঝল না। বলল, ঠিক আছে। একটু তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা কর।

আমি মাথা নাড়লাম।

পুরো ঘি রঙের শালোয়ার কামিজে নিজেকে সাজিয়ে তুললাম। সোনালী বর্ডারগুলো ঝিলিক দিচ্ছিল। একটা সিঁদুরে লাল দোপাট্টা জড়িয়ে নিলাম। পায়ে জরীর ফুল তোলা একজোড়া সাদা নাগরা।

ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে ওঠা পূজারিণী আঁখি বেদজ্ঞ এখন এক মনোহারিণী কত্থক-শিল্পী। না, সারি সারি নূপুরের লহর নেই পায়ে তবে চোখের তারায় বিদ্যুৎ আছে।

অমলাভ, তোমার লজ্জাহীনা বধূ তখন দিবাভিসারিকা। পাপ পুণ্যের পারে সে তার শিল্পীবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত।

বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই দশাশ্বমেধ ঘাট। আমারই আগে ওখানে পৌঁছবার কথা, কিন্তু গিয়ে দেখি ও এসে গেছে।

আমি দূর থেকে হাত নেড়ে আমার আগমনের খবরটি জানালাম। আন্তোনিও কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় হাত নাড়ল।

কাছে যেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, দূর থেকে তোমাকে ঠিক ঠিক চেনাই যাচ্ছিল না।

ও আমার হাতখানা অসংকোচে ধরে দূরে একটা গাড়ির দিকে নির্দেশ করল।

আমরা এগিয়ে গিয়ে ঐ গাড়িতে উঠলাম। হোটেল থেকে ও গাড়িখানা ভাড়া করে এনেছিল।

সারনাথের পথ আমার অচেনা নয়। একাধিকবার বহুজনের সঙ্গে আমার সারনাথ-ভ্রমণ হয়েছে।

পথে যেতে যেতে কিছু দোকানপাট, বিস্তৃত ক্ষেতখামার আর ফসল সম্বন্ধে দু'চার কথা ছাড়া অন্য কোন আলাপ হয়নি।

বেনারসের উত্তর-পশ্চিমে কয়েক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে অল্প সময়ের ভেতরেই পৌঁছে গেলাম সারনাথে। সামনে বিশাল মন্দির।

আন্তোনিওকে বললাম, আমরা এখন সারনাথে বুদ্ধ-মন্দিরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই সারনাথের আগে নাম ছিল মৃগদাব। এ অঞ্চলে হরিণরা বনের ভেতর ঘুরে বেড়াতো নির্ভয়ে। বুদ্ধ তথাগত গয়াতে একটি গাছের তলায় বসে কঠিন তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করেন। পৃথিবীতে জীবের দুঃখকষ্টের কারণগুলি অনুসন্ধান করে তার থেকে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করেন তিনি। এই বোধি বা জ্ঞান লাভ করার জন্যই তিনি বুদ্ধ। যে গাছের তলায় বসে তিনি মহাজ্ঞান লাভ করেন সেটি বোধিবৃক্ষ নামে আজও পরিচিত।

আন্তোনিও বলল, সে জায়গার নাম বোধগয়া। অতি প্রাচীন, বিশাল এক মন্দির আছে সেখানে। কয়েক বছর আগে আমি বোধগয়ায় গিয়েছিলাম। আমার সংগ্রহে অনেক ছবি আছে।

তুমি বুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জান?

আমার কাজ যদিও দুনিয়া ঘুরে ফটো তুলে বেড়ানো তবু আমি বুদ্ধ সম্বন্ধে অল্প কিছু পড়াশোনা করেছি। চীন, জাপান, বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, সব জায়গাতে ঘুরে আমি বুদ্ধের নানা ভঙ্গিমার মূর্তি ক্যামেরায় ধরেছি। আমি চেষ্টা করেছি, বৌদ্ধদের উৎসবের সময় ওগুলো তুলতে।

আমি বললাম, এখানেও তুমি কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাবে। মৌর্য, গুপ্ত রাজারা অতি প্রাচীনকালে এখানে বৌদ্ধস্তূপ আর সঙ্ঘারাম তৈরী করেছিলেন। মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব। এখানে গুপ্ত আমলের তৈরী বুদ্ধমূর্তিটি অপূর্ব সুন্দর। ধর্মোপদেশ দান করছেন তিনি। ঠোঁটের রেখায় মৃদু হাসি। আধবোজা ধ্যানী চোখ। তাছাড়া নিটোল সুন্দর শরীর।

আমরা সেই বিখ্যাত মূর্তিটি দেখলাম। আন্তোনিও অনেকগুলি ছবি তুলল।

আমি ওকে নিয়ে এসে দেখলাম বুদ্ধের সেই প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের স্থান। বললাম, কল্পনা কর, পূর্ণ এক যুবা পুরুষ তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অস্থিচর্মসার দেহ। শুধু তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল ঘিরে এক জ্যোতির বলয়। তিনি তাঁর সিদ্ধিলাভের ভূমি থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন। সে যাত্রা এসে থামল এইখানে। এখানেই তিনি তাঁর পঞ্চশিষ্যকে দীক্ষা দেবার জন্য ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। সামনের স্তূপটি ঐ স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্য পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছিল।

আন্তোনিও বলল, পড়েছিলাম, মার নাকি ওঁর তপস্যা ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল? মার কে?

পার্থিব ভোগ আর ইন্দ্রিয়ভোগের প্রতিমূর্তি বলতে পার। তাপসকে তাঁর সাধনার আসন থেকে তুলে দেবার জন্য বহু ছলনা করল মার। তিনি বিচলিত হলেন না। শেষে নিজের তিনটি অতি সুন্দরী কন্যাকে পাঠাল মার। তাদের একজনের নাম বাসনা, অন্যজনের নাম কামনা, তৃতীয় জনের নাম সম্ভোগ। তারা তপস্বীকে ঘিরে গান করতে লাগল। কখনো নূপুরের ঝংকার তুলে সন্ন্যাসীর চারদিক ঘিরে লাস্য-নৃত্য শুরু করল। কিন্তু সব লীলাই তাদের ব্যর্থ হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ডুবে গেলেন সাধনার আরও গভীরে।

পরাজিত হল মার। মাথা নিচু করে চলে গেল তপস্বীর সাধানার ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে।

আমি কথা থামালে আন্তোনিও বলল, এসব কথা আমার জানা ছিল না।

বললাম, যাঁরা বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কাছে এগুলো অজানা নয়।

এরপর তিব্বত, চীন আর ভারতের বুদ্ধ মন্দির ও মূর্তিগুলি দেখলাম। থাইল্যান্ডের মন্দিরে এখনও নানাধরনের কাজ চলছে। সব কটি মন্দিরের ধরনধারণ, সাজসজ্জা, মূর্তির গঠন অনেকটাই আলাদা। প্রায় সব কটিই উপবেশন মুদ্রায় ধ্যানী বুদ্ধ। মুখে করুণার হাসি। কোথাও দীপ জ্বলছে। ফুল সাজান রয়েছে বেদীতে। সবথেকে অবাক হতে হয়, মন্দিরের ভেতর বাইরের নীরবতা দেখে। কোথাও হুড়োহুড়ি কোলাহল নেই।

আন্তোনিও কত যে ছবি তুলল তার লেখাজোখা নেই।

কখনো তার নির্দেশে আমি দাঁড়াচ্ছি মন্দিরের গেটের সামনে। সেখানে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল নিয়ে দোল খাচ্ছে নাম-না-জানা লতা। আবার কখনো প্রণাম নিবেদন করছি তথাগতকে। কখনো বা নতজানু হয়ে মুগ্ধ চোখ মেলে দেখছি মন্দিরের গায়ে প্যানেলের কাজ।

শিল্পী ছবি তুলল নানা অ্যাঙ্গেল থেকে।

বললাম, সেবার আমার নাচের অসাধারণ কয়েকখানা ছবি তুমি পঠিয়েছিলে। কিন্তু তখন আমার বিয়ে হয়নি। আমরা তোমার পাঠানো ছবি আর তার পেছনে কোটেশানগুলো দেখে খুব উপভোগ করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিবাহিতা আন্তোনিও। তাই তোমার পাঠানো ছবি কিংবা চিঠি আমার স্বামী অন্যভাবে নিতে পারে। তুমি আমাকে এ ছবিগুলো না পাঠালে আমি একদিক থেকে যেমন দুঃখ পাব, অন্যদিকে তেমনি সাংসারিক ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

আন্তোনিও বলল, আমার আগের ছবিগুলো কি তুমি নষ্ট করে ফেলেছ?

ওগুলো আমার বাপের বাড়িতে রাখা আছে।

কিছু মনে কর না, একটি কথা জিজ্ঞেস করব।

অবশ্যই করবে।

তোমার স্বামী কি তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন?

আমি উদ্ভাসিত মুখে বললাম, একটুও না। তিনি আমাকে গভীরভাবে ভালবাসেন আর বিশ্বাসও করেন।

তাহলে আমার পাঠানো ছবিগুলো দেখলে তিনি সন্দেহ করবেন কেন?

আমি বললাম, ওটা আমাদের একটা সংস্কার। স্বামী স্ত্রীর ভেতরে কোনরকম গোপনীয়তা থাকবে না। তাদের অন্তরঙ্গ জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ।

এটা কি তোমরা সব সময় মেনে চল?

আমি এবার হেসে উঠলাম।

আন্তোনিও বলল, আমি কিন্তু এখনও আমার কথার উত্তর পাইনি।

বললাম, এই তো স্বামীর অবর্তমানে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বাঁধন যেমন আছে তার শিথিলতাও তেমনি আছে। আসলে আমরা সবাই ঘোড়-সওয়ার। ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে একমুখে চলেছি। কিন্তু এক এক সময় ঘোড়া বিগড়ে যায়। সে তার খুশি মত চলতে থাকে। রাশ টানলেও মানে না।

ঘোড়ার উপমা দিলে কেন?

সামাজিক সংস্কার, নিয়ম-কানুন আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সুযোগ পেলেই ও বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে। এটা কিন্তু সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। যে যার মনের গঠন অনুযায়ী।

সূর্যের তেজ কমে আসছিল। আমরা জাপানী মন্দিরটি দেখব বলে চলতে লাগলাম। চলতে চলতেই খাবারের প্যাকেট থেকে খাবার বের করে আমরা খেতে শুরু করলাম।

সব থেকে ভাল লাগল এই মন্দিরটি। শান্ত নির্জন পরিবেশ। সবুজ ঘাস ও নুড়ি বিছানো অঙ্গন। কবিতার মত সুন্দর দালান আর চূড়া লাগানো ঘর। ভেতরে তথাগত বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তি। স্বর্ণাভ পীতবাস পরে বসে ছিলেন এক সাধু।

জাপান ছবির মত একটি দেশ। আবার ছবি আঁকিয়েদেরও দেশ। সে দেশের শিল্পীরা ছবির ভেতর দিয়ে একটি নিটোল কবিতার জন্ম দেন। প্রতিটি গৃহ এক একটি শিল্প-মন্দির।

সামনে সবুজ শ্যাওলাকে নাড়া দিয়ে, নিচের নুড়িগুলোকে ঠেলতে ঠেলতে তির্‌তির্‌ করে বয়ে চলেছিল একটি ক্ষীণ জলধারা। তার ওপরে পারাপারের জন্য অতি ছোট্ট সাদা একটি সাঁকো।

প্রাঙ্গণের একটি কোণ থেকে কালচে-ধূসর কাণ্ডওয়ালা একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ তার ঝিরিঝিরি পাতাওয়ালা ডাল মেলে ধরেছিল মন্দিরের দিকে। অসময়েও গাছটা কিছু ফুল ফুটিয়েছিল বুদ্ধের চরণে নিবেদনের আশায়।

সূর্যের মধু-সোনালী আলো গাছের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছিল মন্দির সংলগ্ন একফালি সবুজ প্রাঙ্গণে।

কোন দামাল হাওয়া এক ঝটকায় একটি ফুলকে স্তবক থেকে খসিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। আমি ছুটে গিয়ে ফুলটি কুড়িয়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজলাম। অমনি কয়েকবার ক্যামেরায় ক্লিক হল।

ঘাড় ঘুরিয়ে হেসে তাকালাম, তাও ক্লিক্ হল।

মন্দিরের উঁচু বারান্দায় ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমাদের হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

আমরা তাঁর কাছে যেতেই প্রসাদ দিলেন। বললেন, আগে থেকে খবর দিয়ে এলে যে কোন স্বামীস্ত্রী আমাদের পাশের গেস্ট হাউসে জায়গা পেতে পারেন।

উনি হিন্দিতে কথা বলেছিলেন। আন্তোনিও কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পারেনি।

আমি বৌদ্ধভিক্ষুর ভুলটা আর ভাঙিয়ে দিলাম না। প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। লনের মাঝখানে জাপানের সম্রাটের একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। তাঁরই অর্থানুকূল্যে মন্দিরটি তৈরী।

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আন্তোনিও জানতে চাইল, পুরোহিত কি বলছিলেন? তোমাকে বুঝি আশীর্বাদ করছিলেন?

হেসে বললাম, উনি জানতে চাইছিলেন, তুমি আমার কে?

আন্তোনিও-ও হাসল। কি বললে, তুমি?

বললাম, বন্ধু। উনি সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা বললেন।

কি কথা?

স্বামীস্ত্রী ছাড়া আমাদের গেস্ট হাউসে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই।

তুমি কি থাকতে চেয়েছিলে?

এবার প্রবল বেগে মাথা নেড়ে জানালাম, একেবারেই না।

মাথার ঝাপটায় খোঁপার ফুলটা খসে পড়ে গিয়েছিল। ও সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আনাড়ি হাতে যত্ন করে পরিয়ে দিল।

আমরা মালভূমির মত প্রান্তরে অনেকক্ষণ হাতে হাত বেঁধে ঘুরলাম। আন্তোনিও তার ভ্রাম্যমাণ জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার গল্প করল। আমি রোমাঞ্চিত হলাম। কখনো বা দারুণ উপভোগ করলাম। হাসির কারণ ঘটলে প্রাণখুলে হাসলাম। প্রান্তরে সে হাসি প্রতিধ্বনিত হল। দূর দিগন্তে সবুজ বনের মাথায় উজ্জ্বল গোলাকার চাঁদ দেখা গেল।

আমরা চাদের আলো গায়ে মেখে ঐ ফাঁকা প্রান্তরে বসে পড়লাম।

তোমাদের দেশের ভাষায় একটা গান গেয়ে শোনাও আন্তোনিও। যারা গন্ডোলা চালায় তাদের গাওয়া কোন গান।

ও গান গাইতে পারবে না বলে অজুহাত দেখাল না।

অদ্ভুত সুরেলা গলায় গাইতে লাগল।

গান থামলে আমি হাততালি দিলাম। মুখে বললাম, অপূর্ব! কিন্তু গানের অর্থটি বুঝিয়ে দাও।

ও বলল, আমরা সমুদ্রে ঢেউ ভাঙি না। নগরে যে স্রোত বয়, সেই স্রোতে ভেসে বেড়াই। সমুদ্রে তুফান ওঠে, হাল ভাঙে পাল ছেঁড়ে। এখানে নগরবাসী তুফান তুলে কাজের জায়গায় যায়। তাদের মনে চলে ভাঙাগড়া, বসে বসে আমার এ নৌকায়। আমি গন্ডোলার মাঝি ভাই, এমন দেশ, এমন নৌকো আর কোথাও নাই।

সুরের শেষে মধুর একটা টান আছে।

আমাকেও গাইতে হল। গজল গাইলাম। তারপর একখানা ভজন। শেষে সিনেমার একখানা হিট প্রেমের গান গেয়ে ছাড়া পেলাম। মানেগুলো সব বুঝিয়ে দিতে হল।

বললাম, এবার ঘরে ফিরতে হবে।

কিসের এত তাড়া? আকাশে চাঁদ ভাসছে, ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে আমরা দুজন বসে আছি। ভারী মিঠে লাগছে হাওয়ার ছোঁয়া।

আরও কিছুক্ষণ হাতে হাত রেখে বসলাম। আমরা মুখে কোন কথা বলছিলাম না। মনে মনে অফুরন্ত পথ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিলাম।

একসময় বললাম, তোমার নেক্সট্ প্রোগ্রাম কি? কবেই বা বেনারস ছাড়ছ?

পঁচিশে হৃষিকেশ রওনা হয়ে যাব। তারপর গঙ্গোত্রীর দিকে। দেখি কতদূর যাওয়া যায়।

তুমি একাই যাচ্ছ, না সঙ্গীরা রয়েছে?

আমি একা একা ঘুরতেই ভালবাসি। আমি নিজের চোখে দেখি, নিজের মনে ভাবি। মানুষের ছবি তোলার সময় তাকে কোনভাবেই সচেতন করে দিই না।

বললাম, ভ্রমণে অন্তত একজন সঙ্গী পাশে থাকলে নিজের অনুভূতির কথাগুলো বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

আন্তোনিও হঠাৎ বলে উঠল, তোমার মত সঙ্গী পেলে অন্য কথা।

বললাম, কুড়ি দিন পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত, তারপর ঘোরতর সংসারী। তখন একেবারে কাজের ভেতর ডুবে যাওয়া।

ও সোজাসুজি বলল, গড়োয়াল-হিমালয়ের পথে আমি কি তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে পারি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টেনে তুললাম। মুখে বললাম, রাজি।

আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে আন্তোনিও বোঝালো, ও দারুণ খুশী হয়েছে।

বললাম, যাওয়ার একটিমাত্র শর্ত, খরচ আমার।

ও বলল, অবশ্যই।

আন্তোনিও এত সহজে প্রতিবাদ না করে রাজি হয়ে গেল দেখে আমার কেমন যেন একটু খটকা লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে আন্তোনিও নিজেই কথাটা পরিষ্কার করল।

এ যাত্রায় তুমিই তো আমাকে টাকা যুগিয়েছ।

অবাক হয়ে বললাম, কি রকম?

আন্তোনিও বলল, আমি যখন দেশে থাকি তখন চাকরি করি। চাকরির টাকাতে আমার থাকাখাওয়া, পোশাকআশাক সবই হয়ে যায়। যেটুকু বাঁচে সেটুকুতে আমার তিনচার বছরে একবার করে দেশভ্রমণের খরচ জোটে। গত বছর সাউথ ইস্ট এশিয়ার দেশগুলোতে ভ্রমণ করে এসেছি। এবার হাতে এমন রেস্ত ছিল না যাতে তোমাদের দেশে আসি। অবশ্য এ আমার দ্বিতীয় ভারত-দর্শন।

ও থামলে আমি বললাম, তাহলে কি করে জুটল?

তোমার যে ছবিগুলো তুলেছিলাম, তার কয়েকখানা এক বিখ্যাত নিউজ পেপারে অনেক টাকার বিনিময়ে বেচে দিলাম।

ঐ ছবি দেখে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল এক অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানী। বাকি ছবিগুলো অনেক দামে ওরা কিনে নিল। তাই বলছিলাম, এবারের ভারত-ভ্রমণ তোমার টাকাতেই চলছে।

হেসে উঠে বললাম, দারুণ ব্যাপার তো। আমি যে এতখানি মূল্যবান, তা জানার সৌভাগ্য আগে আমার হয়নি।

ও সিরিয়াসলি বলল, তুমি যে কোন নামী শিল্পীর চোখে মডেল হিসেবে অসামান্য।

তোমাদের দেশেও?

অবশ্যই।

মিকেলাঞ্জেলোর দেশের মেয়েরা কথাটা জানতে পারলে তোমার আর রক্ষে রাখবে না।

আমি তোমাকে ফ্ল্যাটারি করছি না। তোমার দেহের গড়ন আর মুখচোখের এক্সপ্রেশান অসাধারণ।

তোমার কম্প্লিমেন্টে আমি খুশী হলাম, কিন্তু দুঃখ পেলাম, খরচটা তুমি একা করবে বলে।

দরকার পড়লে চেয়ে নেব চতুর্বেদী।

আবার ভুল, আমি এখন বেদজ্ঞ।

সরি।

কলকাতায় ফোনে যোগাযোগ করলাম দিদির সঙ্গে।

আমি কদিন বেনারসের বাইরে যাচ্ছি।

কোথায়!

এই ধর হিমালয় দর্শনে।

দারুণ। কাদের সঙ্গে যাচ্ছিস রে?

একা কি আমি যেতে পারি না?

অবশ্যই। আর সেটাই তো সবথেকে বেশী এক্সসাইটিং। আমার গুড উইশ জানবি।

বাবা আর মা কোথায়?

দুজনেই আউট।

টুকাই?

কথা বল।

আমার টুকাই সোনা, আদরের চুলবুলি। হামি নাও।

আমি তোমার কোলে যাব না।

কেন সোনা?

তুমি দুষ্টু, খালি দুদুন খেতে বলল।

উঁ-হুঁ-হুঁ, আমি কাঁদব।

বল, আর আমায় দুদুন খেতে বলবে না।

তাহলে তুমি আসবে তো?

আসব।

হামি দেবে?

ওপার থেকে বিচ্ছুটা শব্দ করে হামি দিল।

ফোনটা এবার মাসিকে দাও তো সোনা।

দিদি বলল, সত্যি, একেবারে প্রোগ্রাম না ছকেই বেরুচ্ছিস?

আগে তো হরিদ্বারে পৌঁছই, তারপর মনোমত একটা প্রোগ্রাম ছকে নেব।

আমি তোর কাছে থাকলে সঙ্গী হতাম।

উঁহুঁ, অপোজিট সেক্স চাই। তাও অচেনা ভ্রাম্যমাণের সঙ্গে যাত্রাপথে আলাপ।

বুঝেছি, তোর যেন তেমন একটা জুটে যায়।

বাবা মা যেন ভাবনা করতে না বসে, আর আমার চিঠির জন্য অপেক্ষা না করে

চিঠি দিবি না?

কি দরকার। খুঁটির দড়িতে গলা বেঁধে ঘোরাতে আমি বিশ্বাসী নই।

ব্রেভো।

ছাড়ছি।

যাত্রা শুভ হোক।

দ্রুত গোছগাছ সেরে নিলাম। আমি খুবই হালকা মালপত্র নিয়ে বেড়াতে ভালবাসি। কিন্তু হিমগিরির দিকে যাচ্ছি বলে সুটকেসটা বেজায় না হলেও ভারী হয়ে গেল।

দুনে রিজার্ভেশন পেয়ে গিয়েছিলাম। ট্রেনের ধারে দুটো সিট। নিচে আর ওপরে দুটো বাংকে দুজন।

আন্তোনিওকে কিছু খেতে দিলাম, নিজেও খেলাম।

এক সময় বললাম, তুমি ওপরের বাংকে যাও, আমি নিচে আছি।

ও অমনি বলল, তুমি ওপরের বাংকে যাও, আমি নিচে আছি।

ও অমনি বলল, তুমি ওপরে গেলে তো ভাল ঘুমুবে। নিচে ঘুমের ডিসটার্ব হতে পারে।

আমি ট্রেনজার্নিতে সাধারণত জানালার ধারে বসে রাত কাটিয়ে দিই।

কেন, কি কর?

বললাম, অন্ধকারের রূপ দেখি।

বেশ, আজ তাহলে দুজনে এই নিচে বসেই অন্ধকারের রূপ দেখব।

বললাম, তোমার যদি কষ্ট না হয় তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ নেই। বরং উপভোগটা ভালই হবে।

আমরা সারারাত মুখোমুখি-সিটে নিচে বসে রইলাম।

অন্ধকারে এক এক জায়গায় ঘন গাছের জটলা। সেখানে অন্ধকার অনেক ঘন। হঠাৎ সেইসব গাছপালার ভেতর দিয়ে হীরের কণার মত জ্বলতে জ্বলতে এক ঝাঁক জোনাকি উড়ে গেল।

ট্রেন চাকার ঝংকার তুলে লোহার লাইনে শান দিতে দিতে ছুটে চলেছে।

দপ্‌দপ্ করে কাঠকুটোর লালচে-হলুদ আগুন জ্বলে উঠল।

আন্তোনিও জানতে চাইল, ওগুলো কি?

গরীব মানুষরা দিনের অনেক কাজ রাতেই সেরে রাখে। শস্যদানাকে বড় বড় পাত্রে জলের মধ্যে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে সেদ্ধ করে। কখনো বা প্রবল মশার কামড় থেকে গরুমোষদের রক্ষা করার জন্য আধভেজা খড়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। খুব ধোঁয়া হলে মশা পালায়।

বলতে বলতেই অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে এলো আলো-ঝলমল একটা শহর। কতক্ষণ ধরে দেখা গেল শত শত আলোর মালা। ট্রেন যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল ওগুলো রাতের আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি।

স্টেশন এগিয়ে এলো। লাট খেতে খেতে কয়েকটা আলো-জ্বলা দোকান-পাট নিয়ে পিছু হটে গেল। বড় কোন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালেই প্যাসেঞ্জারদের ত্রস্ততা, মালপত্র নিয়ে ওঠানামা, হুড়োহুড়ির ছবি ফুটে উঠছে। ক্লান্ত গলায় কোন চা বা কফিওলা রাতজাগা যাত্রীদের কাছে তার পানীয় সম্বন্ধে ঘোষণা করতে করতে চলে যাচ্ছে। দু'বার গাড়ি ভোঁ দিল। যারা হ্যান্ডেল ধরে প্ল্যাটপর্মে পা রেখে দাঁড়িয়েছিল তারা ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ভেতর।

ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এলো অন্ধকার। একসময় কৃষ্ণা তিথির চাঁদ জেগে উঠল আকাশে। ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল ঘাট, মাঠ, গাছপালা বাড়িঘর।

আন্তোনিও বলে উঠল, দেখ দেখ, গাছের নিচে একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, এদেশে মাঠ ঘাটে সকাল থেকে দলে দলে গরু চরে বেড়ায়। ঠিক সাঁঝ হলেই রাখালরা ওদের গোয়ালে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। দু'একটা গরু দলছুট্ হয়ে ঢুকে পড়ে বনবাদাড়ে।

ট্রেন লাইনের ধারে একটা জনবসতি। তারই মাঝখানে স্টেজ বেঁধে বোধহয় যাত্রাগান হচ্ছে।

আন্তোনিও বলে উঠল, ওখানে কি করছে ওরা?

লাল, সবুজ, হল্‌দে, সাদা টুনি বাল্‌ব দিয়ে সাজানো হয়েছে দেহাতি মানুষজনদের সাধারণ মানের একটি স্টেজ। জেনারেটার চলছে, কয়েকটা বড় বড় আলোও জ্বলছে। কয়েকজন কুশীলব স্টেজে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন হাত পা নেড়ে বিক্রম প্রকাশ করছে।

বললাম, গাঁয়ের চাষাভূষো মানুষরা থিয়েটারে মেতেছে। সারাদিনের খাটুনির পরেও ওরা মজে আছে এইসব ছোটবড় আনন্দ নিয়ে।

জানালা খুলে রেখেছি। হু হু করে হাওয়া বয়ে আসছে। বুক ভরে সে হাওয়া টানছি। আমার দেশের গাছপালা মাটি মানুষের গন্ধ মেশা হাওয়া।

ভোরবেলা গাড়ি পৌছল হরিদ্বারে। এখানে সকালবেলার ঠাণ্ডা বেশ জানান দিল। পাহাড় ছুঁয়ে, গঙ্গার জল ছুঁয়ে হাওয়া বইছিল।

গঙ্গার ধারে একটা ভাল হোটেলে রুম নেওয়া হল। কিছু মিথ্যাচার করতে হল নাম আর রিলেশানের ব্যাপারে।

তোমার কাছে কোন কিছু গোপন করে রাখতে চাই না অমলাভ। যা সত্য তা কঠিন হলেও অনাবৃত হোক।

সন্ধ্যায় গঙ্গার খরপ্রবাহে পাতা আর ফুলের পাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসালাম। তোমার আর টুকাইয়ের মঙ্গল কামনায় সে প্রদীপ ভাসল। এই বিপুল স্রোতধারা চোখের পলকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল সেই আলোর ফুল।

ক্লান্ত ছিলাম। আগের রাতে ঘুমোইনি ট্রেনে। তাই তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট চুকিয়ে একটা ডবল বেডেড রুমে দুজনে শুয়ে পড়লাম।

আন্তোনিও দু'একটা কথা শুরু করেছিল। আমার কানে তা পৌছালেও মগজে ঢুকল না। তার আগেই গাঢ় ঘুমের ভেতর ডুবে গেলাম।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। আন্তোনিও ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনতলার লম্বা বারান্দার একটি কোণায় বসে ভোরের গঙ্গা দেখছে।

আমি ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

খুব তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, ড্রেস চেঞ্জ করে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ওর কাছে গিয়ে বললাম, সরি আন্তোনিও, আজ তোমার বেড-টি ঠিক সময়ে পেলে না।

ও নিচে রাখা কাপটা দেখিয়ে বলল, আমি ঠিক সময়ে এর সদ্‌ব্যবহার করেছি। তুমি আর একখানা চেয়ার টেনে বস, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা করছি।

বাধা দেবার আগেই ও নেমে গেল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই বেয়ারাকে নিয়ে ঢুকল আন্তোনিও। দু'কাপ চাপ আর প্লেটে কিছু বিস্কুট।

আমরা চা খেতে খেতে প্ল্যান ছকে নিলাম।

এখান থেকে দশ দিনের জন্য একটা ট্যাক্সি ভাড়া করব। ঐ ট্যাক্সিতে আমরা হৃষিকেশ ছুঁয়ে চলে যাব উত্তরকাশী। রাত কাটিয়ে পরের দিন পাড়ি দেব গঙ্গোত্রীতে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে গোমুখ। সম্ভব হলে ঘুরে আসব তপোবন।

হরিদ্বার থেকে আমি ট্রেনে ফিরব কলকাতা। ওখানেই পিত্রালয়ে ষোলই সেপ্টেম্বর পুনর্মিলন হবে স্বামী স্ত্রীর ভেতর।

এদিকে আন্তোনিও ঐ ট্যাক্সি নিয়েই পাড়ি দেবে দিল্লী। সেখান থেকে একদিনের পর ফিরে যাবে স্বদেশে।

হোটেলের বিল চুকিয়ে আমরা প্রথমেই এলাম রেলওয়ে রিজার্ভেশান কাউন্টারে। বরাত জোরে একটি এ. সি. কোচে রিজার্ভেশান পেয়ে গেলাম।

এবার একটি ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে দরদামের পালা চুকল। আমরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে। ড্রাইভার তার ডেরায় ছুটল ধড়াচূড়া আনতে।

যথাসময়ে গাড়ি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। গাড়োয়ালের পর্বত, অরণ্য, নদী, প্রান্তরের একটা নিবিড় গভীর সৌন্দর্য আছে। যেদিকে তাকাই চোখ আর ফেরাতে পারি না। বর্ষার পর ধারাস্নানে সিক্ত অরণ্য শ্যামল হয়ে উঠেছে।

পাহাড়ের উঁচু ঢাল থেকে পর পর তরঙ্গের মত নেমে গেছে টেরাস চাষের জমি। মল মল করছে সবুজ শস্যেভরা প্রান্তর।

হৃষিকেশ, নরেন্দ্রনগর, ধারাসু ছুঁয়ে ট্যাক্সি যখন উত্তরকাশীতে পৌঁছল তখন পশ্চিম আকাশে বেলাশেষের আয়োজন। দুটো ট্যুরিস্ট লজই আমাদের নিরাশ করল। একটি গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের যাত্রীতে ঠাসা। অন্যটিতে ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে দিল্লীর দুটি কলেজের ছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছে।

অবশেষে বাজারের ধারে একটি হোটেল মিলল। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। একটি ছোট ঘরে একটিমাত্র শয্যা। পাশে এমন জায়গা নেই যাতে একটা খাট ঢোকাই।

আমার অস্বস্তি বুঝল আন্তোনিও। সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, কেন এত বিচলিত হচ্ছ বেদজ্ঞ, তোমার ভাবনার কিছু নেই।

কিন্তু সমাধানের সূত্রটা জানতে না পেরে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, নিচে একজনের শোবার মত বেশ খানিকটা জায়গা আছে। এক্সট্রা দুখানা কম্বল পেলে ভাল হয়, না হলেও ক্ষতি নেই। এতেও তোমার স্থান সমস্যা হলে আমি ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের সঙ্গে দিব্যি রাতটা কাটিয়ে দেব।

বললাম, আমাকে এতখানি অবিবেচক ভাবছ কি করে। চল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কিছু খেয়ে নিই। এখানে শীত বেশ জানান দিচ্ছে।

রাত নামলে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা শোবার আয়োজন করলাম। আমি শুতে চাইলাম নিচে। তা কি হয়। আমাকে বিছানার ওপর তুলে তবে ও নিশ্চিন্ত। কম্বল দুটো হলেই চলত, তার জায়গায় তিনটে এসে গেল। আন্তোনিও দুটো কম্বল দিয়ে এলো ড্রাইভারকে। ওর নিজের একটা দামী স্লিপিং ব্যাগ আছে। ও আমাকে অবশিষ্ট কম্বলখানা দিতে চাইল।

আমি বললাম, ডানলোপপিলোর বিছানায় শুয়ে দুটো মোটা কম্বল গায়ে চাপিয়েছি, আর একখানা চাপালেই দম বন্ধ হয়ে আসবে। ওটা স্লিপিং ব্যাগের ওপরে তুমি ঢেকে নাও।

তথাস্তু। বাধ্য ছেলের মত ওটা নিয়েই ও শুলো। কিছু পরে ওর একখানা হাত এগিয়ে এসে আমার ঝুলে পড়া হাতখানাকে স্পর্শ করল।

আমি হাতখানা সরিয়ে নিলাম না, কিন্তু ঐ শীতেও ঘামতে লাগলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, হে ঈশ্বর, হে মহেশ্বর আমি যেন দুর্বল হয়ে না পড়ি।

আশ্চর্য! এতখানি সংযমও কি একজন যুবকের থাকতে পারে!

সম্ভবত আমাকে নিশ্চেষ্ট আর অনুত্তেজিত দেখে ও কোনভাবেই আর অগ্রসর হল না।

দ্বিতীয় রাত্রিটিও কাটল নির্বিঘ্নে।

ভোর হতে না হতেই তৈরী হয়ে নিলাম। গাড়ি ছুটে চলল উঁচু নিচু পাহাড়ী পথে। পাহাড়ের গায়ে নানা রঙের তারা ফুল উঁকি দিচ্ছে। আমরা যে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছি তার নিচেই অপ্রশস্ত এক উপত্যকা। তার ঠিক পরেই উঁচু শ্যামল পাহাড়ের সারি। সেই সব শৈল-শিরায় সুশৃঙ্খল সৈনিকের মত সিধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি পাইন গাছ।

একটা বাঁকের মুখে এসে ট্যাক্সি জোরে ব্রেক কষল। আমি টাল সামলাতে না পেরে ওর ওপর আছড়ে পড়লাম। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে হেসে সোজা হয়ে বসলাম।

আন্তোনিও উত্তেজিত হয়ে বলল, দেখ দেখ।

বলতে বলতেই ও ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে ক্লিক্ করতে শুরু করে দিল।

ধবধবে সাদা একপাল ভেড়া। পেছনে ছোট ছোট লাঠি হাতে দুজন মেষচারক। একজন প্রবীণ,

অন্যজন কিশোর। সামনে হঠাৎ গাড়ি ব্রেক কষায় ভেড়াগুলো ঢেউয়ের ফেনার মত এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। দুটো কুকুর ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ আওয়াজের সঙ্গে ওদের তাড়া করতে করতে সিধে লাইনে নিয়ে এলো। অপূর্ব দৃশ্য!

পেরিয়ে গেল পুরো দলটা।

ক্যামেরা খুলে ফিল্ম ভরছিল আন্তোনিও। বললাম, ইস্ পুরো দৃশ্যটা বুঝি তোলা হল না?

হাঁ, বেশ কয়েকটা তুলেছি। কেবল ব্যাক থেকে দু'একটা সট্ নিতে পারলাম না।

আর কোন ক্যামেরা নেই?

ব্যাগের ভেতর রয়েছে। ওটা বের করতে করতেই অদৃশ্য হয়ে যাবে পুরো দলটা।

আমরা গঙ্গোরী, ভাটোয়ারী পেরিয়ে গঙ্গানীতে হাজির হলাম। পাহাড়ী এলাকার শীতলতার সঙ্গে সূর্যের উপচে পড়া উষ্ণতা মিশে আরামদায়ক একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরে।

গাড়ি থামিয়ে গঙ্গানীতে রুটি, ডাল আর সব্‌জি খেয়ে নিলাম। আন্তোনিও দুহাতে রুটি ধরে কামড়ে কামড়ে খেল।

খেতে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে আন্তোনিও।

আমি দুনিয়া ঘুরে বেড়াই। সবরকম অভ্যেস আছে আমার। তুমি একটুও চিন্তা করবে না।

বললাম, এ অঞ্চলগুলোকে বলতে পার দেবলোক। এখানে আহারে বিহারে সংযম চাই।

ও মাথা নেড়ে আমার কথায় সমর্থন জানাল।

এরপর গাড়ি সুখী ছুঁয়ে হরশিল এল। এখানে গাড়ি থেকে নেমে কয়েকখানা ছবি নিল আন্তোনিও।

হরশীল জনপদটি সত্যি অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরা। বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে শিরা উপশিরায় বিভক্ত করে বয়ে চলেছে ভাগীরথীর স্রোতধারা। সমতল ক্ষেত্রের কোথাও কোথাও পলি পড়ে সৃষ্টি হয়েছে চর। আঁকাবাঁকা জলের ধারায় তখন পড়েছিল প্রথম অপরাহ্নের মায়াভরা আলো। আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করলাম। কারু মুখে কোন কথা ছিল না।

এরপর গাড়ি লংকা ছুঁয়ে ভৈরবঘাটির ব্রিজ পেরিয়ে চলে এল গঙ্গোত্রীর পথে। ভৈরবঘাটির কাছের কিছু সময় দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। এখানে জাহ্নবীর নীল জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভাগীরথীর গৈরিক প্রবাহে। ঘন পাইনের মধ্যে পর্বত বিদীর্ণ করে মহাকল্লোল তুলে চলেছে নদী।

আন্তোনিও বলল, পৃথিবীর বহু জায়গায় আমি ঘুরেছি, কিন্তু এমন সৌন্দর্যেভরা গিরিখাতের দৃশ্য আমি আর দেখিনি।

গঙ্গোত্রীর ট্যুরিস্ট বাংলোতে জায়গা পেলাম। সন্ধ্যায় গঙ্গার মন্দিরে আরতি দেখে হোটেলে ফিরে এলাম।

সে রাতে আমরা পাশাপাশি বিছানার ওপর বসে দুজনের জীবনের অনেক গল্প করলাম আর গভীর আগ্রহে শুনলাম। অবশ্য অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আন্তোনিওর, সে তুলনায় আমার পুঁজি অতি সামান্য।

আন্তোনিও খুবই সাধারণভাবে জীবন কাটায়। কিন্তু জানলাম, ও বাবা মার একমাত্র সন্তান। বাবা মস্ত বড় বিজনেসম্যান। প্রথমে ওর বাবা ওকে নিজের ব্যবসার ভেতর টেনে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওর টেম্পারামেন্টের সঙ্গে ব্যবসাকে কোন রকমেই খাপ খাওয়ানো গেল না। তখন আর কি করা যায়। ভিন্নমুখে চলতে লাগল বাপ ছেলেতে।

অর্থে অদ্ভুত নিরাসক্তি দেখে আমার শ্রদ্ধা গভীর হল আন্তোনিওর ওপর।

রাত তখন বেশ গভীর হয়েছে। ও হঠাৎ আমার দিদির ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

আচ্ছা বেদজ্ঞ, তুমি বলছ তোমার দিদির বিয়ে হয়েছিল গভীর ভালবাসা আর জানাজানির পর। আমার কিন্তু মনে হয় ওদের ভালোবাসার ভেতর সত্যিকারের গভীরতা ছিল না। কোথাও কিছু ফাঁকি ছিল।

তুমি যা বলতে চাইছ, একটু বুঝিয়ে বল আন্তোনিও।

কোন জিনিস গভীর হলে সহসা তার থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। যে ভালবাসার বাঁধন হৃদয়টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে তাকে ছিঁড়তে গেলেই বুকের তন্ত্রীতে টান পড়বে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমার মুখে এমন দার্শনিক কথাবার্তা শুনব, তা আশা করিনি। আজকের পাশ্চাত্যের মানুষদের জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাই আলাদা। তুমি কি ওদের বাইরে নাকি।

ও হেসে বলল, হাওয়ায় শুকনো পাতাই ওড়ে। শক্ত হয়ে মূল গাছের সঙ্গে যে পাতা জড়িয়ে থাকে সে ওড়ে না। এটা যে যার প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য বলে আলাদা কিছু নেই।

একটু থেমে থেকে ও বলল, এখন তোমার দিদির কথাই হোক্। তোমার দিদি কি করে প্রথমে আঁচ করলেন যে তাঁর স্বামী তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন?

তুমি বিয়ে করলেই বুঝতে, স্বামী স্ত্রীর ভেতরে একটা উত্তাপ থাকে। দুজনের শরীর আর মন সে উত্তাপ ছড়ায়। একজনের কিছু ঘাটতি থাকলেই অন্যজন তা বুঝতে পারে। যে কোন একজনের শীতলতা অন্যজনকে আঘাত করে তীব্রভাবে। তার জীবনের ভারসাম্যটাই নষ্ট হয়ে যায়।

আন্তোনিও বলল, তোমার ভগ্নীপতির সরে যাবার কারণ?

মানুষটি অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রতিভাবান। এই বয়সে আন্তর্জাতিক একটি কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

আন্তোনিও বলল, কর্মের জগতে খুবই কৃতি সন্দেহ নেই।

আর তার ফলেই সংসারের কাছে দেয় তার বরাদ্দ সময় কমে গেল। দিদি বিচলিত হয়ে পড়ল।

তোমার দিদি কি তাঁর স্বামীর উন্নতি চাননি?

অবশ্যই চেয়েছিল। কিন্তু নিজের জীবনের বঞ্চনার বিনিময়ে নয়। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর স্বাভাবিক একটা প্রাপ্তি আছে। সেটাতে ঘাটতি দেখা দিলেই সইতে পারে না কোন স্ত্রী।

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, শরীর বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী একই দেহ-সম্ভোগে ক্লান্তি আসতে পারে। তখন মানুষ অন্য কোন উত্তেজনার আশ্রয় খোঁজে। কর্মক্ষেত্রে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চায়, অথবা নতুন কোন নারীর সান্নিধ্য।

তোমার বিশ্লেষণে যুক্তি নেই, এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারব না। অন্তত আমার দিদির ক্ষেত্রে তোমার বিশ্লেষণ কিছুটা সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে।

আন্তোনিও তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সে আমার মুখ থেকে আরও কিছু শুনতে চায়।

বললাম, কর্মজীবনে উন্নতির শিখরে প্রতিভাবান মানুষ মাত্রেই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তার এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক বলে আমি মনে করি। এর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের তৃপ্তি অতৃপ্তিকে নাইবা জড়ালাম। তবে আমার দিদির স্বামী জড়িয়ে পড়েছে তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে। মহিলা অতি সুন্দরী। শুনেছি, বিপুল অর্থ দিয়ে তাকে পুষছে কোম্পানী।

এই অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে মহিলাটিকে যে বেঁধে রাখা হয়েছে, তা কি কেবল তোমার ভগ্নীপতির ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য?

তা কি করে বলি। শুনেছি, ওকে টোপ ফেলে কোম্পানীর বহু কাজ হাসিল করা হয়।

তবে তোমার দিদি রাগ করে চলে এলেন কেন? ঐ মেয়েটিকে পোষা হয়ত কোম্পানীর একটা কৌশল। তোমার ভগ্নীপতি সর্বোচ্চ পদে আছেন বলেই তাঁকে এ কাজটা হাতে-কলমে করতে হচ্ছে।

তুমি দেখছি আমার মায়ের মতই ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করছ। কিন্তু ...।

কিন্তু কি?

মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ওয়ার্লড্ ট্যুর করে বেড়াচ্ছে। থাকছে একই হোটেলে।

অমনি হেসে উঠল আন্তোনিও। বলল, তাহলে আমরাও তো অপরাধী। একই হোটেলের একই রুমে থাকছি।

আমরা বন্ধু। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব আমাদের।

ওরাও কিন্তু কোম্পানীর স্বার্থেই মিলিত হয়েছে একসঙ্গে। দেহের প্রয়োজনটাকে এখানে তোমরা বড় করে দেখছ কেন?

এবার রসিকতা করে বললাম, আমার ভগ্নীপতি আমাদের এই ডায়লগগুলো শুনতে পেলে তার পক্ষে সওয়াল করার জন্য তোমাকে অনেক ফি দিয়ে নিয়ে যেত।

ও আমার হাতখানাতে নাড়া দিয়ে হেসে উঠল।

এবার বল, তোমার দিদির ছেলের কি খবর?

তার বাবা তার চারদিকে ইদানিং একটা ডিজনিল্যান্ড তৈরী করে দিয়েছে। ছেলে তাই পেয়ে মা ভুলেছে। এখন চোখের জলের বন্যায় ভাসছে মা।

তোমার দিদি কি খুব সেন্টিমেন্টাল?

দারুণ। বাবা আর দিদি একই স্বভাবের।

তোমার বাবা কি করেন?

তোমার বাবার মতই বিজনেসম্যান।

কিসের বিজনেস তা জানতে পারি কি?

জুয়েলারী। এটা আসলে আমার মা পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। এখন মা বাবা দুজনেই দেখাশোনা করছেন।

তোমাদের দেশের মেয়েরা অনেক অনেক জুয়েলারী পরতে ভালবাসে। আমি দু'দুবার এসে দেখলাম। ছবিও তুলেছি অনেক। ডিজাইন থেকে মণিমুক্তার সেটিং অসাধারণ।

আমাদের গয়নার ডিজাইন যিনি করেন তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। তাঁকে আমরা বিরজুকাকা বলে ডাকি। বিজনেস যখন আমার দাদামশায়ের হাতে ছিল তখনই তিনি ডিজাইনার হিসেবে কাজে ঢোকেন। তখন বিরজুকাকা তরুণ যুবক। অতি সৎ আর আদর্শবাদী।

তাঁর ডিজাইনে গয়না তৈরী হয়ে যাবার পর তিনি প্রতিটি গয়না মার হাতে তুলে দেন।

তোমার মা এত গয়না নিয়ে কি করেন?

ঠিকমত সাজসজ্জা করে বিরজুকাকার নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে দাঁড়ান। বিরজুকাকা নানা দিক থেকে অনেকক্ষণ দেখতে থাকেন। পছন্দ হলে গয়নাটি শো-কেসে যায়, তার আগে নয়।

তোমার মা তাহলে মডেল হয়ে দাঁড়ান?

দোকানটা আমার মায়ের, আর মায়ের বিয়ের আগে থেকেই এই রীতিটি চলে আসছে। মায়ের বিয়ের গয়নার সেট বিরজুকাকার ডিজাইনেই তৈরী।

উনি কোথায় থাকেন?

আমাদের জুয়েলারী সপ সংলগ্ন একটি কোয়ার্টারে।

সপরিবারেই ওখানে থাকেন?

ওকে হাতে হাল্কা একটা ঠ্যালা দিয়ে বললাম, তোমার মত ব্যাচলার।

তাহলে তো আমরা একই পথের যাত্রী।

তোমার পথ বিরজুকাকার পথের থেকে বেঁকে যেতে পারে, কিন্তু বিরজুকাকার আর বাঁকার সম্ভাবনা নেই।

আমার রসিকতাটি উপলব্ধি করে ও আমার মাথাটা নেড়ে দিল।

আমি বললাম, ছেলেবেলায় যখন বেনারসে থাকতাম তখন বিরজুকাকা আমাদের গঙ্গাস্নান করিয়ে আনতেন। আমাদের যা কিছু চাওয়া সব ঐ কাকার কাছে। বাবা, ছোটভাই বা বন্ধুর মত ব্যবহার করেন বিরজুকাকার সঙ্গে। কাকা মাইনে যা পান সব খরচ করেন আমাদের পেছনে। এখনও আমাদের ভাবেন সেই ছোট দুটি মেয়েই আছি। সুখে দুঃখে বিরজুকাকা ছাড়া আমরা ভাবতেই পারি না।

আমি সাধারণতঃ চুপচাপ থাকতে ভালবাসি, কিন্তু এই ভ্রমণে আমাদের যেন কথায় পেয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ বিরজুকাকার কথা বলে আমি চুপ করে গেলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রণাম করে

আসার পর মনের ভেতর যে প্রশান্তি নামে কাকার কথা বলার পর সেই আবেশ নেমে এল আমার মনে।

আমি কথা শেষ করে বসে রইলাম উদাস চোখ মেলে। ও কথা বলে আমার মগ্নতাকে ভাঙল না।

একসময় আমি মুখ তুলে বললাম, শোবে না আন্তোনিও?

ও বলল, জানালার ওপারে যে প্রপাতটা পাথরের কুণ্ডে অনন্তকাল ধরে ঝরে পড়ছে, ওটার শব্দ যেমন কোনদিনই পুরনো হয় না ঠিক তেমনি তোমার বিরজুকাকার গল্পও কোনদিনই পুরনো হবার নয়।

পরের দিন গাড়ি গঙ্গোত্রীতে রেখে পায়ে হেঁটে গোমুখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। প্রথমে পাইন বন পেরিয়ে অপরিসর পথে এগোতে লাগলাম। পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা। আমরা সাবধানে পার হলাম। ও দরকার মত আমার হাত ধরে টেনে সাহায্য করল। ওর রুকস্যাকে ভরে নিয়েছিল আমার যত মালপত্র। হাল্‌কা দু'চারটে গরম পোশাক ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই।

কোথাও পথ সামান্য চওড়া, কোথাও-বা একেবারে সংকীর্ণ। ডাইনে গভীর গিরিখাত, তারই ভেতর দিয়ে পাইন বনকে গান শোনাতে শোনাতে ছুটে চলেছে ভাগীরথী। চিরবাসের কাঠের পুলটি দেখা যাচ্ছিল। ওপারে পাইন বনের ভেতরে ট্যুরিস্ট লজ।

হাঁটতে হাঁটতে থেমে গিয়ে ও পেছন দিকে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, থাকবে নাকি এখানে?

বললাম, ভারী বোঝা নিয়ে তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

একটুও না। এ অভ্যেস আমার অনেকদিনের।

তবে চল, একেবারে ভুজবাসে গিয়েই রেস্ট নেব।

কোন কোন জায়গায় বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড পথের দিকে ঝুঁকে আছে। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ও হঠাৎ পথের ধারে রুকস্যাক নামিয়ে রেখে পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠে গেল। একটা খাঁজ থেকে কি যেন তুলে নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতেই নেমে এলো নিচে।

আমি ওর নামার কায়দা দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ও অবলীলায় নেমে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। হাতে অপূর্ব নীল রঙের একগুচ্ছ পাহাড়ী ফুল। আমার দিকে ফুলের গুচ্ছটি তুলে ধরে বলল, দেখতো কে বেশী সুন্দর?

আমি ফুল কটি খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বললাম, কার সঙ্গে কার তুলনা! শ্রেষ্ঠ যে তাকে শিরে রেখে দিলাম।

ভুজবাসে যখন এসে পৌঁছলাম তখন মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে।

বাঁয়ে লালবাবার টিনের চালার আশ্রম তার একটু দূরে জি. এম. ভি. এন.-এর ট্যুরিস্ট বাংলো।

কোথাও গাছপালার চিহ্ন নেই। বাঁয়ে নেড়া পাহাড়ের সারি। ডাইনে তীব্রবেগে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে অপরিসর ভাগীরথী।

সামনে তুষার পাহাড় নীল আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাইনে ভাগীরথীর ওপারে মাথা তুলে সূর্যস্নান করছে তুষার কিরীট শিবলিঙ্গ।

এতখানি পাহাড়ী পথ ভারী বোঝা নিয়ে পার হয়ে আসার পরেও আন্তোনিও আগে মাথায় গোঁজার ঠাঁই না খুঁজে পাগলের মত ছবি তুলতে লেগে গেল।

আমার পিছে রুকস্যাক চাপিয়ে দিয়ে শিবলিঙ্গকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে ছবি তোলা হল।

আমি বললাম, কষ্ট করে যখন এতখানি পথ এসেছি তখন আরামের ডাকবাংলোতে না থেকে লালবাবার গণসেবাশ্রমেই থাকব।

ও মাথা নেড়ে আমাকে পূর্ণ সমর্থন জানাল।

টিনের চালার তলায় কয়েকজনের সঙ্গে একখানা ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলাম। ঢালাও খিচুড়ির ব্যবস্থা। চায়ের জল বিরাট হাঁড়াতে সবসময় ফুটছে।

গঙ্গামাঈয়ের প্রতিকৃতিতে প্রণাম জানিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ খেয়ে নিলাম।

বাবাজীর পরামর্শে আমরা দুজন সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম গোমুখ দর্শনে।

কয়েক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা অবশেষে এসে পৌঁছলাম গোমুখে। শেষ পথটুকু চুনের চিহ্ন দেখে চিনে নিতে হল। বড় বড় শিলাস্তূপ ধরে ধরে, পায়ের তলার বিপদজনক নুড়ি পাথর সামলে আমরা নিচে নামলাম। বরফ ছুঁয়ে বয়ে আসা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে ঝাপটা মারছিল। আমরা একেবারে মুখ-গহ্বরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ের মাঝে প্রকৃতির সৃষ্ট এই গুহামুখ। বহুদূর থেকে তুষারগিরির হিমপ্রবাহ নেমে এসে ঐ গুহামুখ দিয়ে বরফমেশা জল হয়ে বেরিয়ে আসছে।

ভাগীরথীর জল স্পর্শ করে মাথায় ছোঁয়ালাম। ঐ জলে আঙুল ডুবিয়ে নিয়ে বিদেশী বন্ধুর কপাল আর মাথায় বুলিয়ে দিলাম।

ও কোন প্রশ্ন না করেই আমার ক্রিয়াকর্মগুলো মাথা পেতে মেনে নিল।

বললাম, এই সেই গঙ্গার উৎস, যাকে তুমি দেখেছ হরিদ্বারে, বেনারসে, কলকাতায়। গঙ্গা আমাদের দেবী, আমাদের মা। আমরা মা গঙ্গার পুজো করি। ফুল ভাসাই, দীপ জ্বালাই। প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করি। আমরা এই জল ব্যবহার করি জন্ম, মৃত্যুর মাঝখানে সবরকমের পবিত্র কাজে।

আমার মনে হল আন্তোনিওর ভেতর গভীর একটা মন লুকিয়ে আছে। ওর উপলব্ধি বেশ স্বচ্ছ। কোথায় তর্ক না করে নম্র হতে হয় তা ও জানে।

আমার বার বার মনে হতে লাগল, এমন একজন সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ও নিজে শিল্পীতাই আমার শিল্পী মনটাকে ও জাগিয়ে তুলল।

আমি দূর থেকে মাঝে মাঝে যেন একটা বাঁশির ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার সমস্ত দেহজুড়ে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলা করছিল। আমার পায়ের নূপুর বাজছিল। আমি সেই বাঁশিওয়ালাকে খুঁজে ফিরছিলাম।

কি ভাবছ?

এক শিল্পী বন্ধুর কথা।

তোমার বুঝি কোন শিল্পীবন্ধু রয়েছে বেদজ্ঞ।

আমি হাসিমুখে ওর হাত ধরে বললাম, চল আশ্রমে ফিরি, সন্ধ্যা নামে।

আন্তোনিও আমার হাতের উষ্ণতায় তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম তপোবনের উদ্দেশ্যে। রাতে আশ্রমের এক সাধুর কাছ থেকে পথের নিশানা জেনে নিয়েছিলাম।

আমরা গোমুখের পথেই আবার এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়েই বাঁদিকের একটা পথ ধরলাম। পথটি বেশ সংকীর্ণ। ঐ পথে উঠেই পেয়ে গেলাম ভাগীরথী হিমবাহ।

আন্তোনিও হিমবাহের দক্ষিণ দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ তো সেই ঝর্ণা। কি যেন ওর নাম ...।

আকাশগঙ্গা।

হাঁ হাঁ, ওরই ধার দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

এবার হিমবাহ পার হয়ে এলাম। তারপর বেশ কয়েকটা পাথরের চাঁই পেরিয়ে পেয়ে গেলাম সাধুবাবার বর্ণনা মত সেই খাড়া পাহাড়। ঐ পাহাড়ের গা বেয়ে পিছল পথে ওপরে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ও মাঝে মাঝে সাহায্য করছিল আমার হাত ধরে।

দুপুর নাগাদ শেষ হল আমাদের ঐ কষ্টকর আরোহণ-পর্ব।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম চাই। আমাদের মালপত্র রেখে এসেছি আশ্রমে। সঙ্গে কেবল ওর একখানা স্লিপিং ব্যাগ, দুটো দামী কম্বলের সঙ্গে জড়ানো।

দুজনে গালচের মত পুরু সবুজ তৃণভূমির ওপর পাশাপাশি টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

এখনও কিছুটা পথ পার হতে হবে।

ওঠ আন্তোনিও।

ও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমরা কিছুটা উঁচুনিচু পথ পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম তপোবন।

কিছুটা নিচে নেমে এসে দাঁড়ালাম তপোবনের সবুজ উপত্যকায়। বিস্তীর্ণ সবুজ ছাওয়া প্রান্তর। পেছনে তুষার মৌলী শিবলঙ্গি। পর্বতের পাদদেশ বিধৌত করে সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়েবয়ে চলেছে অমরগঙ্গা।

দুটি প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে এখানে। সাধুরা সাধনভজন করেন।

আমরা আরও খানিকটা ওপরে যাব। ওখানে নাকি এক সাধুমহারাজ ছোট্ট একটি যাত্রী-নিবাস করে রেখেছেন।

অবশেষে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে আমরা সাধু মহারাজের দর্শন পেলাম।

তিনি আমাদের দেখে কিছুটা বিব্রত হয়ে বললেন, জরুরী দরকারে আমাকে এখুনি নিচে নেমে যেতে হচ্ছে। আমার এখানে সবকিছু পাবে। চাবির বালাই নেই। খানাপিনা কর, বিশ্রাম নাও আর গিরিরাজকে দুচোখ ভরে দেখ।

ওঁকে নত হয়ে প্রণাম করলাম। উনি আশীর্বাদ জানিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

কৃষ্ণা রজনীর গাঢ় রাত্রি নামল। সহস্র সহস্র চোখ মেলে নক্ষত্রেরা দেখতে লাগল আমাদের। চারদিকে তুষার-শীতল নীরবতা।

খাবার পর্ব অনেক আগেই চুকে গিয়েছিল। আমরা ঘুমোবার কোন চেষ্টা করিনি।

পাশাপাশি বসে আছি দুজনে। মুখে কারো কথা নেই। বিরাট বিশালের আশ্রয়ে এলে বুঝি সব কথা স্তব্ধ হয়ে যায়।

নিবিড় অন্ধকারে দুজনের অবয়বই হারিয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা বাঁশি বেজে উঠল। আমি শিউরে উঠলাম! কে বাজায়!

গত সন্ধ্যায় গোমুখে ভাগীরথীর কূলে দাঁড়িয়ে আমি এমনি একটা বাঁশির শব্দ শুনেছিলাম। আমার নূপুর সেই বাঁশিওয়ালার কাছে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওটা ছিল আমার মনের একটা কল্পনা।

আন্তোনিও, শুনতে পাচ্ছ?

সাড়া নেই।

ওর খোঁজে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু আন্তোনিও নেই। কখন ও নিঃশব্দে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। এই নিরেট নিরন্ধ্র অন্ধকারকে টর্চ জ্বেলে ছিঁড়ে দিতে চাইলাম না। আমি ঐ পাগল করা বাঁশির সুর শুনতে লাগলাম।

বাঁশিতে এত কান্না কি করে ঝরে! আমার মনে হল সারা হিমালয়ের গলিত ধারা ঐ একখণ্ড বাঁশির ছিদ্রপথে গলে ঝরে পড়ছে।

আমি আর ঐ ছোট্ট চারদেয়ালের ঘরখানাতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম বাইরে।

বাঁশি থেমে গেল। তারার আলোয় চেনা যাচ্ছিল আন্তোনিওর অবয়ব। সে আটফুট উঁচু দেয়ালটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল।

থামলে কেন আন্তোনিও, বাজাও।

আবেগে গলাটা কেঁপে উঠল।

ও এগিয়ে এসে আমাকে ধরল।

চল ভেতরে যাই। এখানে অন্ধকার আর ঠাণ্ডায় মিলে ভীষণ একটা মৃত্যুর আবহাওয়া তৈরী করেছে।

বাইরে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সামান্য বাতাসের ছোঁয়াতেও করাতের ধার।

ও আমাকে একরকম জড়িয়ে ধরেই ভেতরে ঢুকল।

আমরা আবার পাশাপাশি বসে।

আন্তোনিও তুমি এত সুন্দর বাঁশি বাজাও!

ও বলল, আমার প্রয়োজনের কথাগুলো আমি মুখে বলি, কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা এই বাঁশিতেই বলে।

তুমি বাঁশিতে ফুঁ দিয়েই থামলে কেন আন্তোনিও? তোমার সবটুকু কথা কি শুরুতেই শেষ হয়ে গেল?

আগে তোমাকে একটি গল্প শোনাই। ঐ গল্পের প্রয়োজনে আমার বাঁশিটাও বাজবে।

আমি আর কোন কথা বললাম না, স্থির হয়ে বসে রইলাম।

অনেক অনেক কাল আগে গ্রীসদেশে এক মস্ত বড় বীণাবাদক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল অরফিউস। তিনি যখন বীণা বাজাতে বাজাতে পথ চলতেন তখন গাছেদের পাতায় পাতায় আনন্দের কাঁপন লাগত। প্রাণহীন পাথরও তাঁর সুরের ছোঁয়ায় শিউরে শিউরে উঠত। তাঁর বাজনার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত মানুষ। তাদের মন থেকে সেই সময়টুকুর জন্য মুছে যেত সবরকম পাপবোধ।

আন্তোনিও এবার তার বাঁশিতে ফুঁ দিল। কিছুক্ষণের ভেতরেই এক স্বর্গীয় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হল সেই বাঁশির সুরে। স্বর্গ আর মর্তকে স্পর্শ করে বইতে লাগল সে সুর-তরঙ্গ।

এমন আশ্চর্য শক্তির অধিকারী এই ফটোগ্রাফার এ কথা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার।

একসময় ও সত্যিই চারদিকের প্রকৃতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে ওর বাঁশি থামাল। আমার মনে হল, আমি যেন হাজার হাজার বছরের পথ পার হয়ে গ্রীসদেশের এক পর্বত-সংলগ্ন উপত্যকায় বসে অরফিউসের বাজনা শুনছি।

আন্তোনিও কথা শুরু করল, শিশির ভেজা সকালের মত সুন্দর এক তরুণী ছিল অরফিউসের স্ত্রী ইউরিডাইস। যেমন মধুর ছিল সে তেমনি ছিল তার অন্তরের পবিত্রতা। সঙ্গীত ছিল অরফিউসের প্রাণ কিন্তু ইউরিডাইস ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

ঐ আনন্দময়ী তরুণী তার সখিদের নিয়ে বনে প্রান্তরে নেচে গেয়ে বেড়াত।

একদিন এমনি বনে বেড়ানোর সময় একটি ফুল তুলতে গেলে ভয়ঙ্কর বিষধর এক সাপ তাকে দংশন করে। সেই সাপের দংশনে সে মারা যায়।

প্রিয়তমার মৃত্যুতে অরফিউস প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর বীণায় এবার তুললেন বেদনার এক সকরুণ রাগিণী। এই সুরে গলে যেতে লাগল শিলা। গাছের পাতায় শিশিরবিন্দু ঝরে পড়তে লাগল কান্না হয়ে।

এবার থামল আন্তোনিও। আমি অন্ধকারেই অনুভব করলাম আন্তোনিও তার বাঁশিখানা তুলে নিয়েছে ঠোঁটে।

বাতাস কাঁপিয়ে, চরাচরের বুক চিরে বাঁশির সুরে কান্নার ঢেউ উঠল। অদ্ভুত এক কান্নায় ভরে উঠল আমার বুক। আমি কি হারিয়েছি, কাকে হারিয়েছি না বুঝেই চোখের জলে বুক ভাসালাম।

কতক্ষণ পরে আন্তোনিওর বাঁশি থামল।

অরফিউস একটি অদ্ভুত কাজ করলেন এবার। মানুষের পক্ষে যা প্রায় অসম্ভব সেই কাজ করে বসলেন। তিনি বীণা বাজাতে বাজাতে চললেন মৃত্যুপুরীতে। অনেক বাধা পার হয়ে তিনি অবশেষে দেখা পেলেন মৃত্যুর দেবতা প্লুটোর। স্ত্রী প্রসারপাইনকে পাশে নিয়ে তিনি বসেছিলেন সিংহাসনে।

একটি জীবন্ত মানুষকে মৃত্যুপুরীতে দেখে প্লুটোর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তিনি কোনকিছু প্রশ্ন করার আগেই অরফিউস নতজানু হয়ে বসে বীণার সুরে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনী বলে যেতে লাগলেন।

এই অংশে বাঁশির সুর অদ্ভুত এক কথার তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল। তার কম্পনে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল বিরহী হৃদয়ের সীমাহীন ব্যথা।

বাজনা শেষ করে বীণার ওপর ভেঙে পড়লেন অরফিউস।

প্লুটো ও প্রসারপাইন বিচলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

অবশেষে মৃত্যুর দেবতা প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, বল, কি চাও তুমি?

আমি আমার প্রিয়তমাকে ফিরে পেতে চাই প্রভু।

তাই পাবে, তবে একটি শর্ত পালন করতে হবে তোমাকে।

কি শর্ত প্রভু?

তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার সময় পেছন ফিরে তাকে দেখার চেষ্টা করবে না। মৃত্যুপুরীর শেষ দ্বারটি পেরিয়ে যাবার পর তাকে ফিরে পাবে তুমি।

অরফিউস অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে চললেন। প্রায় দ্বারের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন তিনি, হঠাৎ তাঁর মনে হল, ইউরিডাইস অনেক পেছনে পড়ে যায়নি তো? আবার মনে হল, সে কি সত্যি আসছে?

এই চিন্তাটি মনে আসামাত্রই তিনি কোনকিছু না ভেবে পেছন ফিরে স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। অমনি ইউরিডাইস দুহাত বাড়িয়ে অতি করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, বিদায় প্রিয়তম, বিদায়।

ভাঙা বুক নিয়ে বহুপথ পার হয়ে একদিন শ্যামল পৃথিবীতে ফিরে এলেন অরফিউস। কিন্তু মানুষের সঙ্গ আর তাঁর ভাল লাগল না। তিনি নির্জন একটি পর্বতে গিয়ে পশুপাখিদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন আহার। তাঁর বীনায় কেবল বেজে উঠতে লাগল সকরুণ সুর।

আন্তোনিও বাঁশি তুলে নিয়ে কিছু সময় বেদনার একটা রাগিণী আলাপ করে গেল।

একসময় বাঁশি ছেড়ে বলে উঠল, বড় সকরুণ পরিণতির মুখোমুখি হতে হল এই শিল্পীকে।

কি সেই পরিণতি আন্তোনিও?

একদিন একদল উল্লাস-মত্ত তরুণী চলেছিল ঐ পাহাড়ী বনের পথে। তারা অরফিউসকে একটি গাছের তলায় বীণা হাতে বসে থাকতে দেখে বলে উঠল, বাজাও, বাজাও, খুশি আর উল্লাসের রাগিণী তোল তোমার বীণায়।

শিল্পী তখন মহা বিষাদে মগ্ন। তিনি আনন্দের স্পর্শ থেকে বহু বহু দূরে। কেমন করে বাজাবেন তিনি উল্লাসের রাগিণী! তাই মাথা নেড়ে অস্বীকার করলেন তাঁর বীণায় সুর তুলতে।

অমনি প্রমত্তা নারীর দল পাথর তুলে নিয়ে আঘাত করতে লাগল শিল্পীকে।

মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ার আগে শিল্পীর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল শুধু একটি নাম : ইউরিডাইস, ইউরিডাইস।

ওরা শিল্পীর দেহটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বেগবতী এক স্রোতস্বতীর বুকে। সেই প্রবাহিণী কাঁদতে কাঁদতে মহাশিল্পীর দেহটিকে বয়ে নিয়ে গেল মৃত্যুপুরীর দ্বারে। সেখানে দুটি হাত মেলে দাঁড়িয়েছিল ইউরিডাইস। প্রিয়তম দ্বারে প্রবেশ করা মাত্র তাঁকে বেঁধে নিল দুটি বাহুর বন্ধনে।

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র আমার ভেতরে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটে গেল। আমি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে গেলাম সুদূর অতীতের সেই অমর শিল্পীর প্রিয়তমা ইউরিডাইসে।

হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে আমি দু বাহু বাড়িয়ে ধরলাম ওর একখানা হাত। বললাম, কোনদিনই আমরা বিচ্ছিন্ন হব না আন্তোনিও। পার্থিব জগতে আমাদের মিলন না ঘটলেও মৃত্যুতে সে মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না।

আমি বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবলই কাঁদতে লাগলাম। ও অন্ধকারে আমাকে নিজের পাশটিকে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছে দিতে লাগল।

অষ্টমীর চাদ উঠল আকাশে। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। সেই কাকজ্যোৎস্নায় হরপার্বতীকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে গণপতি বন্দনার পর শুরু করলাম আমার নাচ। আন্তোনিও বাঁশি বাজাতে লাগত। আমি আকুল হয়ে খুঁজতে লাগলাম সেই চিরপ্রেমিক বাঁশিওয়ালাকে।

সূর্য শিবলিঙ্গের মাথায় সোনার মুকুট না পরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমার নাচ থামল না।

অমলাভ, আমার স্বীকারোক্তি আমি এইখানেই শেষ করছি। শুধু এইটুকু ভেবে আমার মৃত্যুর পর পার যদি আমাকে ক্ষমা কর,—একজন শিল্পীর বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর কোলেই ঢলে পড়ে।

দুই

দীননাথ-সদনের লনে বসেছিলেন ঊর্মিলা চতুর্বেদী। আঁখির হঠাৎ করে চলে যাবার পর তিনি আরও চুপচাপ হয়ে গেছেন। তাঁর স্বামী শঙ্কর প্রসাদ কন্যার আকস্মিক মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের শিকার হন। এখন প্রায় পঙ্গু, শয্যাশায়ী।

পারিবারিক বন্ধু ও ঊর্মিলা জুয়েলারী হাউসের প্রধান স্থপতি বিরজু মিশ্র শঙ্কর প্রসাদের অনুপস্থিতিতে বিশাল জুয়েলারী হাউস ও তার শাখাগুলোর কাজ চালাচ্ছেন। তিনি কাজের ভেতর জোর করে জড়িয়ে রাখছেন নিজেকে।

আঁখি নেই, তার স্মৃতির কণিকা টুকাইকে সঙ্গে করে বেনারসে নিয়ে গেছে অমলাভ। অনসূয়া মা হারা মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু অমলাভ বলেছিল, আমি একা ওখানে কি করে থাকব দিদি। তাছাড়া ওর মায়ের প্রতিভা বিকাশে বাধা দিয়ে আমি যে ভুল করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয়ই করব। টুকাইকে আমি গড়ে তুলব তার মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলোর কথা মনে রেখে।

অনসূয়ার প্রাণ কেঁদে উঠলেও সে দ্বিতীয়বার আর অমলাভকে পীড়াপীড়ি করেনি। শুধু বলেছিল, বেনারসে আমার দাদুর ছোট্ট বাড়িটাকে বড় ভালবাসত আঁখি।

আমি জানি দিদি।

ওটা যদি পার তুমি রক্ষা করার চেষ্টা কর। তাছাড়া টুকাইকে সারাক্ষণ সামলাবার জন্য মুরালের মা রয়েছে।

সেসব মনে রেখেই দিদি আমি বেনারসে নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

অমলাভ যাবার সময় ঊর্মিলাদেবীকে প্রণাম করতে এলে তিনি তাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, তুমি আমার এক ছেলে অমল, আমি তোমার মা। মাকে ভুলে যেওনা বাবা। যে কোনদিনই ভালবাসার বাঁধন চায়নি, সে-ই ভালবাসার ঘূর্ণিতে তলিয়ে গেল। ভাগ্য এক আশ্চর্য নিয়ন্তা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে হয়। কেবল মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তোমার দেরী হয়ে যাবে। বিরজুকাকা গাড়ি রেডি করে রেখেছেন, তুমি এসো বাবা।

টুকাইকে নিয়ে অমলাভ চলে গেল।

এদিকে অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটল। এক অপরাহ্নে অনসূয়া ছাদের ওপর থেকে দেখল, একটি গাড়ি তাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। কৌতূহলী চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে।

সামনের ড্রাইভার সিট থেকেই দুজন নেমে এল। গেট ঠেলে এখন ভেতরে ঢুকছে তারা।

অনেকদিনের বাঁধানো ফটোগ্রাফের উপর অযত্নে যেমন ধুলো জমে অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি বিস্মৃতির কুয়াশায় বহুচেনা ছবিগুলোও কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হচ্ছে।

স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখের জল-ছায়ায় সে এতক্ষণ যে মুখগুলোকে অস্পষ্ট দেখছিল, চোখ মুছে ফেলার পর সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভরদ্বাজ, আর বুবাই। বুবাইকে চেনাই যাচ্ছে না। বাবার মত লম্বা হয়েছে। কত বছর আগে ওকে শেষবারের মত দেখেছে সে।

বোর্ডিং স্কুল 'আনন্দম্'-এর শিশু বিভাগে সে বুবাইকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। শিশু নিকেতনের বোর্ডিং হাউসের সুপারিনটেন্ডেন্ট অনিতা মালহোত্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছিল।

মালহোত্র অভিজ্ঞ মহিলা। তিনি মায়েদের এমন ছবি বহু দেখেছেন। তাই হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আসুন আমার সঙ্গে, শিশুদের বোর্ডিং হাউসের বাগানটা ঘুরে আসি।

শিশু নিকেতনের পেছনে এতবড় একটা গাছপালায় ভরা বাগান আছে তা ভাবা যায়নি।

সবুজ মখমলের মত লনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানারকম খেলা খেলছে। হুড়োহুড়ি খেলায় ঢেউ উঠেছে খুশির। নুড়ির ওপর দিয়ে তির্‌তির্‌ করে একটা জলধারা বয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট ফ্রকপরা মেয়েগুলো পা ডুবিয়ে খেলা করছে তাতে। ছেলেগুলো কোমর ধরে ধরে লম্বা একটা ট্রেন বানিয়েছে।

চলতে শুরু করেছে ট্রেন হুইসিল্ বাজিয়ে। একেবারে শেষে গার্ডসাহেবের ফ্ল্যাগ নাড়া এখনও থামেনি।

সুপার বলেছিলেন, চিনতে পারছেন আপনার ছেলেকে?

সে দেখেছিল, তার বুবাইও ট্রেনের একটা কামরা হয়ে গেছে। সবার মত মুখ নিচু করে কু-ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ তুলে ছুটছে।

সে হেসে তাকিয়েছিল সুপারের মুখের দিকে।

কতক্ষণ এখানে এসেছে সুপর্ণ?

এক ঘণ্টার বেশী হয়নি।

এরই ভেতর ও মিশে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে। কত ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। দু তিনদিন খেতেই চায় না, জ্বরও এসে যায়। ও কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিতে পারে।

পরিবেশটি ভারি সুন্দর। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। অপরাহ্নের হাওয়া বোর্ডিং হাউসের সীমানায় নারকেল গাছের পাতা কাঁপিয়ে বয়ে আসছে। নানাধরনের গাছপালা, কিন্তু সব ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। ভোরবেলা নানারকম পাখির ডাকে বোর্ডিং হাউসের বাগান মেতে ওঠে। সুপার নিজেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাখিদের চিনিয়ে দেন। ওরা কাঠবেড়ালির পেছনে ছোটে, হাততালি দেয়, হাসি ছড়ায়। লেখাপড়া থেকে বন্ধুত্বের বন্ধন, সবই শেখান হয় আনন্দমে।

সেদিন বাড়ি চলে আসার সময় দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ছেলেকে কাছে ডেকেছিল সে। বুবাই খানিকটা দূর অব্দি ছুটে এসে হাত নেড়ে বলেছিল, এখনও খেলা শেষ হয়নি মা।

আমি বাড়ি যাই, তুমি লক্ষ্মী হয়ে থেকো।

ও হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে আবার দৌড়ে বন্ধুদের দলে মিশে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে সেদিন একাটি বসেছিল সে। অপেক্ষা করছিল, কৌশিক পার্টি থেকে কখন ফিরে আসে। আজকাল ফ্ল্যাটে ফিরতে ওর বেশ রাত হচ্ছিল। একটু বেশীমাত্রায় ড্রিংক করছিল ও।

আনন্দমে ও নিজের ইচ্ছা আর চেষ্টাতেই ছেলেকে ঢুকিয়েছিল। কৌশিকের কাছ থেকে ব্যাপারটা একদম গোপন রেখেছিল ও।

ছেলেকে একটা ভাল জায়গায় ঢোকাতে পেরে সে এখন খুশি। এবার কৌশিককে বুঝিয়ে বলবে সবকিছু। তাই বসেছিল কৌশিকের ফেরার অপেক্ষায়।

প্রায় বারোটার পর ঘরে ঢুকেছিল কৌশিক। কঠিন কিছু কথা বলতে চেয়েছিল সে কিন্তু সেদিন সংযত করে নিয়েছিল নিজেকে।

কৌশিকই প্রথম প্রশ্ন করেছিল, বুবাই কোথায়?

এত রাত অব্দি কি বুবাই কখনো জেগে থাকে?

কৌশিক হাতঘড়ির দিকে না তাকিয়ে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছিল।

বা-রো-টা! ঘড়ি ঠিক আছে তো?

তোমার হাতঘড়ি কি বলে?

একটু কষ্ট করেই ছোট কাঁটাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়েছিল কৌশিক। হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলেছিল, দেখ, দশটা পঁয়ত্রিশ এখনও পেরোয়নি।

রাগ করে বলেছিল সে, ওটা তোমার পার্টির ঘড়ি। ওতে দম দেয়, কাঁটা চালাচালি করে তোমার পি. এ. আনার।

কৌশিক হেসে উঠেছিল।

শোন অন্য কথা।

কৌশিক টাইয়ের নট খুলতে খুলতে বলেছিল, এ-তো-রা-তে?

রাত কোথায়? এই তো সবে দশটা পঁয়ত্রিশের ঘর পেরুলো তোমার ঘড়ির কাঁটা।

কৌশিক আবার হা হা করে হেসে উঠেছিল।

চুপচাপ একটু বস, কথাটা সেরে নিই।

কৌশিক সোফাটায় এলিয়ে পড়েছিল।

বুবাইকে আনন্দমে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি। বোর্ডিংয়ে বহু কষ্টে জায়গা মিলেছে।

কৌশিক সিধে উঠে বসেছিল সোফায়।

রাবিশ। আশ্চর্য! আমার সঙ্গে একটা পরামর্শও করলে না!

কখন করব বল, বাড়িটা তো কয়েক ঘণ্টা তোমার ঘুমুবার একটা আস্তানা। তারপর স্নান আর ব্রেকফাস্ট সেরে অফিস পালানো। লাঞ্চ, এমনকি ডিনারটাও মাসে বিশদিন সেরে আস বাইরে।

ঘরে বসে থেকে ভরদ্বাজের মত দশটা পাঁচটা অফিস করলে কৌশিক যাজ্ঞিক হওয়া যায় না। আজ যেখানে উঠেছি সেখানে উঠতে গেলে বাঁধা রুটিন পালটে ফেলতে হয়।

অকারণে ভরদ্বাজের প্রসঙ্গ টানছ কেন। আসলে সুখী হওয়া নিয়ে কথা। যে যেখানে থাকলে সুখ বোধ করে, সেখানেই সে থাক। বিভিন্নজনের সুখের ধারণা বিভিন্ন রকম।

কিন্তু বুবাইকে একটা খোঁয়াড়ে ঠেলে দিয়ে এলে কি করে? কার বুদ্ধিতে?

নিজের বুদ্ধির ওপর অবিশ্বাস করার মত কারণ এখনও ঘটেনি কৌশিক। সেরকম হলে অন্য বুদ্ধিদাতার খোঁজ করব।

কৌশিক যাজ্ঞিকের সেন্ট জেভিয়ার্স আর প্রেসিডেন্সীর ছাপ আছে। আজও ইংরাজী ইস্কুলে পড়ার গন্ধ না থাকলে কেউ পুঁছবে না। শিখরে উঠতে গেলে ওটি মাস্ট।

দেশের বড় বড় বিজ্ঞানী, ডাক্তার, চিন্তাবিদরা গ্রামের ইস্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। সমাজের শীর্ষস্থানে ওঠার জন্য এইসব নেতাদের ইংরাজী ব্রাশ চালিয়ে গা ঘষতে হয়নি।

কৌশিক রূঢ় গলায় বলেছিল, আমার ছেলের জন্য আরও অনেক ভাল ভাল স্কুল আছে। তুমি আমাকে কোনকিছু না জানিয়ে কাজটা ভাল করনি।

একটু থেমে উত্তেজিত হয়ে আরও বলেছিল, তুমি যে বিজ্ঞানী, ডাক্তার, চিন্তাবিদদের গুণগান করলে তাঁদের সময় থেকে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ভাবনার জগত অনেক অনেক পথ এগিয়ে এসেছে। এখন বিশেষ বিশেষ স্কুল কলেজে উন্নতমানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যোগ্য শিক্ষকরা সেখানে কাজ করছেন। এখন কোনরকম একটা ডিগ্রি পেয়ে লাখ টাকা কমিটি অথবা দাদাদের হাতে তুলে দিলেই নাকি একটা স্কুল মাস্টারী ম্যানেজ করা যায়। সেইসব স্কুল থেকে তোমার ছেলে কি আশা করতে পারে?

অতীতকে অশ্রদ্ধা কর না কৌশিক। শিক্ষাজগতে কিছু অনাচার ঢুকতে পারে তবে সব জায়গাতে নয়। মফস্বলের বহু ছাত্রই কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। এসব কথা এত রাতে আলোচনার সময় নয়। প্লিজ, একবার নিজের চোখে 'আনন্দম্' স্কুলটা দেখে এসো, তারপর যেখানে খুশি ছেলেকে ভর্তি কর।

অবশেষে কৌশিকের জেদই জয়ী হল। সে কোনকিছু শুনতে চাইল না। ছেলেকে নিয়ে সবচেয়ে নামী একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলো। সেটা রেসিডেনসিয়েল স্কুল।

অনসূয়ার মন থেকে অতীত মুছে যায়নি। সময় শুধু একটা পর্দা ফেলে দিয়েছে। হঠাৎ হাওয়ায় সেটা উড়ে উড়ে যায়।

যেবার কৌশিক কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টাব নির্বাচিত হল, সেবার ও পার্টির ব্যবস্থা করল গোয়ার সমুদ্র-সৈকত সংলগ্ন এক হোটেলে। সপরিবারে আমন্ত্রিত হল ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। যাওয়া আসা, থাকা খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। সব খরচ কৌশিক যাজ্ঞিকের।

ছেলেমেয়েরা সারাদিন নুড়ি কুড়ালো সমুদ্রতীরে। ডিনারের পর প্রায় সারারাত ড্রিংকে ডুবে রইল সবাই। বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীরা মিলে উল্লাসের হাট বসিয়েছিল। প্রত্যেকের হাতে গোয়ার উৎকৃষ্ট ওয়াইনের গ্লাস।

অর্ধমত্ত অবস্থায় কৌশিকের বন্ধু-পত্নীরা খোঁজ করছিল অনসূয়ার। কিন্তু অনসূয়া ওদের ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। সে আগলে বসেছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে। বাজের ছোঁ থেকে পক্ষী-জননী যেমন করে দুটি পাখার আড়ালে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি একটা বড় বেডরুমের ভেতরে ওদের ঢুকিয়ে নিয়ে আরব্যরজনীর গল্প বলে মাতিয়ে রেখেছিল সে।

অনেক রাতে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, ওরা লনের প্রান্তে নারকেল কুঞ্জের তলায় শেষ আসর বসিয়েছে।

মৃদু নীলাভ আলোর তরঙ্গ নেমে আসছিল ফলবান নাতিউচ্চ নারকেল কুঞ্জের পত্রান্তরাল থেকে। শেষ রাউন্ডে ওদের সার্ভ করার জন্য কোন ওয়েটার ছিল না। মেয়েরাই নিয়েছিল সে ভার।

ও দেখল প্রমত্ত পুরুষ নারীদের ভেতর এক মক্ষিরাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতে তার দামী ওয়াইনের বোতল। উঁচু করে তুলে ধরা গ্লাসগুলোকে সে ভরে ভরে দিচ্ছে ওমর খৈয়ামের সাকীর মত।

অনসূয়ার চিনতে ভুল হয়নি ডিরেক্টারের নতুন পি. এ. আনারকে। কোম্পানীতে নতুন রিক্রুট এই সোনালী অগ্নিশিখাটি।

পরেছে সোনা রঙের একটি শাড়ি। তার ওপর গোলাপী আভার দু'নরী একটি মালা দুলিয়েছে গলায়। কানে সোনালী রিংয়ের মাঝখানে দুলছে গোলাপী পাথর। এক হাতে সোনার ব্যান্ডে দামী রিস্টওয়াচ। অন্যহাতে কমল হীরের দ্যুতি ছড়ানো আংটি।

আনারের পোশাক ভিন্ন হলেও আজ সবার রঙে রঙ মিলিয়েছে সে। অনসূয়া ঐ ড্রিমল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে অনুভব করল, প্রাণঘাতি বিদ্যুৎ খেলা করছে ঐ নারীর সর্বাঙ্গে।

বিচ্ছেদের দিন সূর্যাস্তের রঙে রাঙানো।

পশ্চিম আকাশে সেদিন অস্তসূর্যের লাল রঙটা ছড়িয়ে পড়েছিল। অনসূয়া পশ্চিমের জানালা দিয়ে সে দৃশ্য দেখছিল। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলোকে মনে হচ্ছিল রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের মত।

সেদিন বুবাইকে নিয়ে কৌশিকের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। হিসেব করে দেখা গেছে শনি, রোব যোগ করে পাঁচদিন লাগাতার ছুটি। কটা দিন সবাই মিলে কাটানো যাবে, এই ছিল প্ল্যান। তাই বোর্ডিং থেকে ছেলে আসবে এই প্রতীক্ষায় ছিল অনসূয়া।

বেল বাজতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একি! বুবাই কোথা?

ওকে আর আনলাম না। মাত্র পাঁচদিন ছুটি, সামনে পরীক্ষা। ভেবে দেখলাম, এই কটা দিনের জন্য ওকে ডিসটার্ব করে লাভ নেই। তুমি কলকাতা যাবে যাবে বলছিলে, বরং ঘুরে এসো।

দূর, ভীষণ খারাপ লাগছে, ছেলেটাকে কতদিন দেখিনি।

পরীক্ষা হয়ে গেলে নিয়ে আসব। কালকের ফ্লাইটে একটা টিকিট এনেছি কলকাতার। তুমি ঘুরে এসো দিন পনেরো, কুড়ি।

তোমাকে একা ফেলে রেখে? কি ব্যাপার বল তো?

আমি কালকের ফ্লাইটে জাপান যাচ্ছি। ফিরব তিন সপ্তাহ পরে।

কই, তুমি তো আমাকে কিছু বলনি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবার পরে এটা ডিউ ছিল। চেয়ারম্যান তাড়া লাগালেন, আর কবে যাবে যাজ্ঞিক। কাজ তোমাকে কামড়ে ধরে আছে। সব ঝেড়েঝুড়ে জাপানে কোম্পানীর খরচে থ্রি-উইকস রিলাক্স কর গিয়ে।

অনসূয়ার মনটা ভারী হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, তুমি আমার জন্যেও তো একটা ব্যবস্থা করতে পারতে। আমার টাকাটা না হয় আমিই দিতাম। পাসপোর্ট, ভিসা সবই করা আছে, ওয়ার্ল্ড ট্যুরের জন্যে।

আমি ভেবেছিলাম, তুমি তোমার বাবা-মাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছ। তাই ...।

তাই তুমি এত সুন্দর একটা দেশে একা ঘুরে আসতে চাইছ! আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তাহলে তোমাকে ফেলে চলে যেতে পারতাম?

এতটা আমার মাথায় আসেনি।

সে কি! আমি জানতাম, এতবড় একটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ব্রেন একটা কম্পিউটারের মত। আমার ইচ্ছাগুলো তো তার জানার কথা।

সত্যি, তোমাকে ছেড়ে একা একা ঘুরতে আমার খুবই খারাপ লাগবে।

এরপর আর কথা বাড়ানোর অবকাশ ছিল না। কৌশিক ক্লান্ত ছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

কৌশিকের পোশাক-আশাক গোছগাছ করে ভি. আই. পি. স্যুটকেশটি খুলতেই আশ্চর্য একটি খবর আত্মপ্রকাশ করল। টিকিট দুখানি। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে চলেছেন তাঁর সদ্য প্রমোশানপ্রাপ্তা পি. এ. আনার। যিনি মিস বম্বের শিরোপা পরেছেন সম্প্রতি।

না, এসব নিয়ে কোনরকম চেঁচামেচি, অশান্তি কোনদিনই করেনি অনসূয়া। সেদিনও করল না। এসব তার মর্যাদার বাইরে। তার শুধু মনে হয়েছিল, মানুষের প্রেমেটেম কিছু নয়, ওটা রূপোলী তবকমারা মশলাদার একটি পান। তবক, চোখকে টানবে কিন্তু পানটা আসলে চিবিয়েই খেতে হবে।

সামান্য একটু অভিনয়, গভীর দুঃখপ্রকাশের ছলনা করতে করতে ঘর থেকে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল কৌশিক।

দুজনের ভেতরে এই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার।

কলকাতায় এসে অনসূয়া একটি চিঠি পাঠাল কৌশিককে।

কৌশিক,

প্রতিদিন তোমার জীবনযন্ত্রণা যে বেড়েই চলেছে, এ আমি লক্ষ্য করেছি। প্রতিটি ঘটনা, যা তুমি আমার কাছ থেকে গোপন কর, তা আমি সবই জানতে পারি। আজকাল তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়, করুণাও হয়। তোমার জীবনের উন্নতি বা বিলাসের শেষসীমা কোথায়, তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। সেসব তোমার বা তোমার একান্ত প্রিয় মিস্ আনার-এর হয়ত জানা আছে। তুমি আর আমি এখন দুজন দুই পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে পড়েছি, তোমার আর আমার আকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই তোমাকে প্রতিদিন আমাদের জীবনে মিথ্যাচারের নায়ক হিসেবে দেখে দুঃখ পেতে চাই না। বরং যে মিথ্যা অভিনয় করতে তোমার কষ্ট হয়, তার থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে চাই। তোমার অভিষ্ট প্রাপ্তির জন্য তুমি এবার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলো। আমাকে নিয়ে তোমার রোজকার বিড়ম্বনা আমাদের পারস্পরিক সম্মানের পরিপন্থী। এখন একমাত্র দূরত্ব রক্ষার মধ্য দিয়েই বুবাইয়ের কাছে আমাদের সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা পাবে। তুমি বুদ্ধিমান, সুতরাং এটাকে একটা পরাজয় হিসাবে দেখে আমার সঙ্গে সম্পর্কের জোড়াতালি দেবার কোন চেষ্টা করো না। তোমার নতুন জীবনের জন্য আমার সমস্ত শুভেচ্ছা রইল।

অনসূয়া।।

এরপর কাজের সূত্রে একাধিকবার কলকাতা এসেছে কৌশিক। এ বাড়িতে এসে দেখা করে গেছে অনসূয়ার মায়ের সঙ্গে। তিনি আপ্যায়ন করেছেন, কিন্তু কখনো মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি! অনসূয়ার সঙ্গে কৌশিকের সাক্ষাৎ হবার কোন সুযোগও ঘটেনি।

আজ ভরদ্বাজের সঙ্গে বুবাইকে আসতে দেখে বিহ্বল হয়ে গেল অনসূয়া। হঠাৎ কি একটা মোচড় দিয়ে উঠল তার বুকে।

অনসূয়া শুনল, ভরদ্বাজ যেন বলছে, বুবাই একান্ত নিজের ইচ্ছেতেই তোমার কাছে চলে এসেছে।

দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল একটি কিশোর। লম্বাটে গড়ন, কোঁকড়া চুল, ভাসা ভাসা দুটি দীপ্তিমান চোখ।

ঐ তো বুবাই। ঠোটের তলায় বাঁদিকে কালো তিলটা জ্বলজ্বল করছে।

চেয়ার ছেড়ে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াল অনসূয়া। তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। হঠাৎ আবছা হয়ে উঠল ছবিটা।

এবার ছুটে আসতে লাগল সেই কিশোর। কান্নাভেজা ভাঙা গলায় একবার ডাকল, মা।

অনসূয়া ছেলেকে দু'হাতে বেঁধে জড়িয়ে ধরল বুকে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, শুধু দুটো চোখ উপচে জলের ধারা ছেলের মাথার ওপর ঝরতে লাগল।

তিন

শঙ্করপ্রসাদ প্রায় সারাদিন শুয়ে থাকেন বিছানায়। তাঁর খাওয়া-দাওয়া এবং নিত্যকর্মের তদারক করেন উর্মিলা দেবী। কোন আয়া বা নার্স নিয়োগের পক্ষপাতি তিনি নন। স্বামীর সেবা নীরবে করে যান। এতে তাঁর কোন ক্লান্তিবোধ নেই। ইদানিং কৌশিক আর ছেলের সঙ্গে বোম্বেতে রয়েছে অনসূয়া। না, সেই ময়ূরীটি আর কৌশিকদের কোম্পানীতে নেই। সে উড়ে গেছে অন্যত্র।

কৌশিক এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসার জন্য প্রায় সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। সে এখন কাজের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে নেক্সড্ ম্যানের ওপর।

অনসূয়া কলকাতায় থাকতে বাবাকে রোজ সকালে কাগজ পড়ে শোনাত। ঠাকুর্দা দীননাথ চতুর্বেদী অনূদিত অষ্টাদশ পুরাণের কিছু অংশ পড়ে শোনাতে হত। পড়া শেষ হলে বাবার মাথায় ছুঁইয়ে দিত সেই পুরাণ গ্রন্থখানি।

কোন কোনদিন ভাবে বিভোর শঙ্করপ্রসাদ বাবার কথা মনে করে আবেগে অধীর হতেন। চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

বিকেলে চায়ের পাট চুকে গেলে স্বামীকে পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে দিতেন উর্মিলা দেবী। ইনভ্যালিড চেয়ারখানা বিছানার কাছে এনে স্বামীকে অনেক কায়দাকানুন করে তার ওপর তুলে দিতেন।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় দোকানের গাড়ি এসে দাঁড়াতো গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে মিশ্রজী হন হন করে হেঁটে যেতেন লন পেরিয়ে শঙ্করপ্রসাদের ইনভ্যালিড চেয়ারটার দিকে। এবার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যেতেন গেটের দিকে। তারপর গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে এগোতেন। এ ছিল তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদনের রীতি।

বাঁয়ে বিরাট কবরখানা। নানা গাছ আর ফুলে ভরা। বছরের প্রায়-সময় অপূর্ব এক গাঢ় সবুজ সারা কবরখানা জুড়ে বিরাজ করে। মৃত্যুর অন্ধকারের বুক চিরে জীবনের সবুজ ঝলমলিয়ে ওঠে।

আগে দোকান থেকে ফিরে এসে শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে বসে চা খেতেন বিরজু মিশ্র। সে সময় সারাদিনের বিক্রিবাটা আর ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত দুজনের। এখন মিশ্রজীকে একাই হাল ধরে থাকতে হয়েছে। অনসূয়া আগে বাবার সঙ্গে দোকান নিয়ে আলোচনায় বসত। এখন চাচাজীর ওপর সব ভার তুলে দিয়ে সেও সরে দাঁড়িয়েছে।

কদিন আগে কিছু দামী স্টোন কেনার ব্যাপারে আলোচনার দরকার ছিল। কাউকে কাছে না পেয়ে উর্মিলাদেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মিশ্রজী।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

মিশ্রজী উর্মিলাদেবীর কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

আচ্ছা উর্মিলা, নিষ্ঠুরতার কি কোন সীমা নেই?

এ কথা কেন বিরজু?

সেই গভীর ব্যক্তিত্বময় কণ্ঠ উর্মিলা চতুর্বেদীর।

তোমরা জুয়েলারী হাউস থেকে সরে দাঁড়িয়েছ। সবাই মনে করছে বিরজু মিশ্রই দোকানটার মালিক।

ওরা না জেনে যা ভাবছে সেটাই তো সত্য বিরজু। তোমার বাবার দুঃখের সুযোগে আমার বাবাই তো দোকানটা কিনে নিয়েছিলেন।

বিরজু মিশ্র এবার ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, ওভাবে বল না উর্মিলা। সে সময় ঐ টাকাগুলো না পেলে মিশ্র পরিবারকে অভুক্ত অবস্থায় মারা পড়তে হত। জ্যেঠামশায় অন্যায় কিছু করেননি। তিনি অর্থ দিয়ে আমাদের উদ্ধার করেছিলেন।

সেসব কথা থাক, এখন বল, আমাকে কি করতে হবে?

বেশ কিছু টাকার স্টোন কেনার দরকার, সেই অনুমতিটা মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। দাদা সুস্থ থাকলে তাঁকেই বলতাম।

সব ক্ষমতাই তো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি বিরজু।

ওতেই তো আমি হাঁপিয়ে উঠছি উর্মিলা। গয়নার ডিজাইন আর সেটিংয়ের সব আনন্দ ঘুচে গিয়ে এখন হিসেবের পাষাণভার মাথার ওপর চেপে বসেছে।

ভাগ্যের দেবতা আমাকে মুক্তি দিচ্ছেন না বিরজু। একটার পর একটা আঘাতে আমাকে পঙ্গু করে ফেলছে। একটুখানি সামলে নিতে দাও। তারপর দুজনে বসে জীবনের সব হিসেব-নিকেশ হবে।

শান্ত প্রকৃতির বিরজু মিশ্র দোকান নিয়ে আর কথা বাড়াননি। তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার যা কিছু শক্তি, সবই তো তোমার কাছ থেকে পাওয়া উর্মিলা। তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি আঘাত তোমাকে আরও শক্ত আরও উজ্জ্বল করে তুলছে।

সেদিন কথাকটি বলে উঠে চলে গিয়েছিলেন মিশ্রজী কিন্তু উঠতে পারেননি উর্মিলা চতুর্বেদী। এক ঝাঁক মৌমাছির গুঞ্জনের মত তঁকে ঘিরে গান শুনিয়েছিল তাঁর কৈশোর স্মৃতিগুলো।

একই মহল্লায় বাড়ি ছিল উপাধ্যায় আর মিশ্র পরিবারের। তাই পরিচয় হতে দেরী হয়নি।

বিরজুর বাবা মঙ্গল মিশ্র তাঁর বাবার আমলের একটি সোনার দোকান চালাতেন। আশ্চর্য সততা ছিল মানুষটির ভেতর। তিনি বলতেন, আনন্দ নিয়েই মেয়েরা গয়না গড়াতে আসে। সেই আনন্দে পাপী ছাড়া কেউ খাদ মেশায়!

সুখের দিনে গয়না গড়িয়ে অভাবের দিনে যারা বেচতে আসত তাদের তিনি বাজার চলতি পুরো দামই দিয়ে দিতেন।

গয়না বেচতে এলে যাদের মুখে তিনি কষ্টের ছাপ দেখতেন, তাদের আড়ালে ডেকে নিতে বলতেন, গয়নাটা নিশ্চয়ই তোমার খুব পছন্দের ছিল, তাই না মা।

মঙ্গল মিশ্রের সহানুভূতি মেশানো কথা শুনে অনেকের চোখে জল নেমে আসত।

তিনি বলতেন, দুঃখের দিনে কাঁদতে নেই মা। দুঃখকে জয় করার জন্য কোমর বেঁধে কাজ করতে হয়।

হাঁ, এবার শোন, একটা কথা বলি। এই গয়না বেচার পুরো টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এক বছর এ গয়নাগুলো না গালিয়ে আমি আমার কাছে রেখে দেব। তুমি ধীরে ধীরে আমার আসল টাকাটা শোধ করে দিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে যেও। সুদ লাগবে না। মানুষ চেষ্টা করলে সবই পারে।

মঙ্গল মিশ্রের অনেক গোপন দানধ্যানের কথা সে সময় কেমন করে যেন প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

কোন দুঃখী পরিবার মেয়ের বিয়ের জন্য কষ্ট করে গয়না গড়াতে এলে তিনি বিনা লাভে তা গড়িয়ে দিতেন। মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে গয়না নিতে এলে তিনি কখনো কখনো ছোট্ট টুলটুলে একজোড়া কানের দুল অথবা নাকের নথ উপহার হিসেবে দিয়ে দিতেন।

এই বেহিসেবী ক্রিয়াকর্মের জন্য তাঁর দোকানের উন্নতি হচ্ছিল না। কোনরকমে দিন গুজরান হয়ে যাচ্ছিল।

তার ওপর মঙ্গল মিশ্রের পুষ্যি ছিল প্রায় এক ডজন। নিজের স্ত্রী আর ছেলে বিরজু ছাড়া ঐ পুষ্যিগুলি প্রতিদিন আসত বিভিন্ন ঘাট থেকে কোন মাটির পাত্রে কিছুটা ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে। মঙ্গল মিশ্র ঐ ধুলো একসঙ্গে জলে গুলে কপালে তিলক আঁকতেন। তিনি বলতেন, কত পুণ্যার্থী, সাধুসন্ত এইসব ঘাটে চলাচল ও জপধ্যান করেন। তাঁদের পায়ের ধুলো কপালে মাখলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

ঐ ধুলো বয়ে আনা ভিখিরী ছেলেগুলোই ছিল তাঁর পুষ্যি।

ছেলে বিরজু ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বাবার কাজে সাহায্য করত। প্রথম থেকেই বিরজুর চোখে ছিল শিল্পীর দৃষ্টি। সে বাবার কাছে ডিজাইন আর সেটিংয়ের কাজ শিখেছিল।

উর্মিলার মনে পড়ছে বিরজুর সঙ্গে তার প্রথম আলাপের দিনটির কথা।

পাশাপাশি দুটো স্কুলে পড়তো ওরা। একই ক্লাশের পড়ুয়া। পাড়ার ছেলে, দোকান বাজার ইস্কুলের পথে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু কথাবার্তা হয়নি।

ছেলেবেলা একটু ডাকাবুকো ছিল উর্মিলা। দুঃসাহসী, যে কোন কথার তুরন্ত জবাব দেবার জন্য তার জিভখানা সর্বদা সজাগ হয়ে থাকত।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল।

কথাটা শুরু করল উর্মিলা, তোমাদের গ্রাউণ্ডে দেখলাম ফুটবল খেলছে ছেলেরা, তুমি খেলতে যাওনি কেন?

আমি খেলি না।

এখানেই প্রসঙ্গে ইতি পড়তে পারত কিন্তু উর্মিলা আবার একটি মন্তব্য করে বসল, এমন খেলোয়াড়ের মত তাগড়াই চেহারা, খেল না কেন?

বিরজু বেশ লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার ছেলে। তাকে সুদর্শনই বলা যায়। তবু তাগড়াই চেহারা বলাতে তার মত শান্ত ছেলেটিও সেদিন ভারী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, তোমারও তো দেখছি স্বর্গের অপ্সরার মত চেহারা, তুমি এমন একজোড়া বেমানান দুল পরেছ কেন?

একটুও না রেগে উর্মিলা সেদিন হো হো করে হেসে উঠেছিল।

তুমি রেগে গেলে বিরজু, আমি কিন্তু তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কথাটা বলিনি। তোমার চেহারা বেশ শক্তসমর্থ, পুরুষালী, তাই বলেছিলাম।

বিরজু অমনি শান্ত হয়ে গেল। সে বলল, আসলে আমি খেলার সময় পাই না, বাবাকে সোনার দোকানে সাহায্য করতে হয়।

তুমি তো মঙ্গলকাকার ছেলে, তাই না?

বিরজু মাথা নেড়েছিল।

মঙ্গলকাকা আমাদের বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে গল্প করেন।

বিরজু বলল, তুমি উপাধ্যায়দের বাড়ির তো?

অনন্তশয়ন উপাধ্যায়ের মেয়ে আমি।

আমাদের দোকানেও উনি মাঝে মাঝে আসেন। ভারী চমৎকার মানুষ। আমাকে কাজ করতে দেখে বলেন, পড়াশোনা আর কাজ একসঙ্গে করছ, তোমার উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না।

তুমি তোমাদের সোনার দোকানে কি কাজ কর?

নানারকম ডিজাইন তৈরী আর সেটিংয়ের কাজ।

দারুণ ব্যাপার তো! আমাকে একদিন দেখাবে, কেমন করে গয়নায় সেটিং করতে হয়?

এখন যে কোন দিন গেলে দেখতে পাবে। বিয়ের মরসুম চলছে।

জড়োয়ার গয়নায় কি দিয়ে সেটিং কর?

অনেক রকম রত্ন আছে, যে যেমনটি চায়। হীরে মুক্তো, চুনি পান্না আরও কতকিছু।

উর্মিলা হঠাৎ তার কানের দুটো দুল খুলে ফেলে বলেছিল, এ দুটো ধরতো।

কেন?

আঃ ধরই না।

বিরজু আর বাক্য ব্যয় না করে দুল দুটো উর্মিলার হাত থেকে তুলে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

এ দুটো আমার ঠাকুরমার গয়না, তুমি তোমার মনের মত করে গড়ে দিও।

বিরজু মাথা নেড়ে বলেছিল, এটা ঠিক হবে না উর্মিলা। ঠাকুরমা, দিদিমাদের গয়না একটা স্মৃতি। এর মূল্য অনেক। তোমাকে বরং একজোড়া নতুন দুল গড়িয়ে দেব। পছন্দ না হলে নিও না। এ দুটো এখন কানে পরে নাও।

তুমি যে দুল জোড়াটা গড়িয়ে দেবে সেটা কিন্তু কাউকে জানাতে পারবে না। আমি দু'চার মাসের ভেতর টাকাটা শোধ করে দেব। তোমার অসুবিধে হবে না তো?

বিরজু একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, আগে তো জিনিসটা গড়া হোক।

সাত দিন যেতে না যেতেই বিরজুকে দেখা গেল, ইস্কুলের পথে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু পরেই ঊর্মিলা ঐ পথে এসে গেল।

তোমার কানবালা তৈরী।

কানবালা, দেখি দেখি!

না, আগে আমি দেখব, তারপর তুমি।

তুমি তো গড়তে গিয়ে দেখেছ।

ওটা কোন দেখাই নয়। যার জিনিস তাকে পরিয়ে দেখতে হয়, কেমনটি মানায়। তুমি চোখ বন্ধ করে থাক, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

সেদিন চোখ বন্ধ করেছিল ঊর্মিলা। তাকে নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় কানবালা দুটি পরিয়ে দিয়েছিল এক তরুণ যাদুকর।

সেই ছিল ঊর্মিলার জীবনে তরুণ হাতের প্রথম ছোঁয়া।

শিহরণ যে এতখানি রোমাঞ্চকর হতে পারে, এ ছিল তার ভাবনার অতীত। তার নারী হৃদয়ের জাগরণ সেদিনই ঘটে গিয়েছিল।

মুখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে অলংকার-শিল্পী তাকে দেখে নিয়ে মন্তব্য করেছিল, ঠিক যেন বাঙালী টোলার দুর্গা প্রতিমাটি। এবার চোখ খোল, দেখ নিজের চোখে।

ঊর্মিলা কান্নাভেজা গলায় বলেছিল, আয়না ছাড়া নিজেকে বুঝি দেখা যায়?

হাসতে হাসতে বিরজু বলেছিল, খদ্দের নিজের চোখে দেখে পছন্দ না করলে দোকানদার দাম পাবে কি করে।

বলতে বলতেই সে তার ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা আয়না বের করে তুলে ধরেছিল ঊর্মিলার মুখের সামনে।

দেখ, দেখ, নিজেকে চিনতে পার কিনা?

উচ্ছ্বাসে ঊর্মিলা বলে উঠেছিল, অপূর্ব!

অলংকারটি, না যে পরেছে সে?

সত্যি তোমার হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মত।

বিরজু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ঐ কাজটি দয়া করে কর না যেন; গরীব ব্রাহ্মণের গয়না গড়ে খাবার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে।

দুজনেই সেদিন দুজনের হাত ধরে নাড়া দিতে দিতে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছিল।

ফাল্গুনের মন কেমন করা হাওয়া ছুটে এসেছিল গঙ্গার জল ছুঁয়ে। আনন্দে করতালি দিয়ে উঠেছিল গাছের পাতা। দুটি তরতাজা তরুণ তরুণীর দেহে শিহরণ তুলে সে বাতাস সেদিন অপূর্ব এক রাগিণী বাজিয়েছিল দুটি হৃদয়ের গভীরে।

সেই রাগিণী কখনো স্ফুট, কখনো অস্ফুট স্বরে আজও বাজে। তারপর কালের যাত্রায় কত ঢেউয়ের ওঠাপড়ার ভেতর দিয়ে দুটি হৃদয় ভেসে এসেছে, কিন্তু আজও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি মহাকাল। সেই প্রথম দিনের রোমাঞ্চিত কদম্ব আজও ফোটে, গন্ধ ছড়ায় দুটি হৃদয়ে।

ওরা যেন উপনিষদের দুটি পাখি। একজনকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে ভোগের জগতে, অন্যজন তাকিয়ে আছে শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায়।

অনেক ওলোটপালট হয়ে গেছে সংসারের চক্রপথে। মিশ্রদের জুয়েলারী হাউস হস্তান্তরিত হয়েছে উপাধ্যায় পরিবারের হাতে। আবার অনন্তশয়ন উপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রবেশ করেছে চতুর্বেদী বংশের বধূ হয়ে।

সামাজিক এই প্রবাহের পাশে পাশে অলক্ষ্যে ভেসে চলেছে একটি মালা, যার গ্রন্থি আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি।

যেদিন সামাজিক অনুশাসনে মিলিত হতে পারল না দুটি নারী পুরুষ, সেদিন রমণীটি নিভৃতে

বলেছিল, আমাদের ভালবাসা নিখাদ সোনার মত। তুমি আমাদের সোনার দোকানে নিত্য নতুন নতুন অলংকার সৃষ্টি করবে। সেটা আমাদের ভালবাসার নিদর্শন হয়ে শোভা পাবে নববধূর অঙ্গে। মিলন-পিপাসু পুরুষ মুগ্ধ হবে তাই দেখে। আমাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এতেই তৃপ্তি পাবে।

পুরুষটি বলেছিল, তোমার আদেশ আমি মেনে নেব শুধু একটি শর্তে।

বল।

আমি নিজের হাতে অলংকার তৈরী করব শুধু নববধূর। আর সেই অলংকারে সেজে তুমি সামান্য সময়ের জন্যে হলেও আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। আমি তোমার ভেতর দিয়ে আমার সেই হারিয়ে যাওয়া আঠারো বছরের মেয়েটিকে ফিরে পাব।

বেশ তাই হবে।

আঁখি চোখের আড়ালে চলে যাবার পর একটি বছর পার হয়ে গেছে। ঊর্মিলাদেবী আঁখির ঘরটিকে সজিয়েছেন ফুলে ফুলে। সেই বিদেশী প্রেমিক পুরুষটির তোলা নাচের ছবিখানাকে ফুলের জলসার মাঝখানে রেখে দিয়েছেন। ছবি নয়তো, সতেজ, সজীব একটি মেয়ে নাচের মুদ্রায় ফুলের অলংকারে সেজে তাকিয়ে আছে।

ঊর্মিলা চতুর্বেদীর পলক পড়ছে না চোখে। মনে হচ্ছে ঐ ছবির ভেতর দিয়ে অপরিবর্তনীয় নিজেকেই তিনি দেখছেন।

পেছনে এসে দাঁড়ালেন একটি মানুষ।

—ফিরে তাকালেন ঊর্মিলা।

এই যে তুমি এসে গেছ বিরজু, আমি তোমার অপেক্ষায়।

আশ্চর্য! ফুলের গয়নায় সেজে ও কার মূর্তি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না বিরজু। তোমার তরুণী জীবনের এমন অপূর্ব ছবিটি এখানে কি করে এলো!

হাসলেন ঊর্মিলা চতুর্বেদী।

চিনতে পারছ না আঁখিকে? তুমিই তো ওকে দেখে প্রথম বলেছিলে, অবিকল মায়ের মত। তারপর ঘরে বাইরে সকলেই তাই বলত।

অপূর্ব সুন্দর এই রঙীন ছবিটি। ফুলের এমন সূক্ষ্ম অলংকার আমি আগে কখনো দেখিনি।

তাই আজ তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি বিরজু।

বল কি আদেশ?

আদেশ নয় বিরজু, একান্ত মিনতি। তুমি আঁখির এই ফটোখানা নিয়ে গিয়ে জুয়েলারী হাউসের শো-রুমে রেখে দেবে।

অবশ্যই।

আরও কথা আছে, আর একটি অনুরোধ। বলতে পার, এটি আমার শেষ অনুরোধ।

বল ঊর্মিলা।

তুমি একসময় অলংকারের নমুনা সংগ্রহ করতে ভুবনেশ্বর, কোনারক, খাজুরাহো আর বেলুর গিয়েছিলে না?

হ্যাঁ সেবার আমি একাই ঘুরে ঘুরে মূর্তির গায়ের অলংকার দেখে বেড়িয়েছিলাম।

আর একবার আমি আর আঁখি ছিলাম তোমার সঙ্গী। সেবার গিয়েছিলাম আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির দেখতে।

সেসব দিনের স্মৃতি ভোলার নয়।

মনে আছে, শ্বেত পাথরের তৈরী ফুলের পাপড়িগুলোকে মনে হচ্ছিল পাতলা কাঁচের বুদবুদের মত।

খুব মনে আছে উর্মিলা। আঁখি বলেছিল, এসব কোন মানুষ তৈরী করেছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা মানুষের বেশে এসে এই অবিশ্বাস্য শিল্পকর্মগুলি সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ তাই বলেছিল আঁখি। তুমি তার উত্তরে কি বলেছিলে মনে আছে?

আমি বলেছিলাম, এসব মানুষেরই হাতের তৈরী জিনিস বেটী। মানুষ চেষ্টা করলে পারে না, এমন কিছু নেই।

আমি তাই তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধটি নিয়ে এসেছি বিরজু।

বল।

আঁখির ঐ ছবিতে ফুলের যত অলংকার আছে তা তুমি নিজের হাতে সোনা আর রত্ন গেঁথে তৈরী করে দেবে। ফুলের নিটোল পাপড়িগুলোও যেন তোমার হাতে উঠে আসে অবিকল।

আমি আমার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে এই শেষ কাজটি করে যাব। কিন্তু ...।

কিন্তু কি বিরজু?

এটির পর আমি আর কোন কাজ নিজের হাতে করব না।

তাই হবে। আর এই শেষ কাজটি বিক্রির জন্য নয়, এটি থাকবে আমাদের শো-কেসে মূল্যবান, দর্শনীয় একটি শিল্পকর্ম হিসেবে।

আমার একটি শেষ আবেদন আছে।

বল বিরজু।

কাজ শেষ হলে ঐ অলংকার পরে শেষবারের মত তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াবে।

সমস্ত দুর্ভাগ্যের পাষাণভার নিয়ে আমি কেমন করে ঐ সোনার সাজে সাজব বিরজু!

শুধু কয়েক দণ্ডের জন্য এই মানুষটার কথা মনে করে সাজবে। আমি সংসার চাইনি, স্ত্রী পুত্র ইন্দ্রিয়সুখ, কিছুই চাইনি। আমি নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে যে নারীর সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে আছি, সে আমার শিল্পী-জীবনের অভিন্ন সত্তা উর্মিলা।

আমি জানি বিরজু জানি। তুমি আমার গোপন হৃদয় থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস। আমার নিভৃত ভাবনার থেকে গড়িয়ে পড়া চোখের জল। শুধু বঞ্চিত একটি মানুষের কথা ভেবেই আমি সাজব। তুমি নিজের হাতে আমাকে সাজিয়ে দিও।

●

অজানা বন্ধনে

এক ঝাঁক খোঁচা খাওয়া ভীমরুল মনে হল বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে আসছে বনের বাইরে। সিক্স মাইলের পীচ ঢালা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো কটা গজলাবাজ ছেলে কান খাড়া করে শুনছে সে আওয়াজ। এই মুহূর্তে কারো মুখে কোন কথা নেই।

পাণ্ডুমান থাপা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, বিক্রম, বিক্রম।

নামটা আরও কয়েকজনের মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। রাস্তার ধারে ধারে ছোট বড় মাঝারি সারি সারি সব ক'টা দোকানঘরের দরজা তখনও খোলেনি। পাণ্ডুমানের চেঁচানি শুনে বুড়োরা মুখ থেকে চুট্টা নামিয়ে কান খাড়া করে রইল। মেয়ের দলের কৌতূহলটা বেশি। তারা এতক্ষণ জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখছিল, এখন হাট করে খুলে চোখ পেতে রইল রাস্তার ওপর।

দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে পা লম্বা করে টান টান শুয়ে থাকলে ঠিক যেমন দেখায় সিক্স মাইলের কাছে রাস্তার চেহারাটা ঠিক তেমনি। এক হাত চলে গেছে ঘুম পেরিয়ে দার্জিলিং-এর দিকে। অন্য হাতখানা গেছে তিস্তা পেরিয়ে সিকিম মুখো। আর পা সমেত ধড়টা ঝুলে পড়েছে ক্রমাগত নীচে, পাহাড়ী বন পেরিয়ে তাগদা, রংলী, গীল, নামরিং-এর দিকে।

বোঁ বোঁ শব্দ করে গজরাতে গজরাতে বন ফুঁড়ে ওপরের রাস্তায় উঠে এল বিক্রমের তাম্রিমারা ল্যাণ্ডরোভারখানা। হৈ হৈ করে তার সামনে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছোকরার দল। ওপরের রাস্তায় উঠে এসে দার্জিলিং-এর দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ব্রেক কষল বিক্রম। স্টিয়ারিং-এ বাঁ হাতখানা রেখে ঘাড় সমেত মুন্ডুটা গাড়ির বাইরে ঠেলে দিয়ে চোখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে চেয়ে রইল সে।

কথা বলল শান্তামান। বলল, ভারি একটা অঘটন ঘটে গেছে বিক্রম। রীখিমায়াকে নিয়ে একটা ভিন্‌দেশী আজ ভোররাতে ভেগেছে।

সিক্স মাইল জায়গাটা এক চিল্‌তে। ক'টা চা আর মুদিখানা, একটা ছাতা পড়া লাড্ডু মেঠাইয়ের দোকান। কালেভদ্রে কেউ শখ করে বা দূর-আত্মীয়কে খাতির জানাতে কিনে নিয়ে যায়। ওদিকে একটা বড় চৌবাচ্চা। পথের গাড়ি দরকার হলে জল নেয়। ছোটখাটো একটা গাড়ি রিপেয়ারিং-এর দোকানও আছে। সব শেষের বাড়িটার গায়ে সাইনবোর্ড লটকানো, 'ভ্যালিভিউ হোটেল।' নিতান্ত কপাল মন্দ হলে যে সব ট্যুরিস্টের গাড়ি সিক্স মাইলে এসে বিগড়ে যায়, আর লোকাল সারাইয়ের দোকানও হালে পানি পায় না তারা বাধ্য হয়ে খদ্দের হয় ভ্যালিভিউ হোটেলের। তাছাড়া পথচলতি দু-চারজন খদ্দের প্রায় রোজ জুটে যায়।

হোটেল মালিক বুড়ো বীরবাহাদুর। বিপত্নীক অনেকদিন। স্ত্রী বিয়োগের পরে কিছুকাল দারুণ রকম মনমরা হয়ে ছিল। একটি মাত্র মেয়ে রীখিমায়াকে বিয়ে দিয়ে জামাই এনে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল এই হোটেলে, কিন্তু তা আর হল না। রীখির বিয়ের বয়েস হতে না হতেই হঠাৎ বীরবাহাদুর একদিন আবিষ্কার করল, তার ভেতরের রস তখনও শুকিয়ে যায়নি। অবশ্য তার এই আবিষ্কারে সবচেয়ে বেশি যে সাহায্য করেছিল সে কাঞ্চী মংগর্ণী, হোটেলের কুক-কাম-পরিচারিকা।

ব্যাপারটা ধীরে ধীরে সকলেই জানল, আবার আস্তে আস্তে গা সওয়াও হয়ে গেল। বীরবাহাদুর কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বিয়ে করল না মংগর্ণীকে। মেয়েকে সত্যিই বড় ভালবাসত বীরবাহাদুর। কাঞ্চী মংগর্ণী প্রথম দিকে পীড়াপীড়ি করেছিল তাকে বিয়ে করে সমাজে স্বীকৃতি দেবার

জন্যে, কিন্তু একদিন বীরবাহাদুরের হাতে বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেয়ে চিরদিনের মত চুপ করে গিয়েছিল সে। অবৈধ প্রেমের সঙ্গে প্রহারের যোগটা সে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে শিখল তখন থেকে।

বীরবাহাদুর এত করেও কিন্তু মেয়েকে ধরে রাখতে পারল না। তার মনেব ইচ্ছাটুকু পূর্ণ হবার আগেই মেয়ে রীখিমায়া অপরিচিত মানুষটার সঙ্গে বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে।

হয়তো এই পলায়নে গোপন সাহায্য ছিল কাঞ্চীর। আর তাই ভেবে বীর বাহাদুর বুনো জানোয়ারের মত গোঁত্তা দিয়ে মাটিতে তাকে পেড়ে ফেলে কীল চড় ঘুষির শিলাবৃষ্টি চালিয়েছিল। কিন্তু মুখ থেকে গোঙানী বেরোলেও রীখির পলায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কথা বেরোয়নি। মারটা অতিরিক্ত হবার ফলে কান্নাটা মাত্রাতিরিক্ত হয়েছিল, আর তাই রাত শেষে ভীড় জমে উঠেছিল হোটেলের সামনে। রীখিমায়ার পলায়নের কথাটা রাষ্ট্র হতে তাই সময়ও লাগেনি।

এ ব্যাপারে ছেলেছোকরাদের উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। তারা দুরন্ত রীখিকে ঘিরে নিজেদের ভেতর একটা অঘোষিত যুদ্ধে মেতেছিল এতকাল, কিন্তু আজ হঠাৎ আবিষ্কার করল, তারা সবাই ঠকেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভেতর সন্ধি হয়ে গেল। এখন রীখির সেই ভেল্‌কি লাগানো প্রেমিকই হল সিক্স মাইলের নওজোওয়ানদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিক্রম গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কোমরে দুটো হাত রেখে পাক্কা ডিটেকটিভের মত জিজ্ঞেস করল, লোকটা কবে ঢুকেছিল এ তল্লাটে?

কে যেন বলল, তিন চার দিনের বেশি নয়।

ছিল কোথা? আবার প্রশ্ন করল বিক্রম। এবার নিজেই উত্তর দিলে, নিশ্চয়ই হোটেলে।

অনেকেই সাথে সাথে উচ্চারণ করল, বীরবাহাদুরের হোটেলে।

বিক্রম হেসে বলল, সে তো জানা কথা।

পাণ্ডুমান বলল, আমরা আগে কিছু আঁচ করতে পারিনি। পরশু রাতে হঠাৎ কাওয়ালির আওয়াজ শুনে হোটেলে গিয়ে দেখি লোকটা দিব্যি ফূর্তিবাজ। ভারি মিঠে গলা।

বিক্রমের গলায় প্রচ্ছন্ন কৌতুক, তোরা অমনি গান শুনতে বসে গেলি, কি বল?

মণিকুমার বলল, তুমিও ওর গান শুনলে উঠতে পারতে না বিক্রম। কোথা দিয়ে রাত কাবার হয়ে যেত।

বিক্রম বলল, তারপর আসল ঘটনাটা কি এখন তাই বল তো শুনি।

পাণ্ডুমানই এবার কথা বলল, কাল সন্ধ্যা থেকে লোকটা কাওয়ালি শুরু করেছিল, ভীড়ও জমেছিল প্রচুর, কিন্তু গান বেশি রাত অব্দি এগোয়নি। তাড়াতাড়ি আসর ভেঙে দিয়েছিল গাইয়ে। তবিয়ত ঠিক নেই বলে মাফিও চেয়ে নিয়েছিল। তারপর শেষ রাতে হাওয়া।

বিক্রম বলল, গানের পুরো পাওনা চুকিয়ে নিয়ে হাওয়া বল।

কথাটা কৌতুকের, কিন্তু এই মুহূর্তে ঐ কৌতুকটুকু উপভোগ করার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না।

এবার সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বিক্রম বলল, এখন চটপট বলে ফেল তো দেখি, আমাকে কি করতে হবে?

পাণ্ডুমান বলল, তুমি যাচ্ছ দার্জিলিং-এর দিকে। ওরা নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে এতক্ষণে বড় বেশি একটা দূর এগোতে পারেনি। আমরা তোমার গাড়িতে গিয়ে লোকটাকে ধরব।

বিক্রম বলল, ওরা যে তিস্তার দিকে যায়নি তার প্রমাণ?

মণিকুমার বলল, একটু আগে একটা লোক তিস্তার দিক থেকে পায়দলে এদিক দিয়ে গেল। সে রাতভোর হাঁটছে, ওদের কাউকে দেখেনি।

বিক্রম বলল, আমার দু-দুটো চাকায় গড়বড় আছে, আমি তোদের কাউকে নিতে পারব না। ফিরতি পথে অনেক মাল আনতে হবে, তখন উপরি কাউকে গাড়িতে চাপানো অসম্ভব। এখন আমার গাড়িতে গেলে বেকার পয়সা খসিয়ে অন্য গাড়িতে আসতে হবে। কি দরকার। তার চেয়ে আমি গাড়িটা ছুটিয়ে দি, পাত্তা মিললে পাকড়াও করে আনব।

ওদের ফুটন্ত উৎসাহে কিছুটা জল পড়লেও আপাতত বিক্রমের প্রস্তাবেই সকলকে সায় দিতে হল। বিক্রম আর কালবিলম্ব না করে গাড়িতে উঠল। গাড়ি গর্জন করতে করতে ছুটল দার্জিলিং-এর পথে। ক'টা উৎসাহী ছোকরা উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে গাড়ির পিছন পিছন কিছুটা দূর ছুটেও এল।

বিক্রম এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ী বাঁকগুলো পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাঁয়ে গভীর গিরিখাদ। বিক্রমের চোখের ওপর ভাসছে রীখির মুখখানা। কতদিন রীখি হোটেলে তার খাবার থালার পাশে চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হলেই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে বলেছে, আর কিছু দেব?

বিক্রমের মুখে কিছুই আটকায় না। সে বলেছে, যা চাই তা দেবার ক্ষমতা আছে?

রীখি তখন আর লাজুক মেয়েটি না, সেও চাপা গলায় বলেছে, চেয়েই দেখ না।

চাওয়া কিন্তু আর হয়নি বিক্রমের। বয়েসে তার চেয়ে রীখি অনেক ছোটই বলা যায়। বিক্রম ওকে বেশ কম বয়স থেকেই দেখছে। মাঝে মাঝে ওকে দার্জিলিং থেকে ওর বায়নার টুকিটাকি জিনিস এনে দিয়েছে। তখন কেমন একটা দাদাগিরি ফলাবার বাসনা জেগে উঠত তার মনে, তার বেশি কিছু নয়।

অবশ্য রীখি দেখতে দেখতে চোখের ওপর ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠল। এক একদিন ও এমন সেজেগুজে বিক্রমের খাবার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াত, যখন শিবেরও ধ্যান ভাঙত, বিক্রম তো কোন্ ছার।

রীখি চাইত সবাই ওকে দেখুক, বিশেষ করে গোঁয়ারগোবিন্দ ঐ বিক্রম।

এদিকে বিক্রমেরও এক একদিন নেশা ধরে যেত। জিভের খাবার ফেলে ও চোখের খাবার খেতে চাইত। রীখির দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হত, ওকে যেন সে আগে কখনো দেখেনি, এই নতুন ফুটে ওঠা মেয়েটিকে সদ্য দেখছে। ওকে টুক করে বোঁটা থেকে তুলে নিয়ে আকুল গন্ধটা লুটে নিতে ইচ্ছে করত।

ওর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে ভালবাসত রীখি। মেজাজ থাকলে বিক্রম জবাব দিত সমান তালে, আর মর্জি না হলে হঠিয়ে দিত এক ধমকে। মুখ ভার করে সরে যেত রীখি, কিন্তু মন ভরে থাকত বিক্রমের ভাবনায়।

আরও খানিক বড় হয়ে যখন তাল রেখে চলতে পারল না বিক্রমের মেজাজ মর্জির সঙ্গে, তখন ছিটকে বেরিয়ে গেল রীখি। সিক্স মাইল মহল্লার উঠতি ছোকরার দল হল তার চোখের ভোগ আর যৌবন নিকুঞ্জের স্তাবক পাখি।

এতে দুঃখ পায়নি বিক্রম। চিরদিনই সে কেমন যেন নিরাসক্ত। নিজের ভেতর এমন কিছু শক্তির সঞ্চয় তার আছে যা বাইরের সবকিছু আঘাতকে মুহূর্তে প্রতিরোধ করতে পারে। তাই কোন ক্ষতি কান দুঃখ তাকে দীর্ঘ সময় পীড়িত করতে পারে না।

আজকাল সে বেশ কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল, রীখি পথের ওপর চোখ পেতে রাখে, কোন খাড়া করে কি যেন শোনে। চড়ুই পাখির মত এই আছে, এই নেই। ওর মন যা চাইছে তা না পেলেই ও ক্ষেপে ওঠে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর চেয়ে অনেক বড় ছেলেদের পোশাক ধরে টান দিয়ে হাজার কথা শুনিয়ে দেয়। আবার একদঙ্গল ছেলের সঙ্গে রাতভোর হল্লা করতে করতে দূরের কোন মেলা বা

সার্কাস দেখতে চলে যায়। বীরবাহাদুর কিছু বলে না। ইতিমধ্যেই বাপের ওপর খবরদারী করার অধিকার জন্মে গেছে মেয়ের।

বিক্রম এ তল্লাটে সবাইকার পরিচিত। কেবল পরিচিত নয়, প্রিয়ও বটে। দার্জিলিং থেকে সিক্স মাইল আর সিক্স মাইল থেকে গভীর কণি ফারের জঙ্গল পেরিয়ে তাগদা অব্দি বিস্তৃত বিশাল এলাকার প্রায় প্রতিটি লোকই জানে বিক্রমকে। বিক্রমকে জানা মানেই ওর ল্যান্ডরোভার গাড়িখানাকেও জানা। হেন লোক নেই যে বিক্রমের গাড়িতে ওঠেনি। আর এ হেন যাত্রী নেই যে দার্জিলিং থেকে বিক্রমের গাড়িতে চেপে তাগদা অব্দি একদমে পৌঁছে গেছে।

পথের ওপর বার পাঁচ সাত বিক্রমের ঐ তাপ্পিমারা ঝড়ঝড়ে গাড়িখানার হঠাৎ দম ফুরিয়ে যায়। বিক্রম ওপর থেকে যতই কলকাঠি নাড়ুক গাড়িখানা দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। শেষে নীচে নেমে বিক্রমকে করতে হয় সাধ্যসাধনা। কখনো গাড়ির মুখ হাঁ করে তার ভেতর আধখানা ঢুকে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে হয়, কখনো বা অদৃশ্য হয়ে যেতে হয় গাড়ির তলায়। নতুন যাত্রীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও করার কিছু থাকে না। আর পুরোনো যাত্রীদের ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে দার্জিলিং টু তাগদা পথের সব যাত্রীই জানে ঝড় বৃষ্টি ধস, গভীর রাতের বিজলীঝলক দুর্যোগ সব কিছুকে উপেক্ষা করে একটি গাড়িই শুধু পথে চলে, সেটি বিক্রমের ল্যান্ডরোভার। দেরি হতে পারে, যাত্রীদের সহ্যের সীমা পেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বিক্রমের গাড়ি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েও তাগদা পৌঁছবেই।

অঘটনের মুখোমুখি কতবার যে হতে হয়েছে যাত্রীদের তার লেখা-জোখা নেই। দৈব যেন প্রতিটি যাত্রায় বাঁচিয়ে দেয় বিক্রমের সোয়ারীদের।

একবার একদল যাত্রী, ছেলেপুলে বুড়োবুড়ি মিলে তা প্রায় ডজনখানেক উঠেছিল বিক্রমের গাড়িতে। তারা আসছিল দার্জিলিং থেকে তাগদা। পথে বৃষ্টি ঝেঁপে এল। সিক্স মাইলের একটু দূরে আঁধার নামল ঘুরঘুট্টি। পথ দেখা যায় না। হেডলাইটের আলো দুটো মাতালের ঢুলুঢুলু লাল চোখের মত মিটমিট করছে। একদিকে গভীর পাহাড়ী জঙ্গল, অন্যদিকে গভীর গিরিখাদ। গাড়ি বর্ষার বান ডাকা রাস্তার ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলেছে। যাত্রীদের মুখে কথা নেই। তারা দিনের আলোয় পথের চেহারা দেখেছে। সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়ী পথেই ফিরছে গাড়ি। তার ওপর এই দিকবিদিক কাঁপানো দুর্যোগ। ক'টি প্রাণী বসে আছে হাতের মুঠোয় প্রাণগুলো নিয়ে। এক সময় গাড়ির ব্যাটারী গেল বিগড়ে, আলো গেল নিভে। ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল পথের ওপর। লাফ দিয়ে নীচে নেমে বিক্রম লাগল সারাইয়ের কাজে। আলো নেই, বিদ্যুৎ চমকায় তো বিক্রম গাড়ি দেখে নেবার চেষ্টা করে। অন্ধকারে গাড়ির নাড়িভুঁড়িগুলো হাতড়ে দেখে। এক সময় বিক্রম উঠে বসল গাড়িতে। বলল, গাড়ি ঠেলতে হবে।

ক'জন সেই বর্ষায় নেমে গাড়িতে ঠেলা দিলে। একটা ঢালু পথে গাড়ি এবার গড়াতে শুরু করল। আলো নেই শুধু গড়িয়ে চলেছে গাড়ি। ওই অন্ধকারে যে কোন মুহূর্তে গভীর গিরিখাদে গাড়ি গড়িয়ে পড়তে পারে। তার পরের অবস্থা না ভাবাই ভাল।

পেছনের লোকেরা গাড়ি দেখতে না পেয়ে চেঁচাতে লাগল। গাড়ির ভেতরে তখন আতঙ্কের আর্ত কলরোল শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ গড়ানো গাড়িখানা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড় করাল বিক্রম।

দারুণ ধমক দিয়ে বলল, তোমাদের জান্ আছে, আমার নেই? এ রাস্তায় চোখ বুজে আমি গাড়ি চালাতে পারি। আঁক-বাঁক সব আমার মুখস্ত। চেঁচামেচি করলে আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে রাখছি। চুপচাপ বসে থাক।

পিছনের লোকগুলো ইতিমধ্যে হোঁচট খেতে খেতে গাড়ির কাছে এসে পড়েছে।

তারাও ধমক খেল বিক্রমের কাছে। বিক্রম বলল, গাড়ি ছেড়ে দিলেই বিপদে পড়তে হবে। এখন

দয়া করে গাড়িটা আর একটু ঠেলে দিলে ভাল হয়। খানিক দূরে তাগাদার রাস্তায় গাড়ি নামবে, তখন ডাউনে আপনি গড়িয়ে যাবে।

তাই হল। গড়াতে গড়াতে গাড়ি স্টার্টও নিল। অতি ক্ষীণ লালচে একটা আলো পড়ল পথের ওপর। যাত্রীরা কিছু দেখতে না পেলেও বিক্রম যে দিব্যি সেই আলোয় সবকিছু দেখতে পাচ্ছে তা বোঝা গেল গাড়ির স্পিড দেখে।

গাড়ি তাগদায় পৌঁছল গভীর রাতে। মেঘ সরে গিয়ে তখন পথের ওপর পড়েছে চাঁদের আলো। যাত্রীরা নেমে দাঁড়াতেই বিক্রম বলল, আজ রাতভোর আরাম করুন। কাল সকালে এসে আমি ভাড়ার টাকা নিয়ে যাব। রাগ করবেন না।

গাড়ি চালিয়ে বিক্রম আরও নীচের দিকে গড়িয়ে গেল। যাত্রীরা শুনল, বিক্রম শিস দিচ্ছে।

বিক্রম চলেছে দার্জিলিং-এর পথে। দুটি পলাতক আসামীর পিছনে সে ধাওয়া করে চলেছে। আজ এই মুহূর্তে তার মনে হল সে হেরে গেছে ঐ কাওয়ালী গাইয়ে লোকটার কাছে। সিক্স মাইলের এতগুলো যুবকের টান একদিকে আর ঐ গাইয়ে মানুষটা একদিকে। টাগ-অব-ওয়ারে জিতে গেল লোকটা। আর জেতার সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল সেরা পুরস্কারটা ছিনিয়ে নিয়ে।

বিক্রম জানে, সে ঠিক ঐ ছোকরাদের দলে নয়, তবু অদৃশ্য এক বাঁধনে। জড়িয়ে পড়েছিল বইকি রীখির সঙ্গে। যতদিন রীখি চোখের ওপর ছিল ততদিন বিক্রমের কাছে রীখির আলাদা মূল্যটা ধরা পড়েনি। একটি চপল ডাগর তরুণীর আকর্ষণ তাকে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ছোঁয়া দিয়ে গেলেও তার শক্ত মেজাজটাকে নাড়া দিয়ে একেবারে পেড়ে ফেলতে পারেনি। সে জানত জগতের আর পাঁচটা তরুণীর মত রীখিও একজন। তার আলাদা কোন সত্তা নেই। জোয়ান ছেলে দেখলে ওদের মন কেমন করে। মনের কথা চোখের ভাষায় ফুটিয়ে তোলে। ঘরের চালে প্রথম বৃষ্টির বোলের মত মাঝে মাঝে চড়বড়িয়ে কথা বলে যায়। এতে সে খুশি ছড়ায়, নিজেও খুশি হয়ে ওঠে।

বিক্রম রীখিকেও ঐ চোখেই দেখেছে। নতুন কোন বিশেষত্বের সন্ধান সে পায়নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার মনে হল রীখি সাধারণ নয়। তার দাম ঠিক মত এতদিন যাচাই করে দেখা হয়নি। ঘরের বাক্সে এক কোণে পড়ে থাকা হীরের টুকরোর মূল্য কে কবে আর যাচাই করে দেখে। কিন্তু চোরে নিয়ে গেলে তখন সে হীরেখানা দারুণ দুর্মূল্য বলে মনে হয়, আর হায় হায় করে ওঠে মন। রীখির বেলাতেও বিক্রমের হল সেই অবস্থা।

গাড়িটা বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে চলেছে। পলাতক দুটো হরিণের পিছনে থাবার মাটি সরাতে সরাতে যেন হাওয়া চিরে ছুটে চলেছে একটা দুরন্ত চিতা। কুয়াশা উঠে আসছে ভ্যালি থেকে। মাঝে মাঝে পথ ছেয়ে যাচ্ছে আবছায়ায়। আবার ভোরের নরম আলোয় ভেসে যাচ্ছে পথ। গাছের কচি পাতায় আলোর সে কি সোনা ছড়ানো খেলা।

দূরে ঘুমপাহাড়ের মাথায় র‍্যাডার যন্ত্রটা স্টীলের ছাতার মত জেগে আছে। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল কারা যেন চলেছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়িখানাকে দাঁড় করাল বিক্রম। মুখ বের করে খানিক দূর থেকে চিনল রীখিমায়াকে। সঙ্গে একটি পুরুষ। নির্ঘাৎ ঐ কাওয়ালী গাইয়ে।

হাতের নাগালে এখন শিকার। এক সেকেন্ডে ওদের ধরে ফেলবে বিক্রম। ও আর এগিয়ে গেল না। ওখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগল ওদের।

অনেক পথ ওরা রাতের অন্ধকারে পার হয়ে এসেছে। বেশ মনে হচ্ছে, ক্লান্ত, তবু চলার আবেগে ভাটা পড়েনি। দুজনে পাশাপাশি ঘন হয়ে হাঁটছে।

কোথায় চলেছে ওরা? কোথায় যেতে পারে? বিক্রমের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন এলোমেলো হাওয়ার মত উড়ে এল। ওরা হাঁটছে, হাঁটছে। এমনি করে হেঁটে চলবে কতকাল। কে বলে জীবনটা সহজে ফুরিয়ে যায়। কত চলা, কত বলা, সংসার গড়ে কত ফুল ফোটানোর খেলা, তারপর কোন একদিন সবার চোখের আড়ালে সরে যাওয়া। সে অনেক দিনের অনেক কথা।

বিক্রম ওদের দুজনকে নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবতে বসল। ওরা দুটিতে কোন এক নির্জন পাহাড়ের কোলে ছোট্ট সংসার পাতবে। একটা ঝরনা হারিয়ে যাবে ওদের কাঠের খাড়ির পাশ দিয়ে কনি ফারের জঙ্গলের ভেতর। রীখি ঐ ঝরনার জলে পোশাক কেচে শুকোতে দেবে। সারাদিন ঐ চঞ্চল মেয়েটার দিন কেটে যাবে সংসার গুছোতে। রাতে লোকটি ঘরে ফিরে খাবার খেয়ে তড়িঘড়ি বিছানা নেবে না। রীখিকে নিয়ে বসবে ঐ ঝরনার ধারে। তখন কুয়াশা সরিয়ে চাঁদ হয়তো উঁকি দেবে ফার গাছগুলোর ফাঁকে। লোকটি বউকে গান শোনাবে। রীখির মনে হবে, সে এর চেয়ে সুখ আর কোনদিন চায়নি।

হঠাৎ কি হল, বিক্রমের গাড়িখানা গর্জন করে উঠল। হর্ন বাজল ঘন ঘন।

চমকে ফিরে তাকাল রীখি। লোকটিও ফিরেছে। রীখি মুহূর্তে চিনে ফেলেছে বিক্রমের গাড়ি। সে যেন কিছু বলল তার সঙ্গীকে। তারপর দুজনে দ্রুত পা চালিয়ে পাশের পাহাড়টায় উঠতে লাগল নিজেদের লুকিয়ে ফেলার জন্যে।

বিক্রম ওদের ওঠার সুযোগ দিল। ও জানে পাহাড় এখানে খাড়াই। অনেক উঁচুতে ওঠার অথবা এদিক ওদিক যাবার সাধ্য নেই। ওরা ততক্ষণে পাহাড়ী লতাগুল্মের ওপর জেগে ওঠা একটা পঁউগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিক্রম গাড়ি চালিয়ে গাছটার কাছাকাছি এল। পঁউগাছের ডালে ফুটে আছে গোলাপী রঙের ফুল। বিক্রম জানে, নেপালীদের সাদিতে পঁউগাছের ডাল না হলে চলে না। ওর হঠাৎ মনে হল, গাছটা যেন বিয়ের আয়োজনে মেতে উঠেছে। বর আর বউ দাঁড়িয়েছে তার তলায়।

গাছটার একেবারে কাছে গাড়িটা এনে দাঁড় করাল বিক্রম।

চঞ্চল রীখি উঁকি দিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে চেয়েছিল, চোখাচোখি হয়ে গেল বিক্রমের সঙ্গে।

বিক্রম আঙুল নাচিয়ে বলল, নেমে আয় নীচে, নেমে আয়।

রীখি মুখ লুকিয়েছে গাছের আড়ালে, নামতে চায় না।

নীচ থেকে ধমক লাগাল বিক্রম, লুকোবি কোথায়, নেমে আয় বলছি।

পঁউগাছের আড়ালে থেকে ওদের কি কথা হল। ওরা আস্তে আস্তে নেমে এসে দাঁড়াল বিক্রমের একটু তফাতে।

রীখির চোখে-মুখে উদ্বেগ আতঙ্কের ছায়া। সে জানে বিক্রমের মেজাজ। একবার ক্ষেপে উঠলে বিক্রমকে রোখে কার সাধ্যি। মেরে হাড়গোড় মাংস তাল পাকিয়ে ভ্যালিতে ফেলে দেবে।

বিক্রম দেখছে পুরুষ মানুষটাকে। ভাবলেশহীন মুখ স্থির হয়ে আছে। পুরুষ মানুষের মত শক্ত সমর্থ দেহের গড়ন হলে কি হয়, চোখে মুখে খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টের ছাপ নেই। শিল্পী মানুষের আদল আছে মুখখানাতে। বিক্রম গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। লোকটি স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে।

বিক্রম কথা বলল, কি করা হয়?

লোকটার গলায় কোন আড়ষ্টতা নেই। জবাব দিল, বিয়ে-সাদিতে, আমোদ-ফূর্তির আসরে গান-বাজনা করি।

ব্যস্, আর কিছু না?

লোকটা যেন কি রকম থিতিয়ে গেল। হঠাৎ এলোপাথাড়ি জবাব দিয়ে বলল, সারা বছর এদিক

সেদিক ঘুরে বেড়াই। বড় বড় মেলা তীর্থ কোনটাই বাদ যায় না। গান গাই পয়সা পাই। উপরি পাওনা দেশ দেখা।

আবার প্রশ্ন বিক্রমের, মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, না আমার মত বাউন্ডুলে?

লোকটা যেন এমন প্রশ্ন কস্মিনকালেও শোনেনি। সে মাথা চুলকিয়ে বলল, আছে একটা ঠাঁই বাপ ঠাকুদ্দার আমলের, তবে আমি ওখানে থাকি না।

বিক্রম বলল, বুঝেছি, আগাপাস্তলা বাউন্ডুলে। এখন বল তো দেখি, মেয়েটাকে নিয়ে যে ভাগছ, ওকে খাওয়াবে কি? রাখবেই বা কোথায়?

কি উত্তর দেওয়া যায় লোকটা একেবারে ভেবেই পেল না। বিক্রম মাথা দুলিয়ে বলল, বুঝেছি। ওঠ আমার গাড়িতে।

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে ধমক লাগাল বিক্রম, ওঠ শিগগীর। আর একখানা গাড়ি তিস্তার দিক থেকে এলে ছোঁড়াগুলো তাতে নির্ঘাৎ চেপে চলে আসবে। তখন তোমার মুন্ডুটা ফাটিয়ে চ্যাংদোলা করে ফেলে দেবে ঐ ভ্যালিতে।

লোকটা এবার বিনা প্রতিবাদে গাড়িতে উঠে বসল। বিক্রম ইশারায় একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেল রীখিকে।

রীখি মুখ নীচু করে আছে দেখে বিক্রম বলল, মুখ নীচু করে আছিস কেন? মুখ তোল। তুই কি চোর না বাটপাড়? বেশ করেছিস পালিয়েছিস।

রীখি অবাক হয়ে তাকাল বিক্রমের দিকে। সে জানে বিক্রম মেজাজী, তবে এতটা সে আশা করেনি।

বিক্রমের মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলতে লাগল এবার। বলল, হ্যাঁ রে, খুব ভালবেসে ফেলেছিস ওকে? আমার চেয়েও বেশি?

দু'হাতে মুখ ঢেকে এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রীখিমায়া।

রীখির কান্নার কারণটা বুঝতে পারল না বিক্রম।

রীখি হয়তো ভেবে বসেছিল দারুণ একটা শাস্তি পাবে সে বিক্রমের কাছ থেকে, তারবদলে এ কি সহানুভূতি মাখানো কথা বলছে বিক্রম! তাই রীখির চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল।

আবার এমনও হতে পারে। বিক্রমকে রীখি একদিন ভালবেসেছিল। সেই ভালবাসার ওপরে একটা ঢাকা পড়েছিল মাত্র। আজ কথার খোঁচায় সেই আবরণটা তুলে দিতেই হয়তো রীখি কেঁদে উঠল। সে তো কোনদিন বিক্রমকে সরিয়ে দিতে চায়নি মনের থেকে। বিক্রম নিজেই সরে গেছে। তাহলে এই নতুন মানুষটার সঙ্গে তার ভালবাসার পরিমাণ নিয়ে তুলনা করছে কেন? তাই বঞ্চিত হৃদয়ের ব্যথা কি রীখির কান্না ঝরাল!

বিক্রম বলল, খামোকা কাঁদছিস কেন? এদিকে সিক্স মাইলের মস্তানগুলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত তেড়ে আসছে। আমি কোনরকমে ওদের ঠেকিয়ে রেখে এসেছি। এখন চটপট বল, কোথায় যাবার প্ল্যান করেছিস?

রীখি বলল, ঠিক জানি না, তবে ও বলছিল, আজ দার্জিলিং-এর কোন হোটেলে কাটিয়ে, কাল ভোর ভোর শিলিগুড়ি নেমে যাবে।

বিক্রম বলল, তাহলে আর শিলিগুড়ি নামতে হবে না, শিলের ঘায়ে গুঁড়ো হয়ে যাবি। এখন চল আমার গাড়িতে, যতটা পারি এগিয়ে দিয়ে আসি।

রীখির চোখে আবার জল উপচে উঠতে দেখে দারুণ এক ধমক লাগাল বিক্রম। বলল, ভিজে যে একেবারে স্যাঁতসেতে হয়ে গেলি রে। এখুনি হয়েছে কি, জীবন ভোর তো জল ঝরাতে হবে, তখন

পাবি কোথা? হ্যাঁ শোন, ওর রেস্ত কত তা জানা হয়ে গেছে, এখন নিজের কাছে কিছু সম্বল-টম্বল রেখেছিস?

রীখি চোখ মুছে বলল, মায়ের সব গয়না আমার কাছে আছে। বাবার একটি পয়সাও আমি ছুঁইনি।

বিক্রমের আবার প্রশ্ন, গয়না পরে সেজেগুজে থাকলেই কি দিন চলে যাবে?

রীখি বলল, ভেবেছি, গয়নাগুলো বেচে যে ক'হাজার টাকা পাব তাই দিয়ে একটা ছোটখাট হোটেল স্টার্ট করব।

বিক্রম রীখির মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, তুই পারবি, ঐ বাউন্ডুলেটাকে তুই বাঁধতে পারবি। চল, এখন ঝটপট উঠে পড় গাড়িতে। কেউ আবার পিছু ধাওয়া করলে সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে।

ওরা গাড়িতে এসে উঠল। এখন রীখি আর গাইয়ে মানুষটার পাশে গিয়ে বসল না। ড্রাইভারের সিটের পাশে বিক্রমের গা ঘেঁষে বসল। গাড়ি ছুটে চলল শিলিগুড়ির পথে।

রীখি ভেসে গেছে জীবনের নতুন জোয়ারে। ক'টা দিন ভাল লাগছে না বিক্রমের। শিলিগুড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার পর অনেক মিথ্যে গালগল্প বলেছে সিক্স মাইলের মস্তানদের কাছে। ক'দিন উত্তেজনা উঠেছিল তুঙ্গে এখন ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসেছে।

বিক্রম দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে রাতের ভোজটা সেরে নেয় ভ্যালি ভিউ হোটেলে। আজকাল ঐ হোটেলটায় ঢুকতে যেন ওর মন চায় না। কি যেন একটা বিরাট শূন্যতা ওখানে ওঁৎ পেতে থাকে।

বিক্রমের মেজাজ যে ভাল নেই তা বুঝতে পারে আর একজন, সে সীমা রাই। তাগদার বাজারের সব্জিওয়ালি। বাজার মানে সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছটি দোকান। তার ভেতর তিনটি সব্জির। একটি ঘরের এক চিল্‌তে কাঠের পার্টিশান করে তার ওপর একখানা চৌকিতে সাজানো থাকে সীমার সব্জি। সারাদিন সে ঘর-সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে খদ্দেরের চাহিদা মেটায়। আর রাতের বেলা তার অন্য ব্যবসা। বহু দূর দেশ-গাঁ ছেড়ে যে সব মানুষ কাজের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে এই গভীর জঙ্গলে এসে পড়ে, সেই সব স্ত্রী পুত্র ছাড়া লোকগুলোকে রাতের সঙ্গ দেয় সীমা। হাসি গান আর মনের ছোঁয়া দিয়ে ভুলিয়ে দেয় তাদের বনবাস যন্ত্রণা।

লোকগুলো কাজের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে আসে, আবার একদিন অন্য কোথাও বদলী হয়ে চলে যায়। ওদের জায়গায় আসে নতুন মুখ। সীমা মুখ দেখলেই চিনতে পারে। সেই বিশেষ মুখের লোকটির কাছে হাসির খই ছড়ায়। পাখি সেই হাসির খাবার খেতে বসলেই সীমা রাই ভুবনমোহিনী চোখের শর হানে। আহত পাখি তখন ছটফট করতে থাকে। সীমার গণ্ডী ছেড়ে তার আর পালাবার পথ থাকে না। সীমার সেবায়তনে তখন তার চলে শুশ্রূষা।

এসব জানে বিক্রম। সীমার মায়েরও ছিল এই ব্যবসা। সে একাধিক পুরুষের সাহচর্য থেকে সীমাকে কোলে পেয়েছিল। সীমা বড় হল। কিছু লেখাপড়াও নেপালী স্কুলে তাকে শেখানো হল। কিন্তু সমাজ তাকে আদর করে ঘরে তুলে নিল না। সমাজের লোকেরা এল রাতের অন্ধকারে তাকে আদর জানাতে। এখন সীমা পুরোপুরি মায়ের ব্যবসাই ধরেছে। প্রথম প্রথম সে আর পাঁচটি মেয়ের মত বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু সবাই মিলে তাকে আর বাঁচতে দিলে না। মা গত হবার পর সে ভেবে নিলে এই তার অনাগত দিনের জীবিকা।

সীমার মা থাকতে থাকতেই বিক্রম একদিন একখানা ঝড়ঝড়ে গাড়ি নিয়ে এসেছিল তার কাছে। তখন সন্ধে হয় হয়, রাতের খদ্দের আসেনি। তরুণ স্বাস্থ্যবান ছেলেটিকে দেখে কেন জানি না স্নেহ উথলে ওঠে সীমার মায়ের মনে।

ছেলেটি কিন্তু বড় বেপরোয়া। সে বলল, আমি আসছি কার্শিয়াং থেকে। গাড়ি চালাব তাগদা থেকে

দার্জিলিং। এদিকে গাড়ি বড় একটা নেই বললেই চলে। ভাল ব্যবসা হবে ভেবেই এসেছি, কিন্তু প্রথমেই ব্যাগড়া।

সীমার মা বলল, কি রকম?

রকম আর কি, বলল বিক্রম, রাতে মাথা গুঁজব তার জায়গা নেই।

আমতা আমতা করে বলল সীমার মা, এই সব্জির চৌকিতে থাকতে পারো, কিন্তু রাতে তোমার ঘুমের বিঘ্ন হতে পারে।

বিক্রম বলল, বিঘ্ন-টিঘ্ন আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। একবার বিছানায় মাথা গুঁজলে ঢাকঢোল ঘণ্টা পিটিয়েও আমাকে জাগানো যাবে না।

সেই থেকে বিক্রম তাগদা বাজারের বাসিন্দা। সকালে বেরিয়ে ফেরে সেই রাত দশ এগারোটা নাগাদ। তখন ভেতরের ঘরে আসর জমজমাট। তাতে অসুবিধে নেই বিক্রমের। সে ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে। সব্জিগুলো ততক্ষণে চৌকির তলায় আশ্রয় নেয়।

সিক্স মাইলের হোটেল থেকে খেয়েই আসে বিক্রম। এরপর গা এলিয়ে দিতে না দিতেই নিঃসাড় নিদ্রা।

সীমার মা ঘরের ভাড়া নিতে চাইল না দেখে দ্বিতীয় মাসে বিক্রম পাততাড়ি গুটাতে চাইল, তখন সীমার মা এই একরোখা ছেলেটার সঙ্গে একটা রফায় এল। সে বলল, তুমি দার্জিলিং থেকে আমার দোকানের কিছু মালপত্র বিনা ভাড়ায় এনে দিও, তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে।

শেষে ঐ শর্তে রাজি হতে হয়েছিল বিক্রমকে। এখন সীমার মা না থাকলেও সেই শর্তই বহাল রয়েছে। কিন্তু ইদানিং সীমা যেন কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছে বিক্রমের ভেতর। সে যেন মাঝে মাঝে কেমন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কাঠের পার্টিশানের ওপার থেকে সীমা হয়তো কোন চাঁদনী রাতে দেখতে পায় বিক্রম বিছানায় বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

এক সন্ধ্যায় পাহাড়ী বন কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। সীমা রাই বুঝল, আজ আর কোন খদ্দেরই নীচ অথবা ওপর থেকে এখানে আসবে না। সে সব্জিগুলো চৌকির নীচে নামিয়ে ঠায় বসে রইল বাইরের দিকে চেয়ে। কতক্ষণ এমনি বসে ছিল খেয়াল নেই। একটানা হাওয়ার গোঙানি আর বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ আওয়াজ শুনতে শুনতে সে হারিয়ে গিয়েছিল নিজের ভেতর। কত মুখ একটি একটি করে ভেসে উঠছিল তার চোখের ওপর।

...লছমী সেদিন এসেছিল তার দোকানে সব্জি কিনতে। লছমীর হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল গাবলু-গুবলু একটি বাচ্চা। লছমীর সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত সীমা। সে যেন কোন্ এক জন্মান্তর আগে। লছমী কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল সীমাকে। সে-ই পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কি রে, চিনতে পারছিস আমাকে?

সীমাই বরং আমতা আমতা করছিল।

লছমী মুখ টিপে হেসে বলেছিল, দেখ, ভাল করে চেষ্টা কর।

সীমাও হেসেছিল, কিন্তু সঠিক কিছু মনে না আসায় কতকটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল। এবার লছমী আর সীমাকে সন্দেহের ভেতর রাখেনি। বলেছিল, ইস্কুলে এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসতাম, লছমীকে ভুলে গেলি?

সীমা সব্জির দোকান থেকে পথে নেমে এসেছিল। সে লছমীর কথার জবাব দিয়েছিল লছমীর ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে। শুধু বলেছিল, এ তোর ছেলে লচমী? বাবার মত হয়েছে নিশ্চয়। তোর আদল তো দেখছি না?

লছমী হেসে বলেছিল, বাবার মুখখানা বসানো।

সীমা বলেছিল, তুই দেখতে ভাল, কিন্তু ছেলে তোর চেয়ে সুন্দর হয়েছে।

লছমী হেসে বলেছিল, তার মানে আমার মানুষটা যে আমার চেয়ে সুন্দর সে কথা বললি তো। আমি তোর প্রশংসার কথাটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।

লছমী অনাবিল হাসি হাসতে লাগল।

একসময় বাচ্চাটাকে আদর জানাতে গিয়ে সীমার মনে হল, ঘরের ভেতর ঢুকে ওকে একখানা বিস্কুট এনে দেয়। লছমীর কোলে বাচ্চাকে দিয়ে ও ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। বয়াম ভরা বিস্কুট। রাতের খদ্দেররা হঠাৎ চা খেতে চাইলে তাদের খেয়াল মেটাতে হয়। চায়ের সঙ্গে দেবার জন্যে তাই জমা রাখতে হয় বিস্কুট।

বিস্কুটের বয়ামে হাত ঢুকিয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল সীমা। বিস্কুটটা রেখে দিল বয়ামে। না, কিছুতেই এ বিস্কুট সে ঐ ফুলের মত তাজা নিষ্পাপ শিশুটির মুখে তুলে দিতে পারবে না। বাইরে বেরিয়ে এসে গলায় আফসোসের আওয়াজ তুলে বলেছিল, না ভাই, ভাঁড়ার যে একদম খালি তা বুঝতে পারিনি। এক টুকরো বিস্কুটও পড়ে নেই।

লছমী ওর হাত ধরে বলেছিল, থাক আর ভদ্রতা করতে হবে না। আজ সব্জি কিনে নিয়ে শীগগির পালাই, ওর আবার বেরোবার তাড়া আছে। রান্না হলে খেয়ে সেই সিকিমের দিকে যাবে।

সিকিমের দিকে! মুখে বিস্ময় চিহ্ন এঁকে বলেছিল সীমা, কি কাজ রে?

লছমী বলেছিল, ছাই আমি কি বুঝি ও সব। অফিস থেকে অর্কিড না কি যেন সব সংগ্রহ করতে পাঠাচ্ছে।

সীমা জানত লছমী এখানে তার মামার কাছে থেকে পড়াশোনা করত। মামারও ছিল বদলির চাকরি। এক সময় ইস্কুল ছেড়ে ও মামার সঙ্গে কোথায় যেন চলে যায়। তারপর আর দেখা নেই। সেই কতদিন পরে আবার লছমী এল তার চেনা জায়গায়। এবার নিজের সংসারে, স্বামীর কাছে।

সীমা প্রশ্ন করেছিল, এতকাল কোথায় ছিলি তা তো বললি না?

কার্শিয়াং-এর কাছাকাছি আমার শ্বশুরবাড়িতে।

এতদিন আসিসনি কেন? আবার প্রশ্ন সীমার গলায়।

লছমী বলল, বাচ্চা আসবে কোলে, তাই শ্বশুর শাশুড়ী পাঠাতে চায়নি। তা ছাড়া এখানে তখনও বাসা পায়নি ও।

সীমা বলেছিল, কত বয়স হল তোর বাচ্চার?

তা দু' বছরে পড়েছে।

সীমা আর কথা না বাড়িয়ে লছমীকে তার দরকারী সব্জি দিয়ে বলেছিল সময় পেলে আসিস। সঙ্গে করে ওকে আনতে ভুলিস না যেন। ভুললেই কিন্তু দোকানে তোমাকে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না।

লছমী হাসতে হাসতে এক হাতে ব্যাগ আর এক হাতে বুকের কাছে ছেলে আগলে ওপরের রাস্তায় উঠে গিয়েছিল।

তার দিকে চেয়ে চেয়ে দু' চোখে জল উপছে উঠছিল সীমার। ছোট্ট সংসার, সুখী সংসার লছমীর। ভাবতে ভাবতে টনটন করে উঠেছিল সীমার বুকটা। তার মনে হচ্ছিল ঐ বাচ্চাটা যেন তার বুকটাকে খুলে তার স্তনের বোঁটায় মুখ লাগিয়ে পরম সুখে টেনে চলেছে। সে ঐ বাচ্চার কচি মাথায় তার মুখখানা ঠেকিয়ে আদরে সোহাগে ভরে দিচ্ছে।

সেই রাতেই সীমা রাই-এর কাছে এল তার পরিচিত অতিথি। মাস কয়েক আগে থেকেই এই নতুন মানুষটি তার খদ্দেরের খাতায় নাম লিখিয়েছে। লোকটিকে আগেও দেখেছে সীমা, কিন্তু তার

চলনে-বলনে একটা সম্ভ্রান্ত ভাব দেখেছিল সে। তাই তাকে কাছে ভেড়ানোর কোন চেষ্টাই করেনি, কিন্তু যে আসে সে নিজেই পথ কেটে আসে।

হঠাৎ থেমে আসা এক বৃষ্টির রাতে ঝড়ের ঝাপ্টা থেকে গা বাঁচাতে গিয়ে সীমার দোকানেই উঠে এসেছিল লোকটি। সেই আবছা আলোয় পাহাড়ী বর্ষায় মুখোমুখি হয়েছিল সে সীমার। তারপর আর তার পক্ষে ফেরা সম্ভব হয়নি। রাতের পর রাত নিঃসঙ্গ অরণ্য থেকে বাঁচবার তাগিদে সে সীমার উত্তপ্ত সান্নিধ্যে এসেছে। এমনি করে কখন সে তার অজ্ঞাতেই তার মনের গভীরে আদিম আর এক অরণ্যলোকে হারিয়ে গেছে।

সীমার কাছে এসে মানুষটি যেন সে রাতে কেমন হয়ে রইল। অভিজ্ঞ সীমা মানুষের ক্ষুধা বোঝে, ক্ষুধা উদ্রেকের সমস্ত কৌশলও তার করায়ত্ত। কিন্তু তার সমস্ত অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেও সে মানুষটাকে সে রাতে জাগাতে পারল না। শেষে বিষণ্ণ অতিথিকে সীমা বলল, কি হয়েছে তোমার? আজ এমন করে মুখখানা ভার করে রাখলে কার ভাল লাগে বল তো?

লোকটি বলল, তোমার কাছে আজ একটা কথা নিতে এসেছি সীমা।

সীমা হাসল, আমার কাছে কথা নিতে এসেছ? বল, বল কি কথা দিতে হবে তোমাকে? দেহ দেওয়াই আমার কাজ, কথা দেওয়া তো কাজ নয়।

আবার বিষণ্ণ হল মানুষটির মুখ, বলল, আমার স্ত্রী আছে, আমার ছেলে আছে সীমা। আমি তাদের মুখ চেয়ে তোমার কাছে কথা নিতে এসেছি।

সীমা বলল, আমাদের কাছে যারা আসে তাদের ভেতর বেশির ভাগই সংসারী মানুষ। তোমার বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের কাছে এটা কোন নতুন খবর নয়। এখন বল, আমার কাছ থেকে কি কথা তুমি চাও?

লোকটি বলল, আজ সকালেই আমার স্ত্রী তোমার কাছে এসেছিল বলে জানতে পারলাম। আর এও শুনলাম, সে তোমার অনেক দিনের চেনা।

একটা ঝরনার মত খল খল হাসির তরঙ্গ তুলে সীমা বলল, তুমি লছমীর বর?

মানুষটি অপরাধীর মত তাকাল সীমার মুখের দিকে।

আবার হাসির হীরে ছড়াল সীমা। বলল, তা ভয় পাবার কি আছে। বউ-এর বান্ধবীর সঙ্গে তো ঠাট্টা তামাশারই সম্পর্ক। বেচারা স্বামীর কাছে বউ নেই, তাই বান্ধবী তার শূন্য হৃদয়খানা পূর্ণ করে রেখেছিল এতকাল, তাতে কার কি ক্ষতি হতে পারে বল?

লোকটি বলল, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা প্রকাশ পেলে সংসারটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সীমা। দোহাই তোমার লছমী যেন তোমার আমার সম্পর্কটা আদপেই বুঝতে না পারে।

সীমা বলল, তার মানে তুমি আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাও না, এই তো?

তা কেন হবে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোন ছেদ পড়ার কথা তো আমি বলিনি। শুধু বাইরের আচরণে তুমি থাকবে আমার অচেনা।

সীমা বলল, তাহলে মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, আজ থেকে তোমার বউ আর আমার মাঝখানে তুমি এক দক্ষ অভিনেতা। দুজনকেই তোমার প্রেমের প্রসাদ দিয়ে যাবে, কিন্তু তোমার বউটি স্বামীর দ্বিতীয় মনটির কথা জানবে না।

লোকটি সীমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল দেখে সীমা বলল, আচ্ছা বনবাবু, তুমি যে আমার কাছে আসো, কি এমন টানে আস বলতে পারো?

লোকটি সহজ গলাতেই বলল, না এসে থাকতে পারি না, তাই আসি।

এবার সীমার চুপ করে বসে থাকার পালা। কিছুক্ষণ কি ভেবে সে বলল, প্রথম যেদিন তুমি আমার কাছে এসেছিলে, সেদিনের কথা মনে আছে?

সেদিন তাগদার বন পাহাড়ে অঝোর বৃষ্টি নেমেছিল। আমি বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

সীমা বলল, আর ঢুকে দেখলে, এ ঘরে ঢোকার পথ আছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই।

লোকটি বলল, বৃষ্টি ছাড়ল, তোমার জানলা দিয়ে নীচের টি-গার্ডেনের ঝিকিমিকি আলো দেখলাম। তোমার চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই ঝিকিমিকি রঙীন আলোর ঝিলিক। আমি আর পথ চিনে ঘরে ফিরতে পারলাম না।

সীমা বলল, এত মিষ্টি বউ তোমার, এমন ফুলের কুঁড়ি ছেলে, তাদের মুখ একবারও কি মনে পড়ল না তোমার বনবাবু?

সীমা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। একটা উদ্‌গত অশ্রুকে সে চাপা দিতে চাইল। কিছু পরে সে মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলল, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তোমার কথা রাখব শুধু একটি শর্তে। বল রাখবে?

নিশ্চয় রাখব।

সীমা বলল, আর কোনদিন আসবে না আমার কাছে, এই কথা দিয়ে যেতে হবে।

লোকটি উদাস চোখে চেয়ে বলল, বনে বনে ঘুরে অর্কিড সংগ্রহ করা আমার কাজ। অর্কিডে ফুল ফুটলে আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। আমার রাত কেটে যায় অর্কিড কালচার সেন্টারের ফুলগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে। তুমি আমার সেই দুষ্প্রাপ্য অর্কিড সীমা। পথের ধারে হঠাৎ সন্ধান পেয়েছিলাম, তোমার মোহে পড়ে গিয়েছিলাম।

সীমা বলল, আমি তোমাকে দেখে কি ভেবেছিলাম, সে-কথা আজ আর বলব না। কারণ অতীতকে মনে করতে গেলেই মোহের বাঁধনে বাঁধা পড়তে হয়। আজ কথা দাও, স্ত্রী কাছে থাক আর দূরে যাক্‌, তুমি আমার কাছে আসবে না।

কথা দিলাম সীমা।

লোকটি উদাস গলায় কথা বলে উঠে চলে যেতেই সীমা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সে এতদিন বুঝতে পারেনি দেহবিলাসিনীর শুধু দেহটাই থাকে না, মন বলেও একটা কিছু থাকে। মনের মানুষ চলে গেলে সে বুক ফাটিয়ে হাহাকার করে।

সীমা সেই বৃষ্টির দিনে বসে বসে ভাবছিল বনবাবু আর লছমীর কথা। ওরা চলে গেছে অন্য কোথাও বদলি হয়ে।

সীমার ভাবনায় ছেদ পড়ল। সীমা শুনতে পেল বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে বিক্রমের গাড়ির গর্জন কাছে-পিঠে পাহাড়ে পাহাড়ে বেজে উঠছে। গাড়ি এক সময় এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। গাড়ি থেকে নেমে দরজা ঠেলে তার আস্তানায় ঢুকে পড়েই বিক্রম দেখল, সীমা রাই তার চৌকি দখল করে বসে আছে। উদাস চোখ জানালার বাইরে হারিয়ে গেছে। বিক্রম কিছুটা অবাক হল বই কি। কালে-ভদ্রে দু-একটা দরকারী কথা ছাড়া সীমার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই ছিল না। ভোরে, সূর্যের আলো পথের ওপর লুটিয়ে পড়ার আগেই সে বেরিয়ে যায় তার কাজে, আবার সেই রাত দশটা বাজিয়ে ফেরা। সুতরাং চৌকির ওপর সীমাকে সে কোনদিনই বসে থাকতে দেখেনি। সে শুধু জানে, তার বেরিয়ে আসার পরই এই চৌকিতে সব্জি সাজিয়ে খদ্দেরের পথ চেয়ে বসে থাকে সীমা। তারপর রাত আটটার ভেতরেই দোকান-পাট বন্ধ করে পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

এদিকে সীমা চৌকি ছেড়ে তড়িঘড়ি নামতে যেতেই বিক্রম বলল, বসতে পারো, আমার কোন অসুবিধে নেই।

সীমা তবু বসল না, পাশের ঘরেও গেল না, চৌকি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইল।

বিক্রম বলল, আজ বেশ তাড়াতাড়িই আমি ফিরে এসেছি। তোমার হয়তো অসুবিধে হল খুব।

সীমা বলে উঠল, না না, তা কেন। আমি দোকান তুলেছি অনেক আগেই। এ ঘর থেকে বৃষ্টিটা ভাল দেখা যায়, তাই আপনার চৌকিতে বসেছিলাম।

বিক্রমের মেজাজটা কিছুদিন ভাল ছিল না। কেন যে সে নিজের ওপর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল তা সে নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে পারবে না! সিক্স মাইলের ভ্যালি-ভিউ হোটেলে সে আর বড় একটা ঢোকে না। একদিন ঢুকেছিল। খেতে খেতে তার মনে হল, রীখি যেন তার দিকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। নাম ধরে রীখির ডেকেও ফেলেছিল, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল হোটেল মালিকের শয্যাসঙ্গিনীটি। বিক্রম খাবার টেবিলে আর বসেনি।

কি হল, খাবার ফেলে উঠলেন যে?—মেয়েটি বলেছিল।

বিক্রম চলে যেতে যেতে বলেছিল, খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি একবার ওর থালা ভরা খাবারগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, তারপর বিক্রমের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখেছিল সে ততক্ষণে রাস্তায় পা দিয়েছে। বিক্রম সেদিন গাড়িতে আসতে আসতে ভেবেছিল, এমনটা সে না-ও করতে পারত। মেয়েটি তার উত্তর শুনে কি ভাবল কে জানে। তার চেয়ে ওখানে না যাওয়াই ভাল ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, হোটেল মালিক গেছে সিকিমে নতুন হোটেল খোলার সম্ভাবনাটুকু তলিয়ে দেখতে, আর সেই সুযোগে মেয়েটি সেজেগুজে এসেছে তার কাছে।

কথাটা ভেবেই সারা শরীরটা ওর ঘিন ঘিন করে উঠেছিল। এতটুকু নিষ্ঠা নেই। দুনিয়া থেকে সব কৃতজ্ঞতাই কি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল!

তারপর থেকে দার্জিলিং-এ সন্ধ্যে নামার আগেই ও রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে গাড়িতে প্যাসেঞ্জার তুলত আর তাগদা পৌঁছে নিজের চৌকিতে শুয়ে তবেই রাতের ছুটি।

বিক্রম আজ সীমাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। এমন সুন্দর মুখখানা কি করে হাজার মুখের ছোঁয়ায় এঁটো হয়ে যায় তা তার ধারণাতেই এল না।

বিক্রম বলল, বসতে আপত্তি আছে চৌকিতে? রাতের চৌকিটা যখন আমার তখন তার ওপর অতিথিকে বসতে বলার অধিকারটাও আমার। বসা না বসা অবশ্য অতিথির মর্জির ওপর নির্ভর করে।

সীমা বলল, ছি ছি, এমন করে বলছেন কেন? এই বসলাম আপনার চৌকিতে। হল তো? দারুণ মেজাজি মানুষ তো আপনি।

বিক্রম পোশাক ছাড়ল না। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে শরীরটাকে বাঁচাবার জন্যে তার হলুদ রঙের একটা প্লাস্টিক জ্যাকেট ছিল। কোন এক সাহেবকে ঘুম থেকে বাগডোগরায় প্লেন ধরিয়ে দিয়েছিল যথাসময়ে, তাই পুরস্কার পেয়েছিল এই জ্যাকেটখানা। সুন্দর এই হলুদ জ্যাকেট আর সাদা প্যান্টে ওকে মানাত দারুণ। মানাবে না কেন—তাকিয়ে দেখার মত চেহারাখানা ওর। দেহের গঠন আর গায়ের রঙ ওকে মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় আর পুরুষদের চোখে ঈর্ষার পাত্র করে তুলেছে।

বিক্রম তার ঐ পুরুষালি চেহারা নিয়ে যখন চৌকির আর এক প্রান্তে বসল তখন তার দিকে সংকোচে তাকাতে পারল না সীমা। আজ এমন করে হেরে গেল কেন সীমা! সে নিজেও তো কম সুন্দরী নয়। তার চোখের চাহনিতে যে সম্মোহনী আছে তা দিয়ে সে এমন কোন মানুষ নেই যাকে

আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু আজ তার কি হল! সব যাদুর খেলা কি সে ভুলে গেল! অনেক ইচ্ছাতেও সীমা তার দুটো চোখের দৃষ্টি বিক্রমের মুখের ওপর মেলে ধরতে পারল না।

বিক্রম বলল, আজ যেন সারা আকাশখানা ভেঙে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। গাড়িখানা জলে-ভাসা পথের ওপর দিয়ে চালিয়ে আনতে খুব বেগ পেতে হয়েছে।

সীমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, এমন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালান যে, দারুণ ভয় করে।

কথাটা বলেই সীমা একটুখানি অপ্রস্তুত হল। এতটা অন্তরঙ্গ কথা বলার সুযোগ বিক্রমের সঙ্গে তার কোনদিনই হয়নি। কি আবার ওভাবে বসে বিক্রম।

বিক্রম হেসে বলল, তাহলে তো চুপচাপ এই চৌকির ওপরেই বসে থাকতে হয়। আর তাতেও কি রক্ষে পাওয়া যাবে সীমা? ভূমিকম্পে সারা পাহাড়টাই ধসে পড়তে পারে।

সীমা শেষটুকু আর শুনতে পেল না। বিক্রম এই প্রথম তাকে নাম ধরে ডাকল। তার কানে শুধু বাজতে লাগল পুরুষের গলায় ডাকা একটি নাম সীমা, সীমা, সীমা। হঠাৎ সীমার কি মনে হল, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি পোশাক ছেড়ে সুস্থ হয়ে বসুন, আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

বিক্রম এবার আর সীমা রাইকে বসতে বলল না। সীমার দিকে চেয়ে সহজ গলাতেই বলল, আজ একটু সকাল সকাল আসার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সীমা। ঘরে যাও, আর আটকে তোমার কাজের সময় নষ্ট করব না।

'কাজের সময়' কথাটা সীমার কানে যেন গরম সীসের একটা তাল ঢেলে দিল। হয়তো সহজ ভাবেই কথাটা বলেছিল বিক্রম, কিন্তু এই মুহূর্তে সীমা তার ভুল ব্যাখ্যা করে বসল। যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়াল সীমা। ঝলসে উঠল তার জিভ, কি করব বলুন, আপনাদের মত ভদ্র কাজ তো শিখিনি যে ইচ্ছে করলেই বসে থাকতে পারব। দেহপাত করেই আমাদের দেহরক্ষা করতে হয়।

কি কথায় কি কথা এসে গেল! সীমা দ্রুত পা চালিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল। অবাক চোখে সেদিকে চেয়ে রইল বিক্রম। সীমার হঠাৎ জ্বলে ওঠার কারণটা সে ধরতে পারল না।

যাব্বাবা! বলে এক সময় সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিক্রম পোশাক ছেড়ে চৌকির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। হাতের কাছে আলোর সুইচটা অফ করে দিতেই মাতাল হাওয়া আর অঝোর বৃষ্টির আওয়াজটা কানে বেশি করে বাজতে লাগল। বাইরে সত্যি যেন একটা প্রলয় চলেছে।

কতক্ষণ শুয়ে থাকার পর বিক্রম উঠে বসল। হঠাৎ তার মনে হল, সে দার্জিলিং থেকে রাতের খাবার খেয়ে বেরোয়নি। বৃষ্টির দাপট দেখে ঘর থেকে বড় একটা কেউ পথে নামেনি, তাই প্যাসেঞ্জারও পাওয়া যায়নি। তাড়াতাড়ি ডেরায় পৌঁছবার জন্যে বিক্রম মনস্থ করে ফেলেছিল। খাবার কথাটা আদপেই মনে পড়েনি তার। বর্ষাকালে একটানা বৃষ্টি পড়তে থাকলেই তাগদাগামী গড়ানে পথটা আঁকাবাঁকা একটা নদী হয়ে যায়। তখন ল্যাণ্ডরোভারখানা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা। তাই অকারণে গভীর রাত করে আস্তানায় ফেরার কোন মানেই হয় না।

এখন কি করা যায়। বিক্রম দুটো কথা সইতে পারে, কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করা তার পক্ষে তো সম্ভব নয়। এখন উপায় কি? একটি মাত্র দোকানে রুটি পাওয়া যেত কিন্তু এই বৃষ্টিতে যে সব ক'টা দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে সে বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিত।

খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা যত কমতে লাগল, খাবার ইচ্ছেটা তত প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। এক সময় তার মনে হল, চৌকির নীচে সজির টোকরিতে পাকা কলার ছড়া থাকা সম্ভব। কিন্তু তার রুচিতে বাধল। সীমাকে না বলে সজির টোকরি থেকে কিছু নেওয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, বলার আগে দেখাই তো যাক খাদ্যবস্তুটা আছে কিনা?

হাতের কাছে সুইচটা অন করল বিক্রম। কিন্তু হায়, সারা তাগদা তখন গভীর অন্ধকারে বৃষ্টির গান

শুনছে। ঝড়ের ঝাপটায় কোথাও ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় একটা লণ্ডভণ্ড কান্ড ঘটিয়ে দিয়েছে।

ওদিকে পাশের ঘরে বিছানায় বুক চেপে শুয়ে পুরো শ্রাবণ আকাশের কান্নাটা কাঁদছিল সীমা। কার ওপর অভিমানে সে কাঁদছিল? দেহবিলাসিনী আবার অভিমান করবে কার ওপর, একমাত্র নিজের ওপরে ছাড়া। সীমার অভিমান হয়তো নিজের ওপরেই ছিল। সত্যিই তো, তাকে হাজার মানুষের ক্ষুধা মেটানোর কাজ নিয়েই থাকতে হয়। ঠিকই বলেছে বিক্রম। এতে তার দিক থেকে কোন অন্যায়ই তো হয়নি।

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়তেই সীমা বিছানায় উঠে বসল। আবার জোরে জোরে কয়েকটা ঘা পড়তেই সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে সুইচ অন করল, কিন্তু আলো জ্বলল না। সে দরজাটা খুলে দিল।

একেবারে মুখের ওপর যেন বেজে উঠল বিক্রমের গলা, কিছু খাওয়াতে পারো সীমা, মনে হচ্ছে এ বৃষ্টিতে রুটির দোকান খোলা পাওয়া যাবে না।

সীমা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। এ মানুষের ওপর কেউ রাগ করে! একটা শিশুর মত যার মনের ওপর আঘাতের কোন দাগই পড়ে না।

সীমা কোন কথা না বলে একটা লণ্ঠন জ্বালল। বাতাসের ঝাপটায় মোমবাতি জ্বালিয়ে লাভ নেই। লণ্ঠনটা নিয়ে সে বিক্রমের ঘরে ঢুকল। বিক্রম দাঁড়িয়ে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। সীমার ছড়ানো চুল আর কান্না থমথমে মুখখানা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

বিক্রম বলল, তোমাকে ডেকে হয়তো ঠিক করিনি সীমা, তবে দরজায় কান পেতে মনে হল আর কেউ নেই, তাই সাহস করে ডাকলাম।

এবার আর রাগ করল না সীমা বিক্রমের ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানায়। সে শুধু রসিকতা করে বলল, বলা যায় না, মানুষগুলো লুকিয়ে থাকতেও তো পারে।

এবার বিক্রমের হাসিতে ঘরটা ভরে উঠল, আমাকে দারুণ একটা বোকা ঠাউরেছ সীমা, তাই না?

সীমা কথা না বাড়িয়ে শুধু বলল, বসুন, আমি আসছি।

আলোটা চৌকির তলায় বসিয়ে রেখে সীমা নিজের ঘরে ঢুকল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে কি মনে ভেবে পথের দিকের কপাট খুলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। না, সীমা আর কোথাও গেল না। সে পথের ওপর দাঁড়িয়ে প্রবল বৃষ্টিতে স্নান করতে লাগল। তার মনে হল, আকাশ থেকে যে জল ঝরে পড়ছে তাতে স্নান করলে সে শুদ্ধ হতে পারবে। নিজের পাপকে ভাসিয়ে দিতে না পারলে কেমন করে সে এই নোংরা দেহ নিয়ে বিক্রমের মুখে খাবার তুলে দেবে? স্নান শেষে শুকনো কাপড় পরে সে পশুপতিনাথের ছবিকে নমস্কার করে মনে মনে অনেক শান্তি পেল।

কিছু চিড়ে আর কয়েকটা কলা পূজোর একটা প্লেটে সাজিয়ে তার একপাশে খানিকটা চিনি রেখে সীমা নিয়ে এল বিক্রমের ঘরে। চৌকির ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনার ঘরের কোণাতেই কুঁজো রয়েছে। গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে খান। ঐ প্লেটে কেউ খায়নি কোনদিন। ওটি ঠাকুরের ভোগ দেবার জন্যে আনা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি।

বিক্রম ভোজ্য থালাটার দিকে একবার তাকাল। ফিরে তাকাল সীমা রাই-এর মুখের দিকে। থালাখানা এবার হাতে তুলে সীমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, নিয়ে যাও তোমার খাবার। আমি কি তোমার ঘরের ঠকুর, যে আমাকে শুকনো শুকনো জিনিসগুলো এ ভাবে খেতে দিয়েছ? আমি রুটি, চাউল, সব্জি খেতে চাই, পারো তো তাই দাও। আর তা যদি না পারো তাহলে দোহাই তোমার, আমাকে আর ঠাকুর বানিও না। সারাদিন কিছু খাইনি, নাড়িগুলো পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। এখন কুঁজোর জল পেটে ঢেলে কিছুটা ঠাণ্ডা হই।

সীমা প্লেটটা বিক্রমের হাত থেকে ধরে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল। যাবার সময় শুধু বলল, শুনেছিলাম আপনি খেয়ালি, এখন দেখছি আপনি দারুণ রকম জেদী।

বিক্রম চৌকিতে বসে পড়েছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, জেদ দেখিয়ে যদি ভাগ্যে খাবারটা জোটে তাহলে মন্দ কি।

পরের দিন থেকে ব্যবস্থা হল সীমার রান্নাতেই বিক্রম ভাগ বসাবে। দিনের খাবার যত্রতত্র আর রাতের খাবার নিজের আস্তানায়। অনেক রাতে ফিরলেও কোন অসুবিধে নেই। খাবার তৈরী হয়ে গেলেই সীমা ঢাকা দিয়ে রেখে আসবে বিক্রমের ঘরে। পাক্কা ব্যবস্থার কোন নড়চড় নেই। বিক্রম খুশি। গুলি মারো তোমার হোটেলের রান্নায়। সীমার হাতখানা বাঁধিয়ে রাখার মত। সত্যি, রান্নায় জুড়ি মেলা ভার।

রাত দশটা এগারোটা অব্দি সীমা বসে থাকে বিক্রমের পথ চেয়ে। দূরে গাড়ির আওয়াজ পেলেই সে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। সে যে একটা মানুষের জন্যে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে বসেছিল তা যাতে বিক্রম জানতে না পারে সেজন্যে মাঝের দরজায় খিল তুলে দেয়। একটা দুরন্ত খেয়ালি মানুষের নিরাপদে ঘরে ফেরার জন্যে সীমা প্রতীক্ষা করে, প্রার্থনা জানায় পশুপতিনাথের কাছে। কিন্তু উদ্বেগের কারণটুকু দূর হলেই সে আর কোন অজুহাতে বসে থাকে না।

বিক্রম ফিরে এসে দেখে খাবার রেডি। সে পোশাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। তারপর চৌকিতে গা এলিয়ে দেওয়ামাত্রই নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। জগৎ সংসার একাকার, সব ভাবনার ইতি।

এদিকে কাঠের পার্টিশানের গায়ে কান পেতে সীমা শোনে বিক্রমের প্রতিটি কাজের ছোট বড় আওয়াজগুলো। যখন একেবারে শব্দগুলোর ধার কমে গিয়ে ও ঘরটা অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়ে তখন সীমা চুপি চুপি তার লণ্ঠনটা জ্বেলে নেয়। এমন ভাবে আলোটাকে আড়াল করে রাখে যাতে বিক্রম টের না পায় যে সীমা জেগে আছে এত রাত অব্দি। ঐ অল্প আলোতেই ধীরে ধীরে সে তার খাবার পাট চুকিয়ে নেয়।

দিনের পর দিন সীমার এমনি করে কাটে। সে একটি একটি করে সব খদ্দেরকেই নানা ছলে ফিরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ফেরাতে পারেনি শুধু একজনকে। সে হল রিভারভিউ টি গার্ডেনের ম্যানেজার বলেন্দ্র চৌধুরী। তার খপ্পরে নাকি ঢোকার একটি পথ আছে, বেরিয়ে আসার কোন রাস্তাই খোলা নেই।

দুর্দান্ত প্রতাপ এই ম্যানেজার চৌধুরীসাহেবের। টি গার্ডেনের কর্মীদের ভেতর একটু বেগড়বাঁই দেখলেই তিনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরুতেই শেষ করে দেন সব উত্তেজনা। চৌধুরীসাহেবের পোষা গুণ্ডারা অবাধ্য শ্রমিকদের কত ভাবে যে শায়েস্তা করেছে তার নাকি হিসেব নেই। ওপর থেকে তেমন কোন অফিসার এলেই তার সেবার জন্যে গেস্ট হাউসে গেছে দামি দামি বিলিতি মদ আর সঙ্গে মনোহারিণী কোন পার্বতী। চৌধুরীসাহেবের মতে সীমা রাই নাকি অতিথিদের খুশি করতে অনন্যা।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বলেন্দ্র চৌধুরী ভেট জোগালেও ভেট গ্রহণ করেন না কোন দিন। তার শত্রুতেও বলে না যে চৌধুরীসাহেব চরিত্রহীন, সুরাসক্ত। ভোজ্যবস্তু প্রস্তুতের পর আস্বাদন করে অতিথিদের পরিবেশন করার যে রীতি আছে সে পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর ধারণা দক্ষ রন্ধনশিল্পী যা তৈরি করে তা পূর্বাহ্নে চেখে দেখার দরকার হয় না।

বিক্রমকে সেই বর্ষার রাতে অনেক কাছ থেকে দেখার পর কি যেন হল সীমা রাই-এর, সে আর তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যেতে চাইল না। একে একে ফেরাল রাতের অতিথিদের কঠিন অসুখের

অজুহাতে। কিন্তু গাড়ি এল যখন চৌধুরীসাহেবের টি-এস্টেট থেকে তখন প্রাণের দায়ে উঠে বসতে হল। সেখানে গিয়ে চৌধুরীসাহেবকে একান্তে যখন সে তার কোন একটি কঠিন স্ত্রীরোগের কথা বলল, তখন প্রথম ধাক্কায় খানিক বিভ্রান্ত হলেও ঐ গাড়িতেই সিধে সীমাকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন দার্জিলিং। তাঁর পরিচিত ডাক্তার সীমাকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠা'লেন। সীমা রাই নীরোগ সুস্থ দেহের সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে ফিরল। চৌধুরী সাহেব সহাস্যে বললেন, এ তোমার মনের অসুখ রাই। টাকার জন্য ভেবো না, বাবুদের খুশি করতে পারলে তোমার অসুখের কোন কারণ থাকবে না। খুশি মত টাকা ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে যেও।

সীমা নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ে ক্রমাগত ছটফট করতে লাগল। তার ছটফটানি যত বাড়ল, জালের ফাঁস তত কঠিন হয়ে আটকে গেল তার দেহে।

এদিকে বিক্রমের একদিন হঠাৎ হুঁশ হল, রাতে কোন কথা দেয়ালের ওপার থেকে আর তো কই ভেসে আসছে না এপারে। সে এই হাসি গল্পকে স্বাভাবিক বলেই ভেবে নিয়েছিল এতকাল। কিন্তু হঠাৎ সবকিছু বন্ধ হয়ে যেতেই কেমন যেন খটকা লাগল তার। কোনদিন সে যা করেনি তাই করল এবার। কাঠের পার্টিশানের গায়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। কোন শব্দই তার কানে এসে বাজল না। এবার সত্যিকারের অবাক হবার পালা তার। সীমা কি তার দেহ বিক্রির ব্যবসাটা ছেড়ে দিল, না এটা অনিবার্য কোন কারণে তার সাময়িক বিরতি?

এবার বিক্রমের কৌতূহল আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। সে তার স্বভাবের বাইরে একটা কাজ করে বসল। দরজার একটা সামান্য ছিদ্রপথ আবিষ্কার করে তার ভেতর দিয়ে চোখ পেতে রইল সে। একপাশে কাঠের একখানা পাতলা তক্তা ঢাকা দেওয়া একটি লণ্ঠন টিম টিম করে জ্বলছে। সেই স্বল্প আলোতে বসে খাবার পাট চুকাল সীমা। বাইরে থেকে ধুয়ে এল হাত-মুখ। নিঃশব্দে বসল বিছানার ওপর। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। চাঁদের এক টুকরো আলো এসে পড়েছে তার বিছানায়। সীমা হাত জোড় করে কতক্ষণ প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে রইল।

সীমা বিছানায় শুয়ে পড়ার পরও কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? ও কি ফুলে ফুলে কাঁদছে? বিক্রম বুঝতে পারল না কি ওর দুঃখ। শুধু ওর মনে হল, এই দরজার বাধাটা যদি না থাকত তাহলে ও সীমার মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনার দু-একটা কথা শুনিয়ে আসতে পারত।

সকাল থেকে আকাশ ঝক্ ঝক্ করছে। তাগদার সরকারি বাংলোতে একদল যাত্রী দার্জিলিং থেকে আসার জন্যে উঠে বসল বিক্রমের গাড়িতে। তখন বেলা প্রায় আড়াইটে। এত সকাল সকাল কোন দিনই প্রায় ফেরে না বিক্রম। অবশ্য যাত্রী পাওয়া যায় প্রায় শেষ বেলায়। কাজকর্ম সেরে ঘরে ফেরে যারা তাদেরকে পাওয়া যায় যাত্রী হিসেবে।

আজ সকাল সকাল সওয়ারি মিলে যাওয়ায় তাগদা ফিরে এল বিক্রম বেলা থাকতে থাকতেই। ওদের বাংলোতে ছেড়ে আর একটা ট্রিপ দেবে ভেবেছিল মনে মনে, কিন্তু বিগড়াল গাড়ি। প্রাথমিক চেষ্টায় মেরামত হল না দেখে তখনকার মত ছাড়ল দার্জিলিং ফিরে যাবার পরিকল্পনা। অমনি মনে হল, আজ সকাল সকাল ফিরে অবাক করে দেওয়া যাবে সীমাকে। বিগড়ানো গাড়ি বিক্রম গড়িয়ে নিয়ে চলল নীচের রাস্তায়। আর খানিক দূর গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারলেই আস্তানায় গিয়ে পৌঁছবে সে, কিন্তু ঘটল একটা অঘটন। বাঁক পেরিয়ে একটা ঝকঝকে প্রাইভেট কার মুখোমুখি হতেই বিক্রমের গাড়ির সঙ্গে লাগল তার ধাক্কা। অবশ্য দেখতে পেয়েই অনেক কসরৎ করে গাড়ি ঘুরিয়েছিল বিক্রম, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। পাশে একটা খাদের দিকে প্রাইভেট গাড়িখানা কাৎ হয়ে থেমে গেল।

আরোহী একটি লোক আর ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসে চোটপাট শুরু করে দিলে। মনে হল

ভেতরে বসে আছে একটি মহিলা। বিক্রমও ছাড়ার পাত্র নয়, সে বলল, দোষ যদি হয়ে থাকে তাহলে দুজনেরই হয়েছে। কেউ হর্ন দিইনি। অকারণ চেল্লাচেল্লি করে লাভ কি?

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নতুন গাড়ি তুবড়েছে, তাছাড়া সাহেবের মাল যথাসময়ে পৌঁছে দিতে না পারলে লাঞ্ছনার একশেষ হবে। গেস্ট হাউসে হাঁ করে বসে আছে বিশিষ্ট অতিথি, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী খাদ্যবস্তুর আস্বাদ নেবার আশায়।

কথা নেই বার্তা নেই ধাঁই করে একটা ঘুষি এসে পড়ল বিক্রমের কপালে। ব্রহ্মরন্ধ্রটা ফেটে গেল বুঝি। এমন আচমকা ঘুষিটা একদম আসা করেনি বিক্রম। আদপেই লোকটার চেহারা কুস্তিগীরের মত নয়, কিন্তু সারা দেহটা বোধহয় ওর পাকা লোহায় তৈরি।

বিক্রম প্রথম চোটটা সামলে নিয়েই স্ব-মূর্তি ধরল। খপ করে লোকটার হাত ধরে কয়েক পাক বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে দিলে। লোকটা দেখা গেল ওস্তাদ। সে দারুণ একটা কসরৎ করে ছিট্‌কে এসে পিছন দিক থেকে চেপে ধরল বিক্রমের ঘাড়। অমনি বুনো জানোয়ারের মত ডাক ছেড়ে লোকটাকে কাঁধে নিয়েই বিক্রম পিছু হটতে লাগল। এ পথের প্রতিটি আঁক-বাঁক, পাথরের খাঁজ-খোঁজ, গাছ-গাছালি বিক্রমের মুখস্থ। সে তার পিছনে ঝুলে থাকা লোকটাকে নিয়ে গিয়ে দারুণ জোরে ধাক্কা লাগিয়ে দিলে পিছনের পাহাড়ের সঙ্গে। শুকনো ডালের মত মট করে পথের ওপর ভেঙে পড়ল লোকটা। মাথায় চোট লেগেছে, প্রায় চেতনা নেই। বিক্রম সেই অবস্থায় পাঁজা করে বয়ে নিয়ে এল লোকটাকে গাড়ির কাছে। ড্রাইভারটা মনে করছিল লোহার হ্যান্ডেলটা নিয়ে গিয়ে বীরত্ব দেখাবে কিন্তু বিক্রমের ডাক শুনেই তার পিলে চমকেছে, তাই ভাল মানুষের মত গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকাই সে নিরাপদ বলে ভেবে নিয়েছে।

গাড়ির একটু দূরে লোকটাকে পথের ওপর ফেলে ড্রাইভারকে হাঁক দিয়ে বলল বিক্রম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নক্সা দেখছিস শালা! আয় পেছনে, গাড়ি ঠেলে তোল রাস্তায়। দুজনের ঠেলাঠেলিতে খাদের দিকে কাৎ হওয়া গাড়িখানা রাস্তার ওপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। এখন বিক্রমের নির্দেশে পথের ওপর পড়ে থাকা লোকটাকে ধরাধরি করে তোলা হল পিছনের সিটে। ইতিমধ্যে মহিলাটি কখন নেমে দাঁড়িয়েছিল পথের ধারে গাছের আড়ালে। বিক্রমের সেদিকে তাকানোর অবস্থাই ছিল না। লোকটাকে গাড়িতে তুলে দিয়েই বিক্রম হেঁকে উঠল, খুব বেঁচে গেলি এ যাত্রায়, ভাগ শালা।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে পালাল। তার মনে হয়েছিল লোকটা যেমন গোঁয়ার, খামোকা তাকেই না ধোলাই দিয়ে বসে। অমন ডাকসাইটে গুণ্ডাকে যে লোকটা বেহাল করে দিলে তার পক্ষে সবই সম্ভব।

নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এসে উঠতে গিয়েই হঠাৎ হুঁশ হল বিক্রমের, মেয়ে একটি ছিল যে ও গাড়িতে, গেল কোথায়!

এদিক ওদিক তাকাতে হল না, মেয়েটি নিজেই বেরিয়ে এল। ঝকঝকে পোশাকে সারা দেহ ঢাকা। একখানা রঙীন স্কার্ফ ঘোমটার মত জড়ানো। তার একপ্রান্তে মুখের তিনভাগ ঢেকে ফেলেছে মেয়েটি। কাছে এসে ঘোমটা সরিয়ে বলল, এমন দুঃসাহসি হয়েছ কবে থেকে?

অবাক বিক্রম।—তুমি গাড়িতে ছিলে!

সীমা বলল, আমার কথার ঐ জবাব হল? জানো, পাহাড়ি গোখরোর ল্যাজে পা দিয়েছ, তুমিও শেষ হবে, আমিও।

বিক্রমের মেজাজটা বিগড়ে গেল। সে তেড়ে বলল, ওসব ভাববার মেজাজ নেই আমার, ঘরে ফিরবে যদি চটপট উঠে এস গাড়িতে।

না, গম্ভীর গলায় বলল, সীমা।

যাব্বাবা, লোকের ভাল করতে গেলেই মন্দ হয়, বলতে বলতে গাড়িখানা গড়াতে গড়াতে বিক্রম নিয়ে চলল তাগদা বাজারের পথে।

ঘরে ঢুকে কুঁজো থেকে অনেকখানি জল ঢেলে খেল বিক্রম। মনে মনে বলল, শালা যত ঝুট ঝামেলা আর হুজ্জোৎ। এসব যত চাই না, ততই শালার খামোকা ঘাড়ে এসে পড়বে আমার। বলতে বলতেই দুটো হাতের পাতার ওপর মাথা রেখে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল চৌকির ওপর।

কতক্ষণ এমনি পড়ে পড়ে অসাড়ে ঘুমচ্ছিল বিক্রম তা তার মনে নেই, হঠাৎ চোখ মেলে দেখল, নীচে হাঁটু গেড়ে বসে সীমা কি যেন করছে। হাত নামিয়ে মাথায় হাত দিতে যাচ্ছিল, সীমা ঘুরে বসে ওর হাতটা ধরে ফেলল।

বলল, কপালে একেবারে কালসিটে পড়ে গেছে। ফুলেও উঠেছে কতখানি। নিজের কষ্টটা বুঝতেও কি পারো না? দয়া করে হাত দিয়ে টেনে ফেলে দিও না মাথার জলপটিটা। তুমি সবই পারো।

সীমা বাটি থেকে জল নিয়ে কপালে বসানো ন্যাকড়ায় বসুধারার মত টপ টপ করে ফেলতে লাগল।

বাধ্য ছেলের মত চোখ বুজে শুয়ে রইল বিক্রম। হঠাৎ তার মনের আর্শিতে ভেসে উঠল মায়ের মুখখানা।

....কত ছোটবেলায় সে মাকে হারিয়েছে। তবু তার স্পষ্ট মনে পড়ে মায়ের মুখখানা। সারাদিন দুষ্টুমি করে বেড়াত সে, মা ব্যাস্ত থাকত কাজে। রাতে শোবার সময় বুকের কাছে টেনে নিয়ে কত আদর করত। দুষ্টুমি করলে, মা আর বাঁচবে না এমন কথাও বলত। মায়ের কথা শুনে কাঁদলে মা বলত, ব্যস, অনেক হয়েছে, আর কেঁদো না, মাকে এতখানি ভালবাসলে মা কি মরতে পারে। সেই মা, দুষ্টুমি করতে গিয়ে মাথায় চোট লাগিয়ে বসলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথাটা কোলে তুলে নিত। আর এমনি করে কতক্ষণ বসে বসে জলপটি দিয়ে যেত। মা তার বিশটা বছর ছুঁতে না ছুঁতেই চলে গেল এ দুনিয়া ছেড়ে। মৃত্যুর দিনটিতে তাকে বুকে জড়িয়ে সে কি কান্না।

মনে পড়ছে ডাক্তার দাদুর কথা। মা কত জায়গায় তাকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক সাধুবাবার চিঠি হাতে হাজির হয়েছিল কার্শিয়াং-এ ডাক্তার দাদুর কাছে। সেখানেই আশ্রয় পেল আমৃত্যু। ব্যাচিলার বৃদ্ধ ডাক্তার তার মাকে কথায় কথায় মা বলে ডাকত। আর তার মা সারাক্ষণ ডাক্তার দাদুর দিকে নজর রাখত। তার দাওয়াইখানার তদারকি করত। মা মারা যাবার পর বুড়ো দাদু কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর বেশ কয়েক বছর বেঁচেছিল দাদু কিন্তু তার প্রাণখোলা হাসি আর দেখা যায়নি।

দাদু তার জন্যে অনেক কিছু রেখে যেতে পারত কিন্তু মায়ের নামে একটি হাসপাতালে তার সবকিছু সঞ্চয় দিয়ে যায়। কার্শিয়াং-এ তাকে কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে একদিন কাছে ডেকে বলেছিল, ব্যাটাছেলে নিজের পরিশ্রমের অন্ন খাবে, অন্যকে খাওয়াবে। কোনদিন পরের সঞ্চয়ের দিকে লোভীর মত চেয়ে থাকবে না। তুমি চাকরি কর এ আমার ইচ্ছা নয়। আমার ল্যাণ্ডরোভারখানা দিলাম তোমাকে. এইটি দিয়ে শুরু কর তোমার জীবন। নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে নাও।

দাদু মারা যাবার পর এই ল্যান্ডরোভারই হয়েছে তার স্মৃতি, সঙ্গী আর রুজি রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। ল্যান্ডরোভারখানাতে উঠলেই মনে হয়, দাদু তার পাশে বসে আছে। ফার্স্ট লার্ণারকে পাহাড়ি আঁকবাঁকগুলো সম্বন্ধে সজাগ করে দিতে দিতে যেন এগিয়ে চলেছে।

দাদু বলত, অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন শেষ নেই। সব ক'টা সেন্স অরগ্যানকে সজাগ রেখে গাড়ি চালাতে হয়।

কোন কোনদিন তার গাড়ির কাছে দাঁড়ালেই মনে হয়, মা গাড়ির ভেতর থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দাদু স্টিয়ারিং ধরে সামনে বসে। ছোটবেলা দুষ্টুমি করে সে ঢুকতে চাইত না ভেতরে।

মা বেরিয়ে এলেই সে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করত। মা কত অনুনয় করে তাকে কাছে ডাকত। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নার অভিনয় করলে সে স্থির থাকতে পারত না, ছুটে আসত মায়ের কাছে। অমনি মা তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠত।

দাদু হেসে বলত, বুনো খরগোসটা তাহলে ধরা পড়ল বল? মা পিছনের সিটে বসে দাদুর হাসিতে যোগ দিত আর তাকে ভরে দিত চুমোয় চুমোয়।....

ছেলেবেলার কথা ভাবতে ভাবতে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল বিক্রম, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল কার যেন হাতের ছোঁয়ায়। সে চোখ মেলে দেখলে। তার সামনে একগ্লাস দুধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীমা।

চৌকিতে উঠে বসল বিক্রম। বলল, আমি কি ছেলেমানুষ যে যখন খুশি দুধ খেতে দিলেই খাব?

সীমা বলল, তুমি ছেলেমানুষ নয়তো কি? যা বলছি তাই কর, দুধটা খেয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে ছুটি দাও।

বিক্রম বলল, এত তাড়া কিসের সীমা?

সে তোমার জেনে কাজ নেই। দোহাই তোমার, এটুকু খেয়ে আমাকে মুক্তি দাও।

বিক্রম ওর হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে প্রায় এক চুমুকেই শেষ করে ফেললে। শেষ করেই মুখখানা কুঁচকে তাকাল সীমার দিকে।

সীমা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। গ্লাস বিক্রমের হাত থেকে ধরে বলল, এখনও গ্লাসের গা থেকে গরম যায়নি, আর তুমি আগুনের মত গরম দুধটা এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেললে!

বিক্রম বলল, তুমি যে বললে, তোমার তাড়া আছে, তোমাকে তড়ি-ঘড়ি ছুটি করে দিতে হবে।

সীমা বলল, তাই তুমি অমনি আগুনটাকে গিলে ফেললে? আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

বিক্রম বলল, কি?

এখুনি আমার জিভটা কেটে ফেলি। তাহলে আর কোন দিন কোন কথা তোমাকে বলতে হবে না।

চলে যাচ্ছিল সীমা।

বিক্রম বলল, আচ্ছা সীমা, আমার একটা কথার জবাব দেবে?

ঘুরে দাঁড়াল সীমা। চোখে মুখে প্রশ্ন। বিক্রম বলল, তুমি আমাকে আপনি, আপনি করে কথা বলতে, হঠাৎ কি করে তুমি হয়ে গেলাম?

সীমা বলল, কি করে যে ভুলটা করে বসলাম তা নিজেই জানি না। এখন থেকে নিশ্চয়ই শুধরে নেব।

বিক্রম বলল, বাব্বাবা, কি বলতে কি হয়ে গেল। আমি কি তোমাকে আপনি, আজ্ঞে সরকার বাহাদুর বলতে বলছি? আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম, কি করে এত সহজে তুমি মানুষকে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে আনার কৌশলটা আবিষ্কার করলে?

হঠাৎ কেন জানি না বিক্রমকে সীমার আঘাত দিতে ইচ্ছে হল। সে বলল, মানুষকে কাছে টানার বিদ্যেটা আমাদের আয়ত্ত করে রাখতে হয়। ঐটাই আমাদের ব্যবসার মূলধন।

আঘাতটা যথাস্থানেই বিঁধল। বিক্রম বলল, মাথায় চোট পেয়ে বুঝতে পারিনি কোথায় লাগল, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলে বুঝছি, চোটটা মাথায় নয় বুকে। মানুষকে আহত করার জন্যে কোন অস্ত্রের দরকার হয় না সীমা। মানুষের জিভটাই সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

সীমা এবার খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে ফেলল, তাহলে তোমারও লাগে বলছ! আবার হাসি থামিয়ে বলল, তাইতো অবাধ্য জিভটাকে আমি একটু আগেই কেটে ফেলতে চেয়েছিলাম।

বিক্রম বলল, যাক্, আর বিবাদে কাজ নেই, এখন কিছু খাবার আনা যাক, বসে বসে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।

বিক্রম চৌকি ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে দেখে সীমা ধমকের সুরে তাকে বসে থাকতে বলে বাইরে বেরিয়ে গেল। রুটির দোকান থেকে রুটি কিনে নিয়ে এল, ঘরে অমলেট বানিয়ে খেতে দিল বিক্রমকে।

বিক্রম বলল, আমি একা খাব বলেই বুঝি খাবার আনতে বললাম?

বিশ্বাস কর, অবেলায় খেয়েছি আজ, একটুও খেতে ইচ্ছে করছে না।

বিক্রম মুখে এক স্লাইস পাঁউরুটি তুলে বলল, না খাবে নাই খাবে, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সীমা বলল, তুমি খাও লক্ষ্মীটি, আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদিকে এতক্ষণে তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। আর দেরি হলেই এসে পড়বে এখানে।

বিক্রম বলল, কোথায় যাবে তুমি সীমা? আর কারাই বা এসে পড়বে?

সীমা দু-হাতে দুটো গাল চেপে ধরে ঘাড় কাৎ করে বলল, তুমি কি কিছুই বোঝ না? মারামারি করলে যাদের সঙ্গে তারাই দলবল ঝেঁটিয়ে নিয়ে এল বলে। তোমাকে আর তোমার গাড়িকে এখানে দেখলে আস্ত রাখবে না।

বিক্রমের সব কথা মনে পড়ে গেল। সত্যি, কোন কিছু মনের মধ্যে গেঁথে রাখা যেন এক দিকদারী। যা ঘটল তাকে ধুলোর মত এক নিমেষে ঝেড়ে ফেলে দাও, ব্যস। লাভ কি রে বাপু তাকে জিইয়ে রেখে।

বিক্রম বলল, কোথায় যাচ্ছিলে তুমি ওদের গাড়িতে?

সোজা বলল সীমা, যমের বাড়ি।

বিক্রমের গলায় জোর, হেঁয়ালি রাখ, ঠিক ঠিক বল কোথায় যাচ্ছিলে?

সীমা বলল, আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম বাপু, ভারি জেদি তো তুমি। সব কথা সবাইকে বলা যায়?

খপ করে বিক্রম সীমার একখানা হাত ধরে ঝট্‌কা মেরে কাছে টেনে আনল। সীমা ওর গায়ে পড়তে গিয়েও কোন রকমে টাল সামলে নিল।

বিক্রম গলায় ঝাঁঝ ঢেলে বলল, যাদের হাতে আমি মার খেলাম তারাই তোমার আপনার হল? গোপন করছ ঐ গুণ্ডাগুলোর পরিচয়?

সীমা হাসিতে শ্লেষ মিশিয়ে বলল, ঠিক তাই, ওদের কাছেই আমার রুটির বরাদ্দ। পাওনা যেখানে বেশি, দরদ সেখানে একটু বেশি মাত্রায় হবেই তো।

সীমার হাত ছেড়ে দিয়ে বাইরের দিকে উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বিক্রম, মাথাটা তার ঝাঁ ঝাঁ করছে। না, এখানে কোন কিছু করার নেই তার। কি অধিকার আছে তার সীমার ওপর কথা বলার। সে যে দয়া করে মাথাটুকু গুঁজতে দিয়েছে তাই অনেক। তার ওপর সময়ে সযত্নে সাজিয়ে দিচ্ছে তার খাবার। ভাবতে গিয়ে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল বিক্রমের। এক সময় ইচ্ছে হল, তার এই ব্যবহারের জন্যে সে ক্ষমা চেয়ে নেবে সীমার কাছে। চোখ ফেরাতেই কিন্তু বিক্রম দেখল, সীমা তার ঘরে নেই।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সীমা ওপরের দরজা দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিপাটি পোশাক আর প্রসাধনে বড় লোভনীয় মনে হচ্ছে তাকে।

সীমা আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বিক্রমকে দেখল। বিক্রমের মুখে ক্রোধের কোন ছাপ দেখতে পেল না। পায়ে পায়ে উঠে এল বিক্রমের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর। পাশে এসে বলল, রাগ পড়ল, বাবুসাহেবের?

বিক্রম কোন কথা না বলে একবার শুধু চোখ তুলে তাকাল সীমার মুখের দিকে; সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ নামাল।

সীমা বলল, আমার কি যেতে ইচ্ছে করে বাবুসাহেব, সারা মন বিষিয়ে উঠলেও আমাকে যেতে হয়। মিথ্যে হাসি মুখে ফুটিয়ে ওদের মন ভোলাই।

বিক্রম বলল, তুমি কেন যাও সীমা, না গেলেও তো পারো?

সীমার আবার কৌতুক করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তা আর সে করল না। সে বলল, একদিন হয়তো যাওয়া বন্ধ করলে পারতাম, কিন্তু আজ আর কোন উপায়ই নেই বাবুসাহেব, আমি এখন বন্ধ করতে চাইলেও ওরা আমাকে ছাড়বে না।

বিক্রমের রক্ত গরম হয়ে উঠল, তুমি বসে থাক এখানে, দেখি কোন্ ব্যাটা তোমাকে টেনে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে।

ম্লান হাসি হাসল সীমা। বলল, ওদের অনেক লোক বাবুসাহেব। মারপিটে হয়তো একটা বাজি তুমি জিততে পারো কিন্তু হারতে হবে ওদের গুণ্ডামি আর কৌশলের কাছে। রিভারভিউ টি গার্ডেনের ম্যানেজার বলেন্দ্র চৌধুরীকে তুমি চেনো না। পথ চল্‌তি মানুষের দাম তার কাছে পোকামাকড়ের চেয়ে বেশি নয়। একটু কামড়াবার চেষ্টা করলেই পিষে মারবে।

বিক্রম বলল, দাদু বলত, অন্যায় করবি না, অন্যায় সহ্যও করবি না। তার ফল যা হয় হোক।

সীমা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করল। হঠাৎ প্রায় দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এল বিক্রমের সামনের দরজাটা। বলল, ওদের গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নীচের রাস্তায়, আমি চললাম। পায়ে পড়ি তোমার, এখন বাইরে বেরিও না। তোমার গাড়িখানা আমার ঘরের সামনে দেখতে পেলেই আর রক্ষে রাখবে না। গাড়ি জ্বালিয়ে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দেবে।

বিক্রম বলল, তা বলে বিপদের মুখে তোমাকে একা ছেড়ে দেব?

সীমা ওঘর দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আমার গায়ে আঁচড় লাগবে না বাবুসাহেব। আমাকে ওরা খাতির করে তুলে নিয়ে যাবে। শুধু সাবধানে থেকো তুমি। আমার দেরি হলে কিছু ভেবো না। এখন বাঁক পেরিয়ে আসার আগেই আমি ওদের সামনে হাজির হতে চাই। যাতে ওরা এখানে তোমার গাড়িখানা দেখতে না পায়।

সীমা দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ কয়েক মিনিট পরে টি-গার্ডেনের দিকের জানালাটা খুলে বিক্রম তাকিয়ে রইলি। একটা সাদা আর একটা কালো গাড়ি সামনে পিছনে চলেছে। ওরা নেমে চলেছে টি-গার্ডেনের ঢালু পথে।

বিক্রমের মনে হল, ও এখুনি ধাওয়া করে ওর ল্যান্ডরোভারখানা নিয়ে ওদের পিছনে এক ধাক্কায় দুটো গাড়িকে ফেলে দিয়ে আসে ঐ খাদের নরকে। পরমুহূর্তে মনে হল, কি ভাবছে ও পাগলের মত। সীমা ঐ দুটো গাড়ির একটাতে আরোহী হয়ে আছে না। হঠাৎ তার বুকখানা হু হু করে উঠল। সীমাকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অথচ সব জেনেও তার করার কিছু নেই।

দু' দুখানা গাড়ি পাঠিয়েছে বলেন্দ্র চৌধুরী। একখানাতে তার বাছাই করা গুন্ডার দল, মানে সীমা রাই-এর দেহরক্ষী। আর অন্যখানা শুধু বিলাসিনী রাই-এর জন্য। কে এক ড্রাইভার ছোঁড়া তার খাস সাকরেদকে বেইজ্জৎ করেছে। প্রথমটা রাগে জ্বলে উঠেছিল তার চোখ, কিন্তু পরমুহূর্তে বলেন্দ্র চৌধুরীর মনে হয়েছে, ঐ ড্রাইভার ছোঁড়াটাকে দলে ভর্তি করে নিলে কেমন হয়। ক্ষমতা, রূপ সবকিছুকে সংগ্রহ করে যে মানুষ কাজে লাগাতে পারে, সিদ্ধি তার হাতের মুঠো থেকে কখনও ফসকে যায় না।

অতিথিদের সুরা পরিবেশন ও সঙ্গদান করে যখন ফিরল সীমা তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। গাড়ি একেবারে বাড়ির সামনে নিয়ে আসেনি সীমা। কারণ বিক্রমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তারই বাড়ির সামনের রাস্তায়। সে যাবার সময় গাড়িখানাকে অন্য কোথাও সরিয়ে রেখে দেবার কথা বলতে ভুলে গেছে।

ঘরে যখন ফিরল সীমা তখন বিক্রম পুরোপুরি সজাগ। চৌকির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে থাকলেও চোখ আর কান তার খোলা।

সীমা তার দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল অতি সন্তর্পণে। পাছে ঘুম ভেঙে যায় বিক্রমের তাই প্রতিটি পদক্ষেপে তার সাবধানতা। পা দুটো যেন টলছে তার। ইচ্ছা না থাকলেও মাঝে মাঝে এসব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের অনুরোধ এড়ানো যায় না, কিছু পান করতে হয়। তার সামান্য হলেও প্রতিক্রিয়া আছে। সীমার সমস্ত চৈতন্য সজাগ থাকলেও শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। এতক্ষণ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে এসে সে একেবারে যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সীমা সুইচ অন না করে একটা মোমবাতি জ্বালাল। মোমবাতির আলোটা ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ইচ্ছা জন্ম নিল সীমার মনে। বিক্রমের মুখখানা ঘুমের ভেতর কেমন দেখায়, তা যদি একবার দেখা যেত! এমন বলিষ্ঠ সুন্দর একখানা শরীর, অথচ মুখখানাতে একেবারে শিশুর ভাব। রাগে ফেটে পড়ছে এই মুহূর্তে, পরক্ষণেই সকালের রোদের মত মিষ্টি লাবণ্য সারা মুখে।

দামী নোংরা পোশাকগুলো ঘরের এক কোণায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ একখানা ধোয়া পাজামা আর চোলী পরল সীমা। গায়ে একটা সাদা আলোয়ান জড়িয়ে তার মনে হল এতক্ষণ নিশ্বাসটা সে সহজ ভাবে নিতে পারছে। ফেলে দেওয়া গাঢ় গোলাপী রঙের পোশাকগুলোর দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেল তার। ঘরের কোণায় জমে থাকা অন্ধকারে মনে হল যেন ডানা ছড়ানো একটা শকুনি। সে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে একটা দেহ। তার রক্ত রাঙা ছাল ছাড়ানো অবশেষটা পড়ে আছে।

সিরসির করে উঠল সীমার সারা শরীর। সে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল । এই মুহূর্তে কেমন যেন একটা অস্বস্তি তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল।

সীমা ওদের মাঝের দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলতেই দরজাটা একটা করুণ আর্তনাদ করে সজ্জির চৌকিতে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। এটা একেবারে আশা করেনি সীমা। ওদিক থেকেও দরজায় একটা আগল দেওয়া থাকে। সীমা ভেবেছিল, ছিটকিনি খুললে দরজার মুখে সামান্য যে একটু ফাঁক সৃষ্টি হবে তার ভেতর দিয়ে সে দেখার চেষ্টা করবে বিক্রমকে। কারণ আকাশে চাঁদের আলো ফিন্‌কি দিয়ে ঝরে পড়ছে এখন। বিক্রমের মাথার দিকের জানালা দিয়ে তার বিছানায় আলো এসে পড়ে।

কিন্তু সীমা দরজার এপারে ছিটকিনিটা খোলার সময় ভাবতেই পারেনি যে ওপারে আগল না দিয়েই বিক্রম ঘুমিয়ে পড়েছে। দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল সীমা। চৌকির ওপর ততক্ষণে উঠে বসেছে বিক্রম।

হঠাৎ সীমার চোখে পড়ল, যাবার আগে ও যে খাবারগুলো বিক্রমের জন্যে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল তা বিক্রম খায়নি। কথা জোগাল ওর মুখে। বলল, এখনও খাওয়া হয়নি তোমার?

বিক্রম বলল, শুধু খাওয়া নয়, ঘুমও হয়নি।

সীমার গলায় উদ্বেগের সুর, কেন, শরীর খারাপ নাকি?

না।

তবে?

বিক্রম বলল, চোখের সামনে কয়েকটা গুন্ডা একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গেলে কোন মানুষ ঘুমুতে বা খেতে পারে?

সীমা বিক্রমের ঘরের ভেতর ঢুকে আলো জ্বেলে খাবার পিঁড়ি পেতে বলল, খাবে এসো। এমন জানলে আমি বরং ঐ খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম তবু ওদের ওখানে যেতাম না।

কথাটা শুনে চুপ করে বসে আপন মনে কি ভাবল বিক্রম। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে খাবার জায়গায় বসে বলল, দেখ, আমারই অন্যায়। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের নিজের পথে কাজ করে যাবে, আমি খামোকা সেখানে নাক গলাতে যাব কেন।

সীমা বলল, ওটুকু বুদ্ধি আগে এলেই তো আমি বাঁচতাম। একজনকে রাত্তির বারোটা অব্দি উপোস করে থাকতে হত না।

অভুক্ত বিক্রম খাচ্ছে, সীমা চেয়ে দেখছে। যে মানুষটা একটু ক্ষিদে সইতে পারে না, সে খাবার সামনে রেখে জেগে আছে এতক্ষণ। প্রতীক্ষা করছে তার মত একটা পণ্য-নারীর ফিরে আসার পথ চেয়ে। উদ্গাত চোখের জল রোধ করতে পারল না সীমা। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। সেদিকে দৃষ্টি নেই বিক্রমের। সে তখন খিদের জ্বালায় ভোজ্যবস্তুগুলো খেতেই ব্যস্ত।

আলোয়ানের কোণায় চোখের জল মুছতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় আর কি সীমা। একটু বেশি সময় বুঝি সে চোখ ঢেকে রেখেছিল, তারপর ঢাকা সরাতেই চোখাচোখি হল বিক্রমের সঙ্গে।

বিক্রমের চোখ ভরা বিস্ময়। বলল, মুখখানা থমথমে দেখছি, চোখ দুটো লাল, কি ব্যাপার? কাঁদছিলে নাকি?

সীমা প্রবলভাবে দুদিকে মাথা নেড়ে জানাল, সে কাঁদেনি।

বিক্রম আবার নীচু হয়ে খাওয়ায় মন দিতে দিতে বলল, কান্না-টান্না আমি একেবারেই সইতে পারি না। কান্নাটা ছোট ছেলেমেয়েদেরই মানায়। আমার ভুল হয়েছিল, তুমিই বা খামোকা কাঁদতে যাবে কেন।

মনে মনে হাসল সীমা। কান্নাটা এই সাদা মানুষটার চোখে যে ধরা পড়েনি সেজন্যে খুশি হল সে।

খাওয়া শেষ হলে সীমা বাসন ক'টা তুলে নিতে নিতে বলল, পেট ভরল তো—না কম পড়ল খাবারে?

তৃপ্ত বিক্রম বলল, যা ক্ষিদে পেয়েছিল, মনে হল ভূ-ভারত খেয়ে ফেললাম।

সীমা ও-ঘরে থালা বাসন নিয়ে যেতে যেতে বলল, থাম, বেশি আবার খেলে কোথায়। রোজ যা খাও তাই ছিল তোমার থালায়। একটুও বেশি না।

বিক্রম হেসে বলল, যা ছিল চেঁছেপুঁছে খেয়েছি, এমন খানেওলা এ তল্লাটে একটিও খুঁজে পাবে না। খাবার পরে দক্ষিণে দেবার রীতি আছে আমাদের বাঙালী ঘরে। তাছাড়া আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণা না পেলে খাবার হজমই হবে না।

সীমা ফিরে এল বিক্রমের ঘরে। বলল, এ অঞ্চলে বহু বাঙালী বাবুর কোঠী আর চায়ের বাগান আছে। কাজে কর্মে আরও অনেক বাঙালী এ তল্লাটে রয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা কথাবর্তা বলতে বলতে আমিও একদম বাঙালী বনে গেছি। এখন বল, কি দক্ষিণা আমি তোমাকে দিতে পারি?

বিক্রম বলল, তা তো জানি না, দেবার মালিক তার খুশি মত দেবে।

সীমা আবার তার ঘরে ঢুকে কি একটা বস্তু বের করে নিয়ে এল। চৌকির ওপর বিক্রমের পাশে ঝকঝকে একটা রূপোর কৌটো রেখে দিয়ে বলল, এর ভেতর মিষ্টি এলাচ আছে, নিয়ে খাও। ঐ রূপোর কৌটোটা একবার মায়ের সঙ্গে কাশী বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছিলাম। ভারি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। যদি তুমি এটি নাও তাহলে আমি খুব খুশি হব।

বিক্রম বলল, মিস্ত্রি মানুষ, গাড়ি চালাই, তোমার এই সুন্দর কাজ করা কৌটোর মর্যাদা কি আমি রাখতে পারব?

সীমা হেসে বলল, ইচ্ছে করলেই পারবে।

বিক্রম বলল, কিন্তু তোমার এই মশলা? এর জোগান আসবে কোত্থেকে?

সীমা বলল, যতদিন তুমি এই চৌকিতে থাকবে ততদিন মশলা জোগানোর ভার আমার।

বিক্রম মশলার কৌটোটা খুলে ফেলে কি মনে করে আবার বন্ধ করে সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি এর থেকে তুলে দাও।

সীমা কৌটো থেকে কয়েকটা রূপোলী এলাচদানা বের করে বিক্রমের হাতে দিতে যেতেই বিক্রম সীমার হাতটা ধরে ফেলল। সীমা কোন কথা বলল না। বিক্রমও হাতখানা ধরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল।

সীমা এক সময় অনুত্তেজিত গলায় বলল, হাতটা ছেড়ে দাও বিক্রম, নইলে হাতের মশলা তোমাকে খেতে দিতে পারব না।

বিক্রম সীমার হাতখানা ছেড়ে দিল। এবার সীমা বাঁ হাতে ধরল বিক্রমের ডান হাতখানা। এলাচ দানাগুলো ওর হাতে দিয়ে হাতখানা ওর মুখের কাছ অব্দি তুলে ধরল। বিক্রম মুখ নামিয়ে এলাচগুলো মুখে পুরে চিবুতে লাগল।

সীমা বলল, কেমন লাগছে?

বিক্রম উদাস গলায় বলল, গন্ধের কথা বলব, না স্বাদের কথা?

সীমা ফিক করে হেসে ফেলে বলল, গন্ধটা তো আগে, স্বাদটা পরে।

বিক্রম বলল, গন্ধ যেমন স্বাদও তেমন।

সীমা বলল, তাহলে আমার দক্ষিণাটা পাশ হয়ে গেল। আমি তো ভাবনায় ছিলাম, তোমার ভাল লাগে কি না লাগে।

বিক্রম বলল, যে দেবে সে যদি একমনে দেয় তাহলে মাটিও সোনা হয়ে যায়।

সীমা একবার উঠে গেল তার ঘরে। পশুপতিনাথের ছবির পাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলল, প্রভু, আমার যেন মতিভ্রম না হয়। আমার লোভকে যেন আমি কোন রকমে মনের মধ্যে প্রশ্রয় না দিই।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এল বিক্রমের ঘরে। বিক্রম বিছানায় বসে চেয়ে ছিল জানালার বাইরে। এখানে ওখানে পাহাড়গুলো পাতলা কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে চাঁদের আলোয় দিব্যি ঘুমোচ্ছে। গাছগুলো থমথমে কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন রাতের পাহারাদার।

সীমা চৌকির এক কোণায় বসল। বিক্রম জানালার দিক থেকে তার চোখ কিন্তু ফেরাল না।

একসময় সীমা বলল, কি ভাবছ।

বিক্রম জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে সীমার দিকে চাইল। বলল, ভাবছি তোমার কথা।

এবার জলতরঙ্গের মত হাসি ছড়াল সীমা। বলল, আমি তো তাহলে, কি বলে যেন, ভি আই পি হয়ে গেছি।

বিক্রম বলল, বিশ্বাস কর, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

সীমাকে ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল। সে শরীরটা ওর দিকে হেলিয়ে বলল, বল না, কি ভাবছ আমার কথা?

এবার সোজাসুজি বলল বিক্রম, আচ্ছা সীমা, তুমি কি তোমার এ জীবনটাকে ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারো না?

সীমা বলল, আমি তো এ জীবন চাইনি বিক্রম, তোমরাই আমাকে বাধ্য করেছ একে গ্রহণ করতে। এখন অনেকদূর এ পথে এগিয়ে এসেছি, আর তো ফিরে যেতে পারব না।

বিক্রম বলল, দেখ সীমা, এই তাগদাতে আসার কিংবা এখান থেকে যাবার পথ একটা নয়, তোমার পথও একটা হবে কেন? পৃথিবী জুড়ে পথ বিছানো।

সীমা বলল, কথাটা তোমার বলতে খুব ভাল লাগছে বিক্রম, কিন্তু যারা একবার পাতালের পথে পা বাড়িয়েছে তাদের টেনে না তুললে তারা তো আর উঠতে পারবে না। তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে অন্ধকার পথ চলায়। আস্তে আস্তে তাদের আলোর জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে কে বল?

বিক্রম বলল, তোমার কি ইচ্ছে করে না স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে?

সীমা বলল, আগে এই নরক থেকে উঠে আসার জন্যে খুব চেষ্টা করেছি, ওপরে তোমাদের আলোর পৃথিবীর দিকে হাত তুলে করুণ চিৎকার করেছি—আমাকে হাত ধরে তুলে নেবার জন্যে, কিন্তু বিশ্বাস কর বিক্রম, কেউ আসেনি। একটু থেমে সীমা বলল, মুর্গীর লড়াই দেখেছ, পায়ে ছুরি বেঁধে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ওরা যখন পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে তখন আমরা উত্তেজনায় ফেটে পড়ি। ওরা নিজেরা মরে আমাদের আনন্দ আর উত্তেজনা জোগাবার জন্যে। আমাদের অবস্থা ওদের চেয়ে ভাল নয় বিক্রম। আমরা স্বর্গে উঠতে পারব না কোনদিন, তাই নরকের ফুল ওপর দিকে তুলে বলি, নেমে এসো আমাদের এখানে, যে-আনন্দ পাবে তার তুলনা নেই। মিথ্যে কাগজের বাহারী ফুলে আমরা ওপরের মানুষের চোখ ধাঁধাই।

অনেকগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগল সীমা রাই।

বিক্রম বলল, আমি যদি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাই, তুমি আসবে সীমা?

বর্ষার ঢল নামা ঝোরার মত তরঙ্গ তুলে কতক্ষণ হাসল সীমা। হাসি আর তার থামে না। তারপর একসময় হাসি থামলে বলল, মনে মনে কতদিন ধরে এই প্ল্যান এঁটে বসে আছ মালিক?

বিক্রম সীমার কাণ্ড দেখে নির্বাক। সে যা ভেবেছিল, এ যে তার একেবারে উল্টো! বিক্রম কোন কথা না বলে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

সীমা ওর গায়ের কাছে সরে গিয়ে বলল, এ্যায়, রাগ হয়ে গেল বুঝি?

সীমার কথা শুনে বিক্রমের দারুণ রাগ হল। ও হঠাৎ সীমার দিকে ফিরে ব্যাঙ্গের সুরে বলল, সত্যি, স্বয়ং ঈশ্বরও তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে না।

সীমা বলল, কথাটা বড় দেরিতে বুঝলে বাবুসাহেব। আমি তো এতক্ষণ ধরে ঐ কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম।

বিক্রমের রাগ আরও চড়ল। সে এবার কঠিন গলায় বলল, টি-গার্ডেনের রঙীন নেশার ঘোর কি আর সহজে কাটে! রোজকার সংসারের পান্‌সে জীবন তোমাদের পছন্দ হবে কেন!

সীমা ঝলকে ঝলকে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। নিজের ঘরে যেতে যেতে বলল, রাত কাবার হতে আর বেশি বাকী নেই। কতক্ষণ একটা বেশ্যার সঙ্গে কথা বলে কাটাবে বাবুসাহেব। তার চেয়ে নিজের বিছানায় আরাম কর।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল সীমা। তারপর নিজের বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, তুমি যদি সেই এলে তাহলে এত দেরী করে এলে কেন বিক্রম! ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট পাতা কুড়িয়ে এনে তাতে কি আর একজনকে খেতে দেওয়া যায়? ঐ এঁটো পাতা শুধু ভিখিরীতেই কাড়াকাড়ি করে খায়।

পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে দুটো হাত জোড় করে বলল, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ ঠাকুর। লোভে পড়েও আমি যে ওকে ঠকাইনি, সে শুধু তোমার অসীম শক্তির জোরে।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল সীমার। সে যেন ঘুমের ঘোরে একটা আওয়াজও শুনেছিল—একটা ভোমরা বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

উঠে বসল সীমা। মিষ্টি একফালি রোদ জানালার ফাঁকে তার বিছানার ওপর এসে পড়েছে। সীমা মাঝের দরজার ছিটকিনি খুলতে গিয়ে দেখল দরজাটা ওধারে বন্ধ করেনি বিক্রম। ঘরে ঢুকে দেখল বিক্রম নেই। বেরিয়ে গেছে। তাহলে ও যে আওয়াজটা শুনেছিল সেটা বিক্রমের গাড়ির।

কেন জানি না সীমার মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সে বাইরের রাস্তায় গিয়ে বিক্রমের লাগানো তালাটা খুলল। তার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। ভোরে বিক্রম কাজে বেরোয়, তখন হয়তো সে

ঘুমিয়েই থাকে, কিন্তু আজ মনে হল সকালে বিক্রমকে একবার না দেখতে পেয়ে তার যেন অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।

ভোরের কাজ সেরে সে যখন সব্জি সাজিয়ে বসল তখন দারুণ একটা অবসাদ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ক্রেতার সঙ্গে কথা বলায় তার উৎসাহ নেই। দায়-সারা কাজ করে চলল সে। সূর্য মধ্যাহ্নের আকাশ স্পর্শ করলে সীমা দোকান বন্ধ করল। সে স্নান সেরে পশুপতিনাথকে প্রণাম করে এসে ঢুকল বিক্রমের ঘরে। আজ কোন কিছু খাবার ইচ্ছে নেই তার। অসীম ক্লান্তিতে শরীরটা যেন তার ভেঙে পড়ছে।

সীমা নিজের বিছানায় বিশ্রাম নিতে গেল না। সে আজ বিকেলে আর প্রতিদিনের মত দোকান পাতবে না মনস্থ করে ফেলে সব্জিগুলো চৌকির তলায় জড়ো করে রাখল। তারপর বিক্রমের চৌকিতে গা এলিয়ে পরম শান্তিতে শুয়ে পড়ল। তার মনে হতে লাগল সে যেন বিক্রমের উত্তপ্ত বিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঘুম নেমে এল সীমার চোখে। দুপুরে খেলও না আর দোকান দেবার জন্যে উঠলও না।

কতক্ষণ সে তন্দ্রার অতলে তলিয়ে ছিল তার মনে নেই, ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। বাজ পড়েছে কাছে-পিঠে কোথাও। সে বিছানার ওপর উঠে বসল। জানালা দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে এসে বাইরের দরজার কপাট ঘনঘন নাড়তে লাগল। সীমা উঠে গেল দরজার কাছে। তার কেবলই মনে হতে লাগল, বিক্রম হয়তো ফিরে এসেছে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সে নাড়া দিয়ে চলেছে।

সীমা পোশাক ঠিক করে নিয়ে চুলের রাশ মুখ আর কপাল থেকে সরিয়ে দিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঋজু জানালা আর দরজার পথে মাতাল এক ঝলক হাওয়া হাহাকার করতে করতে বেরিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই, ওপরে কনি ফারের গাছগুলো মাথার চুল ছিঁড়ে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। মেঘ আর সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা ঘন ঘোর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সীমা তাকিয়ে দেখল ওপরে নীচে কোথাও আলো জ্বলছে না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় নিশ্চয় বিঘ্ন ঘটে গেছে।

সীমার চুলগুলো এলোমেলো উড়ে সারা মুখখানা ছেয়ে ফেলল। অঝোর বর্ষার আকাশের দিকে চেয়ে সীমার বুকখানা কান্নার তরঙ্গে তোলপাড় হতে লাগল। এক সময় যখন গভীর অন্ধকারে সবকিছু মুছে গেল, শুধু একটানা বৃষ্টির ধ্বনিই বেজে চলল তখন দরজাটা বন্ধ করে ঘরের ভেতর চলে এল সীমা। আজ সারাদিন রান্নার কোন আয়োজনই করেনি সে। এখন তাকে খাবার তৈরি করতে হবে। বৃষ্টির আকাশ দেখে হয়তো বিক্রম ফিরে আসবে তাড়াতাড়ি। ক্লান্ত মানুষটার মুখে তুলে দিতে হবে খাবার।

সীমা পরিপাটি করে খাবার বানাল। পাত্রে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল বিক্রমের খাবার। আজ সে পাশে বসে একটি একটি করে পদ খাওয়াবে বিক্রমকে। ওর খাওয়া না হওয়া অব্দি নিজে একটুকরো খাবারও মুখে তুলতে পারবে না।

সীমা রান্নার কাজ শেষ করে পোশাক বদলে প্রসাধনের কাজ সেরে নিল। সে আজ প্রতিজ্ঞা করল, কোনভাবেই এমন কিছু কথা বলবে না যাতে বিক্রমের মনে আঘাত লাগতে পারে। সে বরং নানা কথায় তাকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করবে।

তার নিজের কি ইচ্ছে করে না একটা সুখি সংসারের ছবি দেখতে। তার কি এতটুকু ইচ্ছে করে ঐ টি-এস্টেটের অতিথি ভবনে একবারও গিয়ে দাঁড়াতে! কিন্তু তার ইচ্ছা অনিচ্ছার দুটো পথই যে বন্ধ হয়ে গেছে। সে এই মুহূর্তে ঐ সুন্দর বলিষ্ঠ মানুষটার সঙ্গী হয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে, কিন্তু একদিন যখন তাদের সন্তান আসবে তখন কি কৈফিয়ৎ দেবে সে নিজের কাছে? এক পণ্য-রমণীর সন্তান বলে সেই নির্দোষ শিশুকে সারা জীবন কলঙ্কভাগী হতে হবে। নিজের পাপের শাস্তি সে নিজেই ভোগ করবে কিন্তু আর কাউকে সে ফলভাগী হতে দেবে না।

আর টি-গার্ডেনের বলেন্দ্র চৌধুরী যতকাল বেঁচে থাকবে ততকাল তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না সে। তাগদা ছেড়ে পালালেও চৌধুরীর পাতা ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে না সে কোনদিনও। এত বড় দার্জিলিং জেলার এমন কোন গোপন জায়গা নেই যা বলেন্দ্র চৌধুরীর শ্যেনদৃষ্টিকে আড়াল করতে পারে।

আজ সে যদি বিক্রমকে তৃপ্তি দেবার জন্যে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধে তাহলে বলেন্দ্র চৌধুরীর ক্রোধের আগুনে তাদের দুজনকেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। একথা বিক্রম না বুঝলেও সে সব জেনেশুনে তো অবুঝ হতে পারে না।

অসাধারণ মনের জোর নিয়ে জন্মেছে বিক্রম। অসাধুতার সঙ্গে কোনদিনই তার বনিবনা হবে না। কিন্তু একটি মানুষের ক্ষমতারও তো একটা সীমা আছে। হাজার মানুষের আঘাতের সামনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারে একা একটি মানুষ।

সীমা মনে মনে ভাবল, অবুঝ এই মানুষটাকে পাশে নিয়ে কাটাতে হবে তাকে সামনের কতগুলো দিন কতগুলো বছর কে জানে! নিজের সঙ্গেই তাকে যুদ্ধ করে যেতে হবে নিরন্তর। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিজের মনের কান্নার বিরুদ্ধে বুকের রক্ত ঝরানো যুদ্ধ।

সীমা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে বিক্রমকে। সে বিক্রমের হাতটা নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে করুণ মিনতি জানিয়ে বলছে, বিক্রম, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি চিরদিনই তোমার সহচরী হয়ে থাকব শুধু চেও না আমার দেহ। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে এ উচ্ছিষ্ট শরীরটা দিতে পারব না। তুমি বিয়ে করে সংসারি হলে, বিশ্বাস কর, আমি দুঃখ পাব না। আমি তো জানি, মানুষের ভোগবাসনা আছে। তুমি বা কেন তার থেকে বঞ্চিত হবে। আমি তোমাকে মনে রাখব চিরদিন। এ তোমার জন্যে নয়, এ আমার নিজের বেঁচে থাকার জন্যে। আমার কষ্টের দিনগুলোতে সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়বে তোমার মুখ। তুমি অনেক দূরে চলে গেলেও তুমি আমার কাছে থাকবে বিক্রম।

হঠাৎ সীমার সম্বিত ফিরে এল। সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে চোখ মুছে এক চিল্‌তে ঘরেব ভেতর পায়চারি করতে লাগল। যত রাত বাড়ল তত বৃষ্টি বেড়ে চলল, সীমার উদ্বেগ দমকে দমকে কান্না হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। সারা রাত অধীর প্রতীক্ষা করেও সীমা বিক্রমকে তার কাছে ফিরে পেল না। ভোর হল পুবের পাহাড়ে টকটকে লাল সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কান্না থেমে গেছে সীমার, এখন অন্তহীন ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। সে কিছু চায় না, বিক্রমকেও চায় না, শুধু পশুপতিনাথ যেন তাকে ভাল রাখেন। কোন দুর্যোগ যেন তাকে স্পর্শ করতে না পারে।

ভোরে পথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সীমা। পথচারিদের জিজ্ঞাসা করে, কেউ কোন পথ দুর্ঘটনার খবর রাখে কিনা? কেউ কিছু বলতে পারে না। বেলা বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগে একেবারে ভেঙে পড়ে সীমা। এক একবার নিজের অসহনীয় অবস্থাকে শান্ত করবার জন্যে সে ভাবতে থাকে, তার ওপর রাগ করেই চলে গেছে বিক্রম। যাক সে রাগ করে, ঠাকুর, তাই যেন সত্যি হয়। সে যেন কোন অঘটনের ভেতর জড়িয়ে না পড়ে। আবার ভাবল, দূর ছাই, যা হবার হোক, ও এবার কাছে এলে আর ওকে ফেরাবে না। বরং দুজনে চলে যাবে এ মুল্লুক ছেড়ে অনেক অনেক দূরে, যেখানে বলেন্দ্র চৌধুরীর দৃষ্টি শত চেষ্টাতেও পৌছতে পারবে না। কিন্তু তার কোন ভাবনাকে সফল করার জন্যে কেউ এল না।

সে দিন আর রাত কি করে যে কাটল তা মনে করতে পারে না সীমা। পরের দিন তাগদা

হাসপাতালের ড্রাইভারকে দার্জিলিং-এর পথে একা যেতে দেখে সে অনুনয় করে তার গাড়িতে উঠে বসল। এককালে এই ড্রাইভারও তার অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল।

লোকটা সমানে বকবক্ করে গেল সারা পথ। অতীতের স্মৃতি মন্থন করে ক্রমাগত পাঁক তুলতে তুলতে চলল। সীমা বলল না নিজের কথা। শুধু শুকনো হাসি হেসে মিথ্যে মাথা নেড়ে লোকটার সঙ্গে মাঝে মাঝে অভিনয় করে গেল।

দার্জিলিং-এর বাজারে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ট্যাক্সি, ল্যান্ডরোভার, প্রাইভেট কার, লরী। সীমা বাজারে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

ড্রাইভার বলল, আমি কাজে যাচ্ছি, তিনটে নাগাদ ফিরব, তখন তুমি আমার গাড়িতে ফিরতে পারো।

সীমা বলল, আমি যদি তোমার গাড়িতে ফিরি তাহলে তিনটেতে এখানেই থাকব, আর যদি দেখতে না পাও তাহলে জানবে আমি চলে গেছি।

ড্রাইভার একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, থাকার চেষ্টা কর। একেবারে খালি গাড়িতে পাশে বসে আরাম করে যেতে পারবে।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। সীমার সারা শরীর ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। পরক্ষণেই তার মনে হল, ড্রাইভার অন্যায় কিছু বলেনি। বারবিলাসিনীর যা প্রাপ্য তাই সে তাকে দিয়েছে।

সীমার সামনে অগুণতি লোক যাওয়া আসা করছে। মেয়ে পুরুষের মিছিল। দুদিকে দোকানপাট। দোকানে লোকের ভীড়। ক্লান্তিহীন কেনাবেচা চলেছে। সীমার দুটো চোখ স্থির হয়ে আছে জনযাত্রার ওপর। কিন্তু সে জানে বৃথা তার খোঁজা। এই মানুষের মিছিলে বিক্রম মিশে আছে, এটা যদি কল্পনা হয় তাহলে সে বড় কষ্ট কল্পনা।

সীমা এবার আসল জায়গায় পা চালাল। সে অনেক আশা করে আছে, হয়তো ওখানেই তাকে ধরতে পারবে! আর যদি না-ও হয় তাহলে অন্তত একটা খোঁজও সে পেয়ে যেতে পারবে ঐ ঘাঁটিতে। .....গাড়িগুলো সারি দিয়ে দাড়িয়ে আছে। সীমার সন্ধানী চোখ গড়িয়ে চলেছে ওদের ওপর দিয়ে।

অনেক দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ঐ তো বিক্রমের ল্যান্ডরোভার। হাল্কা হলুদ রঙের গাড়িখানা। দ্রুত পা চালিয়ে প্রায় দৌড়ে এসে পৌঁছল গাড়িখানার পাশে। না, এ তো ওর গাড়ি নয়। দূর থেকে অদ্ভুত একটা মিল দেখে ও ছুটে এসেছিল। সীমার কান্না পেয়ে গেল। ও হাঁফাতে লাগল।

গাড়িটার পাশেই ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল, সে সীমাকে ছুটে আসতে দেখে এগিয়ে এল।—বহিনজী, আপনি কি কোথাও যেতে চাইছেন?

সীমা হতাশায় ভেঙে পড়লেও ঘাড় নেড়ে জানাল, সে কোথাও যেতে চায় না। আবার সে একটি একটি করে গাড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ড্রাইভারগুলো তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সীমা ভাবল, লোকগুলো তাকে পাগল ভাবছে না তো?

একসময় আবার ঐ হলুদ রঙের ল্যান্ডরোভারখানার পাশে এসে দাঁড়াল সীমা। কথা বলার কিংবা চলার শক্তি নেই তার। এইটুকু হাঁটাহাঁটিতে সে যেন নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে।

ড্রাইভারটি আবার এগিয়ে এল। বলল, বহিনজী, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?

সীমার কানে ভারি মিষ্টি লাগল যুবকটির গলা। একটুখানি সহানুভূতির ছোঁয়ায় কেঁপে উঠল তার স্বর। বলল, আচ্ছা ভাই, আপনি কি বিক্রম রায় বলে কোন লোককে চেনেন? এই আপনার মত একখানা ল্যান্ডরোভার আছে তার—দার্জিলিং থেকে তাগদার রুটে চলে?

ড্রাইভারটি মৃদু হেসে বলল, বাঃ, চিনব না কেন, একই সঙ্গে তো আমরা এখানে দাঁড়াই।

সীমার মনে হল সে স্বর্গ হাতে পেলেও বুঝি এত খুশি হত না। সে এবার বলল, আচ্ছা ভাই, বিক্রম এখন কোথায় বলতে পারেন?

কথাটা বলেই কিন্তু সীমার বুকখানা আবার টিপ টিপ করতে লাগল। কি জানি এবার কি উত্তর দেয় লোকটি। উত্তর মনের মত না হলে তার যে আর দাঁড়াবার শক্তিটুকুও থাকবে না।

ড্রাইভারটি বলল, দু-তিনদিন বিক্রম তো কই এখানে আসেনি বহিনজী।

পায়ের তলার মাটি কাঁপছিল সীমার। তবু সে শক্ত করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

ড্রাইভারটি বুঝল কিছু একটা ঘটেছে মেয়েটি বিক্রমের খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। ও বলল, আপনি কি বিক্রমের বাড়ি থেকে আসছেন?

সীমা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, ওর অনুমান ঠিক।

ড্রাইভারটি বলল, আচ্ছা আপনি দাঁড়ান এখানে, বিক্রমের কোন খোঁজ পাই কিনা দেখছি।

ড্রাইভারটি বিক্রমের চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে বলে মনে হল সীমার। বড় ভদ্র যুবকটি। সীমা ওর চলে যাওয়া পথের দিকে আকুল চোখে চেয়ে রইল। কয়েকটা গাড়ির কাছে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারটি। তারপর বাজার পেরিয়ে উঠে গেল ওপরের রাস্তায়। এল প্রায় ঘন্টাখানেক পার করে। উৎকণ্ঠায় অবসন্ন ততক্ষণে সীমা।

ড্রাইভার যুবকটি কাছে এসে বলল, কার্শিয়াং হসপিটালের একখানা ভ্যান এসেছে। ওর ড্রাইভারের মুখে শুনলাম, গতকাল ও বিক্রমের গাড়িখানা হসপিটালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ।

সীমার গলা দিয়ে কোন স্বরই আর বেরিয়ে আসছে না। তবু অনেক কষ্টে ও ক'টি অক্ষর উচ্চারণ করল, অ্যাক্সিডেন্ট!

যুবকটি বলে উঠল না, না, অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাবে কেন, বিক্রমকে ওরা খুবই চেনে। তাছাড়া ওর ল্যান্ডরোভারখানা হস্‌পিটালের প্রায় সকলেরই চেনা। ঐ ল্যান্ডরোভার আগে যে ডাক্তারবাবুর ছিল তিনি ঐ হাসপাতালেই কাজ করতেন।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সীমার। আর যা-ই হোক সুস্থ আছে বিক্রম। একটা খবর অন্তত পাওয়া গেছে তার। সমস্ত শরীর আর মনের ওপর যে গুরুভার পাথরটা চেপে বসেছিল তা হঠাৎ নেমে যেতেই পাখির পালকের মত হাল্‌কা মনে হল নিজেকে।

সীমা বলল, ধন্যবাদ ভাই, আপনি অনেক উপকার করলেন।

যুবকটি বলল, দেখা হলে কিছু বলতে হবে?

সীমা বলল, বড় খেয়ালী মানুষ, তাই আমাদেরই ওর খোঁজ করতে হয়। বলবেন, আমি এসেছিলাম ওর খোঁজে।

যুবকটি বলল, আপনি ওর?

স্ত্রী,—বলেই দু'হাত তুলে নমস্কার করে সীমা জনারণ্যে মিশে গেল।

কতদিন কত রাত পার হয়ে গেছে। সীমা প্রতীক্ষা করেছে বিক্রমের জন্যে কিন্তু বিক্রম আসেনি। অনেক রাতে কোন গাড়ির আওয়াজ পেলে ঘুম ভেঙে গেছে সীমার। মনে হয়েছে, মানুষটা এল, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখেছে, হস্‌পিটালের গাড়িতে দার্জিলিংয়ের দিক থেকে ফিরছেন ডাক্তারবাবু।

একদিন সীমার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এল বিক্রম। এল নির্মল নীল আকাশের তলায় চাঁদের

জোয়ারে ভাসতে ভাসতে। ঝকঝকে নীল রঙের প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট গাড়িখানা যখন প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তাগদা বাজারে সীমার কোঠীর সামনে, তখন সীমা সেজেগুজে তৈরি হয়েই আছে।

ভোরবেলা সব্জি আনার অছিলায় এসে একটি মেয়ে জানিয়ে গেছে, আজ সীমাকে তৈরি থাকতে হবে। গাড়ি আসবে টি-এস্টেটের। বলেন্দ্র চৌধুরীর খবর দেবার পদ্ধতি হল এই।

সীমা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, প্রায় তেমনি নিঃশব্দে ফিরে চলল।

খাদের পাশ দিয়ে গাড়ি চলছিল। দূরে নীচের পাহাড়ে এক ঝাঁক জোনাকির মত জ্বলছিল টি-গার্ডেনের আলোগুলো। সেদিকে চেয়ে ছিল সীমা। যদিও প্রবল শীতে নিঝ্ঝুম হয়ে গেছে সারা পাহাড়ি অঞ্চল, তবু তার তেমন শীত বোধ করছিল না। সে গাড়ির কাচখানা নামিয়েই রেখেছিল। আর ঐ পথে হু হু করে ঢুকে আসছিল হাড়কাঁপানো হাওয়া। হঠাৎ গাড়িখানা ব্রেক কষে থেমে গেল। গাড়ির হেডলাইটও নিভল।

চাঁদের আলোয় সীমা দেখল, গরম পোশাকে আপাদমস্তক ঢেকে ড্রাইভার তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। আলো আঁধারে চেনা অচেনায় মেশা একটা চেহারা তার চোখের ওপর ফুটে উঠল। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু তার ধারণায় এল না।

সীমা গম্ভীর গলায় বলল, গাড়ি থামল যে?

ড্রাইভার বলল, ইচ্ছে হল, তাই থামালাম।

সীমা উত্তেজিত গলায় বলল, তার মানে?

ড্রাইভার বলল, বসতি ছেড়ে আমরা বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছি, এখানে চেঁচিয়ে কথা বললে কিছু সুবিধে হবে না। যা বলছি কর। জানালার কাঁচখানা তুলে দাও। ঠান্ডা হাওয়ায় তোমার কষ্ট না হতে পারে, কিন্তু ড্রাইভার বলে একটি জীব আছে তার কষ্ট হতে পারে।

সীমা এতক্ষণ উত্তেজনায় কাঁপছিল, এবার ভয়ে কাঁচ তুলে ঠাণ্ডা হাওয়া আসার পথ বন্ধ করে দিল। হঠাৎ তার অবচেতন মনের দরজাটা খুলে গেল। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, কে কে তুমি? বিক্রম!

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে, হেডলাইটের আলো ছড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর। বিক্রম গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, বিক্রম বলে কেউ নেই, সে মরে গেছে।

আকুল হয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সীমা, দুটি পায়ে পড়ি তোমার, গাড়িটা একটুখানি থামাও বিক্রম।

নির্বিকার বিক্রম বলল, পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।

সীমা উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল, যদি না থামাও, সত্যি বলছি আমি খাদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।

বিক্রম বলল, তাহলে নাটকটা জমবে ভাল। আমি ফিরে গিয়ে যখন সত্যি কথাটা বলব তখন বলেন্দ্র চৌধুরীর পোষা গুন্ডাগুলো আমাকে এখানেই টেনে আনবে। আর ঠিক তুমি যেখানে ঝাঁপ দিয়েছ সেখানেই ঠেলে ফেলে দেবে আমাকে। ক'দিন পরে পুলিশ রিপোর্টে বেরোবে, এক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা ভালবাসার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

নিরুপায় সীমা কোন উত্তর না দিয়ে ফুলে ফুলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কতকগুলো গাছের আড়ালে গাড়ি থামিয়ে বলল বিক্রম, স্মুদ্লি কোন কাজই দেখছি তুমি করতে দেবে না। একটা কিছু ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসবেই।

গাড়ি থেকে ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে সীমা। এখন তার আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সে শুধু ভাবছে কি করে এমনটা ঘটল। যাকে সে একেবারে চোখের আড়ালে হারিয়ে ফেলেছিল, সে কি করে আজ এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখের সামনে। এ যে কাহিনীর চেয়েও অবিশ্বাস্য!

কিছু পরে গাড়ির ভেতর থেকে বিক্রম বলল, বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার ভেতরের গরমটা কমেছে। এখন উঠে বসলেই আমি গাড়িখানা যথাস্থানে চালিয়ে নিয়ে যাই।

সীমা কোন উত্তর করল না। খাদের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিক্রম।

সীমার পাশে এসে বলল, কি পাগলামী করছ সীমা। তুমি ভাল করেই জানো দেরি হলে বিপদ ঘটবে।

সীমা বলল, এ গোলামী করতে কে তোমাকে বলেছিল? ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত একটা বারনারীকে বইবার চাকরি জোটালে!

বিক্রম বলল, বাজে কথা বলে কি লাভ সীমা, আমি না তোমার স্বামী?

চুপ করে রইল সীমা।

বিক্রম বলে চলল, সারা দার্জিলিংয়ের ড্রাইভারদের মেঠাই খাওয়াতে হল তোমার স্বামী হয়েছি বলে।

সীমার মনে পড়ল মাস কয়েক আগেকার একটা কথা। সে যখন পাগলের মত বিক্রমের খোঁজে দার্জিলিং গিয়েছিল তখন একটি ড্রাইভারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল, সে বিক্রমের স্ত্রী।

সীমা বলল, আরও কত আঘাত করতে চাও কর বিক্রম। অপরাধ যখন করেছি, শাস্তি তো তখন আমাকে পেতেই হবে।

বিক্রম বলল, সীমা, তোমাকে শাস্তি দিলে আমি নিজেই যে শাস্তি পাব। তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না, তোমাকে দেখার লোভেই আমি এই নরকের চাকরিটা অফার করা-মাত্র নিয়ে নিয়েছি।

সীমা বলল, তোমাকে না দেখতে পেয়ে সারাজীবন কাঁদতে কাঁদতে আমি যদি অন্ধও হয়ে যেতাম তবুও চাইতাম না তুমি আমাকে দেখার জন্যে এ গোলামী কর।

বিক্রম বলল, শুধু কি আর চোখের দেখা দেখব বলে আমি এসেছি সীমা, যদি কোনদিন তোমাকে এ নরক থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারি তাহলে সেদিন তোমার আমার সত্যিকারের শুভদৃষ্টি হবে।

সীমা বলল, তুমি যেখানে এসে পড়েছ, শুনেছি সেখানে ঢোকার পথ আছে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। যেদিকে যাবে সেদিকে পাহাড়ের খাঁজে, পথের বাঁকে, গাছের শাখায় চিতা ওৎ পেতে আছে, একটু ভুল করলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর। বিশ্বাস কর বিক্রম, পায়ে পায়ে অতি সাংঘাতিক ফাঁদ পেতে রেখেছে বলেন্দ্র চৌধুরী।

বিক্রম বলল, শুধু তুমি আমার কাছে আসবে, এটুকু কথা দাও, তাহলে কোন বিপদই আমাকে ছুঁতে পারবে না।

সীমা আবার কাঁদল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, এত বিশ্বাস আমার ওপর তোমার! আমি তোমার কাছে আসব, এ কল্পনা কোনদিন করিনা বিক্রম। তুমি যদি পরিত্যক্তা একটি মেয়েকে দয়া করে নিজের কাছে টেনে নাও তাহলে ভাবব সেটি আমার পশুপতিনাথের দান।

একদিন গভীর কনিফারের জঙ্গলের পরিত্যক্ত একখানা বাড়ির ভেতর বসেছিল সীমা আর বিক্রম। তাগদার এ বাড়িখানা ভূতের বাড়ি বলে জনপ্রসিদ্ধি আছে। কোথাকার এক রাজাবাহাদুর দার্জিলিং থেকে বেশ খানিক দূরে এই গভীর জঙ্গলের ভেতর বাড়িখানা তৈরি করেছিলেন। পাহাড়ের ওপর জঙ্গল ঘেরা এই বাড়িখানাকে চলার রাস্তা থেকে দেখা যায় না। এই রহস্যময় বাড়ির শীর্ষে লৌহশলাকায় বিদ্ধ লৌহনির্মিত একটি পাখি পথ থেকে দেখা যায়।

মনে হয় ঐ লোহার পাখিটা শলাকা বিদ্ধ হয়ে প্রাণভয়ে উড়ে পালাবার চেষ্টা করছে ঐ কনিফারের গাছটার গভীরে, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির চৌকিদার থাকে নীচের পাহাড়ে। সে বহুকাল মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই বাড়ির তদারকীতে তার কোন দায়-দায়িত্বই আর নেই। পাহাড়-কাটা ঘোরানো পথ এখন আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে। দুঃসাহসী কেউ আর কৌতূহলী হয়েও ওখানে ওঠে না। যেখানে যত বাধা বিক্রমের উৎসাহ সেখানে তত অফুরন্ত। সে বহুদিন আগেই এক পড়ন্ত বেলায় পিছনের জঙ্গল চিরে উঠেছিল ঐ বাড়ির হদিশ করতে। সে দেখল, বাড়ির কার্নিশ ঘিরে সাজানো লোহার কারুকর্মগুলি এখানে ওখানে মেরামতের অভাবে খসে খসে পড়েছে। দরজাতে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো ছিল। জানালাগুলো হাট হয়ে খোলা। শুধু পাখি লাগানো। ঘরের ভেতর দিয়ে অন্য ঘরে যাবার দরজা। সদর দিয়ে ঢুকলে করিডোরের দু-পাশে সারি সারি ঘর পেরিয়ে একেবারে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। বিক্রম ঐ পথে ঘরের ভেতর ঢুকেছিল। শ্বেত পাথরের মেঝে। কোন কোন ঘরে বিরাট বিরাট টেবিল ঘিরে চেয়ার পাতা। কোন কোন ঘরে পালঙ্ক। বিছানার চাদর তুলে নিয়ে গেছে মনে হয় চৌকিদারের লোক। গদিগুলো খোলা জানালার পথে বৃষ্টির ঝাপটা খেতে খেতে দলা পাকিয়ে গেছে। ভূতের ভয় কস্মিনকালেও নেই অসিম সাহসী বিক্রম রায়ের। সে বাড়িটি আবিষ্কার করার পর আজই অপরাহ্নে সীমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। ওরা দুজনে সেই পিছনের পাহাড়ি জঙ্গলের চিহ্নহীন পথেই উঠে এসেছে। মুখোমুখি বসে আছে বিক্রম আর সীমা। বিশেষ কোন জায়গায় গাড়ির যাবার না থাকলে বিক্রম তাড়াতাড়ি ছুটি পায়। বলেন্দ্র চৌধুরীর খাস ড্রাইভার সে! বিশিষ্ট অতিথিদের দার্জিলিং কিংবা নিউ জলপাইগুড়ির স্টেশান থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার ভার থাকে তার ওপর।

সীমা বলল, আচ্ছা, তোমাকে ওরা খুঁজে পেল কোত্থেকে?

বিক্রম বলল, তুমিই তো একদিন বলেছিলে বলেন্দ্র চৌধুরীর চোখ সব জায়গায়।

সীমা বলল, দেখ, তোমার চলে যাবার পর কত খুঁজেছি তোমাকে, দিন রাত কত কেঁদেছি তবু তোমাকে পাইনি, কিন্তু বলেন্দ্র চৌধুরীর চোখ ঠিক তোমাকে খুঁজে বের করেছে।

বিক্রম বলল, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে আর আমি একেবারে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেলাম কার্শিয়াং।

বিক্রমকে বাধা দিয়ে সীমা বলল, আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম বিক্রম?

বিক্রম বলল, সেদিন তাই মনে করেছিলাম, আর তাই তোমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিলাম অনেকখানি দূরে।

সীমা বলল, তারপর?

বিক্রম বলল, আমি গাড়ি নিয়ে প্রতিদিন একবার করে যেতাম হস্‌পিটালের রাস্তায়। পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে নেমে দেখতাম, মেটারনিটি হোমের ওপর আমার মায়ের নামটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আমার ডাক্তার দাদুর দান। মায়ের নামে দেওয়া তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়।

একদিন তন্ময় হয়ে ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটা লোক পিছন থেকে এসে আমার ঘাড়ে থাবা মারলে। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটা রোগা লম্বা লোক আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে।

দারুণ রাগ হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু লোকটা হাসছে দেখে রাগ করতে পারলাম না। পরক্ষণেই মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি লোকটাকে।

ও নিজেই বলল, চিনতে পারো দোস্ত?

ভুরু কুঁচকে মনে আনার চেষ্টা করছি দেখে ও বলল, তাগদা বাজারের পথে গাড়ির অ্যাকসিডেন্টের কথা এরই ভেতর ভুলে গেলে? তারপর একমুখ হেসে বলল, পেছু হঠে তুমি যে প্যাঁচ কষলে দোস্ত, তাতেই হয়ে গেলাম ঠান্ডা।

বললাম, সেজন্যে দুঃখিত, কিন্তু এখানে এলে কোত্থেকে?

লোকটা বলল, আরে ভাই, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তা এসেছেন টি-প্লান্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক কনফারেন্সে, আমি এসেছি তাঁর বডিগার্ড হয়ে।

সেই মুহূর্তে কেন জানি না সীমা, তোমার মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। দার্জিলিংয়ের ড্রাইভারটির কাছে একদিন তুমি আমার স্ত্রী বলে তোমার পরিচয় দিয়ে এসেছিলে, সে কথা কানে বাজতে লাগল। সেই মুহূর্তে মনে হল, এই লোকগুলো সীমা আর আমার ভেতর মিলনের সবচেয়ে বড় বাধা। বলেন্দ্র চৌধুরীর হাত থেকে সীমা বেরিয়ে আসতে পারছে না শুধু তার এই সাকরেদগুলোর জন্যে। আমার সারা শরীরে রক্ত ফুটতে লাগল। পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। মনে হল, লোকটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পাহাড়ের খাদে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসি। ও আমার মনের ভাব বুঝতে পারল না।

আমি কোন কথা বলছি না দেখে ও নিজেই বলল, কাজ করবে? বেশ ভাল মাইনের কাজ?

শ্লেষের হাসি হেসে বললাম, তুমি কাজ দেবে? আমি তো দোস্ত নিদেনপক্ষে হাজার টাকার কম মাইনেয় কাজ করব না।

ও সরাসরি বলল, এক বাৎ তো?

তেড়ে বললাম, বিক্রম রায় দুটো কথা কোনদিন বলেনি।

লোকটা আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল হস্‌পিটালের পিছন দিকের রাস্তায়। একখানা ঝকঝকে সাদা নতুন অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। সামনে উর্দী-পরা ড্রাইভার। আমাকে খানিক দূর থেকে দেখেই ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমার সঙ্গী লোকটা হয়তো তার সাহেবকে কিছু ইঙ্গিত করে থাকবে।

আমি কাছে যেতেই ভদ্রলোক হেসে বললেন, রাজি আছ চাকরি করতে?

বললাম, করতে পারি—হাজার টাকা মাইনে চাই; আর রাত আটটার ভেতর ছুটি করে দিতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ, তাই হবে।

উনি রিভারভিউ টি-গার্ডেনের ঠিকানা দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন, মাস পয়লাতে যেন আমি কাজে জয়েন করি। বিশ্বাস কর সীমা, ঐ টি-গার্ডেনে আবার তোমার মুখোমুখি হব এই আশা নিয়ে কাজে যোগ দিলাম। মনে মনে আশা, এমন একদিন কি আসবে না যেদিন ওকে বলেন্দ্র চৌধুরীর উদ্যত থাবা থেকে ছিনিয়ে আনতে পারব। আজও সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি সীমা।

সীমা বলল, তুমি আমাকে এতখানি ভালবাসলে কি করে বিক্রম?

বিক্রম বলল, পণ্যা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল তা তুমি পাল্‌টে দিয়েছ বলে। আমার ঘর বাঁধার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দেবার শক্তি যার আছে তাকে ভাল না বেসে কি পারা যায় সীমা! কত ভদ্র ঘরের মেয়ে কার্শিয়াং-এ আমাকে কাছে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আমার মন তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি। তুমি সমাজের চোখে একেবারে সাধারণ হয়েও শুধু উপেক্ষা দেখিয়ে আমাকে জয় করে নিলে। জয় নয় সীমা, একেবারে পাগল করে তুললে।

সীমা বিক্রমের হাতখানা ধরে বলল, শুধু তুমি পাগল হয়েছ, আমি হইনি? আমি কি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা হইনি?

বিক্রম বলল, তাই তো আবার এসেছি আমরা কাছাকাছি। এখন শুধু ওদের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতির পথটুকু খুঁজে বের করতে হবে।

সীমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল বিক্রম। সীমার হৃদয়ে তখন বাজছিল একটা রাগিণী। অসহ্য সুখের কান্নায় ভরা সে রাগিণীর সুর। তার মনে হচ্ছিল অনেক তৃষ্ণা বুকে নিয়ে সে দুস্তর মরু পার হয়ে এই মাত্র এসে স্পর্শ করল এক শীতল নদী। যে নদীতে স্নান করে, যার জল বুক ভরে পান করে সে তার এতদিনের দুঃসহ জ্বালা জুড়োতে পারবে।

চাঁদের একফালি আলো জানালা দিয়ে এসে পড়েছে বিক্রমের মুখে। সীমা দেখছে, বলিষ্ঠ পুরুষের দেহে একটি শিশুর মুখ বসানো। যে মুখে হাজার চাওয়ার ছবি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে, কিন্তু নেই কোন জটিল আসক্তির চিরস্থায়ী চিহ্ন।

বিক্রম বলল, কথায় কথায় রাত হয়ে গেল, এখন বন চিরে নামব কেমন করে?

সীমা বলল, তোমার দুষ্টুমীর খেলায় পেয়ে বসেছিল, তাই হুটপাট করে আমাকে এখানে নিয়ে এলে, এখন পথ ভুললে চলবে কেন মশাই?

বিক্রম ওর কোলে মাথা রেখে পাশ ফিরে শুল। যেন কোন তাড়া নেই তার। সীমাকে ঘরে পৌঁছে দেবার নেই কোন দায়দায়িত্ব।

সীমা ওর চুলে ভরা মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলল, সত্যি তুমি আজ নামবে না?

বিক্রম হাঁটু দুটো ভেঙে আরও গুড়িসুড়ি মেরে আরাম করে শুলো। হঠাৎ একবার সীমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, যদি এখানেই রাতটা কাটিয়ে দি, খুব অসুবিধে হবে তোমার?

কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল সীমা। বিক্রম কাছে থাকলে সময়, মানুষ কিংবা স্থানের কথা সে বেমালুম ভুলে যেতে পারে।

বিক্রম উঠে বসে বলল, সারা রাত এই পোড়ো বাড়িতে কাটাতে তোমার ভয় করবে না সীমা?

সীমা ধমকের গলায় বলল, খুব হয়েছে শোও তো।

বিক্রম বলল, প্রায় সব ক'টা দরজা জানালা ভাঙা, পিছনের জঙ্গল থেকে জন্তু জানোয়ারগুলো ঢুকে পড়তে পারে। তাছাড়া সাপের ভয়ও তো আছে।

সীমা বলল, একটা সাপ কাটলে তো আমি বেঁচেই যাই। তাহলে আমার জন্যে তোমাকে আর এত কষ্ট পেতে হয় না।

বিক্রম বলল, খু-উ-ব কষ্ট, না?

সীমা বলে চলল, আর জন্তু জানোয়ারের ভয় আমার নেই। এই জঙ্গলের জন্তুর চেয়ে বসতি এলাকায় অনেক ভয়ঙ্কর জন্তুর মুখোমুখি হয়েছি আমি।

বিক্রম আবার শুয়ে পড়ে বলল, তাহলে তো সব ভাবনাই চুকল। আজ আর এই রাজপ্রাসাদ থেকে নড়ছি না। আমি এখানে একরাতের রাজা, আর তুমি....

সীমা বাধা দিয়ে বলল, থাক, আমাকে আর রানী বানাতে হবে না। তাহলে কাল সকালে ঘরে ফিরে আর সব্জির দোকান খুলে বসতে মন চাইবে না।

বিক্রম বলল, সত্যি, এই অপূর্ব জায়গাটা যেন আমাদের জন্যেই ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে।

সীমা বলল, তা বলতে পারো।

চাঁদের আলোটা হঠাৎ একটা আবছায়ায় ঢেকে গেল। বিক্রম উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই ডাক দিল সীমাকে। সীমা কাছে যেতে আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলল, মেঘ ঘনাচ্ছে আকাশে। বৃষ্টি হলে কিন্তু ঠাণ্ডা পড়বে প্রচণ্ড। সইতে পারবে তো?

সীমা বলল, ভয়টা তোমার, কারণ শীতকাতুরে আমি নই, তুমি। এখন থাকা আর নেমে যাওয়া তোমার মর্জির ওপর নির্ভর করছে।

বিক্রম বলল, তুমি সাহস দিলেই কিন্তু থেকে যাই।

সীমা বলল, মারামারি করার বেলা তো সাহসে কই ঘাটতি পড়ে না, তবে এই সামান্য শীতের ভয়ে কাবু কেন মশাই?

বিক্রম অমনি সীমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। করিডোর পেরিয়ে ওরা এল সিঁড়ির নীচে। দুজনে পাশাপাশি উঠতে লাগল ওপরে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর বাঁ পাশের দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছিল। ধাক্কা লেগে কাচ ভেঙে গেছে কবে। সেখানে ঘুলঘুলি দিয়ে এসে পড়েছিল আবছা এক ফালি আলো। বিক্রম সীমার হাত ধরে থমকে দাঁড়াল।

রুদ্রমহাদেব মৃত সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে পাগলের মত নৃত্যের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রম আর ওখানে দাঁড়াল না। সীমার হাত ধরে টেনে নিয়ে পশ্চিমের একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকল। এ ঘরের উত্তর দিকে কোন জানালা নেই পুবে করিডোর। দক্ষিণের জানালার কপাটগুলো খোলা, কিন্তু একেবারে ভাঙা নয়।

বিক্রম বলল, আজ আমাদের এ ঘরেই প্রথম রাত্রিবাস হবে।

বলেই বিক্রম দক্ষিণের খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে সেটা বন্ধ করে দিল। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত ওরা। ঘরের দরজা ভেজিয়ে একটা ড্রেসিং টেবিল টেনে এনে তার গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হল। যাতে ঝড়ে দরজাটা না খুলে যায়। দরজা জানালা বন্ধ করে দিতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল ঘরটা। এটা নিশ্চয়ই ছিল রানীমহল। এই একান্ত নিভৃত ঘরটিতে নিশ্চয়ই শয্যা বিছাত কোন পর্দানসীন রানী। হয়তো নিশুতি রাতে রাজাবাহাদুর নিঃশব্দে উঠে আসতেন এই ঘরে। নিদ্রাহারা রানীর পাশে থেকে তিনিও জাগরণে নিশিযাপন করতেন।

সীমাকে নিয়ে প্রাচীন ঐ পালঙ্কে উঠে এল বিক্রম। বাইরে তখন ঝড়ের হাওয়ার গান উঠেছে। নীচে ওপরে রাজবাড়ির প্রায় সর্বত্র ভাঙা দরজা জানালায় করতালের ধ্বনি বাজতে লাগল। অন্ধকারে ওদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঘরের ভেতর বাজছে টুকরো টুকরো কথা—এক একটা উৎকৃষ্ট গানের সুরে ভরা কলির মত।

বিক্রম বলল, সীমা, আজ তোমাকে বুকের ভেতর পেয়ে মনে হচ্ছে রীখিমায়ার কথা।

রীখিমায়া কে বিক্রম?

তাকে তুমি চিনবে না। সিক্স মাইলের হোটেল মালিকের মেয়ে। এক কাওয়ালী গাইয়ের সঙ্গে ভাব করে পালিয়েছে।

সীমার গলা ভেসে এল : তার কথা তোমার মনে এল কেন বিক্রম?

ওকে আমি পালাতে সাহায্য করেছিলাম। ঠিক পালাতে সাহায্য করেছি বললে ভুল হবে, খানিক পথ ওদের এগিয়ে দিয়ে এসেছি আমার গাড়িতে।

সীমার গলা : ওকে তুমি কতদিন থেকে চিনতে?

অনেকদিন। ওদের হোটেলেই আমি তখন রাতের খাবার খেতাম।

তুমি রীখিমায়াকে ভালবাসতে?

বিক্রম বলল, কখনও হয়তো ওকে ভাল লেগেছে, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে তার কোন তুলনা করা যায় না।

আবার প্রশ্ন সীমার : রীখি তোমাকে ভালবাসত?

মনে হয়, ওর মনে রঙ ধরেছিল। তবে আমি পাত্তা দিতাম না বলে ও সাহস করে কাছে ঘেঁষতে পারত না।

সীমা বলল, আজ কেন ওর কথা মনে পড়ল তোমার বিক্রম? বল না গো—লুকিও না কিন্তু কোন কথা। আমার গা ছুঁয়ে আছ তুমি।

যেদিন ওরা পালাচ্ছিল আর আমি সিক্স মাইলের ছোঁড়াগুলোর তাগাদায় ওদের ধরব বলে গাড়ি ছুটিয়েছিলাম, সেদিনটার কথা মনে পড়ে গেল।

একটু থামল বুঝি বিক্রম। কোন কথা নেই সীমার মুখে।

আবার বিক্রমের গলা শোনা গেল : দূর থেকে ওদের পালাতে দেখলাম আমি। তখন এমন ভাল লাগল ওদের দুটিকে দেখে যে কি বলব! আমি পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে ওদের সুখী সংসারের ছবি দেখতে লাগলাম। আমি ঠিক তার পরেই ওদের পালাতে সাহায্য করলাম। আজ মনে হচ্ছে ওদের মিলনে আমি যেটুকু সাহায্য করেছিলাম, তারই পুরস্কার বিধাতা আমাদের দিয়ে দিলেন।

সীমার গলায় আবেগ : তুমি এত ভাল বিক্রম, তোমার কাছে আমি কত ছোট।

বিক্রম বলল, যারা সত্যিকারের ভালবাসতে জানে তাদের কেউই ছোট নয়।

সীমা বলল, রীখিমায়া কত ভাল, আর আমি?

তুমি কি, সীমা?

আমি? আমি একটা পতিতা মেয়ে, যার কোন পিতৃপরিচয়ও নেই।

সীমার মুখে চাপা দিয়ে চাপাগলায় বলল বিক্রম একটা ভালবাসার মন যদি কারো থাকে সীমা, তাহলে তার আর কোন পরিচয়ের দরকার হয় না। তুমি যদি আর কখনো নিজেকে পতিতা বল তাহলে আবার সব ছেড়েছুড়ে আমি কার্শিয়াং চলে যাব।

সীমা অস্ফুটে কি বলল বোঝা গেল না। সে তখন বুঝি নিবিড় ভালবাসার পেষণে ইক্ষুরসের মত বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ছে।

একসময় বিক্রম বলল, কি, এমন স্থির হয়ে রইলে যে, কথা বলবে না?

উঁ—বলে পাশ ফিরল সীমা। সম্ভবত বিক্রমের একখানা হাত বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে শুলো ও।

বিক্রমের গলা শোনা গেল : এ হাতে আর তো স্টিয়ারিং ধরতে মন চাইবে না সীমা। তোমার বুক ছুঁয়ে এ হাত যে সোনার চেয়েও দামী হয়ে গেল।

সীমা জড়িত গলায় বলল, কথা বল না লক্ষ্মীটি, কিছু সময় আমাকে চুপ-চাপ একা থাকতে দাও। আমি এত পেলাম তোমার কাছে যে সে আনন্দের ভার আমি বইতে পারছি না। না না, হাতখানা থাক আমার বুকের মাঝখানে, দোহাই তোমার, সরিয়ে নিও না।

বিক্রম বলল, এরপর আমি তোমাকে আর কারো হাতে তো তুলে দিতে পারব না সীমা। যতদিন তোমাকে স্পর্শ করিনি ততদিন তোমাকে রক্ষা করার ভারও ছিল না আমার হাতে। কিন্তু আজ সব কিছু আমাকে সঁপে দিয়ে সব দায়িত্বই তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছ।

সীমার অস্পষ্ট গলা বাজছে : আমি কিছু ভাবতে পারছি না বিক্রম। এ সুখ না দুঃখ সে বোধটুকুও আমি হারিয়ে ফেলছি ধীর ধীরে। তুমি আমাকে এখন থেকে যেভাবে গ্রহণ করতে চাও কর, আমার বলে আজ থেকে আর কিছু রইল না। ভেবে নিও, তাগদা বাজারের সব্জিওয়ালী সীমা মরে গিয়ে নতুন জন্ম নিয়েছে। আর সে মরেছে তোমারই হাতে।

বাইরে চলছে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব। এলোমেলো হাওয়ার দাপাদাপি শোনা যাচ্ছে। ঠক্ ঠক্ একটা আওয়াজ ক্রমাগত কানে এসে বাজছে। সিঁড়ির ঠিক ওপরের দেয়ালে টাঙানো রুদ্র ও সতীর ছবিখানা ভৈরব নাচের তালে তালে দোল খাচ্ছে, তারই শব্দ। বিক্রমের মনে হল সতী মরে গিয়ে উমা হয়ে জন্ম নিল এই অরণ্যঘেরা শৈলপুরী তাগদায়।

মাস তিনেক পরের কথা। রোববারের ছুটি। সীমা আগে থেকে বলে রেখেছে তাগদা বাজারের উত্তরে লম্বা যে পানিসাজ গাছটা মাখন রঙের ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার তলায় ঠিক দুপুরবেলা ও অপেক্ষা করবে। বিক্রম ওখানে এলেই সীমা তাকে নিয়ে যাবে এক সাধুবাবার কাছে। বেশী দূরে নয়, তাগদার উত্তরে যে পাহাড়টা তাগদার সীমা নির্দেশ করছে তারই ওপরে ছোট্ট একখানা ঝোপড়িতে থাকেন তিনি।

মা বেঁচে থাকতে সীমা কয়েকবার গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে সাধুবাবার কাছে। ধবধবে সাদা দাড়ি সদাপ্রসন্ন মুক।

মা সাধুবাবার জন্যে নিয়ে যেত শুকনো ফল। তিনি ঐ ফল খেয়েই জপধ্যানে কাল কাটাতেন। পাহাড়িরা মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেত আর ওই রকম শুকনো ফল দিয়ে আসত। ধীরে ধীরে এটাই রীতি হয়ে গেল। সাধুবাবার কাছে গেলেই নিয়ে যেতে হবে শুকনো ফল। ভক্তি করত সবাই এই বাঙালী সাধুবাবাটিকে, কিন্তু সাধুবাবা নিজে কাউকে দীক্ষা দিয়ে ভক্ত বানাতেন না।

তিনি বলতেন, নিজের কর্মকে শুদ্ধ কর। নিজের কাছে যা অপবিত্র বলে মনে হবে তাকে বর্জন করে যা কিছু পবিত্র বলে ভাববে তাকে গ্রহণ কর। এমন কাজ করবে না যাতে নিজের স্থির বিচারের কাছে মাথা হেঁট হয়।

এসব কথা তিনি সভা ডেকে সবাইকে জড়ো করে বলতেন না, কাছে গিয়ে যে সব ভক্ত কিছু উপদেশ চাইত তিনি তাঁদের ঐ ধরনের কথা শুনিয়ে দিতেন।

ঠিক দুপুরে নির্দেশ মত পানিসাজ গাছের তলায় এসে দাঁড়াল বিক্রম। তখনও সেখানে এসে পৌঁছয়নি সীমা। ছোট্ট ঝুঁটি বাঁধা জুরেলি পাখিটা টুই টুই লিক্ শব্দ তুলে গাছটার মাখন রঙের ফুলের চারদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই এসে পড়ল সীমা, হাতে একটা প্যাকেট। ওরা পাহাড়ি পথের আঁকবাঁক পেরিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বুক্‌কী গাছের ঝোপে বেগুনী রঙের ফুল ফুটে আছে। অযত্নের গাছ, তবু কি সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে। গোটা দুয়েক প্রজাপতি ফুলের চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে। ওরা চারদিকে তাকাতে তাকাতে ওপরে উঠছে। ওপর থেকে অনেক নীচে টি-গার্ডেনগুলো কচ্ছপের পিঠের মত মনে হচ্ছে। কাল্‌চে সবুজ, ফিকে সবুজ পাতাগুলোর ওপরে সূর্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছে একটা সবুজ গালিচা যেন কেউ পেতে রেখে দিয়েছে পাহাড়ের ওপর। ওদিকে সূর্যকিরণে রূপোর পাতের মত ঝিলিকি দিচ্ছে তিস্তার জল। এত ওপর থেকে সবকিছু আর্টিস্টের হাতে আঁকা ছবি বলে মনে হচ্ছে।

এখন ওরা প্রায় সাধুবাবার কোঠির কাছাকাছি উঠে এসেছে। হলুদ আর লাল্‌চে বাবরি ফুল দেখতে দেখতে ওরা পাহাড়ি বাঁক পেরিয়ে এসে দাঁড়াল ঝোপড়ির সামনে।

সাধুবাবা তাঁর উঠোনে চুনাখারি গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুল কুড়োচ্ছিলেন। পিছন ফিরতেই দেখতে পেলেন ওদের দুজনকে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন ওদের দিকে। মুখে মিষ্টি হাসি মাখানো। সাদা দাড়িটি যেন তাঁর পবিত্রতার প্রতীক।

কাছে গিয়ে ওরা পর পর প্রণাম করতেই উনি ওদের হাতে তাঁর কুড়োনো চুনাখারি ফুল একটি করে দিলেন। হাওয়ায় ভারি মিঠে গন্ধ ছড়াচ্ছিল ফুলগুলো। গাছের তলায় একখানা চারপাই এনে ফেললেন সাধুবাবা।

ওরা বয়ে আনতে চাইলে উনি বাধা দিয়ে বললেন, অতিথিকে সেবা করতে হয়। তোমাদের সেবার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত কর না। যতদিন শরীরের শক্তি কুলোয় ওটুকু আমাকে করতে দাও।

সাধুবাবা বসলেন, আর ওরা তাঁর একটুখানি দূরে খাটিয়াতে বসে পড়ল।

সাধুবাবা বললেন, মুখখানা খুব চেনা চেনা লাগছে।

সীমা সঙ্কোচের হাসি হেসে বলল, মায়ের সঙ্গে এসেছি কয়েকবার। থাকি তাগদা বাজারে। সে অনেক দিনের কথা। তখন ছোট ছিলাম।

সাধুবাবা বললেন, মনে পড়ছে সব। মায়ের হাত ধরে আসত ছোট্ট একটি মেয়ে। সে মেয়ে এত বড় হয়ে ঠিক মায়ের মতটি হয়েছে। খুব খুশি হলাম দেখে। একটু থেমে বললেন, কই, তোমার মাকে তো আর দেখি না।

সীমা বলল, মা ক'বছর হল মারা গেছেন।

সাধুবাবা সীমার ছলছল চোখের দিকে চেয়ে বললেন, মা কারো চিরদিন থাকে না বেটি। বড় ভাল মেয়ে ছিল বিদ্যাবতী।

সীমা বলল, আপনি আমার মায়ের নামটা মনে রেখেছেন!

মৃদু হাসলেন সাধুবাবা। বললেন, বড় শুদ্ধ ছিল তোমার মায়ের অন্তর। তার সংসারকর্ম মনোমত ছিল না বলে বড় আক্ষেপ করত। বিক্রমের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্টে দিলেন তিনি। বললেন, এই তরুণ বন্ধুটিকে আগে কখনো দেখেছি বলে তো কই মনে পড়ছে না?

বিক্রম বলল, আজ প্রথম আপনার দর্শনে এলাম।

সাধুবাবা বললেন, 'দর্শন' বল না ভাই, ওসব ঠাকুর দেবতার বেলাতেই মানায়। আমরা আর পাঁচটি মানুষেরই মত। বলতে পারো, বড় স্বার্থপর। সংসারের আঁচ পাছে গায়ে লাগে তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা একথা থাক, এখন বল তো ভাই, তোমার কি করা হয়?

বিক্রম বলল, আমি রিভারভিউ টি-গার্ডেনে গাড়ি চালাই।

সাধুবাবা বললেন, এ বি রায়চৌধুরীর গার্ডেন ওটা, তাই না?

বিক্রম মাথা নেড়ে বলল, ঐ রকম একটা কি নাম শুনেছি। তবে আমাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ ম্যানেজার বলেন্দ্র চৌধুরীর।

সাধুবাবা হেসে বললেন, তোমার দেশ কোথায় ভাই? মা বাবা কে আছেন?

বিক্রম বলল, কেউ নেই। আমি জন্ম থেকে বাবাকে দেখিনি। মা বেশ কিছুকাল মারা গেছেন। আমার দেশ বলতে পারেন দার্জিলিং। মাকে বাবা কেন জানি না ত্যাগ করেছিলেন। মা কার্শিয়াঙে এক মহানুভব ডাক্তারের আশ্রয়ে সারা জীবন ছিলেন। আমি সেখানেই মানুষ।

সাধুবাবা বললেন, তুমি ধনমায়ার ছেলে।

বিক্রমের বিস্ময় তখন সীমাহীন! সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, আপনি চিনতেন আমার মাকে?

সাধুবাবা বললেন, সংসারে থাকলেই ব্যথা আছে। আর ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে কেউ কেউ এসেছে আমার কাছে। সেই সূত্রে তোমার মা আমার চেনা।

বিক্রম বলল, মা কিংবা ডাক্তার দাদু, আমার কাছে মায়ের অতীত জীবনের কোন কথাই বলতে চাইতেন না। শুধু একদিন পীড়াপীড়িতে মা বলেছিলেন, বাবা তাঁকে ত্যাগ করেছেন বিনা দোষে। এক সাধুর চিঠি নিয়ে তিনি ডাক্তার দাদুর কাছে কার্শিয়াং-এ যান। আর সেখানেই তিনি আশ্রয় পান।

সাধুবাবা বললেন, তোমার মা পবিত্র ছিল কর্মে, আচরণে, ভাবনায়। তেমন নারী সমস্ত সমাজের প্রণামের যোগ্য।

এমন বলিষ্ঠ শক্তিমান বিক্রমের কি যে হল, হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মত কেঁদে উঠল। কান্না থামলে সাধুবাবার দিকে চোখ তুলে বলল, কত গঞ্জনা আমাকে শুনতে হয়েছে বন্ধুদের কাছে। কত মানুষের কত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, কেন বাবা মাকে ত্যাগ করলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি। আজ মায়ের নাম আপনি যেভাবে উচ্চারণ করলেন তাতে আমার এতদিনের সব দুঃখ ধুয়ে মুছে গেল।

সাধুবাবা দূর অতীতের দিকে দৃষ্টি মেলে বললেন, এক ঝড়ের রাতে একটি ছোট ছেলের হাত ধরে তোমার মা আমার দরজায় এসে আছড়ে পড়েছিল। আমি তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম, কোন ভয় নেই মা, কি হয়েছে খুলে বল—তোমার মা সব কথাই আমাকে বলেছিল। সে যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ সেদিন তার কথা থেকে আমি বুঝেছিলাম। তাকে আর তার সন্তানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে গুন্ডা লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি জানতে পেরে দুর্যোগের রাতেই সে ছেলেটিকে বুকে নিয়ে দৌড়ে আসে আমার কাছে। আমি তাকে অতি গোপনে কদিন রেখে কার্শিয়াঙে আমার ডাক্তার ভাইটির কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাই।

বিক্রম বলল, ডাক্তার দাদু কি আপনার আপন ভাই?

সাধুবাবা হেসে বললেন, মায়ের পেটের ভাই হলেও সাধুদের কোন বন্ধন রাখতে নেই। পরিচয়ও দিতে নেই।

বিক্রম বলল, আপনি আমার বাবার পরিচয় জানেন?

উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব বিক্রমের মুখের দিকে চেয়ে সাধুবাবা বললেন, কি হবে জেনে ভাই। মানুষের পরিচয় মানুষ নিজেই। দেশজোড়া খ্যাতিমান পিতার পুত্র হয়েও সে নিজের অকৃতির জন্যে সমাজে নিন্দিত হয়েছে। আবার পরিচয়হীন পিতার সন্তানও নিজের শক্তিতে দেশবন্দিত হয়েছে। তাই বলছিলাম, পরিচয় নিজের অন্তর-শক্তির বিকাশের ভিতরেই রয়েছে।

বিক্রম আর কোন প্রশ্ন করল না দেখে সাধুবাবা আবার বললেন, তুমি প্রথম পরিচয় দিতে গিয়ে, তোমার বাবা যে মাকে ত্যাগ করেছিল সে কথাটুকুও গোপন করে যাওনি। তাই আমি বলছি, একদিন তুমি আপন পরিচয়ে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে। তোমার মনুষ্যত্বকে কেউ মলিন করতে পারবে না।

সীমা সাধুবাবার কাছে তার আনা কিছু শুকনো ফল রেখে দিতেই সাধুবাবা ভেতরে উঠে গেলেন। দুটি রেকাবিতে সামান্য কিছু ফল এনে দিলেন ওদের। হেসে বললেন, দেখলে তো ভাই, সাধুরাও কি রকম স্বার্থবুদ্ধি রাখে। যতক্ষণ অতিথির কাছ থেকে কিছু পাইনি ততক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। এখন কিছু পেয়েই হাত খুললাম। গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি আর কি!

কথাগুলো বলে দরাজ গলায় হাসতে লাগলেন সাধুবাবা।

ওরা প্রসাদ পেয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে এল। বেশ খানিক নীচে নেমে ওরা ফিরে দেখল, ঝোপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাধুবাবা তখনও তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করছেন।

রাতে কথা হচ্ছিল সীমা আর বিক্রমের।

সীমা বলল, বল দেখি আজ কেন সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলাম?

বিক্রম বলল, কেন জানি না। তবে তুমি আজ ওঁর কাছে নিয়ে গেলে আর ফিরে আসার পর আমার মনে হল, আমি তীর্থ দর্শন করে এলাম, কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেছে সীমা। উনি যে আমার

অসহায় মাকে পবিত্র নারী ভেবে বিপদের দিনে ডাক্তার দাদুর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেজন্যে ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সীমা বলল, আমার মা আমারই মত সংসার জীবনে হীন কাজ করে গেছে, তবু দেখ, পতিতা বলে উনি উপেক্ষা করেননি। আপনার জনের মত মায়ের মনের ক্ষত দূর করার চেষ্টা করেছেন।

বিক্রম বলল, সত্যি, এমন শুদ্ধ হৃদয়ের একটি মানুষকে দেখা মহা পুণ্যের কাজ।

সীমা বলল, আমাদের সন্তান এমনি এক মহাত্মা মানুষের আশীর্বাদ লাভ করুক, এই ভেবে আমি ওঁর চরণ স্পর্শ করতে গিয়েছিলাম।

বিক্রম চৌকির ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। তার গলায় বিস্ময়, আনন্দ, উদ্বেগ একই সঙ্গে প্রকাশ পেল, কি বললে! আমাদের সন্তানের জন্যে গিয়েছিলে! কই, আগে তো এ খবর আমাকে দাওনি!

সীমা বলল, খুব বেশী দিন আমিও জানতে পারিনি। যখন জানলাম তখন মনে হল পুণ্যাত্মা মানুষের পায়ের ধুলো আগে নিয়ে আসি, তারপর খবরটা তোমাকে দেব।

বিক্রম সীমাকে তার বলিষ্ঠ দুটো হাতে চেপে ধরে বলল, তুমি মা হতে চলেছ সীমা! আমার সন্তানের মা! আমি যে তোমাকে কি দেব তা ভেবেই পাচ্ছি না!

সীমা বলল, মেয়েদের সবচেয়ে যা কামনার ধন তাইতো তুমি আমাকে দিয়েছ বিক্রম। এরপরে আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। বিক্রম সীমাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমায় চুমায় ভরে তুলল। আনন্দে সব কথা তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

রাত শেষে সীমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বিক্রম বলল, এখন থেকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে সীমা! এতদিন আমি আমার ভালবাসার জনের অপমান হজম করতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমার ভাবী সন্তানের মায়ের অপমান কোন রকমেই সহ্য করতে পারব না।

পরের দিন রাত প্রায় বারোটা, দরজায় টোকা পড়ল। জেগেই বসে ছিল সীমা। দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিল। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। বিক্রম ঘরের ভেতর ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল সীমা। চোখে মুখে উদ্বেগের ছবি।

সীমা বলল, এত দেরী! তুমি আমাকে এমন ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে যে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

বিক্রম সীমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ওর বুকের ওপর কান চেপে বলল, ঠিক, এখনও শব্দটা ড্রামের মত বাজছে। সীমা ওকে দু'হাতে দূরে ঠেলে দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেলল। এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগটুকু উচ্ছ্বসিত হয়ে গলে গলে ঝরে পড়তে লাগল।

বিক্রম হতবাক। সে ভাবতে পারেনি তার দেরিতে আসার জন্যে সীমা এতখানি আহত হয়েছে। সে অপরাধীর গলায় বলল, আমি তো অনেক রাতে এ বাসায় ফিরেছি, কই, তুমি তো তখন এমন করে ভেঙে পড়নি!

সীমা কান্নার ঢেউ তুলে বলল, তখন তুমি দার্জিলিং থেকে তাগদায় গাড়ি চালাতে। তাছাড়া যেদিন থেকে তুমি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছ সেদিন থেকে বল, কবে ফিরতে তোমার এতখানি দেরি হয়েছে?

বিক্রম বলল, আগে শোন আমার কথা, তারপর না হয় শাস্তি দিও যেমন খুশি।

শাস্তি দেবার কথায় সীমার মনটা শান্ত হল। সে কোন কথা না বলে চেয়ে রইল বিক্রমের মুখের দিকে।

বিক্রম বলল, আজ বলেন্দ্র চৌধুরীকে বিদেয় করে দিয়ে এলাম পাক্কা পনেরোটি দিনের মত। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশানে একেবারে তার বার্থে তুলে দিয়ে তবে তোমার কাছে এসেছি।

সীমা বলল, বুঝলাম, কিন্তু তাতে আমার লাভ?

বিক্রম বলল, লাভ দু' সপ্তাহের ছুটি। বলেন্দ্র চৌধুরী স্যাংশান করে দিয়ে গেছে। তারপর ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল বিক্রম, এখন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট, আর ঠিক তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পরে অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় চারটেতে আমরা তাগদা ছেড়ে চলে যাচ্ছি দু'হপ্তার ছুটি কাটাতে।

সীমা বলল, কোথায়?

বিক্রম বলল, গাড়িতে স্টিয়ারিং ধরে যেদিকে দু'চোখ যায় উড়িয়ে নিয়ে যাব।

সীমা বলল, আমার দোকানের কি হবে?

বিক্রম বলল, গুলি মারো তোমার দোকানদারীতে। জীবনের অনেকগুলো দিন তো দোকানদারী করলে, এখন না হয় ঝাঁপটা ফেলেই দিলে।

সীমার মুখখানা হঠাৎ ছাই-এর মত হয়ে গেল! সে রুদ্ধ গলায় বলল, তুমি আমাকে এমন কথা বললে?

বিক্রম বুঝতে পারেনি সে তার অজান্তে সীমাকে একটা বড় রকমের আঘাত দিয়ে বসে আছে। হঠাৎ তার খেয়াল হতেই সে সীমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, আমি তোমাকে নিছক তোমার ঐ সজি দোকানের কথাই বলেছি। কোন রকম আঘাত দেব তোমাকে, এ আমি ভাবতেই পারি না।

সীমার মনের মেঘটা মুহূর্তে কেটে গেল। সে ত্রস্ত হয়ে উঠল এবার। বলল, ছাড় ছাড়, এইটুকু সময় হাতে, গোছগাছ করে নিতে হবে না।

বিক্রম সীমাকে ছেড়ে দিতেই সে সুটকেশ আর বেডিং গোছাতে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। বিক্রম চৌকির ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বিক্রমের চোখে একটুখানি তন্দ্রার ঘোর লেগেছিল, হঠাৎ কি যেন একটা ভাজার ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ও লাফ দিয়ে উঠে পাশের ঘরে ঢুকে দেখলে, যা ভেবেছিল তাই। সীমা একরাশ রুটি সেঁকে ডাঁই করে রেখেছে। কড়াতে এখন তেলেবেগুনে চলেছে বোঝাপড়া।

বিক্রম বলল, আমি বেড়াতে যাব না।

ব্যাস্ত সীমা হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলল, কেন?

বিক্রম গলায় ক্ষোভ আর হতাশার একটা সুর তুলে বলল, যেখানে মেয়েরা যাবে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে চলল সারা সংসার। আরে বাপু, তাহলে বেডানোটা কেন? পথে ঘাটে যা জুটবে তাই খাব, আর গাছতলায় গড়িয়ে নেব, এ না হলে বেড়ানো।

সীমা বলল, ঠিক আছে, এ ক'খানা রুটিতে তো আর চোদ্দটা দিন চলবে না, তখন পথের সরাইখানাই ভরসা। তুমি রাতে ঘরে এসে কিছু মুখে দিলে না তাই খানিকটা খাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

বিক্রম আর কিছু বলল না।

বেরোতে বেরোতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল ওদের। তাগদার জঙ্গল পেরিয়ে আসার সময়ই রাতের আকাশে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। সিক্স মাইলে পৌঁছে ঘন বনটা ফুরিয়ে গেল, আর অমনি পূবের আকাশ জুড়ে শুরু হল আলোর উৎসব। তিস্তা রোড ধরেই গাড়ির মুখ ঘুরিয়েছিল বিক্রম, কিন্তু গাড়ি থামাতে হল। সিক্স মাইলের ছেলেগুলো ভোরবেলা রাস্তায় জড়ো হয়েছিল, তারা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে বিক্রমের গাড়িখানাকে রুখে দিল।

বিক্রম গাড়ি থেকে মুখ বের করে হেসে বলল, কি হল, গাড়ি থামিয়ে দিলে যে?

পাণ্ডমান এগিয়ে এসে একটুখানি চাপা গলায় বলল, কোথায় ডুব মেরে ছিলে বল তো এতদিন? পাশে ভাবীজি বুঝি?

বিক্রম হেসে মাথা নাড়ল।

অমনি আর যায় কোথা, পাণ্ডমান হিপ হিপ হুররে, ভাবীজি জিন্দাবাদ—আওয়াজ তুললে। সঙ্গে সঙ্গে কোরাস শুরু হয়ে গেল। নেমে এসো দাদা, পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমরা ভাবীজিকে নিয়ে ফূর্তি করব।

কে শোনে কার কথা। বিক্রম হাত নেড়ে যত বোঝাবার চেষ্টা করছে ছেলেরা সমস্বরে তার সব কথা ডুবিয়ে দিচ্ছে। অগত্যা নামতে হল।

কৌতূহলী মেয়েরা ততক্ষণে নেমে এসেছে পথে। তারা সীমার হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল। কেউ কেউ মন্তব্য করল, দাদাজির চয়েসের তারিফ করতে হয়। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে কাজটা সেরে ফেলা কি ভাল হল?

ততক্ষণে ভ্যালি-ভিউ হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে রীখিমায়ার বাবা। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, বউ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলে যে সব, এসো আমার হোটেলে।

সবাই তখন হৈ হৈ করতে করতে ওদের নিয়ে ওঠাল ভ্যালি-ভিউ হোটেলে। সারাদিন আর রাত চলল নাচ-গান-হল্লা। সীমা যোগ দিল ওদের হাসি গানে। ওর কেবল মনে হতে লাগল, পুরনো জীবনটা অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল আজ এই তাগদায়।

অনেক রাতে সবাই যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল তখন বিক্রম গিয়ে বসল রীখিমায়ার বাবার পাশে। বলল, মেয়ের কিছু খবর পেয়েছেন?

রীখির বাবা বীরবাহাদুর বলল, চিঠি মিলেছে বাবুজি, আমি বেটিকে এক রোজ দেখতে যাব। চাইকি এখানে নিয়ে আসব।

কাঞ্চীকে দেখলাম না তো বীরবাহাদুরজি?

বীরবাহাদুর হেসে বলল, চিড়িয়া ভেগে গেছে বাবুসাহেব। কিছু রূপেয়া লিয়ে ভেগেছে। ও চলে গেছে তো সিক্স মাইলের সবাই খুশি আছে।

বিক্রম বলল, রীখি কেমন আছে?

বীরবাহাদুর বলল, বাপ কা বেটি। একঠো হোটেল খুলেছে বাবুজি। ইস্টিশানের পাশ বরাবর। বহুৎ জমজমাট কারবার।

বিক্রম বলল, খুব খুশি হলাম শুনে। রীখিকে আমি বড় ভালবাসতাম।

বীরবাহাদুর বলল, জামাইভি চিঠি লিখেছে বাবুজী। একটা বহুৎ খুশির খবর ভি দিয়েছে। লিখেছে কি রীখির বাচ্চা হবে বাবুসাহেব।

বিক্রম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলল, সারাদিন সিক্স মাইলে রইলাম, এর চেয়ে বড় খবর আমি আর পাইনি বীরবাহাদুরজি।

বিক্রম হঠাৎ উঠে গিয়ে একশো টাকার দু'খানা নোট নিয়ে এল সীমার কাছ থেকে চেয়ে। বীরবাহাদুরের হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল, এর একখানাতে সিক্স মাইলের ছেলেমেয়েদের একদিন কিছু খাইয়ে দেবেন। ওদের হাতে দিতে গেলে ওরা নেবে না। তাই ভারটা আপনাকে দিলাম। আর বাকি নোটটা রইল রীখির বাচ্চার জন্যে। বলবেন, তার দাদাজি তার বাচ্চাকে আশীর্বাদ জানিয়েছে।

ভোর না হতেই আবার যাত্রা। তিস্তার পথ ধরে গান গাইতে গাইতে মনের খুশি ছড়াতে ছড়াতে ওরা চলল। পথের খাড়া বাঁকগুলো দারুণ গতি নিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় সীমা ওর কাঁধটা চেপে ধরছিল। ওর ভয় করছিল। আর ওকে ভয় দেখিয়ে আনন্দ পাচ্ছিল বিক্রম। না হয় গেলাম পড়ে ঐ গভীর খাদে গাড়ি শুদ্ধ, তাতে ভয় কি?—বিক্রম গাড়ি থামিয়ে বলল।

সীমা ওর মুখে ডান হাতের পাতটা চেপে রেখে বলল, ফের যদি ও-কথা মুখে এনেছ, আমি হেঁটেই ফিরে যাব তাগদায়।

বিক্রম ওর হাতের ভেতর থেকে মুকখনা সরিয়ে নিয়ে বলল, মরতে এত ভয় সীমা! তুমি সঙ্গে থাকলে আমার মরতে একটুও ভয় করবে না।

সীমা বলল, তুমি কেন বুঝছ না যে আমরা আর দুজন নই। তোমার হাত ধরে আমিও মরতে পারি কিন্তু আমরা কি বাচ্চাটাকে মারতে পারি বিক্রম?

গাড়ি থামিয়ে বিক্রম বুকের ঠিক মধ্যিখানে চেপে ধরল সীমার মুখখানা।

একটা গাড়ি উল্টো দিক থেকে উঠে আসছে। গাড়িটা চোখের সীমানায় এসে না পড়লেও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সীমা নিজেকে বিক্রমের বুকের ভেতর থেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, চল—

ওদের গাড়িখানা আবার ছুটে চলল তিস্তার পথে।

সীমা বলল, এমন হঠাৎ করে চলে এলাম, কি যে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কোনকালে যেন আমাদের আর কোন জীবন ছিল না। এই সবে আমরা দুটিতে আমাদের পথচলা শুরু করলাম।

বিক্রম আর কোন কথা না বলে সীমাকে বাঁ হাতে নিজের কাছে টেনে আনল। ডান হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে একটা বাঁক পার হল। আবার গাড়ি থামিয়ে সীমাকে মিষ্টি একটুখানি আদর করে বলল, এটা আমার সুদ। আসলের চেয়ে মিষ্টি কম নয়।

সীমা অধীর হয়ে বলল, দেখ, গাড়ি চালাতে চালাতে তুমি যদি এমন কর তাহলে আমাকে পিছনে গিয়ে বসতে হবে। এমন খাদের রাস্তায় একটুখানি এদিক ওদিক হলেই আর দেখতে হবে না।

বিক্রম কোন কথা না বলে সীমাকে ছেড়ে দিয়ে একমনে গাড়ি চালাতে লাগল। প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট শুধু গাড়ির গর্জন। মাঝে মাঝে এক একখানা উল্টোমুখো গাড়ি সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিক্রমের গাড়ির পাশ দিয়ে।

সীমা আড়চোখে তাকাচ্ছিল বিক্রমের দিকে। বিক্রমকে সে কতখানি রাগিয়ে দিয়েছে তাই লক্ষ্য করছিল কৌতুকের সঙ্গে।

এক সময় সীমা বলল, কি, একেবারে কথা নেই মুখে। আমি কি গাড়ি চড়িনি কখনো যে গাড়ির গর্জন শুনতে তোমার ল্যান্ডরোভারে উঠলাম!

গাড়ি থেমে গেল।

বিক্রম বলল, কথা বললে বিপদ, আদর করলে অসন্তোষ, আবার একমনে গাড়ি চালালেও কথা শুনতে হয়, তাহলে এবার বল আমি যাই কোথা?

সীমা ওর বুকের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে বলল, তুমি যা ইচ্ছে তাই কর, যা খুশি তাই বল, আমি কিচ্ছু বলব না তোমাকে। শুধু দয়া করে অমন সুন্দর মুখখানাকে গোমড়া করে বসে থেকো না।

বিক্রম সীমার চুলে ভরা মাথায় থুতনী ঠেকিয়ে আদর করল। তারপর বলল, চল, আর খানিক দূরে রাস্তার পাশেই একটা শালের বন পড়বে। তার ভেতরটা বড় পরিস্কার। পাতা কুড়ুনিরা বড় বড় পাতাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়। তাই সারাক্ষণ জায়গাটা ঝকঝকে তকতকে হয়ে থাকে।

সীমা বলল, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার আসল মতলবটা কি বল তো? ওর ভেতর। রোদ্দুর আর ছায়ার আলপনা তোমার মুখে কেমন মানায় তাই দেখব চেয়ে চেয়ে। যদি কথা বলতে না দাও

চুপ করে থাকব, কেবল চেয়ে থাকতে দিও তোমার মুখের দিকে।

ওরা এক সময় এসে পৌঁছল শালবনে। গাড়ি রাস্তার ধারে রেখে ঢুকল শাল বনের ভেতর। সকালের খাবার বের করে খেতে লাগল দুজনে।

সীমা বিক্রমের দিকে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে তাকাল। বুকের ভেতর সীমার মুখখানাকে চেপে ধরে বিক্রম আদরে সোহাগে ভরে দিতে লাগল।

কখন দূর থেকে পাতা-কুড়ুনিরা বিক্রমের গাড়িখানাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসেছে পায়ে পায়ে, শালের বনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের পিছনে, তা জানতে পারেনি ওরা। এক সময় উঠে বসতে গিয়ে সীমা কুড়ুনিদের দেহের কিছু অংশ গাছের ফাঁকে দেখতে পেল।

বিক্রমের দস্যুতা ওরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছে। দারুণ একটা লজ্জায় সীমা আর ওদের দিকে তাকাতে পারছিল না। সে বিক্রমকে শুধু পিছনের দিকে ইঙ্গিত করে দেখতে বলল।

বিক্রম পিছন ফিরতেই ওরা পায়ে পায়ে সেখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করেও পারল না। বিক্রম উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

আরে চলে যাচ্ছ কেন, এস তোমরা, তোমাদের দেখাব বলে বউ নিয়ে বসে আছি কতক্ষণ।

মেয়েগুলি ফিরল। ওরা গোল হয়ে বসল সীমাকে ঘিরে। কত গরীব, তবু কত ভদ্র। ওরা সীমাকে নিয়ে গেল শালবনের নীচে ওদের জীর্ণ ঝোপড়িতে। পুরুষগুলো ভোর না হতেই কনট্রাক্টরের পাথর সরানোর কাজে বেরিয়ে যায়। কেউ বা দূর দূর বনে লকড়ির সন্ধানে বেরোয়। ফেরে সেই সন্ধ্যায়। তখন দেহে আর তাদের কোন জোর থাকে না। ওরা সুযোগ পেলে তিনভাগ মজুরি খসিয়ে দারু পিয়ে আসে। দুঃখের শেষ নেই ওদের।

সীমা একসময় গাড়ির কাছে ফিরে এসে ওর কয়েকটা পোশাক আর কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে ওদের দিয়ে এল। মেয়েগুলো সীমাকে গাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে গেল। কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তাদের চোখে-মুখে।

গাড়ি চলল তিস্তা ব্রীজের দিকে।

বিক্রম বলল, যে হারে দান চলেছে, এরপর ফিরতে পারবে তো? না পেট্রোলের পয়সার অভাবে পথেই গাড়ি ফেলে পালাতে হবে?

সীমা বলল, তুমিও তো বাপু আমার চেয়ে কম দাতা নও। রীখির ছেলের জন্যে দান করে এলে একশোটি টাকা। আমার ছেলের কথা ভেবে না হয় আমি দান করলাম ক'টা টাকা এই গরীবদের।

বিক্রম গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বেশ করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। দেখ, আমাদের অভাব কোনদিনই হবে না।

তিস্তা বয়ে চলেছে, ওরা এসে পড়ল ব্রীজের কাছে। সারি সারি খাবারের দোকান। বেশ ক'খানা গাড়ি জড়ো হয়েছে পারাপারের জন্যে। ওরা দোকানে বসে চা খেল।

বিক্রম বলল, তুমি একটু বস সীমা, আমি গাড়িখানা চা করে এক্ষুনি আসছি।

বিক্রম চলে গেল।

দোকানটা বেশ বড়। দু'সারি বেঞ্চ সামনে পাতা। পিছনে তিস্তার দিকে একখানা বেঞ্চ আবছা আলোছায়ায় পড়ে আছে। ওদিকে গিয়ে বসল সীমা। পিছনের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল ভয়ঙ্করী তিস্তার জলপ্রবাহ। হঠাৎ যেন কার হাতের ছোঁয়ায় চমকে পিছন ফিরে চাইল সীমা।—কে!

লছমী, তুই এখানে?

লছমী বলল, আমিও তো তোকে সেই প্রশ্ন করতে যাচ্ছি।

সীমা আমতা আমতা করে বলল, আমার বরের সঙ্গে গ্যাংটক যাচ্ছি, ও গাড়িটা ঠিক আছে কিনা দেখতে গেছে। এখুনি এসে পড়লেই আমরা চলে যাব।

লছমী বলল, তাই আর কি। এই যে পাশাপাশি দুটো ঘর দেখছিস, ওটা ভাড়া নিয়ে আছি। আমার বর গেছে সিকিমের জঙ্গলে অর্কিড সংগ্রহ করতে। বেশ ক'দিন পাত্তাই মিলবে না—তোরা এসে পড়েছিস ভালই হল। সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না কিন্তু।

চিরদিনই লছমী চঞ্চল। প্রাণের জোয়ারে ভরপুর। হঠাৎ ও বলে উঠল, ঐ বুঝি তোর মানুষটি আসছে সীমা। খুব হ্যান্ডসাম তো।

বিক্রম এসে দোকানে ঢুকল। সীমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

লছমী বলল, আমরা তাগদা ইস্কুলের বন্ধু। এখানেই বাসা। বলুন তো, এতদিন পরে বন্ধুকে কাছে পেয়ে কেউ কি কখনো ছেড়ে দেয়?

বিক্রম হাসতে লাগল।

সীমা বলল, তুমি হাসছ কি গো! যেতে হবে না আমাদের গ্যাংটক?

বিক্রম বলল, আমাকে আর টেনো না এর ভেতর, দু' বন্ধুতে ফয়সালা করে নাও।

লছমী বলল, কে শুনছে ওর কথা। আপনি চলুন, গাড়ি থেকে দরকারি জিনিসগুলো ভেতরে নিয়ে আসি।

কিছুতেই কারো বারণ শুনল না লছমী। সে সীমাদের স্যুটকেশ আর ব্যাগ নিজের হাতে টেনে এনে তুলল তার ঘরে।

বিক্রমের ব্যাপারটা ভালই লাগছিল। পথে বেরিয়েছে তারা। কাজের তাড়া নেই। হুড়োহুড়ির দরকার কি। পথে বেরিয়ে যদি পথের ধারের চটিতে দু-একটা দিন না কাটাল তাহলে আনন্দ কিসের।

সীমা কিন্তু ব্যাপারটা আদপেই সহজভাবে নিতে পারছিল না। তার মুখে ছিল একটা বিষণ্ণ হাসি আর বুকের ভেতর ছিল দারুণ ভীতি।

যদি লছমীর বর হঠাৎ এসে পড়ে! কি করবে সে মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে! লছমীর বরই বা তাকে দেখে চোখে-মুখে কি ছবি ফুটিয়ে তুলবে? এরা দুজনে তাদের দেখে তখন ভাববেই বা কি?

সারাদিন লছমীর ছেলেটাকে এদিক ওদিক নিয়ে সে কাটাল। মাঝে মাঝে লছমীর কাছে বসে গল্প করতে করতে তার কাজে কিছুটা হাত লাগাল। সাহায্য করল। পিছনে শব্দ পেলেই সে চমকে চমকে উঠছিল। লছমীর মানুষটা এসে পড়ল নাকি!

রাত কাটল দু' বান্ধবীতে, বাচ্চা নিয়ে একই ঘরে শুয়ে। পাশের ঘরে বিক্রম। কতক্ষণ গল্প হল। একসময় বাচ্চাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল লছমী। সীমা কিন্তু ঘুমুতে পারল না। যে চিন্তাকে সে মন থেকে প্রতিদিন সরিয়ে দিতে চাইছিল তাই এল ভীড় করে। তার মনের লাগানো দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ঐ বাতিল করা চিন্তাগুলো তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। সীমা অসহায়ের মত শুয়ে শুয়ে তাদের দেখতে লাগল। তারা হাসছে, গান করছে, মদ গিলে মাতলামি করছে। তাকে গান গাইতে বলছে। সশব্দে চুমু খাচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরে। ময়দার তালের মত চটকাচ্ছে তার দেহটা। সারারাত কিছুতেই ঘুমোতে পারল না সীমা।

পরের দিন ভোরে আব সীমাকে কিছুতেই আটকে রাখা গেল না। সে লছমীর সব অনুরোধ অভিমান উপেক্ষা করে উঠে এল গাড়িতে। শুধু লছমীর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে দিয়ে এল।

বিক্রম গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, ভদ্রমহিলা কিন্তু খুব আন্তরিক, তুমি এতটা রূঢ় না হলেও পারতে।

সীমা কোন কথা না বলে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিক্রমের মুখের দিকে।

নদীর তীর ধরে ছুটে চলেছে ওদের গাড়ি। ধবধবে পাউডারের মত সাদা ধুলো উড়ছে। ডানদিকে পাহাড়। আবার কিছুটা এসে সবুজ ক্ষেতি, ঘরবাড়ি। নদীর ওপারে ঘন পাহাড়ি জঙ্গল। কত পথ পেরিয়ে এল ওরা। এখন দুদিকে পাহাড়, মাঝখানে নদীর খাতের মত ভ্যালি। এমন মখমলের মত সবুজ ভ্যালি সহসা চোখে পড়ে না। গ্যাংটক পৌঁছে কিন্তু সীমা হোটেলে থাকতে চাইল না। বাজার ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা নিচে কয়েকটা পাইনগাছের তলায় একটা কাঠের বাড়ি ভাড়া করল ওরা।

বিক্রম বলল, হোটেলের টাকা হিসেব করেই আমি এনেছি সীমা। হোটেলে না থাক, হোটেলে খেয়ে আসতে ক্ষতি কি? রান্না তো সারা জীবন ধরে করতে হবে। দুটো দিন না হয় শুয়ে বসে বিশ্রাম করে কাটালে।

সীমা বলল, আমাকে বাধা দিও না লক্ষ্মীটি। নতুন জায়গায় এসে মনে হচ্ছে, এ আমাদেরই ঘর। এখানে নিজের হাতে তোমাকে রান্না করে খাওয়াতে কত তৃপ্তি। তুমি বাজার করে আনবে, আমি তোমাকে খাওয়াব। বিশ্বাস কর, খুব তাড়াতাড়ি আমার রান্না শেষ হয়ে যাবে, আর তখন দুজনে ঐ পাহাড় আর ভ্যালির দিকে চেয়ে চেয়ে গল্প করব।

বিক্রম বলল, তুমি গান করবে না?

সীমা বলল, যত গান শিখেছি, সব তোমাকে একটি একটি করে শোনাব গো। এখন যাও তো বাজারে—

বিক্রম ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে বলল, এমন নির্দয় বউ জানলে কে বিয়ে করত। ঘর থেকে বের করে দিতে একটুও মায়া হয় না।

সীমা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, হয় না-ই তো।

স্বপ্নের মত ক'টা দিন কেটে গেল ওদের। নির্মেঘ আকাশের তলায় চাঁদের আলো-ঝরা স্বপ্নের রাত পেরিয়ে, বনে বনে ভোরের সোনালী আলো গায়ে মেখে, দুপুরে সবুজ ভ্যালির গালিচার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ওরা কাটাল ওদের ছুটির দিনগুলো। ফিরে আসার আগের রাতে বিক্রমের বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে সীমা বলল, আমার একটুও আর ইচ্ছে করে না তাগদার ঐ বাসাটাতে ফিরে যেতে। তুমি কথা দাও, যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে ওখান থেকে বের কবে আর কোথাও নিয়ে যাবে।

বিক্রম বলল, আমারও কি ইচ্ছে করেনা সীমা ওখান থেকে আমি বেরিয়ে আসি। কিন্তু চা-বাগানের মানুষগুলোর সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আমি কেমন যেন বন্দি হয়ে পড়েছি। শুধু আমার ওপর ভরসা রেখো, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন ওখান থেকে বের করে আনব।

পুরোদমে চায়ের পাতা তোলার কাজ চলেছে। মেয়েদের পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে পড়ছে চা-গাছের কচি সবুজ পাতাগুলো। সর্দারের শ্যেন চোখ ঘুরছে চারদিকে। কচি সবুজ পাতার সঙ্গে বুড়ো কালচে পাতাগুলো যেন ঝটপট মিশিয়ে না ফেলে। চার টাকা রোজে নির্দিষ্ট কয়েক কেজি পাতা তুলে ফেলতে পারলেই এক্সট্রা যা তোলা হবে তাতে মিলবে কমিশন। তাই সর্দার পিছন ফিরলেই মেয়েরা হাতের কাছে যে পাতা মিলছে তাই তুলে ভর্তি করছে ঝুড়ি।

সর্দারটা ভারি বদ। চেকিং-এর সময় কেউ ধরা পড়লে তাকে অন্তত আধঘণ্টা ধরে জ্ঞান দেবে। ডকে উঠল তার চা তোলা। সময় নষ্ট করে লেকচার শোন। আর শুনতে শুনতে কাজ চালিয়ে গেলে তার হয়ে গেল। তখন কিছুই বলবে না কিন্তু ফাইনাল চেকিং-এর সময় এমন কড়াকড়ি করবে যে নাকের জলে চোখের জলে একাকার।

কয়েকখানা ঝুড়ি ভরে যেতেই ট্রলারে তোলা হল। দু-তিনখানা ট্রলার জুড়ে দেওয়া হল ট্র্যাকটারের সঙ্গে। টানতে টানতে নিয়ে চলল কারখানার দিকে। তারপর কাটিং, প্রসেসিং। উইদারিং ট্রেতে বিছিয়ে রাখা। হট এয়ার ব্লো করে তাড়াতাড়ি ড্রাই করার কাজটা সেরে ফেলা।

ফ্যাক্টরিতে কাজ চলছে। কোথাও পাতা শুকোচ্ছে। কোথাও বা প্রসেসিং শেষ হয়েছে, করা হচ্ছে গ্রেডিং-এর কাজ। প্যাকাররা প্যাক করছে পেটিতে। চারদিকে চোখ ম্যানেজার বলেন্দ্র চৌধুরীর। সিলেক্ট কোয়ালিটির চা যাতে বাজারে সেরা বলে প্রমাণিত হয় তার জন্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর পরিচর্যার শেষ নেই। মালিক মিঃ রায়চৌধুরীর এ বিষয়ে কড়া নির্দেশ।

এদিকে প্রোডাকসন বাড়াতে হচ্ছে। কুলি-কামিনদের ইউনিয়ান যে হারে দাবি আদায় করছে তাতে প্রোডাকসন না বাড়িয়ে উপায় আছে? বর্ষার জল না পেলেও শীতের দিনে কাজ চালাবার জন্যে আর্টিফিসিয়াল রেইন-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নভেম্বরের পর গাছের প্রুণিং। ছাঁটাই পর্বের পর ডিসেম্বর থেকে স্পিঙ্কলার দিয়ে সেচের কাজ করা হচ্ছে। প্রোডাকসন চাই, হেভি প্রোডাকসন। ডাইরেক্টর রায়চৌধুরীর খরচে নেই কার্পণ্য।

তবে বলেন্দ্র চৌধুরী একটি কাজ করতে সমর্থ হয়েছে। সেটি অনেক কৌশল, অনেক মেহনত আর বহু অর্থ ব্যয়ের ফল। রিভারভিউ টি-গার্ডেনের ইউনিয়ন বিভক্ত হয়েছে দু'ভাগে। কুলি-কামিনদের শক্তিকে ভাগ করে দিয়ে বলেন্দ্র চৌধুরী কিছুটা নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েছে। এ জন্যে বাইরে থেকে অনেক টাকা খরচ করে আনতে হয়েছে দফায় দফায় পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। এক এক পার্টিকে ডোনেশন দিয়ে নেতা এনে পরীক্ষা করে দেখেছে বলেন্দ্র চৌধুরী তাদের পার্টি গড়ার শক্তি, ইউনিয়নকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। তারপর যাদের ক্ষমতায় তার বিশ্বাস জন্মেছে, নানাভাবে দল গড়ার জন্যে করেছে তাদের সাহায্য। তারা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের হয়ে কাজ করে, কি মালিক পক্ষের হয়ে সেটা বড় কথা নয়। বলেন্দ্র চৌধুরী চায় দু'পক্ষের শত্রুতা আর চিরস্থায়ী একটা বিবাদ। তার ভেতর দিয়ে কাজ হাসিল করে নেবার কৌশল সে জানে।

একটি বছর টি-গার্ডেনে আসতে না আসতেই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে বিক্রম। তার মেলামেশা হাসিঠাট্টার ভেতর যে আন্তরিকতাটুকু থাকে তা বুঝে নিতে কারো বেশি সময় লাগে না। রাত আটটার পর তাকে যে দলই পাকড়াও করুক, তাদের সঙ্গে গিয়ে সে ফুর্তিতে মাতে। মদ খায়, গান গায়, হুল্লোড় করে। ছুটির দিনে ইউনিয়নের যে কোন একটা দলের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে পিকনিকে। সে দলের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নিজের ল্যান্ডরোভারখানা নিয়ে চলে যায় অন্য দলের মজলিশে। তাই সে সবার প্রিয়, সবার আপনজন। বিক্রম চা বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখে কোন মেয়ে মা হতে চলেছে, আর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে, তখন সর্দারকে বলে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়। আর ঠিক সে সময়টিতে তার মনে পড়ে যায় সীমার মুখখানা। আবার কোনদিন গার্ডেনের ভেতর পিঠে বাচ্চা বেঁধে নিয়ে কোন মেয়েকে কাজ করতে দেখলে সে মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাটাকে চেয়ে নেয়। আদরে সোহাগে ভরে দেয় তাকে। ওর কাণ্ড দেখে অন্য সব মেয়েরা হাসে।

দালালরা কানে লাগায় বলেন্দ্র চৌধুরীর। বলে, বিক্রম মালিকের স্বার্থ দেখছে না, ইউনিয়নের সঙ্গে, কুলিকামিনদের সঙ্গে তার মেলামেশা, ভাবসাব।

বলেন্দ্র চৌধুরী মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা সে দেখা যাবে।

দালালরা চলে গেলে হাসে চৌধুরী। ভাবে, ঐ হীরেই আমার দরকার। ঐ দিয়ে কাঁচ কাটতে হবে। মারামারি হামলাবাজিতে কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবারই সম্ভাবনা। ওতে লোকসান ছাড়া লাভ নেই। এখন এই মানুষই পারবে না ভেঙে ভাগ করতে। সম্প্রতি দেখছে বলেন্দ্র চৌধুরী, ইউনিয়ন ভাগ

করে দিয়েও সুবিধে হচ্ছে না বিশেষ। এখন কর্মীরা সজাগ হয়ে উঠেছে। যে দল যত বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে সে দলের সভ্য সংখ্যাই হয়ে যাচ্ছে তত বেশি। এদিকে দুটো ইউনিয়নকে পোষা মানেই হাতি পোষা। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাচ্ছে। এ অবস্থায় যদি বিক্রম হয় আঁধারে আলো, তাহলে মন্দ কি। যাক না সে ওদের সঙ্গে মিলেমিশে। ওকে দিয়েই হয়তো একদিন ফয়দা ওঠানো যাবে। বাইরের পার্টিবাজ ছারপোকাগুলো এখানে এসে পার্টির নামে শুষে নিচ্ছে সবকিছু। ওদের হটিয়ে লোকাল কর্মীদের দুটো ইউনিয়নের নেতা বানাতে পারলে টাকার বাইরের টানটাকে বন্ধ করা যাবে।

একদিন বলেন্দ্র চৌধুরী গাড়ি নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। গাড়ি ড্রাইভ করছে বিক্রম। ওরা প্রায় তিস্তার কাছাকাছি নেমে এল। এক জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে সিমেন্টের বাঁধানো বেদীতে বসল বলেন্দ্র চৌধুরী। কানুন না হলেও ডাকল বিক্রমকে ঐ বাঁধানো বেদীর একদিকে বসতে। বিক্রম দালালি বা মোসাহেবি করে না, তাই কোন সঙ্কোচ বা সঙ্কোচের ভান ছিল না তার। সে সোজাসুজি বেদীতে এসে বসল।

তিস্তার শোভা ও স্রোত সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার পর বলেন্দ্র চৌধুরী বলল, আইম দেখে খুব খুশি হয়েছি যে ইউনিয়নের কর্মীরা তোমাকে ভালবাসে।

বিক্রম বলল, ওসব ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন আমার মগজে আসে না। আমি ওদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি, তাই হয়তো ওরাও আমাকে ভালবাসে।

বলেন্দ্র চৌধুরী বলল, মানুষের ভালবাসা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার, ওটা সবার কপালে জোটে না। তুমি সেদিক থেকে বলব, খুবই লাকি।

বিক্রম এর কি জবাব দেবে, তাই সে চুপ করে রইল।

আবার শুরু করল বলেন্দ্র চৌধুরী, জানো বিক্রম, আমার খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি বাইরের পার্টিলিডাররা এসে ওদের নাচাচ্ছে। বলতে পারো মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। ভাবো দেখি এই গরিব মানুষগুলোকে কত রকমের পার্টির চাঁদা দিতে হচ্ছে। সেগুলো ওদের বেনিফিটে লাগছে না ছাই। ওরা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পার্টির কেন্দ্রীয় তহবিলে।

বিব্রত বিক্রম বলল, বিশ্বাস করুন এসব আমার মাথায় একদম ঢোকে না। তবে আপনি যে কথা বলছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে খুবই অন্যায়। আর তাছাড়া আমি ভেবেই পাই না একই টি-গার্ডেনে দু-দুটো ইউনিয়ন থাকবে কেন? একই জায়গায় কাজ করছি আর মিলেমিশে থাকতে পারব না?

বলেন্দ্র চৌধুরী বলল, একটা প্রতিযোগিতা না থাকলে কাজ এগোয় না বিক্রম। থাক দুটো ইউনিয়ন, মারামারি করুক, প্রতিযোগিতা গড়ে তুলুক, কিন্তু বাইরের কাউকে নাক গলাতে দেওয়া নয়। নিজেদের কষ্টের ধনে কাউকে ভাগ বসাতে দেওয়া নয়।

বিক্রম বলল, এসব মনে হচ্ছে মন্দ ব্যাপার। আমি একদিন ওদের সব বুঝিয়ে বলব।

বলেন্দ্র চৌধুরী বললেন, আমি তাই চাইছি বিক্রম। আমার প্রতিটি কথায় ওরা সন্দেহের গন্ধ পাবে, কিন্তু তোমাকে ভালবাসে বলে তোমার কথাকে ওরা উড়িয়ে দিতে পারবে না।

বিক্রম বলল, আমার যা ঠিক বলে মনে হবে আমি তা বলতে কোনদিন পেছপা হব না, তাতে যে যা মনে করে করুক।

বিক্রমের শেষের কথাটা ঠিক সুরে বাজল না বলেন্দ্র চৌধুরীর কানে। তার মনে হল, বিক্রম একটা নির্বোধ গোঁয়ার। কোন বিষয়েই ওর ওপর বিশেষ ভরসা করা যাবে না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারা যায় মাত্র। বলেন্দ্র চৌধুরী উরে গাড়িতে গিয়ে বসল। বিক্রম ফিরে চলল টি-গার্ডেনের পথে।

লেবার অফিসার হেরম্ব সিংহ আসছেন। একটি বিশেষ পার্টির লিডাররা কয়েকটা লিখিত অভিযোগ ওপরে পাঠিয়েছে। তাই তাঁর এনকোয়ারিতে আসা। ট্রাঙ্ক যোগাযোগ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে বলেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে।

বলেন্দ্র চৌধুরী বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে ফাইলপত্র সাজাচ্ছে। প্রতিপক্ষের অভিযোগের সমুচিত জবাব দিতে হবে, তারই প্রস্তুতি।

ইতিমধ্যে কম দামের র‍্যাশন শপ থেকে কর্মীদের যে মাল সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা আছে সেখানে পার্টির লোক নাকি কম ওজনের বাটখারা পেয়েছে। বলেন্দ্র চৌধুরীর অনুগ্রহ-পুষ্ট কোন এক ব্যক্তি নাকি ঐ র‍্যাশন বণ্টনের চার্জে রয়েছে।

বলেন্দ্র চৌধুরী দাঁতে দাঁত ঘষল। রাগে গর গর করে বলতে লাগল শালা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

এদিকে অফিসারটি আসার আগেই বলেন্দ্র চৌধুরী তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে। নতুন অফিসার, তাই মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হয়নি। তাহলেও বহু অভিজ্ঞ বলেন্দ্র চৌধুরীর হিপোদের হাঁ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

অফিসার তাঁর অফিসের গাড়িতেই আসবেন কিন্তু তাঁকে রিসিভ করে আনার জন্যে পাঠানো হল টি-এস্টেটের ঝকঝকে গাড়ি। ড্রাইভার বিক্রম রায়। এদিকে স্থির হয়েছে বলেন্দ্রের পোষ্য গুণ্ডা নিশানাথ যাবে অফিসারের মনোরঞ্জনের জন্য কোন বিলাসিনীকে আনতে।

পথে ল্যান্ড-স্লাইডের জন্যে অফিসারের গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছিল। নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিল বিক্রম। গাড়ি এলে বলেন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশ মত টি-এস্টেটের গাড়িতে তুলে আনবে মাননীয় অতিথিকে।

বিক্রম পাহাড়ের গায়ে গাড়িখানা রেখে তাকিয়ে ছিল ভ্যালির দিকে। কত অজস্র কণিফার এদিকে ওদিকে সারি দিয়ে বৃক্ষ-সংসার রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বড় অসংখ্য গাছ আন্দোলিত হচ্ছে।

আজ মনের ভেতর একটা কষ্ট বুক ঠেলে উঠে আসছিল তার। সে এই পাহাড়, বন সবার সঙ্গে শিশুকাল থেকে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। তার মায়ের হাত ধরে সে ঘুরে বেড়িয়েছে বনে বনে। কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে তার মা পিঠে বোঝা বেঁধে বিক্রির জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। সে ঘুরেছে মায়ের পিছনে পিছনে। ছেলেবেলার সে সব দিন কি ভোলা যায়। বনের ভেতর কাঠ কুড়োচ্ছে তার মা, আর সে পাথরের গায়ে কাঁপা কাঁপা রোদ্দুরটুকু ধরার জন্যে চুপি চুপি পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। রোদ্দুর সরে গেলেই সে অবাক চোখে পলাতককে খুঁজছে।

বিক্রম ভাবতে লাগল, তার যদি ছেলে হয় তাহলে সেও এমনি অরণ্য ঘেরা পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। পৃথিবীতে অনেক বড় হবার দরকার নেই তার। এই পথের সঙ্গে, গাছেদের সঙ্গে আত্মীয়তা করলে সে অনেক বেশি সুখী হবে। আর যদি তার মেয়ে হয়, সে তার মায়ের হাত ধরে ঘুরবে বনে বনে। শীতের দিনের জন্যে বন থেকে কুড়িয়ে আনবে ডাল-পাতা। বড় হয়ে বুনো পাহাড়ী ফুল মাথায় গুঁজবে সে, ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে গান গাইবে। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে সীমার জন্যে তার মনটা কেমন করে উঠল।

বনে পাহাড়ে ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যা। রাতের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ল পথের ওপর। বিক্রম এখন শুনতে পাচ্ছে অসংখ্য কীটপতঙ্গের ঐকতান সঙ্গীত। দূর পথের ধারে জঙ্গলের ভেতর আলো জ্বলছে। ধিকি ধিকি জ্বলছে আলোটা। বিক্রম জানে ওটা কিসের আলো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে গাছ কাটার পর টুকরো কাঠগুলো সংগ্রহ করে পথের ধারে বিরাট চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে। চুল্লির

ওপরে মাটির প্রলেপ দেওয়া ঢিবি। পাশ দিয়ে হাওয়ার আসা-যাওয়ার ছিদ্রপদ। ওখানে কাঠকয়লা তৈরি হচ্ছে।

বেশ খানিক রাত হয়ে গেছে, এদিকে অফিসারটির দেখা নেই। ওদিক থেকে কোন গাড়ি আসছে না, তার মানে এখনও পথের ওপর খসে পড়া পাথর মাটির চাঁই সরানো হয়নি। একটা মোটর-সাইকেল কোন রকমে বেরিয়ে এসেছিল। এ পথ দিয়ে চলে যাবার সময় তার আরোহীদের মুখেই খবরটা পেয়েছে বিক্রম। রাত প্রায় আটটা নাগাদ একটা গাড়ির হর্ন শোনা গেল। পাহাড়ি পথের বাঁকে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

গাড়িখানা বিক্রমের গাড়ির সামনে এসে থেমে গেল। বিক্রম পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। বিক্রম নিজের পরিচয় দিয়ে টি-গার্ডেনের গাড়িতে তুলল অফিসারটিকে। সরকারী জিপখানা ওর গাড়ির পিছন পিছন আসতে লাগল।

তখন রাত্তির প্রায় ন'টার কাছাকাছি। গাড়ি নামছে সাবধানে উৎরাই-এর সঙ্কীর্ণ পথে। টি-গার্ডেনের এলাকা শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ এক চিৎকারে ব্রেক কষে গাড়ি থামাল বিক্রম। পিছনের গাড়িটাও থেমে গেছল। গাড়িটাকে সাবধানে সাইড করে রেখে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল বিক্রম। মুহূর্তে অন্ধকারে সে হারিয়ে গেল।

একটা মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার উঠেছিল। একবার মাত্র, তারপর সব চুপ। অন্ধকার রাতের বুকে এক ঝলক কান্না ছুড়ে দিয়ে কে যেন হঠাৎ থেমে গেল। শব্দটা পৌঁছে গেছে কুলি-কামিনদের বস্তি অব্দি। একটা কোলাহল উঠেছে ওদিকে। কয়েকটা টর্চের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে কতকগুলো মশাল জ্বলে উঠল। ওরা এগিয়ে আসছে গার্ডেনের পথে চড়াই ভেঙে। কোলাহল ক্রমশ বেড়ে উঠছে।

বিক্রম ধরেছে দুটো শয়তানের ঘাড়। ওরা বিক্রমের গলার শব্দ পেয়ে ভেবেছিল ওদের আপনার লোক আসছে। তাই ওরা কাছে এসে চুপি চুপি বলেছিল, মালটা আনতে বহুৎ মেহনত হয়েছে। এক ঘুষিতে ওর চেল্লাচিল্লি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন একে ঝটপট তোমার গাড়িতে তুলে পাচার কর সর্দার। তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আমাদের গাড়ি চেক করবে।

বিক্রমের ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে উঠল। সে মোক্ষম দুটো ঘুষি চালিয়ে বলেন্দ্র চৌধুরীর পোষ্য গুণ্ডা দুটিকে ঘায়েল করে ফেলল। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গেল গাড়ির ধারে। ততক্ষণে নিচের মানুষগুলো উঠে এসেছে ওপরে। বিক্রম ওদের হাতে বলেন্দ্র চৌধুরীর সাকরেদ দুটোকে সঁপে দিয়ে ছুটল অন্ধকারে সেই ভাঙাচোরা রাস্তার পাশে। একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারটাকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। বিক্রম কঠিন গলায় বলল, নেমে যাও ওখানে। গাড়িতে অফিসার বসে আছে, নিয়ে যাও বাংলোতে।

লোকটা সেই ভাঙা রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে দৌড়ল।

বিক্রম গাড়ির পাশে পড়ে থাকা মেয়েটিকে তুলল কোলপাঁজা করে। এ যে লছমী! লছমীকে শয়তানের বাচ্চারা ধরে এনেছে! আহত লছমীর গোঙানি উঠছিল। বিক্রম সেই আবছায়ায় লছমীকে গাড়ির পিছনের সিটে শুইয়ে ভাঙা রাস্তা ধরেই ফিরে গেল তাগদা বাজারের দিকে।

সীমার কাছে যখন লছমীকে রেখে সব কাহিনী বলে সে আবার ফিরে এল গার্ডেনে তখন রাত্তির এগারোটাব ঘর ছুঁই ছুঁই। গেস্ট হাউসের সামনের উঠোন লোকে লোকারণ্য। লেবার অফিসার নিচু হয়ে রিপোর্ট লিখছেন, বলেন্দ্র চৌধুরী গালে হাত ঠেকিয়ে বসে আছে তাঁর পাশে।

বিক্রমকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল সকলে। সামনের একটা গাছের ওপর চোখ পড়তেই বিক্রম দেখল, গুণ্ডা নিশাপতি আর তার সাকরেদকে গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে।

বিক্রমের গলা বাজের মত ভেঙে পড়ল, অফিসার সাহেব, আপনার ভোগের জন্যে একটা কচি নিরীহ মেয়েকে নিয়ে আসা হচ্ছিল।

চিৎকার করে উঠল কুলি-কামিনের দল, কে, কে সে?

লছমী—বিক্রমের গলার আওয়াজ বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়ল।

লছমী, লছমী!—সমবেত কণ্ঠের সে আওয়াজ দূরে কাছের পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে হাহাকারের মত শোনাতে লাগল।

লেবার অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আপনাদের এখানে আজ নতুন এসেছি। দয়া করে আপনারা আমার সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা নেবেন না। আমি আপনাদের বন্ধু হয়ে এসেছি, আপনাদের শত্রুতা করার জন্যে সরকার আমাকে পাঠাননি। আপনারা দয়া করে আমাকে সবকিছু দেখেশুনে বুঝে নিতে দিন। নারীঘটিত ব্যাপারটি আমার সম্পূর্ণ অজানা। আমার যতদূর অনুমান, যে দুটি লোককে আপনারা বেঁধে রেখেছেন, তারা মেয়েটিকে কোন কৌশলী লোকের প্ররোচনায় এখানে বলপ্রয়োগ করে আনার চেষ্টা করেছিল। ভগবানের অশেষ করুণা, আপনারা মেয়েটিকে যথাসময়ে ফিরে পেয়েছেন। আমি আজ ফিরে গিয়েই পুলিশের হায়ার অফিসারের কাছে খবরটা দেব। এ ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে, পুলিশের আওতায়।

এই ঘটনাটুকুকে কেন্দ্র করে লড়াই বাধল রিভারভিউ টি-গার্ডেনের মালিকের সঙ্গে মজদুরদের। পাশাপাশি টি-গার্ডেনের ইউনিয়নগুলো প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। দিনের পর দিন যে ঘৃণার কাজ মালিকপক্ষ করে এসেছে তার মূলোচ্ছেদ চাই, নয়তো অচল হয়ে পড়বে রিভারভিউ টি-গার্ডেনের ফ্যাক্টরী।

কেস উঠল কোর্টে। টি-গার্ডেনের খোদ মালিককে একদিন দাঁড়াতে হল কাঠগড়ায়। মিলিওনেয়ার বৃদ্ধ অনন্তবিক্রম রায়চৌধুরী সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্বীকার করলেন তাঁর অপরাধ। জয় হল মজদুর ইউনিয়ানের। জয় হল দুটি বিভক্ত ইউনিয়ানের নেতা বিক্রম রায়ের।

প্রবল জয়ধ্বনির ভেতর ফিরে যাচ্ছিল বিক্রম রায়, কে যেন ডাক দিল পিছন থেকে। বিক্রম ফিরে দেখল ডাইরেক্টার বাহাদুর স্বয়ং এগিয়ে আসছেন।

বৃদ্ধ কাছে এসে বিক্রমের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমাকে ফেলে রেখে যাবে ভাই, তোমাদের সঙ্গী করে নেবে না?

বিক্রম বলল, নিশ্চয়, আজ আপনিও যে আমাদের জয়ের অংশীদার। চা বাগানের সমবেত কর্মীরা ডাইরেক্টারের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

অনন্তবিক্রম বললেন, এ আমার জয় নয়, এ জয় নতুন দিনের নতুন মানুষদের। তোমরা তোমাদের নেতা বিক্রমের জয়ধ্বনি দাও। তোমাদের সকলের অক্লান্ত চেষ্টায় তার পরিশ্রম জয়যুক্ত হয়েছে। একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, আজ তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, তোমাদের প্রিয় মানুষটিকে আমার সঙ্গে টি-গার্ডেনে নিয়ে যাব। আগামী কাল তোমাদের সবাইকে নিয়ে তিস্তার তীরে আয়োজন করা হবে এক পিকনিকের। সেখানে আমি আমার মনের একটি কথা তোমাদের কাছে ঘোষণা করতে চাই।

সবাই করতালি দিয়ে ডাইরেক্টার বাহাদুরের কথাকে অভিনন্দিত করল।

মজদুরদের বিদায় দিয়ে গাড়িতে উঠলেন ডাইরেক্টার বাহাদুর। বিক্রম ড্রাইভ করে নিয়ে যাবার জন্যে ড্রাইভারের সীটের দিকে যাচ্ছিল, অনন্তবিক্রম তাকে ডেকে বললেন, তুমি আমার পাশে বস

বিক্রম। সঙ্গে সঙ্গে বলেন্দ্র চৌধুরীর দিকে চেয়ে বললেন, বড় স্মুদ গাড়ি চালাও তুমি। বুড়ো মানুষ, জোয়ান ছেলেদের স্পিড আমার সইবে না।

ইঙ্গিতটা বুঝল বলেন্দ্র চৌধুরী। কি গ্রহের ফের! কোর্টে পরাজয়। সবার কাছে হেনস্তা। তার ওপর ড্রাইভার সাজতে হবে তাকে! বলার কিছু নেই। চাকরি হল প্রাণের চেয়ে বড়। চাকরি আছে তাই বলেন্দ্র চৌধুরী বেঁচে আছে। চাকরি গেলে প্রাণ থেকেও নেই।

গাড়ি চলছে। পাশের পাহাড় গাছপালা সরে সরে যাচ্ছে। অনন্তবিক্রম রায়চৌধুরীর স্মৃতির পর্দা থেকে সরে সরে যাচ্ছে বর্তমান দৃশ্যপটগুলো। তিনি ক্রমশই যেন প্রবেশ করছেন অতীত স্মৃতির গভীর অরণ্যে। ***

দাঁড়িয়ে আছেন অনন্তবিক্রম ডাইরেক্টার্স বাংলোর বারান্দায়। আজ থেকে প্রায় তিরিশটি বছর আগে। পুবের আকাশে সূর্যোদয়ের ছবি। আকাশ জুড়ে মেঘের কোলে রঙের উৎসব। সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর একমাত্র পুত্র বীরবিক্রম প্রাতর্ভ্রমণের শেষে ফিরে আসছে বাংলোতে। উন্নত দীপ্ত চেহারা। মা-হারা সন্তান, কিন্তু অবিকল মাতৃমূর্তি।

সেদিন দূর থেকে তরুণ পুত্রকে দেখে তৃপ্ত হচ্ছিলেন অনন্তবিক্রম। একটি ভাস্কর যেমন করে বার বার ফিরে ফিরে দেখে তার সৃষ্টিকে।

কিন্তু মুহূর্তে পট পরিবর্তিত হল। অনন্তবিক্রম যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। চাবুক হাতে নিয়ে নির্মম আঘাতে জর্জরিত করে তুলছেন প্রিয় সন্তান বীর-বিক্রমকে।

বীরবিক্রমের মুখ নত। একটিও কথা উচ্চারিত হচ্ছে না মুখে। ড্রাইভারকে ডাকা হল। সেই অবস্থায় পুত্রকে তুললেন গাড়িতে। পাশে বসলেন নিজে। চলে এলেন মহানগরী কলকাতায়। আর কোনদিন পুত্রকে তিনি সঙ্গে করে আনেননি তাঁর শখের রিভারভিউ টি-গার্ডেনে। তারপর বীরবিক্রমকে উচ্চশিক্ষার জন্যে পাঠালেন লন্ডনে। কাগজে কাগজে ছাপালেন তরুণ পুত্রের উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত গমনের ছবি। পাঁচ বছর পরেও যখন পুত্রের ফিরে আসার লক্ষণ দেখা গেল না তখন তিনি স্বয়ং লন্ডনে ফ্লাই করলেন। পুত্রের ঠিকানায় গিয়ে জানতে পারলেন যে সে বাসা বদল করে চলে গেছে। কতদিন বসে সন্ধান চালালেন, কিন্তু হদিশ মিলল না তার। শেষে ফিরে আসার জন্যে প্লেনে সীট বুক করে ফিরছেন এমন সময় তাকে দেখতে পেলেন ওয়েটিং রুমের বাইরে আকস্মিকভাবে। বীরবিক্রম কোমর জড়িয়ে চলেছে একটি ফ্রেঞ্চ লেডীর। মেয়েটির কোলে একটি বাচ্চা। অনন্তবিক্রম একটি পিলারের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। ভাগ্যিস বীরবিক্রম তাঁকে দেখে ফেলেনি।

ওরা চলে গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে। পরের দিনই প্লেনে করে স্বদেশে ফিরে এলেন তিনি। সেই থেকে অনন্তবিক্রম নিঃসঙ্গ। নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে একটার পর একটা পরিকল্পনা করে গেছেন। ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন কাজের সমুদ্রে। মুঠি ভরে মুক্তো কুড়িয়েছেন কিন্তু দেবার মানুষ না পেয়ে বার বার ফেলেছেন ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মাঝে কিসের যেন অনুশোচনায় তিনি পীড়িত হয়ে পড়েছেন। এই রিভারভিউ টি-গার্ডেনে দাঁড়িয়ে অনেক নির্জন রাত্রে তিনি শুনতে পেয়েছেন একটা হাহাকার। অসহায় কোন মেয়ের কান্না তাঁর কানে এসে বেজেছে। তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়েছে সবই তাঁর ভুল। ও কিছু নয়, পাহাড়ে পাহাড়ে ঝরনার কান্না আর হাওয়ার হাহাকার। ***

ডাইরেক্টার অনন্তবিক্রমের পাশে বসে ভাবছিল বিক্রম তার আগামী দিনগুলোর কথা। আজ মাসখানেক সে দেখতে পায়নি সীমার মুখ। পাশাপাশি টি-গার্ডেনগুলোতে ঘুরে ঘুরে তাকে সমর্থন যোগাড় করতে হয়েছে। নিজেদের ইউনিয়নের বিবাদ মিটিয়ে এক করেছে সে দু'দলকে। লছমীকে

নিয়ে ঘুরেছে এখানে ওখানে। নির্জন বাড়ি থেকে কেমন করে গুণ্ডারা তাকে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে গাড়িতে তুলে এনেছিল আর পথে তাকে সম্পূর্ণ অসহায় ভেবে কি করে তার নারীত্বের অবমাননা করেছিল, সবিস্তারে সে সব কথা শুনিয়েছে লছমী প্রভাবশালী হৃদয়বান মানুষদের কাছে।

কেসের তদ্বির তদারক করতে গিয়ে সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল সীমার কথা। আজ তার কেবলই সীমার মুখখানা মনে পড়তে লাগল। আসন্ন মাতৃত্বের ছায়া পড়েছে সে মুখে। বৃষ্টি ঝরানোর আগে মেঘ যেমন পরিপূর্ণ লাবণ্যে ভরে ওঠে। সীমা কি তার ওপর অভিমান করে আছে? অনেকগুলো দিনের অদর্শনে সে কি বিক্রমকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে?

নিশাপতির মুখখানা হঠাৎ বিক্রমের চোখের ওপর ভেসে উঠল। সারা মুখখানা শয়তানিতে ভরা। সে যেদিন লেবার অফিসারকে আনতে গাড়ি নিয়ে চলে যায় সেদিন ঐ নিশাপতি আর তার সাকরেদ প্রথম গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সীমার কাছে। সীমা ঘরের ভেতর থেকেই ওদের অসুস্থ বলে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শয়তান দুটো শোনেনি সে কথা। জোর করে ঘরে ঢুকে পড়েছিল আর সীমার অবস্থা দেখে কুৎসিরি হাসি হেসেছিল। বলেছিল, দেখ দেখ, সীমা রাই এর শরীরখানায় কেমন তিলোত্তমা তৈরি হচ্ছে।

বিক্রম সব শুনেছে। শুধু মুখ বুজে ছিল সে এতদিন মামলার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে। এবার বলেন্দ্র চৌধুরীর ঘাড়ে ক'টা মাথা সে দেখে নেবে। কেমন করে সে বোম্বেটেগুলোকে বাঁচায় তার বোঝাপড়া হবে এবার। আশ্চর্য, প্রায় দেড়ঘণ্টার পথ ওরা পেরিয়ে এল, কিন্তু কারো মুখ থেকে একটি কথাও উচ্চারিত হল না।

টি-গার্ডেনে ঢুকে ডাইরেক্টার্স বাংলোর সামনে গাড়ি এনে দাঁড় করাল বলেন্দ্র চৌধুরী। গাড়ি থেকে প্রথমেই নামল বিক্রম। নামতে গিয়ে মনে হল পায়ের ছোঁয়া লাগল অনন্তবিক্রমের পায়ে। তাই বৃদ্ধ নেমে আসা-মাত্রেই তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় ছোঁয়াল বিক্রম। বৃদ্ধ আবেগে জড়িয়ে ধরে বিক্রমের মস্তক চুম্বন করলেন। বিক্রমকে তেমনি আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নিয়ে ঢুকলেন বাংলোর ভেতর। বলেন্দ্র চৌধুরী বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ এ দৃশ্য দেখল, তারপর গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে চলে গেল নিজের কোয়ার্টারের দিকে।

বাংলোর ভেতর মুখোমুখি বসে বৃদ্ধ অনন্তবিক্রম রায়চৌধুরী আর তরুণ বিক্রম রায়। বিক্রমের মুখ দুটো দু'হাতে ঢাকা। সে আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে! কতক্ষণ পরে মুখ থেকে হাত নামাল বিক্রম। চোখ দুটি তার রাঙা হয়ে উঠেছে।

অনন্তবিক্রম বললেন, কেঁদো না ভাই, আজ আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার পালা। তোমার মা অত্যন্ত ভদ্র আর কর্মী মেয়ে ছিল। ঐ খুশিতে ভরপুর মেয়েটিকে আমি মনে মনে বড় স্নেহ করতাম। বুঝতেই পারছ, চা বাগানের অন্যান্য মেয়েরা যখন আমার সামনে দিয়ে হাঁটতে পর্যন্ত সাহস পেত না তখন তোমার মা ধনমায়া ছুটে আসত আমার কাছে। সবে কৈশোর ছেড়ে সে তারুণ্যে পড়েছে। তার চলন-বলনের ভেতর ছিল না কোন অশালীনতা। সে সোজাসুজি অভিযোগ জানাত সর্দারদের বিরুদ্ধে। এতটুকু কোন ত্রুটি হলেই সে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার এমন কি ম্যানেজারের কাছে না গিয়ে ছুটে আসত আমারই কাছে প্রতিকারের আশায়। আমি ওর কথার মর্যাদা দিতাম। ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি দেখে ম্যানেজারেরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হত, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করত না।

ছুটিতে দার্জিলিং থেকে এল বীরবিক্রম। দু'মাসের জন্যে কলেজ বন্ধ। আমি কিন্তু থাকতে পারলাম না। জরুরি কাজে আমাকে বম্বে চলে যেতে হল। ফিরে যখন এলাম তখন যা হবার তা হয়ে গেছে।

তুমি এসেছ তখন ধনমায়ার দেহে নতুন অতিথি হয়ে। কলেজ খুলতেই চলে গেল বীরবিক্রম। কিন্তু দুটি মাস যেতে না যেতেই তোমার মা এসে দাঁড়াল আমার কাছে। অকপটে বলে গেল তার অবস্থার কথা। আমার সমস্ত রোমকূপ তখন আগুনের শিখা হয়ে গেছে। আমার হৃদয়ের সঞ্চিত সবটুকু স্নেহ তখন বাষ্পের মত উবে গেছে।

আমি ধনমায়াকে বললাম, এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস এ অঞ্চল ছেড়ে পালা। নইলে অনন্তবিক্রমের লোকেরা তোর চোখ উপড়ে নিয়ে ঐ তিস্তার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে।

থরথর করে কাঁপছিল বৃদ্ধের গলা।

বিক্রম চেঁচিয়ে উঠল, ও কথা থাক দাদু আমি শুনতে চাই না।

অনন্তবিক্রম গলা নামিয়ে বললেন, আমার পাপের কথা বলে একটু লঘু হতে চাইছি ভাই। তোমার মা বেঁচে থাকলে তার কাছে আজ আমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে মনটাকে হালকা করতে পারতাম।

বিক্রম অনেক ব্যথার অতল থেকে বলল, যদিও আজ তার কোন দরকারই নেই তবু একবার জানতে ইচ্ছে করে, আমার বাবা এখন কোথায়?

অনন্তবিক্রম বললেন, সে ঘটনার পর আমি তোমার বাবাকে ডেকে এনে চাবুক মেরে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিলাম। তারপর এক সময় ওকে পাঠিয়ে দিই লন্ডনে। পাঁচটি বছর পরে ও ফিরে এল না দেখে আমি ওর সন্ধানে যাই। কিন্তু তখন ও একটি ফরাসী মহিলাকে বিয়ে করে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে। আমি জানতে পেরে চলে আসি। রায়চৌধুরী বংশের সম্মানের কাছে আমি একমাত্র পুত্র বীরবিক্রমকেও বিসর্জন দিয়ে এলাম।

কথা শেষ করে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার সঙ্গে ভেতরে এসো।

বিক্রম বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল। অতি আধুনিক সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত। রায়চৌধুরীর বংশের অন্তহীন ঐশ্বর্যের প্রতীক।

বৃদ্ধ সোফায় বসতে বললেন বিক্রমকে। একটি দামী অ্যালবাম বের করে আনলেন আলমারি থেকে। পাশে বসে মেলে ধরলেন অ্যালবামের পাতা। বললেন, এটি বীরবিক্রমের ফটোর অ্যালবাম। এই যে বীরবিক্রমের অন্নপ্রাশনের ছবি। আমার মা সুধাময়ী নাতিকে কোলে নিয়ে ছবি তুলেছেন। এখানে তোমার পিতামহী প্যারাম্বুলেটারে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন বীরবিক্রমকে।

পর পর ক্রিকেট খেলার পোশাক আর ফুটবলের পোশাকে দেখা গেল বীরবিক্রমের ছবি। তারপর স্কুল-কলেজের পুরস্কার নিচ্ছে নত নমস্কারে। এরপর এল প্রথম যৌবন-উন্মেষের ছবিগুলো। ঘোড়ায় চড়ে দৃপ্তভঙ্গিতে সামনের দিকে চেয়ে আছে বীরবিক্রম। শিকারীর পোশাকে লক্ষ্যভেদের ভঙ্গিতে বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরবিক্রম। সবকটি চেহারাই পৌরুষদীপ্ত।

বিক্রম মনে মনে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিল কি অদ্ভুত সাদৃশ্য তার চেহারার সঙ্গে।

অনন্তবিক্রম ঠিক যেন বিক্রমের মনের কথাটি উচ্চারণ করে বললেন, আমি তোমাকে প্রথম চিনেছিলাম কোর্টে তোমার মুখখানা দেখে। আমি চমকে উঠেছিলাম। মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, বীরবিক্রম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি দীপ্ত চেহারা, তেমনি সুগঠিত দেহ। তারপর যখন শুনলাম, তোমার নাম বিক্রম রায়, তখন আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমার বুকের ভেতর থেকে বলল, এ আমার বংশের সন্তান না হয়ে যায় না। বিতাড়িতা ধনমায়া তার স্বামীর বংশের নামটুকুকে সংক্ষিপ্ত করে নিশ্চিত পুত্রের নাম রেখেছে তার। তুমি একটু আগে চোখের জল ফেলেছিলে তোমার মায়ের মৃত্যুর

কথা স্মরণ করে। আমি তার আত্মার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব, আমার বংশের সন্তানকে আজ আমার কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। বৃদ্ধ বুকে জড়িয়ে ধরলেন পৌত্র বিক্রমকে। তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল বহুদিনের সঞ্চিত অশ্রু।

সেদিন সন্ধ্যায় ডাইরেক্টর্স বাংলোর সবকটি আলো জ্বলে উঠে ইন্দ্রপ্রস্থের রূপ নিল। অনন্তবিক্রম মনের গভীর আনন্দ আর পরের দিনটির জন্যে চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি ম্যানেজার বলেন্দ্র চৌধুরীকে সব কথা বললেন। ডাক দিয়ে জড়ো করা হল কুলি-কামিনদের। প্রাঙ্গণ ভরে গেল কয়েক মুহূর্তে। অনন্তবিক্রম একে একে তাঁর জীবনের গোপন ব্যর্থতার কথাগুলি অকপটে সবার সামনে প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন, আজ থেকে তোমাদের প্রিয় বিক্রম রায় হল তোমাদের এই রিভারভিউ টি-গার্ডেনের ডাইরেক্টার।

উল্লাসধ্বনিতে তরঙ্গিত হতে লাগল আকাশ বাতাস। তাদের প্রিয় লালবাবুর জয়ধ্বনি ঘন ঘন বাজতে লাগল জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ে পাহাড়ে।

এই আনন্দ অনুষ্ঠান মজদুর পল্লীতে সারা রাত ধরে চলতে লাগল। রাতের আকাশ ভরে জ্বলতে লাগল রোশনাই। পরদিনের বিজয় উৎসবের জন্যে শহর থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল যে সব বাজি, সেগুলি আজ রাতেই ফুল হয়ে ফুটতে লাগল আকাশে, বজ্র হয়ে ফাটতে লাগল অরণ্যে পর্বতে।

এই উৎসবের রাতে কেবল একজন সবার অগোচরে গা ঢাকা দিল। সে চা বাগানের ভেতরের সংকীর্ণ পথ ধরে উঠতে লাগল ওপরে। এবার ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলল তাগদা বাজার লক্ষ্য করে।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে ... নিশাপতি এসে দাঁড়াল সীমার কোঠির সামনে। সবিস্তারে আজ সীমাকে বলতে হবে বিক্রম রায়ের অভাবিত পরিণতির কথা। অনন্তবিক্রম রায়চৌধুরীর পৌত্র, বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী যে তার একটা বারবণিতার দিকে ফিরেও চাইবে না, এ কথা বলার পর সে শুধু লক্ষ্য করবে সীমার প্রতিক্রিয়াটুকু। সীমাকে যে অনন্তবিক্রম এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারেন সে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু দিতেও সে ভুলবে না। আর যদি সীমা বুদ্ধিমতী হয়, প্রাণ নিয়ে পালাতে চায় তার সঙ্গে তাহলে সে রাজি। বলেন্দ্র চৌধুরীর গোপন নির্দেশ পালন করবে অক্ষরে অক্ষরে।

নিশাপতি সীমার বন্ধ দরজায় টোকা দিতে লাগল।

পরদিন তিস্তার তীরে বিজয় উৎসবের আয়োজন। টি-গার্ডেনের সর্বশ্রেণীর কর্মী তাদের নতুন মনিবকে বরণ করে নেবে। আনন্দে ভোজনে নাচে গানে কাটবে তাদের সমস্ত দিন।

এদিকে বলেন্দ্র চৌধুরী জীবনের শেষ দান ধরেছে। সে দার্জিলিং কনভেন্ট থেকে গাড়ি পাঠিয়ে এনেছে তার একমাত্র কন্যা বিপাশাকে। মেয়েটি এসেই পিতার নির্দেশে সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেছে অনন্তবিক্রমের। ইতিমধ্যেই সে তার মধুর হাসিতে জয় করে নিয়েছে বৃদ্ধ অনন্তবিক্রমের হৃদয়। কিন্তু চোখের কালো ভ্রমর দুটিকে বার বার উড়িয়েও সে সন্ধান পাচ্ছে না নতুন ডাইরেক্টারের হৃদয়ের। সুযোগ বুঝে ইষ্টনাম জপ করে ইতিমধ্যেই বলেন্দ্র প্রস্তাবটা ফেলেছে অনন্তবিক্রমের শ্রীচরণে। বহুদিন একনিষ্ঠ সেবা করে এসেছে সে রায়চৌধুরী পরিবারের, সেজন্যে জীবনের শেষ পর্বে প্রভুর কাছে অভাবিত পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা। ইঙ্গিতে তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছেন অনন্তবিক্রম। এরপর সবাই মিলে ওরা গেছে তিস্তার পিকনিক স্পটে। বিক্রম কোন কথা শোনেনি, সে আজ তার ডাক্তার দাদুর উপহার দেওয়া ল্যান্ডরোভারখানা চালিয়ে নিয়ে গেছে। এই গাড়িতে যে রয়েছে তার মায়ের দেহের স্পর্শ। আজ যে সবচেয়ে বেশি করে চাই তার মায়ের আশীর্বাদ।

সারাদিন কাটল অফুরন্ত আনন্দ আয়োজনের ভেতর। সমস্ত কুলি-কামিনদের সঙ্গে বিক্রমের অনুরোধে একই পঙ্ক্তিতে ভোজনে বসতে হল অনন্তবিক্রমকে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অনন্তবিক্রম তিস্তার তীরেই সভা রচনা করে বসলেন।

অনন্তবিক্রম বললেন, গত রাতেই আমি আমার অন্তরের ইচ্ছা তোমাদের সকলের কাছে ব্যক্ত করেছি। বিক্রম যে আমার সমস্ত সম্পদের, সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের অধিকারী সে কথা আজ আবারও ঘোষণা করছি।

সকলে করতালি দিয়ে অনন্তবিক্রমের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করল।

বলেন্দ্র চৌধুরী এবার করুণ চোখে তাকাল অনন্তবিক্রমের দিকে। অনন্তবিক্রম ঠিক তার পায়ের কাছে বসে থাকা মঞ্জুহাসিনী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে এবার বললেন আজ আমার শেষ আর একটি ঘোষণা আছে। বলেই বিপাশার হাত ধরে তুলে পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই মেয়েটি মাত্র একটি দিনের ব্যবহারে এ বৃদ্ধের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। আমার শেষ প্রস্তাব, আমার একমাত্র পৌত্র বিক্রমের সঙ্গে ...।

কথা সমাপ্ত করতে পারলেন না অনন্তবিক্রম। তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি তুলে তাঁর কাছে ছুটে এল বিক্রম। বলল, আমি বিবাহিত দাদু!

সমস্ত সভা মূক হয়ে গেল। অনন্তবিক্রম স্তব্ধ।

বিক্রম ধীরে ধীরে বলল, বিধাতা আমাকে দিয়ে পাপের ঋণ শোধ করিয়ে নিলেন। এই টি-গার্ডেনে যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্যে যে হতভাগ্য বিলাসিনীদের আনা হয়েছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। আমি এখানকার গেস্ট হাউসের বিলাসিনী বারাঙ্গনা সীমা রাইকে গ্রহণ করেছি।

সীমা রাই! সীমা রাই! কথাগুলো মুখে মুখে গুঞ্জন ধ্বনিতে ফিরতে লাগল।

বিক্রম বলে চলল, আজ আমার তার কাছ থেকে ফেরার কোন পথ নেই। সে আজ রায়চৌধুরী বংশের সন্তানের জননী হতে চলেছে।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল অনন্তবিক্রমের, তা কখনো হয় না, হতে পারে না। পতিতা বারাঙ্গনা কোনদিন রায়চৌধুরী বংশের বধূ হতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন অনন্তবিক্রম, আমার মুখাগ্নি বা পারলৌকিক কাজ যদি অসম্পূর্ণও থাকে তাহলেও দুঃখ নেই, কিন্তু ভ্রষ্টা মেয়ের সন্তানকে আমি প্রাণ থাকতে আমার বংশধর বলে স্বীকার করে নিতে পারব না।

বিক্রম বৃদ্ধ অনন্তবিক্রমের চরণ স্পর্শ করে বলল, আমি শপথ করছি, কোনদিন নিজেকে রায়চৌধুরী বংশের সন্তান বলে পরিচয় দেব না, কিংবা আমার সন্তানও দেবে না। শুধু আশীর্বাদ চাই যা সত্য তাকে যেন সহস্র প্রলোভনের ভেতরেও ত্যাগ না করি। আর আমার পিতা, পিতামহ যে ভুল করে গেলেন, সে ভুলের পথে যেন আমি আর পা না বাড়াই।

বিক্রম সবাইকে স্তব্ধ, বিস্মিত করে দিয়ে তার ল্যান্ডরোভারে গিয়ে উঠে বসল। তারপর স্বপ্নের জগতের মত সবকিছু মুছে ফেলে দিয়ে গাড়িখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল তার অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। তাগদা বাজারের সেই ঝোপড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বিক্রমের ল্যান্ডরোভার। সীমা, সীমা, সীমা! সমস্ত ঘর শূন্য খাঁ-খাঁ করছে। বিক্রমের আবেগ আকুল ডাকে সাড়া দিতে কেউ এগিয়ে এল না।

মুহূর্তে কি মনে করে ঘুরে দাঁড়াল সে। গাড়ি ছুটল তাগদা পাহাড়ের দিকে। তাগদা পাহাড়ের চূড়ায় সাধুবাবার ঝোপড়িতে তখন শেষ সূর্যের সোনাটুকু ঝিলমিল করছে। ... বিক্রম পাগলের মত উঠতে লাগল। বিক্রম যত ওপরে উঠছে, তার মনে হচ্ছে নীচের টি-গার্ডেনগুলো ততই নিচে নেমে যাচ্ছে।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছে। আর তার মনে হচ্ছে, গভীর ভাবে মনে হচ্ছে, সাধুবাবাই তাকে দিতে পারবে তার সীমার সন্ধান।

... কে যেন বেরিয়ে এল বাইরে। গায়ে সাদা র‍্যাপার জড়ানো। ঐ তো সেই পুষ্পিত চুনাখারি গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বিক্রম তার সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে উঠে চলেছে চড়াই ভেঙে।

অবশেষে বিক্রম এসে পৌঁছল। ... দাঁড়িয়ে আছে তার সীমা। আবেগে অভিমানে কাঁপছে সীমার দুটি ঠোঁট।

ও কে জড়িয়ে আছে সীমার বুকের মধ্যে? ফুটে আছে একটা গোলাপের মত? রায়চৌধুরী বংশের সন্তান! না, না, না, একটা স্কাউন্ড্রেল ড্রাইভার আর পতিতার সন্তান। সীমা আর তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল বিক্রম রায়।

চুনাখারি গাছের ফুলগুলো শেষ সূর্যের সোনা মেখে দুলতে দুলতে ওদের ওপর ঝরে পড়ল।

●